প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

মুদ্রক। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯
প্রচ্ছদপটশিল্পী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত
গ্রন্থন। ন্যাশনাল ট্রেডার্স। কলিকাতা ৯
পরিবেশক। দাশগুপ্ত এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৪।৩ কলেজ স্ট্রিট। কলিকাতা ১২

মূল্য: নয় টাকা মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন

গত শতকে যে সব মনীষী বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসগুলি বাঙলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছে। বর্তমানকালের পাঠকের নিকটেও ইহার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির দুই একটি সংস্করণ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নহে। সেই অভাব মিটাইবার জন্য আমরা রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস একটি খণ্ডে গ্রথিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। রমেশচন্দ্রের জীবিতকালে উপন্যাসগুলির যে শেষ সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতে এই পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটি মুদ্রিত হইয়াছে। আশা করি ইহা পাঠকের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

রমেশচন্দ্র দত্তের রচনাবলীর সাহিত্য অংশটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনার কথা আমরা অবগত হইয়াছি। সেইজন্য এই অংশটি আপাতত প্রকাশ করিতে আমরা বিরত রহিলাম। যদি ভবিষ্যতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ইহা প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে এই অংশটিও পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এবং গ্রন্থখানি সম্পাদনা করিয়া শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সূচীপত্র

বঙ্গবিজেতা	১— ৮২
মাধবীকঙ্কণ	৮৩—১৫০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত	১৫১—২৪৯
রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা	২৫০—৩২৬
সংসার	৩২৭—৪২৬
সমাজ	৪২৭—৪৯৭

ভূমিকা

রমেশচন্দ্রের রচনাবলীর প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই একটি আকর্ষণ রহিয়াছে। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করার স্থান এ নয়। তবে একটি কথা আমাদের বরাবরই মনে হইয়াছে। তাহা হইল —স্বদেশের শিক্ষা, সাহিত্য. সংস্কৃতির প্রতি রমেশচন্দ্রের ঐকান্তিক অনুরাগ। স্বদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিই ছিল তাঁহার আন্তরিক লক্ষ্য। আমরা যাহাকে Patriotism বা স্বদেশপ্রেম বলি তাহা তাঁহার ভিতরে বিশেষভাবে ছিল, আর তাঁহার ইংরেজী বাঙ্গালা সকল রকম রচনার মধ্যে এই স্বদেশপ্রেম বিধৃত। তাই বলিয়া তিনি সংস্কারকে যুক্তির উপরে কখনও জ্ঞাতসারে স্থান দেন নাই। এককথায় বলিতে গেলে রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ছিল বাস্তবধর্ম্মী এবং যুক্তিনিষ্ঠ।

বর্ত্তমান সংস্করণে রমেশচন্দ্রের উপন্যাস ক'খানি সন্নিবেশিত হইল। ইহার মধ্যেও পাঠক ঐ একই ধারা লক্ষ্য করিবেন। রমেশচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁহার ছয়খানি উপন্যাস লইয়া 'হিতবাদী সংস্করণ' প্রকাশিত হয় (১৯০৫)। এই পুস্তকে ঐ সংস্করণই অনুসৃত হইয়াছে। হিতবাদী সংস্করণে স্থানে স্থানে মুদ্রাকরপ্রমাদ ঘটিয়াছে। বর্ণাশুদ্ধি একই শব্দের বিভিন্ন রকম বানান, বিরতি চিহ্নের অসমতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল সংশোধন পূর্ব্বক প্রত্যেকখানি উপন্যাসকেই একটি সুসমঞ্জস রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। রমেশচন্দ্রের পঞ্চম উপন্যাস—'সংসার' মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ঢালিয়া সাজিয়া 'সংসার-কথা' নামে প্রকাশের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরে এখানি মুদ্রাঙ্কিত হয়। তিনি এই প্রকারে অন্যান্য উপন্যাসগুলিরও সংস্কার সাধনের মানস করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তাঁহার রচনা ও চিন্তাধারার ক্রমিক বিকাশ সংরক্ষণের নিমিত্ত মূল 'সংসার'ই প্রকাশিত করিলাম। পাঠক সাধারণের অভীপ্সা পূরণের নিমিত্ত পরবর্ত্তী সংস্করণে 'সংসার-কথা' প্রকাশেরও বাসনা আমাদের রহিল।

এই রচনাবলীতে দুইটি অধ্যায়ে রমেশচন্দ্রের জীবনকথা এবং সাহিত্য সাধনার বিষয় আলোচনা করিতে যত্ন লইয়াছি। রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করিতে হইলে তাঁহার সংরক্ষিত "Paper-Cuttings" পাঠ একান্ত আবশ্যক। তিনি সযত্নে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষাদানের সময় হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজের এবং সমসাময়িক জ্ঞাতব্য বিষয়াদি বিভিন্ন দেশী, বিদেশী, ইংরেজী, বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া কয়েক খণ্ডে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের প্রামাণিক ইংরেজী জীবনী—*Life and Work of Romesh Chunder Dutt*—তাঁহার জামাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়া গিয়াছেন (১৯১১)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র অন্তর্গত 'রমেশচন্দ্র দত্ত' লিখিয়াছেন। এসব হইতেও রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে নানা তথ্য মিলিবে। উক্ত অধ্যায় দুইটি রচনায় আমি এই সকল সূত্রের বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছি। সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হইতেও কিছু কিছু অত্যাবশ্যক তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

বর্ত্তমান সংস্করণকে সুষ্ঠু রূপদানে বহুজনেরই আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি পাইয়াছি। প্রথমেই বন্ধুবর ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করি। তিনি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিকালে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য, বিমল দেব, গৌতম সেন প্রমুখ সুহৃদবর্গ আমাকে

পুস্তকাদি দিয়া এবং নানাভাবে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট আমি পুস্তক ও তথ্যাদি সংগ্রহে যথোচিত সাহায্য পাইয়াছি তাহার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও অনেকের নিকট হইতে আমি সহায়তা লাভ করিয়াছি। এখানে সকলের নামোল্লেখ সম্ভব না হইলেও তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সাহিত্য সংসদের পক্ষে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত দীর্ঘকাল যাবৎ রমেশ রচনাবলী প্রকাশের সর্ব্ববিধ আয়োজনে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়াছেন। তাঁহারা রমেশ রচনাবলী প্রকাশদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিস্মৃতপ্রায় সম্পদের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন, এজন্য তাঁহারা বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। ইতি—১লা বৈশাখ ১৩৬৬।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

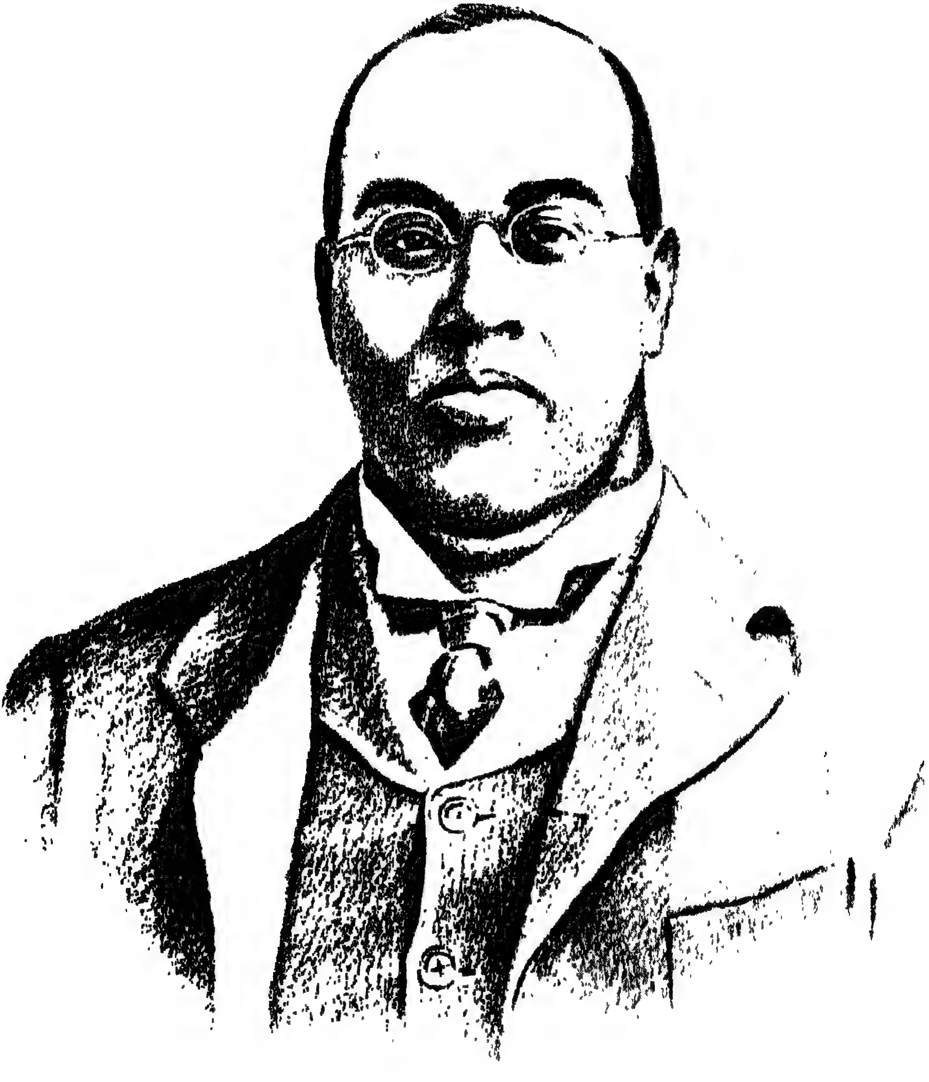

রমেশচন্দ্র দত্ত : জীবন-কথা

ভূমিকা : ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী একটি গৌরবময় যুগ। এই শতাব্দীতে পরাধীনতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে বহু মনীষী, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ ও সাহিত্য সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা আধুনিক কালের ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচিত তাঁহারা এই সকল যুগস্রষ্টা সমাজনেতাদের কার্য্যকলাপের কথা অবগত আছেন। রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ গত শতাব্দীর যুগস্রষ্টাদের পুরোধা। রমেশচন্দ্র দত্ত এই যুগস্রষ্টা মনীষিগণের সমপর্য্যায়ের না হইলেও নিজ কৃতিবলে ভারতমাতার সুসন্তান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। রমেশচন্দ্রের জীবন-কাল গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধব্যাপী; বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকেও তাহা উপচাইয়া পড়িয়াছে। এই ষাট বৎসরের ভিতর বাঙ্গালা তথা ভারতে এক অভূতপূর্ব্ব রেণেসাঁস্ বা নবজাগরণের সূচনা ও কথঞ্চিৎ পরিণতি ঘটিয়াছে। এই রেণেসাঁস বা নবজাগরণে যাঁহারা ভূরিপরিমাণ রসদ যোগাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের নাম স্বতঃই আমাদের মনে আসে। তাঁহার জীবন-কথা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : রমেশচন্দ্র ১৮৪৮ সনের ১৩ই আগষ্ট কলিকাতা রামবাগানের বিখ্যাত দত্তপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি বা নীলু দত্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই তিনি ইংরেজী নবীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। নীলমণির তিন পুত্র : রসময়, হরিশ ও পীতাম্বর। পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশানচন্দ্র। রমেশচন্দ্র ঈশানচন্দ্রের মধ্যমপুত্র। রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপিতামহ রসময় দত্ত সে যুগের একজন বিদগ্ধ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে এই পরিবারে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিকেরও আবির্ভাব হয়। রসময় দত্তের পুত্র কৈলাসচন্দ্র দত্ত "হিন্দু পাইয়োনীয়ার" নামক একখানি ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ইংরেজী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুবিখ্যাত কবি অরু ও তরু দত্ত এই গোবিন্দচন্দ্রেরই কন্যা। রমেশচন্দ্রের খুল্লতাত শশীচন্দ্র দত্ত-ও সে যুগে ইংরেজী লেখক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা প্রত্যেকেই ইংরেজী ভাষায় লিখিতেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণে তেমন পরিচিত হইতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র ছিলেন একজন খ্যাতনামা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। রাজকার্য্যহেতু ঈশানচন্দ্রকে প্রায়ই স্থানান্তরে বদলি হইতে হইত। এজন্য রমেশচন্দ্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতার বাটীতে শিক্ষালাভের নিমিত্ত রাখা হইয়াছিল।

ছাত্রজীবন : বিবাহ : রমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া রীতিমত পাঠাভ্যাসে মন দেন। তিনি কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (বর্ত্তমান হেয়ার স্কুল) ভর্ত্তি হইলেন। রমেশচন্দ্রের মাতা ১৮৫৯ সনে ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৬১ সনে পিতা ঈশানচন্দ্রও খুলনায় মারা যান। অতঃপর রমেশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল খুল্লতাত শশীচন্দ্রের উপর। রমেশচন্দ্র উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৮৬৪ সনে এন্ট্রান্স ও ১৮৬৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ.এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া যথাক্রমে সেকেণ্ডগ্রেড জুনিয়র স্কলারশিপ ও সিনিয়র স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন।

এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতিকালে ১৮৬৪ সনে কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী নবগোপাল বসুর মধ্যমা কন্যা মাতঙ্গিনী ওরফে মোহিনী বসুজার সঙ্গে রমেশচন্দ্রের বিবাহ হয়।

এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রমেশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজেই বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। এখানে এক বৎসর যথারীতি অধ্যয়নান্তর চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত হন। কিন্তু এই সময়েই তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ গতি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ ঘটিল। তিনি ছাত্রাবস্থায়ই কিরূপ উচ্চ আশা পোষণ করিতেন তাহা অল্পকাল মধ্যেই প্রকটিত হইল। সে যুগে ভারতবাসীদের মধ্যে একজনমাত্র (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিন-তিনবার চেষ্টা করিয়াও পরবর্ত্তী কালের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতকার্য্যতায়ই পরবর্ত্তী কালে এই পরীক্ষার পথ ভারতবাসীদের পক্ষে অধিকতর কণ্টকিত করা হইয়াছিল।

রমেশচন্দ্র তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া বন্ধুবর সহপাঠী বিহারীলাল গুপ্তের সহিত এমন কতকগুলি বিষয় অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন যাহাতে ঐ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ সহজ হইয়াছিল।

বিলাত যাত্রা : রমেশচন্দ্র ১৮৬৮ সনে ৩রা মার্চ্চ বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আত্মীয়স্বজন প্রায় সকলেরই অগোচরে বিলাত যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য— সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দান। এই উপলক্ষে "অমৃতবাজার পত্রিকা" (১২ই মার্চ্চ. ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ) লেখেন :

"বিগত ৩রা মার্চ্চ কলিকাতা হইতে ৩টি যুবক ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। সিবিল সরবিস পরীক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্তবাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, তিনি এই বৎসর বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনেক দিন পূর্ব্বে হইতেই তিনি সিবিল সরবিস পরীক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। ডবটন্ কালেজে লাটিন ভাষা এক প্রকার উত্তম রূপেই তিনি শিক্ষা করিয়াছেন; অপরাপর প্রয়োজনীয় বিদ্যাভ্যাসে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। বাঞ্ছিত ফললাভে কতদূর কৃতকার্য্য হন জানি না।

অপর দুইটির নাম রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত; ইঁহারা প্রেসিডেন্সি কালেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। এই দুই বন্ধু গুপ্তভাবে গত বৎসরারম্ভ হইতেই ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষা এবং অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করিতেছিলেন। আমরা শুনিলাম রমেশচন্দ্র আপনার নামে কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা লইয়া গিয়াছেন, (এবং বোধ হয়) সুরেন্দ্রবাবু বিহারীবাবুর ব্যয়ের ভার লইয়াছেন। রমেশবাবু ও বিহারীবাবু গুপ্তভাবে গিয়াছেন বলিলেও বলা যায়। বিহারীর পিতা তাঁহাদের গমন বৃত্তান্ত শুনিয়া ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত গিয়াছেন, কোনক্রমে স্বপুত্রকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। অবশেষে এই বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন 'বাবা! সব করো কেবল বিবি বিয়ে করো না।' আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, ইঁহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। কিন্তু মনমোহনবাবুর বিষয় মনে হইলে বোধ হয় না যে, ইঁহাদের মনোবাঞ্ছা সহজেই সিদ্ধ হইবে।"

রমেশচন্দ্রের বিলাত গমনের বিষয় একমাত্র তাঁহার অগ্রজ যোগেশচন্দ্র দত্ত জানিতেন। তিনি গোপনে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া ভ্রাতার বিলাত গমনে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সিবিল সার্বিস পরীক্ষা : রমেশচন্দ্র বিলাতে পৌঁছিয়াই সিবিল সার্বিস পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি এই সময় গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৮৬৯, জুন মাসে সিবিল সার্বিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গৃহীত হয়। ফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল রমেশচন্দ্র উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এবারে সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থী ছিলেন তিনশত তেইশ জন। ইহাদের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ জনকে নির্ব্বাচিত করিবার কথা ছিল।

এই পরীক্ষা ছিল প্রাথমিক। শেষ পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮৭১ সনের মাঝামাঝি। ক'বৎসরই রমেশচন্দ্র গভীর অধ্যয়ন ও অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই পরীক্ষায় রমেশচন্দ্র আটচল্লিশ জন উত্তীর্ণ ও নির্ব্বাচিত প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। এইবারে মোট নির্ব্বাচিত সিবিল সার্বিস কর্ম্মীদের মধ্যে ছিলেন চারিজন ভারতীয়—রমেশচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদ্বয় ব্যতিরেকে বোম্বাইনিবাসী শ্রীপৎ বাবাজী ঠাকুর।

ইহার পর রমেশচন্দ্র ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিয়াও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৮৭১ সনে সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। দেশবাসীরা নবাগত সিবিলিয়ানদের স্বাগত করিবার জন্য পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে একটি সম্বর্দ্ধনা সভার অনুষ্ঠান করেন। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ সমাজ-নেতৃবর্গ। উত্তরপাড়া হিতকরী সভাও তাহাদের অভিনন্দনের যথোচিত আয়োজন করিলেন। হিতকরী সভা প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে নিজের ও বন্ধুদের পক্ষে রমেশচন্দ্র একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি এই মর্ম্মে বলেন যে, তাঁহারা এখনও স্বদেশ-সেবার কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই বটে, তবে তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যদ্বারা স্বদেশের খানিকটা উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা পোষণ করেন। তিনি স্বদেশবাসীদের প্রতি আবেদন জানান যেন তাঁহারা অধিক সংখ্যায় বিলাতে গিয়া সিবিল সার্বিস

পরীক্ষায় যোগ দেন। বিলাত প্রবাসের দরুণ তাঁহারা স্বাধীনতার মর্ম্ম এবং নর-নারীর মধ্যে সাম্যের বিষয় বিশেষভাবে হৃদ্‌গত করিতে পারিবেন।

কর্ম্মজীবন : রমেশচন্দ্র ভারতে পৌঁছিয়াই সিবিল সার্বিসের কর্ম্ম আরম্ভ করেন। তাঁহার এই সরকারী কর্ম্মজীবনের বিশদ বিবরণ *History of Services of Gazetted and other officers Serving under Government of Bengal*—পুস্তকের ১৮৯৭ সনের ১লা জুলাই পর্য্যন্ত সংশোধিত খণ্ড হইতে (পৃঃ ১৬৯-৭০) এখানে বাংলায় সংকলন করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করিবার পক্ষে এই বিবরণটি অপরিহার্য্য :

২৪ পরগণা, আলিপুর	অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর	২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭১
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ	ঐ	৭ নবেম্বর ১৮৭২
বনগ্রাম, নদীয়া	ঐ	১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩
মেহেরপুর, নদীয়া	ঐ	৮ মে ১৮৭৪
বনগ্রাম, নদীয়া	ঐ	১০ নবেম্বর ১৮৭৪
নদীয়া	ঐ	৩১ আগষ্ট ১৮৭৬
দক্ষিণ শাহ্‌বাজপুর, বরিশাল	ঐ	২৯ নবেম্বর ১৮৭৬
ত্রিপুরা	ঐ	১৩ জুলাই ১৮৭৮
বর্দ্ধমান	ঐ	১২ ডিসেম্বর ১৮৭৮
বাঁকুড়া	ঐ	১ মার্চ ১৮৮০
ঐ	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮১
ঐ	অ্যাঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর	১৫ ডিসেম্বর ১৮৮১
ঐ	জয়েণ্ট ম্যা. ও ডে. কলেক্টর (২য় শ্রেণী)	১ জুন ১৮৮২
বালেশ্বর	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	২৭ জুলাই ১৮৮২
ঐ	জয়েণ্ট ম্যা. ও ডে. কলেক্টর	২৪ অক্টোবর ১৮৮২
বাখরগঞ্জ	ঐ	৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩
ঐ	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	২৯ মার্চ ১৮৮৩
ঐ	জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৩
ঐ	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	২৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪
ঐ	জ. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর (১ম শ্রেণী)	১৩ অক্টোবর ১৮৮৪

(ছুটি : ১৫ মার্চ ১৮৮৫ হইতে দুই বৎসর)

পাবনা	জ. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর	১৫ মার্চ ১৮৮৭
ঐ	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	১৮ মার্চ ১৮৮৭
ময়মনসিংহ	ঐ	৪ অক্টোবর ১৮৮৭
ঐ	ঐ (৩য় শ্রেণী)	৬ মার্চ ১৮৮৮
ঐ	ঐ (২য় শ্রেণী)	২৯ অক্টোবর ১৮৮৯
বর্দ্ধমান	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	১৬ এপ্রিল ১৮৯০
দিনাজপুর	ঐ (২য় শ্রেণী)	২ ডিসেম্বর ১৮৯০
মেদিনীপুর	ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	২৫ এপ্রিল ১৮৯১
ঐ	ঐ (২য় শ্রেণী)	১৮ ডিসেম্বর ১৮৯১

(ছুটি : ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ হইতে ১ বৎসর ২ মাস ১৬ দিন)

ছুটিতে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (১ম শ্রেণী)......১৮ মার্চ ১৮৯৩

(ছুটি : ১৭ নবেম্বর ১৮৯৩ হইতে)

বর্দ্ধমান	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর	২৬ নবেম্বর ১৮৯৩
ঐ	কমিশনর, বর্দ্ধমান বিভাগ (অস্থায়ী)	১৬ এপ্রিল ১৮৯৪
হুগলী	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর	১৭ এপ্রিল ১৮৯৫
উড়িষ্যা	কমিশনর ও করদমহলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (অস্থায়ী)	৬ অক্টোবর ১৮৯৫

(ছুটি : ১৭ জানুয়ারী ১৮৯৭ হইতে। ২৬-১-৯৭ হইতে ১০ মাস)

রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা শুরু হয় তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম দিকেই। কিরূপে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলনে রত হন সে এক বিচিত্র কাহিনী।

প্রতিটি সিবিল সার্বিস কর্ম্মী স্বদেশ-সেবায় কতখানি কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন রমেশচন্দ্র তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থান করিয়াছেন এবং নিয়ত জনসাধারণের মঙ্গল-কর্ম্মে নিজেকে লিপ্ত রাখিয়াছেন। প্রজার কল্যাণ ছিল তাঁহার সকল কর্ম্মের মূল তন্ত্র। ১৮৭৩-৭৪ সনে পাবনায় যখন তথাকথিত প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয় তখন তিনি ভূমিতে প্রজার স্বত্ব নিরূপণ কল্পে 'ARCYDE' ছদ্মনামে বহু ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন রেভাঃ লালবিহারী দে সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায়। দক্ষিণ শাহাবাজপুরের (বরিশাল) অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর থাকাকালে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ ঝড় ও প্লাবন হয়। ইহাতে নর-নারী, শিশু, গৃহপালিত গো-মহিষ এবং অসংখ্য জীবজন্তুর প্রাণহানি ঘটে। রোহিণীকুমার সেনের 'বাক্‌লা' শীর্ষক বাখরগঞ্জের ইতিহাসে এই মর্ম্মন্তুদ প্লাবনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আমি ঐ সময়কার 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র স্তম্ভে এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ের বিস্তারিত বর্ণনা বহু সংখ্যায় পরপর দেখিয়াছি। এ সময় রমেশচন্দ্র যুবজনোচিত আগ্রহে দুর্গত জনসাধারণের দুঃখকষ্ট লাঘবের নিমিত্ত অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বরিশালবাসী নর-নারী বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা-পরায়ণতার কথা অতীব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্রের মত বিদ্যোৎসাহী প্রশাসক সে যুগেও খুব কমই দেখা যাইত। তিনি যখনই যেখানে গিয়াছেন সে সব স্থলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রসমাজকেও নিজ অকৃত্রিম উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি বাখরগঞ্জের জিলাশাসকরূপে অবস্থান কালে তিনি ইহার অন্যতম মহকুমা পিরোজপুরে গিয়াছেন এবং স্কুল পরিদর্শন করিয়া তরুণ ছাত্রগণকে বিশেষ উৎসাহ এবং বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। "প্রবাসী" ও "মডার্ন রিভিয়ু"র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একদা আমাদিগকে রমেশচন্দ্রের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তিনি বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ছাত্রাবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্রের হস্ত হইতে পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন-হেতু পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রদত্ত মধুর উপদেশ এখনও তাঁহার স্পষ্ট মনে আছে। এইরকম ঘটনা বা দৃষ্টান্ত বিভিন্ন জেলার প্রাচীন লোকেরা এখনও হয়ত দিতে পারিবেন।

স্বদেশের অর্থনীতি ও শিল্পোন্নতির চিন্তাও রমেশচন্দ্রের মনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিল। সরকারী কর্ম্মকালে তাঁহার বিশেষ পরিচয় না পাইলেও ইহার আভাস আমরা ঐ সময়েই পাইয়া থাকি। বিশেষতঃ সাহিত্যানুশীলন এবং বিবিধ উপায়ে স্বদেশের উন্নতিসাধনই যে তাঁহাকে সিবিল সার্বিসের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণে প্রবুদ্ধ করে তাহা আমরা এখনই জানিতে পারিব।

রমেশচন্দ্র কর্ম্মকালেই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সরকার হইতে সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। নূতন ভারত সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হইলে ১৮৯৫ সনে তিনি বঙ্গীয় আইন-সভায় সরকার কর্ত্তৃক সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু নির্ব্বাচিত সদস্যরূপে আইন-সভায় তাঁহার সহকর্ম্মী হন।

অবসর গ্রহণ : লন্ডন য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক : রমেশচন্দ্র ১৮৯৭, ২৬শে জানুয়ারী হইতে দশ মাসের ছুটি লইয়া বিলাত গমন করেন। তিনি ইহার পর সরকারী কর্ম্মে আর ফিরিয়া আসেন নাই। বাৎসরিক এক হাজার পাউন্ড পেন্সনে কার্য্যকাল পূর্ণ হইবার আট নয় বৎসর পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি যে মনে মনে স্বদেশ-সেবার উচ্চতর আদর্শ এবং

বিস্তৃততর ক্ষেত্র খুঁজিতেছিলেন তাহার আভাস পাই ১৮৮৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অগ্রজ যোগেশচন্দ্রকে লিখিত পত্র হইতে। এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রখানির কিয়দংশ এখানে দিলাম :

"I did not think of an appointment in the India Council, but of a readership in Indian History or in Sanskrit, in Cambridge, Oxford, or London, if my 'History of India' makes a name for itself. Anything which will give me a position and some little income over and above my pension, and will enable me to organise an Indian Party to represent Indians' rights in England and Parliament."

রমেশচন্দ্র ১৮৯২-৯৩ নাগাদ বৎসরাধিক কালের ছুটিতে বিলাতে অবস্থান করিয়াছিলেন ; এই সময়ে তিনি সেখানে জাতীয় কংগ্রেসের কোন কোন প্রস্তাব, যেমন, বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ, প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। এরূপ কার্য্যে সরকার যে তাহার উপর রুষ্ট হইবেন এবং তাহাতে তাঁহার উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, ইহা তিনি বেশ জানিতেন। সরকারী কর্ম্মে যোগ্যতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও রমেশচন্দ্রের অপেক্ষা জুনিয়র ইংরেজ সিবিলিয়ানদের দ্রুত পদোন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে তিনি কোনরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। পক্ষান্তরে স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি-সাধনই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তিনি ঐ সময়ে অগ্রজ যোগেশচন্দ্রকে একখানি পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখেন—

"...but I only state these facts to show that if Government is not disposed to repose any real trust and confidence in me, I am free to utilise my powers and abilities, such as they are, to the benefit of my country in other ways. And Government will feel this when they see me co-operating with Sir Richard Garth and Mr. Reynolds to press for a reform in the system of our administration."

ইহার পরেই, ১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে রমেশচন্দ্র যখন বর্দ্ধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনর পদে নিয়োজিত হইলেন, তখন সাধারণ ভাবে ইংরেজের ভারত-দ্বেষী মনোভাব পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই ব্যাপারে দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রে বিশেষ বাদানুবাদও কিছুকাল যাবৎ চলিয়াছিল। কিন্তু প্রথমে বর্দ্ধমান ও পরে উড়িষ্যার অস্থায়ী কমিশনর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রমেশচন্দ্র শুধু যোগ্যতারই প্রমাণ দেন নাই, ভারতীয় ও ইউরোপীয় নির্ব্বিশেষে সকল অধীনস্থ কর্ম্মচারী তাঁহার মধুর ব্যবহারে এবং সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তবে রমেশচন্দ্রের মন সরকারী কর্ম্মে আর বেশী দিন সায় দিতে পারিল না। সাহিত্য-সাধনা এবং স্বদেশ-সেবার অধিকতর উপযুক্ত ও ব্যাপকতর ক্ষেত্র লাভের আশায় কর্ম্ম হইতে অকালে অবসর গ্রহণ করিলেন।

রমেশচন্দ্র অবসর গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই ১৮৯৭ সনের ১৪ই ডিসেম্বর লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিয়োগ-সম্বলিত একখানি পত্র কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার কথা পরে বিস্তারিত রূপে বলা যাইবে। এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্যাদির সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিভিন্ন পুস্তকে উহা মুখ্যতঃ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজের নিকট হইতে তিনি সবিশেষ প্রশংসাও প্রাপ্ত হন। তাঁহার অবসর গ্রহণের সংবাদে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ বিলাতে উপস্থিতির সুযোগ লইয়া তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য নিয়োগপত্র দিয়া থাকিবেন। তবে এই পদের কোন বেতন ছিল না। বক্তৃতায় উপস্থিত ছাত্রগণের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে একটি থোক ফী গ্রহণ করা হইত। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি সম্পর্কে। এই বক্তৃতাগুলি প্রস্তুতি কালে তিনি গভীর ভাবে গবেষণা কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইহার ফল—কয়েকখানি ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক ইংরেজী গ্রন্থ। অন্যত্র এইসব গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। প্রাচীন ভারতের বিবিধ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইয়া ইংরেজ সমাজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব্ব-সংস্কার যাচাই করিয়া লইতে অগ্রসর হইল। রমেশচন্দ্র স্বদেশ-সেবার এই পন্থাটি গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর যে কি হিতসাধন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

রাজনীতি : কংগ্রেসের সভাপতি : সাহিত্যের মাধ্যমেই ভারত-কথা প্রচার করিয়া রমেশচন্দ্র ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি ভারতের শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, সরকারী ভূমি-কর-নীতি, শাসন-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়েও আন্দোলন সুরু করিয়া দেন বক্তৃতায় ও বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে। বন্ধুবর বিহারীলাল গুপ্তকে তিনি এই সময়ে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :

"In the first place, my criticisms after I have retired from the service do not in the least degree injure the prospects of other Bengalies in the service; on the contrary, I believe they improve their chances. A little provocation does more good than eternal attempts at conciliation...

Secondly, I know the India office. Considerations of race are paramount there; they want to shut us out, not because we are critics, but because we are natives, and their policy is rule by Englishmen. They have matured this policy in twenty years—they have a vast mass of secret minutes in their archives on the subject. Licking the dust off their feet will not move them from this policy; unsparing criticism and persistent fighting can, and will do it. Englishmen understand fighting, and they will yield to persistent fighting —not to begging.

Thirdly, it is admitted perhaps that my Land Revenue agitation has done some good. It has forced government to correct past mistakes, to revise assessments in Bombay, Madras, and the Central Provinces, and to frame rules of remissions and suspensions when crops fail. And our personal interests sink into insignificance compared with these results."

বিলাতে অবস্থানকালে প্রায় তিন বৎসর যাবৎ রমেশচন্দ্র স্বদেশের সেবায় নিয়ত তৎপর ছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে প্রীত হইয়া কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৯৯ সনে তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরণ করেন। রমেশচন্দ্র যথাসময়ে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হ'ন এবং ঐ সনের শেষভাগে লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার সভাপতি পদের নির্ব্বাচনের কথা জানিয়া নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তদীয় 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকায় লেখেন :

"A better selection could not be made. By his learning, experience, position, sobriety and soundness of judgement, he seems to be specially marked out for the honour which it has been decided to confer on him. *(2 October, 1899)"*

২৭শে ডিসেম্বর যথারীতি অধিবেশন হইল। সভাপতির দীর্ঘ বক্তৃতায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যে একটি বিষয়ের উপর রমেশচন্দ্র বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন যে, ভারতের সিবিল সার্বিস তথা পদস্থ কর্ম্মমণ্ডলী এদেশের ও বিলাতের সরকারকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একরূপ বুঝাইয়া থাকেন, কিন্তু বিবিধ বিষয়ে ভারতবাসীদের নিজস্ব মতামত ইঁহাদের দ্বারা জানা সম্ভব নয়। ইহা জানা যায়, ভারতবাসীদের একমাত্র মুখপাত্র 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' দ্বারা। এদিক হইতে কংগ্রেসের গুরুত্ব মানিয়া না লইলে শাসনে অনাচার ও ব্যাভিচার রোধ করার উপায়ান্তর নাই। রমেশচন্দ্র কংগ্রেসের অধিবেশন-শেষে জন্মভূমি বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন বাঙ্গালীরা তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। এই উদ্দেশ্যে একটি সভার অনুষ্ঠান হয় শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে ৬ই জানুয়ারী ১৯০০ সনে। দ্বিতীয় সভা বিরাটাকারে হয় টাউনহলে পরবর্ত্তী ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। এখানে পৌরোহিত্য করেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার পর রমেশচন্দ্র বিলাতে চলিয়া যান।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা এখনও বলা হয় নাই। কর্ম্মব্যপদেশে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে দূরে বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গমন করিতে হইয়াছে। ১৮৯৪ সন নাগাদ তিনি কলিকাতার সন্নিকটে স্থিত হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি রমেশচন্দ্র ১৮৯৪—৯৫ সনে বর্দ্ধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনর এবং হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনের বিষয় সকলেরই জানা। স্বদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ ইতিমধ্যেই নানাভাবে

প্রকটিত হইতেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পূর্ব্ব রূপ ত্যাগ করিয়া যখন নূতনভাবে গঠিত হয় তখন রমেশচন্দ্র ইহার সভাপতি-পদ গ্রহণ করেন ১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে। তিনি দেড় বৎসরকাল পরিষদের সভাপতি থাকিয়া ইহার আদর্শ এবং কর্ম্মপদ্ধতি নির্ণয়ে সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইহার পর কর্ম্মোপলক্ষে অন্যত্র যাইতে হওয়ায় রমেশচন্দ্র সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরিষদ তাঁহাকে ১৩০৫ বঙ্গাব্দে বিশিষ্ট সদস্য করিয়া লন। ১৩০৯ সালে (১৯০২-০৩) রমেশচন্দ্র এক বৎসরকাল স্বদেশে অবস্থান করেন। পরিষদ সেই সময়ে একবৎসরের জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয়বার সভাপতির পদে বৃত করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র বিস্তর পরিশ্রমে ও বহুল অর্থব্যয়ে সঞ্চিত সংস্কৃত গ্রন্থরাজি পরিষদকে দান করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রমেশচন্দ্রের আন্তরিক সহযোগিতার কথা কখনও ভুলেন নাই। কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডস্থিত নবনির্ম্মিত ভবনে পরিষদ চলিয়া আসিলে রমেশচন্দ্রকে ১৯০৯ সনের ১৫ই এপ্রিল বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। তবে ইহা খানিকটা পরবর্ত্তী কালের কথা।

পুলিশ কমিশন : ভারতবর্ষে অবস্থিতির সুযোগ লইয়া সরকার রমেশচন্দ্রকে পুলিশ কমিশনে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করেন। তিনি ইহাতে যে লিখিত সাক্ষ্য পেশ করেন তাহা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এই সাক্ষ্যে পুলিশ বিভাগের যে দোষত্রুটি সংশোধনের নির্দ্দেশ দেন তাহা ভবিষ্যৎ শাসনের দিগ্‌দর্শন হইয়া আছে। রমেশচন্দ্র সাক্ষ্যে বলেন:

"I have seen it stated that the police in India are of the people, and that the police is dishonest because the people are so. Those who make such sweeping charges do not know, or do not consider, that by the inadequate scale of pay we have fixed for the police service, we draw to that service, by a natural selection, a class of men not fit for their high responsibilities, and that we train them in dishonesty by giving them ample powers, and an undue degree of protection when they are detected in wrong doing." *(The Bengalee, 25 Dec, 1902)*

দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমা : রমেশচন্দ্র ভারতবর্ষের ভিক্টোরিয়া যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সনের প্রথমে তিনি দক্ষিণ-ভারতের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণকল্পে সেখানে কয়েক মাস ধরিয়া পরিভ্রমণ করেন। ইহার পর এই বৎসরের এপ্রিল মাসে তিনি পুনরায় বিলাত যান।

বরোদায় : দীর্ঘ-প্রবাস জীবনের পর রমেশচন্দ্র বরোদা গাইকোয়াড়ের আহ্বানে তাঁহার রাজস্ব সচিবের পদ গ্রহণ করিয়া ১৯০৪ সনের মাঝামাঝি ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। এই বৎসরের আগষ্ট মাস হইতে ১৯০৭ সনের জুলাই পর্য্যন্ত একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিয়া তিনি বরোদার সামগ্রিক, এবং বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার পরিকল্পিত এবং কতকাংশে আরব্ধ কর্ম্মপদ্ধতির একটি সুস্পষ্ট আভাস পাই সিস্টার নিবেদিতাকে লিখিত একখানি পত্র হইতে। রমেশচন্দ্রকে নিবেদিতা "God-father" এবং রমেশচন্দ্র নিবেদিতাকে "God-daughter" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। উভয়ের গুণপনায় উভয়ই সবিশেষ মুগ্ধ ছিলেন। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর নিবেদিতা তাঁহার সম্বন্ধে যে নিবন্ধ লেখেন তাহাতে তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-প্রীতিই সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এবিষয়ে একটু পরে জানা যাইবে। নিবেদিতাকে লিখিত রমেশচন্দ্রের পত্রখানি এই :

MY DEAR NIVEDITA,

I am trying to strike out new lines of progress, to develop new policies and reforms, and am determined to move forward and to carry the State forward. I am trying to gather the scattered forces which were present here, to encourage enterprise and talent in younger men, to welcome new ideas and new schemes, to initiate progress in all lines, and to make Baroda a richer and a happier State. I go among the people, print and publish my schemes, face the Maharaja with my proposals, and manage to have my way in a manner which old officers of this State pronounce quite "unconventional"! I am trying to relieve the agriculturists of excessive taxation on their land, I am endeavouring to get together capitalists to start new mills and industries, and if I can build up the Legislative Council I will make the work of the State proceed in the interest of the people, and in touch with the people. Everything shall be open and above-board,—nothing done in dark tortuous, secret, autocratic ways. Dreams! Dreams! some will exclaim. Well, let them be so,—it is better to dream of work and progress than to wake to inaction and stagnation. This last shall never be my vocation, it is not in my nature.

Pardon all this declamation; the fact is that my pen sometimes runs away with me, and I think so much of reforms by night and day, that sometimes these ideas will come out in spite of myself. Don't show this foolish letter to any one, or show it only to such as will be charitable enough to appreciate even my boyish enthusiasm.—Ever your loving god father,

ROMESH CH. DUTT.*

বরোদার জনসাধারণের উন্নতিসাধনই ছিল রমেশচন্দ্রের আন্তরিক লক্ষ্য। আর এই উদ্দেশ্যে তিনি নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণে গাইকোয়াড়কে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বরোদার ভাবী উন্নতির সূচনা হয় এ সময় হইতে। গাইকোয়াড় শয়াজী রাও সর্ব্ববিষয়েই রমেশচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁহার অকুণ্ঠ সমর্থনে রমেশচন্দ্রের পরিকল্পনাগুলি যে সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছিল একথাও আমাদের স্বীকার করিতে হয়। বরোদার প্রশাসনিক বাৎসরিক বিবরণগুলি লেখার ভার পড়ে রমেশচন্দ্রের উপর। ১৯০২-৩ হইতে ১৯০৫-৬ সন পর্য্যন্ত প্রশাসনিক রিপোর্টগুলিতে এই সময়ে অনুসৃত উন্নতিমূলক কর্ম্মপদ্ধতির বিশদ পরিচয় মিলিবে।

ভারতীয় শিল্প-সম্মেলন : ১৯০৬ সনে বিলাত-গমন : রমেশচন্দ্র ১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কাশীতে অনুষ্ঠিত Indian Industrial Conference বা ভারতীয় শিল্প-সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সময় জাতীয় কংগ্রেসেরও অধিবেশন হয় কাশীধামে গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের পৌরোহিত্যে। শিল্প-সম্মেলন সম্বন্ধে বলিতে গেলে ইহার পূর্ব্ব ইতিহাসও আমাদের কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। রমেশচন্দ্রের জামাতা প্রসিদ্ধ ভূ-তত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি মানসে ১৮৯১ সনে কলিকাতায় একটি শিল্প-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। তদবধি শিল্প-প্রদর্শনী এবং শিল্প-সভা, ভারতীয় শিল্প-সম্পদ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি মাঝে মাঝে হইতে থাকে। কংগ্রেসও বাৎসরিক অধিবেশনের সঙ্গে ক্রমে একটি করিয়া শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গ-ভঙ্গ-হেতু যে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইল তাহার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, উন্নতি-সাধন এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের বহুল ব্যবহার-বিষয়ে উদ্যোগ। ১৯০৫ সনের কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে যে শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইল, তাহাকে একটি বাস্তব প্রাণবন্ত রূপ দিবার জন্যই এই ভারতীয় শিল্প-সম্মেলনের অনুষ্ঠান। রমেশচন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। বরোদায় রাজস্ব সচিব-পদে নিযুক্ত হইয়া ইহাকে একটি সুষ্ঠু রূপ দিতেও ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কাজেই নব-অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকেই সভাপতি-পদের যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! ১৯০৫, ৩১শে ডিসেম্বর সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সভাপতির সারগর্ভ অভিভাষণে রমেশচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনকে অভিনন্দন জানাইয়া যে সকল কথা বলেন, তাহার কিয়দংশ মাত্র এখানে দেওয়া হইল :

"...the Swadeshi Movement is one which all nations on earth are seeking to adopt in the present day....It will certainly foster and encourage our industries in which the Indian Government has always professed the greatest interest. It will relieve millions of weavers and other artisans from a state of semi-starvation in which they have lived, will bring them back to their hand-loom and other industries, and will minimise the terrible effects of famines...It will give a new impetus to our manufactures which need such impetus; and it will see us, in the near future, largely dependent on articles of daily use prepared at home, rather than on articles imported from abroad."

---

* *Life and work of Romesh Chunder Dutt, C.I.E*—J. N. Gupta., 1911. pp. 402-3.

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হইবে সে সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা ছিল। এই উন্নতির দরুণ শুধু তন্তুবায় এবং বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত অন্যান্য কারিগর শ্রেণীরই আর্থিক সচ্ছলতা হইবে না, সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যও ফিরিয়া আসিবে এবং ইহার ফলে দুর্ভিক্ষের তীব্রতাও বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে। ১৯০৭ সনে সুরাটে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প-সম্মেলনেও রমেশচন্দ্র সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

ক্রমাগত তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রমান্তে বিশ্রাম লাভের আশায় বরোদার কার্য্য হইতে ছুটি লইয়া ১৯০৬, ৯ই জুন রমেশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। প্রায় সাত মাস পরে ঐ সনের ১৭ই নবেম্বর তিনি ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়ে বাংলাদেশে তুমুল স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। স্বদেশগত-প্রাণ রমেশচন্দ্র বিশ্রামলাভের আশায় বিলাত গেলেও স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সাধারণভাবে ভারতবর্ষের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ লইয়া নানারূপ আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতাদি করিতে থাকেন। এই সময়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গোখ্‌লে বিলাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে একযোগে স্বদেশের কার্য্যে ব্রতী হন।

রয়্যাল (ডি-সেণ্ট্রালাইজেশন) কমিশন : রাষ্ট্রীয় চিন্তা : রমেশচন্দ্র ১৯০৭ সনের জুলাই মাসে পুনরায় ছুটি গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে তাঁহাকে সেপ্টেম্বর মাস হইতে রয়্যাল (ডি-সেণ্ট্রালাইজেশন) কমিশনের অন্যতম সদস্য-পদে নিয়োগ করিলেন। বরোদার রাজস্ব সচিবের বেতন বাবদ রমেশচন্দ্র প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করিয়া পাইতেন। সরকার তাঁহাকে মাসিক দক্ষিণা এই হারেই দিতে লাগিলেন। ১৯০৯, ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত তিনি এই পদে লিপ্ত রহিলেন। ভারতবর্ষের কার্য্য সমাপনান্তর কমিশনের সঙ্গে তাঁহাকেও বিলাতে কিছুকালের জন্য অবস্থান করিতে হয়। সরকারী শাসন-কাঠামোর সংস্কার ও উন্নতি-সাধনে পরামর্শ দানই মাত্র ছিল কমিশনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার ইহার উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য করা হয় নাই। কিন্তু রমেশচন্দ্র স্বদেশের উন্নতির সম্ভাবনা যেখানেই যতটুকু দেখিতেন তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাই তিনি ভারত-সচিব মর্লেকে কমিশনের সদস্য নিয়োগের সংবাদ পাইয়া লিখিয়াছিলেন:

"But I am one of those who think half a loaf is better than no bread, and I am grateful for the inquiry which has been permitted."

শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার কিরূপে হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের মতামত আমরা জানিতে পারি ভারত-সচিব মর্লেকে লিখিত এ সময়কার কয়েকখানি পত্র হইতে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের মরশুম। বঙ্গদেশে তখন এমন একদল প্রগতিশীল রাজনৈতিকের উদ্ভব হইয়াছে যাহারা শাসন-ব্যবস্থায় মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সাতিশয় উন্মুখ। এই নূতন ভাবনাকে ঐ সময়েই "New spirit" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয় এবং যাহারা এই ভাবনার ধারক তাহাদিগকে বলা হয় "Extremist বা উগ্রপন্থী"। রমেশচন্দ্র মর্লেকে লিখিত পত্রে এই নূতন দল ও নবভাবনার দিকে তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলেন, এবং তাঁহাদের দাবী যে মোটেই অযৌক্তিক বা ভিত্তিহীন নয় তাহাও তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ধীরপন্থী বা Moderate Party দেশ-শাসনে যতটুকু অধিকার চাহিয়াছেন তাহা তখনই পূরণ না করিলে অনতিবিলম্বে ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি একখানি পত্রে সরকার কর্ত্তৃক হিন্দু-মুসলমানে ভেদ-বৈষম্যের আস্কারা দেওয়াকে স্বদেশের উন্নতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। মুসলমানদের হিন্দু হইতে আলাদা হইয়া পৃথক নির্ব্বাচনের সুযোগ দিলে জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। যে ঐক্য-বুদ্ধি উভয়ের ভিতরে

শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জাগ্রত করা হইয়াছে তাহার মূলে আঘাত হানা কোন সুস্থ ব্যক্তিরই কাম্য হইতে পারে না।

কমিশনের উদ্দেশ্য সংকীর্ণ হইলেও রমেশচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে শাসন-সংস্কারের কতকগুলি মৌলিক নীতির উপরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্ত্তী মর্লে-মিণ্টো সংস্কার-আইন রচনাকালে ইহা খুবই কাজে লাগিয়াছিল।

বরোদার দেওয়ান : মৃত্যু : রমেশচন্দ্র ১৯০৯ সনের জুন মাস হইতে বরোদার অমাত্য-পদে চারি হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই পদে তিনি বেশী দিন কার্য্য করিতে পারেন নাই। ১৯০৯, ৩০শে নবেম্বর তিনি বরোদায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশবাসী একজন অকৃত্রিম বান্ধব হারাইলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার কৃতিত্ব ও গুণপনার কথা কতই না আলোচিত হইল।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন : "তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্য্যে, কি দেশহিতে, সর্ব্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছেন—বস্তুতঃ ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি—এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল—তাঁহার কর্ম্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদাপ্রসন্ন অরুগ্ন নির্ম্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।"*

সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে রমেশচন্দ্রের পিতা-পুত্রীর সুনিবিড় সম্পর্কের কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা খানিকটা অবগত হইয়াছি। নিবেদিতা অতি নিকট হইতে রমেশচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতিমূলক কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মধ্যে ভারত-আত্মার পরিচয় প্রদানের আন্তরিক প্রয়াসও তিনি সবিশেষ লক্ষ্য করেন। ভারতগতপ্রাণা নিবেদিতার নিকট তাঁহার মৃত্যু একটি গভীর আঘাতস্বরূপ হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। নিবেদিতা সুবিখ্যাত 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় (জানুয়ারী, ১৯১০) একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'N' স্বাক্ষরে রমেশচন্দ্রের জীবনতন্ত্র বা জীবনাদর্শের বহুমুখীন অভিব্যক্তির কথা প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। অনন্যতুল্যা, প্রতিভাধারিণী বিদুষী নিবেদিতা রমেশচন্দ্রের জীবন ও কর্ম্ম, সাহিত্য-সাধনা, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার দরদ, ইহার আন্তরিক অনুভূতি ও সশ্রদ্ধ প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অধিকারিণী। রমেশচন্দ্রের জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধে যে কোন আলোচনায় নিবেদিতার এই প্রবন্ধটির প্রয়োজনীয়তা তাই অত্যধিক: ইহা সম্পূর্ণ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"It is an old and seemly rule that says *of the dead, nothing but good!* And there is, to our own mind. something a trifle ungracious and indecorous, however intellectually brilliant it may sound, in the criticism that would weigh and measure too closely its praise of one, himself so generous as Romesh Chunder Dutt. Young Inida cannot rear the temple of the future on sounder foundations than those of reverence and gratitude, and it would be nobler to err on the side of warmth, than to prove oneself on a thought too cold, in adjudging the merits of the great soul that has just passed.

In all that is said of Romesh Chunder Dutt, the one thing that seems to be left out of view is the age in which he rose. Time after time he has told me, with mingled shame and amusement, of the mental atmosphere in which his childhood passed. It was a world in which a poet thought it proper to write in French and English. It was a world so saturated with certain conceptions, that the future civilian and his brothers and sisters showed their

---

* চৈতন্য লাইব্রেরী সম্পাদককে লিখিত পত্র (১৬ই পৌষ, ১৩১৬) হইতে।

public spirit by standing at the window on *Bijaya* day, to count the images going to the Ganges, and mourning and lamenting if these were more, or rejoicing if they were fewer, than at the same time the year before! If we are all aware, today, of further elements in the Procession of the Images, than those of mere religious forms, if we understand something of the civic life that goes with it, and the proud history of Pataliputra and of Gour that speaks through it, let us not forget how high amongst the forces that have brought this home to us, stands Romesh Dutt himself.

He had none to lead him in the path of nationality. Gradually, he said, as he worked on from point to point, he began to see the greatness of his own country and his own people, and the solidarity and distinctness of their cause. Gradually, he understood the immensity of the Indian world and atmosphere, and by no violent cataclysm of the spirit, but little by little, following the thread of truth, he found himself at last in the opposite camp to that of his early preconceptions. But the determining factor in this process, as anyone but himself could see, was the strong true *heart,* that had always stood shoulder to shoulder with his own; the heart of a free man, who followed that which he saw to be good, and aped no foreign ways, as such; the heart of one who was too proud to be courtier or sycophant, and who knew not how to be petty or ashamed. Romesh Chunder Dutt, notwithstanding the towering success of his life, kept to the end, the simplicity of true greatness.

The splendid pluck that carried him and his two friends off to England, in their boyhood, as runaways, turned into the ringing cheer of his presence, in mature age. But his generosity was always the same. He never forgot to tell either that he owed the idea of the adventure,—like many other ideas that had contributed to his success—to his friend B. L. Gupta; or that the money that took him was a sister's dower. And the same quality of cheeriness and brightness had yet another and most pathetic development, when I met him for the last time in England more than a year ago, and heard him say, with beaming smiles of self-gratulation, 'A new world has risen, in India, and my day is done! The boys listen to me with politeness, of course for the sake of the past! But a new day has dawned in India and mine is past' 'My day is past!' If one had only known that one would never hear that voice again! But no! life would be intolerable, if every moment carried full knowledge of its content of pathos and farewell. And in truth, the day of souls like his is never ended. Woe be to that land and that people where they shall cease to be born!

The writing of 'Civilisation in Ancient India' was one of the turning-points in his career. To have begun such a task at all, shows the marvellous energy and courage that was never contented to give a day's labour for a day's bread, but must for ever be doing more than the bond laid down. And having begun, he found himself being re-created by his own work. The task of writing was a task of self-education. It was the inception of the second great intellectual influence of his life. All his great influences were literary. The first had lain in English literature, when he and his two comrades, Surendranath Banerjee and B. L. Gupta, would sit up in their London lodgings, reading Shelly aloud till three in the morning, in sheer delight; or when he, recovering from an illness, read Gibbon for the first time, and in the cosmic mind of England's greatest historian found his own *guru.* And the second was his discovery of the *Indian mind,* as revealed in ancient history and literature. It is a platitude to say of a book like this that it is being out-dated. It was never a work of original scholarship. It never professed or attempted to be anything of the kind. Even if it had been, it would still have been out-dated some day. A subject that is itself growing, cannot, till a certain stage is reached in the accumulation of data, produce immortal literature. This book was intended as an exposition to India and to the world, of the national glory. It was never meant to be more than a popular *resume*. It is high praise to be able to say of it that it has been so carefully put together, with such fulness and precision of detail, that as a book of reference, and as a memorial of the view-points reached from time to time, it is difficult to imagine its ever passing completely out of use.

Having discovered the Indian mind, Mr. Dutt, in his daily work, began to explore it. It gradually dawned on him that the simple unlettered Indian brain was far broader and more catholic in its ideals and outlook than the European. 'I have really come to think,' he said to some of us, one day, in a slow puzzled way, 'that our people are *more* universal in their ideas than the English! I almost think, if they had a chance, that they would *better* justify education!' In other words, he had discovered that the ancient civilisation and literature had been merely a product of the same energy that still lives, and still creates, in its ancient home!

His voluminous publications had lifted him to a position of great distinction amongst his fellow-civilians. But the simple sincerity and straightforwardness of the man is seen in the fact that he wrote no more for an English world. He now began to feed the Indian mind with that food that he saw it needed, the Rig-Veda in the vernacular, and Indian history and social problems in the form of Bengali novels. When next he wrote in English, it was by way of expostulation, or for the whole of India. His was no itching desire for the admiration of the foreigner.

As an administrator, it is difficult to understand in what sense he was second-rate. At the age of 28, he re-organised Barisal, after the Dakkhin Shahbazpur tidal wave of 1876. When he was magistrate of Maimensingh, crime fell, there, two-thirds of what it has been before and since. And for what more he was, as an administrator, let Baroda answer, or let the families whom he has relieved in famine, answer! One had only to stand in the presence of Romesh Dutt to know what a just and merciful judge, what a wise ruler and father, he would be. To the honour of the Bengali race, be it said, that in this, he was thoroughly representative of his countrymen, not even head and shoulders, perhaps, above many in capacity. It can only be said, that he had the opportunity of which many are worthy. But he did nothing to lessen that opportunity for others. 'You're a very fine fellow, Dutt! But you're not a bit finer than tens of thousands of Bengalis!' I heard A. O. Hume say to him once, and no one could have assented to the second part of the statement, so warmly as he to whom it was addressed. Before we begin to classify administrators let us remember that this is one of the chief tasks in which brilliance is not nearly so distinguished as *quietness*. Romesh Chunder Dutt had the qualities of a most distinguished, because an absolutely quiet ruler. He inspired all who approached him with the conviction of his benevolence, and filled them with confidence in his wisdom and gentleness.

As an economician, he was probably more up-to-date than his own countrymen are quite prepared to understand. His economics were not gathered, to any great extent, from foreign books. And thereby they avoided many errors! He knew well enough that rice is better than money, that a high price for grain means poverty for the farmer, and many another fundamental fact that would completely change our economics if duly assimilated. His were the economics of facts, the economics of the peasant-statesman, the wisdom of the king of an agrarian and socialistic people. In Indian economics, his name will be remembered, when others are long forgotten.

In work, his industry was appalling. As his fellow-guest, on one of the Norwegian fiords, when he was writing the 'Economic History,' I can remember how his only recreation consisted of the long evenings spent in boating or in music, and the hour after the forenoon sea-bathing, when he would come to the verandah, to eat a little fruit, while one of us would read to the others, the last instalment of his work. I have even wakened at night, sometimes, to see the candle-light streaming through the half-open door, and catch a glimpse of the head bowed over its manuscript, at the other end of the great music-room, when he had lain sleepless for hours, and risen to work!

It was to do the work that he thought he could do for his country by writing books, that he renounced his appointment, with its large salary, at the earliest possible moment, and retired to spend even his pension, in the further philanthropy of publishing his works!

In London, late in 1900, and throughout, 1901, it was the pleasure and privilege of my friends and myself, to see much of Mr. Dutt, in many ways; and one felt more and more, in his calm disinterestedness, in his loneliness, and in his concentration, that as his forefathers had gone to the forest to live the life of the *banaprastha,* for the development of the self, so here was one, leading the same life, in the forest of bricks and mortar, for the development of his people. 'You ask if I will go with you to so-and-so,' he wrote to me once, of a journey that I knew to be very disagreeable, 'only to speak for ten minutes of India? But I would go into a tiger's cage for that!' Unassuming, simple, generous to a fault, the expression might be modern, but the greatness within was the ancient greatness. Romesh Chunder Dutt was a man of his own people. The object of all he ever did was not his own fame, but the uplifting of India. That gained, what matters it to him, the illustrious dead, whether a book or two more or less, live or die? But it matters to his countrymen, matters to all eternity, that they should not fail in his meed of reverent salutation, that the voice of criticism should be hushed, and cleverness stand silent, while they carry to the funeral-fire, one who stands amongst the fathers of the future, one who dreamt high dreams and worked at great things untiringly, yet left behind him, before his country's altar, no offering so noble, no proof of her greatness so incontrovertible, as that one thing of which he never thought at all, his own character and his own love!"

মৃত্যুর পরে : রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেশ-বিদেশের গুণিজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিভিন্নভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। স্বদেশের যে সব প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাঁহারাও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা আমরা অবগত হইয়াছি। পরিষদ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যথোচিত আয়োজন করিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সাহিত্য-পরিষদ সংলগ্ন একটি স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন চলে। কয়েক বৎসর অবিরাম চেষ্টার ফলে ১৩৩১ বঙ্গাব্দে "রমেশ ভবন" নামে একটি স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হয়। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে ইহার দ্বিতল নির্ম্মিত হয়। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া স্বদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান রূপে পরিণত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত ঃ সাহিত্য-সাধনা

রমেশচন্দ্রের আয়ুষ্কাল উনষাট বৎসর। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের দিকে দিকে উন্নতির সূচনা দেখা দিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশ এই উন্নতিকে অব্যাহত শুধু নয়, ইহাকে ত্বরান্বিত করিতেও তৎপর হয়। বঙ্গসাহিত্যের দ্রুত উন্নতি এই তৎপরতারই একটি প্রকৃষ্ট পরিচয়। সে যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় যাঁহারা তৎপর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বস্তুতঃ ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশিষ্ট মনীষীদের রচনায় বাঙ্গালার গদ্য সাহিত্য অত দ্রুত একটি সুষ্ঠুরূপ লইতে পারিয়াছিল। রমেশচন্দ্র আকৈশোর ইংরেজী সাহিত্যই বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছিলেন। এই অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফলস্বরূপ প্রথমে তিনি ইংরেজী কবিতা ও প্রবন্ধাদি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনেও অবহিত হইলেন। ইহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য যে কত সমৃদ্ধ হইয়াছে এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না।

সাহিত্য সাধনার ক্রমিক ধারার বিষয় রমেশচন্দ্র নিজেই "*Wednesday Review*" (আগষ্ট ২৩, ১৯০৫) পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কৈশোরে ও যৌবনে ইংরেজী সাহিত্যের যে বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন এই রচনাটি হইতে তাহা আমাদের বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। ইংরেজী সাহিত্য তথা কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং কিয়দংশে দর্শন তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। উপন্যাস, বিশেষতঃ স্যার ওয়ালটার স্কটের ওয়েভারলি নভেলস্ তাঁহার খুবই প্রিয় ছিল। অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি স্কটের আন্তরিক প্রীতি রমেশচন্দ্রের মধ্যেও অনুক্রামিত হইতে থাকে। রমেশচন্দ্র একস্থলে বলিয়াছেন, ইতিহাস-প্রীতি তাঁহাকে স্কটের উপন্যাস পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে কি স্কটের উপন্যাসই তাঁহার হৃদয়ে ইতিহাস-প্রীতির উদ্রেক করিয়াছে তিনি বলিতে অক্ষম, অর্থাৎ উভয়ই যে উভয়ের পরিপূরক হইয়াছিল, তাঁহার উক্তির ব্যঞ্জনা এইরূপ বুঝা যাইতেছে! রমেশচন্দ্র ফরাসী ভাষাও ভাল জানিতেন, জার্ম্মান ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পড়িয়াও রস গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহার সাহিত্য সাধনায় এই সকল ভাষাও বিশেষ রসদ জোগাইয়াছিল। রমেশচন্দ্র এই নিবন্ধেই একস্থলে বলিয়াছেন :

"Our Education is incomplete unless we learn the great modern languages—English, French and German."

অর্থাৎ ইংরেজী, ফরাসী এবং জার্ম্মান ভাষা না শিখিলে আমাদের শিক্ষা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অর্দ্ধশতাব্দী পরেও তাঁহার এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

রমেশচন্দ্র কৈশোরেই সংস্কৃত অধ্যয়নে রত হইয়াছিলেন। সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। সিবিল সার্বিস পরীক্ষার প্রস্তুতি কালে তিনি বিলাতে বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর গোল্ডস্টুকারের নিকটে সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। উক্ত পরীক্ষায় তাঁহার যথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারের মূলে ছিল তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যে অত্যধিক ব্যুৎপত্তি। রমেশচন্দ্র সুনিপুণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের কথা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এই রচনাটিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মজীবনের শেষার্দ্ধে তিনি ঋগ্‌বেদ এবং সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ ও আলোচনায় যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার মূলেও দেখি তাঁহার স্বাভাবিক সংস্কৃত-প্রীতি।

রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন তাঁহার কৈশোরে বাঙ্গালা সাহিত্য অনুন্নত অবস্থায় ছিল, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী স্পর্শে ইহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে এবং অতিদ্রুত একটি সহজ রূপ পরিগ্রহ করে। রমেশচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসেও একথা পরিষ্কারভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদের মধ্যে মুকুন্দরামকেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করেন। কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস এবং ভারতচন্দ্রকেও তিনি যথাযোগ্য স্থান দিয়াছেন।

ইংরেজী সাহিত্য চর্চ্চা : রমেশচন্দ্রের সাহিত্য সাধনাকে আমরা প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করিতে পারি—ইংরেজী ও বাঙ্গালা। বলা বাহুল্য তাঁহার অধিকাংশ রচনাই ইংরেজীতে

লিখিত। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অনুশীলনে আকৈশোর অবহিত হইয়াছিলেন। রামবাগান দত্ত পরিবারের অন্যান্য কৃতী সন্তানদের মত তিনিও ইংরেজীতে রচনা সুরু করিয়া দেন। তিনি ইউরোপ হইতে ইংরেজীতে যেসব পত্র লেখেন তাহারই সারাংশ লইয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম ইংরেজী পুস্তক *Three Years in Europe* প্রকাশিত হয়। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া তৎকালীন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "মুখার্জি'স্ ম্যাগাজিন" এবং রেভাঃ লালবিহারী দে সম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগাজিনে" ইংরেজী কবিতা ও প্রবন্ধাদি 'ARCYDE' ছদ্মনামে লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথম দিককার কোন কোন ইংরেজী পুস্তকও লেখকের এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলনে রত থাকিয়াও রমেশচন্দ্র কিরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় অনুপ্রাণিত হন তাহার কথা একটু পরে বলিতেছি। প্রথমে তাঁহার ইংরেজী পুস্তকগুলির নাম কালানুক্রমিক উল্লেখ করিব। পাঠ্যপুস্তকগুলি ইহা হইতে বাদ দেওয়া গেল। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে রমেশচন্দ্রের একখানি সুলিখিত ইংরেজী ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক ছিল; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরও একখানি ছিল। পুস্তক দুইখানি কৈশোরে দেখিয়াছি। এখন তো পাঠ্যপুস্তকের ছড়াছড়ি। এই পুস্তক দুইখানির কি মনোজ্ঞ ভাষা, কি পরিপাটি বিষয় সন্নিবেশ—এমনটি তো এখন আর চোখে পড়ে না। এখানে আর একটি বিষয় আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত। রমেশচন্দ্র ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদির মূলভাগের অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া ভারতবর্ষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা জগদ্বাসীকে জানাইতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আধুনিক ভারতের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক জীবনের চড়াই-উৎরাইয়ের কথা ইংরেজীতে বিবৃত করিয়া তিনি স্বদেশবাসীর অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজী পুস্তকাবলী :

1. Three Years in Europe: Cal. 1872.
   ইউরোপ হইতে লিখিত পত্রগুলির সারাংশ। ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।
2. The Peasantry of Bengal: Cal. 1874.
   হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ আমলে বঙ্গদেশের প্রজাকুলের অবস্থার বর্ণনা সহ তাহাদের ভাবী উন্নতির নির্দ্দেশ এই পুস্তকখানিতে দেওয়া হইয়াছে।
3. The Literature of Bengal: *By* ArCyDae. Cal. 1877.
   প্রাচীন কাল হইতে রমেশচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। বিশিষ্ট লেখকদের রচনার নিদর্শন সম্বলিত এই পুস্তকখানির সচিত্র পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ গ্রন্থকারের নামেই ১৮৯৫ সনে বাহির হয়।
4. A History of Civilisation in Ancient India: Vols. 1—3. Cal. 1889-90.
   সংস্কৃত সাহিত্যের উপরে ভিত্তি করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা এই পুস্তকখানিতে বিবৃত হইয়াছে।
5. Lays of Ancient India: London 1894.
   সংস্কৃত কবিতার ইংরেজী ছন্দে অনুবাদ।
6. Rambles in India during twentyfour years, 1871 to 1895. With maps and illust.: Cal. 1895.
7. Reminiscences of a Workman's Life (Poems) "For private circulation only."—Cal. 1896.
8. England and India—a record of progress during a hundred years 1785—1885: London 1897.
9. Maha-Bharata :—London 1899.
   ম্যাক্সমূলারের ভূমিকা সম্বলিত মহাভারতের সারাংশ ইংরেজী কবিতায় অনূদিত।
10. Ramayana :—London 1900.
    ইংরেজী কবিতায় রামায়ণ মহাকাব্যের সারাংশ।

11. Open Letters to Lord Curzon on Famines and Land Assessments in India :—London 1900.
12. The Lake of Palms :—London 1902.
    রমেশচন্দ্র প্রণীত 'সংসার'এর তৎকৃত ইংরেজী সার-সংকলন।
13. The Economic History of India (1757—1837):—London 1902.
14. Speeches and papers on Indian Questions :
    1897—1900—Cal. 1902.
    1901—1902—Cal. 1902.
15. India in the Victorian age—an Economic Hist. of the People (1837—1900) :—London 1904.
16. Baroda Administration Report :
    1902-03 and 1903-04 : 1905.
    1904-05 : 1906.
    1905-06 :—1907.
17. Indian Poetry Selections rendered into Eng. Verse :
    —London 1905.
18. The Slave Girl of Agra :—London 1909.
    রমেশচন্দ্রের 'মাধবী কঙ্কণ'-এর তৎকৃত ইংরেজী সার সংকলন।

রমেশচন্দ্র স্বলিখিত ইংরেজী পুস্তকগুলির মধ্যে চারখানি সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি ১৯০৩ সনে বিলাত হইতে বন্ধুবর বিহারীলাল গুপ্ত এবং অগ্রজ যোগেশচন্দ্র দত্ত-কে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়াছে। পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত নামও ইহাতে আছে। বিহারীলালকে লিখিত পত্রখানি মাত্র এখানে দিলাম :

"MY DEAR BEHARI,

I have not yet seen any one in London, nor have I regularly commenced my work. But I hope to do so as soon as we are settled down in our new house. I am also going to lecture at university college from next week, if I can form a class. The great work before me is the second volume of my "Economic History"—the Victoria Age (1837—1900), and if I can finish that in the present year my life's literary work is done! I may write novels and political articles after that, but am not likely to engage in any great work again at this age! My, "Ancient India," and "Epics," and "Economic History" will remain the most important productions of my rather prolific pen during the maturest period of my life, between forty and sixty.—

Yours affectionately ever,
Romesh *

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন : রমেশচন্দ্র সিবিলিয়ান, ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন। কাজেই তিনি যে ইংরেজী সাহিত্যের চর্চ্চায় কালক্ষেপ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তথাপি তিনি কিরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলনে তৎপর হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহলী হওয়া স্বাভাবিক। রমেশচন্দ্র অন্ততঃ দুইস্থলে তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইবার মূল কারণ বিবৃত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের পরিচয় ঘটে কৈশোরে তাঁহার পিতৃদেবের জীবিতকালেই। বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" বাহির করিবার জন্য কলিকাতা ভবানীপুরে আগমন করিলে রমেশচন্দ্র পূর্ব্ব পরিচয় হেতু প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। তখন একদিন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুশীলনের জন্য যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই ভাষায় এখানে উদ্ধৃত করি। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন : "একদিন

---

* Life and work of Romesh Chunder Dutt C. I. E. J. N. Gupta. (1911) —pp 306-7.

বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লিখ না কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম—আমি যে বাঙ্গালা লিখা কিছুই জানি না! ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি! ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনা পদ্ধতি জানি না। গম্ভীরস্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন,—'রচনা পদ্ধতি আবার কি, তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে। এই মহৎ কথা আমার মনে বরাবর জাগরিত রহিল, তাহার তিন বৎসর পর আমার বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম উদ্যম 'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশ করিলাম।" (নব্যভারত, বৈশাখ ১৩০১)

রমেশচন্দ্র 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' নামক ইংরেজী গ্রন্থেও (পরিবর্ত্তিত সংস্করণ, ১৮৯৫, পৃঃ ২২৬) বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপদেশ এবং অনুপ্রাণনার কথাও এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :

"You will never live by your writings in English," said he on this or on another occasion, "look at others. Your uncles Govind Chandra and Sashi Chandra and Madhu Sudan Datta were the best educated men of the Hindu College in their day. Govind Chandra and Sashi Chandra's English poems will never live, Madhu Sudan's Bengali poetry will live as long as the Bengali language will live." These words created a deep impression in me, and two years after this conversation, my first Bengali work, *Banga Bijeta*, was out in 1874."

স্বরচিত কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের উচ্চ ধারণার কথা বন্ধুবর বিহারীলাল গুপ্তকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র হইতে আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালা রচনাই যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে এ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অগ্রজ যোগেশচন্দ্রকে লিখিত একখানি পত্রে (আগষ্ট ১৩, ১৮৭৭) ইহা জানা যায়। একথা স্থানান্তরে বলিতেছি।

পরবর্ত্তী জীবনে বিশেষ করিয়া স্বদেশ সেবার তাগিদে গবেষণা ও আলোচনা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করিতে বাধ্য হইলেও রমেশচন্দ্র মাতৃভাষার অনুশীলনে কখনও বিরত হন নাই। তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যানুশীলন আমরা প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। (১) উপন্যাস-সাহিত্য এবং (২) মনন-সাহিত্য। মনন সাহিত্য সম্বন্ধে আগে বলি।

মনন সাহিত্য : 'মনন সাহিত্য' কথাটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিতেছি। রমেশচন্দ্রের মনন সাহিত্য আবার দুইভাগে ভাগ করা যায় : (১) অনুবাদ ও (২) মৌলিক। তাঁহার *Three Years in Europe*-এর অনুবাদ অন্যকৃত। একারণ তাঁহার পুস্তকাবলীর তালিকায় ইহার স্থান দান সমুচিত নহে বলিয়াই মনে করি। রমেশচন্দ্রের *A History of Civilisation in Ancient India* গ্রন্থখানির বহুলাংশের বঙ্গানুবাদ ১২৯৭—১৩০০ বঙ্গাব্দের 'নব্যভারত' পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্রীনাথ দত্ত ইহার অনুবাদ করেন। রমেশচন্দ্র এই অনুবাদ দেখিয়া দিতেন এবং তাহারই নামে ইহা প্রকাশিত হইত।*

রমেশচন্দ্রের অনুবাদ পুস্তকগুলির মধ্যে **ঋগ্বেদ সংহিতা** প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের বঙ্গানুবাদ ইহাতে তিনি দিয়াছেন। পুস্তকখানির প্রকাশ কাল ১৮৮৫। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০২।

---

* অনুবাদের প্রথম কিস্তি প্রকাশকালে (নব্য ভারত ১২৯৭, পৌষ) সম্পাদক নিম্নরূপ মন্তব্য সংযোজিত করেনঃ—শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হিন্দু-আর্য্যদিগেব প্রাচীন ইতিহাস নামক ইংরাজি পুস্তক, বিলাত প্রত্যাগত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় অনুবাদ করিতেছেন এবং তাহা শ্রীযুক্ত দত্ত মহোদয় সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব লিখিতেছেন। এই দুই মহাত্মা নব্যভারতের জন্য যে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অতুলনীয়। বিধাতা ইঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুন। ন. স.।

ঋগ্বেদ সংহিতা-র—আখ্যাপত্র :

ঋগ্বেদ সংহিতা।|মূল সংস্কৃত হইতে|শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক|বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত|প্রথম. অষ্টক|কলিকাতা।|বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত|১৮৮৫।

উৎসর্গপত্র :

যাঁহাদিগের সরল সত্যপরায়ণ পবিত্রজীবনের স্মৃতিমাত্র|এ জগতে|আমার ধর্ম্মস্বরূপ হইয়াছে;| যাঁহাদিগের অসীম স্নেহ ও বাৎসল্যের চিন্তা|আমার শান্তিস্বরূপে হইয়াছে,|সেই স্বর্গারূঢ়া জননী থাকমণি ও স্বর্গীয় জনক ঈশানচন্দ্র দত্তের|পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।|কলিকাতা ২০ বিডন ষ্ট্রীট, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫|শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত|

ঋগ্বেদের অনুবাদ কালে রমেশচন্দ্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ, প্রেরণা ও সহায়তা পাইয়াছিলেন। একথা তিনি এই পুস্তকের ভূমিকায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন : 'ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। পরে আজি ছয় বৎসর হইল যখন রাজকীয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় কিছুদিন বাস করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন সর্ব্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতে যাইতাম এবং তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হইল। বলা বাহুল্য যে তাঁহার উদারতা, তাঁহার সহৃদয়তা, তাঁহার দেশহিতৈষিতা ও তাঁহার প্রকৃত হিন্দুযোগ্য সমদর্শিতা যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে লাগিলাম। তাঁহার সুন্দর গ্রন্থাগার তিনি আমাকে দেখাইলেন, তাঁহার সংস্কৃত পুঁথিগুলি বসিয়া বসিয়া ঘাঁটিতাম। অনেক বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিতাম। বাঙ্গালী মাত্র ঋগ্বেদের অনুবাদ পড়িবে, একথা শুনিয়া যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পয়সা আদায় করে, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ধর্ম্ম ব্যাপারিগণ ঋগ্বেদের অচিন্তিত অবমাননা ও সর্ব্বনাশ বলিয়া গলাবাজী করিতে লাগিল,—গলাবাজীতে পয়সা আসে। ধর্ম্মের দোকানদারগণ অনুবাদ ও অনুবাদককে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতে লাগিল,—গালি বর্ষণে পয়সা আসে। এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে যে কথাগুলি বলিলেন, "ভাই উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটী সম্পন্ন কর। যদি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদি আমি কোনরূপে পারি, তোমায় সাহায্য করিব।" পাঠকগণ প্রকৃত হিন্দুয়ানী ও হিন্দু ধর্ম্ম লইয়া ভণ্ডামির বিভিন্নতা দেখিতে পাইলেন? নিঃস্বার্থ দেশোপকার এবং দেশের নাম লইয়া পয়সা উপায়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন? সর্ব্বসাধারণকে প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রসিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার নাম লইয়া রোজগারের উপায় উদ্ভাবন করার মধ্যে কি বিভিন্নতা, অবগত হইলেন?" ('ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—নব্যভারত', ভাদ্র, ১২৯৮)।

পুস্তকখানির ভূমিকায় রমেশচন্দ্র আরও কয়েকজন প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তা ও উৎসাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আর একটি কারণে ভূমিকাটি খুবই মূল্যবান। রমেশচন্দ্রের পুস্তক প্রকাশকাল পর্য্যন্ত স্বদেশে বিদেশে মূলে ও অনুবাদে ঋগ্বেদ প্রকাশের যে আয়োজন চলিয়াছিল তাহার একটি আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ইহাতে তিনি দিয়াছেন। ইহা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ মাত্র এখানে দিলাম:

"অনেকদিন হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই গ্রন্থের একটি সুন্দর অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শেষ হইল না। পরে কয়েক বৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এই কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর বঙ্গ ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার আর কোনও চেষ্টা করা হয় নাই, শীঘ্র যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

"অথচ জগতের অন্যান্য সুসভ্য দেশে এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর ও অনুশীলন আছে। ইউরোপে রোসেন প্রথম বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনি ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় যত্ন ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে এই অনুবাদটি করিয়াছিলেন। তাহার পর ফরাসী পণ্ডিত লাংলোয়া সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদ সংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ কোন ভাষায় নাই। লাংলোয়াও সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুবাদটি তাঁহার নিজের কল্পনায় বিজড়িত, অতএব দূষিত। এদেশে প্রথমে ষ্টীভেনশান্

পরে রোয়ার মহোদয়গণ বেদের অতি অল্প অংশই ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার পর যখন আচার্য্য মক্ষমূলর মূল ঋগ্বেদ সংহিতা সায়নের টীকা সহিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন উইলসন মহোদয় তাহার একটি ইংরাজি অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। মক্ষমূলর পঞ্চবিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া (১৮৪৯ হইতে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে) সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা ও সায়নের টীকা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। জগতের মধ্যে ঐখানি ভিন্ন আর মুদ্রিত সটীক ঋগ্বেদ নাই। উইলসন সাহেব সায়নের টীকা অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিতেছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কাউয়েল সাহেব সেই কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। অনুবাদ অর্দ্ধেকের অধিক হইয়াছে, কিন্তু শেষ হয় নাই। বেনফে মহোদয় ঋগ্বেদের কতক অংশ জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং আচার্য্য মক্ষমূলর মরুদ্যান সম্বন্ধে মন্ত্রগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদ তিনি সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা অবলম্বনে করেন নাই। বোম্বাই নগরের বেদার্থযত্ন প্রণেতাগণ ঋগ্বেদের অনেকদূর ইংরাজিতে ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারাও সায়নাচার্য্যকে সকল স্থানে অবলম্বন করেন নাই। ইহা ভিন্ন ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই ঋগ্বেদ সম্বন্ধীয় অনেক আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। অদ্বিতীয় ফরাসী পণ্ডিত বর্ণীফ ঋগ্বেদ ও ইরাণীয় জেন্দ-অবস্থা তুলনা করিয়া যে সকল ঐতিহাসিক আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা জগদ্বিখ্যাত। মক্ষমূলর ও রোথ তাঁহার ছাত্র ছিলেন, এবং ইঁহারা উভয়ে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন।

কেবল কি আমরা এই আর্য্য জাতির আদিগ্রন্থ, এই হিন্দু ধর্ম্মের মূল গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণে অসমর্থ থাকিব? এটি আমাদের পৈতৃক ধন, কেবল কি আমরাই এই ধনের সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিব? ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ, জগতের আর্য্য জাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব্ব কাব্য রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব? এই অসহ্য চিন্তায় ব্যথিত হইয়া আমি এই গুরু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যদি তাহাতে ধৃষ্টতা হইয়া থাকে সহৃদয় পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।"

ঋগ্বেদ সংহিতা রচনার কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের সারাংশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে রমেশচন্দ্র অভিনিবিষ্ট হইলেন। ঋগ্বেদ অনুবাদ কালে তিনি যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে উপদেশ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থগুলির অনুবাদ প্রকাশে তিনি তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতেও বিশেষ প্রেরণা প্রাপ্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এ বিষয়ে তাঁহাকে যথোচিত সাহায্যদানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রেরই ভাষায়—"যে ক্ষণজন্মা লেখক ও উৎসাহী সুহৃদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া আমি হিন্দু শাস্ত্র সংকলন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, সেই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই মহাভারত অংশ সংকলন করিবেন মানস করিয়াছিলেন।" (হিন্দুশাস্ত্র, ৭ম ভাগ, 'মহাভারত'-এর ভূমিকা)। রমেশচন্দ্র এই অনুবাদ কার্য্যে স্বয়ং ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তৎকালীন সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণকেও ইহাতে ব্রতী করান। নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ এবং অনুবাদকের নাম সন তারিখসহ পাওয়া যাইবে:

হিন্দুশাস্ত্র, (১৮৯৩-৯৭)

প্রথম খণ্ড:—

১ম ভাগ—**বেদসংহিতা**—সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত
২য় ভাগ—**ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্**— ঐ
৩য় ভাগ—**শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র**— ঐ
৪র্থ ভাগ—**ধর্ম্মশাস্ত্র**—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
৫ম ভাগ—**ষড়দর্শন**—কালীবর বেদান্তবাগীশ

দ্বিতীয় খণ্ড:—

৬ষ্ঠ ভাগ—**রামায়ণ**—হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
৭ম ভাগ—**মহাভারত**—দামোদর বিদ্যানন্দ
৮ম ভাগ—**শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**—দামোদর বিদ্যানন্দ
৯ম ভাগ—**অষ্টাদশ পুরাণ**—আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী

রমেশচন্দ্রের মৌলিক প্রবন্ধগুলি মনন-সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালী তথা ভারতীয় জীবনের নানা দিক ও সমস্যা লইয়া এগুলির অধিকাংশ রচিত। বাঙ্গালা সাহিত্য, জীবন কথা, শিল্প, বাণিজ্য, ভূমিব্যবস্থা, রাজস্বনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি নানা বিষয়েই তিনি স্বীয় চিন্তা ও গবেষণার ফল নানা প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ যুগের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এগুলি প্রায় সবই আত্মগোপন করিয়া আছে। এই প্রবন্ধগুলি পাঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের বহু সমস্যার সঙ্গে আমরা পরিচিত হইতে পারি। রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারা ছিল রচনাত্মক বা গঠনমূলক। তিনি শুধু সমস্যার কথা পাড়িয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, সমাধানেরও যথাযোগ্য পথ নির্দ্দেশ করিতেন। এই প্রবন্ধগুলির বিষয় বিভাগ করিয়া পুস্তকাকারে গ্রথিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যই শুধু সমৃদ্ধ হইবে না, গত যুগের বাঙ্গালী জীবনের উপরও উহা যথেষ্ট আলোকপাত করিতে সমর্থ হইবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল সহ এই সকল মূল্যবান রচনার একটি তালিকা এখানে সংকলন করিয়া দিলাম। তবে এই তালিকা যে সম্পূর্ণ একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

নবজীবন:

শ্রাবণ, ১২৯২—ঋগ্বেদের দেবগণ—(প্রথম প্রস্তাব)—ঋগ্বেদ সংহিতা।
ভাদ্র, ১২৯২—ঋগ্বেদের দেবগণ—(দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আকাশ দেবগণ।
কার্ত্তিক, ১২৯২—ঋগ্বেদের দেবগণ—(তৃতীয় প্রস্তাব)—আলোক দেবগণ।
মাঘ, ১২৯২—ঋগ্বেদের দেবগণ—(তৃতীয় প্রস্তাব)—আলোক দেব (সমাপ্ত)।
ফাল্গুন, ১২৯২—ঋগ্বেদের দেবগণ—(চতুর্থ প্রস্তাব)—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ।
চৈত্র, ১২৯২—ঋগ্বেদের দেবগণ—(পঞ্চম প্রস্তাব)—সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ। ব্রহ্মণস্পতি, বিষ্ণু ও রুদ্র। বিশ্বকর্ম্মা ও প্রজাপতি।
বৈশাখ, ১২৯৩—ঋগ্বেদের দেবগণ—(৬ষ্ঠ প্রস্তাব)—আচার ব্যবহার ও সভ্যতা।

ভাদ্র, ১২৯৮—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
বৈশাখ, ১৩০১—বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভাণ্ডার :

ফাল্গুন, ১৩১২—বারাণসী শিল্প-সমিতি (সঞ্চয়ন)।

ভারতী:

বৈশাখ, ১৩০৭—দুদিনের স্বদেশ যাপন।
বৈশাখ, ১৩০৮—হিন্দু দর্শন।
জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮—হিন্দু দর্শন ও সাংখ্য দর্শন।
আষাঢ়, ১৩০৮—ভারতীয় দুর্ভিক্ষ।
শ্রাবণ, ১৩০৮—বৃটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি।
পৌষ, ১৩০৮—বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত—ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকাল।
ফাল্গুন, ১৩০৮—ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা।
বৈশাখ, ১৩০৯—ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল।

ভারতী ও বালক:

পৌষ, ১২৯৯—কবি কালিদাস।

মুকুল:

আষাঢ়, ১৩০২—অমৃতসর।

সাধনা:

মাঘ, ১২৯৯—কবি ভবভূতি।
চৈত্র, ১২৯৯—উন্নতির যুগ।

সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা:

শ্রাবণ, ১৩০১—বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য।
মাঘ, ১৩০১—মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।

এতদ্ব্যতীত “মানসী” ভাদ্র, ১৩১৮ সংখ্যায় একখানি পত্র এবং “বঙ্গশ্রী”, শ্রাবণ, ১৩৪৪ সংখ্যায় তিনখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁহার আর একখানি পত্রও পাইয়াছি।

উপন্যাস সাহিত্য: ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিয়াও রমেশচন্দ্র কিরূপে বঙ্গসাহিত্যানুশীলনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার কথা একটু আগে বলা হইয়াছে। রমেশচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে” বঙ্কিম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি বঙ্কিম রচিত প্রথম ক’খানি উপন্যাস পাঠে বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের রচনাশৈলীর সহিত ইতিপূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনায় মনোযোগী হইলেন। তিনি মোট ছয়খানি মাত্র উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহার মধ্যে তাঁহার শিল্প-মানসের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথম চারিখানি ইতিহাস ভিত্তিক, অপর দুইখানি সামাজিক সমস্যা লইয়া বিরচিত। তাঁহার প্রথম উপন্যাস—**বঙ্গবিজেতা**। এখানি ১৮৭৪ সনে প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র এই কটী কথায় তাঁহার প্রথম উপন্যাসখানি আজীবন-সুহৃদ বিহারীলাল গুপ্তকে উৎসর্গ করেন: উৎসর্গ / বঙ্গবিজেতা। / উপহার / মদীয় / বিদ্যালয়ে সহাধ্যায়ী / বিদেশ-ভ্রমণে-চিরসহচর, / জীবনের বন্ধু / শ্রীবিহারীলাল গুপ্ত মহানুভবকে / এই প্রণয়োপহার প্রদান / করিলাম। / শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত। / মেহেরপুর / ২৬এ অক্টোবর ১৮৭৪। /

রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস—**মাধবীকঙ্কণ**। ইহার প্রকাশকাল ১৮৭৭। এখানি তিনি বিলাত যাত্রা ও বিলাত প্রবাসের অন্যতর সঙ্গী বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রখানি তাঁহারই ভাষায়:

“স্বদেশহিতৈষী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয় সুহৃৎ সুরেন্দ্র!

নয় বৎসর গত হইল, তুমি, সুহৃদবর বিহারীলাল ও আমি, এই তিনজনে একদিন প্রাতঃকালে মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া একত্রে, একই উদ্দেশ্যে, বহুসমুদ্র-পার বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলাম। আমাদিগের জীবনের মধ্যে সেই স্মরণীয় দিনটী স্মরণ করিয়া অদ্য এ পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিলাম। অদ্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই। সেই মহৎ কার্য্যে সফল হও, এই সহিত এই সামান্য পুস্তকখানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

কৃষ্ণনগর
১২৮৩ বঙ্গাব্দ।

তোমার স্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।”

রমেশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা উপন্যাস দুইখানি রচনা ও প্রকাশের পর বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি রমেশচন্দ্রের মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহা অগ্রজ যোগেশচন্দ্রকে বাখরগঞ্জ হইতে ১৩ই আগষ্ট, ১৮৭৭ তারিখে লিখিত নিম্নোক্ত পত্রাংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়:

“...I have written a few English books which have, for the time, pleased my countrymen for whom they were written. I have composed two Bengali novels which will probably live after my death...My own mother tongue must be my line, and before I die I hope to leave what will enrich the language and will continue to please my countrymen after I am dead.”

রমেশচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস **মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত**। এখানি প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সনে।

রমেশচন্দ্র এই উপন্যাসখানি উৎসর্গ করেন তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর অবিনাশচন্দ্র দত্তকে। উৎসর্গ-পত্র হুবহু উদ্ধৃত হইল:

উপহার

বিজ্ঞানোৎসাহী, সংযতমনা, উদার চরিত্র
কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত।

প্রিয় ভ্রাতঃ!

ইউরোপ হইতে তুমি যে নানা ভাষা ও নানা বিদ্যা আহরণ করিয়া আসিয়াছ, তাহা যখন চিন্তা করি তখনই আনন্দিত হই। কিন্তু তুমি ইহা অপেক্ষাও অমূল্য রত্নের অধিকারী। সে রত্ন, নির্ম্মল উদার চরিত্র, মনঃসংযমে অসাধারণ ক্ষমতা, বিজ্ঞান চর্চ্চায় আনন্দনীয় উৎসাহ ও জীবনব্যাপী চেষ্টা।

এই অসাধারণ সদ্‌গুণসমূহ দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন কর, ভ্রাতার এই মঙ্গলেচ্ছা। ভ্রাতার জীবনব্যাপী স্নেহের সামান্য নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিতেছি।

দক্ষিণ শাহাবাজপুর
১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

রমেশচন্দ্রের চতুর্থ বা শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস—**রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা**। এখানির প্রকাশকাল ১৮৭৯ সন। তখন রমেশচন্দ্র ত্রিপুরায় সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া তিনি যেসব কথা লিখিয়াছেন তাহা দ্বারা তাঁহার জীবনের কোন কোন নিগূঢ় ঘটনার প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হইতেছে। উৎসর্গপত্র এই:

“স্বদেশপ্রিয়, অমায়িক, উদারচরিত্র,
জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত।

প্রিয় ভ্রাতঃ!

এই সংসার স্বরূপ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। শৈশবে ঐ স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালবাসায় আমি স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা আকাঙ্ক্ষায় যখন ক্লান্ত হই, বহুদূরে, প্রবাসে, জীবনের অনন্ত চেষ্টা-পরম্পরায় যখন শ্রান্ত হই, প্রাণের অলীকতায় বা সংসারের বাহ্যাড়ম্বরে যখন বিরক্ত হই, তখন ঐ আদর্শরূপ নির্ম্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম, অমায়িক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়, আমি শান্তি লাভ করি।

জগৎ এ সমস্ত কথা জানে না, একথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে পাই, ধন, মান, খ্যাতি, ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উদ্যম দেখিতে পাই। এই চেষ্টায় ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া যাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া যাইতেছে। এ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋষিতুল্য অমায়িক লোক অলক্ষিত, অপরিচিত, অনাদৃত!

শৈশব ও বাল্যকালের একমাত্র সহচর! জীবনের প্রথম ও প্রিয়তম সুহৃদ! ত্রিংশ বৎসর যে তোমার অতুল স্নেহে প্রফুল্লতা ও শান্তি লাভ করিয়াছে, অদ্য সে তোমাকে এই সামান্য উপহার দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল।

ত্রিপুরা
১২৮৫ বঙ্গাব্দ।

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।”

রমেশচন্দ্র এই বৎসরই (সেপ্টেম্বর ১৮৭৯) তাঁহার উপন্যাস চতুষ্টয়—“বঙ্গবিজেতা”, “মাধবীকঙ্কণ”, “মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত”, “রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা”—একসঙ্গে **শতবর্ষ** নামে প্রকাশিত করিলেন। ইহার প্রায় সাত বৎসর পরে তাঁহার পঞ্চম উপন্যাস ‘সংসার’ বাহির হয়। কোন্ শ্রেণীর ‘উপন্যাসকে’ ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপে আখ্যাত করিব সে সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। তবে আমরাও বঙ্কিম রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে আচার্য্য যদুনাথ সরকার এবং দেশী বিদেশী মনীষিবৃন্দের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসের

লক্ষ্য বিচারের প্রয়াস পাইয়াছি। রমেশচন্দ্রের প্রথম চারিখানি উপন্যাসই ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া। নূতন নূতন ব্যক্তির আবির্ভাব বা চরিত্রের সৃজন সত্ত্বেও তিনি মূল ইতিহাসকে কোথাও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। নিজ প্রতিভা ও কল্পনাবলে খুঁটিনাটি তথ্যগুলি বিকৃত না করিয়াও, এই সকলের সাহায্যে তিনি তাঁহাকে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতবর্ষের একটি শতাব্দীর মানবজীবনের বিভিন্ন দিক, সমস্যা, ঘটনা ও ব্যক্তি লইয়া তিনি এই চারিখানি উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই উপন্যাস কখানি সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মনোজ্ঞ আলোচনা তাঁহার "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে কিয়দংশ মাত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম:

"রমেশচন্দ্রের চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসকে স্থূলতঃ দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম উপন্যাসদ্বয় 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবী-কঙ্কণ' এক শ্রেণীর অন্তর্গত; শেষের দুই-খানি উপন্যাস—'জীবন-প্রভাত' ও জীবন-সন্ধ্যা'-কে অপর শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম শ্রেণীতে কল্পনার আধিপত্য; দ্বিতীয় শ্রেণীতে সত্য-নিষ্ঠার অধিক প্রাদুর্ভাব—কল্পনা ঐতিহাসিক সত্যের অনুগামী হইয়াছে। প্রথম দুইখানি উপন্যাসের বর্ণনীয় বস্তু ও মুখ্য চরিত্রগুলি প্রধানতঃ কাল্পনিক; কেবল ঐতিহাসিক আবেষ্টনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহারা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী উপন্যাসদ্বয় প্রধানতঃ ইতিহাসের সংশয়হীন ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত; তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত কাল্পনিক বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে, তাহারা কেবল বৃহত্তর ঐতিহাসিক ঘটনা-গুলির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিতেছে; তাহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে শূন্য স্থানটুকু আছে, তাহা-দিগকে রসে ও বর্ণে ভরিয়া তুলিতেছে। অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্যের চারিদিকেও কল্পনা-শক্তির ক্রীড়ার যথেষ্ট অবসর আছে। ইতিহাসের শুষ্ক অস্থির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে হইলে, ঐতিহাসিক বাহ্য ঘটনাকে মানুষের প্রকৃত জীবনের ও হৃদয়াবেগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিতে হইলে, এক কথায় ইতিহাসকে মানব-মনের নিগূঢ় রসলীলার সহিত সম্পর্কান্বিত করিতে হইলে কল্পনার সাহায্য অপরিহার্য্য। রমেশচন্দ্রের শেষের দুইখানি উপন্যাসে যে কল্পনার পরিচয় পাই, তাহা মুখ্যতঃ এই জাতীয়। তাহা ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী নহে, অনুগামী; তাহা ইতিহাসকে বিকৃত করে না, কেবল বিস্মৃত-মলিন সত্যের রেখাগুলির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিতে চেষ্টা করে মাত্র। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রমেশ-চন্দ্রের গতি কাল্পনিকতা হইতে সত্যনিষ্ঠার দিকে; প্রথম উপন্যাসদ্বয়ে যে ইতিহাস অপ্রধান ছিল, শেষের উপন্যাস দুইখানিতে তাহা প্রধান হইয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয় রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রসার এবং রাজপুত ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসের বীরত্ব কাহিনীতে একটা প্রবল, প্রচুর রসধারার আবিষ্কার......।" (পৃঃ ৩৬—৩৭)।

"...আধুনিক উপন্যাসে ঘটনার ভিড় যতদূর সম্ভব কমাইয়া মানুষকে প্রধান আসন দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার মানসিক বিক্ষোভের চিত্রটি অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাহ্য ঘটনা অনেকটা দুর্দ্দান্ত দস্যুর মত আসিয়া পড়িয়া মানুষের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিতেছে, এবং তাহাকে অধিক চিন্তার অবসর না দিয়া তাহার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ একটা জবাব আদায় করিয়া লইতেছে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন বাহ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলিতে বাধ্য হইতেছে। আধুনিক উপন্যাসে বহির্জগতের এই দোর্দ্দণ্ড আততায়ীর প্রতাপ অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনা মানুষের উপর জাল বিস্তার করে, এবং ধীরে ধীরে তাহাকে শতবন্ধনের নাগপাশে জড়াইয়া ফেলে, তাহারা তাহার চিত্তকে অভিভূত না করিয়া আত্মবিশ্লেষণের যথেষ্ট অবসর দেয়; প্রত্যেক পাকটি কেমন করিয়া জড়াইয়া আসিতেছে, এবং মানুষের মর্ম্মস্থানে সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া বসিতেছে। ঔপন্যাসিক আমাদিগকে তাহা দেখাইবার সুযোগ পান। এই জন্যই আধুনিক উপন্যাসে বিশ্লেষণের প্রাধান্য এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই গুণের অভাবের জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত বিবাদ করিতে চাহেন, তাঁহারা উহার উদ্দেশ্য ও সুবিধা-অসুবিধার কথা বিশেষ রূপে বিবেচনা করেন না।

"কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশ্লেষণের অভাব অন্য দিক্ দিয়া পূরণ করে। ঘটনা-বৈচিত্র্যে, একটা সমগ্র যুগের ব্যাপক বর্ণনায়, উচ্চ ভাব ও আদর্শের বিকাশে ও বীরত্ব কাহিনীর প্রাচুর্য্যে ইহা মানুষকে এমন একটি তৃপ্তি দেয়, এমন একটি বর্ণ-বহুল সৌন্দর্য্যের দ্বার উদ্ঘাটিত

করে, যাহা সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা আমাদিগকে দিতে পারে না। অন্য সাহিত্যের পক্ষে যাহা হউক, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে ইহা একটি অবিসংবাদিত সত্য যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তব জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে এক বিচিত্র রসের আস্বাদ দেয়; এবং রমেশচন্দ্র এই রস আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণেই দিয়াছেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন, এক শূন্য পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। আমাদের ক্ষীণ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে সে-জাতীয় অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব, তাহা তাঁহার উপন্যাসে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাই। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, জাতীয়-ভাগ্য-বিধাতা বীরপুরুষদের জীবন্ত চিত্র, গুরুতর রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিবরণ, যুদ্ধবিগ্রহের রোমাঞ্চকর, উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা—এই সমস্তই রমেশচন্দ্রের আখ্যান-বস্তু।......" (পৃঃ ৪৪)।

রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস দুইখানি সম্বন্ধে এখন কিছু বলা যাইবে। তৎকৃত এই শ্রেণীর প্রথম উপন্যাস "সংসার"। ইহা প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সনের মাঝামাঝি। এই উপন্যাসখানি বঙ্কিমচন্দ্র পরিচালিত "প্রচারে" (১২৯২ বঙ্গাব্দ) প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সংসারের উৎসর্গপত্রখানি এইরূপ:

"এই শতাব্দীতে যাঁহারা হিন্দুদিগের পথপ্রদর্শক
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,
হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহারা স্বদেশীয়দিগকে
শিক্ষা দান করিয়াছেন,
সামাজিক উন্নতি ও জাতীয় ঐক্যসাধন বিষয়ে
যাঁহারা আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন;
বঙ্গভাষায় গদ্য সাহিত্য যাঁহারা স্বহস্তে
সৃষ্ট ও ভূষিত করিয়াছেন—
রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—
এই মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ
উৎসর্গ করিলাম।

চৈত্র সংক্রান্তি
১২৯২ বঙ্গাব্দ। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।"

রমেশচন্দ্র শেষ জীবনে তাঁহার উপন্যাসগুলির পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার মানস করিয়াছিলেন। সংসার উপন্যাসখানি তিনি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। তিনি ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া প্রেসে দিবার পর, পুস্তক মুদ্রণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এখানি **সংসার-কথা** নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় সামাজিক উপন্যাস—**সমাজ**। ইহার প্রকাশকাল জুলাই, ১৮৯৪। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্ব্বে ইহার কতকাংশ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যে' ১৩০০—০১ সনের পাঁচটি সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। সমাজের উৎসর্গপত্র এই:

"বঙ্গীয় সাহিত্যকে যাঁহারা নূতন রূপ, নূতন বল,
নূতন সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন,
বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে যাঁহারা নূতন আশা,
নূতন উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছেন,
পদ্য, গদ্য ও নাটকে যাঁহারা বঙ্গভাষাকে
নূতন অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন,—
মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত
ও দীনবন্ধু মিত্র,
এই মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ
উৎসর্গ করিলাম।

চৈত্র সংক্রান্তি
১৩০০ বঙ্গাব্দ। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।"

রমেশচন্দ্র সমাজ-সংস্কারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ এবং ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত অসবর্ণ বিবাহ প্রচেষ্টার সারবত্তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। একারণ তিনি সংসার উপন্যাসে বিধবা বিবাহ এবং সমাজ উপন্যাসে অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনে সবিশেষ প্রয়াসী হন। সমাজের উর্দ্ধ্বস্তরে অর্থাৎ শিক্ষিত প্রগতিশীল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেই যে এইরূপ সংস্কার প্রবর্ত্তন আশু প্রয়োজন তাহার কথা তিনি একখানি পত্রেও প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের নিজের কথায় :

"...On principle inter-caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well as widow marriage, &c.) safely and securely in our little society, so that the greater Hindu Society, of which we are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow. I cannot tell you how deeply I have felt this for years past; of my last two novels "Sansar" goes in for widow marriage, and, "Samaj"...goes in for inter-caste marriage."

(১০-২-১৮৯৪ তারিখে লিখিত পত্রাংশ।)

এবারে আমরা পুনরায় এই দুইখানি উপন্যাস সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। তিনি এ দুইখানির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার আলোচনা করিয়া বলেন :

"'সংসার' ও 'সমাজে' রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কোলাহল হইতে শান্ত পল্লীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুইখানি উপন্যাসে তিনি নূতন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা এতদিন ইতিহাসের সুবিশাল ক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সমাজ ও পরিবারের ক্ষুদ্র ব্যাপার লক্ষ্য করিতে তিনি অবসর পান নাই। কিন্তু তাঁহার শেষ উপন্যাসদ্বয়ে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইতিহাসের বিশাল, ও সমাজের সংকীর্ণ, এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার তুল্য অধিকার ও সমান শক্তি আছে।

"'সংসার' ও 'সমাজে' তিনি পল্লী গ্রামের পারিবারিক জীবনের এমন একটি সুন্দর, রসপূর্ণ, সহানুভূতিমূলক চিত্র দিয়াছেন, যাহা বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত সুলভ নহে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় না, কোনরূপ উচ্চাঙ্গের সৃজনীশক্তি, উচ্চস্তরের সমালোচনা লক্ষ্য হয় না। মনে হয় যেন সমস্তই কেবল বাস্তব বর্ণনা, পল্লী সমাজের নিখুঁত ফোটোগ্রাফ মাত্র। ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে Jane Austen পড়িতে পড়িতে অনেকটা এইরূপ ভাবের উদয় হয়। লেখিকা এমন সহজ, সরলভাবে ঘটনাবিরল, প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র দিয়া যান, এতই সাবধানে বিশ্লেষণ বাহুল্য ও গভীরতা বর্জ্জন করেন যে, আমরা মনে করি যে ইহার মধ্যে বিশেষ কিছু কলাকৌশল নাই, এবং কেবলমাত্র সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী হইলেই আমরাও ঐরূপ লিখিতে পারিতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই নাই; খুব উচ্চ রকমের কলাকৌশল না থাকিলে নিতান্ত সাধারণ উপাদান হইতে এত সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাস রচনা করা যায় না। যে আর্ট আত্মগোপন করিতে পারে, নিজের সমস্ত বাহ্য লক্ষণ প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে, তাহাই উচ্চতম আর্ট।" (পৃঃ ৪৭)

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসগুলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাসের একটি মনোজ্ঞ সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা হইতে এই অংশটি এখানে দেওয়া হইল :

"......রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক ও সামাজিক দুই প্রকার উপন্যাসেই নিজ ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাঁহার 'জীবন প্রভাত' ও 'জীবন সন্ধ্যা' বঙ্গসাহিত্যে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনেকগুলি গুণ আছে—তিনি বর্ণিত যুগের বিশেষত্বটুকু উপলব্ধি করেন, বীরত্ব-কাহিনীর উন্মাদনা নিজ রক্তের মধ্যে অনুভব করেন ও বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য স্থাপন করিতে পারেন। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের আর একটা গুণ—সাধারণ সামাজিক জীবনের উপর ইতিহাসের বিশাল ঘটনাগুলির প্রভাব-চিত্রণ তাঁহার

রচনায় নাই; কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ। সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের বিশেষ গুণ তাঁহার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও পল্লীগ্রামের দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি করুণ ও অকৃত্রিম সহানুভূতি। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসে কোন গভীর বিশ্লেষণ নাই। কেননা তিনি যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কোন বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতা নাই। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পল্লীসমাজে' যে গভীর স্তরে অবতরণ করিয়াছেন, তাহা রমেশচন্দ্রের ক্ষমতার অতীত। কিন্তু ইহার একটি কারণ এই যে, শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের বিকারগুলিকে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন; রমেশচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থারই বর্ণনা করিয়াছেন, বিকৃতির দিক্‌টা কেবল উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহাকে ফুটাইয়া তোলেন নাই। সুতরাং শরৎচন্দ্র সমাজদেহের ক্ষতপ্রদেশে যত গভীরভাবে ছুরিকা চালাইয়াছেন, রমেশচন্দ্র সমাজের সুস্থদেহে সেরূপ পারেন নাই। কিন্তু এই বিশ্লেষণ-শক্তির অপ্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব ও বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় তাঁহার লঘু ও অন্তরঙ্গ স্পর্শটি ইংরাজী সাহিত্যের মহিলা ঔপন্যাসিকদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রমেশচন্দ্র আমাদের অনেক মহিলা ঔপন্যাসিকের অপেক্ষা অধিক মাত্রায় স্ত্রীজাতিসুলভ সাহিত্যিক গুণের অধিকারী। সামাজিক উপন্যাসে তাঁহার প্রধান অপূর্ণতা একটা প্রবল আবেগের অভাব—মানবজীবনের সংকট-মুহূর্তগুলি তাঁহার কল্পনাশক্তিকে খুব গভীরভাবে আন্দোলিত করে নাই। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রধান প্রভেদ। বঙ্কিমের আবেগ ও উন্মাদনা তাঁহার নাই; বঙ্কিমের ন্যায় জীবনের রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তা, জীবন সমস্যার জটিলতা, জীবনের চরম মুহূর্তগুলির ভাবৈশ্বর্য্য তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে বঙ্কিম অপেক্ষা তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অধিক ছিল; তাঁহার উপন্যাসে বঙ্কিমের বিচিত্র রোমান্স ও ঐন্দ্রজালিক মোহ নাই। কিন্তু তাঁহার সরল সত্যনিষ্ঠাই কোন কোন সময়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইয়াছে; 'মাধবীকঙ্কণে' তিনি ব্যর্থ প্রেমের যে অগ্নিজ্বালাময় চিত্র দিয়াছেন, বঙ্কিমের উপন্যাসের রত্নভাণ্ডারের মধ্যেও তাহার অনুরূপ দৃশ্য আমরা কোথাও খুঁজিয়া পাই না।" (পৃঃ ৫০-৫১)

রমেশচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার মূল উৎস স্বদেশ-বাৎসল্য বা দেশভক্তি। তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে এই দেশভক্তির চর্য্যা করিয়া গিয়াছেন। অসময়ে অবসর গ্রহণের মূলে অন্যান্য কারণ থাকিলেও অপরিমেয় স্বদেশানুরাগই তাঁহাকে এই কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করে। সাহিত্য সাধনা তাঁহার জীবনের অঙ্গ হইয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহার রচনাবলীর সম্যক অনুধাবন করিতে হইলে এই সার কথাটি ভুলিলে চলিবে না। স্বদেশের পূর্ব্ব গৌরবের পুনরুদ্ধার, সমাজের তৎকালীন দুর্ব্বলতা বিদূরনান্তে এবং নূতন পরিবেশে ইহার সংস্কার সাধন পূর্ব্বক ইহাকে সবল সুস্থ এবং সক্রিয় করিয়া তোলা ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি এই উদ্দেশ্যের পরিপন্থী যত বাধা বিঘ্ন সকলই অগ্রাহ্য করিয়া সাহিত্যের মাধ্যমে ইহা সাধন করিতে সবিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন সাহিত্যের মাধ্যমে দেশসেবা যেরূপ সম্ভব এমনটি অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়। একারণ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও সাহিত্য সাধনাকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। এবং সাংসারিক কর্ম্মাবর্ত্ত হইতে ছুটি লইয়া একান্তভাবে সাহিত্য সাধনায় লিপ্ত হইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার এই আকূতি তৎকৃত 'সংসার' উপন্যাসখানির গুজরাটী অনুবাদিকাকে ১৯০৭ সনের ১৭ই এপ্রিল লিখিত একখানি পত্রে জানা যায়। পাঠক লক্ষ্য করিবেন তখন রমেশচন্দ্রের জীবন-সায়াহ্ন। ইহার মাত্র আড়াই বৎসর পরে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। পত্রখানি এই :

"Tell me your honest opinion, Sharada, do you not think I would do well to devote the remaining years of my life in writing such books as the 'Lake of Palms'—ay, in compiling a complete history of the Indian people from the earliest times to the twentieth century—than to work and vegetate in Baroda? I am the Amatya here, I am acting Dewan here, people look upon me with feelings of awe and respect—but I feel I am proving false to my higher pursuits, false to my destiny! I have done something in Baroda in these three years; let me plunge back to those pursuits which are dearest to my heart. As you are longing to come back from Naosari to the larger world of Baroda—I am longing also to return from Baroda to the larger world of literature and political work."

রমেশচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা স্বদেশের নবজাগরণ তথা সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। স্বাধীনতার ইতিহাসে শুধু কর্ম্মকুশল রাজনৈতিকের কৃতিসমূহই লিপিবদ্ধ হইবে না। সাহিত্য সাধনার দ্বারা ইহার ভিত্তি যাঁহারা দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের কথাও অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে। রমেশচন্দ্রের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞান এবং সাহিত্য-প্রয়াসের মণি-কাঞ্চন সংযোগ ঘটিয়াছে। স্বাধীন ভারতের সত্যকার ইতিহাসে রমেশচন্দ্রের কথাও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিবে।

বঙ্গবিজেতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : রুদ্রপুরে আগমন

WHILE the ploughman near at hand,
Whistles o'er the furrowed land,
And the milkmaid singeth blithe,
And the mower whets his scythe,
And every shepherd tells his tale
Under the hawthorn in the dale.

—*Milton.*

১২০৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার দেশে হিন্দুরাজ্য বিলুপ্ত হইল। সেই অবধি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৩৭০ বৎসর, আফগান অথবা পাঠানেরা এই দেশে রাজত্ব করেন। ইঁহারা কখন দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কখন বা সময় পাইলে স্বাধীনভাব অবলম্বন করিতেন। ইঁহাদিগের রাজ্যতন্ত্র অনেকাংশে ইউরোপীয় ফিউডল রাজ্যতন্ত্রের সদৃশ ছিল। দেশের সিংহাসন শূন্য হইলেই কখন কখন রাজপুত্রই রাজা হইতেন; এবং কখন বা কোন সেনাপতি আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। দেশের অধিপতি কোন একটি উৎকৃষ্ট জেলা আপন অধীনে রাখিতেন, অন্যান্য জেলা প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ নিজ নিজ অধিকারে রাখিতেন। তাঁহারা আবার আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে জমী বিভাগ করিয়া দিতেন। সেনাপতিগণ কখন কখন বঙ্গাধিপতির অধীনতা স্বীকার করিতেন; আবার সুযোগ পাইলেই আপন আপন জেলায় স্বাধীনভাব অবলম্বন করিতেন।

পাঠানদিগের শাসনাধীনে হিন্দু জমীদারদিগের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ছিল। এমন কি, বঙ্গদেশের পাঠান রাজাদিগের মধ্যে আমরা একজন হিন্দুরাজারও নাম দেখিতে পাই। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে গণেশ রাজা বঙ্গদেশের অধিপতি হইয়া সাত বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করেন। তিনি পূর্ব্বে জমীদার ছিলেন, আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং তাঁহার বংশ সর্ব্বশুদ্ধ চত্বারিংশৎ বৎসর বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন।

মোগলগণ যখন বঙ্গদেশ জয় করেন, তখন হিন্দু জমীদারদিগের আট লক্ষ পদাতিক ও তেইশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং চারি সহস্র রণতরি ছিল। জমীদারগণ প্রায়ই জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা ছিলেন। দেশের কৃষক ও প্রজাগণ সম্পূর্ণরূপে জমীদারদিগের অধীন থাকিত। প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তাঁহারা কিংবা তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন, দস্যু ও দুশ্চরিত্র লোকদিগকে তাঁহারাই দণ্ড দিতেন, তাঁহারাই গ্রামে গ্রামে শান্তিরক্ষা করিতেন, তাঁহারাই প্রজাগণের "বাপ মা" ছিলেন' ফলতঃ জমীদারেরাই প্রজাদিগের পালনকর্ত্তা ও বিচারপতি ছিলেন। তাঁহারাই প্রজাদিগের রক্ষক ও রাজা ছিলেন। এইরূপে পাঠানদিগের অধীনে দেশে হিন্দুশাসন প্রবল ছিল।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে শেষ পাঠান রাজা দায়ুদখাঁ বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার পরবৎসরই আকবরশাহ এই দেশ জয় করিবার অভিলাষ করেন। তিনি স্বয়ং পাটনা নগর অধিকার করিয়া মনাইমখাঁকে সেনাপতি রাখিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। মনাইমখাঁ নামে মাত্র সেনাপতি ছিলেন; ক্ষত্রিয়চূড়ামণি রাজা টোডরমল্লই বস্তুতঃ পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ জয় করেন। তিনিই দায়ুদখাঁকে বার বার পরাস্ত করিয়া অবশেষে কটকের মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাহাতে দায়ুদখাঁ ভীত হইয়া ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহারদেশ মোগলদিগকে অর্পণ করিয়া কেবলমাত্র উড়িষ্যা প্রদেশ আপন অধীনে রাখিলেন। এই সন্ধির পরই টোডরমল্ল দিল্লী যাত্রা করেন, এবং দায়ুদখাঁ অবকাশ পাইয়া সন্ধির কথা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আকবরশাহ হোসেনকুলীখাঁকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন

তিনি নামে মাত্র সেনাপতি; রাজা টোডরমল্লই সর্ব্বেসর্ব্বা। টোডরমল্ল দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে আসিয়া রাজমহলের মহাযুদ্ধে দায়ুদখাঁকে পরাস্ত করেন, এবং সেই যুদ্ধে দায়ুদখাঁ নিহত হয়েন। দিল্লীর হোসেনকুলীখাঁকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, এবং টোডরমল্ল পুনরায় দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল; এবার দেশে নব আগন্তুক মোগল সেনাপতি ও জায়গীরদারগণই বিদ্রোহী হইলেন। আকবরশাহ অতিশয় বুদ্ধিমান সম্রাট ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যে হিন্দুসেনাপতি দুইবার পাঠান শত্রুদিগকে জয় করিয়াছেন, সেই হিন্দুসেনাপতি ভিন্ন আর কেহই দেশীয় হিন্দুদিগের সাহায্য লইয়া মোগল বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না; সুতরাং ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে টোডরমল্ল সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন। কি প্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীরপুরুষ তৃতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করিয়া দুই বৎসরকাল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে। এই আখ্যায়িকায় ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কথা লিখিত হইবে, সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, জমীদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগলদিগের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

একদিন প্রাতঃকালে একজন ব্রহ্মচারী নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ রুদ্রপুর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। চারিদিকে কেবল বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে; প্রভাতবায়ু রহিয়া রহিয়া শস্যক্ষেত্রের উপর খেলা করিতেছে; শস্য আনন্দে যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। বহুদূরে প্রান্তরসীমায় দুই একটী পল্লীগ্রাম দেখা যাইতেছে; কুটীরাবলী দেখা যায় না, কেবল নিবিড় হরিৎবর্ণ বৃক্ষাবলী নয়নগোচর হইতেছে। আকাশ অতি নীল, পক্ষী সকল গান করিতেছে, এবং কৃষকগণও পল্লীগ্রাম হইতে আসিতে আসিতে মনের উল্লাসে গান করিতেছে। ব্রহ্মচারী যাইতে যাইতে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রুদ্রপুর আর কতদূর? সে উত্তর করিল,—অধিক দূর নাই, প্রায় আধ ক্রোশ হইবে।

ব্রহ্মচারী যাহার সহিত কথা কহিলেন, তাহার বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছে; সে জাতিতে কৈবর্ত্ত, কিন্তু বেশভূষা ভদ্রোচিত। সে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—ঠাকুর, রুদ্রপুরে যাইতেছেন? আমি তথাকার লোক; চলুন, একত্রে যাই, আপনার নাম কি, নিবাস কোথায়? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—আমার নাম শিখণ্ডিবাহন, ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ মহেশ্বরমন্দির হইতে আসিতেছি। তোমার নাম কি?

নবীন। আমার নাম নবীন দাস; এইস্থানে আমার কিছু জমী আছে, সেইজন্য আমি আসিয়াছিলাম।

শিখণ্ডি। এবার শস্য কেমন হইয়াছে?

নবীন। ঠাকুর, আমার দুই কুড়ি বৎসর পার হইয়াছে, এমন সুন্দর শস্য কখন দেখি নাই। এ বৎসর বিধাতার অনুগ্রহের সীমা নাই।

ক্ষণেক পর নবীন দাস আবার বলিতে লাগিল,—ঠাকুর! আমাদের জমীদারপুত্রের কি হইয়াছে, শুনিয়াছেন?

শিখণ্ডি। না; কি হইয়াছে?

নবীন। তিনি এক প্রকার উন্মত্তের মত হইয়াছেন, কারণ কেহ জানে না। তাঁহার পিতা তাঁহার আরোগ্যের জন্য কত যত্ন করিলেন, কোন ফল হইল না। আপনি ঠাকুর লেখাপড়া জানেন, আপনি কিছু স্থির করিতে পারেন?

শিখণ্ডি। শাস্ত্রে উন্মত্ততার অনেক কারণ নির্দ্দেশ করে,—বন্ধুর বিয়োগ, রমণীর প্রেম—

নবীন। না, সেরূপ নহে; আমাদের জমীদারপুত্র কত প্রকার বিহ্বল কথা বলেন—কিছু ঠিকানা থাকে না। বোধ হয়, অনেক লেখাপড়া শিখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন।

শিখণ্ডি। কি বলেন, বলিতে পার?

নবীন। শুনিয়াছি, আমাদের জমীদারপুত্র কখন কখন বলেন, বৈরনির্য্যাতনে পরম সুখ; কখন বলেন, স্ত্রীরত্ন পরম রত্ন; কখন বলেন, বন্ধুহত্যার মত পাপ নাই; আবার কখন বলেন, প্রজার কষ্ট দেখা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।

শিখণ্ডিবাহন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—আমার বোধ হয়, তিনি কোন ভয়ানক পাপ করিয়া থাকিবেন, মহাপাপে চিত্তের উন্মত্ততা জন্মে।

নবীন। তিনি কোন পাপ করিবেন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।

এই বলিয়া নবীন দাস ক্ষণেক স্থির হইয়া যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে লাগিল। পুনরায় বলিল,—তাঁহার অন্তঃকরণে যে দয়া, তিনি পাপ করিতে পারেন না। আজ অনুমান দ্বাদশ বৎসর হইল, আমি একবার ইচ্ছাপুর গিয়াছিলাম, দেখিলাম দুই চারিজন প্রজা খাজনা দিতে পারে নাই বলিয়া ঘরে আবদ্ধ আছে। তখন আমাদের জমীদারপুত্রের বয়স আট বৎসর হইবে। তিনি লুকাইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং প্রজাগণের হস্তে দুইটী করিয়া মুদ্রা দিলেন। প্রজারা আনন্দে খাজনা দিয়া চলিয়া গেল।

শিখণ্ডি। তাহার পর?

নবীন। তাহার পর প্রজারা হঠাৎ কেন খাজনা দিল, মুদ্রাই বা কোথা হইতে পাইল, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে প্রজারা গৃহে ফিরিয়া গেলে পর বালক অতি ভয়ে ভয়ে পিতার নিকট আপন কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। তাঁহার পিতা নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। আমি দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলাম; আমার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে দুইজনই রুদ্রপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। নানাপ্রকার বৃহদাকার বৃক্ষে গ্রাম আচ্ছাদিত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সূর্য্যরশ্মি পত্রের ভিতর দিয়া শুষ্কপত্ররাশি ও গ্রাম্য পথের উপর পতিত হইতেছে। ডালে ডালে নানাপ্রকার সুন্দর পক্ষী গান করিতেছে, কোকিল, শ্যামা, দোয়েল, ফিঙ্গা, পাপিয়া, ঘুঘু, সকলেই নিজ নিজ রবে মনের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে! মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য সরোবরে পদ্ম, শালুকফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে বৃক্ষতলে দুই একটী কুটীর দেখা যাইতেছে, স্থানে স্থানে দুই একজন কৃষক গান করিতে করিতে মাঠে যাইতেছে, তাহাদের গৃহিণীগণ মৃন্ময়-কলস কক্ষে লইয়া হেলিয়া দুলিয়া জল আনিতে যাইতেছে।

শিখণ্ডিবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশ্বেতা নামে এক বিধবা এই গ্রামে বাস করেন, তাঁহার নিবাস কোথা?

নবীন দাস উত্তর করিল,—চলুন, আমি দেখাইয়া দিতেছি। অনন্তর কিছু পথ লইয়া গিয়া নবীন মহাশ্বেতার ঘর দেখাইয়া দিল। শিখণ্ডিবাহন মহাশ্বেতার ঘরে অতিথি হইলেন, নবীন দাস ব্রহ্মচারীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় লইয়া আপন কুটীরে আগমন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ব্রতাবলম্বিনী

SHE stole along, she nothing spoke,
The sighs she heaved were soft and low,
And naught was green upon the oak,
But moss and rarest mistletoe:
She kneels beneath the huge oak tree,
And in silence prayeth she.

—*Coleridge.*

রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। আজি শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী; কিন্তু মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন; ক্ষেত্র, গ্রাম, অটবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। খদ্যোৎমালা বৃক্ষলতাদির নিবিড় অন্ধকার রঞ্জিত করিতেছে। ইচ্ছামতী নদী বিপুলকায়া হইয়া তরঙ্গমালায় প্রবাহিত হইতেছে ও সেই তরঙ্গমালা নিশাবায়ুবেগে অধিকতর উচ্ছ্বাসিত হইতেছে। নিবিড় নিকুঞ্জবনের ভিতর দিয়া স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু প্রধাবিত হইতেছে, বায়ুর শব্দ ও তরঙ্গের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হইতেছে না। সমগ্র জগৎ সুপ্ত।

এই প্রকার গভীর অন্ধকারে, এই শীতবায়ুতে একাকিনী কোন্ শুভ্রবসনা নদীজলে অবগাহন করিতেছেন? ইনি ব্রতাবলম্বিনী! অন্ধকারে ইঁহার শুভ্র বসন ব্যতীত আর কিছুই

দেখা যাইতেছে না। স্নানানন্তর বনপুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন, পরে নিকটবর্ত্তী এক পুরাতন বটবৃক্ষতলে এক শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া কবাট রুদ্ধ করিলেন।

মন্দিরের ভিতর একটী অল্পায়ত শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত শিব-প্রতিমা ও একটী প্রদীপ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; সেই প্রদীপের জ্যোতিঃ রমণীর অবয়বে ও শুভ্র বসনে পতিত হইতে লাগিল। রমণী অনেককাল যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন; বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষের অধিক হইবে, শীর্ণ কলেবর ও দুই একটী শুভ্র কেশ দেখিলে হঠাৎ পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক বোধ হয়। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘায়ত, অথচ কোমলতাশূন্য নহে। ললাট উচ্চ ও প্রশস্ত, কিন্তু চিন্তা-রেখায় গভীরাঙ্কিত। গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত-কৃষ্ণ কেশরাশি কপোলে, হৃদয়ে ও গণ্ডে লম্বিত রহিয়াছে। নয়নে যে সমুজ্জ্বলতা, তাহা প্রায় নবীনার নয়নেও দেখা যায় না, কিন্তু সে যৌবনের সমুজ্জ্বলতা নহে, হৃদয়ের চিন্তাগ্নি যেন নয়ন দিয়া বিস্ফুলিঙ্গরূপে বহির্গত হইতেছে। ওষ্ঠ অতি সুচিক্কণ অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-প্রকাশক। সমস্ত শরীর গম্ভীর, উন্নত ও বিধবার শ্বেতবস্ত্রে আবৃত হইয়া অধিকতর গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে। রমণী পুষ্প সকল প্রতিমার সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।

অনেকক্ষণ উপাসনা করিতে লাগিলেন। বায়ু ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কবাট ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিতে লাগিল, প্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়, কিন্তু রমণীর মুখমণ্ডলের স্থিরভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। স্থিরভাবে, মুদিতনয়নে, নিস্পন্দশরীরে, প্রায় এক প্রহর কাল আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কি কামনা, কি বিষয়ে আরাধনা করিলেন, অনুভব করিতে সাহস করি না।

উপাসনা সাঙ্গ হইলে রমণী প্রদীপ লইয়া বহির্গত হইবার জন্য কবাট খুলিলেন। খুলিবামাত্র বাতাসে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। সেই অন্ধকার নিশীথসময়ে ক্ষীণাঙ্গী প্রবল বায়ুবেগে কিঞ্চিন্মাত্র কাতর না হইয়া ধীরে ধীরে রুদ্রপুরের গ্রাম্য পথ দিয়া কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথ অতি সঙ্কীর্ণ; উভয় পার্শ্বে কেবল জঙ্গল; তাহার পার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষসমূহের পত্ররাশি দ্বারা অন্ধকার দ্বিগুণ নিবিড় বোধ হইতেছে। সেই বৃক্ষতলে স্থানে স্থানে একটা কুটীর দেখা যাইতেছে; কুটীরবাসিগণ সকলেই সুপ্ত; জীবজন্তুর শব্দমাত্র নাই। এই প্রকারে মহাশ্বেতা কতক পথ অতিবাহিত করিয়া অবশেষে এক কুটীরে উপস্থিত হইয়া কবাটে আঘাত করিলেন। দ্বার ভিতর হইতে উদ্‌ঘাটিত হইল; মহাশ্বেতা প্রবেশ করিলে ভিতরে প্রদীপহস্তে এক অল্প-বয়স্কা স্ত্রীলোক পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিল।

মহাশ্বেতা কি চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছিলেন; অল্পবয়স্কার মুখ দেখিবামাত্র সহসা সকল চিন্তা দূর হইল ও পবিত্র স্নেহভাব বদনমণ্ডলে বিকাশ পাইতে লাগিল। বলিলেন,—সরলা, এত রাত্রি হইয়াছে, তুমি এখনও জাগিয়া আছ; যাও মা, শোও গে যাও। এই বলিয়া সস্নেহে সরলাকে আলিঙ্গন করিলেন। সরলা উত্তর করিল,—রাত্রি অধিক হইয়াছে, তা মা আমি জানিতাম না; ব্রহ্মচারী ঠাকুর মহাভারতের কথা বলিতেছিলেন, তাহাই শুনিতেছিলাম। আমার বোধ হয়, মহাভারতের কথা শুনিলে আমি সমস্ত রাত্রি জাগিতে পারি।

সরলা প্রদীপ লইয়া যখন শয়নগৃহে যাইতেছিল, তাহার মাতা অনিমেষলোচনে অনেকক্ষণ তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও অর্দ্ধস্ফুটবচনে বলিলেন,—তুমি আমার সর্ব্বস্ব, বিধাতা কি বনশোভার নিমিত্ত এই অমূল্য রত্ন, এই অতুল্য পুষ্প সৃজন করিয়াছিলেন? বলিতে বলিতে যে ঘরে ব্রহ্মচারী ছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

সরলা শয়নগৃহে যাইয়া প্রদীপ রাখিল। মাতা শয়ন করিতে আসিবেন বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল না, প্রদীপও নিবাইল না। তাহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ হইবে, এখনও যৌবন সম্যক-রূপে আবির্ভূত হয় নাই, মুখ দেখিলে এখনও বালিকা বলিয়া বোধ হয়। অবয়ব বা মুখে বিশেষ রূপের ছটা বা লাবণ্য ছিল না; কবিগণ যেরূপ তন্বঙ্গী রূপসীদিগের বর্ণনা করিতে ভালবাসেন, আমাদের সরলার সে অপরূপ সৌন্দর্য্যের কিছুই ছিল না। তবে শরীর কোমলতা-পূর্ণ ও মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় মধুরিমা ও সরলতা বিরাজমান রহিয়াছে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন বালিকাহৃদয়ে কেবল সুশীলতা, সরলতা ও মানব-সাধারণের প্রতি পবিত্র প্রেম এবং স্নেহরাশি বিরাজ করিতেছে। বিশেষ সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার মাতার মত নয়নদুটী সমুজ্জ্বল;—সমুজ্জ্বল, কিন্তু শান্ত, সরল ও কোমলতাপূর্ণ। ওষ্ঠদ্বয় বিশেষ সুচিক্কণ নহে, কিন্তু দেখিলে

বোধ হয়, মিষ্টতার আধার, আর সদা সুহাসিতে বিকশিত। গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ বদনমণ্ডলের সরল কিশোর ভাব অধিকতর বর্দ্ধন করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ কোমল ও সুস্নিগ্ধ। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর শয্যায় শয়ন করিতে না করিতে নিদ্রার আবির্ভাব হইল, প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন পুনরায় মুকুলিত হইয়া কোরকভাব ধারণ করিল।

যে কুটীরে মাতা ও কন্যা বাস করিতেন, সে কুটীর অতিশয় সামান্য। ক্ষুদ্র একটী পাকশালা ও একটী গোশালা ছিল, এতদ্ভিন্ন দুইটী বড় ঘর ছিল, তাহার মধ্যে একটীতে মাতা, কন্যা ও একমাত্র দাসী শয়ন করিত, অপরটীতে দিনের বেলা কর্ম্মকার্য্য হইত এবং কোন অতিথি আসিলে তাঁহার শয্যা রচনা হইত। গোশালায় দুই তিনটী গাভী থাকিত; প্রাঙ্গণে একটী গোলা ছিল, তাহাতে কিছু ধান্য সঞ্চিত থাকিত। গৃহপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রায়ত বাগান ছিল, তাহাতে কতকগুলি ফলবৃক্ষ ছিল, আর সরলা কতকগুলি পুষ্পের চারা রোপণ করিয়াছিল। যদিও কুটীর সামান্য, তথাপি কোনও আগন্তুক আসিলেই অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিতেন যে, কুটীরবাসিনীগণ নিতান্ত সামান্য লোক নহেন। গৃহের মধ্যে সকল দ্রব্যই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বসন যৎসামান্য, কিন্তু পরিচ্ছন্ন; ঘরগুলিও যৎসামান্য, কিন্তু পরিষ্কৃত; প্রাঙ্গণে তৃণমাত্র নাই। কুটীরবাসিনী কায়স্থরমণীদিগের আচারব্যবহার দেখিয়া প্রথমে গ্রামবাসিগণ নানাপ্রকার আলোচনা করিত। এক্ষণে ছয়-সাত বৎসরাবধি তাঁহাদিগকে সেই গ্রামে বাস করিতে দেখিয়া সকলেই নূতন অনুভবে বিরত হইল; সকলেই সিদ্ধান্ত করিল যে, মহাশ্বেতা কোনও কায়স্থ জমীদারের বিধবা হইবেন, বিষয়সম্পত্তি হারাইয়া, ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া কন্যাকে লইয়া এই গ্রামে আশ্রয় লইয়াছেন।

এদিকে মহাশ্বেতা বহু সম্মান করিয়া শিখণ্ডিবাহন ব্রহ্মচারীকে আহার করাইয়া আপনিও কিছু জলযোগ করিলেন। পরে ব্রহ্মচারীকে আসনে উপবেশন করাইয়া আপনি ভূমিতে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইতে লাগিল; আমরা তাহার কিয়দংশ বিবৃত করিব।

শিখণ্ডিবাহন বলিলেন,—ভগিনি! আমি পিতা চন্দ্রশেখরের নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সম্প্রতি তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আজি সাত বৎসর হইল, পিতা তীর্থে গিয়াছিলেন, সাত বৎসরে হিমালয় হইতে কাবেরী-তীর পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন।

মহাশ্বেতা। পিতার সার্থক জীবন।

শিখণ্ডি। অবশেষে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই শুনিলেন যে, পাঠান রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে, দিল্লীশ্বরের হিন্দুসেনাপতি টোডরমল্ল এ দেশ জয় করিয়াছেন। আরও শুনিলেন যে, বঙ্গদেশের জমীদারকুলতিলক সমরসিংহের কাল হইয়াছে। পরে আমার প্রমুখাৎ তোমার ব্রতের বিষয় শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ব্রতের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, এ ব্রত হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। ভগিনি, এখনও ক্ষান্ত হও।

মহাশ্বেতা বলিলেন,—ভ্রাতঃ! এ অনুরোধ হইতে আমাকে মার্জ্জনা করুন। এ ব্রত আমার প্রাণের অংশ স্বরূপ ও জীবনের অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছে। এত শোক, এত মনস্তাপ সহ্য করিয়া যে আমি জীবিত আছি, এই ভয়ানক অবস্থার পরিবর্ত্তনেও যে আমি স্বচ্ছন্দে আছি, সে কেবল এই ব্রতের নিমিত্ত। যে দিন ব্রত উদ্‌যাপিত করিব, সেদিন আমাকে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এই উত্তর শ্রবণ করিয়া শিখণ্ডিবাহন ব্রতত্যাগের অনুরোধ হইতে নিরস্ত হইলেন। ক্ষণেকপর বলিলেন,—বৈরনির্য্যাতনের কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতেছ?

মহাশ্বেতা বলিলেন,—আমি এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট একটী ভীষণ মন্ত্র লইয়াছি। তিনি এই মন্ত্র-সাধনের জন্য যে অনুষ্ঠান বলিয়া দিয়াছেন তাহাও ভীষণ, কিন্তু সে অনুষ্ঠানে আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় স্নান করিয়া নিশা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দেবদেব মহাদেবের সেই মন্ত্রদ্বারা আরাধনা করিব;—যতদিন মহাদেব শত্রুনিপাত না করেন, ততদিন কন্যা অবিবাহিতা থাকিবে,—সপ্তমবর্ষের মধ্যে শত্রুনিপাত না হইলে কুমারীকন্যাকে মহাদেবের নিকট হত্যা দিয়া চিতারোহণ করিব।

অনেকক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তোমার ব্রত কি, তাহা আমি অবগত আছি। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বৈরনির্য্যাতন সাধনের জন্য এই ব্রতধারণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছ?

মহাশ্বেতা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—যিনি এই বিপুল সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা লাভ ভিন্ন স্ত্রীলোকে আর কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে?

সরলস্বভাব ব্রহ্মচারী মহাশ্বেতাকে ব্রত হইতে নিরস্ত করিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন। মহাশ্বেতা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—আপনি পূর্ব্বকথা সকল জানিলে এ প্রকার অনুরোধ করিতেন না, আমি নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন, আর মহাত্মা চন্দ্রশেখরকেও এই সকল কথা জানাইবেন।

পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে করিতে মহাশ্বেতার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল বিকৃতভাব ধারণ করিল, উজ্জ্বল চক্ষু আরও ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। প্রদীপ ক্ষীণ জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছে; ঘরের চারিদিকে নিবিড় অন্ধকারে বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দে প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতেছে ও মহাশ্বেতার সামান্য কুটীরে বেগে আঘাত করিতেছে; কিন্তু স্মৃতিজাত প্রবল চিন্তাবায়ু তদপেক্ষা শতগুণ বেগে মহাশ্বেতার হৃদয়কন্দরে আঘাত করিতেছিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মহাশ্বেতা বলিলেন,—আমি পাপীয়সী বটি; যে পরের অমঙ্গলের জন্য সপ্তবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রতধারণ করিয়া থাকিতে পারে, সে পাপীয়সী নহে ত কি? কিন্তু সামান্য অত্যাচারে আমি পাপব্রত অবলম্বন করি নাই। শ্রবণ করুন।

সরলচিত্ত শিখণ্ডিবাহন অগত্যা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্রতাবলম্বিনীর পূর্ব্বকথা

BUT o'er her warrior's bloody bier
The lady dropped nor flower nor tear.
Vengeance deep brooding on the slain
Had locked the source of softer woe,
And burning pride and high disdain
Forbade the rising tear to flow.

—*Scott.*

আমার স্বামী রাজা সমরসিংহ রায় কায়স্থকুলের ভূষণ ছিলেন, এবং কায়স্থ জমীদারদিগের শিরোরত্ন ছিলেন। পাঠান দায়ুদখাঁর সহিত যৎকালে মোগলদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সম্রাট আকবর স্বয়ং যে সময় পাটনা নগর বেষ্টন করেন ও গঙ্গার অপর পারস্থ হাজীপুর নগর অধিকার করিবার অভিলাষ করিয়া আলমখাঁকে প্রেরণ করেন, আমার স্বামী একসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মহাবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ও তিনিই সেই নগর হস্তগত করিবার প্রধান কারণ ছিলেন। তাঁহার বীরত্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দিল্লীশ্বর এত তুষ্ট হইলেন যে, কিছুদিন পরে পাটনা হস্তগত করিয়া পাটনার দরবারে সমস্ত হিন্দু জমীদারদিগের মধ্যে আমার প্রভুকেই প্রথম স্থান প্রদান করিলেন! তাহার অনতিবিলম্বেই সাগর-তরঙ্গের ন্যায় মোগল সৈন্য বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। মহাযোদ্ধা টোডরমল্ল সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়নপর দায়ুদখাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন,—রাজা সমরসিংহ সানন্দ-চিত্তে টোডরমল্লের সহিত শত্রুপরিপূর্ণ বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিতে নির্গত হইলেন। তণ্ডা হইতে বীরভূমি, বীরভূমি হইতে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর হইতে কটক, টোডরমল্ল যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই আমার স্বামী তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। যে যে যুদ্ধে টোডরমল্ল জয়লাভ করিয়াছিলেন, রাজা সমরসিংহ সেই সেই যুদ্ধে আপনার নৈসর্গিক বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে বীরত্ব ও সাহসের কি এই পুরস্কার?

পরে কটকের নিকট যে মহাযুদ্ধ হয় তাহাতে মোগল সেনাপতি মনাইমখাঁ স্বয়ং বর্ত্তমান ছিলেন। মোগলেরা প্রায় পরাস্ত হইয়াছিল। মনাইমখাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আলমখাঁ যুদ্ধে নিহত হইলেন। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল ও রাজা সমরসিংহ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। রাজা টোডরমল্ল বলিলেন, "আলমখাঁর মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি; মনাইমখাঁ পলায়ন করিয়াছেন তাহাতেই বা আশঙ্কা কি; সাম্রাজ্য আমাদের হস্তে আছে, আমাদের

হস্তেই থাকিবে।" এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে আমার স্বামী সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া শত্রু-ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, মোগল সৈন্য বঙ্গদেশীয় জমীদারের সাহস দেখিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিল, দায়ুদখাঁ পরাস্ত হইলেন। তৎপরেই পাঠানগণ বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দিয়া মোগলদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। সেই সন্ধি সংস্থাপনের সময়ে মনাইমখাঁ দায়ুদখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাঠানরাজ! প্রায় এক বৎসর আপনি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, দিল্লীশ্বরের কোন্ সেনাপতি যুদ্ধে অধিকতম সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি অবশ্যই বলিতে পারেন।" পাঠানরাজ উত্তর করিলেন, "প্রথম ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল, দ্বিতীয় বঙ্গীয় জমীদার রাজা সমরসিংহ।" এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে সমগ্র দরবার জয়ধ্বনি ও কোলাহলে প্লাবিত হইল; সেই জয়ধ্বনি বায়ুমার্গে আরোহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিল; চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে—যথায় আমি একাকিনী উপবেশন করিয়া যুদ্ধে স্বামীর বিপদ আশঙ্কা করিতেছিলাম,—প্রবেশ করিয়া আমার শরীর কণ্টকিত করিল! অদ্য কি না সেই সমরসিংহের বিদ্রোহ অপবাদে শিরশ্ছেদন হইল! দেবদেব মহেশ্বর! ইহার কি ইহকালে প্রতিহিংসা নাই, পরকালে বিচার নাই?

ছিন্ন-তার বীণার মত সহসা মহাশ্বেতার গম্ভীর স্বর থামিয়া গেল। শিখণ্ডিবাহন বলিলেন, —ভগিনি! পূর্ব্বকথা স্মরণে যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিবার আবশ্যক কি? বিশেষ রাজা সমরসিংহের যশোবার্ত্তা বঙ্গদেশে কে না অবগত আছে? সমরসিংহের পত্নীর সে কথা বিবরণ করিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইবার আবশ্যক কি?

মহাশ্বেতা। সমরসিংহের পত্নী নহি, এককালে সমরসিংহের রাজমহিষী ছিলাম, এক্ষণে নিরাশ্রয়া বিধবা!—আমার আর অধিক বলিবার নাই, শ্রবণ করুন।

সতীশচন্দ্র নামে পাঠানদিগের একজন চতুর কর্ম্মচারী ছিল; পাঠানগৌরব অস্তপ্রায় দেখিয়া সে পাঠানপক্ষ ত্যাগ করিয়া রাজা টোডরমল্লের আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমার স্বামীই সেই বিনীত ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া রাজা টোডরমল্লের নিকট লইয়া যান, এবং অনেক সহায়তা করেন।

ব্রাহ্মণ চতুর ও কার্য্যদক্ষ; সৈন্যদিগের রসদ আহরণে, শত্রুদিগের অভিসন্ধি অনুভব করণে, এবং কুটিল চক্রান্ত দ্বারা শত্রুদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ সাধনে বিশেষ তৎপর ছিল। রাজা টোডরমল্ল সতীশচন্দ্রের উপর তুষ্ট হইলেন,—রাজপ্রসাদে সতীশচন্দ্র ক্রমে খ্যাতি, ধন ও বিস্তীর্ণ সম্পত্তি লাভ করিল।

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সতীশচন্দ্রের ভীষণ উচ্চাভিলাষ হইল, বঙ্গদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান হইবার আশা হইল, আমার স্বামীর প্রতি বিজাতীয় হিংসা হইল! আপনারা বলেন, লোকের উপকার করিলে লোকে কৃতজ্ঞ হয়:—আমার স্বামী দরিদ্র সতীশচন্দ্রের উপকার করিয়া কালসর্প হৃদয়ে পুষিলেন!

রাজা টোডরমল্ল বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করাতে সতীশচন্দ্র সুযোগ পাইল। জাল কাগজ প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করিল যে, রাজা সমরসিংহ উড়িষ্যার পাঠানরাজ দায়ুদখাঁর সহিত গোপনে সন্ধি করিয়াছেন! বঙ্গের মুসলমান সুবাদার এই অপূর্ব্ব কথা বিশ্বাস করিলেন; রাজা সমরসিংহ বিদ্রোহী বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল; পামর সতীশচন্দ্র আমাদের বিস্তীর্ণ জমীদারি পুরস্কার স্বরূপ অপলাভ করিয়া আজি বঙ্গদেশের দেওয়ান হইয়াছেন!

ভ্রাতঃ! আমার কথা শেষ হইয়াছে। এই শোকে আমি পাগলিনী হইয়াছি; এই নরহত্যার প্রতিহিংসার জন্য আমি ব্রত ধারণ করিয়াছি!

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিখণ্ডিবাহন দেখিলেন, মহাশ্বেতার ব্রতভঙ্গের চেষ্টা করা বৃথা; অগ্নিরাশিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ মাত্র। বলিলেন,—তবে আমি পিতাকে এই সকল বৃত্তান্ত বলিব?

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন,—হাঁ, বলিবেন যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্নিকট, নরঘাতকের দণ্ড সন্নিকট। রাজা টোডরমল্ল তৃতীয়বার বঙ্গদেশে আসিয়াছেন; তাঁহার যুদ্ধকার্য্য শেষ হইলে সমরসিংহের বিধবা তাঁহার নিকট সমরসিংহের বধের জন্য বিচার প্রার্থনা করিবে! পিতাকে বলিবেন যে, পক্ষিশাবক ব্যাধকর্ত্তৃক আহত হইলে আপনার যাতনায় ক্রন্দন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু মানিনী ফণিনী পদাহত হইলে আঘাতকারীকে দংশন করিয়া হর্ষে—হেলায় প্রাণত্যাগ করে!

বলিতে বলিতে মহাশ্বেতা আসন ত্যাগ করিয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—মহাশ্বেতার সমস্ত শরীর কম্পিত ও কণ্টকিত! গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন; প্রভাতের আলোকচ্ছটা তাঁহার কুঞ্চিত ললাটে পতিত হওয়ায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, বৃক্ষের অগ্রভাগ তরুণ অরুণকিরণে সুবর্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, ডালে ডালে নানা পক্ষী নানা রঙ্গে গান করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সরলা ও অমলা

WE Hermia, like two artificial gods,
Have with our needles created both one flower,
Both on one sampler, sitting on one cushion,
Both warbling of one song, both in one key;
As if our hands, our sides, voices and minds,
Had been incorporate. So we grew together,
Like to a double cherry seeming parted,
And yet a union in partition,
Two lovely berries moulded on one stem.

—*Shakespeare.*

বৃক্ষশাখা হইতে পক্ষিগণ শব্দ করিবার পূর্ব্বেই সরলা গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইল। ঘর, দ্বার, প্রাঙ্গণ, সকল পরিষ্কার করিল। পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, রাজকুমারীর কি এ সকল কাজ সাজে? সরলা যে রাজকুমারী, তাহা সে জানিত না। পিতার মৃত্যুর সময় সে অল্পবয়স্কা বালিকা ছিল, তখনকার কথা প্রায় একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার মাতাও একথা তাহাকে কখন বলেন নাই, তাহার বালিকা-হৃদয়ে অহঙ্কার বা অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। চিরকাল কুটীরে বাস করিয়া মাতাকে ভালবাসিবে, কৃষক-পত্নীদিগের সহিত আলাপ, সহবাস করিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চাভিলাষ তাহার সরলান্তঃকরণে কখন স্থান পাইত না।

গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া সরলা মৃৎকলস লইয়া নদীতে স্নান করিতে চলিল। প্রতি দিনই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার স্নান সমাপন হইত। পথিমধ্যে এক কুটীরপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "সই!" কেহ উত্তর দিল না। পুনরায় ডাকিল, "সই অমলা!" "যাইলো!"—এই বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে কে উত্তর দিল। ক্ষণেক পরে এক পঞ্চদশবর্ষীয়া, প্রখরনয়না, চঞ্চলহৃদয়া রমণী বাহিরে আসিল। তাহার পরিধানে এক রাঙ্গাপেড়ে শাটী, কক্ষে কলস, হাতে শাঁখা, পায়ে মল। আসিয়াই সরলার চুল ধরিয়া টানিয়া চিমটী কাটিয়া বলিল,—তোর যেমন আক্কেল, আমার ঘরে বৃদ্ধ স্বামী, আমাকে কি এত ভোরে আসিতে দেয়? তোর কি বল্, মা বিবাহ দিলেন না, সমস্ত রাত্রি ভাবনায় নিদ্রা হয় না, প্রভাত হইতে না হইতে ঘর হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচিস। এই বলিয়া সরলাকে আবার চিমটী কাটিল ও হাসিতে হাসিতে গাল টিপিয়া দিল।

সরলা বলিল,—সই, তুমি আমাকে আসিতে বল, তাই আমি ডাকিতে আসি।

অমলা। তা না হইলে আসিতে না?

সরলা। আসিতাম।

অমলা। কেন আসিতে?

সরলা। তাহা আমি জানি না। সকালে উঠিয়াই তোমার মুখখানি মনে পড়ে। যদি একদিন তোমায় না দেখি, তাহা হইলে আমার সমস্ত দিন কাজ কর্ম্মে মন থাকে না।

অমলা প্রেমপূর্ণলোচনে সরলার মুখখানি নিরীক্ষণ করিল,—বালিকার মুখখানিও প্রেমরাশিতে টলমল করিতেছে। ক্ষণেক পর অমলা বলিতে লাগিল,—

সই, আর শুনিয়াছ,—জমীদারের কাছারির নূতন খবর শুনিয়াছ?

সরলা। না; কি খবর?

অমলা। আমাদের জমীদার নাকি এক বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন; মেয়ে নাকি বড় রূপসী, রূপ যেন বিদ্যুতের মত, আর চক্ষু দুটী যেন,—যেন, দুটী কাল কাল ভোমরার মত।

সরলা। তার পর?

অমলা। তার পর সম্বন্ধ স্থির হইলে আমাদের জমীদারের ছেলে নাকি বলিলেন, আমি ও মেয়েকে বিবাহ করিব না।

সরলা। কেন?

অমলা। কেন, তা জানি না, শুনিয়াছি, কোন পল্লীগ্রামে কোন এক গরীব মেয়েকে দেখিয়া মন হারাইয়াছেন। তা সেই মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য নাকি গৃহত্যাগী হইয়াছেন! আমার সইকেই বা দেখিয়া থাকিবেন!

সরলা। তামাসা কর কেন সই? আচ্ছা, বাপ্‌ বল্‌ছেন একজনকে বিবাহ কর্‌তে, ছেলে আর একজনকে বিবাহ কর্‌বেন?

অমলা। তা যার যাকে মনে ধরে; বাপ্‌ যাহাকে বিবাহ কর্‌তে বলেন, তাহাকে যদি মনে না ধরে?

সরলা। কেন ধর্‌বে না?

অমলা। তুই যেমন হাবা, তোকে আর কত শিখাব। বলি, মাকে বল্‌ বিবাহ দিতে, তাহা হইলে সব শিখ্‌বি। এই বলিয়া আবার সরলার গাল টিপিয়া দিল।

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে নদীর ঘাটে উপস্থিত হইল। নদীর তীরে যাইয়া এক অপরূপ দর্শন দৃষ্ট হইল। তথায় নিবিড় কৃষ্ণবর্ণা, দীর্ঘায়তা, ছিন্নবসনা এক স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান আছে। তাহার গলদেশে অক্ষমালা, হস্তে দণ্ড, শরীরে ভস্ম, চক্ষু রক্তবর্ণ ও ঘূর্ণায়মান। দেখিয়া দুই জনই বিস্মিত হইল। অমলা জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে গা?

সে উত্তর করিল,—আমার নাম বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী। অমলা বলিল,—হাঁ হাঁ, আমি বিশু পাগ্‌লীর নাম শুনিয়াছি। তুমি আগে এ গ্রামে একবার আসিয়াছিলে না?

বিশ্বেশ্বরী। আসিয়াছিলাম।

অমলা। তুমি না হাত দেখিতে জান?

বিশ্বেশ্বরী। জানি।

অমলা। আচ্ছা, আমার হাত দেখ দেখি।

পাগলিনী হাত দেখিয়া ক্ষণেক পর বলিল,—তুমি দেওয়ানের গৃহিণী হইবে।

অমলা। দূর পাগ্‌লী, আমার স্বামী বর্ত্তমান; বলে কি না দেওয়ানের স্ত্রী হবে। আমার দেওয়ান উজিরে কাজ নাই, আমার বৃদ্ধ স্বামী বাঁচিয়া থাকুক। এখন বল দেখি, আমার সইয়ের কবে বিবাহ হবে? বিবাহের ভাবনায় সইয়ের রাত্রিতে ঘুম হয় না।

পাগলিনী অনেকক্ষণ সরলার হস্তধারণপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, আবার হস্ত দেখিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর বলিল,—তোমার ভবিষ্যৎ আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন; কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি ও ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। সম্প্রতি তুমুল প্রলয় উপস্থিত, তাহার পর কি আছে বলিতে পারি না। তিন দিন মধ্যে ঝড় আসিবে, অদ্যই এ গ্রাম হইতে পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর!

সরলা ভীত হইল। অমলা প্রিয়সখীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পাগলিনীকে উপলক্ষ করিয়া বলিল,—ধান ভানিতে শিবের গীত! আমি কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, সইয়ের বিবাহ হইবে কবে, উনি আকাশ, মেঘ, প্রলয়ের কথা আনিলেন। দাঁড়া তো, আমি পাগ্‌লীকে জব্দ করি।

এই বলিয়া অমলা পাগলিনীর গায়ে জল দিতে লাগিল, পাগলিনী ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া গেল। দূরে যাইয়া পুনরায় সরলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল,—পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর!

এদিকে অন্যান্য কৃষকপত্নীগণ আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল। রামী, বামী, শ্যামী, নৃত্যের বৌ, হরির মা ইত্যাদি অনেক গ্রাম্য সুন্দরী আসিয়া ঘাট আলো করিয়া বসিল। নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা ও রঙ্গরসে ঘাট জমকাইয়া তুলিল। ইচ্ছামতী নদী এত সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিয়া আনন্দে

স্ফীত হইয়া কল্‌ কল্‌ শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল; গ্রাম্য সুন্দরীরাও আনন্দে কল্‌ কল্‌ শব্দে গল্প আরম্ভ করিল। গল্পের মধ্যে অল্পবয়স্কারা স্বামীর কথা ও প্রাচীনারা পরনিন্দার কথা আনিল। সরলা ও অমলা কলসে জল লইয়া নিজ নিজ গৃহে আসিল।

অমলার স্বামীর সহিত পাঠক অগ্রেই পরিচিত হইয়াছেন। নবীন দাস জাতিতে কৈবর্ত্ত, সে গ্রামের একজন মহাজন ছিল, ও অনেক প্রকার ব্যবসাও করিত। তাহার স্বভাব অতি শান্ত ও সরল। তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্গতিও ছিল। প্রায় একশত বিঘা জমি, ২০।২৫টা গরু, ৪।৫ খানা লাঙ্গল ও বাটীর মধ্যে আট-দশটা গোলা ছিল। আর লোকের মুখে এমনও শুনা যাইত যে, নগদ কিছু টাকা মাটীতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন আপন পত্নীকে অনেক গহনাও দিয়াছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সের সময় দশমবর্ষীয়া অমলাকে বিবাহ করে। এখনও বৃদ্ধ হয় নাই, কিন্তু অমলা উপহাস করিয়া তাহাকে "বৃদ্ধ স্বামী" বলিয়াই ডাকিত। অমলা স্নেহবতী ভার্য্যা, কিন্তু অত্যন্ত রসিকা। "বৃদ্ধ স্বামীর" সেবা শুশ্রূষা করিত, কিন্তু দিবারাত্রি উপহাস করিতেও ক্ষান্ত থাকিত না। এ প্রকার পত্নী পাইয়া বৃদ্ধ স্বামীর স্নেহের ও সুখের সীমা ছিল না।

সরলার রুদ্রপুরে আগমন অবধি অমলা তাহাকে আপন সোদরা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিত, প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিত। দুঃখের সময়ে সরলার নির্ম্মল বালিকা-মুখখানি দেখিয়া সকল দুঃখ একেবারে ভুলিয়া যাইত, সুখের সময়ে সরলার প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুইটী দেখিতে পাইলে সুখ দ্বিগুণ হইত। ছয় বৎসরকাল একত্র থাকিয়া তাহাদের স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ভালবাসার শেষ ছিল না। সরলা সময় পাইলেই অমলার নিকট যাইত, অমলা অবকাশ পাইলেই সরলার নিকট আসিত, কতদিন তাহারা দুইজনে মধ্যাহ্নে একত্র একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কোনও কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, কতদিন রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত দুইজনে নিভৃত স্থানে বসিয়া গল্প করিত। দুইজনের বিচ্ছিন্ন হইবার ইচ্ছা নাই, সুতরাং সে গল্পেরও শেষ নাই। ফলতঃ তাহাদিগের শরীর বিভিন্ন হইলেও একই মন, একই প্রাণ, একই হৃদয় ছিল।

সরলা বাটী আসিয়া দেখিল, মাতা ও ব্রহ্মচারী ঘর হইতে বাহির হইলেন। সরলা বলিল,— মা, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাও নাই?

মহাশ্বেতা। না মা, ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতেছিলাম, কথায় কথায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তোমার আজ ঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে,—সূর্য্য উঠিয়াছে।

সরলা। হাঁ মা, আজ ঘাটে বিশু পাগ্‌লী নামে এক স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। এই বলিয়া সরলা সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। তাহার মাতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর জন্য অনেক অন্বেষণ করাইলেন, কিন্তু তাহাকে আর দেখা গেল না।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। মহাশ্বেতা দৈনিক রীতানুসারে স্নানার্থ গমন করিলেন। কুটীরে সরলা একাকিনী কাজ করিতেছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিবশতঃই হউক, বা অনেকক্ষণ একাকিনী বলিয়াই হউক, সরলার মুখমণ্ডল যেন কিছু ম্লান বোধ হইতেছে, সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সরলার হৃদয়ে ছায়া ঘনীভূত হইতেছে। চিন্তা কিছুই নাই, দুঃখ কিছুই নাই, তথাপি হৃদয়-আকাশ যেন অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই, স্মৃতিতে কোন পরিতাপ নাই, অথচ হৃদয় আপনা হইতেই ভারগ্রস্ত। সম্মুখে চরকা ঘুরিতেছে, ললাটে ঈষৎ ঘর্ম্মবিন্দু দেখা যাইতেছে, সরলা একাকিনী বসিয়া কার্য্য করিতেছে ও অতি মৃদুস্বরে এক এক বার গান করিতেছে। অতি মৃদু গুন্‌ গুন্‌ শব্দে একটী খেদের গান এক বার, দুই বার, তিন বার সাঙ্গ হইল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

"সরলা!"

যিনি ডাকিলেন তিনি একজন যুবাপুরুষ, বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে। মুখমণ্ডল অতি সুশ্রী ও ঔদার্য্যব্যঞ্জক, কিন্তু ঈষৎ গম্ভীর ও ম্লান। কেশবিন্যাসে কিছুই যত্ন নাই, সুতরাং নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল অধুনা মালিন্য প্রাপ্ত হইয়া মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিতেছে। চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ, কিন্তু দারিদ্র্য, অথবা দুঃখ, অথবা চিন্তায় চতুষ্পার্শ্বে কালিমা পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, বক্ষঃস্থল আয়ত, বাহুযুগল দীর্ঘ, শরীর গম্ভীর ও শান্ত, অথচ তেজোব্যঞ্জক, আকৃতি দেখিলে সহসা বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ গীত হইতেছিল, আগন্তুক নিস্পন্দ-শরীরে পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন ও অনিমেষলোচনে সরলার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বোধ হয়,

যেন সরলার শোকাবহ গানে আগন্তুকের হৃদয়ে কোন শোক-চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া যুবক সরলার নাম উচ্চারণ করিলেন,—

"সরলা!"

সরলা হঠাৎ পশ্চাতে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিল,—"ইন্দ্রনাথ?"

ইন্দ্রনাথ। সরলা! তোমার সংসারে কি এতই বৈরাগ্য হইয়াছে যে, এরূপ শোকাবহ গান গাইতেছ?

সরলা। না, আমি মনে কিছুই ভাবি নাই, আমার মনে কোন ভাবনাই নাই, তবে আমি ঐ একটী ভিন্ন আর গান জানি না, সেই জন্য আমি ঐটী বার বার গাইতেছিলাম। সই আমাকে গান শিখাইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার কেবল ঐটী মনে লাগে, যখন একলা থাকি, তখন বসিয়া বসিয়া গাই। আমি কি জানি যে, তুমি লুকাইয়া শুনিতেছ? এই বলিয়া সরলা মুখ নত করিল। ক্ষণেক পর আবার বলিল,—মা পূজা করিতে গিয়াছেন, আমাদের দাসী হাটে গিয়াছে, সেই জন্য আমি একলা বাড়ীতে আছি। তুমি বস, দাসী এখনই আসিবে।

এতক্ষণ একাকিনী থাকিয়া সরলা যেরূপ ম্লান হইয়াছিল, চিরপরিচিত বন্ধুকে অনেকদিন পরে দেখিয়া সেইরূপ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। সরলার কি কথা? সরলচিত্ত বালিকার যে কথা, সরলা সেই কথাই কহিতেছিল। কখন মাতার কথা কহিতেছিল; কখন আপন কার্য্যের কথা কহিতেছিল; কখন ক্ষুদ্র উদ্যানে লইয়া গিয়া আপনি যে পুষ্পচারা রোপণ করিয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছিল। ইন্দ্রনাথ আগ্রহপূর্ব্বক তাহাই শুনিতে ও দেখিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে নিবিড় বৃক্ষাবলীর ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে আকাশ সুবর্ণবর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে বৃক্ষপত্রের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের আলোক দেখা যাইতে লাগিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্র উচ্চে আরোহণ করিয়া নীল আকাশে স্বর্ণ-আলোক বিস্তার করিল। সে আলোক সরলার সুগোল শরীর প্লাবিত করিল, সুন্দর বদনমণ্ডলের কিশোর ভাব বর্দ্ধন করিল, সহাসপরিপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় আরও মধুরিমাময় করিল, শান্তজ্যোতিঃ নয়নদ্বয় স্নেহরসে আপ্লুত করিল। ইন্দ্রনাথেরও মুখে কথা নাই, সস্নেহনয়নে সেই সুবর্ণ-পুত্তলীর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল, সেই সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল, সেই প্রেমপ্লাবিত নয়ন, সেই স্মিতমধুর ওষ্ঠাধর, সেই মোহন মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "সরলা!"

ইন্দ্রনাথের গম্ভীর স্বরে সরলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, তাঁহার ম্লান মুখ আরও ম্লান হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন,—সরলা! বোধ হয়, তোমার সহিত আমার এই শেষ দেখা। সরলার প্রফুল্ল নয়নে এক বিন্দু জল আসিল, সে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন, তুমি কি আর রুদ্রপুরে থাকিবে না?

ইন্দ্রনাথ। না; আমি আর রুদ্রপুরে থাকিব না; বোধ হয়, তুমি পরে কারণ জানিতে পারিবে।

সরলা। কেন, তোমার এ গ্রামে থাকিতে কোন ক্লেশ হইতেছে? তুমি কেন আমাদের বাড়ী থাক না? আমি মাকে বলিলে মা সম্মত হইবেন। আমাদের যাহা সামান্য আয় আছে, তাহাতে তোমার এখানে কোন কষ্ট হইবে না, স্বচ্ছন্দে থাকিবে।

ইন্দ্রনাথ। সরলা, তোমার দয়ার শরীর, তোমার স্নেহ অসীম। কিন্তু আমার খাইবার কষ্ট কিছুই নাই, আমি নবীন দাসের বাড়ীতে অতিথি হইয়া আছি, তোমার সই আমাকে বিশেষ যত্ন করেন, তাহাত তুমি জান। এখানে স্থান না হইলেও আমার থাকিবার অন্য স্থান আছে। আমি অন্য কারণে গ্রাম ত্যাগ করিতেছি।

সরলা। নিতান্তই কি গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে?

ইন্দ্রনাথ। সরলা, আমি চলিয়া গেলে কি তোমার মনে কষ্ট হইবে?

সরলা। কষ্ট হইবে না? আমাদের আর কে আছে বল?

ইন্দ্রনাথ। সরলা, তোমার মনের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু আমি কোনও প্রকারে আর এ গ্রামে থাকিতে পারি না। সরলা, বিদায় দাও; যদি বাঁচিয়া থাকি, যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, পুনরায় দেখা করিব; না হয়, এই শেষ।

ইন্দ্রনাথের মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না, সরলার প্রশান্ত নীলোৎপলসদৃশ চক্ষুতে

অশ্রু টল টল করিতে লাগিল। সরলা ইন্দ্রনাথকে ভ্রাতার মত ভালবাসিত, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভালবাসা আপন হৃদয়-কোরকে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানিত না; বিদায় দিতে এমন যাতনা হইবে, তাহা জানিত না।

সেই পৌর্ণমাসী রজনীতে, সেই নিভৃত উদ্যানে, উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া, উভয়ের হস্তধারণ করিয়া, পরস্পরের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন;—পরস্পর-দর্শন-সুধা সতৃষ্ণনয়নে পান করিতে লাগিলেন;—পরস্পরের বদনমণ্ডল দেখিয়া হৃদয়ের যাতনা কিছু কিছু প্রশমিত করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ স্নেহভরে সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

সরলা, আমি ধর্ম্মের গৌরবের জন্য, পাপের দণ্ডের জন্য, যাইতেছি। ভগবান আমাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। যদি তিনি সাহায্য করেন, তবে কাহাকে ভয়? অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়া আবার তোমারই নিকট আসিব।

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল,—যদি আইস, কবে আসিবে?

ইন্দ্রনাথ বলিলেন,—ছয় মাসের মধ্যে আসিব। আজি পূর্ণিমা, আজ হইতে সপ্তম পূর্ণিমা তিথিতে আবার তোমার সহিত দেখা হইবে। যদি না হয়, তবে জানিবে ইন্দ্রনাথ আর এ জগতে নাই।

এই কথা বলিতে বলিতে দ্বারদেশে শব্দ হইল। সরলা বুঝিল, দাসী আসিয়াছে। দ্বার খুলিয়া দিতে গেল। ইন্দ্রনাথ অনিমেষলোচনে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও মনে মনে বলিলেন,—

ভগবান, সহায় হও, যেন এই রমণীরত্ন লাভ করিতে পারি। যদি না পারি, এ হৃদয় শুষ্ক হইবে, এ জীবন মরুভূমি হইবে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : রুদ্রপুর পরিত্যাগ

AND there were sudden partings, such as press
The life from out young hearts, and choking sighs
That ne'er might be repeated. Who could guess,
If e'er again should meet those mutual eyes,
Since upon a night so sweet such awful morn
could rise.

—*Byron.*

রাজা সমরসিংহ রায় বঙ্গদেশীয় সমস্ত হিন্দু জমীদারদিগের সম্পদকালে পরমবন্ধু ও বিপদকালে অবলম্বন এবং আশ্রয় ছিলেন। তিনি নিজ সাহস ও বাহুবলে যে খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা স্বধর্ম্মাবলম্বী জমীদারদিগের গৌরব বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ বিপদকালে তাঁহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হন নাই, এ প্রকার জমীদার প্রায় বঙ্গদেশেই ছিল না। ইচ্ছাপুরের প্রজারঞ্জন জমীদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজা সমরসিংহের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। নগেন্দ্রনাথও রাজা সমরসিংহকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না।

রাজা সমরসিংহের মৃত্যুর পর বিধবা রাজ্ঞী ও রাজকুমারীর জন্য নগেন্দ্রনাথ অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ছদ্মবেশে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করাতে কেহই তাঁহাদের কোন সন্ধান পাইল না। বিশেষতঃ রাজা সমরসিংহের অপত্যের নিমিত্ত অধিক স্নেহ প্রকাশ করিলে দেওয়ান সতীশচন্দ্রের ক্রোধভাজন হইতে হইবে, এই বিবেচনায় আন্তরিক স্নেহও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংবৃত রাখিতে হইয়াছিল। মানবহৃদয়ে স্নেহরজ্জু অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী, স্বার্থপরতা যৎপরোনাস্তি প্রবল। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে নগেন্দ্রনাথ আপনার উন্নতিপথে ধাবিত হইতে লাগিলেন; যাহাতে ধন, মান, ক্ষমতা বর্দ্ধন হয়, যাহাতে

বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ও দেওয়ান মহাশয়ের প্রণয়ভাজন হইতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে অভাগা বিধবা ও অনাথা কন্যার কথা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। বৎসর মধ্যেই সে দুঃখের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলেন। রাজা সমরসিংহের যে বিধবা স্ত্রী ও অনাথা কন্যা আছে, তাহা নগেন্দ্রনাথের স্মরণপথ হইতে এককালে দূরীভূত হইল।

পাঠক মহাশয়, নগেন্দ্রনাথকে কৃতঘ্ন বলিয়া মনে করিবেন না। এই অখিল ভূমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করুন। ইহার মধ্যে কয় জন উপকারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য আপন পথে কাঁটা দেন, কয় জন পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণে আপন স্বার্থসাধনে বিরত হন? স্নেহ, দয়া, মায়া, এ সকল স্বর্গীয় পদার্থ। কিন্তু স্বার্থপরতা প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে স্নেহ কত দিন থাকে, মায়ার পাত্র নয়নের বহির্গত হইলে মায়া কত দিন থাকিতে পারে? আমরা যদি নগেন্দ্রনাথের প্রতি রাগ করিয়া থাকি, তবে নগেন্দ্রনাথকৃত অপরাধ হইতে আপনারা নিরস্ত থাকিতে যেন চেষ্টা করি। বোধ করি, অনেক দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্ব আমাদিগের মুখ চাহিয়া আছে, তাহাদিগকে যেন আশ্রয় দান করি; বোধ করি, অনেক অনাথা বিধবা যাতনায় ও কষ্টে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছে, স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহায়তা দানে যেন ধাবমান হই। এ দুঃখপূর্ণ সংসারে চারিদিকে যে দুঃখরাশি দেখিতে পাই, তাহা সমস্ত নিবারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য; কিন্তু যদি একজন ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিতে পারি, একজন তৃষ্ণার্ত্তকে স্নেহবারি দিয়া তুষ্ট করিতে পারি, একজন অনাথিনীর নয়নজল মোচন করিতে পারি, তবে এ কার্য্যক্ষেত্রে আমরা বৃথা জন্ম ধারণ করি নাই।

নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এ জগতে বৃথা জন্ম ধারণ করেন নাই। ধনবান জমীদারের পুত্র হইয়াও ধনে তাঁহার আদর ছিল না; উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন; কখন কখন কৃষকদিগের সহিত বাস করিতেন; সদাই কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষকদিগের গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সায়ংকালে কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জ্বলিত, যে সময়ে গো-শালায় গাভী সকল আসিয়া প্রবেশ করিত, কতবার তিনি কুটীরাবলীর পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্যে সন্তোষ, জ্ঞানশূন্যতায় দোষশূন্যতা, দুঃখ ও ক্লেশে তপস্বীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আলোচনা করিতেন, দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে যুগ যুগান্তরেও প্রজাদিগের অপরিবর্ত্তিত অবস্থা আলোচনা করিতেন। কতবার প্রজাদিগের সামান্য বিষয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেন,—অমুক গ্রামে একটী পুষ্করিণী খনন হইতেছে; অমুক গ্রামে ধান্য দুর্ম্মূল্য হইতেছে; এ স্থানের মহাজন বড় শিষ্ট লোক; ও স্থানের গোমস্তা বড় অত্যাচারী;—সুরেন্দ্রনাথ এই সকল কথাই আগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। এরূপ সময়ে তিনি আপন ধন-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেন; আপন কুলগৌরব বিস্মৃত হইতেন; সেই ধান্যক্ষেত্রবেষ্টিত, আম্রকানন-শোভিত কুটীরবাসীদিগকে আপন ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া ভ্রাতার মত তাহাদিগের সাহায্যে তৎপর হইতেন।

যখন মহাশ্বেতা বালিকা কন্যা লইয়া চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করেন, সুরেন্দ্রনাথ আপন পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া অনেক দিন অন্বেষণের পর তাঁহার সন্ধান পাইলেন। তৎকালে মহাশ্বেতা ইচ্ছামতী-তীরে মোহান্ত চন্দ্রশেখরের নিকট মহেশ্বর-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয়দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অভিমানিনী মহাশ্বেতা দরিদ্রাবস্থায়ও গর্ব্বিতা ছিলেন, সহায়তা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বার বার উপরোধ করিলেন, কিন্তু মহাশ্বেতা বার বার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—রাজা সমরসিংহের বংশ এই দরিদ্রাবস্থায়ও মাননীয়, পরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। এ কথায় সুরেন্দ্রনাথ অগত্যা উপরোধ হইতে নিরস্ত হইলেন। অবশেষে বলিলেন,—আপনার স্বামীর নিকট আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক বিষয়ে ঋণগ্রস্ত আছি, এই অসময়ে যদি কোন প্রত্যুপকার না করিতে পারিলাম, তবে চিরকাল আমার জন্ম বিফল মনে করিব। অতএব যদি আমাদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ না করেন, বলুন, আর কি প্রকারে আপনার উপকার করিতে পারি? মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন,—তবে তোমার জমীদারীর মধ্যে আমাকে থাকিবার স্থান দান কর, আমি বৎসরে বৎসরে তাহার খাজনা দিব, আর কোন নদীতীরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেও, তথায় প্রতিরাত্রে পূজা করিব। ইহা ভিন্ন আমার প্রার্থনীয়

আর কিছুই নাই। সুরেন্দ্রনাথ রুদ্রপুর গ্রামে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং সেই অবধি মহাশ্বেতা ও তাঁহার কন্যা তথায় থাকিতেন।

যে সময় সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখরের নিকট গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ছদ্মবেশ, তখনই তিনি ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশেই তিনি দেশে দেশে অনুসন্ধান করিয়া মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, ছদ্মবেশেই তাঁহার সহিত সেই নিস্তব্ধ আশ্রমে সরলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইচ্ছামতী-তীরে কতবার তিনি বালিকাকে খেলা দিয়াছেন; কতবার তাহাকে গল্প বলিয়াছেন, কতবার তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিয়াছেন। এইরূপে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথ ও সরলার মধ্যে সোদর সোদরার প্রেম জন্মিয়াছিল। তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাব অন্তরে উদয় হইয়াছে, তাহা অদ্যকার এই পূর্ণিমার রজনীর পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারেন নাই।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় মহাশ্বেতা পূজা সমাধা করিয়া গৃহে আসিলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট বিদায় লইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। ইন্দ্রনাথ বলিলেন,—

আপনি যে দৃঢ় ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সতীশচন্দ্রের নিধন সাধন না করিলে বোধ হয়, আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পাইব না।

মহাশ্বেতা। পাইবে না।

ইন্দ্রনাথ। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি অদ্যই সেই অভিপ্রায়ে যাত্রা করিতেছি! আশীর্ব্বাদ করুন, অবশ্যই মনোরথ সিদ্ধ হইবে।

মহাশ্বেতা। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দেবদেব মহেশ্বর তোমার যত্ন সফল করুন। কিন্তু তুমি বালক, সেই চতুর বুদ্ধিকুশল দেওয়ানকে কিরূপে পরাস্ত করিবে, আমার বুদ্ধির অগোচর।

ইন্দ্রনাথ। অধুনা আমারও বুদ্ধির অগোচর, দেখা যাউক কি হয়।

মহাশ্বেতা। অবশ্যই তোমার জয় হইবে,—ধর্ম্মের যদি জয় না হয়, তবে এ সংসার ছারখার হইবে, কেহ আর ভগবানের আরাধনা করিবে না।

ইন্দ্রনাথ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—ধর্ম্মের যদি সর্ব্বদা জয় হইত, তবে আপনার স্বামী নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, সতীশচন্দ্রও বঙ্গদেশের দেওয়ান হইতেন না, মানবজাতি কখন ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিত না। যখন চারিদিকে পাপের গৌরব দেখিতেছি; যখন অত্যাচারী ও কপটাচারিগণ ধন, মান, ঐশ্বর্য্য লাভ করিতেছে; যখন পরমধার্ম্মিক, পবিত্রচেতা, পরোপকারিগণ নিষ্পীড়িত ও পদদলিত হইতেছেন; তখন আর সংসারের ছারখার হইবার বাকী কি? যদি সদাই ধর্ম্মের জয় থাকিত, তাহা হইলে পাতক ও কপটাচরণ এ সংসার হইতে একেবারে দূরীভূত হইত। তথাপি কেন যে অধর্ম্মের জয় হয়, কে বলিবে? ভগবানের লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে?

পরে মহাশ্বেতা বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর কথা ইন্দ্রনাথকে বলিলেন। ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এই পাগলিনী মানুষী, কি যোগিনী, কি প্রেতকন্যা, বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহার কথা কখনও মিথ্যা হয় নাই।

মহাশ্বেতা। কখনও মিথ্যা হয় নাই। আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিয়াছিল। আমি স্বামীকে সবিশেষ অবগত করাইয়া সপরিবারে পলাইবার উপদেশ দিলাম। সেই বীরপুরুষ যে উত্তর দিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপথে অদ্যাপি জাগরিত রহিয়াছে। বলিলেন,—ঘোর সংগ্রামস্থলে হিন্দু কি মুসলমান, মোগল কি পাঠান, কেহ কখন সমরসিংহকে পলায়ন করিতে দেখে নাই,—আজি পামর সতীশচন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিব? মরিতে হয় মরিব, যোদ্ধার তাহাতে ভয় কি?

ইন্দ্রনাথ বলিলেন,—সেইবার ভিন্ন আরও দুই তিন বার ঐ পাগলিনী যে যে কথা বলিয়াছে, তাহা সত্য হইয়াছে। আমার পরামর্শে আপনাদিগের এই গ্রাম হইতে পলায়ন করা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই।

মহাশ্বেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। উক্ত পাগলিনী দুই তিন বার এই প্রকার সহসা দেখা দিয়া যে যে ভবিষ্যৎ কথা বলিয়াছিল, কখনও মিথ্যা হয় নাই। তিনি অন্তরে নিশ্চয় জানিলেন যে, সেই পামর সতীশচন্দ্র আবার সমরসিংহের নিরাশ্রয় বিধবার অনিষ্টচেষ্টা করিতেছে, পাগলিনী মানুষী হউক বা প্রেতকন্যা হউক, জানিতে পারিয়া সতর্ক করিবার জন্য আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—অদ্যই পলায়ন করা শ্রেয়ঃ, উপায়ান্তর নাই।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোথায় যাইবেন,—আমার আলয়ে কি আপনাকে আহ্বান করিতে পারি?

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন,—মহেশ্বর-মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্রশেখরের নিকট পুনর্ব্বার যাইব। ইন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন, কোন উত্তর করিলেন না। তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগে গমন করিলেন।

মহাশ্বেতা সরলাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া সবিশেষ বলিলেন। সরলার বালিকা-মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। রুদ্রপুর গ্রামে ছয় বৎসর কাল থাকিয়া সকল দ্রব্যে মায়া হইয়াছিল। সেই পরিপাটী কুটীর, সেই উদ্যান, সেই স্বহস্তরোপিত পুষ্পচারা, সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া আর রুদ্রপুরের পক্ষীদিগের সুললিত গান শুনিতে পাইবে না, দুই প্রহরে সেই আম্রবৃক্ষের নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ ছায়াতে উপবেশন করিয়া আর কার্য্য করা হইবে না, সন্ধ্যায় অমলার সেই সুমধুর হাস্যবিকসিত মুখ আর দেখিতে পাইবে না। অমলার কথা স্মরণ হওয়াতে চক্ষুতে জল আসিল, বলিল,—

মা, আমি সইয়ের নিকট বিদায় লইয়া আসি। মহাশ্বেতা বলিলেন,—যাও মা, কিন্তু শীঘ্র আসিও।

সরলা বিদায় লইতে চলিল।

অমলার গৃহের নিকট যাইয়া ডাকিল, "সই!" প্রফুল্লবদনা অমলা গৃহের বাহিরে আসিল। কি তামাসা করিবে বলিয়া তাহার অধরোষ্ঠে হাসি দেখা দিতেছে; কিন্তু সরলার মুখপানে চাহিয়া অমলার প্রফুল্লমুখ গম্ভীর হইল; অধরের হাসি শুকাইয়া গেল। দেখিল, সরলার নয়নযুগল জলে ছল্ ছল্ করিতেছে, টস্ টস্ করিয়া বক্ষঃস্থলে জল পড়িতেছে। অমলা নিকটে আসিয়া স্নেহভরে হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি সই, কি হইয়াছে?

সরলা উত্তর করিল,—মা বলিয়াছেন, আমরা এই গ্রাম হইতে অদ্যই চলিয়া যাইব, তোমার সঙ্গে বোধ হয়, এই শেষ দেখা,—এই বলিয়া সরলা অমলার বক্ষঃস্থলে আপন মুখ লুকাইয়া দরবিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সহসা এই কথা শুনিয়া অমলার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হইল। প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু সরলার অবস্থা দেখিয়া সন্দেহেরও স্থল থাকিল না। তখন অমলা অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, চক্ষুজলে সরলার কেশ সিক্ত করিল।

অনেকক্ষণ পর কষ্টে চিত্তসংযম করিয়া অমলা বলিতে লাগিল,—সেকি সই? আমার সঙ্গে আবার শেষ দেখা? তুমি যেখানে থাকিবে, আমি সেইখানে যাইয়া তোমার সহিত দেখা করিব। এক্ষণে এ স্থান হইতে তোমরা কেন যাইবে, বল দেখি?

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল,—তাহা আমি জানিনা; মা তাহা বলেন নাই; কিন্তু আমরা ইচ্ছামতী-তীরে মহেশ্বর-মন্দিরে যাইতেছি।

অমলা বলিল,—তা মহেশ্বর-মন্দির আর রুদ্রপুর ত এপাড়া ওপাড়া, প্রত্যহ যাইয়া তোমায় দেখিয়া আসিব। তার জন্য আবার ভাবনা কিসের?

ক্ষণেক পর অমলা বলিল,—দাঁড়াও সই, আমি শীঘ্রই আসিতেছি,—বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। শীঘ্র বাহিরে আসিয়া সরলার কাপড়ের অঞ্চলে কি বাঁধিয়া দিল। সরলা জিজ্ঞাসা করিল,—কি দিলে সই? অমলা উত্তর করিল,—ও কিছু নহে, পথে ক্ষুধা পাইবে, সেই জন্য কিছু মুড়ি আর ফুটকড়াই আঁচলে বাঁধিয়া দিতেছি। আমার মাথা খাও, ফেলিয়া দিও না। এই বলিয়া কাপড়ে ১০টী রৌপ্যমুদ্রা বাঁধিয়া দিল।

বিদায়ের সময় অমলা সইয়ের হাত ধরিয়া বলিল,—সই, কিছু ভাবিও না, আমি মহেশ্বর-মন্দিরে শীঘ্র তোমার সহিত দেখা করিতে যাইব। আর পাছে ইহার মধ্যে আমাকে ভুলিয়া যাও, সেই জন্য আমার একটী চিহ্ন তোমার গায়ে রাখিয়া দি। এই বলিয়া আপন গলদেশ হইতে সোণার চিক লইয়া সরলার গলায় পরাইয়া দিতে গেল। সরলা বাধা দিবার চেষ্টা করিল, তাহাতে অমলা বলিল,—যদি না লও, তবে আমি জানিব, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ;—যদি আমাকে কখন ফিরাইয়া দিতে চাহ, তবে জানিব, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। সরলা নিরুত্তর হইল। অমলা তাহাকে সেই চিক পরাইয়া দিল এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রিয় সইকে বিদায় দিল।

এদিকে ইন্দ্রনাথ নৌকা ঠিক করিলেন। মহাশ্বেতা, সরলা ও ইন্দ্রনাথ সেই নৌকায় আরোহণ

করিলেন। নৌকা ধীরে ধীরে ইচ্ছামতী নদী দিয়া চলিতে লাগিল। কোন কোন স্থানে নদী প্রশস্ত হইয়াছে, উভয় পার্শ্বে প্রান্তর, অটবী ও গ্রামস্থ বৃক্ষলতাদি চন্দ্রালোকে অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে নদী এমন সংকীর্ণ হইয়াছে যে, উভয় পার্শ্বস্থ বংশশাখা লম্বিত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাহার নিবিড় পত্ররাশির মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে ইচ্ছামতীর স্বচ্ছ সলিল উজ্জ্বল করিতেছে। ইচ্ছামতীর নীল জল কল্ কল্ করিতেছে ও তাহার উপর দিয়া ক্ষুদ্র তরী তর্ তর্ করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সরলা এই প্রকার শোভা সন্দর্শন ও শ্রুতিমধুর শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই নিদ্রিত হইল। ইন্দ্রনাথ নিকটে উপবেশন করিয়া সমস্ত রাত্রি আপনি অনিদ্র হইয়া সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোক-দীপ্ত মুখমন্ডল দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে নৌকা ইচ্ছামতী-তীরস্থ এক ক্ষুদ্র গ্রামে লাগিল। সেই গ্রাম প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দির হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূর ও চারিদিকে কাননে বেষ্টিত, সেই জন্য উহাকে বনগ্রাম বলিত। মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য পূজক সময়ে সময়ে মন্দির হইতে আসিয়া এই গ্রামে বাস করিত। আরোহিগণ নামিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করিয়া চন্দ্রশেখরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিমলা

Now naught was heard beneath the skies,
The sounds of busy life were still,
Save an unhappy lady's sighs,
That issued from the lonely pile.
—*Mickle.*

সন্ধ্যাকাল সমাগত। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর ভীমকান্তি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। যমুনা নদী চতুর্দ্দিককে দুর্গ বেষ্টন করিয়া কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। দুর্গের চারিদিকের দৃশ্য অতি রমণীয়। সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, মনোহর হরিৎ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও পশ্চিম মেঘে রক্তিম আভা দেখা যাইতেছে। দুর্গপাদচারিণী, শান্ত প্রবাহিণী নদীর নির্ম্মল বক্ষে সেই আভা প্রতিফলিত হইতেছে। সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে অবতরণ করিতেছে; অবতরণ করিয়া সায়ংকালীন নিস্তব্ধতাকে অধিকতর মনোহর করিতেছে। প্রান্তরে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে বায়ুহিল্লোলে দূরস্থ পল্লীর ক্রমশঃ মন্দীভূত রব শ্রুত হইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে পরিশ্রান্ত গৃহাভিমুখগামী কৃষকদিগের শ্রমাপনোদন গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে।

দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ এরূপ নহে। তথায় একটী প্রশস্ত আম্রকানন; উহা এত প্রশস্ত যে, দুর্গ হইতে সেই আম্রবৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।

যেমন অন্ধকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সেই আম্রবৃক্ষের ভিতর পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা দেখা দিতে লাগিল; নিকটে, দূরে, উচ্চে, নীচে সেই খদ্যোৎমালা খেলা করিতে লাগিল। উদ্যানের ভিতর সুন্দর সরোবর, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে, সরোবরের চারিদিকে নানাপ্রকার কীট পতঙ্গ স্ব স্ব রবে সায়ংকালের কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে।

বাহির হইতে দেখিলে দুর্গের উচ্চ প্রাসাদ সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃত,—কেবল একমাত্র গবাক্ষ হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। সেই গবাক্ষপার্শ্বে এক অল্পবয়স্কা রমণী আসীনা,—হস্তে গন্ডদেশ স্থাপন করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন।

রমণী গগনমন্ডলের একমাত্র উজ্জ্বল তারার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারও সুন্দর সীমন্তে একমাত্র উজ্জ্বল হীরকখন্ড ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

রমণীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ হইবে,—যৌবনে সর্ব্ব অঙ্গ অসাধারণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু এ সাধারণ নারীজাতির সৌন্দর্য্য নহে। সে রূপরাশির সম্মুখে দাঁড়াইলে সহসা প্রেমের সঞ্চার হয় না, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঞ্চার হয়। শরীর ক্ষীণ, উন্নত ও দীর্ঘায়ত, অথচ কোমলতা পরিপূর্ণ। ললাট অতি সুন্দর সুবঙ্কিম, অথচ উচ্চ ও প্রশস্ত; এরূপ প্রশস্ত ললাট

পুরুষের কদাচিৎ দেখা যায়, স্ত্রীলোকের কখনই সম্ভবে না। নয়নের স্থির উজ্জ্বলতা, ওষ্ঠের সুচিক্কণতা, সমস্ত বদনের উন্নত, গম্ভীর ভাব, হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে; সমস্ত অবয়বের ভাবভঙ্গী দেখিলে হঠাৎ প্রতীয়মান হয় যে, এ তীক্ষ্ণ জ্যোতির্ম্ময়ী তন্বঙ্গী মানুষী নহেন,—কোন যোগপরায়ণা স্বর্গবাসিনী মানবজাতির উন্নতি সাধনার্থ এই মর্ত্ত্য জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

সেই নিস্তব্ধ সায়ংকালে গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া রমণী সেই সুন্দর নির্ম্মল আকাশপথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রমণীর বদনমন্ডলও অপরূপ সুন্দর ও নির্ম্মল। রজনী গভীর হইতে লাগিল; আকাশের বিস্তীর্ণ নীলবর্ণ ক্রমে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; রমণীর হৃদয়েও যেন চিন্তারজনী গভীর হইতে লাগিল। তাঁহার প্রশস্ত ললাটও যেন ক্রমশঃ ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল অধিকতর কুঞ্চিত হইতে লাগিল; নয়ন হইতে তীক্ষ্ণতর উজ্জ্বলতর জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল।

এই সময়ে একজন পুরুষ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, “বিমলা!” বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা সতীশচন্দ্র আসিয়াছেন।

যে পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে না; কিন্তু আকার দেখিলে সহসা ষষ্টি বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। মস্তকের অধিকাংশ কেশ শুক্ল, ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত, শরীরের চর্ম্ম শিথিল, সর্ব্ব অঙ্গ ক্ষীণ, তথাপি চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতির্ম্ময় ও মুখমন্ডলে চিন্তাদেবী সততই অধিষ্ঠান করিতেছেন। ধীর আচরণ, ধীর গমনাগমন, ধীর অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসঞ্চালন। নানারূপ বহুদূরদর্শিনী বহুদূরব্যাপিনী কল্পনাতে তাঁহার জীবন ও অন্তঃকরণ চিরকালই পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে ঈষৎ হাস্যসহকারে ডাকিলেন, “বিমলা!”

বিমলাও পিতাকে দেখিয়া আপন গভীর ভাবনা কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। বদনমন্ডলে গম্ভীরভাব ক্রমে অপনীত হইয়া পবিত্র পিতৃস্নেহের আবির্ভাব হইল। পিতা কক্ষে আসিয়াছেন, অনবধানতা বশতঃ এতক্ষণ দেখিতে পান নাই, মনে করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। সতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিমলা! এত কি দুঃখ হইয়াছে যে, মৌনভাবে এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছ?

বিমলা উত্তর করিলেন,—আপনি কল্য দুর্গ ত্যাগ করিবেন, কতদিন আপনাকে দেখিতে পাইব না, কতদিন এই প্রকান্ড দুর্গ শূন্য থাকিবে; সে চিন্তায় আমার মন অস্থির হইয়াছে, আমি আপন মন শান্ত করিতে পারিতেছি না।

পিতা উত্তর করিলেন,—সে কি বিমলা, কেন মিথ্যা ভাবনা করিতেছ? আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব; আমি কি তোমাকে ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে পারি?

বিমলা। পিতা, আপনি যে আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন তাহা জানি,—পিতা কন্যাকে ইহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারে না।

সতীশ। তবে চিন্তা করিতেছ কেন? আমি ত প্রতিবৎসরই একবার রাজধানী যাইয়া থাকি, এবার তোমার বিশেষ চিন্তা কেন?

বিমলা। প্রতিবৎসর আমার এ প্রকার ভাবনা হয় না; এবার সহসা হৃদয়ে ভয় হইয়াছে, কেন জানি না। পিতা, আপনি গৃহে থাকুন, কোথাও যাইবেন না।

শেষ কথাগুলি অতি অর্দ্ধস্ফুট মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইল—শুনিয়া সতীশচন্দ্রের হৃদয়ও যেন আহত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন,—

বিমলা, কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ, আমাকে যাইতেই হইবে, যাইবার সময় রোদন করিও না।

বিমলা উত্তর করিলেন,—পিতা, মিথ্যা ভয় নহে, কল্য রজনীযোগে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, বোধ হইল যেন স্বর্গীয়া মাতা দেখা দিলেন, সাশ্রুলোচনে যেন অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, “মা, সাবধান! ঘোর বিপদ্ সমাগত!” এখনও বোধ হইতেছে, তাঁহার শুষ্ক মুখখানি,—তাঁহার অশ্রুপূর্ণ লোচন দুইটী দেখিতে পাইতেছি। কি পাপ করিয়াছি, বলিতে পারি না; কি পাপে স্নেহময়ী মাতাকে হারাইলাম, জানি না; আবার কি ঘোর বিপদ্ সমাগত, ভগবানই জানেন। পিতা, ক্ষমা করুন। আমার ভাবনা হইতেছে, আপনি প্রস্থান করিলে আর এ আলয়ে প্রত্যাগমন করিবেন না।

এই বলিয়া বিমলা বাষ্পাকুলিতলোচনে পিতার নিকট যাইয়া তাঁহার হৃদয়ে আপন বদনমণ্ডল লুকাইলেন। বিমলার যদি স্থিরভাব থাকিত, দেখিতে পাইতেন যে, পিতারও মুখমণ্ডল সহসা বিকৃতি ধারণ করিয়াছিল। স্বপ্নকথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন,—যেন ভয়াবহ কোন পূর্ব্বকথা হৃদয়ে সহসা জাগরিত হইল, যেন কোন গূঢ় পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেইক্ষণেই আরম্ভ হইল। যখন বিমলা পিতার হৃদয়ে মুখ রাখিয়া রোদন করিতেছিলেন, পিতার সান্ত্বনা করিবার আর ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই সতীশচন্দ্র আপন চিত্তসংযম করিয়া স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন,—

বিমলা, এ সকলই তোমার মিথ্যা ভয়। দিবাযোগে তুমি কেবল মিথ্যা চিন্তা কর, তাহাতেই রজনীযোগে সেই প্রকার ভয়ের স্বপ্ন দেখ। আমি দেখিয়াছি, গত কয়েক দিন অবধি তুমি কেবলই চিন্তামগ্ন রহিয়াছ, আমাকে যথার্থ করিয়া বল, সে মহাচিন্তার কারণ কি?

বিমলা ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—পিতা, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অবশ্যই তাহার উত্তর করিব; আপনার নিকট লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই। আপনিই সে মহাচিন্তার কারণ। অদ্য প্রায় এক মাস হইতে আপনাকে কোন গভীর দুঃখে বা চিন্তায় মগ্ন দেখিতেছি, দিন দিন সেই চিন্তা গাঢ়তর হইতেছে। আপনার আহারের সময় খাদ্যদ্রব্যে মন থাকে না, রজনীকালে আপনার নিদ্রা হয় না, যদি নিদ্রা হয়, সে কুস্বপ্ন-পরিপূর্ণ। আমি কতবার দিবাযোগে লুকাইয়া আপনার কক্ষে গিয়াছি; যতবার যাই, দেখি, আপনি সেই চিন্তায় মগ্ন। নিশিযোগে আমি কতবার আপনার শয়নগৃহে গিয়াছি, যখন যাই, দেখি কোন কুস্বপ্নে আপনার ললাট কুঞ্চিত ও বদন বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। কি ঘোর চিন্তায় আপনাকে এ প্রকার যাতনা দিতেছে? সামান্য জমীদার, সামান্য কৃষকও দৈনিক পরিশ্রমের পর রজনীতে বিশ্রাম লাভ করে, বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের কি সে বিশ্রামে অধিকার নাই?

বিমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন, দেখিলেন, পিতা স্থিরভাবে তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ করিতেছেন, পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

গত এক মাস অবধি আপনার নিকট এত চর আসিতেছে কেন? চর এত গুপ্তভাবে আসিয়া এবং গুপ্তভাবে চলিয়া যায় কেন? দিবারাত্রি আপনিই বা কোন্ গুপ্ত পরামর্শে ব্যস্ত আছেন? বঙ্গদেশের দেওয়ানের কার্য্যের ভার অতি গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের সুশাসন ও প্রজার মঙ্গল যে কার্য্যের উদ্দেশ্য, সে কার্য্য ও সে পরামর্শ কি রজনী দ্বিপ্রহরের সময় গৃহের কবাট রুদ্ধ করিয়া কতকগুলি নিভৃত চরের সহিত সিদ্ধ হয়? বালিকার এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, যদি আমি অপরাধ করিয়া থাকি, পিতা মার্জ্জনা করুন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ; বিবেচনা করিয়া দেখুন, খলস্বভাব সর্পেরই গতি বক্র; উদারচিত্ত মনুষ্যের গতি সরল। যাঁহার চরিত্র সরল, যাঁহার উদ্দেশ্য সরল, তাঁহার গতি বক্র হইবে কেন? পিতা, বালিকার কথায় অবধান করুন, কপট লোকের পরামর্শ ত্যাগ করুন, ধর্ম্মের পথ,—সরল পথ অবলম্বন করুন, তাহা হইলে কাহাকেও ভয় থাকিবে না, কোন চিন্তা থাকিবে না। পাপপথে সর্ব্বদাই ভয়, ধর্ম্মপথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক।

বলিতে বলিতে বিমলার উদার ললাট ও বদনমণ্ডল অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাঁহার উজ্জ্বল নয়নযুগল হইতে উজ্জ্বলতর আভা বহির্গত হইতে লাগিল। বিমলা অতিশয় পিতৃবৎসলা কন্যা, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে নৈসর্গিক গৌরব ও ধর্ম্মবল বিরাজ করিত। সেই গৌরবের আবির্ভাব হইলে জনাকীর্ণ রাজসভায় যিনি শত শত বার বাকপটুতার জন্য প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকার কথায় তিনি নিরুত্তর হইতেন।

“পাপপথে সর্ব্বদাই ভয়, সরল ধর্ম্মপথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক”, এই কথা অর্দ্ধস্ফুটবচনে উচ্চারণ করিতে করিতে সতীশচন্দ্র সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ পাপিষ্ঠে পাপিষ্ঠে

> TRY what repentance can; what can it not?
> Yet what can it when one cannot repent?
> O wretched state! O bosom black as death!
> O limed soul that struggling to be free,
> Art more engaged. Help angels, make assay!
> Bow stubborn knees! and hearts
> with strings of steel,
> Be soft as sinews of the new-born babe,
> All may be well.
>
> —*Shakespeare.*

সতীশচন্দ্র বাহিরে আপন কক্ষে যাইলেন। ভৃত্য প্রভুর সেবা করিতে আসিল, সতীশচন্দ্র তাহাকে মুষ্টি প্রহার করিয়া বলিলেন,—শকুনিকে ডাক্। ভৃত্য বেগে প্রস্থান করিল।

বাহিরের কক্ষ অতি প্রশস্ত ও অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। গৃহতল অতি সুচারু চিত্রশোভিত বস্ত্রে মণ্ডিত; প্রতিদ্বারে, প্রতিবাতায়নে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে; স্থানে স্থানে স্তূপাকারে পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে; সম্মুখে সুগন্ধ তৈলপূর্ণ দীপ জ্বলিতেছে; দীপের চতুষ্পার্শ্বে আবার পুষ্পগুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে। সতীশচন্দ্রের উপবেশন স্থান মহার্হ রক্তবস্ত্রে মণ্ডিত,—সেই সুন্দর কক্ষে, সেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত, মহাধনসম্পন্ন, রাজাধিরাজ দেওয়ান সতীশচন্দ্র আজি বিষণ্ণবদন কেন?

পাঠক যদি আমাদের মত দরিদ্র লোক হয়েন, যদি ঈর্ষাপরবশ হইয়া কখন "বিষয়ী" লোকের বিষয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, কখন যদি সতৃষ্ণ নয়নে রাস্তা হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বাবুর বৈঠকখানার ঝাড়লণ্ঠনের প্রতি নয়নপাত করিয়া থাকেন, যদি কখন অর্থের আবাসস্থানকে সুখের আবাসস্থান মনে করিয়া থাকেন, তবে আসুন একবার লক্ষপতি সতীশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া মন শান্ত করি,—লোভ দূর করি।

সতীশচন্দ্রের হৃদয় পাপে কলুষিত, পাপান্ধকারে আবৃত, সেই পাপরাশির মধ্যে একটীমাত্র পুণ্য ছিল,—বিমলার প্রতি নির্ম্মল অপত্যস্নেহ সূক্ষ্ম আলোক-রেখার ন্যায় সেই পাপান্ধকারের মধ্যে দেখা যাইত। কন্যাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন, কন্যাকে অতি স্নেহের সহিত লালনপালন করিতেন, স্ত্রীবিয়োগের পর অবধি কন্যার সহিত অনেক সময়ে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন, বিষয়-কর্ম্মের কথাও কন্যার সহিত আলোচনা করিতেন, এই জন্যই কন্যাও কখন কখন পিতাকে বন্ধুর মত উপদেশ দিতে সাহস করিতেন। বিমলাও অতিশয় স্নেহবতী কন্যা, পিতার সুখবর্দ্ধন ভিন্ন তাঁহার আর কোন লালসা ছিল না। কিন্তু নিতান্ত স্নেহবতী হইয়াও বিমলা উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা ও মানিনী; পিতাকে কপটাচারী দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইতেন। আলোকের উদয়ে অন্ধকার লীন হয়, সত্যের ও সরলতার সম্মুখে পাপ ও কপটতা স্বভাবতঃ ভীত হয়, বিমলার সম্মুখে সতীশচন্দ্র নিরুত্তর হইতেন। সতীশচন্দ্রের চরিত্র কতদূর পাপে কলুষিত, তাহা বিমলা জানিতেন না; ভক্তিভাজন পিতার চরিত্রে যে অধিক পাপ আছে, তাহা বিমলার নির্ম্মল অন্তঃকরণে একবারও স্থান পায় নাই; তথাপি পিতার আচার-ব্যবহার দেখিয়া সম্প্রতি বিমলার চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দুলিত হইয়াছিল ও সেই সন্দেহ তাঁহার যারপরনাই যাতনার কারণ হইয়াছিল।

কখন কখন একটী ঘটনাতে, বা একটী কথাতে, বা একটী সঙ্গীতে, সহসা আমাদের হৃদয়ের কবাট খুলিয়া যায়, সাগরতরঙ্গের ন্যায় অনন্ত চিন্তালহরীতে হৃদয় সহসা প্লাবিত হয়, বহুকালের বিস্মৃত কথা সহসা স্মরণপথে উদয় হয়। স্নেহবতী কন্যার সস্নেহ তিরস্কার-বচনে যেন সেই প্রকার হইল। সতীশচন্দ্রের হৃদয়কেন্দ্র ব্যথিত হইল, সহস্র চিন্তায় প্লাবিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল। শৈশবকালে যে খেলা করিয়াছিলেন, বাল্যকালে যে অধ্যয়ন

করিয়াছিলেন, সে সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। যে বিদ্যালাভ তাঁহার পক্ষে বিষময় ফল ধারণ করিয়াছিল, সেই বিদ্যালাভের আরম্ভ-কথা মনে জাগরিত হইতে লাগিল। সমবয়স্কদিগের সহিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, অধ্যয়নের পর সেই বয়স্যদিগের সহিত নিষ্পাপ, নিশ্চিন্ত চিত্তে ক্রীড়া রহস্য করিতেন। আজি তিনি বঙ্গদেশের একজন প্রধান লোক,—লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিপতি। সেই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলে কি এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই নিষ্পাপ, নিশ্চিন্ত চিত্ত ফিরিয়া পাওয়া যায়?

বাল্যকাল অতীত হইল, যৌবনকাল সমাগত। সেই যৌবনকালে তাঁহার স্মৃতিপথে কি গভীর পাপরেখা অঙ্কিত হইয়াছে! বিদ্যাদর্প, তাহার পর ধনদর্প, তাহার পর প্রবল দুর্দ্ধর্ষ উচ্চাভিলাষ! তাঁহার পক্ষে সেই কাল উচ্চাভিলাষ কি ভয়ানক বিষময় ফল ধারণ করিয়াছে।

তাহার পর সেই প্রজারঞ্জক মহানুভব বীরপুরুষ রাজা সমরসিংহের কথা সতীশচন্দ্রের পামর হৃদয়ে উদিত হইল। যে মহাত্মা বঙ্গদেশের গৌরবস্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, প্রজাদিগের পিতাস্বরূপ ছিলেন, জমীদারদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাস্বরূপ ছিলেন, কায়স্থকুলের নেতাস্বরূপ ছিলেন, সতীশচন্দ্র তাঁহার প্রাণসংহার করাইয়াছেন! সমরসিংহের শোণিতাপ্লুত ছিন্নমস্তক তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল, সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন, যেন সেই শোণিতাপ্লুত ছিন্নমস্তক বিকৃতি-ধারণ-পুরঃসর তাঁহার দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছে, যেন বলিতেছে, "পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই।" সতীশচন্দ্র সম্মুখে আর চাহিতে পারিলেন না, দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন। রে মূর্খ! স্মৃতি-দীপ অত শীঘ্র নির্ব্বাণ হয় না।

ঘোর অন্ধকারে বসিয়া সতীশচন্দ্র কি চিন্তা করিতেছেন? কাহার সাধ্য সে চিন্তা অনুভব করে। সহস্র বৃশ্চিক-দংশনাপেক্ষা সে চিন্তা ক্লেশদায়িনী। যাতনায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন,—এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? যদি থাকে, হৃদয়ের শোণিত দিয়াও তাহা করিব। ভগবন! সহায় হও, এখনও বালিকার কথা শুনিয়া কার্য্য করিব, এখনও ধর্ম্মপথে ফিরিতে চেষ্টা করিব। সত্য কথা স্বীকার করিব, পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিব, যদি ক্ষমা না পাই, আমার অকিঞ্চিৎকর শোণিত দিয়া সমরসিংহের রক্তপ্রবাহ বর্দ্ধন করিব।

পরক্ষণেই শকুনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন,—এ কি? অন্ধকারে একাকী বসিয়া আছেন কেন?

সতীশচন্দ্র অতিশয় গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—আলোক সহ্য করিতে পারি না, হৃদয়ে দুর্ভেদ্য অন্ধকার ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমার জীবনালোকও শীঘ্র অনন্ত অন্ধকারে লীন হইবে, আমার লীলাখেলা সাঙ্গপ্রায়।

শকুনি এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, ভৃত্যকে আলোক আনিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্য শীঘ্র আলোক আনিয়া পুনরায় কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—শকুনি! তোমার পরামর্শেই আমি এতদূর কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে কি ফল হইল? আমার পরকাল অনেক দিনই গিয়াছে, এক্ষণে ইহকালেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এই পাপরাশিতে, এই বিপদরাশিতে তুমিই আমাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ, এক্ষণে আর কি করিবে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন উন্নতিশালী লোকের সর্ব্বনাশ কল্পনা কর; আমিও ঘোর পাপের যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তাহাতে প্রবৃত্ত হই।

শকুনি প্রভুর গম্ভীরস্বর শুনিয়া চমকিত হইলেন। বুঝিলেন, প্রভুর হৃদয়ে সামান্য ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয় নাই; দুই চারি কৈতব অশ্রুবিন্দু দেখাইয়া শকুনি উত্তর করিলেন,—

প্রভুর গৌরবকালে তাঁহারই স্নেহভাজন হওয়া ভিন্ন আমার অন্য অভিলাষ ছিল না, যদি যথার্থই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, প্রভুর সর্ব্বনাশের ভাগী হওয়া ভিন্ন আমার দ্বিতীয় অভিলাষ নাই।

সতীশ। শকুনি! তোমার কথা অতি মিষ্ট, বিধাতা কেন এমন বিষপাত্র ক্ষীরদ্বারা আবৃত করিয়াছেন?

শকুনি। আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা না হইলে প্রভুভক্তির এই ফল ফলিবে কেন? এই বলিয়া শকুনি আর দুই চারিটী অশ্রুবিন্দু বাহির করিলেন। সতীশচন্দ্র দেখিয়া কিছু মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—

তুমি আমার উন্নতিচেষ্টা কর, তাহা আমি জানি, কিন্তু পাপপথে সর্ব্বদাই বিপদ। শকুনি! সে পথ ভিন্ন কি আর উন্নতির পথ ছিল না?

শকুনি দেখিলেন, তাঁহার অশ্রুবিন্দু নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—প্রভুভক্তি যদি পাপ হয়, তবে আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা ভিন্ন পাপ কি, আমি জানি না।

সতীশ। জান না,—বঙ্গচূড়ামণি রাজা সমরসিংহকে বিনাশ করিবার পরামর্শ কে দেয়?

শকুনি। রাজাজ্ঞায় তাঁহার দণ্ড হইয়াছে।

সতীশ। ভাল, তাঁহার জমীদারী এক্ষণে কে পাইয়াছে?

শকুনি। সুবাদার স্নেহবশতঃ যাহাকে যে দ্রব্য দান করেন, তাহা সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য।

সতীশ। শকুনি! আর আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। অদ্য আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে এত অন্ধকার, এত পাপ দেখিতেছি যে, সে দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারি না। অদ্য বালিকার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বলিয়া সতীশচন্দ্র বিমলার সহিত কথোপকথন সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন।

শকুনি উত্তর করিলেন,—বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ানের কি বালিকার কথায় ভীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ?

সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন,—বালিকা যদি সত্য কথা কহে, তবে সে কথা বালিকা-মুখনিঃসৃত বলিয়া পরিহার্য্য নহে। পাপপথে সর্ব্বদাই বিপদ্‌, তাহা আমি এতদিনে জানিলাম।

শকুনি। যদি আজ্ঞা করেন, তবে বলি, আপনার বিপদ কি, আমি দেখিতে পাইতেছি না।

সতীশ। আজি ছয় বৎসর হইল, যখন রাজা টোডরমল্ল প্রথমবার বঙ্গ ও বিহারদেশ জয় করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন, তাহার অনতিবিলম্বে পুণ্যাত্মা সমরসিংহ আমা কর্ত্তৃক নিহত হয়েন; সে কার্য্যে তুমিই পরামর্শ দিয়াছিলে।

শকুনি। দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ বঙ্গ ও বিহারদেশের সেনাপতি মনাইমখাঁর আজ্ঞায় সমরসিংহের দণ্ড হয়।

সতীশ। সত্য, কিন্তু সে আমাদেরই পাপ ষড়্‌যন্ত্রে। তাহার দুই বৎসর পরে, যখন রাজা টোডরমল্ল দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করেন, তখন সমরসিংহের মৃত্যুর বিষয়ে কি মিথ্যা কহিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, বোধ হয় বিস্মৃত হও নাই।

শকুনি। তাহার পর?

সতীশ। তাহার পর টোডরমল্ল পুনরায় সেনাপতি ও সুবাদার হইয়া মুঙ্গেরে আসিয়াছেন, আর নিস্তার নাই।

শকুনি। যে কৌশলে এতদিন কথা গুপ্ত ছিল, সে কৌশল এক্ষণে ব্যর্থ হইবে কেন?

সতীশ। দূরদর্শী টোডরমল্ল আমাদের কৌশলে পরাস্ত হইবেন না,—তুমি রাজা টোডরমল্লকে জান না।

শকুনি। কিন্তু এই দূরদর্শী রাজাই একবার এই কৌশলে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

সতীশ। সত্য, কিন্তু সে বার দুই এক মাসের জন্য আসিয়াছিলেন,—এবার সুবাদার হইয়া আসিয়াছেন, অনেক দিন বাস করিবেন। শকুনি! আমাকে নিবারণ করিও না, আমি তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তিনি একবার আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, পুনরায় ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। তাহার পর আমি এ পাপ সংসারে থাকিব না, যোগী হইয়া এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিব।

শকুনি। তাহা হইলে আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। প্রিয়সুহৃদ্‌ সমরসিংহের হত্যাকারক সম্বন্ধে রাজা টোডরমল্ল কি আদেশ দিবেন, আপনি কি তাহা বুঝিতে পারেন না?

এই ব্যঙ্গ বাক্যে সতীশচন্দ্র মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শকুনির কথাই সত্য! গুপ্তকথা অপ্রকাশ থাকার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রকাশ হইলে প্রাণরক্ষার কিছুই সম্ভাবনা নাই। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

শকুনি! তুমি আমা অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ, কিন্তু যদি তুমি মূর্ত্তিমান পাপ হও, তথাপি তোমার পরামর্শ অবলম্বন ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়।

শকুনি। আপনার সহিত তর্ক করা আমার সম্ভবে না; কিন্তু কাহার মাথার উপর মাথা আছে যে, বঙ্গদেশের দেওয়ানের বিরুদ্ধে সুবাদারের নিকট অভিযোগ করিতে যাইবে? প্রভো! আমার কথা অবধারণ করুন, যে কথা ছয় বৎসর গুপ্ত আছে, তাহা প্রকাশিত হইবে না। আমি

আপনার নিকট পণ করিতেছি, যদি এ কথা না গুপ্ত রাখিতে পারি, তবে আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।

আশার প্রভাব অতি চমৎকার! যে আশা মনুষ্যকে কত সুখ ও সান্ত্বনা প্রদান করে, সেই আশাই আবার কত দুঃখের কারণ হয়। মানবহৃদয়ও অতি চমৎকার! আশার কুহকে কতই খেলা করে! বিপদের সময়, পীড়ার সময়, দুঃখের সময়, হৃদয়ে ধর্ম্মভয় প্রবল হয়,—বিপদের শান্তি হইলে, পীড়ার আরোগ্য হইলে, দুঃখের অবসান হইলে ধর্ম্মভয় ক্রমে ক্রমে দূর হয়। ইতিপূর্ব্বে সতীশচন্দ্র বিপদাশঙ্কা করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মভয় মনে জাগরিত হইয়াছিল। ক্রমে কুহকিনী আশা কাণে কাণে বলিতে লাগিল, "ভয় কি? বিপদ কোথায়? মিথ্যা ভাবনা কেন?" সতীশচন্দ্রও সেই কুহকে মুগ্ধ হইলেন, ভাবিলেন, বিপদ না আসিলেও না আসিতে পারে, ভাবিতে ভাবিতে বিপদভয় অন্তর্হিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভয়ও চলিয়া গেল। মানবহৃদয়ে বিপদভয় যত প্রবল, ধর্ম্মভয় যদি সেইরূপ প্রবল হইত, তাহা হইলে কি পৃথিবীতে এতাদৃশ দুঃখ থাকিত?

অনেক চিন্তা করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন,—শকুনি! তোমার উপরই আমি নির্ভর করিব। আশু বিপদের কি কোন সম্ভাবনা আছে?

শকুনি সময় বুঝিয়া উত্তর করিলেন,—আশু কি বিলম্বেও গুপ্তকথা প্রচারের কোন সম্ভাবনা নাই; আর যদিই বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে, ভবাদৃশ মহাপুরুষের পক্ষে কি বিপদের সময় কাতরতা যুক্তিসিদ্ধ? বঙ্গদেশে আপনার যশঃ কে না প্রশংসা করে? ব্রাহ্মণকুলে আপনার মত পবিত্র কুল কাহার? আপনার ক্ষমতার মত ক্ষমতা কাহার? আপনার গৌরবের মত কাহার গৌরব? আপনার অধিকারের মত কাহার অধিকার? বালিকার বাক্য অবলম্বন করিয়া এ সমস্ত সহসা ত্যাগ করা কি বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের পক্ষে উচিত কর্ম্ম? আপনাকে পরামর্শ দিব আমার কি সাধ্য, আপনিই বিবেচনা করুন, আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে, এরূপ পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

সতীশচন্দ্র এ কথার কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—যথার্থই কি আমি বাতুল হইয়াছিলাম, বালিকার কথায় ভীত হইয়াছিলাম! শকুনি তাঁহার মুখ দেখিয়া আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন,—রুদ্রপুরে যে চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সংবাদ শুনিয়াছেন কি?

সতীশ। না, সেই এক বিষয়ে এখনও ভাবনা আছে। শুনিয়াছি, সমরসিংহের বিধবা ভয়ানক স্ত্রীলোক, টোডরমল্ল দেশে আসিলে হয়ত সেই একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে।

শকুনি। সে ভয় করিবেন না। টোডরমল্ল আসিবার অগ্রেই সমরসিংহের বংশের সকলেরই মুখ বন্ধ হইবে।

সতীশ। তবে কি আমরা যে চর রুদ্রপুরে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিয়া আনিতে পারিয়াছে?

শকুনি। না, এখনও পারে নাই, কিন্তু সে কার্য্য শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে।

সতীশ। পারে নাই কেন?

শকুনি। শুনিলাম, তাহারা দুই একদিন পূর্ব্বেই সমাচার পাইয়াছিল, সেই পাগলিনী সমাচার দিয়াছিল।

সতীশ। পিশাচী আমার সকল কর্ম্মেই বাধা দেয়, তাহাকে ধরিয়া আনাইতে পার না?

শকুনি। চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাই নাই। বোধ হয়, তাহার যথার্থই পৈশাচিক বল আছে, তাহা না হইলে আমাদিগের সকল গুপ্ত অনুসন্ধান জানিতে পারে কিরূপে? না হইলে একশত চরেও তাহার অনুসন্ধান পাইতেছে না কেন?

সতীশ। তবে এক্ষণে উপায় কি?

শকুনি। চিন্তা করিবেন না। শীঘ্রই সকলের মুখ বন্ধ হইবে। আর অধিক রাত্রি নাই, আপনি বিশ্রাম করুন, শকুনি শর্ম্মার মন্ত্রণা হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

এই বলিয়া শকুনি আপন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় দুই একবার সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভাবিলেন—তোমারও নিস্তার নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : ধূর্ত্তে ধূর্ত্তে

> CURSE on his perjured arts! dissembling smooth?
> Are honor, pity, conscience, all exiled?
> Is there no pity, no relenting truth?
>
> —*Burns.*

পরদিন প্রাতে দেওয়ানজী মহাসমারোহে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। কন্যার নিকট বিদায় লইবার সময় বিমলা বলিলেন,—পিতঃ! আপনি চলিলেন, অনুমতি করুন, আমি প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দিরে যাইয়া আপনার মঙ্গলার্থ পূজা দিব। তথায় আমাকে কিছুদিন অবস্থিতি করিতে হইবে। পিতা সম্মত হইলেন ও অনেক স্নেহগর্ভ বচনে কন্যার নিকট বিদায় লইলেন। কন্যার চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত হইল, পিতা চলিয়া যাইবার সময়, সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিমলা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—এই বিপুল সংসারে আপনি ভিন্ন এ হতভাগিনীর আর কেহই নাই, আপনি না থাকিলে সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। ভগবান আপনাকে নিরাপদে রাখুন, ধর্ম্মপথে আপনার মতি হউক। আপনার নৈসর্গিক চরিত্র উদার ও অকপট, কুক্ষণে শকুনির সহিত মিলন হইয়াছিল।

শকুনির সহিত বিদায় লইবার সময় শকুনি বলিলেন,—আপনি অগ্রসর হউন, আমিও সমরসিংহের বিধবাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া ও অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়া আপনার নিকট যাইতেছি। সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন,—যাহা উচিত হয় কর, আমি তোমারই তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপর নির্ভর করি। সতীশচন্দ্র যখন বহির্গত হইলেন, শকুনি মনে মনে বলিতে লাগিল,—বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কি না, হাতে হাতেই টের পাইবে, বড় বিলম্ব নাই।

শকুনির সহিত সতীশচন্দ্রের আজ আট বৎসর পরিচয়। যখন প্রথমে পরিচয় হইয়াছিল, তখন শকুনির বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, সতীশচন্দ্রের বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষ। শকুনি দেখিতে সুশ্রী ছিল ও অল্প বয়সে অনাথ ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া সতীশচন্দ্রের দ্বারে শরণাপন্ন হইয়াছিল। সতীশচন্দ্রও সুকুমার নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন,—সেই দিন অবধি হৃদয়ে কালসর্প ধারণ করিয়াছিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি শকুনি শীঘ্রই সতীশচন্দ্রের হৃদয় বুঝিল; সতীশচন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ লক্ষ্য করিল; সেই ভীষণ অগ্নিতে দিন দিন আহুতি দিতে লাগিল; আহুতি পাইয়া অগ্নিশিখা দিনে দিনে গগনস্পর্শী হইতে চলিল। এই ঘোর মদে মত্ত হইয়া সতীশচন্দ্র দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হারাইলেন, একেবারে অন্ধপ্রায় হইলেন।

শকুনি সুযোগ পাইল। অন্ধকে কুটিল পথে লইয়া যাওয়া দুরূহ নহে, সৎপরামর্শ হইতে কুপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল, প্রভুকে সৎপথ হইতে কুপথে লইয়া চলিল। অবশেষে এমন ঘোর পঙ্কে নিমগ্ন করিল যে, তথা হইতে উদ্ধার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা মানুষের সাধ্য নহে। তখন সতীশচন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত হইল, ক্রমে ক্রমে ভ্রম দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তখন পশ্চাত্তাপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শকুনির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিল।

শকুনিকে আশ্রয় দিবার অনতিবিলম্বেই সতীশচন্দ্র তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শকুনির বিনীতভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার পরামর্শে চমৎকৃত ও প্রীত হইয়াছিলেন, দিন দিন তাহাকে অধিকতর স্নেহ করিতেন, আপনার পুত্র নাই বলিয়া শকুনিকে পুত্রের মত ভালবাসিতেন। কখন তাহাকে পোষ্যপুত্র করিবার কামনা করিতেন, কখন বা তাহাকে আপন দুহিতার সহিত বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে মানহানি হইবে, এই ভয়ে শকুনিকে গৃহ-জামাতা করিতে পারেন নাই। ক্রমে কন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু কুলীন-কন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইলে ক্ষতি কি? বিশেষ সতীশচন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে কন্যার প্রতি স্নেহ দ্বিগুণ হইয়াছিল, কন্যার বিবাহ দিলে গৃহ শূন্য হইবে, এইজন্য বিবাহের বিলম্ব হইতে লাগিল, এইজন্য শকুনিকে জামাতা করিয়া গৃহে রাখিবার সঙ্কল্প হইতে লাগিল।

পরে যখন পাপপঙ্কে পতিত হইয়া সতীশচন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত হইল, তখন এই সঙ্কল্প আবার দূর হইল। পাপ এরূপ ঘৃণার পদার্থ যে, একজন পাপী অন্য জনকে ভালবাসিতে পারে না; সতীশচন্দ্র শকুনিকে আর ভালবাসিতে পারিলেন না। উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা দুহিতাকে কুটিলস্বভাব, কপটাচারী শকুনির হস্তে অর্পণ করিবেন, এ ভাবনা সতীশচন্দ্র সহ্য করিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—আমি পাপিষ্ঠ বটে, কিন্তু পাপেরও সীমা আছে। ধর্ম্মপরায়ণ সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছি, কিন্তু আমার স্নেহের পুত্তলি বিমলাকে নরকে ফেলিতে পারিব না। আমার যাহা হইবার হইয়াছে, বিমলা ধর্ম্মপথে থাকুক। সতীশচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেন, কিন্তু শকুনিকে কিছু বলিতে পারিতেন না। শকুনি সুবাদারের নিকট একটী কথা জানাইলে সতীশচন্দ্রের শিরশ্ছেদন হইবে, তাহা তিনি জানিতেন, সুতরাং তিনি শকুনির একরূপ হস্তগত হইলেন।

শকুনি যে ঘোর পাপিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। সতীশচন্দ্রও পাপিষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার পাপের সীমা ছিল, তাঁহার চরিত্রে দুই একটী সদ্‌গুণও ছিল, তাঁহার হৃদয়ে দুই একটী মহানুভবতা লক্ষিত হইত। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মধ্যে মধ্যে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত। শকুনির এ সমস্ত কিছুই ছিল না, কেবল ঘোর স্বার্থপরতা ও দুর্ভেদ্য কুটিলতা।

সতীশচন্দ্রের মত তাহার দুর্দ্দমনীয়া বেগবতী মনোবৃত্তি একটীও ছিল না; তাহার হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তিই শান্ত; সকল প্রবৃত্তিই ঘোর স্বার্থপরতার অনুচারিণী। ঊর্ণনাভ যেরূপ বৃক্ষপত্রগুলি দেখিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে জাল পাতিত করে, শকুনি সেইরূপ অন্য লোকের মনোবৃত্তির বেগ বুঝিয়া অতি ধীরে ধীরে আপন সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করিত। সে মন্ত্রণাজাল এমন সূক্ষ্ম, এমন দুর্লক্ষ্য ও এমন দুর্ভেদ্য যে, কাহার সাধ্য তাহা ভেদ করে? প্রেম, বন্ধুত্ব, দয়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি যে সকল সুকুমার মনোবৃত্তি দ্বারা জগৎ বদ্ধ ও মানবজাতি একীকৃত হইয়া রহিয়াছে, শকুনি সে সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। যশে অভিরুচি ও উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি যে সকল দুর্দ্দম মনোবৃত্তি অনেককে বিচলিত করে, তাহা হইতেও শকুনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল। সুতরাং আপন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গূঢ় মন্ত্রণার দ্বারা আপন স্বার্থসাধনে কখনও নিষ্ফল হইত না।

শকুনি সতীশচন্দ্রকে বলিয়াছিল যে, চরেরা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিতে অক্ষম হইয়াছে,—সেটি মিথ্যাকথা। শকুনির যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মহাশ্বেতাকে ধরা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য কার্য্য নহে; সে কেবল সতীশচন্দ্রের সহিত শকুনিকে মুঙ্গেরে না যাইতে হয় এইজন্য। শকুনির বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজাল ভেদ করি, আমাদের কি সাধ্য? পাঠক মহাশয়! চলুন, শকুনি যথায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে, তথায় যাইয়া দেখা যাউক, যদি কিছু জানা যায়।

চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের প্রশস্ত কক্ষে শকুনি একাকী পদচারণ করিতেছে, চারিদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অবলোকন করিতেছে, দুর্গপদসঞ্চারিণী কল্লোলিনী যমুনার কল্ কল্ শব্দ শ্রবণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত দুর্গের শুদ্ধান্তঃপুরাদিকে অবলোকন করিতেছে। তাহার মুখমণ্ডলে আনন্দের লক্ষণ, স্বার্থসাধন হইলে স্বার্থপর লোকের যেরূপ আনন্দ ও উল্লাস হয়, সেইরূপ আনন্দের লক্ষণ। মনে মনে এইরূপ চিন্তা উদয় হইতেছে,—

এই সুবিস্তীর্ণ জমীদারী, এই প্রশস্ত দুর্গ, ঐ অন্তঃপুরবাসিনী সপ্তদশ-বর্ষীয়া সুন্দরী শীঘ্রই নব স্বামী গ্রহণ করিবে; সমরসিংহের প্রজাগণ, সতীশচন্দ্রের প্রজাগণ, শীঘ্রই শকুনির নাম উচ্চারণ করিবে; কল্লোলিনী যমুনা শীঘ্রই শকুনির গৌরব-গীত গান করিবে। আর তুমি বিমলে! তুমি আমাকে ঘৃণা কর জানি, কিন্তু ঘৃণার দিন শেষ হইল; তোমার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমাকে স্বামী বলিয়া আলিঙ্গন করিতেই হইবে; তথাপি যদি ঘৃণা কর, এই পতঙ্গের মত তোমাকে পদে দলিত করিব; এই দলিত মৃত পতঙ্গের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিব। প্রেমের জন্য বিবাহ করিতেছি না, প্রেম বালক-বালিকার স্বপ্নমাত্র! তোমার রূপলাবণ্যের জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি না; আমার নিকট রূপলাবণ্যের আদর নাই; যদি থাকিত, লক্ষপতির রূপলাবণ্যের অভাব কি? তবে তোমায় দলিত না করিব কেন? সতীশচন্দ্র, সাবধান! আজি তোমাকে যম-মন্দিরে প্রেরণ করিলাম; যেরূপ চর নিযুক্ত করিয়াছি, গুপ্তকথা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে; অধিকন্তু শকুনির দোষও তোমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহার পর? তাহার পর নিঃসন্তান সতীশচন্দ্র গত হইলে তাহার জামাতা ভিন্ন আর কে উত্তরাধিকারী হইবে? তীক্ষ্ণবুদ্ধির চিরকালই জয় হউক।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শকুনি দেখিল, অন্তঃপুরে গবাক্ষপার্শ্বে বিমলা এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পিতা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পিতার গমনপথ-দিক অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ক্রন্দন করাতে সেই উন্নত প্রশস্ত ললাটের শিরা স্ফীত হইয়াছে; চক্ষুর্দ্বয় এখনও জলে ঢল্ ঢল্ করিতেছে; অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছে; উন্নত বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতেছে; বস্ত্র অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়াছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ের যে গম্ভীর বিষণ্ণ ভাব, তাহা বালিকার উচ্চ রোদনে প্রকাশ পায় না, নিঃশব্দ, অলক্ষিত, অবারিত অশ্রুজলে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায়, কথঞ্চিৎ শান্ত হয়।

দেখিয়া শকুনি আপন চক্ষে দুই এক বিন্দু জল আনিয়া আপনিও বাহিরের ঘরের গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইল। বিমলা চক্ষু উঠাইয়া দেখিলেন, শকুনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ক্রোধে, ঘৃণায় ভ্রূকুটী করিয়া গবাক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। বিমলার মনোহরণ করিবার জন্য শকুনির এই প্রথম উদ্যম নিষ্ফল হইল।

নবম পরিচ্ছেদ : উপাসকে উপাসকে

ENAMOURED, yet not daring for deep awe
To speak her love:—and watched his nightly sleep,
Sleepless herself, to gaze upon his lips
Parted in slumber, whence the regular breath
Of innocent dreams arose: then when red morn
Made paler the pale moon, to her cold home
Wildered and wan and panting, she returned.

—*Shelly.*

চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে ইচ্ছামতী-তীরে প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দির ছিল। সন্ধ্যার সময় বিমলা শিবিকা আরোহণ করিয়া চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই চারিজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক ও অনেক সংখ্যক দাসদাসী চলিল। বঙ্গদেশের দেওয়ানজীর একমাত্র দুহিতার যেরূপ সমারোহে যাওয়া উচিত, সেইরূপ সমারোহে বিমলা মহেশ্বর-মন্দিরে চলিলেন।

অনেক দূরদেশ হইতে অনেক লোক এই মন্দিরে প্রতিদিন সমাগত হইত। বৃদ্ধাগণ পুত্রকন্যার কুশল কামনা করিয়া পূজা দিতে আসিতেন; যুবতীগণ পুত্র আকাঙ্ক্ষায় মহেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিতেন; চিররোগিগণ রোগশান্তি কামনায় এই মন্দিরে আসিতেন; যোদ্ধৃগণ জয়াকাঙ্ক্ষায়, কৃপণগণ ধনাকাঙ্ক্ষায়, যুবকগণ বিদ্যাকাঙ্ক্ষায়, নানাপ্রকারের লোক নানা আকাঙ্ক্ষায় এই মন্দিরে সমবেত হইত। বহুকালের ধন সঞ্চিত হইয়া এই মন্দিরে রাশীকৃত হইয়াছিল. মন্দিরের অট্টালিকাসমূহ দিন দিন দীর্ঘায়ত হইতেছিল। মধ্যে উচ্চ মন্দির, তাহার চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ, উজ্জ্বল, উন্নত সৌধমালা শোভা পাইত। আগন্তুকগণ এই সৌধমালায় বাস করিত, তাহা হইতে যে আয় হইত, তাহাও দেবসেবায় অর্পিত হইত।

এই প্রকাণ্ড অট্টালিকাশ্রেণী মন্দিরের চারিদিকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যবর্ত্তী স্থান অতি বিস্তীর্ণ। সুতরাং মন্দিরের যে কোন দিকে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে কেবল সৌধমালা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই সৌধমালার ভিতর দিয়া মন্দিরাভিমুখে যাইবার জন্য চারিদিকে চারিটী সিংহদ্বার ছিল। শিবিকা কি শকট সেই সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিতে পারিত, তাহার ভিতর যাইতে পারিত না। সেই সিংহদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলে আর ধনগৌরবজাত কোন প্রকার বিভিন্নতাই স্থান পাইত না। রাজকুমারী ভিখারিণীর সহিত একত্র পদব্রজে সিংহদ্বার হইতে মন্দির পর্য্যন্ত যাইতেন. ভস্ম-বিভূষিত সন্ন্যাসীর সহিত স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কৃত মহারাজ একত্রে পথ অতিবাহিত করিতেন। ধর্ম্মের সম্মুখে উচ্চ কে? নীচ কে? ধনীই বা কি? দরিদ্রই বা কি?

যদিচ চারিদিকের সৌধবেষ্টিত মধ্যস্থ ভূমি অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ, তথাপি কখন কখন এত লোকের সমাগম হইত যে. সেই ভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইত। তথায় যে কেবল উপাসকগণ

আসিত, এমত নহে; নানাপ্রকার লোকে নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আসিত। বালক-বালিকার জন্য নানাপ্রকার ক্রীড়াদ্রব্য, যুবক-যুবতীদের জন্য নানাপ্রকার অলঙ্কার, সকলের জন্যই পরিধেয়, খাদ্য ও অন্যান্য নানারূপ ব্যবহার্য্য দ্রব্য তথায় দিবানিশি বিক্রয় হইত। ক্রেতৃগণ তথায় দিবানিশি ব্যস্ত রহিয়াছে।

যখন বিমলা আপন সঙ্গিনীদিগের সহিত মহেশ্বর-মন্দিরে পঁহুছিলেন, তখন রজনী আগত হইয়াছে। বিশ্রাম করিয়া আহারাদি করিতে করিতে রজনী দ্বিপ্রহর হইল। বিমলার সঙ্গিগণ তাঁহাকে সে রাত্রিতে পূজা করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু বিমলার হৃদয় চিন্তা-পরিপূর্ণ। তিনি বলিলেন,—আমাকে ক্ষমা করুন, আমি উপাসনা না করিয়া অদ্য শয়ন করিব না,—যদি করি, নিদ্রা হইবে না। এই বলিয়া বিমলা একাকিনী ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর-মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া গভীর নীল আকাশপটে যেন চিত্রের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল শ্বেত সৌধমালা চন্দ্রকিরণে রৌপ্যমণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে,—সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত হইতেছে। মধ্যস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য হইয়াছে,—যেস্থানে সমস্ত দিন কলরব হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্থান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষপত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা নয়নরঞ্জন করিতেছে। শীতল সুগন্ধ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিতেছে ও নিকটস্থ উচ্চ বৃক্ষ হইতে সুমধুর গম্ভীর রব বাহির করিতেছে। সেই রব ভিন্ন অন্য রব নাই; কেবল স্থানে স্থানে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে,—কেবল কখন কখন দূরস্থ ক্ষেত্র হইতে দুই একটা গাভীর হাম্বারব শুনা যাইতেছে;—কেবল দূরস্থগ্রামবাসীদিগের গীত গান বায়ুপথে আরোহণ করিয়া কখন কখন কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে, সেস্থানে, সেই গীত শুনিতে বড় সুললিত বোধ হয়।

এই নিস্তব্ধ, শান্তপথে যাইতে যাইতে বিমলার হৃদয়ও কিছু শান্ত হইল; চিন্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণ দূর হইতে লাগিল; প্রকৃতির নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিমলার হৃদয়েও শান্তভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। সেই দেবায়তনে প্রাতঃকালে দুই একটী করিয়া লোক সমবেত হয়; মধ্যাহ্নে কোলাহলের সীমা থাকে না; সায়ংকালে সেই কলরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে; রজনীতে সমস্ত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, শান্ত! বিমলা বিবেচনা করিতে লাগিলেন,—আমাদের জীবনেও এইরূপ। শৈশবে মনের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে; যৌবনে সেই প্রবৃত্তিসমূহের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ, —যেন জগৎসংসারকে গ্রাস করিবে; বার্দ্ধক্যে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে; শীঘ্রই শান্ত, নিস্তব্ধ, অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়—বারিবিন্দুর মত অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়। তবে এত ধুমধাম কেন?—এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত কৌশল, এত মন্ত্রণা কেন? এত ক্রোধ, এত লোভ, এত অর্থলালসা, এত উচ্চাভিলাষ কেন?—কে বলিবে কেন? বিধির নির্ব্বন্ধ কে বুঝিবে? যে পতঙ্গ মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ হইবে, তাহার পক্ষবিস্তার করিয়া আকাশদিকে ধাবমান হওয়া কেন? যে শিশিরবিন্দু মুহূর্ত্তমধ্যে মনুষ্যপদে দলিত হইবে বা প্রাতঃকালের রবিকিরণস্পর্শে শুকাইয়া যাইবে, তাহার হীরকখণ্ডের জ্যোতিঃ বিস্তার কেন?

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিমলা সহসা রজনী দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব শুনিতে পাইলেন, সেই ঘণ্টারব চতুর্দ্দিকস্থ সৌধমালায় প্রতিহত হইয়া দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ুমার্গে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, নিস্তব্ধ নৈশগগনে আরোহণ করিয়া সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ঘণ্টারব শেষ না হইতে হইতে দ্বিপ্রহরের পূজা আরম্ভ হইল। সপ্তস্বরে মিলিত হইয়া মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা গীত হইতে লাগিল; কাদম্বিনীর গম্ভীর নির্ঘোষবৎ সেই গীত কখন মন্দীভূত, কখন সতেজে উচ্চারিত হইতে লাগিল; উপাসকদিগের মন দ্রবীভূত হইতে লাগিল। বিমলা সপ্তস্বরে সেই গানের সহিত যোগ দিলেন; তাঁহার হৃদয় পবিত্র প্রেমে ও উল্লাসে প্লাবিত হইতে লাগিল।

বিমলা যখন মন্দিরের ভিতর আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন আর অধিক উপাসক ছিল না, প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। বিমলা পূজায় রত হইলেন।

প্রায় এক প্রহর কাল মুদিতনয়নে, নিস্পন্দশরীরে, বিমলা পূজা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে যে পবিত্র কামনা উদয় হইতেছিল, বিমলার বদনমণ্ডলে তদনুরূপ পবিত্র ভাব অঙ্কিত হইতে লাগিল। বিমলার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, বন্ধু কেহ নাই, পিতাই একমাত্র ভক্তির আধার,

পিতাই স্নেহের পাত্র, পিতাই পরম বন্ধু, পিতাই পূজনীয় দেবতা। বিমলার অপার স্নেহস্রোত, অপরিসীম ভক্তিস্রোত, সেই একমাত্র আধারাভিমুখে ধাবমান হইল। পিতার দুঃখেই দুঃখ, পিতার আনন্দেই আনন্দ, পিতার বিপদে চিন্তা, পিতার সম্পদে ভরসা,—বিমলা পিতার জীবনেই জীবনধারণ করিতেন। সেই পিতার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতে করিতে বিমলার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্য্যন্ত ভক্তিরসে প্লাবিত হইল। অর্দ্ধপ্রহর কাল বিমলা উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে যখন বিমলা প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য ও শান্ত।

তখন বিমলা একেবারে মন্দির হইতে বহির্গত না হইয়া ঔৎসুক্যফুল্ললোচনে মন্দিরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন এ মন্দিরে আইসেন নাই, মন্দিরের সকল দ্রব্যই নূতন বোধ হইতে লাগিল। বিমলা এরূপ সুনির্ম্মিত, প্রশস্ত, চমৎকার অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। কখন কখন সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পালঙ্কৃত স্তম্ভসমূহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কখন কখন ভিত্তির উপর সুন্দর ভাস্করকার্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন; কখন ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে লাগিলেন; কখন দুই এক জন দেবদাসীকে মন্দির-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উপাসক আর কেহই নাই, সুতরাং বিমলার এইরূপ ঔৎসুক্যে কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই।

একপার্শ্বে একমাত্র উপাসক নিদ্রিত রহিয়াছেন, সহসা বিমলার নয়ন সেই দিকে পতিত হইল। তাঁহার অলৌকিক তেজঃপরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমলা বিস্মিত হইলেন, নয়ন আর সেদিক হইতে অন্যদিকে ফিরাইতে পারিলেন না। যুবকের ললাট উদার ও প্রশস্ত, কিন্তু নিদ্রাতেও যেন কোন গাঢ় চিন্তায় কুঞ্চিত রহিয়াছে। নয়ন মুদ্রিত, বদনমণ্ডল উজ্জ্বল ও বীরদর্পপ্রকাশক। উপাসকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমলার বোধ হইল যেন, কোন বীরপুরুষ বীরব্রতে ব্রতী হইয়া দূরদেশে যাত্রা করিতেছেন, পথিমধ্যে এই দেবমন্দিরে উপাসনা করিতে আসিয়াছেন। শ্রান্তিবশতঃ বা অন্য স্থান না থাকাতে উপাসনান্তে এই স্থানেই নিদ্রিত রহিয়াছেন। বিমলার অবলা হৃদয়েও বীর ভাবের অভাব ছিল না; সুতরাং উপাসকের এই অলৌকিক বীর-আকৃতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল। অনিমেষলোচনে সেই বীরপুরুষের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

উপাসকের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে উজ্জ্বল-নয়না তন্বঙ্গী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র বিমলার সংজ্ঞা হইল, অপরিচিত পুরুষের দিকে দেখিতেছিলেন জ্ঞান হইল, লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নিশা প্রভাতপ্রায় হইয়াছে। প্রাতঃকালের প্রথম রশ্মি বিমলার নয়নোপরি নিপতিত হইল। চারিদিকে দুই এক জন করিয়া লোক বাহির হইতেছে। বিমলার লোকের সম্মুখে পদব্রজে যাওয়া অভ্যাস নাই, কুণ্ঠিত হইয়া দ্রুতবেগে বাসস্থানাভিমুখে চলিলেন। প্রাচীনাগণ যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, এতক্ষণ কি করিতেছিলেন, তখন বিমলা কি বলিবেন? এতক্ষণ কি তিনি উপাসনা করিতেছিলেন?

বিমলার অন্যান্য চিন্তা হইতে লাগিল। এ বীরপুরুষ কে? কি ব্রতে ব্রতী হইয়া সমস্ত রাত্রি উপাসনা করিতেছিলেন? এমন ভাগ্যবান বীরপুরুষের প্রার্থনীয় কি আছে? এইরূপ নানা চিন্তায় অভিভূত হইয়া বিমলা শয়নগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ : পরিচয়

AMID the jagged shadows
Of mossy leafless boughs,
Kneeling in the moonlight
To make her gentle vows;
Her slender palms together prest,
And heaving sometimes on her breast;
Her face resigned to bliss or bale,—
Her face, O! call it fair not pale,—
And both her eyes more bright than clear,
And each about to have tear.

—*Coleridge.*

সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর কিঞ্চিৎ আরাম লাভ করিবার জন্য বিমলা আপন শয়নভবনে গমন করিলেন। দিনের বেলা বড় অধিক নিদ্রা হইল না; যে পরিমাণে নিদ্রা হইল, তাহা স্বপ্নে পরিপূর্ণ। সেই দেবপ্রাঙ্গণ, সেই চন্দ্রালোকে মহেশ্বরগীত, সেই দেবমন্দিরে মহেশ্বরমূর্ত্তি, তৎপার্শ্বে সেই উপাসক, এই সমস্ত বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

জাগিয়া দেখিলেন, গৃহে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে; প্রাঙ্গণে লোকের সমাগম হইয়াছে; কলরব শুনা যাইতেছে। নিশি জাগরণে বিমলার চক্ষে কালিমা পড়িয়াছে; তাঁহার স্বাভাবিক গৌর-বদন রক্তশূন্য হইয়া অধিকতর গৌর হইয়াছে; কপালে, গণ্ডে, বক্ষঃস্থলে ঈষৎ ঘর্ম্ম হইয়াছে। বিমলা আলুলায়িত কেশ কথঞ্চিৎ বদ্ধ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সমস্ত দিন বিমলা অন্যমনস্কার ন্যায় হইয়া রহিলেন। পূর্ব্বরাত্রির কথা তাঁহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল। অনেক চিন্তা করিয়া কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

সেদিন রজনী এক প্রহরের সময় বিমলা উপাসনার্থ গমন করিলেন। সমস্ত দিন যদিও তিনি অন্যমনস্কা হইয়া ছিলেন, উপাসনার সময় তাঁহার চিত্ত স্থিরভাব অবলম্বন করিল। প্রণিপাত করিয়া উপাসনা শেষ করিলেন।

উঠিবামাত্র পুনরায় সেই অপরিচিত উপাসককে দেখিতে পাইলেন। তিনিও পূজা সমাধা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন। বিমলার চিত্তসংযমের ক্ষমতা ছিল, তিনি চিত্তসংযম করিলেন, ক্ষণেকমাত্র বিমলা সেই উপাসকের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া অবনতমুখে মন্দির হইতে বাহির হইবার উদ্যম করিলেন।

যুবক কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। দুই দিনই সেই পরমসুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইলেন. দুই দিনই সুন্দরী একদৃষ্টে তাঁহার দিকে ক্ষণেকমাত্র চাহিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত এই হইল যে. এই রমণীর কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে; কিন্তু লজ্জায় অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। একবার ইচ্ছা হইল নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু অপরিচিতা তরুণী ভদ্রকন্যার সহিত কিরূপে বাক্যালাপ করিবেন? দুই দিনের কথা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া অবশেষে ভাবিলেন.—যদি আমি না জিজ্ঞাসা করি, বোধ হয়. কোন বিশেষ গূঢ় কথা অব্যক্ত থাকিবে,—বোধ হয় যে কারণে রমণী মন্দিরে আসিয়াছেন. নিষ্ফল হইবে।

ধীরে ধীরে বিমলার নিকটে যাইয়া বলিলেন,—ভদ্রে! অপরিচিত হইয়াও আপনার সহিত কথা কহিতেছি, ক্ষমা করুন; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে. আপনার কিছু বক্তব্য আছে.—যদি থাকে আজ্ঞা করুন।

বিমলার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইল. শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, বিমলা মুখ অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবক দেখিলেন, কোন উত্তর নাই, অথচ রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন,—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

ভদ্রে! আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, বলুন, আমি শুনিতেছি,—এখানে আর কেহই নাই।

বিমলার বিহ্বলতা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

আপনার নাম কি?

যুবক উত্তর করিলেন,—নাম এক্ষণে অজ্ঞাত থাকিবে, আমাকে অধুনা ইন্দ্রনাথ বলিয়া জানিবেন।

বিমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার মহেশ্বর-মন্দিরে উপাসনার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

ইন্দ্রনাথ। সংক্ষেপে বলিতেছি,—কোন অনাথা, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকের সাহায্যে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

বিমলা। ধন দ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে?

ইন্দ্রনাথ। না; কিন্তু আপনাকে অপরিচিতের উপকারার্থ তৎপর দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রাখুন।

বিমলা। তবে কিরূপে সাহায্য হইবার সম্ভব?

ইন্দ্রনাথ। বিচার। আমি মুঙ্গের যাত্রা করিয়া বিচার প্রার্থনা করিব; কিন্তু আপনি এ সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

বিমলা মুঙ্গের নাম শুনিয়া পিতার কথা স্মরণ করিলেন, পিতার বিপদ স্মরণ করিলেন, তখন লজ্জা একেবারে দূরীভূত হইল। সজল নয়নে ইন্দ্রনাথকে বলিলেন,—আপনি বোধ হয় বীরপুরুষ, আপনার ক্ষমতা অপার, প্রতিজ্ঞা করুন দাসীর একটী ভিক্ষা প্রতিপালন করিবেন।

ইন্দ্রনাথ। রমণি! আমার ক্ষমতা নাই; কিন্তু সাধ্যমতে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান হইব; আজ্ঞা করুন।

বিমলা। মুঙ্গেরে আপনি বঙ্গদেশের দেওয়ান সতীশচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন। তিনি এক্ষণে বিপদ-জালে বেষ্টিত, প্রতিজ্ঞা করুন, তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

ইন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হইল, ললাট কুঞ্চিত হইল। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন,—

এ বিষয়ে আপনি চিন্তা করিতেছেন কেন? বিপন্নের বিপদশান্তি করাই বীরপুরুষের কার্য্য, আর যদি কখন তাঁহাকে অসৎ লোক বলিয়া শুনিয়া থাকেন, সে জঘন্য মিথ্যা কথা,—শকুনির প্রতারণা।

ইন্দ্রনাথ। আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন,—শকুনি কে?

বিমলা। শকুনি সতীশচন্দ্রের শনি। সেই পামরই সকল দোষে দোষী,—সতীশচন্দ্রের উদার চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শে না। বীরপুরুষ! এই দেবালয়ে অঙ্গীকার করুন, আপনি সতীশচন্দ্রের সহায় হইবেন।

ইন্দ্রনাথ এই সকল কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন,—কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন,—যদি যথার্থই সতীশচন্দ্র নির্দ্দোষী হয়েন, তবে আমি নিজ শোণিত দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনার নাম কি বলুন। আপনি কে, কিরূপেই বা আমার উপাসনা, আমার প্রতিজ্ঞার কারণ জানিতে পারিলেন?

বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আপনার উদ্দেশ্য আমি জানি না, কিন্তু আপনি কোন মহৎ বীরপুরুষ, মুঙ্গেরে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে যাইতেছেন, আমার হৃদয় আমাকে বলিতেছে। আপনার পরিচয়ও কিছু পাইতে ইচ্ছা হইতেছে।

ইন্দ্রনাথ। আমার পরিচয় এই পর্য্যন্ত জানিবেন, আমি কোন কায়স্থ জমীদারের সন্তান, যুদ্ধব্যবসায় শিখিবার জন্য মুঙ্গেরে যাইতেছি।

ব্রাহ্মণকুমারী নিস্তব্ধে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : অপরিচিত নৌকাস্বামী

> How he heard the ancient helmsman
> Chant a song so wild and clear,
> That the sailing sea-bird slowly
> Poised upon the mast to hear
> Till his soul was full of longing,
> And he cried with impulse strong,
> "Helmsman! for the love of heaven,
> Teach me, too, that wondrous song!"
>
> —*Longfellow.*

গঙ্গানদীর উপর মুঙ্গেরের ভীমকান্ত দুর্গ শোভা পাইতেছে। কল্ কল্ শব্দে গঙ্গার তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে, এক এক বার দুর্গের উপর বলে আঘাত করিতেছে,—আবার ফেনময় হইয়া দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও তীরের মৃত্তিকারাশি সশব্দে জলে পতিত হইতেছে, বারিরাশি কিঞ্চিন্মাত্র কলুষিত ও চঞ্চল হইয়া পুনরায় মুহূর্ত্তমধ্যে আপন গম্ভীর রূপ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে শুভ্র বালুকার চর দেখা যাইতেছে, সেই চরে নানাপ্রকার পক্ষী বিচরণ করে, কোথাও বা তরণীবাসিগণ অবতরণ করিয়া সায়ংকালের ভোজ্য পাক করিতেছে, সেই তরী হইতে অসংখ্য দীপ তারকাজ্যোতিঃরূপে বহির্গত হইয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ঝক্‌মক্ করিতেছে। আকাশেও ক্রমে ক্রমে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, গঙ্গাতীরে দুই এক জন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে, নগর ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে।

সেই গঙ্গাতীরে একজন যুবাপুরুষ একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ অদ্যই মুঙ্গেরে পঁহুছিয়াছেন, চিন্তায় মগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন।

ইন্দ্রনাথ কি করিতে মুঙ্গেরে আসিয়াছেন? সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিহিংসা-সাধন-জন্য! সত্য, কিন্তু সে প্রতিহিংসা কিসে সাধন হইবে? আপনি আশ্রয়হীন, সহায়হীন, সম্পত্তিহীন, অপরিচিত লোক হইয়া কিরূপে সে প্রতিহিংসা সাধন করিবেন? রাজা টোডরমল্ল মুঙ্গেরে আছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলে হয় না? রাজা টোডরমল্ল এক্ষণে যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়ে মগ্ন, এক্ষণে কিরূপে তিনি অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন? বঙ্গদেশ এখনও জয় করিতে পারেন নাই, কিরূপে বঙ্গবাসীদিগের ন্যায় অন্যায় বিচার করিবেন?

আর যদিই বা সে বিচার করিতে এক্ষণে সক্ষম হয়েন, অপরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? মান্যবর দেওয়ানজীর বিরুদ্ধে একজন অপরিচিত জমীদারপুত্র যাহা বলিবেন তাহা কি বিশ্বাসনীয়? রাজা টোডরমল্ল বিচার করিতে সম্মত হইলেও ইন্দ্রনাথ এমন প্রমাণ কোথায় পাইবেন যে, সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ হইবে?

আর সহসা দোষারোপ করা কি উচিত? মহেশ্বর-মন্দিরে অপরিচিতা রমণী যাহা বলিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। সে রমণী যে মিথ্যা বলিয়াছেন তাহাও বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহার কথা যদি সত্য হয়, তবে সতীশচন্দ্র নিরপরাধী। নিশ্চয় না জানিয়া কি সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ করা উচিত?

আর সেই রমণী যাহার নাম করিয়াছিল, সে শকুনিই বা কে? ইন্দ্রনাথ যত ভাবিতে লাগিলেন, ততই অধিকতর ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেই গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সেই তীরে উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন,—এক্ষণে কোন উপায় দেখিতেছি না; মুঙ্গেরে কিছুদিন অবস্থান করা যাউক, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিব।

সহসা এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতে ইন্দ্রনাথের চিন্তা ভঙ্গ হইল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির চন্দ্রালোকোজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে একটী ক্ষুদ্র তরী ভাসমান রহিয়াছে, তাহার

একমাত্র আরোহী সেই গান করিতেছে। গান বিশেষ মধুর কি না, জানি না, কিন্তু ইন্দ্রনাথের কর্ণে স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হইল।

সেই গান একবার, দুইবার, তিনবার গীত হইল। গঙ্গার অনন্ত গীতের সহিত মিলিত হইয়া বায়ুপথে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ক্রমে ভাসিতে ভাসিতে সেই নৌকা ইন্দ্রনাথ যে স্থানে ছিলেন, তাহারই নিকটে আসিল, ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, নৌকার উপর একজন ভদ্রলোক একাকী স্বহস্তে নৌকা বাহিতেছেন, ও আপন মনে গান করিতেছেন।

সেই ভদ্রলোককে দেখিয়া ও তাঁহার গান শুনিয়া ইন্দ্রনাথের তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। প্রথমে তাঁহাকে মুঙ্গের সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও আগ্রহের সহিত উত্তর দিলেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের প্রণয়সঞ্চার হইল।

তখন ইন্দ্রনাথ বলিলেন,—

মহাশয়! যদি অনুমতি দেন তবে আমি আপনার নৌকায় যাইয়া আমিও একবার চন্দ্রালোকে দাঁড় বাহিব, এবং আপনার অপূর্ব্ব গান আর একবার শুনিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিব।

নৌকারোহী উত্তর করিলেন,—আপনার ন্যায় লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া আমারই ভাগ্য; আসুন, নৌকায় আরোহণ করুন; আর যদি হতভাগ্যের গানে রুচি হয় শ্রবণ করুন।

আবার নৌকা বাহিত হইল, আবার সুন্দর খেদপূর্ণ গীতে নৈশগগন পূর্ণ হইল।

অনেকক্ষণ পর নৌকাস্বামী ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয় মুঙ্গেরে কবে আসিয়াছেন?

ইন্দ্রনাথ। আমি অদ্যই আসিয়াছি।

নৌকাস্বামী। আপনার নাম কি? নিবাস কোথায়?

ইন্দ্রনাথ। আমাকে ইন্দ্রনাথ বলিয়া জানিবেন, নিবাস অনেক দূরে, নদীয়া জেলায়।

নৌকাস্বামী। নদীয়া জেলায় কোন্ গ্রামে?

ইন্দ্রনাথ। ইচ্ছাপুর গ্রামে।

নৌকাস্বামী। ইচ্ছাপুর গ্রামে? আপনি কাহার পুত্র, জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

ইন্দ্রনাথ। কেন, আপনি ইচ্ছাপুরে গিয়াছিলেন না কি?

নৌকাস্বামী ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—আমায় কার্য্যবশতঃ সকল স্থানেই যাইতে হয়, আপনার পিতার নাম কি? হইতে পারে, আমি তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারি। ইন্দ্রনাথ আপন পরিচয় সকলের নিকট লুকাইয়া রাখিতেন, গুপ্তভাবেই দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিতেন, কিন্তু ইঁহার নিকট পিতার নাম লুকাইবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, আমি অনেক দিন পিত্রালয় হইতে আসিয়াছি, যদি এই ভদ্রলোক সম্প্রতি সে গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পিতার কুশলসংবাদ দিলেও দিতে পারেন। বলিলেন,—ইচ্ছাপুরের জমীদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমার পিতা। অপরিচিত ভদ্রলোক শুনিয়া সহসা চমকিত হইলেন। হস্তদ্বারা নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া বলিলেন,—হা নগেন্দ্রনাথ! পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ!

পরে চিত্তসংযম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার নাম কি ইন্দ্রনাথ? ইন্দ্রনাথ তখন বলিলেন,—ইন্দ্রনাথ আমার কখনই নাম নহে, চিরকালই আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ; তবে অজ্ঞাতরূপে দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিতে হয়, এই জন্য মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করি।

"সুরেন্দ্রনাথ!" এই কথামাত্র উচ্চারণ করাতে অপরিচিতের চক্ষে জল আসিল, আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

ক্ষণেক পর বলিলেন,—আমার বাল্যাবস্থায় পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথের বাটীতে কিছুকাল ছিলাম, সেই হেতু আপনাকে শৈশবাবস্থায় আমি দেখিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার পূর্ব্ব বন্ধুর সংসারের বিষয় জিজ্ঞাসা করি। নগেন্দ্রনাথ ভাল আছেন?

ইন্দ্র। আছেন।

নৌ। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এক্ষণে কোথায়?

ইন্দ্র। আমার জ্যেষ্ঠের অনেক দিন কাল হইয়াছে।

নৌ। তাঁহার নাম উপেন্দ্রনাথ ছিল না?

ইন্দ্র। হাঁ।

নৌ। তাঁহার কাল হয় কিরূপে?

ইন্দ্র। ইচ্ছাপুরে বড় ব্যাঘ্রের ভয়, আমার জ্যেষ্ঠকে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। আমার জ্যেষ্ঠকে প্রায় স্মরণ নাই। অনেক বৎসর হইল তাঁহার কাল হইয়াছে।

নৌ। মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন?

ইন্দ্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন, সেই দুঃখে তাঁহার রোগ হয়, সেই রোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

প্রায় এক দণ্ডকাল কেহ কথা কহিলেন না, এক দণ্ডকাল নৌকা জলে ভাসিতে লাগিল, এক দণ্ডকাল পর ইন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, দরবিগলিত অশ্রুধারায় অপরিচিতের মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল ও সমস্ত বস্ত্র সিক্ত হইয়া গিয়াছে! ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন।

নৌকা এক ক্রোশ ভাসিয়া গেল, গঙ্গার জল উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে, আকাশে দুই এক খণ্ড শুভ্র মেঘ দেখা যাইতেছে, কখন কখন চন্দ্রকে ঈষৎ আবরণ করিতেছে, আবার বায়ুতে তাড়িত হওয়াতে চন্দ্রের পুণ্যজ্যোতিঃ নদীর প্রশান্ত বক্ষে পতিত হইতেছে। আকাশ গভীর নীলবর্ণ, দুই একটী তারা লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় কখন কখন মুখ দেখাইতেছে। জগতে সমস্ত জীব নিস্তব্ধ, কেবল কখন কখন দূর হইতে একটী গীত বায়ুমার্গে ভাসিয়া আসিতেছে, আর সেই বিস্তীর্ণ গঙ্গা-বারিতে ও পার্শ্বস্থ শুভ্র সৈকতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গঙ্গায় আর একটী নৌকাও চলিতেছে না। কেবল সুরেন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র তরী তর্‌ তর্‌ শব্দে ভাসিতেছে।

যাইতে যাইতে তীর হইতে একটী আলোক দৃষ্ট হইল। তখন অপরিচিত নৌকারোহী সেই আলোক দেখাইয়া ধীর স্বরে বলিলেন,—ঐ আমার গৃহ, আর উহার অনতিদূরে যে নিকুঞ্জ দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমার হৃদয় সংস্থাপিত আছে।

নৌকাস্বামীর গম্ভীর ভাবে চমকিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন তাঁহার চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু টল্‌ টল্‌ করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হইল। স্নেহপূর্ব্বক সেই জল মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বন্ধু আপনার নাম আমি জানি না, আপনার কার্য্য জানি না, কিন্তু তথাপি আপনাকে বন্ধু বলিয়া, ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইতেছে। বন্ধুর নিকট, ভ্রাতার নিকট, মনের দুঃখ খুলিয়া বলুন, যদি আমার সাধ্য থাকে আপনার দুঃখ মোচন করিব।

নৌকাস্বামী উত্তর করিলেন,—যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, অনুগ্রহবোধে আমার কুটীরে আসুন, আমি সমস্ত কথা আপনাকে নিবেদন করিব।

সুরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। তরী তীরে লাগিল। দুইজনে নিঃশব্দে সেই তরীচালকের ক্ষুদ্র কুটীরে গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : নৌকাস্বামীর পূর্ব্বকথা

How sweet the days that I have spent,
In you sequestered bower;
Those citron trees, still sweet of scent,
Had then some magic power.
Or some fair spirit did reside,
In that sweet purling brook,
Which runs by you green mountain side,
Now haunted by the rook.
No charm was in the spicy grove,
No spirit in the stream,
O 'twas the smile of her I love,
Now vanished like a dream! —*I. C. Dutt.*

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন বন্ধুর কুটীরে আসিলেন। দেখিলেন, কুটীর ক্ষুদ্র কিন্তু ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বাহিরে একটী ক্ষুদ্র বাগান আছে, তাহাতে কয়েকটী ফলবৃক্ষ আছে.

নিকটে একটী গ্রাম আছে, সম্মুখে অনন্ত নদী, পশ্চাতে সুন্দর কুঞ্জবন ও ধান্যক্ষেত্র। এই কুটীরস্বামী মুঙ্গেরে সামান্য কার্য্য করিতেন, কিন্তু স্বভাবতঃ চিন্তা ও খেদ-পরায়ণ হওয়ায় নগর হইতে দূরে একটী গ্রামের নিকট বাটী করিয়াছিলেন, তথায় একাকী থাকিতেন, একাকী গীত গাইতেন, এবং সায়ংকালে একাকী আপন নৌকা আপনি নদীবক্ষে বাহিতেন। উভয়ে উপবেশন করিলে পর সেই অপরিচিত সুরেন্দ্রনাথকে বলিতে লাগিলেন,—

"যুবক! আপনার হৃদয়ে যদি ক্রোধ ও দর্প থাকে, তাহা ত্যাগ করুন,—এই দর্পেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শৈশবাবস্থা হইতে আমি অতিশয় গর্ব্বী ছিলাম। শুনিয়াছি, অতি শৈশবেও আমার কোন বিষয়ে ইচ্ছা যদি সম্পন্ন না হইত, তাহা হইলে আমি এক দিন, দুই দিন অনাহারে থাকিতাম। এই বিজাতীয় ক্রোধেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

"বাল্যাবস্থায়ও এইরূপ ছিলাম। আমার মন স্বভাবতঃ পাঠাভ্যাসে রত হইত, কিন্তু কখন যদি গুরুমহাশয় অন্যায় তিরস্কার করিতেন, তাহা হইলে আমার সেই বিজাতীয় ক্রোধের আবির্ভাব হইত, পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিতাম, সহস্র বেত্রাঘাতেও আমি কথা কহিতাম না, ক্রন্দন করিতাম না। গুরুমহাশয় আমাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে আমার ক্রোধ দেখিয়া আমার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন। একদা এরূপ রুষ্ট হইয়া আমাকে সহস্র যাতনা দিলেন, আমি ক্রন্দন করিলাম না, মুহূর্ত্তমধ্যে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তখন গুরুমহাশয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া ক্রোড়ে করিলেন, জলসেচনের দ্বারা আমাকে শীঘ্রই চেতনা দান করিলেন। সেই অবধি আমার পড়া সাঙ্গ হইল। গুরুমহাশয় আর আমাকে পড়াইলেন না, আমি জন্মের মত মূর্খ রহিলাম।

"আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে কখন নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাই। তিনি আমার হৃদয় জানিতেন ও আমাকে এরূপ ভালবাসিতেন যে, কখনও তাঁহার একটী কথাতেও মনে বেদনা জন্মে নাই। আমি পিতার অবাধ্য হইয়াছি, গুরুর অবাধ্য হইয়াছি, কিন্তু কস্মিনকালেও মাতার একটি কথা অবহেলা করি নাই। গৃহের সমস্ত লোকে উপরোধ করিলে, ভয় প্রদর্শন করিলে, প্রহার করিলে, আমি যে কার্য্য না করিতাম, মাতা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই আমি তাহা করিতাম। হায়! সে স্নেহের প্রতিমাকে আমি আর দেখিতে পাইব না।" বলিতে বলিতে বক্তার কণ্ঠরুদ্ধ হইল, মুখ নত করিয়া অনবরত অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন, আপনার মাতার কাল হইয়াছে?

অপরিচিত উত্তর করিলেন,—শুনিয়াছি তাঁহার কাল হইয়াছে।

ক্ষণেক অশ্রু বিসর্জ্জনের পর হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

"আমার পিতা দেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমীদার ছিলেন, তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা, লোকজন এবং সৈন্যসামন্ত ছিল, এবং স্বভাবতঃ তিনি কিছু গর্ব্বিত ও রুষ্ট ছিলেন। আমাকে যথার্থ ভালবাসিতেন, আমার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার লোচন আনন্দে উৎফুল্ল হইত, আমার নিন্দা শুনিলে তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া যাইত; কিন্তু তথাপি তিনি সর্ব্বদা স্বাভাবিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। একদিন আমাকে নির্দ্দোষে প্রহার করিলেন ও বলিলেন, 'তোর মুখ আর দেখিতে চাহি না, আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যা।' 'চলিলাম', বলিয়া আমি পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলাম।

"প্রহারে ও তিরস্কারে অনেক বালক শান্ত হয়, কিন্তু আমি ক্রোধে অন্ধ হইলাম; হৃদয়ে হুতাশন জ্বলিতে লাগিল। সেই হুতাশন পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ, সকলই দগ্ধ করিল। সেই হুতাশনে আমার ভাবী সংসার-সুখ, পিতামাতার আশা ভরসা একেবারে দগ্ধ করিল। পিতা আমাকে দূর হইতে বলিলেন, আমি দূর হইলাম। সেই অবধি আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছি। তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

"তাহার পর কয়েক বৎসর আমার জীবন যে কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। মরুভূমিতে প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় আমার জীবনের দশ বৎসর বহিতে লাগিল। প্রচণ্ডতা আছে, কিন্তু ফল নাই, অর্থ নাই, কাহারও উপকার নাই। নির্জ্জন প্রাণিশূন্য পর্ব্বতপার্শ্বে সমুদ্রগর্জ্জনবৎ আমার হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি সমুদয় গর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু সে গর্জ্জনের শ্রোতা নাই; সে গর্জ্জনে কেহ আনন্দিত হয় নাই, কেহ বিস্মিত হয় নাই।

পাতালপ্রবাহিনী, ভৈরবকল্লোলিনী ভোগবতীর তরঙ্গমালার ন্যায় আমার হৃদয়কন্দরে কত প্রবৃত্তি প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সে প্রবাহ ভোগবতীর ন্যায় মনুষ্যের অদৃশ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন।

“দশ বৎসর অতীত হইলে সেই অন্ধকাররাশি সহসা আলোকচ্ছটায় চমকিত ও উদ্দীপ্ত হইল।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া বক্তা ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিস্পন্দনেত্রে সেই অপূর্ব্ব উন্মত্তপ্রায় লোকের দিকে দেখিতে লাগিলেন, অনন্যমনে তাঁহার উন্মত্ততার কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনিও ক্ষণেক পর আরম্ভ করিলেন,—

“যে সকল প্রবৃত্তিতে আমার হৃদয় দশ বৎসর কাল ব্যথিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রেম সর্ব্বাগ্রগণ্য। (সুরেন্দ্রনাথ অধিকতর আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।) সামান্য স্ত্রীলোকের প্রেম আমি আকাঙ্ক্ষা করিতাম না, যে প্রেম মানব-হৃদয়কে একেবারে পরিপূর্ণ করিতে পারে, যে প্রেম জীবনের অংশস্বরূপ, দেহের আত্মাস্বরূপ, যে প্রেম শেষ হইলেই জীবন শেষ হয়, সেইরূপ প্রেম আমি আকাঙ্ক্ষা করিতাম। কতবার অন্ধকারে বসিয়া সেই প্রেমের কল্পনা করিতাম। চিন্তাবলে কতবার শূন্য হইতে অলৌকিক স্নেহসম্পন্না প্রেমপ্রতিমাকে জাগরিত করিয়া তাঁহারই সহিত কালহরণ করিতাম! সহসা সে সুন্দর মূর্ত্তি জলবিম্বের ন্যায় ভিন্ন হইয়া যাইত; কল্পনাশক্তি শ্রান্ত হইত; আমি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতাম।

“দিন দিন এইরূপ কল্পনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবাকালে অর্দ্ধেক সময় আমি এজগতে থাকিতাম না, কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতাম। সে জগতে উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বল ক্ষেত্রবৃক্ষ, উজ্জ্বল অট্টালিকা, উজ্জ্বল গৃহদ্রব্যাদি,—তন্মধ্যে সেই উজ্জ্বল প্রেমপ্রতিমা আসীন রহিয়াছেন। নিবিড় কৃষ্ণকেশে জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণকান্তি মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, বালিকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুটী অল্প প্রেমহাস্যে বিস্ফারিত, ভ্রমর-কৃষ্ণ চক্ষু দুটী প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল প্রেমে ঢল্ ঢল্ করিতেছে। সহসা কল্পনাশক্তি ছিন্ন-তার বীণাসম নীরব হইত। আমিও মূর্চ্ছিত হইতাম।

“একদিন নিশাবসানে ঐ রূপ-কল্পনা ছিন্ন হওয়াতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া এই গঙ্গাতীরে ঐ নিকুঞ্জবনে শুইয়া রহিয়াছি। কতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিলাম বলিতে পারি না,—বোধ হইল, মস্তকে ও মুখে কে জলসিঞ্চন ও ব্যজন করিতেছেন। ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি,—আপনি বিশ্বাস করিবেন না,—সেই প্রেমপ্রতিমা! সেই স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার মুখে জল দিতেছে!”

উভয়েই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। ক্ষণেক পর সেই অপরিচিত লোক আবার বলিতে লাগিলেন,—

“সুরেন্দ্রনাথ! আমি আর অধিক কথা কহিতে পারি না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সেই বালিকা কায়স্থকন্যা, অবিবাহিতা, অনাথা এবং জ্ঞাতির অন্নে পালিতা। আমি বালিকার পাণিগ্রহণ করিলাম, তাহার পর কয়েক বৎসর যেরূপ সুখস্বপ্নে অতিবাহিত হইল, তাহা বর্ণনার অতীত।

“ঐ যে নিকুঞ্জবন দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমরা বাস করিতাম। শরৎকালের ঊষা আকাশে যে পবিত্র বর্ণ বিস্তীর্ণ করে, প্রেম আমাদের হৃদয়-আকাশে তদপেক্ষা পবিত্র বর্ণে চিরকালই রঞ্জিত হইয়া থাকিত। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার যেরূপ শান্ত ও নিস্তব্ধ, আমাদের হৃদয়ে প্রেম তদপেক্ষা নিস্তব্ধ ও শান্তভাবে বিরাজ করিত। আমি সে রমণীকে কুঞ্জবাসিনী বলিতাম, কেন না, ঐ যে কুঞ্জবন দেখিতে পাইতেছেন, ঐ স্থানে”—

আর কথা সরিল না। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন অপরিচিত উন্মত্তের ন্যায় সেই কুঞ্জবনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন,—মুখে কোন ভাবই নাই, সংজ্ঞার কোন লক্ষণ নাই। সুরেন্দ্রনাথ অনেক যত্নে তাঁহাকে চৈতন্যদান করিলেন। পরে অন্য কথা কহিতে কহিতে রাত্রি অনেক হইল। দুই ভ্রাতার মত দুই জন এক শয্যায় শয়ন করিলেন, অচিরে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : বঙ্গবিজেতা

A combination and a form indeed
Where every god did seem to set his seal
To give the world assurance of a man.
—*Shakespeare.*

মুঙ্গেরের প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে একটী প্রশস্ত গৃহে এক বীরপুরুষ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ইনি ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল।

তাঁহার নিকটে সে সময়ে অধিক লোক নাই, দুই চারি জন অতি বিশ্বাসী যোদ্ধা আসীন ছিলেন। অতি মৃদুস্বরে যুদ্ধের পরামর্শ হইতেছিল। এমন সময় একজন সৈনিক আসিয়া প্রণিপাত করিয়া বলিল,—

মহারাজ! একজন অশ্বারোহী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক, অনুমতির জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান আছে।

টোড। তাঁহার বক্তব্য কি জিজ্ঞাসা কর।

সৈন্য। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—বলিলেন, মহারাজের সহিত দর্শন ভিন্ন বলিতে পারি না, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

টোড। হিন্দু কি মুসলমান?

সৈন্য। কায়স্থ জমীদারপুত্র।

টোড। বঙ্গদেশে অনেক পরাক্রান্ত কায়স্থ জমীদার আছেন; শুনিয়াছি তাঁহাদিগের আট লক্ষ সেনা আছে; সম্রাটের কার্য্যে তাঁহাদিগের সহায়তা আবশ্যক। আগন্তুককে আসিতে বল।

সৈনিক পুরুষ অশ্বারোহীকে আনিতে যাইল।

এই অবসরে আমরা পাঠক মহাশয়কে রাজা টোডরমল্লের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ক্ষত্রিয়কুলাবতংস টোডরমল্ল অপেক্ষা সর্ব্বগুণবিভূষিত বীরপুরুষ কখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমিতে অনেক পুণ্যাত্মা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বীরপ্রসূ ক্ষত্রিয়কুলে অনেক বীর-পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এই তিন গুণেই বিভূষিত ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা দিল্লীশ্বর আকবরশাহের সহিত পঞ্জাব গমন করিবার সময় দ্রুত ভ্রমণবশতঃ তাঁহার দেবারাধনা কার্য্যে বিঘ্ন হইয়াছিল। টোডরমল্ল প্রাতঃকালে দেবারাধনা না করিয়া কোন কর্ম্মই করিতেন না, জলগ্রহণও করিতেন না; সুতরাং দেবারাধনার ব্যাঘাত হওয়াতে তিনি অনাহারে রহিলেন। আকবরশাহ অনেক অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে লওয়াইতে পারিলেন না। আবুলফাজেল প্রভৃতি আকবরের মুসলমান অমাত্যগণ টোডরমল্লকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া সততই নিন্দাবাদ করিত, কিন্তু মহানুভব দিল্লীশ্বর স্বধর্ম্মানুরাগী বীরকে সম্মান করিতেন। যখন টোডরমল্ল বৃদ্ধ হইলেন, যখন তাঁহার যশে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার পদ ও গৌরব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, তিনি সেই সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া গঙ্গাতীরে মানবলীলা সম্বরণ করিবেন, এই অভিলাষে দিল্লীশ্বরের অনুমত্যনুসারে রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বার গমন করেন।

ক্রমান্বয়ে তিনবার বঙ্গদেশ জয় করিয়া রাজা টোডরমল্ল সাহস ও যুদ্ধ-কৌশলের যথেষ্ট প্রমাণ দেন। প্রথমবার মনাইমখাঁর ও দ্বিতীয়বার হোসেনকুলীখাঁর অধীনে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারই সাহসে দুইবারই জয়লাভ হয়। তৃতীয়বার তিনি স্বয়ংই সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশে নহে, তিনি যেস্থানে যাইয়াছিলেন, সেই স্থানেই অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুজরাট প্রদেশে বিদ্রোহীদিগের সহিত যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহাতে টোডরমল্ল সিংহের মত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধোলকার-যুদ্ধে সেনাপতি ভিজারখাঁ

পলায়ন-তৎপর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা টোডরমল্ল তাঁহাকে নিষেধ করিয়া এরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ করিলেন যে, বিজয়লক্ষ্মী অগত্যা তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইলেন। আকবরশাহের অসংখ্য সেনাপতি ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে টোডরমল্ল অপেক্ষা কোন সেনাপতিই অধিক বীরত্ব ও সাহস দেখাইতে পারেন নাই।

আকবরশাহ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্ব-স্থিরীকরণ-ভার রাজা টোডরমল্লের উপর ন্যস্ত করেন। সেই দুরূহ কর্ম্ম তিনি যেরূপে সম্পন্ন করেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

রাজা টোডরমল্ল লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা দারিদ্র্যজনিত যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াও শিশুকে অতি যত্নে লালন পালন করেন। শিশুও অল্প বয়সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রকাশ করেন ও প্রথমে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন। স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবশতঃ এই নীচ কর্ম্ম হইতে তিনি রত্নপরিপূর্ণ আকবরশাহের সভার মধ্যে প্রধান রত্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সৈনিক পুরুষ সেই অপরিচিত আগন্তুককে রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। তিনি পাঠকের অপরিচিত নহেন। টোডরমল্ল জিজ্ঞাসা করিলেন,—যুবক! তোমার নাম কি? যুবক উত্তর করিলেন,—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী।

টোড। নিবাস কোথায়?

ইন্দ্র। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ইচ্ছাপুর গ্রামে।

টোড। তোমার কত সৈন্য আছে?

ইন্দ্র। সম্রাটের কার্য্য ও দেশ সুশাসনের জন্য পিতার দুই তিন সহস্র পদাতিক সৈন্য বঙ্গদেশে আছে। কিন্তু আপাততঃ আমি একাকীই সম্রাটের কার্য্য-সাধনার্থ বিহার প্রদেশে আসিয়াছি।

রাজা টোডরমল্ল কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধভাবে যুবকের প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যুবকের আকারে উদারভাব ভিন্ন কিছু মাত্র লক্ষিত হইল না। ক্ষণেক পর রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তোমার পিতা কি সম্রাটের কার্য্যে কিছু সেনা এই স্থানে পাঠাইতে পারেন নাই?

ইন্দ্র। প্রভুর আজ্ঞা পাইলে পাঠাইবেন। অধুনা অনুমতি হইলে আমি প্রভুর কার্য্য-সাধনের আশা রাখি।—বলিয়া কোষ হইতে একবার অসি বাহির করিয়া পুনরায় কোষে রাখিলেন।

সাদীকখাঁ নামক সেনাপতি বলিলেন,—যুবক! তুমি যেরূপ অসি ধারণ করিলে, আমার বিশ্বাস, যুদ্ধে তোমার হস্তে অসির অপমান হইবে না।

তারসনখাঁ নামক অপর একজন সেনাপতি মৃদুস্বরে রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ! এ শত্রুদিগের গুপ্তচর, ইহাকে জল্লাদহস্তে অর্পণ করুন।

রাজা টোডরমল্ল কাহারও কথায় উত্তর না দিয়া বার বার যুবকের উপর তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকৃতিতে বা মুখভঙ্গিতে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলেন না। বিশেষ পরীক্ষার জন্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—তুমি একাকী আমাদের কার্য্যসাধনে আসিয়াছ, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

ইন্দ্র। আমার একটী ভিক্ষা আছে। আপনাকে যদি প্রভুভক্তি প্রদর্শনে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তবে সে ভিক্ষা করিব, এক্ষণে সে ভিক্ষা করা বৃথা হইবে।

টোড। শত্রুরা আমাদের সৈন্যমধ্যে বিদ্রোহ উত্থাপন করিবার জন্য অনেক চর প্রেরণ করিতেছে। তুমি তাহাদিগের একজন নহ, আমি কিরূপে জানিব?

ইন্দ্র। কায়স্থ জমীদারপুত্রের কথার উপর বোধ হয় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।

টোড। অনেক সময়ে অভদ্র লোকও ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করে; অনেক সময়ে ভদ্রবংশীয় লোক কপটাচারী হয়।

ইন্দ্র। মহারাজ! কপটাচরণ কখন করি নাই, আমাদের বংশে সে দোষ নাই। ক্রোধে ইন্দ্রনাথের স্বর বদ্ধ হইল।

টোড। তোমার কথা উদারচেতা বীরপুরুষের ন্যায়, কিন্তু অনেক সময়ে গভীর খলতা বাহ্যিক ঔদার্য্য অবলম্বন করে।

ইন্দ্রনাথের মুখ ক্রোধে রক্তিমা ধারণ করিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—যদি আপনার নিকট কপটাচরণ করিবার জন্য আসিয়াছি বিশ্বাস হয়, তবে বিদায় দিন চলিয়া যাই।

টোডরমল্ল তুষ্ট হইলেন, ইন্দ্রনাথকে সম্মানপুরঃসর অশ্বারোহীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : বন্ধুর স্মরণার্থ

ALAS! they had been friends in youth!
—*Coleridge.*

কয়েক মাস বিগত হইল; ইন্দ্রনাথ ক্রমে যুদ্ধকার্য্যে নৈপুণ্য ও খ্যাতি লাভ করিলেন। বিদ্রোহিগণ ভাগলপুরে সমবেত হইয়াছিল, সুতরাং ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের মধ্যদেশে সর্ব্বদাই যুদ্ধাদি হইত।

একদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বিদ্রোহিগণ টোডরমল্লের দুর্গে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। টোডরমল্ল তাহাদিগের উদ্দেশ্য পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং অনায়াসে তাহাদিগের চেষ্টা প্রতিরোধ করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তিনি দুর্গের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার উৎসাহে, তাঁহার বুদ্ধিবল ও রণকৌশলে, সৈন্যগণ প্রোৎসাহিত হইয়া অনায়াসে শত্রুদিগকে সকলস্থানে পরাস্ত করিল। টোডরমল্ল ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্রনাথের সাহস ও যুদ্ধে উৎসাহ দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন, অদ্য সমস্ত দিন ইন্দ্রনাথ যেরূপ সাহসের সহিত শত্রুদিগের সহিত বার বার যুদ্ধ দান করিলেন, তাহাতে সেনাপতি যাহার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। সূর্য্যাস্তের সময় শত্রুগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ভাগলপুরের দিকে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর ইন্দ্রনাথ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন টোডরমল্ল একাকী বিশ্রাম করিতেছেন, ইন্দ্রনাথকে আসিতে অনুমতি দিলেন।

ইন্দ্রনাথের অদ্যকার সাহসিক কার্য্য দেখিয়া টোডরমল্লের মন প্রফুল্ল হইয়াছিল, তিনি যুবা সৈনিককে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া নিকটে বসাইলেন। তাঁহাদের নিকটে তখন আর কেহ ছিল না।

তখন টোডরমল্ল বলিলেন,—

ইন্দ্রনাথ! তুমি অদ্য যেরূপ বিক্রম দেখাইয়াছ, তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়াছি। আজিকার যুদ্ধে তোমার জীবন সংশয়স্থলে ছিল।

ইন্দ্র। মহারাজ! যে দিন সৈনিক হইলাম, সেই দিনই রাজকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, তবে যদি এ যুদ্ধের পরও জীবিত থাকি, তবে সে আপনার আশীর্ব্বাদে, আর পিতার পুণ্যবলে।

টোড। তোমার পিতা দেশে আছেন?

ইন্দ্র। আছেন।

টোড। তোমার ভ্রাতা ভগিনী কয়জন?

ইন্দ্র। আমার একজন জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার কাল হইয়াছে। এক্ষণে আমিই পিতার একমাত্র সন্তান।

টোডরমল্লের মুখ গম্ভীর হইল। বলিলেন,—যদি এই যুদ্ধে তোমার নিধন হয়, তবে তোমার পিতার কি মনঃপীড়া হইবে! আমারও পুত্র আছে, সেই জন্যই এই ভাবনা আসিতেছে। ধারুর বয়ঃক্রম তোমারই মত, তাহার সাহস তোমারই মত, তোমারই মত সে বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। মরণকে ভয় করে না। যদি সে যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহার পিতার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইবে। তথাপি রাজকার্য্যে মরণাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কি আছে? সম্রাট আকবরশাহের কার্য্যে আমরা পিতা পুত্রে নিয়োজিত আছি: সে কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিতে আক্ষেপ নাই।

ইন্দ্র। বিধাতা সে দিন এখনও দূরে রাখুন; তাহার পূর্ব্বে প্রভু বহুদিন জীবিত থাকিয়া দিল্লীশ্বরের কার্য্য নির্ব্বাহ করুন, গৌরব ও খ্যাতি অর্জ্জন করুন। আপনার ন্যায় গৌরবান্বিত নাম ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের মধ্যে কাহারও নাই, আপনার ন্যায় গৌরবের কার্য্য কেহ সাধন করে নাই।

টোড। আমার অপেক্ষা গৌরবের কার্য্যে আমার জীবনের একজন বন্ধু প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। টোডরমল্ল এই কথা বলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ইন্দ্রনাথ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; টোডরমল্ল ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—অদ্য আমার আনন্দের দিন, অদ্য যেরূপ শত্রু পরাস্ত হইয়াছে তাহা শুনিয়া দিল্লীশ্বর অতিশয় তুষ্ট হইবেন, কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে অদ্য আমার একটী দুঃখের কথা মনে উদয় হইতেছে। এই মাসের এই দিনে আমার বাল্যকালের একজন পরম সুহৃদ্ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সে আজ ঠিক দ্বাদশ বৎসর হইল।

ইন্দ্র। সে মহাত্মাও বোধ হয় যোদ্ধা ছিলেন, তিনিও বোধ হয় দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন দান করিয়াছিলেন।

টোড। আশৈশব তাঁহার যুদ্ধ ভিন্ন অন্য ব্যবসা ছিল না, কিন্তু তিনি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন দান করেন নাই, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জীবন দিয়াছেন।

টোডরমল্লের মুখে এ কথা শুনিয়া ইন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন, টোডরমল্ল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—

দিল্লীশ্বরের পুরাতন দাসের নিকট দিল্লীশ্বরের শত্রুর প্রশংসা শুনিয়া তুমি চমকিত হইতেছ; কিন্তু তুমি যদি দিল্লীতে কখন গমন কর, স্বয়ং আকবরশাহের মুখে তাঁহার পরম শত্রু রাণা প্রতাপসিংহের প্রশংসা শুনিয়া আরও চমকিত হইবে। ইন্দ্রনাথ! আকবরের কার্য্যে আমার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, আকবরের শত্রুই আমার শত্রু; কিন্তু তথাপি সাহস, অধ্যবসায় ও স্বদেশপ্রিয়তা দেখিলে, কি শত্রু কি মিত্র সকলেই প্রশংসা করে। প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতায় যেরূপ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পর্ব্বতকন্দরে ও মরুভূমিতে বাস করিয়া বৎসর বৎসর আকবরের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ দান করিতেছেন তাহাতে আকবরশাহ স্বয়ং বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। আজি চারি বৎসর হইল প্রতাপ হলদীঘাটার যুদ্ধে অনেক সৈন্য হারাইয়াছেন, তাহার পর দুর্গ, ভূমি, সম্পত্তি, সমস্তই হারাইয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যের পণ, মনুষ্যের সাহস ও অধ্যবসায় হারান নাই। কন্দরবাসী প্রতাপ এখনও স্বদেশের জন্য যুঝিতেছেন, যত দিন জীবিত থাকিবেন যুঝিবেন। কি শত্রু কি মিত্র, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, এরূপ মুসলমান নাই. যে তাঁহার সাধুবাদ করে না। ভারতবর্ষ আজ প্রতাপসিংহের গৌরবে পূর্ণ।

ইন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। টোডরমল্ল ধীরে ধীরে বলিলেন,—

কিন্তু প্রতাপসিংহের কথা আমি অদ্য চিন্তা করি নাই; আর একজন যোদ্ধা, যিনি দ্বাদশ বৎসর হইল সেই মেওয়ারের রাজধানী চিতোর রক্ষার্থ জীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহারই চিন্তা করিতেছিলাম। ইন্দ্রনাথ! অদ্য তোমার কার্য্য দেখিয়া আমি তুষ্ট হইয়াছি, সকলের সম্মুখে আমি যে কথা বলি না তোমাকে তাহা বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি। একটী গল্প শ্রবণ কর।—

যৌবনের প্রারম্ভে আমি মেওয়ার দেশে একবার ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। একটী বরাহ-শীকারে আমি প্রায় জীবন হারাইয়াছিলাম, একজন অসুরবীর্য্য যোদ্ধার অব্যর্থ বর্ষা আঘাতে সে বরাহ হত হইল, আমি পরিত্রাণ পাইলাম। সেই অসুরবীর্য্য যোদ্ধা সূর্য্যমহল-দুর্গের তিলকসিংহ।

ক্রমে তিলকসিংহের সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য হইল, তখন তাঁহার অসাধারণ গুণ আমি ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলাম, তিনিও আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব হইল।

জীবনের বন্ধুত্ব একবার হয়, দুইবার হয় না। ইন্দ্রনাথ! নারীর প্রণয়ের কথা তুমি অনেক পড়িয়াছ, অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু যৌবনে দুইজন সরলস্বভাব, উৎসাহপূর্ণ পুরুষের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়, তাহা অপেক্ষা প্রকৃত প্রণয় আমি এ জগতে কিছুই জানি না।

যখন আমি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে ব্রতী হইলাম. তখন তিলকসিংহকেও সেই কার্য্যে ব্রতী করিবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার ন্যায় রণপণ্ডিত ও অসুরবীর্য্য যোদ্ধা যদি দিল্লীশ্বরের কার্য্য স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে দিল্লীশ্বরের এরূপ সেনাপতি নাই. যে তিলককে গুরু বলিয়া না মানিত। তিনি এতদিনে বঙ্গদেশ বা দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা হইতেন।

কিন্তু তিলকসিংহ সে কার্য্যে ব্রতী হইলেন না। তিনি আমার প্রস্তাবে যে উত্তর দিলেন

তাহা অদ্যাবধি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমার পিতা, আমার পিতামহ, আমার প্রপিতামহ মেওয়ারের রাণার কার্য্য করিয়াছেন, আমিও সেই কার্য্য করিব। দিল্লীশ্বর চিরকালই মেওয়ারের শত্রু, তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক নাই। অথবা শুনিয়াছি আকবর চিতোর অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন; যদি তিনি সেই উদ্যমে চিতোরে আইসেন তবে তিলকসিংহের সহিত তাঁহার একদিন সাক্ষাৎ হইবে।"

বীর যে কথা বলিলেন, তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন দিল্লীশ্বর চিতোর আক্রমণ করিলেন, তখন তিলকসিংহ সিংহবল প্রকাশ করিয়া চিতোর রক্ষার্থ জীবন দান করিলেন। স্বয়ং দিল্লীশ্বর তাহা দেখিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং আমাকে সে কথা বলিয়াছিলেন।

টোডরমল্ল অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে বীর আকৃতি ম্লান হইল; সেই যোদ্ধার গণ্ডস্থল দিয়া এক বিন্দু অশ্রু বহিয়া পড়িল। সে অশ্রু মোচন করিয়া টোডরমল্ল কহিলেন,—

ইন্দ্রনাথ! প্রতাপসিংহ এক্ষণে আমাদের শত্রু। শুনিয়াছি তিলকের পুত্র তেজসিংহ* এখন প্রতাপ সিংহের অধীনে যুদ্ধ করিতেছেন, যদি দিল্লীশ্বর আমাকে মেওয়ারে প্রেরণ করেন তবে বন্ধুপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সংকুচিত হইব না। তথাপি শত্রুরও যদি গুণ থাকে সে গুণ স্বীকার করা নিষিদ্ধ নহে, জীবনে পরম বন্ধু যদি বিধির বিড়ম্বনায় শত্রু-পক্ষীয় হয়েন, তাঁহার মৃত্যুর জন্য এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করা নিষিদ্ধ নহে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : অপরিচিত শত্রু ও পরিচিত বন্ধু

> PRISONER! pardon youthful fancies;
> Wedded? if you can say no!
> Blessed is and be your consort:
> Hopes I cherished, let them go!
>
> —*Wordsworth.*

টোডরমল্লের শিবির হইতে ইন্দ্রনাথ চিন্তা ও বিস্ময় ও খেদপূর্ণ হইয়া নিজ শিবিরে আসিলেন। একাকী নির্জ্জনে বসিয়া মেওয়ার ও প্রতাপসিংহ ও তিলকসিংহের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিলেন; মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল,—

"তোমার বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষে যাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই, তুমি তাহার চক্ষে ধূলি দিয়াছ। আমরাও ঐ পথ অবলম্বন করিব, কেন না, যে পতনোন্মুখ গৃহ অগ্রে ত্যাগ করে, সেই বুদ্ধিমান। অদ্য এক প্রহর রজনীতে শ্মশানঘাটে দেখা হইবে।"

এ পত্রের কিছুই অর্থগ্রহণ করিতে পারিলেন না। "ভারতবর্ষে যাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই"—সে কে? বোধ হয় রাজা টোডরমল্ল, কিন্তু তাঁহার চক্ষে ধূলা কে দিয়াছে? পতনোন্মুখ গৃহ কি? ইন্দ্রনাথের বোধ হইতে লাগিল যে, কোন বিদ্রোহিকর্ত্তৃক এই পত্র লিখিত হইয়াছে, শ্মশানঘাটে যাওয়া কি কর্ত্তব্য? ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যাওয়ায় কোন হানি নাই, বরং কোন গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান পাইতেও পারি। নিরূপিত সময়ে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই, অসিই তাঁহার একমাত্র সহায়।

রজনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন, আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন! আকাশে নীলমেঘ উড়িতেছে; এক একখানি করিয়া সেই মেঘ পশ্চিম দিকে রাশীকৃত হইতেছে; সেই পশ্চিম দিক হইতে ক্ষণে

---

* যাঁহারা তেজসিংহের বীরত্বের কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা "জীবন-সন্ধ্যা" আখ্যায়িকা পাঠ করুন।

ক্ষণে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে; বিদ্যুৎ-আলোকে শ্মশানের ভয়ানক বস্তু সকল এক এক বার দেখা যাইতেছে। কোন স্থানে সম্প্রতি শবদাহ হইয়াছে, ভস্মরাশির মধ্যে অগ্নি এক এক বার দেখা যাইতেছে; কোন স্থানে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা চারিদিকে নিবিড় অন্ধকারকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে নানারূপ ছায়া দেখা যাইতেছে, নিকটস্থ বৃক্ষরাশির মধ্য দিয়া বায়ুবেগবশতঃ নানারূপ অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ-গোচর হইতেছে। সেই ছায়া দেখিয়া, সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ সাহসী হৃদয়ও এক এক বার স্তম্ভিত হইতে লাগিল। কখন কখন দূরে যেন ভয়ানক আকৃতি দেখিতে লাগিলেন, সেই দিকে গমন করিয়া কখন বা দেখেন ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে, কখনও বা বোধ হয়, যেন সেই আকৃতি ধীরে ধীরে যাইয়া বৃক্ষের অন্ধকারে লীন হইতেছে। গগনমণ্ডল ক্রমশঃই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, বায়ু ক্রমশঃই ভীষণতর শব্দ করিয়া বহিতে লাগিল, গঙ্গার তরঙ্গ ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর হইতে লাগিল। আকাশে নক্ষত্র মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, দূরে শিবাগণ মুহুর্মুহুঃ বিকট শব্দ করিতেছে, যেন দূরে হইতে প্রেত ও পিশাচের অট্টহাসি শ্রুত হইতেছে।

যেদিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল, সেই দিকে যেন বোধ হইল, দুইটী ভীষণ আকৃতি অন্ধকারে দেখা যাইতেছে। ইন্দ্রনাথ তাহা প্রথমে গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু যতবার সেই দিকে নয়নপাত করেন, ততবারই সেই ভীষণ আকৃতি দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রনাথ সেই দিকে আগমন করিলেন, বোধ হইল, যেন সেই আকৃতিদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইয়া যাইল। ইন্দ্রনাথ সে দিক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, বোধ হইল, যেন জঙ্গলের ভিতর হইতে অট্টহাসি শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া দেখিলেন, সেই দুই ভীষণ আকৃতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

“ভগবান সহায় হউন!”—এই কথা বলিয়া ইন্দ্রনাথ অসিহস্তে ধীরে ধীরে সেই দিকে পুনরায় গমন করিলেন। অতিশয় সতর্কতার সহিত আকৃতিদ্বয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জঙ্গলের নিকটে আসিতে না আসিতে আবার সেই আকৃতিদ্বয় অদৃশ্য হইল। আবার দূর হইতে সেই পৈশাচিক অট্টহাসি শ্রুত হইল।

“ভগবান সহায় হউন!” বলিয়া সেই জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেস্থানে এরূপ নিবিড় অন্ধকার যে, চারি হস্ত দূরে কোনও দ্রব্যই লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়াছে; ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতেছে। সেই হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার শরীরের উপর যেন কে হস্ত স্থাপন করিল।

ইন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, প্রেত নহে, তাহারা দুই জন ছদ্মবেশী মনুষ্য। তাহারা ইঙ্গিত করিয়া ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিল। ইন্দ্রনাথ তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই দুইজন মনুষ্যের সহিত অনেকক্ষণ নীরবে যাইতে লাগিলেন। চতুঃপার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল ও নিবিড় অন্ধকার; নিঃশব্দে তিন জনে সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে গঙ্গাতীরে এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় মুখমণ্ডল হইতে আবরণ খুলিয়া লইল, ইন্দ্রনাথ তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। তাহারা হুমায়ুন ও তর্খান নামক রাজা টোডরমল্লের অধীনস্থ দুই জন সেনাপতি।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এত রাত্রিতে এই ভয়ঙ্করবেশে এস্থানে আপনারা কি করিতেছেন?

হুমায়ুন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—সেনানী ইন্দ্রনাথের সাহস পরীক্ষা করিতেছিলাম।

ইন্দ্রনাথ। আমি আপনাদিগের নিকট পরীক্ষা দিতে যদি অসম্মত হই।

হুমায়ুন। তাহা হইলে বোধ করিব, আমরা যে অসমসাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, সেনানী ইন্দ্রনাথ তাহা সমাধা করিতে অক্ষম।

ইন্দ্রনাথ। কার্য্যকালে ইন্দ্রনাথ অক্ষম কি সক্ষম, তাহা অন্য লোক বিবেচনা করিবেন। শ্মশানভূমিতে পিশাচের সহিত যুদ্ধ করিলে কি সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়?

হুমায়ুন। সেনানী ইন্দ্রনাথের যে অসাধারণ সাহস আছে, তাহা আমাদের শিবিরে অবিদিত নাই। তাঁহার পৈশাচিক সাহস আছে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলাম। পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পৈশাচিক সাহস আবশ্যক হয়।

ইন্দ্রনাথ। কি পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি?

হুমায়ুন। তাহা কি জানেন না? উপহাস করিতেছেন কেন? আপনি যে কার্য্যের

সূত্রপাত করিয়াছেন, আপনি গূঢ়মন্ত্রণায় ও চমৎকার কৌশলে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সে কার্য্য কি আপনি জানেন না? আপনার কৌশল ও বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, রাজা টোডরমল্লকে কেহ বঞ্চনা করিতে পারেন নাই, আপনি তাহা করিয়াছেন। আপনি চিরজীবী হউন, একদিন বঙ্গদেশের গৌরবস্থল হইবেন।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তর্খান বলিতে লাগিলেন,—

যথার্থই হুমায়ুন ও আমি কতবার অন্তরালে আপনার কৌশলের ধন্যবাদ করিয়াছি। শিবিরে আমাদের মত অনেক জনই বিদ্রোহোন্মুখ সেনানী আছেন। ত্রিংশৎসহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি মাসুমীফারাঙ্মুদীও বিদ্রোহতৎপর। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল আমাদিগের সকলের অন্তরের ভাব জানিয়াছেন, আমাদিগের সকলেরই উপর এরূপ দৃষ্টি রাখিয়াছেন যে, আমরা কামনা সিদ্ধ করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনি কি কুহকে, কি মহাকৌশলে যে রাজা টোডরমল্লকে অন্ধ করিয়াছেন কিছুই বুঝিতে পারি না। ধন্য আপনার বুদ্ধিবল!

তর্খান আরও বলিতেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—আমি বিদ্রোহী নহি, আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন আমি গুপ্তচর, কি কপটাচারী, কি বিদ্রোহকামনা করিয়া রাজা টোডরমল্লের অধীনে কর্ম্ম করিতেছি, তাহা হইলে আপনারা ঘোর ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হইয়াছেন। আর আপনারা যদি বিদ্রোহী হয়েন, তবে আমাকে বিদায় দিন। আমার সহিত আপনাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। আমি এইক্ষণেই রাজা টোডরমল্লকে সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত করাইব। কুক্ষণে আমার হস্তে আপনাদিগের লিপি পড়িয়াছিল।

হুমায়ুনদিউয়ানা ও তর্খানফার্মিলীর মুখ গম্ভীর হইল, উভয়েই ভাবিতে লাগিল,—আমরা এতদিন কি ভ্রান্ত ছিলাম, মাসুমীফারাঙ্মুদী কি এই হিন্দুর অন্তর বিশেষ জানেন না? উভয়েই কোষ হইতে খড়্গ বহির্গত করিবার উদ্যম করিলেন। ইন্দ্রনাথও শস্ত্রবিষয়ে অপটু ছিলেন না, কোষ হইতে অসি বহির্গত করিলেন। এমত সময়ে হুমায়ুন পুনরায় একটু হাসিয়া বলিলেন,—

বুঝিয়াছি, আপনি বোধ হয়, এখনও আমাদিগকে বিশ্বাস করেন নাই, এই জন্য আমাদিগের নিকট বিদ্রোহ-মন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে চাহেন না। কিন্তু আমাদিগের নিকট মন্ত্রণা গুপ্ত করিবার আবশ্যক নাই; আপনি একর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বাবধি আমরা বিদ্রোহোন্মুখ। এই দেখুন, বিদ্রোহীদিগের নিকট হইতে আমরা কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি।

ইন্দ্রনাথ ক্রোধে ও বিস্ময়ে অন্ধ হইলেন, বলিলেন,—পামর মুসলমান! কাপুরুষ বিদ্রোহী! তোমাদের পাপের সমুচিত দণ্ড দিব।

হুমায়ুন ও ইন্দ্রনাথের মধ্যে অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইন্দ্রনাথ হুমায়ুন অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন ও অল্পদিন মধ্যে চমৎকার অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে হুমায়ুনের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে হুমায়ুন ভূতলশায়ী হইলেন।

যখন প্রথমে ইন্দ্রনাথ ও হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ হয়, তখন তর্খান কিছু দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রথমেই যুদ্ধ এরূপ ভয়ঙ্কর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল যে, তর্খান ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। যখন দেখিলেন, হুমায়ুন ভূতলশায়ী হইয়াছেন, তখন একেবারে লম্ফ দিয়া ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিলেন। ইন্দ্রনাথ ফিরিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে করিতে হুমায়ুন উঠিয়া পুনরায় অসিহস্ত হইলেন। সুতরাং দুই জনে একেবারে ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিলেন।

এবার ইন্দ্রনাথের বিষম সঙ্কট উপস্থিত। দুই জনের সহিত এক জনের অসিযুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষতঃ তর্খান ও হুমায়ুন অসিচালনে নিতান্ত অপটু ছিলেন না। কেবল হুমায়ুনের কাতরতা ও রজনীর অন্ধকার বশতঃই কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

হুমায়ুন ক্রমে অবসন্ন শরীর হইলেন, তর্জ্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিলেন। তর্খানও সেই অবসরে সতেজে আক্রমণ করিলেন। দুই জনের সমকালীন আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রনাথ হঠাৎ পশ্চাৎ যাইবার মানস করিলেন। তখন তিনি গঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন, লম্ফ দিয়া যেই পশ্চাতে যাইবেন, অমনি গঙ্গাসলিলে নিপতিত হইলেন! "মাতঃ পৃথিবি! এই বিপত্তিকালে তুমিও স্থান দিলে না", এইরূপ মনে ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গাসলিলে মগ্ন হইলেন। তর্খান ও হুমায়ুন ইন্দ্রনাথের মৃত্যুস্থির করিয়া আপন কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

হুমায়ুন ও তখন যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা বড় মিথ্যা নহে; ইন্দ্রনাথ যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, তাহাতে উত্থানশক্তি ছিল না। সন্তরণ করা দূরে থাক, উচ্চ পাড় হইতে পড়িয়া একেবারে অচেতন হইলেন। ভাগ্যক্রমে নিকটবর্ত্তী ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল এবং সেই নৌকায় একজন ভদ্রলোক জাগরিত ছিলেন। মনুষ্যকে জলে পড়িতে দেখিয়া তিনিও মাল্লাদিগকে জলে নামাইয়া মৃতপ্রায় ইন্দ্রনাথের প্রাণ বাঁচাইলেন। মাল্লাগণ ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথকে নৌকার দিকে লইয়া চলিলেন। শেষে ইন্দ্রনাথকে নৌকায় তুলিলেন।

যিনি মাল্লাদিগকে উঠাইয়া ইন্দ্রনাথের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, তিনি রমণী। তিনি অতিশয় যত্নসহকারে ইন্দ্রনাথের শরীর ধৌত করিয়া দিলেন, তাহার পর সেই অস্ত্রাঘাতগুলি একে একে সিক্ত বস্ত্রের দ্বারা বাঁধিতে লাগিলেন, দেখিলেন যদিও অনেক স্থানে ক্ষত হইয়াছে তথাপি কোন ক্ষতই গভীর বা সাংঘাতিক নহে। তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল, সমস্ত রাত্রি উত্তম নিদ্রা হইলে প্রাতঃকালে শরীরে অধিক বেদনা থাকিবে না।

সমস্ত রাত্রি ইন্দ্রনাথের উত্তম নিদ্রা হইল। প্রাতঃকালে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, পার্শ্বে এক পরমা সুন্দরী রমণী বসিয়া রহিয়াছেন। ইন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন এই সুন্দরীকে কখন দেখিয়াছেন, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ করিতে পারিলেন ন বলিলেন,—

ভদ্রে! আপনি আমাকে প্রাণ দিয়াছেন, আপনি বোধ হয় আমাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনি কে? কি করিলে এ ঋণ শোধ করিতে পারিব? আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন জানিলে রাজা টোডরমল্ল কিছুই দিতে অস্বীকৃত হইবেন না।

রমণী অনেকক্ষণ উত্তর দিলেন না; ইন্দ্রনাথ বার বার প্রশ্ন করাতে অবশেষে বলিলেন,—সৈনিকবর! আমাকে কি ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছেন?

সে কোকিলনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি ইন্দ্রনাথ এখনও ভুলেন নাই। উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন,—

রমণীরত্ন! আমি জীবিত থাকিতে আপনাকে বিস্মৃত হইব না। কিন্তু আপনি কিরূপে এস্থানে আসিলেন? মহেশ্বর-মন্দির কতদিন ত্যাগ করিয়াছেন?

সেই নৌকাবাসিনী রমণী বিমলা! ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে মহেশ্বর-মন্দিরে দেখিয়াছিলেন, অদ্য এই স্থানে এই অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইন্দ্রনাথের বিস্ময় দেখিয়া বিমলা একটু হাসিলেন, অবগুণ্ঠন টানিয়া ধীরে ধীরে আহত সৈনিকের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন!

ইন্দ্রনাথ অনেকস্থানে আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু আঘাত গুরুতর নহে। বিমলা যত্নসহকারে আঘাতগুলিতে বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন; তৎপর ইন্দ্রনাথ প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন।

যাইবার সময় ইন্দ্রনাথ সেই রমণীকে শতবার ধন্যবাদ দিলেন, এবং কোনরূপ পুরস্কার গ্রহণ করিতে বার বার উপরোধ করিলেন।

বিমলা অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শেষে সজলনয়নে উত্তর করিলেন,—সৈনিকবর! প্রভু! মহেশ্বর-মন্দিরে আপনার নিকট একটী ভিক্ষা করিয়াছি, সতীশচন্দ্রের রক্ষা। তাহাই আমাকে পুরস্কারস্বরূপ দান করুন।

ইন্দ্রনাথ। কিন্তু সে ভিক্ষা নহে, সতীশচন্দ্র যদি নির্দ্দোষী হয়েন তবে তাঁহাকে রক্ষা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমি আপনার আর কি করিতে পারি আদেশ করুন, আমি পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি।

বিমলা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—আমার দ্বিতীয় ভিক্ষা এই, আপনি আমাকে মহেশ্বর-মন্দিরে দেখিয়াছেন, মুঙ্গেরেও দেখিলেন, একথা বিস্মৃত হউন।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—আপনি আজ আমাকে জীবন দান করিলেন তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। আপনার এ যাচ্ঞা কি জন্য?

বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আমি ব্রাহ্মণকুমারী, অতএব আপনার স্মরণপথে থাকিবার অযোগ্যা। সরলা আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব অন্য নারী আপনার স্মরণপথে থাকিবার অযোগ্যা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ কমলা

As in the bosom o' the stream,
The moon beam dwells at dewy e'en
So trembling, pure was tender love,
Within the breast o' bonnie Jean.
And now she works her mammie's work,
And aye she sighs with care and pain,
Ye wist na what her ail might be,
Or what wad make her weel again.

—*Burns.*

বিমলা কি জন্য মুঙ্গের গমন করিয়াছিলেন, জানিতে পাঠক মহাশয় উৎসুক হইবেন, কিন্তু সে কথা বলিতে হইলে আমাদের তাহারও পূর্ব্বকথা লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং ইন্দ্রনাথ যে মন্দিরে সরলাকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই মন্দিরের কথা লইয়া আমরা আরম্ভ করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইচ্ছামতীতীরস্থ মহেশ্বর-মন্দিরের অনতিদূরে একটী গ্রাম ছিল --নাম বনগ্রাম। মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্রশেখর প্রায়ই দেবালয়ে থাকেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এই পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিতে ভালবাসিতেন।

দেবালয়ের মোহান্ত সচরাচর যেরূপ স্বার্থপর ও বিষয়লুব্ধ হইয়া থাকেন, চন্দ্রশেখর সেরূপ ছিলেন না। তিনি অতিশয় নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন, ও অনেক অনাথা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে এই পল্লীগ্রামে রাখিয়া ভ্রাতাভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। দেবালয়ের কার্য্য অন্যান্য বিশ্বস্ত পূজকের হস্তে সমর্পণ করিয়া চন্দ্রশেখর আপন আশ্রিত কয়েক ঘর লোক লইয়া এই গ্রামে উপাসনা করিতে ভালবাসিতেন, আবার আবশ্যক হইলে স্বয়ংও মহেশ্বর-মন্দিরে কার্য্য করিতেন। কমলানাম্নী একটী অনাথা কায়স্থ কন্যাকে পরিচারিকারূপে গৃহে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতেন। চন্দ্রশেখর যেরূপ নির্ম্মলচরিত্র সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাকে দেখিলে পুরাকালের মুনিঋষির ন্যায় বোধ হইত, তাঁহার গ্রামটীকেও তিনি যথার্থই পুরাকালের আশ্রমের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শিষ্যগণ কথাচ্ছলে তাঁহাকে কণ্বমুনি, এবং তাঁহার পালিতা কমলাকে শকুন্তলা বলিত!

সায়ংকাল উপস্থিত। সেই সায়ংকালে দুইজন নদীতীরে আসীন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সরলা, অন্য কমলা।

কমলা অনেক দিন অবধি এই আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বৎসর মাত্র। তিনি কাহার দুহিতা, কাহার বনিতা, তাঁহার স্বামীর কতদিন মৃত্যু হইয়াছে, এ সকল কথা কেহ জানিতেন না, জিজ্ঞাসা করিলে কমলা ক্রন্দন করিতেন, সুতরাং কেহ জিজ্ঞাসাও করিতেন না।

কমলার স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া আশ্রমবাসিগণ বিস্মিত হইতেন। কমলা সততই শান্ত, অন্যমনস্কা ও চিন্তাশীলা। যে স্থানে আশ্রমপাদপপুঞ্জ অতিশয় নিবিড় ও অন্ধকারময়, যে স্থানে মনুষ্যের শব্দমাত্র নাই, মধ্যাহ্নকালে গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া কমলা সেই নিভৃত স্থানে একাকী চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন, মধ্যাহ্নে অতি মৃদুনিঃসৃত পক্ষীর রব শুনিতে ভালবাসিতেন। যেখানে আম্রবৃক্ষের পদপ্রক্ষালন করিয়া ইচ্ছামতী কুল্ কুল্ শব্দে প্রবাহিত হইত, সন্ধ্যার সময় কমলা সেই স্থানে যাইয়া বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন, নদীর অনন্ত কুল্ কুল্ ধ্বনি শুনিতে ভালবাসিতেন। সে অনন্ত ধ্বনি শুনিতে শুনিতে কমলা যে অনন্ত চিন্তা করিতেন সে চিন্তা কিসের? কে বলিবে কিসের? চন্দ্রশেখর কমলাকে আপন গৃহে রাখিয়াছিলেন, আপন কন্যার মত যত্ন করিতেন, এবং গ্রামবাসিনী সকলেই কমলাকে ভালবাসিতেন এবং কমলার কথাবার্ত্তায় প্রীত হইতেন। সে কথাবার্ত্তা কি মধুর, কি ভাবপরিপূর্ণ! শ্রোতার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত!

কমলা নিরুপমা সুন্দরী। তাঁহার নয়ন দুটী অতিশয় শান্তজ্যোতিঃ ও চিন্তাপ্রকাশক, সমস্ত মুখখানি শান্ত ও গাঢ় চিন্তায় ম্লান। দেহ অতি সুকুমার, বিধবার মলিন বস্ত্রে সে সুকুমার দেহ আবৃত হইয়া শৈবাল-বেষ্টিত পদ্মবৎ শোভা পাইত। কিন্তু সে প্রস্ফুটিত পদ্ম নহে, সায়ংকালে মুদিতপ্রায় পদ্ম যেরূপ জলহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকে, কোমলাঙ্গী তপস্বিনী সেইরূপ সততই চিন্তায় মগ্ন, লোকালয়ে সেইরূপ মুদিতপ্রায় হইয়া থাকিতেন। কমলা চন্দ্রশেখরকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন, চন্দ্রশেখরের গৃহকার্য্য সমস্ত তিনিই নির্ব্বাহ করিতেন. কার্য্যে অবসর পাইলেই আবার সেই নিভৃত নিবিড় পাদপাবৃত স্থানে যাইতেন। শিখণ্ডিবাহন তাঁহাকে উপহাস করিয়া বনদেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তদনুসারে আশ্রমের অনেকেই কমলাকে বনদেবী বলিয়া ডাকিত। ফলতঃ তিনি যেরূপ একাকী বনে বনে বিচরণ করিতে ভালবাসিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সেই শান্ত পবিত্র ছায়ান্বিত আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বোধ করা কিছুই বিচিত্র নহে।

অদ্য সন্ধ্যার সময় কমলা সরলাকে লইয়া বনবিচরণ করিতেছিলেন. এক্ষণে দুইজনে নদীতীরে বসিয়া রহিয়াছেন। কমলা সরলাকে ভালবাসিতেন. সে সরলচিত্ত বালিকাকে না ভালবাসিয়া কে থাকিতে পারে? সরলাও কমলার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেন, আপনার দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সেই বিধবার দুঃখে দুঃখী হইতেন। সুতরাং ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, সরলার আবার দুঃখ কি? বালিকার হৃদয়ে চিন্তা কিসের? আমরা উত্তর করিব, সরলা আর বালিকা নাই, তাহার হৃদয়কোরকে প্রণয়কীট প্রবেশ করিয়াছে।

যেদিন হইতে ইন্দ্রনাথ সরলার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে প্রণয় কাহাকে বলে সরলা বুঝিল, চিন্তা কাহাকে বলে বুঝিল। সরলা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহময়ী কন্যা, কিন্তু এক্ষণে মাতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে করিতে সততই আর এক জনের কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত, আর একখানি মুখ মনে পড়িত। এখনও সরলা পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিত কিন্তু কার্য্য করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিত. মধ্যে মধ্যে সহসা চক্ষে জল আসিত। লজ্জায় অশ্রু মুছিয়া আবার কার্য্যে নিযুক্ত হইত, আবার ধীরে ধীরে চক্ষে জল আসিত। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে চক্ষুর্দ্বয় পরিপূর্ণ হইত, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে মুখখানি সিক্ত হইত।

চিন্তা কি? সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে পারিত না,—কিন্তু আমরা অনুভব করিতে পারি। রুদ্রপুরে পূর্ণচন্দ্রালোকে যে দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম আবার কি সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? যাঁহার কণ্ঠে লীলাক্রমে মালা দিতাম, তাঁহাকে কি আবার দেখিতে পাইব? যুদ্ধ হইতে ইন্দ্রনাথ আবার কি ফিরিয়া আসিবেন? এই চিন্তা করিতে করিতে সরলা কার্য্য কর্ম্ম ভুলিয়া যাইত, চারিদিক শূন্য দেখিত। জ্ঞানচক্ষে সেই রুদ্রপুরের কুটীর দেখিতে পাইত, সেই কুটীরের পার্শ্বে সেই উদ্যান, সে উদ্যানে সেই পুষ্পচারা, উপরে পূর্ণচন্দ্র,—সেই পুষ্পচারার মধ্যে সেই চন্দ্রালোকে সেই হৃদয়ের ইন্দ্রনাথ, সহসা নয়নজলে সরলার মুখখানি প্লাবিত হইয়া যাইত।

মন্দিরবাসীদিগের মধ্যে একজন মাত্র সরলার মনের ভাব বুঝিয়াছিল। কমলা সরলাকে কখন কখন আপনার সঙ্গে নিস্তব্ধ নদীকূলে অথবা সুস্নিগ্ধ ছায়াবৃত বৃক্ষতলে লইয়া যাইতেন, এবং আপনার চিন্তার ভাগিনী করিতেন, সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতেন, ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতেন। সরলা কমলার গল্প শুনিতে শুনিতে আপন দুঃখ ভুলিয়া যাইত, কমলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন দুঃখ দূর করিত। যেরূপ জনশূন্য স্থানে যাইতে তাহার ভয় করিত, চিন্তাশীলা কমলার সঙ্গে সে সকল স্থানেও যাইত, যেরূপ গভীর ভাবময় চিন্তা তাহার বালিকাহৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, ভাবিনী কমলার নিকট তাহাও শুনিত। ফলতঃ দুইজনে একত্র হইলে কমলা আপনার হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া বালিকার নিকট নানারূপ গল্প করিতেন ও অন্তরের নানারূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। সরলা বালিকার মত এক মনে সেই সমুদয় শুনিত, সে ভাব তাহার বড় ভাল লাগিত, সে হৃদয়গ্রাহী কথা শুনিতে শুনিতে আপন দুঃখকথা বিস্মৃত হইত।

আজি সন্ধ্যার সময় তাঁহারা দুই জনে নদীতীরে বসিয়া আছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : কে বল দেখি?

MANFRED.—Oblivion, self-oblivion.
—*Byron.*

কমলা ডাকিলেন,—সরলা!

সরলা উত্তর না করিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজ তোমাকে এত ম্লান দেখিতেছি কেন?

সরলা মুখখানি নত করিল।

কমলা দেখিলেন, আজ দুঃখবেগ প্রবল হইয়াছে। স্নেহসহকারে সরলার নিকটে বসিয়া সরলার হস্ত আপন হস্তে ধারণ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,—

ভগিনি! পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষাও হতভাগিনী আছে। তোমার স্নেহময়ী মাতা আছেন, জগৎসংসারে থাকিবার স্থান আছে, হৃদয়েশ্বর জীবিত আছেন, তোমার আশা-ভরসা সকলই আছে। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ হতভাগিনী আছে যাহার কিছুমাত্র নাই, যাহার ভবিষ্যতের আশা নাই, অতীতের স্মৃতি নাই, কেবল অতুল চিন্তাজলে ভাসিতেছে।

সরলা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইল, বলিল, দিদি, তোমার কথা ভাবিলে আমি আপন দুঃখ ভুলিয়া যাই।

কমলা। বিধাতা সহ্য করিবার জন্যই নারীজন্ম দিয়াছেন। পুরুষে যত সহ্য করিবে, আমরা তাহার দশ গুণ সহ্য করিব।

সরলা। যদি না পারি?

কমলা। তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিলে কেন? দেখ, মনুষ্যের মানসম্ভ্রম আছে, ধনসম্পত্তি আছে, কুলমর্য্যাদা আছে, নামগৌরব আছে, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সহস্র অবলম্বন আছে, সহস্র সুখের কারণ আছে, একটী না হইলে অন্যটী অন্বেষণ করিতে পারে, সেটী না পাইলে অপর একটী অনুসন্ধান করে, সেই অনুসন্ধানে জীবন স্বপ্নবৎ অতিবাহিত হয়। চেষ্টা সফল হউক বা না হউক, যত দিন চেষ্টা থাকে, যত দিন আশা থাকে, ততদিন জীবন দুর্ব্বহনীয় হয় না। আর আশা নাই কোন্ মনুষ্যের? যুবকের উচ্চাভিলাষ, মান, সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা; বৃদ্ধের ধন-কামনা, পুত্র-কামনা, বংশবৃদ্ধি কামনা, সহস্র কামনা, সহস্র আকাঙ্ক্ষায় জীবন অতিবাহিত হয়। আর অভাগিনী নারীকুলের কি আছে?

কমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন। সরলার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সরলা একাগ্রচিত্তে শুনিতেছে, আর তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন আবার বলিতে লাগিলেন,—

অভাগিনী নারীকুলের কি আছে? সংসারস্বরূপ অপার সমুদ্রে তাহাদিগের একটী মাত্র ক্ষুদ্র তরী আছে, সেটী ভালবাসা। সেই ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অপার সংসারে আইসে, যদি সেই তরীটী ডুবিল, তবে নারীর আর অবলম্বন নাই, আর সুখের কারণ নাই, আর আশা নাই, আর ভরসা নাই, অতল জলে মৃত্যু ভিন্ন আর উপায় নাই।

সরলা বলিল,—আমার বোধ হয়, দিদি, তুমি বড় দুঃখিনী, তোমার দুঃখকথা জানিতে ইচ্ছা হয়।

কমলা উত্তর করিলেন,—

তথাপি সরলা আমি দুঃখিনী নহি। চিন্তাই আমার জীবনস্বরূপ হইয়াছে। ঐ যে গলিত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে পাইতেছ, মধ্যাহ্নে যখন ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া ঐ মর্ম্মরশব্দ শ্রবণ করি, তখন আমার হৃদয় শান্তিরসে পরিপূরিত হইতে থাকে। ঐ যে আকাশে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘের ভিতর দিয়া চন্দ্র যাইতেছে দেখিতেছ, ক্ষণেকমাত্র ঈষৎ অন্ধকার করিয়া আবার পরিষ্কার নীল গগনমণ্ডলে বাহির হইয়া আপন জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে, ঐ চন্দ্র ও আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি 'নিরুপম শান্তি লাভ করি। এই সকল দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে অনন্ত ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাতেই আমার সুখ; সরলা, আমি দুঃখিনী নহি।

সরলা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল,—দিদি, তোমার পূর্ব্বকথা জানিতে আমার বড় ইচ্ছা করে।

কমলা বলিলেন,—সরলা, তুমিও আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? আশ্রমবাসীদিগের নিকট আমি কিছুই বলি না, কিন্তু ভগিনি! তোমার নিকট আমার লুকাইবার কিছুই নাই; আমি সত্য সত্য বলিতেছি, আমার জীবন কোন অপরূপ মোহজালে জড়িত রহিয়াছে, তাহা আমি ভেদ করিতে পারি না,—আমার পূর্ব্বকথা কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

সরলা আশ্চর্য্য হইল, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—কিছুই মনে নাই? দিদি, তোমাদের বাড়ী কোথায়?

কমলা। পশ্চিমদেশে; গ্রামের নাম স্মরণ নাই!

সরলা। তোমার পিতার নাম কি?

কমলা। আমি শৈশব হইতে অনাথা।

সরলা। তোমার স্বামীর কি নাম ছিল?

কমলা। নাম স্মরণ নাই। কেবল সে দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে।

সরলা। দিদি, তুমি অকালে বিধবা হইলে কিরূপে?

কমলা। একটা কি মহাবিপদে তাঁহাকে হারাই। তাহার পর আমার ভয়ঙ্কর পীড়া হয়, তদবধি এই পবিত্র মহেশ্বর-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছি।

কমলা ক্ষণেক পর বলিতে লাগিলেন,—আমার কেবল এইমাত্র স্মরণ আছে যে, কিছুদিন পীড়ায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ছিলাম, হৃদয়ে অতিশয় বেদনা বোধ করিয়াছিলাম, যাতনায় অস্থির হইয়াছিলাম। সেই পীড়ার সময় স্বামীর দেবমূর্ত্তি দেখিতাম। বোধ হইত যেন অপরিসীম নীল আকাশের মধ্যে চন্দ্রকরোজ্জ্বল একটী ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ডে সেই দেবমূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছেন। এখনও আকাশের দিকে চাহিলে তাঁহাকেই দেখিতে পাই।

কমলা আরও বলিতে লাগিলেন,—যখন আমি ঘোর পীড়া সহ্য করিতেছিলাম, তখন সকল লোকেই স্থির করিল যে, আমি আর বাঁচিব না। পিতা চন্দ্রশেখর সেই সময়ে তীর্থ-পর্য্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েন। পিতার দয়ার শরীর, তিনিই আমাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় বিধবাকে পিতা আশ্রয় দান করিয়া আপন নৌকায় তুলিলেন। তখনও আমার ঘোরপীড়া, গ্রামের সকলেই স্থির করিল যে, নৌকাতেই আমার মৃত্যু হইবে। অনেক দিন জলপথে আসিতে লাগিলাম, নদীর স্বাস্থ্যজনক বায়ুতে আর পিতার যত্নে আমি পুনরায় আরোগ্যলাভ করিলাম। কিছুদিন পরে নৌকা আসিয়া এই মন্দিরের ঘাটে লাগিল, সেই অবধি আমি পিতার গৃহে রহিয়াছি।

শুনিতে শুনিতে সরলার চক্ষুতে জল আসিল। সরলা ধীরে ধীরে কমলার নিকটে আসিয়া তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক বলিল,—দিদি, আমি আর নিজের জন্য দুঃখ করিব না, তোমার দুঃখ-কথা শুনিয়া আমি নিজের দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি।

দুইজনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে পশ্চাৎ হইতে একজন লোক আসিয়া সরলার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—কে বল দেখি?

সরলা সে স্বর চিনিত, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল না, একে একে বনগ্রামবাসিনীদিগের নাম করিতে লাগিল।

"নিস্তারিণী"—চক্ষু হইতে হস্ত উঠিল না,

"মনোমোহিনী"—তথাপি হস্ত উঠিল না,

"যোগেন্দ্রমোহিনী"—তবু হইল না,

"তারা"—

তোর মাথা, আমাকে ইহার মধ্যেই ভুলেছিস, তবু এখনও বিবাহ হয় নাই, না জানি বিবাহের জল গায়ে লাগিলে কি হইবে!—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সরলার প্রিয় সই অমলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সরলার বিস্ময়ের সীমা থাকিল না—সই?—এখানে!—কবে আসিলে? বাষ্পপরিপূর্ণলোচনে সরলা অমলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার বক্ষে আপন মুখ লুকাইল। অমলাও যখন অনেকদিন পরে সেই প্রেমপুত্তলীটীকে হৃদয়ে স্থান দিল, তখন তাহার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না।

ক্ষণেক পরে অমলা বলিল,—এই দুই প্রহর রাত্রিতে, এই অন্ধকারে এখানে বসিয়া আছ? আমি যে তোমার জন্য কত অন্বেষণ করিয়াছি, বলিতে পারি না।

সরলা। এখানে কমলার সহিত আসিয়াছি, কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইয়াছে। সই তুমি অদ্য আসিলে?

অমলা। হাঁ, আমি আজই আসিয়াছি, তোমাকে দেখিবার জন্য কতদিন আসিব আসিব মনে করি, তা "বৃদ্ধস্বামী" কি আমাকে ছাড়ে? আজ কত করিয়া তবে আসিলাম।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনজন আশ্রমে ফিরিয়া আসিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : ইচ্ছাপুরের জমীদার

> BUT I have woes of other kind,
> Troubles and sorrows more severe,
> Give me to ease my tortured mind,
> Lend to my woes a patient ear.
>
> —*Crabbe.*

চন্দ্রশেখর ও শিখণ্ডিবাহন ভিন্ন সে গ্রামে আর কেহই মহাশ্বেতার প্রকৃত পরিচয় জানিতেন না। তাঁহারাও এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, বিশেষরূপে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

মন্দিরের শান্ত, দ্বেষবিদ্বেষশূন্য নিবাসিগণের সহিত একত্র বাস করিতে করিতে মহাশ্বেতার অন্তঃকরণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে বয়সে স্বভাবের পরিবর্ত্তন কখনই হয় না। মহাশ্বেতার বিজাতীয় মান ও জিঘাংসা অন্তরে সেইরূপই জাগরিত ছিল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি সেইরূপই প্রতিরাত্রি বৈরনির্য্যাতনের জন্য শিবপূজা করিতেন।

চন্দ্রশেখরের কুটীরে অদ্য এক জন অতি সমৃদ্ধিশালী অতিথি আসিয়াছেন বলিয়া অনেকেই খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হইলে তথায় যাইয়া সমবেত হইলেন। গৃহের মধ্যস্থানে চন্দ্রশেখর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক হইয়াছে। কিন্তু দিন দিন মন্দিরের শান্ত দেবকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াই হউক, বা মানসিক শান্তি বশতঃই হউক, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে একটীমাত্র বার্দ্ধক্য চিহ্ন নাই। নয়ন দুটী জ্যোতিঃপূর্ণ, সমস্ত শরীর তেজঃপূর্ণ, সেই শরীরের উপর যজ্ঞোপবীত লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সেই সমৃদ্ধিশালী অতিথি বসিয়া আছেন, তাঁহারও বয়ঃক্রম চন্দ্রশেখরের সহিত সমান হইবে, কিন্তু সংসার-চিন্তায় ও পার্থিব দুঃখে তাঁহার শরীর শীর্ণ করিয়াছে। মস্তকের কেশ অধিকাংশ শুক্ল হইয়াছে, ভ্রূযুগলের কেশও দুই একটী শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। চক্ষুতে জ্যোতিঃ নাই, বদনমণ্ডলে কান্তি নাই, বিশাল শরীরে এক্ষণে আর বল নাই। তাঁহাদিগের দুইজনকে দেখিলে সংসার ও সংসার-চিন্তার অকিঞ্চিৎকারিতা ও পুণ্যবলের মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সমৃদ্ধিশালী অতিথি পাঠক মহাশয়ের নিতান্ত অপরিচিত নহেন; ইনি ইচ্ছাপুরের জমীদার নগেন্দ্রনাথ।

সেই দুই জনের উভয়পার্শ্বে ও পশ্চাতে অনেক মন্দিরবাসী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে, ঈষৎ অন্ধকারে, মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহন বসিয়া রহিয়াছেন, মৃদু মৃদু কি কথা কহিতেছেন, এক এক বার নগেন্দ্রনাথের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন। চন্দ্রশেখরের বামহস্তের নিকট কমলা বিনীতভাবে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। কুটীরের একপার্শ্বে অমলা ও সরলা বসিয়া রহিয়াছে, আজ তাহাদিগের আনন্দ অপার, তাহাদিগের গল্প শেষ হইতেছে না, তাহাদিগের সুমিষ্ট ওষ্ঠে সুহাসি লুকাইবার সময় পাইতেছে না। অপর একটী পার্শ্বে নিস্তারিণী, মনোমোহিনী, যোগেন্দ্রমোহিনী ও তারাসুন্দরী প্রভৃতি অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণকন্যাগণ আমোদ ও রহস্য করিতেছে, আবার এক একবার নিস্তব্ধ হইয়া চন্দ্রশেখর ও নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিতেছে।

নগেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—মহাত্মন্! আমি আপনার বিস্তীর্ণ মহেশ্বর-মন্দির দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। যদি মোহময় সংসার ত্যাগ করিয়া আপনার মত এই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতাম, তাহা হইলে এই বার্দ্ধক্যে আমি

অসীম দুঃখসাগরে ভাসিতাম না। চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন,—মহাশয়, কেবলই কি মন্দিরে পুণ্যকর্ম্ম করা যায়, সংসারের মধ্যে থাকিয়া কি পুণ্যকর্ম্ম সম্ভবে না? শাস্ত্রে বলে সত্য ও পরোপকারিতায় যত পুণ্য, যাগযজ্ঞে তত নাই। যে জমীদার পরোপকারিতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য সর্ব্বত্রই সমাদৃত, তাঁহার কি মন্দিরবাসের জন্য আক্ষেপ উচিত?

নগে। মহাশয়! আপনি আমাকে অতিশয় সম্মান করিলেন, আমি সে সম্মানের যোগ্য নহি। যদি যোগ্য হইতাম, তবে আজ পাপ-প্রশমনার্থ মহাত্মা চন্দ্রশেখরের নিকট আসিতাম না।

চন্দ্র। এজগতে সহস্রগুণসত্ত্বেও কে মহাপাপী নহে? কে বলিতে পারে, আমি পাপ করি নাই,—কে বলিতে পারে, আমি নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধী?

দুইজনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নগেন্দ্রনাথ আপনার আসিবার কারণ বলিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : জমীদারের পূর্ব্বকথা

AND let me if I may not find
A friend to help, find one to hear.
—*Crabbe.*

নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন,—মহাত্মন, আমার মত দুঃখী আর কেহই নাই, আমার দুঃখকথা শ্রবণ করুন।

আমার সহধর্ম্মিণী আমাকে বলিতেন যে, যেদিন তাঁহার জন্ম হয়, সেদিন আকাশে অপরূপ তিথি-নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত গণিয়া বলিয়াছেন যে, শিশুকন্যা ঘোর উন্মাদিনী হইবেন। সে ভ্রম, আমার সহধর্ম্মিণী উন্মাদিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি মনোবৃত্তি অতিশয় বেগবতী ছিল, সেজন্য আমি তাঁহাকে পাগলিনী বলিতাম। আজি দ্বাদশ বর্ষ হইল, সে স্নেহময়ী পাগলিনীর কাল হইয়াছে।

পাগলিনীর গর্ব্ভে আমার দুইটী পুত্র জন্মে। তাহাদিগের গর্ব্ভধারিণীর মত দুই জনই পাগল। জ্যেষ্ঠটী চিন্তায় পাগল, কনিষ্ঠটী কার্য্যক্রমে পাগল। সে দুইটী পুত্র আমার দুইটী নয়নের তারা ছিল,—আজ তাহারা কোথায়? হায় দারুণ বিধি! বার্দ্ধক্যে কি আমার কপালে এই লিখিয়াছিলে? আমার দুইটী নয়নই গিয়াছে, আমি অন্ধ হইয়াছি। দুইটী রত্ন হারাইয়া আমি কাঙ্গালী হইয়াছি।

সে দুঃখবচনে সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ক্ষণেক পরে নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন,—

আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে অল্প বয়সে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। তাহারই শোকে তাহার মাতা কালগ্রাসে পতিত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মুখ চাহিয়া আমি শোক সহ্য করিয়াছিলাম। আহা! সেরূপ বীরপুত্র কেহ কখনও দেখে নাই। দয়া ধর্ম্মে, বিদ্যালোচনায়, বল ও বিক্রমে সুরেন্দ্রনাথের মত কে ছিল? বৎস নবীনবয়সে সিংহবল ধারণ করিত, মল্লযুদ্ধে পালওয়ানদিগকে পরাস্ত করিত, বাহুবলে সকলকে বিস্মিত করিত, অশ্বচালনায় তাহার সমকক্ষ এদেশে কাহাকেও দেখি নাই। যে দেখিত, সুরেন্দ্রনাথকে দয়ায় দাতাকর্ণ বলিত, বলবিক্রমে ভীমাবতার বলিত। বালক বাল্যকালেই রাজা সমরসিংহের নিকট যুদ্ধবার্ত্তা শুনিতে ভালবাসিত, শুনিতে শুনিতে বালকের মুখ গম্ভীর হইত, নয়নদ্বয় প্রজ্বলিত হইত। শিশু সমরসিংহের খড়্গ ধারণ করিত ও যুদ্ধে যাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিত, রাজা সমরসিংহ অশ্রুপূর্ণলোচনে বালককে চুম্বন করিতেন। বাল্যকালেই তাহাকে রাজা সমরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতেন। রাজা সর্ব্বদাই বলিতেন,—পাঠানেরা বাঙ্গালীদিগকে ভীরু বলিয়া ভর্ৎসনা করে, কিন্তু সেই বাঙ্গালীর মধ্যেও মধ্যে মধ্যে বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ! আমি মরিলে তুমি আমার তরবারি লইবে, তোমার হস্তে এ খড়্গের অপমান হইবে না।—আজি সে সুরেন্দ্র কোথায়! বিধাতঃ! এক্ষণে আর কে আছে যাহার মুখ চাহিয়া আমি সুরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ সহ্য করিব।

বৃদ্ধ দুই একটী অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিলেন। চন্দ্রশেখর শোকার্ত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সুরেন্দ্রনাথের কোন অমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিয়াছেন?

নগেন্দ্রনাথ। তাহা যদি শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে আর এতক্ষণ জীবিত থাকিতাম না।

চন্দ্র। তবে এত চিন্তিত হইতেছেন কেন? সুরেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বিদেশে গিয়াছেন, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অবশ্যই কুশলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

নগে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহাই হয়। কিন্তু আমি কল্য রাত্রিযোগে অতিশয় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই জন্যই ব্যাকুল হইয়াছি, সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। বোধ হইল যেন ভয়ঙ্কর তরঙ্গরাশির মধ্যে আমার পুত্রকে দেখিলাম, যেন সে তরঙ্গরাশিতে আমার দেবতুল্য পুত্র নিমগ্ন হইতেছে, দূর দেশে বন্ধুহীন সহায়হীন হইয়া নিমগ্ন হইতেছে। প্রভু! এ স্বপ্নের অর্থ করিয়া দেন, যদি কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে তবে আমি এইক্ষণেই প্রাণত্যাগ করিব।

চন্দ্রশেখর বলিলেন,—শান্ত হউন। ভগবান আপনার বীর পুত্রকে রক্ষা করিবেন; পুণ্যাত্মা প্রজাবৎসল জমীদারকে বৃদ্ধবয়সে পুত্রহীন করিবেন না।

নগেন্দ্রনাথ সজলনয়নে উত্তর করিলেন,—প্রভু! আমাকে পুণ্যাত্মা বলিবেন না, আমি বহু পাপে কলঙ্কিত। যদি রুচি হয়, যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ হয়, আমার পাপ-কথা শ্রবণ করুন, তৎপরে উপায় বিধান করুন।

যখন আমার সুরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, তখন আমি সপুত্রে রাজা সমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আপনি জানেন, রাজা সমরসিংহ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ জমীদারদিগের শিরোরত্ন ছিলেন, এবং আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত ভালবাসিতেন। একদিন আমরা দুইজনে কথা কহিতেছি, আমাদের পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ আর সমরসিংহের একমাত্র দুহিতা ক্রীড়া করিতেছিল। ক্রীড়াচ্ছলে সেই দুহিতা একটী পুষ্পমাল্য লইয়া সুরেন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া দিল। রাজা কন্যাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, কন্যার এই কার্য্যটী দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। আমাকে বলিলেন,—নগেন্দ্রনাথ, অনেক রাজপুত্রের সহিত আমার এই কন্যার সম্বন্ধ হইতেছে; কিন্তু কন্যা যাহাকে আপনি বরণ করিয়াছে তাহারই সহিত আমি উহার বিবাহ দিব। আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না, বঙ্গচূড়ামণি রাজা সমরসিংহ একমাত্র দুহিতাকে যে এই অকিঞ্চিৎকর জমীদারের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিবেন, তাহা আমার সৌভাগ্য। সেইদিনই আমরা অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলাম,—সে অঙ্গীকার আমি ভঙ্গ করিয়াছি।

মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তীক্ষ্ন কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইতেছিল। তিনি নগেন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনিবার জন্য তথায় বসিয়া ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন,—আমি সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি। সমরসিংহের মৃত্যুর পর আমি নিরাশ্রয় বিধবার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হইলাম। তখন আমি অন্য সম্বন্ধ স্থির করিতে লাগিলাম। বঙ্গদেশে সমৃদ্ধিশালী কায়স্থ জমীদারের অভাব নাই. ইচ্ছাপুরের জমীদার কুলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে কেহই বিমুখ নহেন। শীঘ্রই উপযুক্ত পাত্রী পাইলাম। কিন্তু যদিও আমি অঙ্গীকারভঙ্গে তৎপর হইয়াছিলাম, আমার ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র তাহাতে অসম্মত হইল। একদিন আমাকে বলিল,—পিতা, আমি আপনার কোন কথায় অবাধ্য হইতে পারি না, কিন্তু একটী বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি রাজা সমরসিংহের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিতে দিব না। পুত্রের এই যথার্থ কথায় আমি রুষ্ট হইলাম, তৎক্ষণাৎ নূতন পাত্রীর সহিত বিবাহের দিন স্থির করিলাম, বলপূর্ব্বক তাহার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ দিবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু আমার পুত্রের কথাই রহিল, আমার পুত্র গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল,—তাহাকে সেই অবধি আর দেখি নাই!

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন,—সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি, সেই জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে আমার এই যাতনা। কোথায় এই বয়সে আমার অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় দুই পুত্র আমার হস্ত হইতে জমীদারীর ভার লইবে, কোথায় চন্দ্রাননা পুত্রবধূদ্বয় বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষা করিবে, তাহা না হইয়া আমার পুত্র নাই, পুত্রবধূ নাই, স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী নাই, অগাধ সমুদ্রে ভাসিতেছি। প্রভু! আমার ন্যায় হতভাগ্য এ তিন সংসারে আর কে আছে?

এই কথা সাঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, সে রোদন শুনিয়া সকলের হৃদয় বিগলিত হইল। চন্দ্রশেখর অনেকক্ষণ সান্ত্বনা করায় অবশেষে বৃদ্ধ শান্তি লাভ করিলেন।

তৎপরে শিখণ্ডিবাহন নগেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া যদি অন্যায় করিয়া থাকেন, সে প্রতিজ্ঞা পুনরায় পালন করিতে যত্নবান্ হউন।

নগেন্দ্রনাথ কহিলেন,—শিখণ্ডিবাহন! আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিব। রাজা সমরসিংহের অনাথা দুহিতাকে আনিয়া দাও, আমার সুরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ দিব। আর আমার পূর্ব্ববৎ গর্ব্ব নাই, পূর্ব্ববৎ অভিমান নাই, এবার যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, তাহা হইলে যেন আমি আর পুত্রের মুখ কখন না দেখিতে পাই। ইহা অপেক্ষা অভিশাপ আমি আর জানি না।

শিখণ্ডিবাহন কোন উত্তর না করিয়া মহাশ্বেতার সহিত পুনরায় কথা কহিতে লাগিলেন। সে কি কথা হইতেছিল, পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবেন।

শিখণ্ডিবাহন বলিতেছিলেন,—ভগিনি! আর বিলম্বে আবশ্যক কি? আপনার পরিচয় দিন।

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন,—যদি বিধাতা আমাদিগকে পূর্ব্বমত উন্নতিসম্পন্ন না করেন, তাহা হইলে এজন্মে পরিচয় দিব না, এ জন্মে কন্যার বিবাহ দিব না।

শিখণ্ডি। কেন?

মহাশ্বেতা। পরের নিকট অনুগ্রহ গ্রহণ করা আমার স্বামীর রীতি ছিল না। তিনি অপরকে অনুগ্রহ বিতরণ করিতেন, কাহারও নিকট অনুগ্রহ গ্রহণ করিতেন না।

শিখণ্ডি। তবে আপনি আমাকে নগেন্দ্রনাথের নিকট প্রতিজ্ঞাপালনের প্রস্তাব করিতে বলিলেন কেন?

মহাশ্বেতা। এ অবস্থায় উনি প্রতিজ্ঞাপালনে সম্মত আছেন কি না দেখিবার জন্য,—আমি সম্মত নহি!

বিংশ পরিচ্ছেদ : বনগ্রাম ত্যাগ

> ALL prevailing foe!
> I curse thee! let a sufferer's curse
> Clasp thee, his torturer, like remorse.
>
> —*Shelley.*

কুটীরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, একে একে তাঁহারা প্রায় সকলেই উঠিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নী ও ব্রাহ্মণকন্যাগণ সকলেই আপন আপন গৃহে গমন করিলেন। মহাশ্বেতা এখনও বসিয়া ছিলেন, আর অমলা প্রিয়সখীর মস্তক আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া বসিয়া ছিল। অমলা এতক্ষণ কি জন্য বসিয়া ছিল, পাঠক মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করেন? অমলা ভাবিতেছে,—জমীদার মহাশয়ের পুত্র বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়া পিতার গৃহত্যাগ করিয়াছেন, জমীদার মহাশয় এইরূপ বলিতেছেন;—হরি! হরি! যদি ইন্দ্রনাথ এই জমীদার মহাশয়ের পুত্র না হয়, তবে আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে নহি! মন, স্থির হও, পিতা যাহাকে বিবাহ করিতে বলেন, তাহাকে বিবাহ করিবে না, সমরসিংহের মেয়েকে বিবাহ করিবে, সমরসিংহের বিধবা এক্ষণে নিরাশ্রয়, ছদ্মবেশে আছে, তাহার মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছে;—হরি! হরি! আমার সই কি সমরসিংহের কন্যা? মহাশ্বেতাকে দেখিলেও রাজরাণীর মত বোধ হয়, সামান্য কায়স্থ বিধবার মত বোধ হয় না, কাহারও সহিত অধিক কথা কহেন না, প্রত্যহ শিবপূজা করেন, বৃদ্ধ বয়সেও মুখে স্বর্গীয় মহিমা বিরাজ করিতেছে। আর সরলা! সই আমার বক্ষের উপর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, আমার বোধ হয় উহার মন ইহা অপেক্ষাও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত, আপনি রাজকন্যা হইয়াও তাহা জানে না। রাজকুমারীর সহিত কি আমি বন্ধুত্ব করিতে সাহস করিয়াছি? রাজকুমারীর পদবিক্ষেপে কি রুদ্রপুর ও বনাশ্রমের পথ ও ঘাট পবিত্র হইয়াছে? ভগবান! তুমিই জান, আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না।—অমলা এইরূপ চিন্তায় অভিভূত হইয়া নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিল।

জমীদার নগেন্দ্রনাথ শয়ন করিতে গেলেন। স্নেহময়ী কমলা বৃদ্ধ শোকার্ত্ত জমীদারের অনেক সেবা-শুশ্রূষা করিলেন। কমলা ও সরলা, দুইজনে আজি নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া

স্বজাতীয় জমীদারকে খাওয়াইয়াছেন, সযত্নে জমীদারের শয্যা রচনা করিয়াছেন, জমীদারের অনেক সেবা করিয়াছেন। জমীদার এই শান্ত নম্রমুখী রমণীদ্বয়ের যত্ন দেখিয়া প্রীত হইলেন, সজল নয়নে কহিলেন,—মা কমলা, তুমি আর ঐ বালিকা সরলা বৃদ্ধের জন্য অদ্য যে সেবা ও যত্ন করিলে, এ বৃদ্ধ এতটুকু যত্ন অনেক দিন পায় নাই। আমি যদি অভাগা না হইতাম, তোমাদের মত স্নেহময়ী পুত্রবধূদ্বয় আজি আমার সেবা করিত, তোমাদের ন্যায় শান্ত, সুরূপা পুত্রবধূদ্বয় আমার ঘর আলো করিত! কিন্তু বিধাতা সে সুখ আমার কপালে কি লিখিয়াছেন? কার্ত্তিকের ন্যায় পুত্রদ্বয়, লক্ষ্মীর ন্যায় স্নেহময়ী পুত্রবধূদ্বয় আমার গৃহ কি পূর্ণ করিবে? আমি সংসারে অনেক দেখিয়াছি, এই গ্রামের ন্যায় শান্তিপূর্ণ স্থান সংসারে বিরল। আমি অনেক কায়স্থ কুল দেখিয়াছি, তোমাদের ন্যায় স্নেহময়ী সর্ব্বগুণসম্পন্না কায়স্থকন্যা অতি বিরল।

অমলাও শয়নার্থ গমন করিল। বাহিরের কুটীরে কেবল মহাশ্বেতা সরলাকে লইয়া এখনও বসিয়া আছেন, শীঘ্র শয়ন-কক্ষে যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকা-বেশে একজন নারী আসিয়া মহাশ্বেতার কাণে কাণে বলিল,—রাণীমা, একবার এদিকে আইসুন।

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন! এ গ্রামে তাঁহাকে "রাণীমা" বলিয়া কে চিনিল! পরিচারিকা আবার বলিল,—রাণীমা, আমাকে চিনিতে পারিলেন না? আমি যে আপনারই পুরাতন দাসী।

মহাশ্বেতা তখন তাহাকে চিনিলেন, সে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের একজন পুরাতন পরিচারিকা ছিল। বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

একি! তুই এত দিন পরে সেখান হইতে আসিলি, কি জন্যই বা আসিলি? আমরা এ গ্রামে আছি কিরূপে জানিলি?

পরিচারিকা। আপনারা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে চলিয়া যাইবার পর আপনার শ্বশুর কুলের লোক আপনার জন্য কত অনুসন্ধান করিয়াছে, কচিমেয়ে সরলার জন্য কত কাঁদাকাটি করিয়াছে, তাহা আর কি বলিব মা? সে সব কথা পরে বলিব। অনেক অনুসন্ধান করিয়া শেষে আপনাদের পাইলাম। সরলা দিদির পিশিমা একবার ভাইঝির মুখখানি দেখিবার জন্য কত দেশে ঘুরিয়াছেন তাহা আর কি বলিব। শেষে রুদ্রপুরে যান, তথা হইতে নৌকা করিয়া এই গ্রামে আসিয়াছেন। এখানে তাঁহার আসিতে ভয় হয়; যদি রাণীমা কন্যাকে লইয়া একবার নৌকায় যাইয়া দেখা করেন তাহা হইলে পিশিমা আপনাদিগকে অনেক দিন পরে দেখিয়া একবার চক্ষু জুড়ান।

পুরাতন কথা মনে উদয় হওয়ায় মহাশ্বেতার পাষাণ হৃদয় গলিত হইল, নয়ন দিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। সে অশ্রু সম্বরণ করিয়া সরলাকে সঙ্গে লইয়া পরিচারিকার সঙ্গে ঘাটের দিকে চলিলেন।

ঘাট অতি নিকটে। ঘাটে আসিয়া পরিচারিকা নৌকা দেখাইয়া দিল। নৌকাখানি অতি ক্ষিপ্রগামী, দশ বার জন দাঁড়ী দাঁড় ধরিয়া রহিয়াছে। নৌকার ভিতর হইতে জনৈকা বৃদ্ধা রমণী তাঁহাকে আসিতে ইঙ্গিত করায় মহাশ্বেতা তৎক্ষণাৎ সরলাকে লইয়া উঠিলেন। তন্মুহূর্ত্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল, পরিচারিকা নৌকায় না উঠিয়া অন্য দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। নৌকার ভিতর বৃদ্ধা নারী সরলার পিশিমা নহেন, শকুনির একজন চর মাত্র! মহাশ্বেতা ও তাঁহার কন্যা অদ্য সতীশচন্দ্রের বন্দী হইলেন!

একবিংশ পরিচ্ছেদ: কারাবাস

THE pale stars of the morn
Shine on a misery, dire to the borne.
Dost thou faint?

—*Shelley.*

প্রাতঃকালে স্বর্ণবর্ণ সূর্য্যরশ্মি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের (আধুনিক চৌবেড়ে) শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রাচীর, স্তম্ভ, গবাক্ষ, কক্ষ, ছাদ, সকলই আলোকময় করিতেছে, দুর্গপদচারিণী শান্ত-প্রবাহিণী যমুনার উপর ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। নদী-বক্ষে প্রকাণ্ড দুর্গের ছায়া প্রতিফলিত

রহিয়াছে, আর দুই একখানি ক্ষুদ্র তরী ভাসিতেছে। শীতল সমীরণ ক্ষেত্রস্থিত শিশির বিন্দুতে সিক্ত হইয়া অধিকতর শীতল হইয়া বহিতেছে, আর ঘাটে যে সকল রমণী স্নান করিতে বা জল লইতে আসিয়াছে, তাহাদিগের শরীর পুলকিত করিতেছে। কৃষকগণ গরু লইয়া মাঠে যাইতেছে ও রহিয়া রহিয়া আনন্দে গান করিতেছে, এবং পক্ষিগণ তরুণ অরুণ কিরণে পুলকিত হইয়া সেই গানে যোগ দিতেছে। সমস্ত জগৎ আলোকময় ও আনন্দময়।

সেই প্রকাণ্ড দুর্গের নিম্নতলে একটী নিভৃত ঘরে একটী হীনজ্যোতি প্রদীপালোকে মহাশ্বেতা ও সরলা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা শকুনির চর দ্বারা আনীত হইয়া এই দুর্গে বন্দী হইয়াছেন।

সরলা নিদ্রিত। মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় মহাশ্বেতার পার্শ্বে বালিকা নিদ্রিত রহিয়াছে, সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সরলা নিদ্রা যাইতেছে। সরলার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, চক্ষু দুইটী কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, মুখমণ্ডলে পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা বা বালিকাভাব দেখা যায় না, সরলা আর বালিকা নাই। সহসা অসীম শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া বালিকা-সুলভ সুখস্বপ্ন জাগরিত হইয়াছে।

সরলার পার্শ্বে মহাশ্বেতা অনিদ্র হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে যে ভাব লক্ষিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত, সে ভাব ভয়ের নহে, দুঃখের নহে, কেবল চিন্তার নহে। নয়ন জ্বলিতেছিল, সূক্ষ্ম ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া রহিয়াছে, সমস্ত মুখমণ্ডলে উন্মত্ততার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয় পূর্ব্বস্মৃতি ও চিন্তাতরঙ্গে প্লাবিত হইতেছে।

ক্ষণেক পর সরলা জাগিল। উঠিয়া মাতার মুখমণ্ডলে চাহিয়া বলিল,—মা, সমস্ত রাত্রি তোমার নিদ্রা হয় নাই?

মহাশ্বেতা কোনও উত্তর করিলেন না। সরলা আবার বলিল,—

মা, তোমার জন্য কল্য যে অন্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহা এখনও স্পর্শ কর নাই, যেরূপ ছিল সেইরূপ আছে?

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন,—না মা, আহারে রুচি নাই।

সরলা। না খাইলে শরীর কতদিন থাকিবে?

মহাশ্বেতা। বাছা, আর শরীর থাকার আবশ্যক কি? ভগবান অনুগ্রহ করিয়া যদি ইহার অগ্রেই আমার মৃত্যু ঘটাইতেন, তাহা হইলে তোমাকে এ অবস্থায় দেখিতে হইত না।

সরলা। মা, তুমি না থাকিলে আমি কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব, জগতে আর আমার কে আছে যে তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?

মহাশ্বেতা সজলনয়নে উত্তর করিলেন,—না মা, হতভাগিনীর এখনও যাইবার সময় হয় নাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে ঘরের দ্বার খুলিল। মহাশ্বেতা দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন নিরুপমা সুন্দরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। বলিবার আবশ্যক নাই যে, সে সুন্দরী বিমলা।

বিমলা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে দুঃখে অধীর হইল। দেখিলেন পূর্ব্বদিনের খাদ্যদ্রব্য এখনও স্পর্শ করা হয় নাই, বৃদ্ধা মহাশ্বেতা প্রায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন. তাঁহার পার্শ্বে বালিকা বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

বিমলা আপন চক্ষু মুছিয়া, মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—মাতঃ! আপনাদিগের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আপনারা বাহিরে আইসুন।

রমণীকণ্ঠনিঃসৃত করুণাসূচক কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা সেইদিকে চাহিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? বিমলা উত্তর করিলেন,—এই দুর্গাধিপতি সতীশচন্দ্রের দুহিতা, আমার নাম বিমলা।

ক্রোধে মহাশ্বেতা শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—তোমার পিতাকে বলিও, আমাদের আর অধিকদিন বাঁচিবার নাই, যে কয়েকদিন আছি, আমাদিগকে নির্জ্জনে থাকিতে দাও, তোমরা আসিয়া বিরক্ত করিও না।

অন্য সময়ে এরূপ উত্তর পাইলে মানিনী বিমলা ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু বন্দীদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের লেশমাত্র উদয় হইল না। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—

আমার পিতার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন, তিনি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আইসি নাই, এই জঘন্য ঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।

মহাশ্বেতা পুনরায় বলিলেন,—বন্দীর এইরূপ ঘরেই থাকা ভাল, যাহার চরণে শিকল, তাহার সে শিকল সুবর্ণের না হইয়া লৌহের হওয়াই উপযুক্ত! যাও বাছা, হতভাগিনীদিগের কষ্টের উপর আর উপহাস করিও না।

বিমলা সজলনয়নে উত্তর করিলেন,—মাতঃ! আমি যে আপনাদিগকে উপহাস করিতে আইসি নাই, জগদীশ্বর জানেন।

বিমলা আরও বলিতেন, কিন্তু মহাশ্বেতা তীব্রস্বরে বলিলেন,—জগদীশ্বরের নাম করিও না, তোমার পিতা যেন সে পবিত্র নাম কখনও গ্রহণ না করেন, এবং যেন সে নাম কেহ গ্রহণ করিয়া অপবিত্র না করে।

বিমলা গভীরস্বরে বলিলেন,—মাতঃ! আপনি আমাদিগকে অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন! আপনি যেরূপ হতভাগিনী, আমিও সেইরূপ; হতভাগিনীর জগদীশ্বরের নাম ভিন্ন আর কি আছে? মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই নাম স্মরণ করিব, এই দুঃখ পরিপূর্ণ সংসারে হতভাগিনীর সেই নামই অবলম্বন, সেই নামই একমাত্র সুখ।

সে পবিত্র কথা শুনিয়া মহাশ্বেতার ক্রোধ লীন হইল। বিমলার ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া মহাশ্বেতা একদৃষ্টে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, দেবকন্যার মত সেই উন্নতপ্রকৃতি রমণীরত্ন দণ্ডায়মান আছেন। নয়নে অশ্রুজল, মুখে স্বর্গীয় প্রেম ও ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইতেছে না।

মহাশ্বেতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—বিমলা, ক্ষমা কর; না জানিয়া তিরস্কার করিয়াছি, দুঃখে বিবেচনাশক্তির লোপ হয়।

বিমলা মহাশ্বেতাকে আর কথা বলিতে দিলেন না। নিকটে আসিয়া হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—মাতঃ! ক্ষমা প্রার্থনার কিছুই কারণ নাই,—আপনিও দুঃখিনী, আমিও অল্প দুঃখিনী নহি, আমার অবস্থা জানিলে আপনিও আমার প্রতি দয়া করিবেন।

মহাশ্বেতা বিমলার হাত ধরিয়া রহিলেন, দুই জনে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন, হতভাগিনী সরলাও রোদন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর মহাশ্বেতা বলিলেন,—বিমলা, তোমার দুঃখ আমি বুঝিতে পারিতেছি। পিতার পাপকর্ম্ম দেখিয়া কোন্ ধর্ম্মপরায়ণা কন্যার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়?

বিমলা উত্তর করিলেন,—মাতঃ! আপনি এখনও ভ্রান্ত। আমরা যেরূপ হতভাগা আমার পিতাও সেইরূপ হতভাগা, তাঁহার জীবন মরণ এখনও স্থির নাই। যে পামর আপনাকে ও আমাকে কষ্ট দিতেছে, সে পিতাকেও হতভাগ্য করিয়াছে, আমি আশঙ্কা করি, সে পিতার মৃত্যু সঙ্কল্প করিতেছে।

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন,—সে কি, সতীশচন্দ্র ভিন্ন ইহার ভিতর আর কে আছে?

বিমলা বলিলেন,—উপরে আসুন, আমি সকল কথা আপনাকে অবগত করাইব।

তিন জনে ধীরে ধীরে সেই জঘন্য ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। বিমলা সরলাকে ভগিনীর মত স্নেহ করিয়া লইয়া যাইলেন। তাঁহাদিগের আহারাদি সাঙ্গ হইলে বিমলা শকুনিসংক্রান্ত সমস্ত কথা মহাশ্বেতাকে অবগত করাইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : এ স্বপ্ন নহে,—পূর্ব্বস্মৃতি

> WALL of my Sires, if ye could speak,
> If ye could have a tongue,
> Save by the owlet's awful shriek
> Or ravens' uncouth song,
> Fain would I ask of days gone by,
> And o'er each tale would heave a sigh.
>
> —*J. C. Dutt.*

পৃথিবীতে একপ্রকার লোক আছে যে, তাহাদিগের মুখ দর্শন-মাত্রেই নির্দ্দয়ের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়, নিষ্প্রেমের হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হয়, সকলেরই হৃদয়ে স্নেহের উদ্রেক হয়। মুখের সে ভাব কেবল সৌন্দর্য্য নহে, কেন না, সৌন্দর্য্য সকল হৃদয়কে সমরূপে আকৃষ্ট করিতে পারে না; কতক সৌন্দর্য্য, কতক অমায়িকতা, কতক বালিকার লজ্জা, কতক বালিকার নির্দ্দোষিতা। এক একখানি মুখের সরলতা ও নম্রতা দেখিলে ইচ্ছা হয় যে, তাহাকে হৃদয়ে স্থান দেই, তাহার সন্তোষার্থে জগৎসংসার ত্যাগ করি, তাহার সুখসাধনের জন্য চিরকাল ব্রতী হই। সরলা পরমা সুন্দরী নহে, অথচ তাহার মুখে এইরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাব ছিল, হৃদয় ও মুখের অবিকল প্রতিকৃতি। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে বিমলা যে তাহাকে কনিষ্ঠ ভগিনীর মত ভালবাসিবেন, আশ্চর্য্য নহে।

আর এক প্রকার আকৃতি আছে, যাহাকে নিরুপম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিবার জন্য প্রকৃতি আপন ভান্ডার শূন্য করিয়াছেন। সে জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমন্ডল, জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নযুগল, সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়, উন্নত ললাট, তুলিকাচিত্রিতবৎ সূক্ষ্মভ্রূযুগল, তনু অঙ্গ, সুগঠিত সুদীর্ঘ অবয়ব দেখিলে হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হইবার অগ্রে ভক্তির উদয় হয়। সে উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে, সে উন্নত, প্রশস্ত ললাটে হৃদয়ের উন্নতভাব প্রকাশ পায়, হৃদয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিরাজ করে। বিমলার এইরূপ সৌন্দর্য্য ছিল; তাঁহারও হৃদয় মুখের অবিকল প্রতিকৃতি। এইরূপ দেবীর অবয়ব দেখিয়া সরলা যে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভক্তি করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

সরলার হৃদয় হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য বিমলা তাহাকে দুর্গের চারিদিক দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমে দুর্গের পশ্চাতে উদ্যানে লইয়া গেলেন। তথায় আম্রবৃক্ষের নিবিড় ছায়া দিবা দুই প্রহরকেও সন্ধ্যার ন্যায় সুস্নিগ্ধ করিয়াছে। দুইজনে সেই ছায়ায় ক্ষণেক বসিলেন, দুই প্রহরের মৃদু বায়ুতে অল্প অল্প পত্রের মর্ম্মর শুনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে ঘুঘুর অতি মৃদু অপরিস্ফুট শব্দ শুনা যাইতেছে। সে শব্দে হৃদয় মোহিত ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

উভয়ে উদ্যান হইতে সরোবরসমীপে গমন করিলেন। তাহার জল অতি বিস্তীর্ণ, চারিপার্শ্বে আপন স্থির বক্ষে আম্রছায়া ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দুইজনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সরোবরের ঘাটে বসিয়া রহিলেন, স্বভাবের নিস্তব্ধ শোভা দেখিয়া হৃদয় নিস্তব্ধ হইল। বিমলা মধ্যে মধ্যে কথা কহিতেছেন, সরলার মুখে কথা নাই, নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছে।

সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেক পূর্ব্বেই সেই ঘনচ্ছায়ান্বিত আম্রবেষ্টিত সরোবরে অন্ধকার হইতে লাগিল। বিমলার বোধ হইল, যেন তাঁহার প্রিয়সখীর অন্তঃকরণেও কোন দুঃখ-তিমির ঘনীভূত হইতেছে।

বিমলা অতি স্নেহসহকারে সরলাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া আপন হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন,—সরলা, তোমার মনে কোন দুঃখ উদয় হইতেছে? আমার নিকট লুকাইতেছ কি জন্য?

সরলা উত্তর করিল,—তোমার কাছে লুকাইব কি জন্য, সত্য, আমার মন কেমন কেমন করিতেছে, কিন্তু যথার্থ বলিতেছি, কি দুঃখ তাহা জানি না।

বিমলা। তবে কিছু চিন্তা করিতেছ?

সরলা। জানি না, চিন্তা কিছুই নাই, এক একবার মন কেমন কেমন করিতেছে।

সরলা সম্পূর্ণ সত্যকথাই কহিতেছিল। মন কিজন্য চঞ্চল হইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারে নাই।

সন্ধ্যা হইল, বিমলা ও সরলা উদ্যান হইতে পুনরায় দুর্গাভ্যন্তরে আসিলেন। তথায় আসিয়া বিমলা সরলাকে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে লাগিলেন ও নানারূপ অপরূপ ও বহুমূল্য সামগ্রী দেখাইতে লাগিলেন। আপনার শয়নাগারে লইয়া যাইলেন, তথায় একটী ময়নাপাখী ছিল, সে কথা কহিতে পারিত।

বিমলা সরলাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—বল দেখি এ কে? পাখী বলিল,—এ কে?

বিমলা। তুই বল্ না, আমি বল্‌ব কেন?

পাখী। বল্‌ব কেন?

বিমলা। তবে বুঝি তুই জানিস না?

পাখী। তুই জানিস্ না।

বিমলা। বল্ দেখি, সরলা বাহিরের মেয়ে, না বাড়ীর মেয়ে?

পাখী। বাড়ীর মেয়ে।

বিমলা। পারলিনি, দূর বাঁদী।

পাখী। দূর বাঁদী।

সরলা পাখীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল,—আমি কি এই বাড়ীর মেয়ে?

পাখীর কতদূর বিদ্যা বিমলা তাহা জানিতেন,—সে পাখীকে যে কথাগুলি বলা যাইত, তাহার শেষ দুইটী কথা উচ্চারণ করিতে পারিত।

তাহার পর বিমলা সরলাকে অন্য একটী কক্ষে লইয়া যাইলেন। কক্ষ দেখিবামাত্র সরলার বিষণ্ণতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল, হঠাৎ অন্যমনস্কা হইয়া ভাবিতে লাগিল। বিমলা স্নেহভরে বলিলেন,—আইস আবার চিন্তা কেন?

সরলা উত্তর করিল,—আমার মন আরও কেমন করিতেছে, যেন স্বপ্ন দেখিতেছি,—মা কোথায়?

বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, সরলার চক্ষুতে জল, নিস্তব্ধে তাহাকে মাতার নিকট লইয়া গেলেন। সরলা দ্রুতবেগে মাতার নিকট যাইয়া অশ্রুপরিপূর্ণনয়নে মাতার বক্ষঃস্থলে লুকাইল।

মহাশ্বেতা অতিশয় ঔৎসুক্য ও স্নেহের সহিত সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি মা, কি হইয়াছে?

সরলা উত্তর করিল,—মা, আমি জানি না, এ বাটীতে কি আছে, আমি আজ সমস্ত দিন যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। সকল দ্রব্যই যেন দেখিয়াছি বোধ হইতেছে। একটা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র যেন এক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মা, আমি পাগলিনী, সহসা সেই মূর্ত্তিকে পিতা বলিয়া ভাবিলাম। মা, আমি অজ্ঞান, কিংবা স্বপ্ন দেখিতেছি।

মহাশ্বেতা আর শুনিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন, অজ্ঞান বালিকার কথায় অদ্য তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে মহাশ্বেতা কন্যাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—সরলা, এ স্বপ্ন নহে, পূর্ব্বস্মৃতি তোমার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, যে কথা আমি এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, যে কথা তুমি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ বোধ করিয়াছিলাম, সে কথা আপনা হইতেই তোমার অন্তরে উদয় হইতেছে, আর আমি তোমার নিকট কিছু লুকাইব না।

এই বলিয়া মহাশ্বেতা আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা সরলার নিকট বলিলেন। সরলার জন্মকথা, রাজা সমরসিংহের সম্মান ও গৌরবের কথা, তাঁহার অন্যায় মৃত্যুর কথা, আপনাদিগের পলায়ন ও ছদ্মবেশের কথা, এসমস্ত কথা বালিকার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। সেই সকল কথা প্রথমে সরলার স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোহজাল অন্তরিত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে দুই একটী কথা স্মরণ হইতে লাগিল। ঘর, দালান, স্তম্ভ দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বকথা জাগরিত হইতে লাগিল।

মহাশ্বেতার লৌহহৃদয়ও অদ্য দ্রবীভূত হইতেছিল, মাতা কন্যায় পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

বিমলা পার্শ্বে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত, নয়ন হইতে বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তাঁহার মনের ভাব পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিবেন। শকুনি যে কতদূর পামর, পিতাকে যে কতদূর পাপকর্ম্মে লিপ্ত করিয়াছে, কি জন্য মহাশ্বেতাকে বন্দী করিয়াছে, এ সমস্ত চিন্তা মহা-বাত্যার ন্যায় তাঁহার হৃদয় আহত ও ব্যথিত করিতেছিল।

বিমলা সহসা চিন্তাস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া গভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—মাতঃ! পামর শকুনির পাপ আমি এতদিনে জানিলাম, এ বিশ্বসংসারে উহার মত পাতকী আর নাই, নরকেও উহার মত কীট নাই। কিন্তু উপরে ভগবান আছেন, এ ভীষণ পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত আছে।

এই গভীর কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা বলিলেন,—বৎস বিমলা, ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি আছে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায়, তাঁহার লীলাখেলা আমরা বুঝিতে পারি না। না হইলে এ সংসারে পাপের জয় কি জন্য?

বিমলা পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন,—মাতঃ, আমার কথা অবধারণা করুন। পাপের জয় ক্ষণস্থায়ী মাত্র, পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই। আমি এই পামরের মৃত্যুর উপায় দেখিতে পাইতেছি, আপনার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিহিংসার বিলম্ব নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : ভিখারিণীর রত্ন

HAS sorrow thy young days shaded
As clouds o'er the morning fleet?
Too fast have those young days faded
That even in sorrow were sweet?
Does time with his cold wings wither
Each feeling that once was dear?
Come, child of misfortune! come hither.
I'll weep thee tear for tear!

—*Moore.*

সন্ধ্যার সময় মহাশ্বেতা পূজার্থ যমুনাতীরে গমন করিলেন, শকুনির তাহাতে আপত্তি ছিল না। যে দুর্গে তাঁহার যৌবনাবস্থা, তাঁহার সুখের দিন গত হইয়াছিল, যথায় তিনি রাজকুলচূড়ামণি সমরসিংহের রাজমহিষী হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন, আজি সেই দুর্গের পার্শ্বে হীন, নিরাশ্রয় বিধবা বন্দী হইয়া উপাসনা করিতেছেন। পূর্ব্বে দুর্গপার্শ্বে যে তরঙ্গময়ী যমুনা কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইত, আজিও সেই নদী সেইরূপ ভ্রূকুটী করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই। দূরে যে পল্লীস্থ বৃক্ষশ্রেণী দেখা যাইত, পার্শ্বে যে আম্রকানন দেখা যাইত, সম্মুখে যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখা যাইত, তাহাতে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু মহাশ্বেতার জীবনে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! আজি সে পূর্ব্বগৌরব কোথায়, সে দুর্গাধিপতি কোথায়, সে বীরশ্রেষ্ঠ কোথায়? গ্রীষ্মকালের প্রবল বাত্যায় যেরূপ শুষ্কপত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মধ্যে বারিবিন্দু যেরূপ লীন হয়, অতীতকালরূপ অনন্ত সাগরে সেইরূপ পূর্ব্ব গৌরব লীন হইয়াছে।

এদিকে বিমলা সরলাকে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া দুই সহোদরার ন্যায় এক শয্যায় শয়ন করিলেন। বিমলা সরলাকে দেখিয়া অবধি তাহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু যখন জানিলেন যে, শকুনি ও পিতার পরামর্শে সরলা অনাথা হইয়াছে, তখন তাহার প্রতি স্নেহ ও মমতা দ্বিগুণ হইল। পিতা যে ঘোর পাপ করিয়াছেন, তাহার যদি পরিশোধ থাকে, মহাশ্বেতা ও সরলার প্রতি গাঢ় যত্ন ও স্নেহ দ্বারা বিমলা তাহার পরিশোধ করিতে লাগিলেন। দুইজনে একত্র শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ অবধি কথোপকথন করিতে লাগিলেন। দুইজনই অল্পবয়স্কা ও অবিবাহিতা, দুইজনের মধ্যে শীঘ্রই প্রগাঢ় ও পবিত্র ভালবাসার সঞ্চার হইল।

বিমলা বার বার সরলা ও মহাশ্বেতার অজ্ঞাতবাস ও কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,

বার বার পল্লীগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সরলার মুখ হইতে সেই সকল গল্প শুনিতে শুনিতে বিমলার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, পিতার পাপকর্ম্মে হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা হইতে লাগিল, শকুনির চক্রান্তে তাঁহার শরীর কোপে কণ্টকিত হইতে লাগিল। অতি স্নেহসহকারে দুই বাহু দ্বারা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া বিমলা বার বার সেই বালিকার মুখে সেই দারিদ্র্যের কথা, সেই পল্লীগ্রামে নিবাসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার বার চক্ষুজলে সরলার নয়ন ও বদনমণ্ডল এবং কেশরাশি সিক্ত করিলেন।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা যখন রুদ্রপুরে ছিলে, তখন তোমাদের বন্ধু কে ছিল? কৃষকপত্নীরাই কি তোমাদের বন্ধু ছিল?

সরলা বলিল,—মা কাহারও সহিত অধিক কথা কহিতেন না, দিবাভাগে প্রায় চিন্তায় লিপ্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিতেন। আমার সহিত দুই একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের আলাপ ছিল। অমলা নামে এক মহাজনের স্ত্রী ছিল, তাহারই সহিত অধিক সময় আমার কথাবার্ত্তা হইত।

বিমলা। সে কি জাতি?

সরলা। জাতিতে কৈবর্ত্ত।

বিমলা। সে তোমাকে ভালবাসিত, তোমাকে যত্ন করিত?

সরলা। বোধ হয়, আমার মাতা ভিন্ন আর কেহ আমাকে সেরূপ ভালবাসিতে পারে না, তাহার কথা মনে হইলে চক্ষুতে জল আসে।

বিমলা। সরলা, তোমাদের প্রতি কিরূপ অন্যায় করা হইয়াছে তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। যদি আমার সাধ্য থাকে, আপনি ভিখারিণী হইয়াও তোমাদের পূর্ব্বাবস্থা বজায় রাখিব।

সরলা। আমি সত্য বলিতেছি, পল্লীগ্রামে সেরূপ অবস্থায় আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, কিন্তু মাতা দিবারাত্রি চিন্তা করিতেন, সেইজন্য আমার দুঃখ হইত। মাতাকে সুখে রাখ, এই আমার ভিক্ষা।

বিমলা। সরলা, আমারও সেই ইচ্ছা, প্রাণ দিয়াও যদি তোমার মাতাকে সুখে রাখিতে পারি, তাহাতেও সম্মত আছি।

সরলা। কেন, তোমার অসাধ্য কি? তোমাদের এত ধন, এত মানসম্ভ্রম!

বিমলা। সরলা, তুমি আমার সকল কথা জান না, যদি জানিতে, তবে আমাকে তোমা অপেক্ষাও হতভাগিনী বোধ করিতে। এ ধন মান আর আমাদের নহে।

সরলা। কেন?

বিমলা। আমি প্রাতঃকালেই বলিয়াছিলাম যে, পামর শকুনি আমার পিতার প্রাণসংহার করিয়া এই দুর্গ ও জমীদারী হস্তগত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। আমার দিবারাত্রি পিতার চিন্তায় নিদ্রা হয় না। কিন্তু কেবল সেই দুঃখ নহে।

সরলা। আর কি?

বিমলা। সরলা, তোমার নিকট কিছুই লুকাইব না। এই পামর আমাকে বিবাহ করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর পর অনায়াসে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে। আমার বলিতে লজ্জা করে, এই পামর কয়েকদিন অবধি প্রত্যহই বিবাহের প্রস্তাব করিতেছে। আমি অস্বীকার করাতে বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিতে চাহে। কল্য প্রত্যূষে সেই নরঘাতক যমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সরলা, আমাপেক্ষা হতভাগিনী আর কে আছে?

সরলা বিস্মিত হইল, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিল,—কাল পরিত্রাণ পাইবে কিরূপে?

বিমলা অতি গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—কল্য জগদীশ্বর আমাকে উদ্ধার করিবেন, তাঁহার কৃপায় কল্য পরিত্রাণের আশা আছে। তাহার পর নিশিযোগে পিতার নিকট পলায়ন করিব, তাহারও উপায় স্থির হইয়াছে। তাহার পর পামরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহারও উপায় পাইয়াছি। ভগবান্, এই দুরূহ কার্য্যে অবলার সহায় হও।

সরলা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, বিমলা আরও বলিতে লাগিলেন,—মুঙ্গের যাইয়া পিতার পরিত্রাণ করিব, পাপীর শাস্তি দান করিব। তাহার পর পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া এই দুর্গ মহাশ্বেতাকে পুনরায় দান করিব। আমি পিতার অন্তঃকরণ জানি, শকুনির পরামর্শ হইতে মুক্ত

হইলে তিনি ন্যায় কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিবেন না। আর মুঙ্গেরে এক বীর পুরুষ আছেন, তিনিও বোধ হয় আমার সহায়তা করিবেন। ইন্দ্রনাথ! সত্য পালন করিও।

“ইন্দ্রনাথ” নাম শুনিয়া সরলা চমকিত হইল, সহসা তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, বিমলা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—সরলা, তুমি অমন করিয়া উঠিলে কেন? তুমি বেদনা পাইয়াছ?

সরলা কোন উত্তর করিতে চাহে না, মুখ গোপন করিয়া রাখে। কিন্তু অনেক জিজ্ঞাসায় বলিল,—ইন্দ্রনাথ নামক আমার পরিচিত একজন লোক আছেন, তিনিও পশ্চিম যাত্রা করিয়াছেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিমলার নিকট কোন কথা গোপন রহিল না। সরলার নিকট হইতে একটী একটী করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলেন। ইন্দ্রনাথ সরলার হৃদয়েশ্বর, ইন্দ্রনাথ সরলার প্রণয়ী, ইন্দ্রনাথ মহাশ্বেতা ও সরলার উদ্ধারার্থ দুই তিন মাস হইল পশ্চিম গিয়াছেন,—তবে কি সেই ইন্দ্রনাথকেই বিমলা মহেশ্বর-মন্দিরে দেখিয়াছেন? বিমলার হৃৎকম্প হইল, তিনি ধীরে ধীরে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সরলা, সেই বীরশ্রেষ্ঠের শরীরের কোন স্থানে কোন বিশেষ চিহ্ন আছে, লক্ষ্য করিয়াছ? সরলা উত্তর করিল,—তাঁহার বাম হস্তে একটী নিবিড় কৃষ্ণ যৌতুক চিহ্ন আছে।

বিমলার শরীর কাঁপিয়া উঠিল,—ইন্দ্রনাথের হস্তে সে চিহ্ন তিনিও দেখিয়াছেন।

নীরবে বিমলা পাশ ফিরিয়া শুইলেন, তাঁহাকে নিদ্রিতা বিবেচনা করিয়া বালিকা সরলাও ঘুমাইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ : বিবাহের বরকন্যা

"O! do not tempt," she said,
"O! do not add to my distress,
I have tasted much of bitterness."

* * *

But ah, fair maid, thou plead'st
in vain,
His heart is proof to prayers,
Albeit like darksome floods of rain
Thou shedst thy scalding tears.

—*S. C. Dutt.*

রাত্রি প্রভাত হইল। আজ বিমলার পক্ষে ভয়ানক দিন। কিন্তু বিমলা বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে বিমলা শয্যাগৃহ হইতে অন্য একটী গৃহে যাইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসনা করিতে লাগিলেন, অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা কপোলদেশ প্লাবিত করিয়া বহিতে লাগিল।

উপাসনা সাঙ্গ করিয়া বিমলা বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন, শকুনি তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, গায়ের রক্ত শুকাইয়া গেল।

শকুনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিমলার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্প যেরূপ ভেককে ভক্ষণ করিবার অগ্রে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ শকুনি বিমলার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিমলাও নিস্পন্দশরীরে দণ্ডায়মান হইয়া ভূমির দিকে একদৃষ্টে চাহিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভয়ে ও ক্রোধে জর্জ্জরীভূত হইতেছিল। অবশেষে মৃদুস্বরে কহিলেন,—শকুনি, আমি হতভাগিনী, আমার মত হতভাগিনী আর নাই, আমাকে আর দুঃখ দিও না, ক্ষমা কর।

সে বচনে পাষাণও দ্রবীভূত হইত, শকুনির হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—এইজন্য বুঝি সময় চাহিয়াছিলে?

বিমলা। আমাকে সময় দিয়াছিলে বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু আমাকে ক্ষমা

কর, আমার হৃদয়ে যে কষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি জান না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শকুনি, আমায় ক্ষমা কর।

শকুনি। বিবাহের আগে সকল বালিকাই ঐরূপ বলে, শ্বশুর-বাড়ী যাইবার সময় সকলেই কাঁদে, কিন্তু একবার গেলে আর বাপের বাড়ীতে আসিতে চাহে না।

বিমলা। শকুনি, উপহাস করিও না, আমি হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছি, উপহাস ভাল লাগে না।

শকুনি। আমি উপহাস করিতে আইসি নাই। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা পালন করিতে সম্মত আছ কি না?

বিমলা। আমি কোন প্রতিজ্ঞা করি নাই।

শকুনি। প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাক, আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ কি না?

বিমলা। জীবন থাকিতে সম্মত হইব না।

শকুনি। আর আমার দোষ নাই, এক্ষণে বলপ্রকাশ ভিন্ন আর উপায় নাই।

বিমলা। আমার পিতা থাকিলে তুমি এরূপ কথা বলিতে পারিতে না। পিতার অবর্ত্তমানে, রক্ষাকর্ত্তার অবর্ত্তমানে, নিরাশ্রয় অবলার উপর অত্যাচার করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে।

শকুনি। আমি বালিকার নিকট ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শিখিতে আইসি নাই।

বিমলা। তথাপি আমার কথা অবধারণ কর। দেখ, আমার পিতা তোমাকে কত অনুগ্রহ করেন, তোমাকে দরিদ্রাবস্থা হইতে পুত্রের মতন লালনপালন করিয়াছেন, তোমাকে অদ্যাপি পুত্রের মতন যত্ন করেন। তাঁহার কন্যার প্রতি অত্যাচার করা তোমার বিধেয় নহে।

শকুনি আপনার পূর্ব্বকার দরিদ্রাবস্থার কথা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—তোমার পিতা সহস্র পাপ করিয়াও যে আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন, সে আমার অনুগ্রহে।

পিতার নিন্দাবাদে বিমলা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আরক্ত নয়নে কহিলেন, —তুমিই আমার পিতার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তুমিই আবার তাঁহাকে তিরস্কার কর? কুক্ষণে ভৃত্যের বেশে এই দুর্গে আসিয়াছিলে, এক্ষণে প্রভু হইতে চাহ? ভৃত্যের সহিত বিবাহে বিমলা কখনও সম্মত হইবে না।

শকুনি। কাহার সম্মুখে এরূপ কথা কহিতেছ জান? তোমার জীবন মরণ, তোমার পিতার জীবন মরণ আমার হস্তে তাহা জান?

বিমলা। জানি,—সতীশচন্দ্রের কন্যা সতীশচন্দ্রের ভৃত্যের সহিত কথা কহিতেছে, সে দিন যে নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্র অন্নের জন্য পিতার নিকট আশ্রয় লইয়াছে, তাহারই সহিত আমি কথা কহিতেছি।

বিমলা স্বভাবতঃ মানিনী, পিতার নিন্দা-কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার নয়নদ্বয় জ্বলিতেছিল, আলুলায়িত কেশ কপোলে ও উন্নত বক্ষঃস্থলের উপর পড়াতে তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেছিল। সে অপরূপ আকৃতি দেখিয়া শকুনিও কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন ও ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে বিমলা ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

আমার মিথ্যা রাগ, শকুনি, আমি জানি আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীনে আছি। তোমাকে যে ভর্ৎসনা করিলাম সে কেবল ক্রোধে অন্ধ হইয়া। পিতৃনিন্দা আমি সহ্য করিতে পারি না, আমার নিকট পিতার নিন্দা করিও না।

শকুনি। আমি তোমার পিতার নিন্দা করিতে আইসি নাই; তোমার পিতা আমার প্রতি যে দয়া করিয়াছেন তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে যাহার জন্য আসিয়াছি তাহার উত্তর কি?

বিমলা। আমি জীবন থাকিতে তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।

শকুনি। বিমলা, তুমি অতি বুদ্ধিমতী। আমার হৃদয়ে দয়া, ক্রোধ, দুঃখ প্রভৃতি নানারূপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া আমার মনস্কামনা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেছ; বিমলা, তাহা পারিবে না। আমি যে কর্ম্মে যখন দৃঢ়ব্রত হইয়াছি, জগৎসংসারে কোন লোকই আমাকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখিতে পারে নাই। তুমি বালিকা হইয়া যে এত দিন আমাকে এই বিবাহ হইতে নিরস্ত রাখিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু আর পারিবে না। অদ্যই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে, সকল আয়োজনই প্রস্তুত আছে। তুমি

বাধা দিলেই বল প্রকাশ করিব, তবে মিথ্যা আর কি জন্য আপত্তি কর, আইস, দুইজনে নীচে যাই।

এই কথা শুনিয়া বিমলা একেবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অজ্ঞানের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—পিতা এ বিপত্তির সময় সহায় হও।

শকুনি। তোমার পিতা মুঙ্গেরে, তোমার বৃথা প্রার্থনা।

বিমলা। তবে জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও। এই বলিয়া বিমলা হস্ত জোড় করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেশরাশিতে বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়াছে, বেশভূষা বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, নয়নদুটী জলে পরিপূর্ণ অথচ অপার্থিব জ্যোতিঃতে জ্বলিতেছে। উন্মত্তের ন্যায় উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বিমলা বলিলেন,—জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও।

সে আকৃতি দেখিয়া শকুনি আবার নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। একদৃষ্টে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন,—

শকুনি, তুমি জগদীশ্বরকে ভয় কর, এ পৃথিবীতে এত পাপ করিয়াছ, অবশ্যই জগদীশ্বরকে ভয় কর। আমি তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার ভ্রাতাস্বরূপ, আমি তোমার ভগিনীস্বরূপা,—তুমি আমার পুত্রের স্বরূপ, আমি তোমার মাতার স্বরূপা,—আমাকে বিবাহ করিতে চাহিও না।

জগদীশ্বরের পবিত্র নামে কোন্ পাপীর হৃদয় কম্পিত না হয়? শকুনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—হতভাগিনি! নির্ব্বোধ! দেখিব, কে তোর সহায় হয়। এক দণ্ড সময় দিলাম, এক দণ্ডের পর এ কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

এক দণ্ড একাকী বসিয়া বিমলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চক্ষু হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এ রোদনের সময় নহে, তীক্ষ্ন বুদ্ধিমতী কয়েক দিন হইতে যে উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন তাহাই স্থির করিলেন।

একদণ্ড কাল পরে শকুনি পুনরায় দর্শন দিলেন। বিমলা কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—শকুনি, আমার কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে, বিধি যদি তোমার গৃহিণী হইবার জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহাই হইবে।

শকুনির মুখে আর হাসি ধরে না, তিনি আগ্রহের সহিত বিমলার হাত ধরিলেন। বিমলা তাহাতে আপত্তি করিলেন না, পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—

শকুনি, আমার একটী মাত্র ভিক্ষা আছে। পিতার রক্ষার জন্য আমি একটী ব্রত করিতেছি তাহা আর তিন দিনে সমাপন হইবে, এই তিন দিন অবসর দাও, এ ভিক্ষা দানে পরাঙ্মুখ হইও না। শকুনি, এ ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া আমি বিবাহ করিব না, বরং আত্মঘাতিনী হইব, তুমি আমাকে পাইবে না।

শকুনি ক্ষণেক চিন্তা করিতে লাগিলেন, অগত্যা আর তিন দিনের সময় দিলেন।

তীক্ষ্ন বুদ্ধিমতী বিমলা পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত পরিচারিকা দ্বারা দুর্গ হইতে এক ক্রোশ দূরে নৌকা স্থির করিয়াছিলেন। এক প্রহর রাত্রির সময় মহাশ্বেতা ও সরলাকে অনেক আশ্বাস দিয়া কয়েকজন অনুচর ও পরিচারিকা লইয়া এক ক্রোশ পদব্রজে যাইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : নির্ব্বাসন

AND shall my life in one sad tenour run,
And end in sorrow as it first begun.

—*Pope.*

নৌকা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল। উপরে নৈশ আকাশ নীল ও নিস্তব্ধ, চারিদিকে ধান্যক্ষেত্র ও পল্লীগ্রাম নিদ্রিত ও নিস্তব্ধ, তাহার মধ্য দিয়া বর্ষার বিস্তীর্ণ ও বেগবতী নদীর বক্ষ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষিপ্রগামী নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে! নৌকার ভিতর একটীও দীপ নাই, কোনও প্রকার শব্দ নাই, নৈশ আকাশও জগতের ন্যায় অন্ধকারময় ও শব্দশূন্য!

আকাশ অন্ধকারময়, যতদূর দৃষ্ট হয়, সম্মুখে ও পশ্চাতে নদীর জল ধূ ধূ করিতেছে, রাশি রাশি মেঘ সেই নীল জলে প্রতিফলিত হইতেছে, অল্প বায়ুতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তরঙ্গমালা ও ফেনরাশির মধ্য দিয়া নৌকা কল্ কল্ শব্দে চলিতেছে। উভয় পার্শ্বে কোথাও আম্রকানন নিশাচরশ্রেণীর ন্যায় নিবিড় অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বায়ুতে গম্ভীর শব্দ করিতেছে, কোথাও বা কতদূর শুভ্র বালুকারাশি বিস্তৃত রহিয়াছে। আকাশে দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, মেঘ ক্রমাগত উড়িতেছে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পশ্চিমদিকে রাশীকৃত হইতেছে। নৌকা কল্ কল্ শব্দে চলিতেছে।

বিমলা নৌকার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে কত যে চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল, কে বলিবে? ছয় বৎসরকাল যে দুর্গে অতিবাহিত করিয়াছেন, স্নেহময়ী মাতার যে দুর্গে মৃত্যু হইয়াছে, বাল্যকাল হইতে যে দুর্গে যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আজি সেই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। সে সাগরের কি কূল আছে? বিমলা কি সেই কূল পাইবেন? আশ্রয়হীনা রমণী কি পিতাকে ফিরিয়া পাইবেন? মহাশ্বেতা ও সরলার কি উদ্ধারসাধন করিতে পারিবেন? পাপাচারী শকুনির দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন?

যিনি কখন অনেক দিনের জন্য দেশত্যাগী হইয়া যাত্রা করিয়াছেন, পোতে আরোহণ করিয়া মাতৃভূমির দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু প্রিয় ও সুখকর আছে সজল নয়নে সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন, অল্প বয়সে সহায়হীন বন্ধুহীন প্রবাসী হইয়া অনন্ত সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন,—তিনিই বিমলার সে রাত্রির ঘোরচিন্তা ও ঘোরদুঃখ অনুভব করিতে পারেন। একাকী নৌকার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের দিকে দেখিতে লাগিলেন। জলের কল্ কল্ শব্দ শুনিতেছিলেন না, আম্রকাননের গম্ভীর শব্দ শুনিতেছিলেন না, তরঙ্গমালার উচ্ছ্বাস ও ফেনরাশির খেলা দেখিতেছিলেন না, ঘোর মেঘের ছটা দেখিতেছিলেন না, কেবল চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ দেখিতেছিলেন, আর অনন্ত ভাবনা ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনার শেষ নাই, আকাশ যেরূপ অনন্ত, নদীর স্রোত যেরূপ অবারিত, সে চিন্তা সেইরূপ অনন্ত ও অবারিত। ভাবিতে ভাবিতে বিমলা চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বভাবতঃ বীরান্তঃকরণ অদ্য দ্রবীভূত হইতে লাগিল। যখন চাহিয়া চাহিয়া আর সে দুর্গ দেখিতে পাইলেন না, কেবল দুর্ভেদ্য তিমিররাশি দেখিতে লাগিলেন, তখন হস্তদ্বয়ে মুখ আবরণ করিয়া দর-বিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহার অঙ্গুলির মধ্য দিয়া অশ্রুজল বাহির হইয়া বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল একেবারে সিক্ত করিল। শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বিমলা যে নিরাপদে মুঙ্গের পঁহুছিয়াছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয় জানেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : অপরূপ ব্যূহ

YET though thick the shafts as snow,
Though charging knights like
whirlwinds go,
Though billmen ply their ghastly blow,
Unbroken was the ring.
The stubborn spearmen still made good
Their dark impenetrable wood,
Each stepping where his comrade stood,
The moment that he fell.

—*Scott.*

শত্রুরা এক্ষণও মুঙ্গেরের নিকট বসিয়া আছে, টোডরমল্ল এক্ষণও অসাধারণ যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন, ইন্দ্রনাথ দিন দিন খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। সুযোগ

পাইলেই তিনি আপনার পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেন, অল্পসংখ্যক শত্রু-সৈন্য কোথাও আছে এরূপ সংবাদ পাইলেই মহারাজের অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতেন, অধিক শত্রু আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গে প্রবেশ করিতেন। বার বার এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শত্রুরা ব্যতিব্যস্ত হইল, দুর্গবাসিগণ নব সেনাপতির রণ-কৌশল, সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, দিন দিন তাঁহার বীরত্বের যশ বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল।

শত্রুরা ভাগলপুর হইতে অগ্রসর হইয়া মুঙ্গেরের নিকটে একটী শিবির স্থাপন করিয়াছিল। এক দিন সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় রাজা টোডরমল্ল শত্রুদিগের শিবির দর্শনার্থ দুর্গের প্রাচীর ছাড়িয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে গিয়াছিলেন। শত্রুর শিবির সে স্থান হইতে অনেক দূরে, সুতরাং কোন ভয়ের কারণ ছিল না। বিশেষ মহারাজ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন ও তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশৎ জন অশ্বারোহী ছিল। অশ্বারোহিগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, রাজা একদৃষ্টে শত্রুর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সহসা দূর হইতে একটী শব্দ শ্রুত হইল। সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, দূরে ধূলিরাশি দেখা যাইতেছে, আরও দেখিল, একজন অশ্বারোহী বায়ুবেগে রাজার দিকে ধাবমান হইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন অশ্ব ভূমি স্পর্শ করিতেছে না। সে অশ্বারোহী মুহূর্ত্তমধ্যে নিকটবর্ত্তী হইল, সকলেই চিনিল, সে মহারাজের একজন সৈনিক। রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া সে লম্ফ দিয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইল, অশ্ব এত বেগে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল যে, অশ্বারোহী অবতীর্ণ হইবামাত্র ঘোটক পড়িয়া গেল ও দুই চারিবার চীৎকার ও শূন্যে পদবিক্ষেপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ঘোটকের দিকে দেখিবার কাহারও অবকাশ ছিল না। সৈনিক প্রণাম করিয়া ভীতচিত্তে বলিল,—মহারাজ! আমাদের শিবিরস্থ কোন বিদ্রোহোন্মুখ সেনার নিকট হইতে শত্রুরা সংবাদ পাইয়াছিল যে, অদ্য মহারাজ সন্ধ্যার সময় দুর্গপ্রাচীরের বহির্গত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে দুই সহস্র অশ্বারোহী অপেক্ষা করিয়াছিল, সেই দুই সহস্র অশ্বারোহী এক্ষণে আসিতেছে। সৈনিক এইমাত্র বলিয়া শ্রান্তিবশতঃ ভূমিতে পড়িল।

রাজার অনুচরেরা আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইল। রাজা আজ্ঞা দিলেন,—তোমরাও অশ্বারোহী, দুর্গের দিকে ধাবমান হও, শত্রুরা আসিবার অনেক পূর্ব্বেই আমরা দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব। সকলেই বেগে দুর্গাভিমুখে অশ্বচালনা করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি ইন্দ্রনাথ দূরে ধূলি দেখিয়াই আপন রণভেরী বাজাইয়াছিলেন, তাঁহার পঞ্চশত অশ্বারোহীও সেই আম্রকাননের এক অংশে কোন কারণবশতঃ স্থাপিত ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা আসিয়া মিলিত হইল। তখন ইন্দ্রনাথ রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ! যদি আজ্ঞা পাই, আমার পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুদিগকে ক্ষণেক বাধা দিতে পারি। ততক্ষণে আপনারা স্বচ্ছন্দে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—বালক! যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে টোডরমল্ল কখনও পলায়নতৎপর হয় না। বৃথা প্রাণ নষ্ট করা যুদ্ধ নহে, নরহত্যা মাত্র।

সকলে দুর্গের নিকট উপস্থিত হইল। দুর্গের সম্মুখে পরিখা; সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া দেখিল পরিখার উপরিস্থ সেতু ভগ্ন হইয়াছে! যে নরাধম শত্রুদিগকে গোপনে সংবাদ দিয়াছিল, সেই সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল; সুতরাং অশ্বারোহীদিগের দুর্গে প্রবেশ করিবার উপায় নাই!

সকলেই সন্তরণ করিয়া পরিখা পার হইবার প্রস্তাব করিল। রাজা শত্রুর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—পার হইতে না হইতে শত্রুরা আসিয়া পড়িবে, তখন কাপুরুষের ন্যায় শত্রুকর্ত্তৃক সকলে আহত হইয়া জলমগ্ন হইবে। বীরপুরুষের কার্য্য কর, শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ দাও, এইক্ষণেই কাষ্ঠের নূতন সেতু নির্ম্মিত হউক, যতক্ষণ নির্ম্মিত না হয়, শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব। ইন্দ্রনাথ, শত্রুদিগকে যুদ্ধদান কর।

ভৃত্য সাধ্যমত কার্য্য করিবে,—বলিয়া ইন্দ্রনাথ ব্যূহনির্ম্মাণে তৎপর হইলেন। ব্যূহ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি শ্রেণীতে একশত অশ্বারোহী। প্রথম শ্রেণীর পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে তৃতীয় শ্রেণী ইত্যাদি। সুতরাং যুদ্ধের সময় প্রথম শ্রেণী পরিশ্রান্ত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণী অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহাদের পর

আবার তৃতীয় শ্রেণী সম্মুখীন হইবে, এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক শ্রেণীই এক একবার করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে। সম্মুখে শত্রুর আক্রমণ রুদ্ধ হইবে, পশ্চাতে পরিখার জল, সে দিক হইতে আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। সেই পরিখার নিকট কয়েক জন দুই চারিটী বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া সেতু বন্ধন করিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শত্রু আসিয়া পড়িল, ইন্দ্রনাথের হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল!

আজি প্রায় তিন চারি মাস পর্য্যন্ত মুঙ্গের নগর বেষ্টিত ছিল, কিন্তু অদ্য যেরূপ দুইপক্ষই ভীষণ সাহস প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, এরূপ কখনও দেখা যায় নাই। ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেই রাজা টোডরমল্ল বন্দী হইবেন, এই জ্ঞানে শত্রুরা সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বার বার ভীষণ আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যূহ ভাঙ্গিবার নহে, পর্ব্বতশিখরের ন্যায় বার বার শত্রুদলের তরঙ্গমালা দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শত্রুরা অধিক সংখ্যক বলিয়া তাহাদিগের বড় সুবিধা হইল না, কেন না, ইন্দ্রনাথ যেরূপ কৌশলে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে একেবারে একশত জনের অধিক শত্রু আসিয়া সে ব্যূহ আক্রমণ করিতে পারিল না, বরং সেই অল্প স্থানের মধ্যে দুই সহস্র সৈন্যের চলাচলের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তথাপি শত্রুরা অদ্য বার বার সিংহ-গর্জ্জন করিয়া সিংহবিক্রম প্রকাশ করিতেছিল, বীরমদে উন্মত্ত হইয়া বার বার শব্দ করিয়া সেই ব্যূহভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথের সৈন্যেরাও সাহসে হীন ছিল না। অদ্য স্বয়ং রাজা টোডরমল্লের দ্বারা চালিত হইয়া তাহাদিগের উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা ছিল না। ইন্দ্রনাথ তীরের মত ব্যূহের এপার্শ্ব হইতে ওপার্শ্বে, এদিক হইতে ওদিকে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে শত্রুরা অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল, সেই সেই স্থানে সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আজি মহারাজ স্বয়ং তোমাদের যুদ্ধ দেখিতেছেন, আজি মহারাজের রক্ষার ভার তোমাদের হস্তে, আজি দিল্লীশ্বরের নাম ও গৌরব তোমরা রক্ষা করিবে।" এইরূপ উৎসাহবচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল, ভৈরব গর্জ্জনে আকাশ ভিন্ন হইল, শত্রুর হৃদয় কম্পিত হইল।

তথাপি দুই সহস্র সৈন্যের সহিত পঞ্চশত সৈন্যের যুদ্ধ সম্ভবে না, ইন্দ্রনাথের সেনাগণ একে একে নিহত হইতে লাগিল, শত্রুদিগেরও অনেক সৈন্য হত ও আহত হইল, কিন্তু দুই সহস্রের মধ্যে এক শত কি দুই শত যুদ্ধে অক্ষম হইলে ক্ষতি নাই দেখিয়া, রাজা চিন্তিত হইলেন, একবার ইন্দ্রনাথকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন,—ইন্দ্রনাথ! তুমি আপন সৈন্যদিগকে যেরূপ রণশিক্ষা দিয়াছ, তাহাতে আমি চমৎকৃত হইলাম। কিন্তু যেরূপ সেনাগণ হত ও আহত হইতেছে, ভয় হয় রণে ভঙ্গ দিবে।

ইন্দ্রনাথের মুখ রক্তবর্ণ হইল, বলিলেন,—আমার সৈন্যগণকে সম্মুখ যুদ্ধ করিতেই শিখাইয়াছি, রণে ভঙ্গ দিতে কখনও শিখাই নাই। যতক্ষণ একজন অশ্বারোহী থাকিবে ততক্ষণ সম্মুখ যুদ্ধ হইবে।

সন্ধ্যার ছায়ায় ক্রমে ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র আবৃত করিতে লাগিল, কিন্তু সে চমৎকার ব্যূহ ভঙ্গ হইল না। একজন অশ্বারোহী হত হয়, তাহার স্থানে অপর একজন অশ্বারোহী আসিয়া দণ্ডায়মান হয়; সে হত হয়, আর একজন আসিয়া তথায় দণ্ডায়মান। শ্রেণী যত ক্ষীণ হইতে লাগিল, সৈন্যদিগের উৎসাহ ও উল্লাস যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছিলেন, পলায়ন কাহাকে বলে, তাঁহার সৈন্যেরা শিখে নাই। শত্রুগণ হতাশ হইয়া একবার বেগে শেষ আক্রমণ করিল, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিল। দুই সহস্র অশ্বারোহীর সে ভীষণ গর্জ্জন চারিদিকে একক্রোশ পর্য্যন্ত শ্রুত হইল, দুই সহস্র অশ্বের যুগপৎ পদবিক্ষেপে মেদিনী কম্পিত হইল, কিন্তু সে শব্দে ও সে পদবিক্ষেপে ইন্দ্রনাথের ব্যূহ কম্পিত হইল না। যুদ্ধ সাঙ্গ হইল, সে অপরূপ ব্যূহ ভঙ্গ হইল না।

অবশেষে সেতু নির্ম্মিত হইল। রাজা পরিখা পার হইলেন, রাজা নিরাপদে পার হইয়াছেন শুনিয়া ইন্দ্রনাথের সৈন্যগণ একেবারে সিংহ-গর্জ্জন করিল, সে গর্জ্জন শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিল। তাহারা জানিল, যে জন্য দুই সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বৃথা হইয়াছে।

আক্রমণকারিগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া নীরবে নিজ শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। যতক্ষণ রাজা টোডরমল্ল সেতু পার হইতেছিলেন, ইন্দ্রনাথ একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলেন।

যখন দেখিলেন, রাজা নিরাপদে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপন অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সহসা পড়িয়া গেলেন, আর উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহাকে উঠাইতে আসিয়া দেখিল শত্রুর বর্শাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভিন্ন হইয়াছিল, শোণিতে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইয়াছিল, বলশূন্যতাবশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

ইন্দ্রনাথের সৈন্যেরা অনেকেই সেতু পার হইয়াছিল। শত্রুগণ যাইবার সময় দেখিল, ইন্দ্রনাথ আহত হইয়াছেন। উল্লাসে চীৎকার করিয়া ইন্দ্রনাথকে ভূমি হইতে তুলিয়া শিবিরাভিমুখে চলিল। ইন্দ্রনাথ বন্দী হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : বন্দী

THE soldier's hope, the patriot's zeal,
For ever dimmed, for ever crossed,
Oh! who shall say what heroes feel,
When all but life and honor's lost.
The last sad hour of freedom's dream,
And valor's task moved slowly by.
While mute they watched till morning's beam,
Should rise and give them light to die.
There's yet a world where souls are free,
Where tyrants taint not nature's bliss,
If death that world's bright opening be
Oh! who would live a slave in this?

—*Moore.*

শত্রুরা ইন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পর পুনরায় ইন্দ্রনাথের চেতনার সঞ্চার হইল।

দেখিলেন তাঁহার চারিদিকে শত্রুসমূহ আসীন রহিয়াছে। সম্মুখে এক উচ্চ সিংহাসনে মাসুমী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে মহামান্য ওমরাহ ও অমাত্যগণ বসিয়া রহিয়াছেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে টোডরমল্লের বিদ্রোহী সেনাপতি তর্খান ও হুমায়ুনকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রনাথের পশ্চাতে জল্লাদ কুঠারহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, প্রভুর দিকে নিমেষশূন্য লোচনে চাহিয়া রহিয়াছে, আজ্ঞা বা ইঙ্গিত পাইলেই বন্দীর শিরশ্ছেদন করিবে। ইন্দ্রনাথ কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না। তীব্রদৃষ্টিতে মাসুমীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মাসুমীও ইন্দ্রনাথকে সচেতন দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—হিন্দু! তুমি বীরপুরুষ, কিন্তু বিদ্রোহাচরণ করিয়াছ, বিদ্রোহাচরণের দণ্ড শিরশ্ছেদন।

ইন্দ্রনাথ ভীষণস্বরে উত্তর করিলেন,—যোদ্ধা মৃত্যুর আশঙ্কা করে না, যাহা ইচ্ছা হয়, করুন, আমি বিদ্রোহাচরণ করি নাই।

মাসুমী ইন্দ্রনাথের উগ্রভাবে কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া বলিলেন,—টোডরমল্লের সহিত যোগ দিয়া বঙ্গদেশের জায়গীরদারদিগের সহিত যুদ্ধ করা বিদ্রোহাচরণ নহে?

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—বঙ্গদেশের অধীশ্বর, সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর আকবরশাহের জন্য আমি বিদ্রোহী জায়গীরদারদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি।

সকলেই ভাবিলেন, ইন্দ্রনাথ আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছেন, সকলেই ভাবিলেন, মাসুমী সেইক্ষণেই ইন্দ্রনাথের শিরশ্ছেদনের আদেশ দিবেন। কিন্তু মহানুভব মাসুমী, অসহায় হিন্দুর এইরূপ নির্ভীকতা দর্শনে কুপিত হইলেন না, বরং আহ্লাদিত হইলেন। ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—বীর! তোমার উগ্রতা ক্ষমা করিলাম, তোমার বীরত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইলাম,

কিন্তু তুমি বঙ্গদেশের জায়গীরদারদিগকে আর কখন বিদ্রোহী বলিও না। আমরা মোগল সন্তান, আমরা বঙ্গবিজেতা, আমাদের বাহুবলে এদেশ জয় হইয়াছে, আমরা এদেশের প্রকৃত রাজা।

ইন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—আপনারা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছেন, আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সম্রাট আকবরের প্রতাপে আপনারা সে জয়লাভ করিয়াছেন, সেই সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহাচরণ করিতেছেন। বিধির নির্ব্বন্ধের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেন শোণিতস্রোতে সুন্দর বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন?

মাসুমী। হিন্দু! তোমরা বিধির নির্ব্বন্ধের উপর প্রত্যয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাক, সাহসী মোগলেরা জীবন থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইবে না, অধীনতা স্বীকার করিবে না।

ইন্দ্রনাথ। পাঠানগণও এই কথা বলিয়াছিল, এক্ষণে পাঠান-রাজ্য কোথায়! দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে আপনারাও বৃথা যুদ্ধ করিতেছেন, বৃথা রক্তস্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন।

মাসুমী। হিন্দু! তোমার জীবন মৃত্যু আমার হস্তে, তোমার কি জীবনের অভিলাষ নাই যে, আমার সম্মুখে এইরূপ কথা কহিতেছ?

ইন্দ্রনাথ। আমার জীবনের অভিলাষ অনেক আছে, কিন্তু যখন আপনাদিগের হস্তে পড়িয়াছি, তখন আর জীবনের আশা রাখি না।

মাসুমী। কেন?

ইন্দ্রনাথ। সাহসী পুরুষ শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারেন, যাঁহারা জয় নিশ্চয় জানেন, তাঁহারা শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা নিজের জয়ে সংশয় করেন তাঁহারা শত্রুকে কখনও ক্ষমা করিতে পারেন না।

অনেকক্ষণ কথা কহিতে কহিতে ইন্দ্রনাথের হীনবল শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতেছিল, তাহাতে বক্ষঃস্থল হইতে পুনরায় শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

মাসুমী ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন,—পামর! কৌশলবাক্যের দ্বারা ক্ষমা পাইবার প্রত্যাশা করিও না।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—আমি কোন প্রত্যাশা করি না, কেবল এই প্রত্যাশা করি যে, জল্লাদ আপন কার্য্য শীঘ্রই নিষ্পন্ন করিবে।

কিন্তু জল্লাদকে সে ভীষণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইল না। ইন্দ্রনাথের ক্ষত হইতে রক্তস্রোত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ত্বরায় শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, পুনরায় চেতনাশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

মাসুমীর হৃদয় স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নহে। আহত, বলহীন, চৈতন্যহীন যোদ্ধার শিরশ্চেছদনের আজ্ঞা দিলেন না। বলিলেন,—অধুনা কারাগারে লইয়া যাও।

ইন্দ্রনাথ কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : রমণীর বীরত্ব

THE midnight passed, and to the massy door
A light step came—it paused—it moved once more.
Slow turns the grating bolt and sullen key—
'Tis as his heart foreboded—that fair she!

—*Byron.*

একটী ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কারাগারে একজন বীরপুরুষ তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কারাগারের একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া প্রাতঃকালের তরুণ রৌদ্র আসিতেছে। অন্ধকাররাশির মধ্যে সেই রৌদ্রের রেখা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ সেই রৌদ্ররেখায় খেলা করিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, একবার রৌদ্ররেখায় দেখা যাইতেছে. আবার অন্ধকাররাশিতে লীন হইতেছে। দুই একটী ক্ষুদ্র পক্ষী সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেছে, আবার ক্ষণেক পর উড়িয়া যাইতেছে, তাহারা বন্দী নহে, পক্ষবিস্তার করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতেছে, জগৎ-সংসারে ও আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে! বীরপুরুষ সেই তৃণশয্যায়

শয়ন করিয়া সেই বাতায়নের দিকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, অন্ধকারস্থিত লতাপল্লব যেরূপ বাহুবিস্তার করিয়া আলোকের দিকে ধায়, বন্দীর নয়ন সেইরূপ বাতায়নের দিকে রহিয়াছে। বন্দী কি চিন্তা করিতেছেন? রৌদ্ররেখায় পতঙ্গসমূহের খেলা দেখিতেছেন? বাতায়নাগত পক্ষিগণ যখন পুনরায় পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, বন্দীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানসপক্ষ বিস্তার করিয়া সুন্দর জগৎসংসার ও অনন্ত নীল আকাশে পর্য্যটন করিতেছেন?

ইন্দ্রনাথ এ সকল চিন্তা করিতেছেন না। তাঁহার হৃদয়ে অন্য চিন্তার উদ্রেক হইতেছে। ইন্দ্রনাথ যোদ্ধা, যোদ্ধার মৃত্যুতে ভয় নাই। কিন্তু তিনি মরিলে অন্যের কি ক্লেশ হইবে, সেই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ এই বার্দ্ধক্যে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিলে জীবন ত্যাগ করিবেন। নগেন্দ্রনাথের আর কেহই নাই; ভার্য্যা নাই, কন্যা নাই, অন্য পুত্র নাই, বৃদ্ধ একমাত্র পুত্রের উপর চাহিয়া জীবনধারণ করিতেছে, সেই পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলে নগেন্দ্রনাথের গৃহ শূন্য হইবে, বৃদ্ধ প্রাণত্যাগ করিবেন।

আর সেই অজ্ঞান বালিকা, সেই প্রেমবিহ্বলা সরলা, সেই সহায়হীনা, সম্পত্তিহীনা, কুটীরবাসিনী সরলা, তাহারই বা কি দশা ঘটিবে? ইন্দ্রনাথ সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে যাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে সপ্তম পূর্ণিমা অতীত হইবে, বালিকা আশানেত্রে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে নয়ন মুদ্রিত করিবে, জীবন অভাবে অপরিস্ফুট পুষ্পের ন্যায় নীরবে অসময়ে শুকাইবে। চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রনাথের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, নয়ন দৃষ্টিশূন্য হইল, বলিলেন,—ভগবান! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, বিধির নির্ব্বন্ধে যাহা আছে হউক, আমি আর এ চিন্তাযাতনা সহ্য করিতে পারি না।

শত্রুদিগের মধ্যে ইন্দ্রনাথকে পীড়ার সময় যত্ন করে এরূপ কেহই ছিল না। কারাগারের পার্শ্বে প্রহরিগণ নিঃশব্দে খড়্গহস্তে দিবারাত্রি দণ্ডায়মান থাকিত। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একজন ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিত, আহার সাঙ্গ হইলে একমাত্র দাসী নিঃশব্দে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া যাইত। ইহা ভিন্ন আর কেহই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। শত্রুশিবিরের মধ্যে ইন্দ্রনাথের কেবল একমাত্র বন্ধু ছিল। যে দাসী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই কারাগৃহ পরিষ্কার করিতে আসিত, সেই ইন্দ্রনাথের দুঃখে যথার্থ দুঃখিনী। প্রত্যহ নীরবে আসিয়া নীরবে প্রস্থান করিত বটে, কিন্তু সেই বীরের দুঃখ দেখিয়া অন্তরালে অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিত। নির্দ্দয় শত্রুগণ বন্দীকে অতিশয় কষ্টে রাখিত, শয়নের জন্য ভূমিতে কেবলমাত্র তৃণশয্যা রচনা করিত,—দাসী ইন্দ্রনাথের জন্য আপন বস্ত্র দ্বারা সেই তৃণশয্যা মণ্ডিত করিয়া যাইত। শত্রুরা ইন্দ্রনাথকে দিনের মধ্যে কেবল একবার মাত্র অপকৃষ্ট আহার দিত,—দাসী আপনি অনাহারে থাকিয়া ইন্দ্রনাথকে নানাপ্রকার সুপথ্য আনিয়া দিত। শত্রুগণ ইন্দ্রনাথের চিকিৎসা করাইত না,—দাসী তাঁহার ক্ষতগুলি জলে ধৌত করিয়া পুনরায় পরিষ্কার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিত এবং ঔষধি আনিয়া দিত। সেই করুণা-জল-সেচনে ইন্দ্রনাথের ক্ষত আরাম হইতে লাগিল, তিনি দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রনাথ প্রায় আপন চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি সময়ে সময়ে দাসীর যত্ন ও মমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। কারাগৃহের অন্ধকারে দাসীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন না, কোন কথা কহিতে চাহিলে দাসী ধীরে ধীরে প্রহরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত। ইন্দ্রনাথ আবার নিস্তব্ধ হইয়া আপন চিন্তায় অভিভূতই হইতেন।

প্রহরিগণ দাসীর এই স্বাভাবিক মমতা দেখিয়া কখন কখন উপহাস করিয়া বলিত,—এ বিবি, এ হিন্দু কি তোমাকে সাদী করিবে? এরূপ উপহাসে দাসী বিরক্ত হইত না, কখন কখন অতি নম্র ভাবে উত্তর দিত, কখন কখন প্রহরীদিগকে সুরাপান করিতে দিত, সুতরাং সকল প্রহরীই দাসীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান হইয়া চৌকি দিবার সময়ই সেই নব প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সুন্দরী দাসীর কথা ভাবিত, নিদ্রার সময়ে সাকী ও সুরা-পেয়ালার স্বপ্ন দেখিত।

অদ্য রজনীতে দাসী রক্ষকদ্বয়কে সুরাপান করিতে দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল, দাসী সুরা লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া প্রহরিদ্বয়ের মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। ক্রমে সুরা মস্তকে উঠিতে লাগিল, রজনী দ্বিপ্রহরের মধ্যে প্রহরিদ্বয় অজ্ঞান

অবস্থায় শয়ন করিয়া সুরাপেয়ালা ও সাকীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দাসী কারাগারে প্রবেশ করিল।

ঘরের ভিতর তৃণশয্যায় বীরপুরুষ নিদ্রিত রহিয়াছেন। ইন্দ্রনাথের ললাট পরিষ্কার, ওষ্ঠে হাসির চিহ্ন,—এ দুঃখসাগরে তিনি কি সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন? দেখিতেছেন, যেন আজি পূর্ণিমা, যেন অদ্য তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পুনরায় রুদ্রপুরে গিয়াছেন, যেন বহুদিন পরে হৃদয়ের সরলাকে পাইয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, যেন সরলার আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতেছে। সহসা ইন্দ্রনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চমকিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার তৃণশয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একজন নারী যথার্থই রোদন করিতেছে, কারাগৃহের সেই দাসী নীরবে দরবিগলিত ধারা বিসর্জ্জন করিতেছে!

ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। দাসীর মায়া ও মমতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, আপনি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—হতভাগার দুঃখে তুমি কিজন্য দুঃখিনী? আমার আর জীবনের আশা নাই, পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন।

দাসী উত্তর করিল না, নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ আবার বলিলেন,—এ অসময়ে তুমি আমার প্রতি যে মমতা প্রকাশ করিলে জগদীশ্বর তজ্জন্য তোমাকে সুখে রাখিবেন। আমি তোমাকে কিছু দিয়া পুরস্কৃত করি এরূপ আমার কিছু নাই, আমি বন্দী। এই সুবর্ণের অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ কর, আমার বিপদ ও পীড়ার সময় যেরূপ শুশ্রূষা করিলে, মুসলমানদিগের হস্তে আমার মৃত্যু হইলে পরে এই অঙ্গুরীয়টী দেখিয়া এক একবার আমার কথা স্মরণ করিও।

দাসী অনেকক্ষণ কোনও উত্তর করিল না, অনেকক্ষণ অধোবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে নীরবে হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করিল, নীরবে সেটী আপনার কণ্ঠমালায় বাঁধিয়া রাখিল। কতক্ষণ পরে চক্ষুজল মোচন করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,—সৈনিকবর! আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, তাহারই চিহ্ন স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করিলাম, তাহারই স্মরণার্থ এটী আজীবন ধারণ করিব। সেনাপতি ইন্দ্রনাথ বোধ হয় দাসীকে বিস্মৃত হইয়াছেন।

সে কোকিলবিনিন্দিত স্বরে ইন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন, শয্যায় একেবারে উঠিয়া বসিলেন! বনগ্রামের মহেশ্বর-মন্দিরে সে স্বর একবার শুনিয়াছিলেন, গঙ্গাবক্ষের উপর নৌকামধ্যে সে স্বর আর একবার শুনিয়াছিলেন! গঙ্গায় জলমগ্ন হইবার সময় যে নারী ইন্দ্রনাথকে একবার উদ্ধার করিয়াছিলেন, অদ্য সেই নারী, সেই বিমলা, দাসীবেশ ধারণ করিয়া শত্রু-শিবির হইতে ইন্দ্রনাথের উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন!

চিন্তা তরঙ্গমালার ন্যায় ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে উথলিত হইতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইল, নয়ন দুটী জলে পূর্ণ হইল। শেষে বিমলার হস্ত দুটী ধরিয়া করুণস্বরে বলিলেন,—মানবী কি দেবী! আপনি কে আমি জানি না, কিন্তু বিপদকালে আপনি আমার চির সহায়। এই বিপদপূর্ণ শত্রুশিবিরে আপনি আমার উদ্ধারার্থ একাকিনী আসিয়াছেন? আপনাকে দাসী বলিয়া কথা কহিয়াছি? আমার জীবনদান করিয়াছেন তজ্জন্য তুচ্ছ অর্থ পুরস্কার দিতে চাহিয়াছি? এসকল অপরাধ কি আপনি মার্জ্জনা করিবেন?

ইন্দ্রনাথের কথাগুলি যেন বিমলার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল, ইন্দ্রনাথের হস্ত-সংস্পর্শে বিমলার শরীর কাঁপিতে লাগিল, গাত্র কণ্টকিত হইল! কিন্তু বিমলা প্রত্যুৎপন্নমতি; যত্নে আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত সরাইয়া লইলেন ও ধীরস্বরে উত্তর করিলেন,—সৈনিকবর, আপনার অপরাধ নাই, আমি দাসী বেশে আসিয়াছি, আপনি আমাকে দাসী বিবেচনায় যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি যে পুরস্কার দিয়াছেন তাহা আমি আজীবন হৃদয়ে ধারণ করিব, আজি যে আমার প্রতি একটু স্নেহ প্রকাশ করিলেন, আজীবন তাহা স্মরণ রাখিব। কিন্তু এক্ষণে এ সমস্ত কথা কহিবার অবসর নাই, এক্ষণে অন্য কথা বলিতে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি আপনার উদ্ধারের উপায় সঙ্কল্প করিয়াছি, কারাগৃহের প্রহরিদ্বয় চৈতন্যশূন্য হইয়াছে, আপনি এই রমণীর বেশ ধারণ করিয়া চলিয়া যাউন। কারাগৃহের বাহিরে সৈনিকগণ যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, বলিবেন,—আমি ভিকারিণী দাসী।

ইন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, বিমলার সাহস ও স্থিরসঙ্কল্প দেখিয়া বিস্মিত

হইলেন। কিন্তু ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন,—দেবি! ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছুক নহি। আপনি এইরূপে আমার উদ্ধার করিয়াছেন জানিলে নৃশংস শত্রুগণ আপনাকে প্রাণে বধ করিবে।

বিমলা বলিলেন,—আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমার উদ্ধারের উপায় আছে, উদ্ধার না হইলেও অধিক ক্ষতি নাই। আমার জন্য চিন্তা করিবে, আমার জন্য শোক করিবে, জগতে এরূপ অধিক লোক নাই। অনন্ত সাগরের মধ্যে একটী জলবিম্ব যেরূপ লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই জগৎসংসারে একজন হতভাগিনীর মৃত্যু অশ্রুত, অলক্ষিত থাকিবে। আপনি যশস্বী, ক্ষমতাশালী, বীরপুরুষ, আপনি সুখে থাকিলে অনেকে সুখে থাকিবে।

ইন্দ্রনাথ বিমলার প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধীরভাবে বলিলেন,—দেবি! আপনি আমার উদ্ধারে যত্নবতী হইয়াছেন, তাহার জন্য আমি আজন্মকাল আপনার নিকট বাধিত রহিলাম; কিন্তু আপনাকে এই স্থানে রাখিয়া আমি কারাগার ত্যাগ করিব না, উপরোধ করিবেন না।

এবার বিমলা পরাস্ত হইলেন। অনেক অনুরোধ করিলেন, অনেক কারণ দর্শাইতে লাগিলেন, কিছুতেই বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রনাথের একই উত্তর,—যিনি আমাকে একবার প্রাণদান করিয়াছেন, পুনরায় আমার উদ্ধারের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া আমি উদ্ধার প্রার্থনা করি না, এরূপ উদ্ধারে, এরূপ জীবনে আমার কাজ নাই।

অবশেষে বিমলা অতি কষ্টে বলিলেন,—বীরপুরুষ! আপনি বোধ হয় জানেন না যে, আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী সরলা আজি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে আবদ্ধ রহিয়াছেন। আপনি যদি শীঘ্র তাঁহার উদ্ধার না করেন, পামর শকুনি নিজের একজন ভৃত্যের সহিত সরলার বিবাহ দিবে স্থির করিয়াছে!

ইন্দ্রনাথ সহসা বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ললাট হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। বিমলা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন, ইন্দ্রনাথ নীরবে শুনিলেন, নীরবে হস্তের উপর ললাট ন্যস্ত করিয়া অধোবদনে রহিলেন। মস্তকে শিরা স্ফীত হইতেছিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পর ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন,—ভদ্রে! আপনার কথাই থাকিবে, আমি পলায়ন করিব, কিন্তু একটী প্রতিজ্ঞা করুন।

বিমলা। কি প্রতিজ্ঞা?

ইন্দ্রনাথ। যদি কল্য আপনার উদ্ধারের উপায় না হয়, যদি নৃশংস শত্রুরা আপনার বধের আজ্ঞা দেয়, অঙ্গীকার করুন মাসুমীর নিকট তিন দিবসের সময় প্রার্থনা করিবেন! আমি মাসুমীকে বিলক্ষণ জানি, অবলার এ যাচ্ঞায় কখনই অস্বীকৃত হইবেন না। তিন দিনের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে।

বিমলা তাহাই প্রতিশ্রুত হইলেন।

তখন বিমলা ইন্দ্রনাথকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া দিলেন। ইন্দ্রনাথ আপনার নূতন রূপ দেখিয়া হাসিলেন। আবার বিমলার দিকে চাহিলেন, উদ্বেগের সহিত বিমলার হস্ত দুইটী আপনার দুই হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন,—

ভদ্রে! দুইবার আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিলেন, জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমি আপনার এ ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিব। এই কথা কহিতে কহিতে ইন্দ্রনাথের উষ্ণ নিশ্বাস বিমলার বাহুলতার উপর পড়িল, ইন্দ্রনাথের ওষ্ঠদ্বয় বিমলার করপল্লব স্পর্শ করিল। বাতাহত পত্রের ন্যায় বিমলার গাত্র কাঁপিতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ইন্দ্রনাথ অদৃশ্য হইলেন, বিমলা ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া সেই অন্ধকারময় কুটীরে বসিয়া পড়িলেন। নৈশ জগৎ দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিমলার নারী-হৃদয়ও দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পুরুষের বীরত্ব

HEARD ye the din of battle bray,
Lance to lance and horse to horse.
—*Grey.*

ইন্দ্রনাথকে সহসা শিবিরে দেখিয়া তাঁহার অধীনস্থ সেনাদিগের বিস্ময় ও আহ্লাদের সীমা ছিল না। কিন্তু ইন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার অধীনস্থ অশ্বারোহিগণ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হও, এইক্ষণেই নিঃশব্দে শত্রুশিবির আক্রমণ করিব।

সৈন্যেরা বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ এই অবসরে ভগবানের নাম লইলেন। দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! অদ্যকার মত অসমসাহসী কার্য্যে আমি কখনও লিপ্ত হই নাই, অদ্য প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিজয়লাভ করিতে দিন, আমার উপকারিণীর উদ্ধার সাধন করিয়া যদি প্রাণে হত হই, ক্ষতি নাই।

রজনী তিন প্রহর অতীত হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, চারিদিকে গভীর অন্ধকার। আকাশে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, আবার মেঘরাশিতে আবৃত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে পেচকের ভীষণ শব্দ শুনা যাইতেছে, নিকটস্থ গঙ্গার ভীম কল্লোল শ্রুতিগোচর হইতেছে। সে গভীর অন্ধকারে ইন্দ্রনাথের সেনা নিঃশব্দে শত্রুশিবিরাভিমুখে চলিল।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে দূর হইতে একটা আলোক দৃষ্টিগোচর হইল, সে আলোক একবার দেখা যায়, অন্যবার নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন, একজন দূতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। দূত নিঃশব্দে যাইয়া নিঃশব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, বলিল, শত্রুপক্ষের চারিজন শিবিররক্ষক ঐ স্থানে পাহারা দিতেছে। ইন্দ্রনাথ দশ জন তীরন্দাজকে অগ্রে যাইতে বলিলেন ও আদেশ করিলেন,—যদি ঐ চারিজনের মধ্যে একজন পলাইয়া যাইয়া শিবিরে সংবাদ দেয়, তবে তোমাদের দশ জনের প্রাণ সংহার করিব! তীরন্দাজগণ ধীরে ধীরে যাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চারি জনকেই ভূতলশায়ী করিল। ইন্দ্রনাথের সেনা অগ্রসর হইতে লাগিল।

আরও দুই তিন স্থানে ঐরূপ পাহারা ছিল, রক্ষকগণ ঐরূপে নিহত হইল। অচিরে ইন্দ্রনাথ শত্রুদিগের পরিখার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সেনাদিগকে পরিখা পার হইতে আদেশ দিলেন।

পরিখার অপর পার্শ্বের মুসলমানগণ সহসা শত্রুর আগমন দেখিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা সজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রনাথ সসৈন্যে পরিখা পার হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রনাথ তখন সৈন্যগণকে সেই পরিখা রক্ষা করিবার জন্য রাখিয়া কেবল পঞ্চাশ জন মাত্র সঙ্গে লইয়া উর্দ্ধ্বশ্বাসে কারাগারের দিকে যাইলেন।

কারাগৃহের বাহিরে সৈনিকগণ দ্বার রক্ষা করিতেছে। ইন্দ্রনাথ এখনও কারাগৃহে বদ্ধ আছে, তাহারা এইরূপ বিবেচনা করিতেছিল; সহসা ইন্দ্রনাথের বজ্রনাদ শুনিয়া, এবং ইন্দ্রনাথ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বেগে পলায়ন করিল। ঘরের নিকটে যাইয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাঁহার ঘরের রক্ষকদ্বয় এখনও সুরায় অচেতন, নিকটে একটী দীপ জ্বলিতেছে। ইন্দ্রনাথ দীপটী হাতে লইয়া ঘরের ভিতর যাইলেন, দেখিলেন সেই অন্ধকারময় কারাগৃহের তৃণশয্যায় বিমলার শ্রান্ত শীর্ণ দেহলতা পড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষু মুদিত, নিশ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষঃস্থল ধীরে ধীরে স্ফীত হইতেছে।

ইন্দ্রনাথ এক মুহূর্তকাল সজল নয়নে ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ক্ষীণ দেহলতা তৃণশয্যা হইতে উঠাইয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্ষণেক পর বিমলার যেন চেতনা হইল, ইন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন,—সেনাপতি ইন্দ্রনাথ আমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন? ভগবান আপনার উপকার করিবেন। আমি মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলাম, কেবল মৃত্যুর সময় পিতাকে দেখিলাম না, এই জন্য মনে বড় ক্লেশ হইতেছিল। সেনাপতি আমার উদ্ধার সাধন করুন, আমি পিতাকে আর একবার দেখিব।

এ কাতর স্বর শুনিয়া ইন্দ্রনাথের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, কিন্তু উত্তর দিবার অবসর ছিল না। ইন্দ্রনাথ অশ্বারোহণ করিলেন, এবং শিশুকে যেরূপে উঠাইয়া লয়, বিমলার ক্ষীণ শরীর আপনার পশ্চাতে উঠাইয়া লইলেন। বিমলা না পড়িয়া যান এই জন্য একটা পেটী দিয়া বিমলার শরীর ইন্দ্রনাথের শরীরের সহিত বদ্ধ করা হইল।

যেখানে ইন্দ্রনাথের অশ্বারোহিগণ পরিখা রক্ষা করিতেছিল, বিদ্যুৎ গতিতে ইন্দ্রনাথ সেইখানে যাইলেন। চারিদিকে কৃষ্ণমেঘের ন্যায় প্রায় তিন চারি সহস্র শত্রুসৈন্য সজ্জিত হইয়া আসিতেছে। ইন্দ্রনাথ দ্রুতবেগে সসৈন্যে পরিখা পার হইয়া দ্রুতবেগে দুর্গাভিমুখে চলিলেন, শত্রুসেনা নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা মুঙ্গেরে পঁহুছিলেন।

সমস্ত শিবির জয় জয় রবে পরিপূরিত হইল। ইন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইয়াছেন, হইয়াই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার পঞ্চশত অশ্বারোহীর সহিত শত্রুদিগের পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন, এরূপ সংবাদ পাইয়া মোগলসৈন্যগণ উল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইল। টোডরমল্ল স্নেহসহকারে ইন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিলেন, তিনি কিরূপে উদ্ধার পাইলেন জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অবসর রহিল না।

কয়েকজন অশ্বারোহী ভিন্ন বিমলার কথা কেহ জানিল না। বিমলা সেই রজনীযোগেই পিত্রালয়ে যাইলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পাপের প্রায়শ্চিত্ত

OUT! Out! Brief candle!

—*Shakespeare.*

উপরি উক্ত ঘটনার দুই তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রাজা টোডরমল্ল ও ইন্দ্রনাথ দুই জন দুর্গের প্রাচীরোপরি পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতেছিল।

রাজা। ইন্দ্রনাথ! যুদ্ধে কেবল সাহস আবশ্যক করে না, রণকৌশলও আবশ্যক।

ইন্দ্রনাথ। কিন্তু আপনি কি বোধ করেন, যদি আমরা দুর্গ ছাড়িয়া সম্মুখরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা পরাস্ত হইব?

রাজা। যুদ্ধ করিলে পরাস্ত হইব না, কিন্তু কয়জন যুদ্ধ করিবে?

ইন্দ্রনাথ। মহারাজ! তবে আমরা কয়দিন এই অবস্থায় দুর্গের ভিতর থাকিব?

রাজা। আর অধিক দিন নহে। ঐ যে একখানি শিবিকা আসিতেছে, উহার আরোহী আমাদিগকে এইক্ষণেই সংবাদ দিবেন যে, আর অল্প দিনের মধ্যে শত্রুর বিনাশ হইবে, আমাদের বিনাযুদ্ধে জয় হইবে।

ইন্দ্রনাথ। মহারাজ! আপনার যুদ্ধকৌশল জগৎবিখ্যাত। কিন্তু আপনি ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন, তাহা আমি জানিতাম না।

সেই শিবিকা নিকটে আসিলে তাহার ভিতর হইতে দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র অবতরণ করিলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন।

সতীশচন্দ্রের সহিত রাজা টোডরমল্লের যে যে কথা হইল, তাহা বিস্তারিত বিবরণ করিবার আবশ্যক নাই। সতীশচন্দ্র রাজা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান হিন্দু জমীদারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র কার্য্যদক্ষ, বাকপটু ও বুদ্ধিমান। সেই সকল জমীদারের নিকট নানারূপ কারণ দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে একে একে শত্রুপক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাটপক্ষ অবলম্বন করিতে লওয়াইয়াছিলেন। আকবরশাহ পরম বন্ধু; হিন্দুদিগের উপর অন্যায় করসমূহ উঠাইয়া দিয়াছেন; হিন্দুদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন; হিন্দুরমণী বিবাহ করিয়াছেন; হিন্দুদিগের আচারব্যবহার কোন কোন অংশে অবলম্বন করিয়াছেন; বঙ্গদেশে হিন্দুসেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন; বিজয়লক্ষ্মী স্বয়ং সে সেনাপতির ছায়াস্বরূপ; তিনি দুইবার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং এবারেও জয় করিবেন; জয় করিলে বিদ্রোহী জায়গীরদারদিগকে শাস্তি দিবেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সহায়তা করিলে সে ক্ষত্রিয় মহাত্মা কখন সে ঋণ বিস্মৃত

হইবেন না;—ইত্যাদি নানারূপ প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া, সতীশচন্দ্র অনেক জমীদারকে সম্রাটপক্ষাবলম্বী করিয়াছেন। সেই জমীদারগণ এক্ষণে শত্রুসৈন্যদিগকে খাদ্যদ্রব্য পাঠাইবেন না স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং আর পাঁচ সাতদিনের মধ্যে শত্রুগণ আহার অভাবে রণে ভঙ্গ দিয়া ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া দিগ্বিদিক চলিয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা সতীশচন্দ্রকে বহু সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন, ইন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—ইন্দ্রনাথ, আমার কথা সত্য কি না?

ইন্দ্র। মহাশয়! আপনি যুদ্ধে যেরূপ অজেয়, কৌশলে সেরূপ অতুল্য। কিন্তু—

রাজা। কিন্তু কি?

ইন্দ্র। আমি কাহারও বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু সতীশচন্দ্রের সমস্ত কথা আপনি কি বিশ্বাস করেন?

রাজা। তরুণ সেনাপতি কি টোডরমল্লকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে চাহেন? কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, কাহাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা ইন্দ্রনাথ কি আমা অপেক্ষা ভাল জানেন?

ইন্দ্র। মহারাজ! আমার অপরাধ লইবেন না, কিন্তু হইতে পারে এই সতীশচন্দ্রের সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, আমি তাহা অপেক্ষা অধিক জানি।

রাজা। হইতে পারে ইন্দ্রনাথ যতদূর জানেন, আমিও ততদূর জানি; হইতে পারে ইন্দ্রনাথের মনে এইক্ষণে কি চিন্তা হইতেছে তাহাও আমি জানি।

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে অবাক হইয়া রাজার দিকে চাহিয়া রহিলেন; রাজা পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—এই সতীশচন্দ্র রাজা সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছে, ইন্দ্রনাথ তাহাই চিন্তা করিতেছেন।

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় হইলেন, বলিলেন,—মহারাজ! ক্ষমা করুন। আপনি অন্তর্য্যামী।

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—ইন্দ্রনাথ! কেবল ভগবানই অন্তর্য্যামী; কিন্তু দিল্লীশ্বরের সেনাপতি চারিদিকের সন্ধান না রাখিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। যুদ্ধকার্য্যে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় যুদ্ধকৌশল কিছু শিখিয়াছি।

ইন্দ্রনাথ ক্ষণেক মৌনভাবে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! তবে রাজা সমরসিংহের হত্যাকথা আপনি অবগত আছেন।

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—সে হত্যাকথা আমি জানি, এবং যথাকালে সে হত্যার বিচার করিব। আমার পুত্রকে হত্যা করিলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি না।

সেইদিন রাত্রি একপ্রহরের সময়ে সতীশচন্দ্র গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছেন। আজি তিনি রাজার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় উল্লাসে পরিপূরিত হইয়াছে, মায়াবিনী আশা তাঁহার কাণে কাণে বলিতেছে, "তুমি একদিন পাপের দণ্ডের ভয় করিয়াছিলে, সে পাপ কে জানিতে পারিয়াছে? দণ্ড কোথায়? এখন দিন দিন তোমার সম্মানবৃদ্ধি হউক, পদবৃদ্ধি হউক।" সূর্য্য অস্তে যাইবার সময় অবধি কুহকিনী আশা তাঁহার কাণে কাণে এই প্রকারে বলিতেছিল, সেই সূর্য্য পুনরায় উদয় হইবার অগ্রে সতীশচন্দ্র বুঝিলেন, আশা মায়াবিনী, কুহকিনী, মিথ্যাবাদিনী।

সহসা চন্দ্রালোকে সতীশচন্দ্র একজন দস্যুকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই দস্যু ছুরিকাহস্তে সতীশচন্দ্রের দিকে দৌড়াইয়া আসিল। সতীশচন্দ্র পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা, সেই হত্যাকারী ছুরিকাহস্তে সতীশচন্দ্রকে আঘাত করিল। সতীশচন্দ্রের ভৃত্যগণ তখন দৌড়াইয়া আসিয়া খড়্গ দ্বারা দস্যুকে ভূতলশায়ী করিল।

মৃতপ্রায় দস্যু বলিল,—সতীশচন্দ্র আপনার মৃত্যু সন্নিকট।

সতীশচন্দ্র। নরাধম! ভগবান আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তোর আঘাতে সামান্য মাত্র রক্ত পড়িয়াছে।

দস্যু। সেই সামান্য আঘাতে আপনার প্রাণনাশ হইবে, আমার ছুরিকা বিষাক্ত। প্রভু! আপনি আমাকে কি জানেন না?

সতীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আপনার পুরাতন ভৃত্যকে চিনিলেন, বলিলেন,—নরাধম! তোকে কে এরূপ প্রভুভক্তি শিখাইয়াছিল?

ভৃত্য অতি ক্ষীণ ও স্খলিতস্বরে উত্তর করিল,—পাপিষ্ঠ শকুনি।

সতীশচন্দ্র তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,—আমিও ভাবিয়াছিলাম সেই পামরেরই এই কার্য্য। পৃথিবীতে তাহার মত ভীষণ পাপী আর নাই। কিন্তু তুই আমার পুরাতন ভৃত্য হইয়া তুই আমার বধের সঙ্কল্প করিয়াছিলি?

ভৃত্য আরও ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল,—শ—শ—শকুনি অনেক লোভ দেখাইয়াছিল, লোভে পড়িলে জ্ঞান থাকে না, লোভে পড়িয়া পাপ করিলাম, প্রাণ হারাইলাম।

আর কথা বাহির হইল না; শরীর হইতে প্রাণ বহির্গত হইল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে স্থির হইল, নয়ন দুইটী আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রালোকে মৃতদেহের দিকে চাহিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন,—ভৃত্য, তোর অপেক্ষা জ্ঞানী লোকও লোভে পড়িয়া জ্ঞান হারাইয়াছে, তোর অপেক্ষা ভীষণ পাপ করিয়াছে, তোর মত প্রাণ হারাইবারও বিলম্ব নাই। পরমেশ্বর তোকে ক্ষমা করুন, আমার পাপের ক্ষমা নাই।

প্রাতঃকালে রাজার নিকট সংবাদ আসিল, দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সতীশচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন, ইন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তথায় যাইয়া দেখিলেন, সতীশচন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, চারিদিকে চিকিৎসক বসিয়া রহিয়াছে, কিন্তু যে ভীষণ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে পরিত্রাণ নাই। রাজা এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্শ্বস্থ অনুচরগণ সবিশেষ অবগত করাইল। তখন সতীশচন্দ্র অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! আমি পাপী, পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন।

রাজা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন,—আমি ভীষণ দোষ করিয়াছি, সে অপরাধ ক্ষমা করুন।

রাজা তথাপি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন,—মহারাজ! আমি নরহত্যাকারী; কিন্তু সকল অপরাধেরই ক্ষমা আছে; আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নরহত্যাকারী; মৃত্যুশয্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। সে কাতরস্বর শ্রবণ করিয়া রাজা আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে আমি কখনও ক্ষমা করিব ভাবি নাই। কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে শাস্তি দিয়াছেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার জীবিত থাকিবার আর অধিক কাল নাই, ভগবানের নাম গ্রহণ কর, তিনি দয়ার সাগর, মৃত্যুকালে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে জীবনের পাপ খণ্ডন হয়।

চকিত হইয়া সতীশচন্দ্র আবার রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! তবে আপনি সমরসিংহের মৃত্যুর কারণ সবিশেষ অবগত আছেন?

রাজা উত্তর করিলেন,—আছি।

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর আবার বলিলেন,—মহারাজ! আমার একটী নিবেদন আছে। আমি পাপী বটে, কিন্তু জন্মাবধি পাপী ছিলাম না, যৌবনে আমার জীবন পবিত্র ছিল, উচ্চ মতি, উচ্চ আশা, উচ্চ প্রবৃত্তি ছিল। লোভে, মহালোভে পড়িয়া সে সকল হারাইয়াছি, জীবন পাপে কলুষিত হইল, আজি প্রাণ হারাইলাম,—

সতীশচন্দ্রের ক্ষীণস্বর অধিকতর ক্ষীণ হইয়া আসিল, আর কথা নিঃসৃত হইল না। রাজা সস্নেহে ওষ্ঠে দুগ্ধ দিলেন, রসশূন্য ওষ্ঠ পুনরায় সিক্ত হইল। সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—আমি পাপী বটে, কিন্তু আমার অপেক্ষাও ঘোরতর পাপী আছে। মহারাজ! আমার ভৃত্য শকুনিই যথার্থ সমরসিংহকে বধ করিয়াছে, সেই অদ্য আমাকে বধ করিল, আপনি তাহার বিচার করিবেন।

ক্রোধে রাজা টোডরমল্লের নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—চিন্তা নাই, জগদীশ্বর পাপীর দণ্ড দিবেন।

আবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে নীরব হইয়া রহিল। সতীশচন্দ্রের আয়ু নিঃশেষিত

হইয়া আসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র অধিকতর ক্ষীণ ও কাতরস্বরে বলিলেন,—কন্যা, আমার স্নেহের বিমলা,—সহসা বাকরোধ হইল।

রাজা পুনরায় অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠে দুগ্ধ দান করিলেন। ক্ষণেক পর আবার বলিতে লাগিলেন,—হতভাগিনী বিমলা, তোমার মাতা নাই, তুমি আজি পিতৃহীন হইলে!—এই কথা বলিতে বলিতে পার্শ্বের গৃহ হইতে হৃদয়বিদারক রমণীকণ্ঠজাত ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল, সে ধ্বনি শুনিয়া সতীশচন্দ্রের স্পন্দহীন নয়নদ্বয় জলে পরিপূর্ণ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে বিমলা বেগে পিতার নিকটে আসিলেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু সে সময়ে সে জ্ঞান কোন্ রমণীর থাকে?

ইন্দ্রনাথ পূর্ব্বপরিচিত রমণীকে সতীশচন্দ্রের কন্যা বিমলা বলিয়া জানিয়া বিস্মিত হইলেন!

বিমলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। বোধ হইল যেন সেই পবিত্র আলিঙ্গনে সতীশচন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগশূন্য হইল, মুখমণ্ডল শান্তভাব ধারণ করিল, নয়ন দুইটী চিরনিদ্রায় মুদ্রিত হইল।

তখন বিমলা বার বার সেই মৃতদেহকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আজ বিমলার নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইল, আজি চারিদিক অন্ধকার হইল, আজি হৃদয় বিদীর্ণ হইল, আজি জগৎ শূন্য হইল।

সে দর্শন দৃষ্টি করিয়া রাজা নয়নদ্বয় আবরণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ইন্দ্রনাথ খড়্গের উপর ভর দিয়া বালিকার ন্যায় অবারিত নয়নধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে প্রত্যাগমন

> IF after every tempest come such calms,
> May the winds blow till they have wakened death.
>
> —*Shakespeare.*

আজি পূর্ণিমা তিথি, কিন্তু আকাশ দেখিলে কে বলিবে আজি পূর্ণিমা? গভীর ধূম্রবর্ণ মেঘরাশিতে আকাশ অদ্য আচ্ছন্ন রহিয়াছে, জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-লতার ভীষণ আলোকে সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য উদ্দীপ্ত হইতেছে, আবার পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকার হইতেছে। মুষলধারা বৃষ্টিতে ক্ষেত্র, গ্রাম, পথ, ঘাট সকল ভাসিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন সেই বৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে। বায়ু রহিয়া রহিয়া অতিশয় শব্দ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, সেই বায়ুশব্দের মধ্যে মধ্যে মেঘের অনেকক্ষণস্থায়ী গর্জ্জন জগৎ-সংসার গ্রস্ত ও কম্পিত করিতেছিল।

এরূপ ভয়ঙ্কর বাত্যায় সরলা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্যস্থ একটী জনশূন্য কুটীরাভ্যন্তরে একাকী বসিয়া আছে, কি জন্য? বালিকার হৃদয়ে কি ভয় নাই, এই অন্ধকারে এই ভয়াবহ মেঘগর্জ্জনে বালিকার হৃদয়ে কি শঙ্কা হইতেছে না?

না, অদ্য সরলার চিত্তে আর ভয় নাই, অদ্য সরলা কাহাকেও ভয় করে না। সুখের আশা, জীবনের আশা অদ্য শেষ হইয়াছিল, যাহার আশা নাই, তাহার ভয় কিসের? আকাশে যে ভীষণ বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে নয়ন ঝলসিতেছিল, সরলা স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিতেছিল। তাহার পর যে ভয়ানক মেঘগর্জ্জন হইতেছিল, সরলা স্থিরচিত্তে তাহাও শ্রবণ করিতেছিল। আজি ছয় মাস হইল ইন্দ্রনাথ পশ্চিমে গিয়াছেন, তিনি সরলাকে ভুলিয়াছেন, পামর শকুনি সরলার অন্য বিবাহ স্থির করিয়াছে!

একবার বাল্যাবস্থার কথা মনে আসিল। মহামান্য সমরসিংহের একমাত্র দুহিতা এই বিস্তীর্ণ উদ্যানে বেড়াইত, পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া শাখা হইতে ফুল পাড়িত, মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া এক দিন একটা পাখী ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাখী উড়িয়া গেল, নির্ব্বোধ শিশু কাঁদিল, নির্ব্বোধ শিশু জানিত না যে, জীবনের আশা ভরসা সকলই সেই পাখীর মত একে একে উড়িয়া যায়!

তাহার পর ছয় বৎসর কাল রুদ্রপুরে অতিবাহিত হইয়াছে। দরিদ্র পল্লীগ্রামে দরিদ্র কুটীরে সেই ছয় বৎসর কাটিয়াছে, কিন্তু ধন হইলেই সুখ হয় না, দারিদ্র্য হইলেই দুঃখ হয় না। সরলার অন্তঃকরণে সেই ছয় বৎসর পরম সুখের কাল বলিয়া বোধ হইল। প্রাণের সখী অমলা! তাহাকে কি আর দেখিতে পাইবে? প্রাতঃকালে সেই অমলার সহিত প্রত্যহ ঘাটে জল আনিতে যাইত, সন্ধ্যার সময় সেই অমলার সহিত অনন্ত উপকথা, অনন্ত প্রণয়ের কথা হইত। সুখের সময় অমলা নিকটে থাকিলে সুখ দ্বিগুণ হইত, দুঃখের সময় অমলার প্রবোধবাক্যে দুঃখ শান্তি হইত। আজি সে অমলা কোথায়? পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছে!

তাহার পর বনগ্রামের আশ্রমবাসিনী কমলা, তিনিও সরলাকে বড় ভালবাসিতেন। আর এই দুর্গবাসিনী বিমলা, তিনিও সরলাকে কত যত্ন করিয়াছেন। তাঁহারা কোথায়? তাঁহারাও কি পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছেন?

আর সেই ইন্দ্রনাথ! যাহার চিন্তায় আজি ছয় মাস সরলার হৃদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাহার আশায় আজি ছয় মাস সরলা জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? বাল্যকালে ইচ্ছামতীতীরে যাহার পার্শ্বে বসিয়া বালিকা গল্প শুনিত, গল্প শুনিত আর একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; যৌবনের প্রারম্ভে যে প্রেমময় মুখখানির কথা সদাই ভাবিত, ভাবিত আবার সেই মুখখানি দেখিয়া হৃদয় শীতল করিত, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? রুদ্রপুরের কুটীর পার্শ্বে চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনাথ বিদায় লইয়াছেন, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? হায়! তিনিও পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়াছেন, অনন্ত সংসারাকাশে বিচরণ করিতেছেন!

সরলা ভাবিয়া ভাবিয়া হতজ্ঞান হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু চক্ষুতে জল নাই। বালিকার হৃদয়ে আজি যে যাতনা, অশ্রুজলে তাহা নিবারিত হয় না। যতদিন জীবনে একটী আশা থাকে, ততদিন জীবন সহনীয় হয়, কিন্তু সরলার পক্ষে এক একটী করিয়া সকল আশাই তিরোহিত হইয়াছিল, পৃথিবী শূন্য হইয়াছিল, সংসার তমোময় হইয়াছিল। এক একটী করিয়া নাট্যশালার দীপ নির্ব্বাণ হইল, সরলা ধীরে ধীরে সেই নাট্যশালা ত্যাগ করিবার আশায় বসিয়া আছে।

কিন্তু আমাদের সুখ-সম্পদের মধ্যে অনেক সময়ে বিপদ আইসে, আবার নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার সঞ্চার হয়। সরলার বোধ হইল যেন একটা শব্দ হইল। সরলা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া চারিদিক দেখিল, কিন্তু সে নিবিড় অন্ধকারে কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। অন্য দিন হইলে, সরলা ভীত হইত, কিন্তু আজি বালিকার হৃদয়ে ভয় নাই।

এমত সময়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোক দেখা দিল। সে আলোকে সরলা সম্মুখে কি দেখিতে পাইল? সরলার সম্মুখে, কেবলমাত্র দশ হস্ত দূরে, একটী মনুষ্যের আকৃতি! দীর্ঘ আকৃতি, দীর্ঘ বাহু, উন্নত ললাটের উপর যোদ্ধার উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে, কটিদেশে যোদ্ধার অসি লম্বমান রহিয়াছে! সে আকৃতি, সে বদনমণ্ডল, সে উজ্জ্বল নয়নদ্বয় সরলার অপরিচিত নহে! মুহূর্ত্তমধ্যে সরলার পতনোন্মুখ কম্পিত দেহখানি সেনাপতি ইন্দ্রনাথ হৃদয়ে ধারণ করিলেন!

প্রাতঃকালে ইন্দ্রনাথ আপন নৌকা হইতে কয়েকজন সৈনিক পুরুষকে ডাকাইলেন। পরে রাজা টোডরমল্লের আজ্ঞানুসারে শকুনিকে বন্দী করিয়া লইয়া ইচ্ছাপুরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। রাজা স্বয়ং অচিরে ইচ্ছাপুরে সুরেন্দ্রনাথের ভদ্রাসনে আসিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। মহাশ্বেতা, সরলা ও বিমলা এক নৌকায় যাত্রা করিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার সময় ইচ্ছাপুরে পঁহুছিয়া ইন্দ্রনাথ পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : ইচ্ছাপুরে প্রত্যাগমন

WHEN wild war's deadly blast was blown,
And gentle peace returning,
With many a sweet babe fatherless,
And many a widow mourning,
I left the lines and tented field,
Where long I'd been a lodger.

—*Burns.*

বহুকালের পর আত্মীয় স্বজনের পরস্পর মিলনে যে অপর্য্যাপ্ত সুখলাভ করিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নগেন্দ্রনাথ বহুকাল পরে পুত্রকে পাইয়া অপার আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। পুত্রকে বার বার আলিঙ্গন করিয়া সহস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

বনগ্রাম হইতে চন্দ্রশেখর কমলাকে সঙ্গে করিয়া ইচ্ছাপুরে আসিলেন। রুদ্রপুর হইতে অমলা স্বামীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা টোডরমল্ল আসিবেন শুনিয়া সকলেই সকল দিক হইতে ইচ্ছাপুরে আসিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ যে জমীদার নগেন্দ্রনাথের পুত্র তাহা সকলেই জানিতে পারিল। সরলা একদিন গোপনে ইন্দ্রনাথকে কহিল,—আমি তোমাকে দরিদ্র ভদ্রসন্তান জানিয়া কথা কহিতাম, জমীদার-পুত্র জানিলে ভয়ে কথা কহিতাম না।

ইন্দ্রনাথ সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন,—সেজন্য এখন যেন পুরাতন ভালবাসা ভুলিও না।

সরলা মনে মনে ভাবিল,—পারিব কেন? লজ্জাবনতমুখী বেগে পলায়ন করিল। অমলা রুদ্রপুরে ইন্দ্রনাথকে সামান্য কায়স্থপুত্র বলিয়া কত তামাসা করিত, এক্ষণে তাঁহাকে জমীদারপুত্র জানিয়া লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু ইন্দ্রনাথ অল্পে ছাড়িবার লোক নহেন। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নবীন দাসের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অমলা তাঁহাকে দেখিয়া দেড় হাত ঘোমটা টানিল!

ইন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বটে, এই বুঝি পুরাতন ভালবাসা?

অমলা লজ্জিত হইল, অথচ তামাসা ছাড়িল না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল,—আপনি পরের বাড়ীর ভিতর গিয়া এইরূপ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেন, আমি সরলাকে বলিয়া দিব।

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন,—অমলা, তুমি আমাকে পর মনে কর. আমি তোমাকে পর মনে করি না।

অমলা এবার অপ্রতিভ হইল। অবগুণ্ঠন খুলিয়া বলিল,—আমায় ক্ষমা কর, আর আমি তোমার নিকট লজ্জা করিব না। সেই অবধি অমলার লজ্জা ভঙ্গ হইল।

মহাশ্বেতা যে রাজা সমরসিংহের বিধবা তাহা জানিয়া লোকে অধিকতর বিস্মিত হইল। এখন আর মহাশ্বেতা দরিদ্রা নহেন, রাজা টোডরমল্লের আজ্ঞানুসারে সমরসিংহের বিস্তীর্ণ অধিকার তাঁহার বিধবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সকলের সুখ দেখিয়া বিমলাও আপনার দুঃখ কিয়দংশ বিস্মৃত হইলেন। সরলার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ হইয়াছিল। সরলা আজি পিতার বিস্তীর্ণ জমীদারীর উত্তরাধিকারিণী, পাপাত্মা শকুনি এক্ষণে বন্দী, এ সকল বিষয় আলোচনা করিয়া বিমলা মনের ক্লেশ কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

চিন্তাশীলা কমলাও তাঁহাদিগের সহিত থাকিতেন। তিনি এক্ষণে নগেন্দ্রনাথের গৃহে বাস করেন, এবং প্রত্যহ নিজহস্তে পাক করিয়া নগেন্দ্রনাথকে খাওয়ান। নগেন্দ্রনাথ কমলার কন্যাতুল্য যত্নে প্রীত হইলেন।

ইচ্ছাপুরে আনন্দের উৎস বহিতে লাগিল; রাজা টোডরমল্ল আসিবেন বলিয়া বড় ধুমধাম ও আয়োজন হইতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : জমীদারের পুত্র ও পুত্রবধূ

SHE gazed—she reddened like a rose,
Sine pale like only lily;
She sank within my arms and cried,
"Art thou my ain dear' Willie?"
"By Him who made yon sun and sky,
By whom true love's regarded,
I am the man; and thus may still.
True lovers be rewarded."

—*Burns.*

সন্ধ্যাকাল আগত। কমলা একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছাপুরের নিকটস্থ যমুনা নদীর তীরে যাইয়া পড়িলেন। একাকী যমুনার তীরে বসিয়া স্বভাবের নিস্তব্ধ ভাব অবলোকন করিতেছিলেন, ঘন বৃক্ষাবলীর মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা খেলা করিতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। নীল আকাশে দুই একটু শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, শান্ত নদীর উপর অনেকগুলি নৌকা ভাসিতেছে। রাজা টোডরমল্লের ইচ্ছাপুর আগমন উপলক্ষে অনেক দেশের লোক তথায় আসিতেছেন।

কমলা সততই চিন্তাশীলা, কিন্তু অদ্য যেন কোন বিশেষ চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। সেই নদীতীরে বসিয়া শান্ত নয়ন দুটী ফিরাইয়া আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। তাহার শান্ত জ্যোতিঃ সেই শান্ত নয়ন ও মুখমণ্ডলের উপর পড়িতেছে। আলুলায়িত কেশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, বা বদনমণ্ডল ঈষৎ আবৃত করিয়া বক্ষঃস্থলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুর উপর বদনমণ্ডল স্থাপিত রহিয়াছে। কমলা কি চিন্তা করিতেছেন?

কমলা আজি পূর্ব্বকালের কথা স্মরণ করিতেছেন। স্বামীর মৃত্যু-কথা তাঁহার স্মরণ হইতেছে; স্বামীর দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে; স্বামীর প্রণয়ে হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন সন্ধ্যার বায়ুর সহিত তাঁহার স্বামীর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত বহিয়া যাইতেছে। সঙ্গীতশব্দে চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন নদীর উপর দেবাকৃতি একজন মনুষ্য একখানি তরী চালন করিতেছেন, এবং আকাশের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে গীত গাইতেছেন।

কমলা বার বার সেইদিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে সহস্র চিন্তা জাগরিত হইতে লাগিল। আবার নৌকারোহী সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। আবার সে সঙ্গীতে কমলার হৃদয় উদ্বেলিত করিল। এক দণ্ড ধরিয়া কমলা সে গান শুনিতে লাগিলেন। যৌবনে কমলা সে গান শুনিয়াছিলেন; গানের কথায় কথায় মাধুরীত্ব ক্ষরিতেছে; গানের অক্ষরে অক্ষরে পূর্ব্বস্মৃতি গ্রথিত রহিয়াছে! এ কি স্বপ্ন, না সত্য, না পূর্ব্বস্মৃতি মাত্র?

আকাশে চাঁদ উঠিল। সেই নীল আকাশ, সেই অনন্ত বৃক্ষাবলী, সেই নদী, আলোক পরিপূর্ণ করিয়া চন্দ্র উদিত হইল। নৌকাখানি ভাসিতে ভাসিতে নিকটে আসিল, কমলা সেই চন্দ্রালোকে নৌকারোহীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা নারী পতির কণ্ঠস্বর বিস্মৃত হয় না, পতির দেবমূর্ত্তি বিস্মৃত হয় না! বাতাহত পত্রের ন্যায় কমলার দেহলতা কাঁপিতে লাগিল। অচিরে মূর্চ্ছিতা হইয়া কমলা ভূমিতে পতিত হইলেন।

ক্ষণেক পর কমলা চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন, সেই যৌবনের হৃদয়েশ্বর তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সযত্নে ললাটে জল সিঞ্চন করিতেছেন, সস্নেহে সেই কম্পিত ওষ্ঠ চুম্বন করিতেছেন। চিরহতভাগিনী কমলা এই সৌভাগ্যের স্পর্শে শিহরিয়া উঠিলেন, পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন,—ভগবান! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখনিদ্রা হইতে জাগরিত না হই।

সেই চন্দ্রালোকে, সেই জনশূন্য নদীতীরে, সেই নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্বে, উপেন্দ্রনাথ

অনিমেষলোচনে সেই বহুপূর্ব্বদৃষ্ট বদনমণ্ডলের দিকে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুন্দর ললাট, সেই নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল, সেই স্নেহপরিপূর্ণ চিন্তা-প্রকাশক নয়ন, সেই মধুর ওষ্ঠ, ও সেই নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি, সেই উন্নত হৃদয় ও সুসৌষ্ঠব বাহুযুগল। উপেন্দ্র দেখিতে দেখিতে পাগলের ন্যায় হইয়া সেই হৃদয়ের প্রতিমাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। জগতের মধ্যে ভাগ্যবতী কমলা দেবতুল্য পতিকে পাইলেন, তাঁহার পুলকিত শরীর স্বামীর আলিঙ্গনে বদ্ধ, স্বামীর ওষ্ঠে তাঁহার ওষ্ঠ, স্বামীর হৃদয়ে তাঁহার হৃদয়!

অনেকক্ষণ পরে উপেন্দ্র বলিলেন,—নিকুঞ্জবাসিনী কমলা! আমার নৌকা মগ্ন হইবার পর আমি পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে আর পাইব, আমার আশা ছিল না। গ্রামে ফিরিয়া আসিলে গ্রামের লোকে আমাকে বলিয়াছিল, পীড়ায় তোমার কাল হইয়াছে।

কমলা বলিলেন,—হৃদয়েশ্বর! তোমার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমার সংকট পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে নিস্তার পাইয়াছিলাম। যখন নিস্তার পাইলাম তখন আমি বনগ্রামের আশ্রমে।

উপেন্দ্র। জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ কর। এক্ষণে আইস, তোমাকে তোমার শ্বশুরালয়ে লইয়া যাই।

কমলা। আমার শ্বশুরালয় কোথায়?

উপেন্দ্রনাথ কমলাকে লইয়া জমীদার নগেন্দ্রনাথের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত কথা যখন প্রকাশিত হইল, তখন জমীদার গৃহে যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। জমীদারের জ্যেষ্ঠপুত্রের বহুদিন পূর্ব্বে কাল হইয়াছে বলিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিল; সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র আজি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ গৃহ আলো করিলেন, এ সকল কথা জমীদার গৃহ হইতে সমস্ত গ্রামে, গ্রাম হইতে সমস্ত দেশে প্রচার হইল। ইচ্ছাপুর নগর জয়ঢাকের নাদে পরিপূর্ণ হইল, প্রাসাদ ও পর্ণকুটীর পতাকায় শোভিত হইল, দিবানিশি লোকের আনন্দ-শব্দে শব্দিত হইল।

বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথ বার বার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কন্যাতুল্যা কমলাকে পুত্রবধূ জানিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পথে, ঘাটে, গৃহে, কুটীরে, শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, আনন্দের ঢাক বাজিতে লাগিল, পুরবাসিগণ উপেন্দ্রনাথের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত পুরজন ও পুরনারীদিগের আনন্দলহরী বহিতে লাগিল!

প্রাতঃকালে সুরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আপনার অজ্ঞাতবাসে আমি আপনার প্রতি মুঙ্গেরে কত অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবেন, আমি জানিতাম না, ভ্রমবশতঃ করিয়াছি।

উপেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন,—সুরেন্দ্রনাথ! তোমার ক্ষমা চাহিবার আবশ্যক নাই, জগৎ-সংসারে তোমার মত ভ্রাতা দুর্লভ। তোমার সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের যশে বঙ্গদেশ যেরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছে, তোমার দয়া, প্রজাবাৎসল্য ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণেও আমাদের দেশ সেইরূপ পরিপূর্ণ ও আনন্দিত হইয়াছে। যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা ও ধন থাকে, তাঁহারা সকলেই যদি তোমার মত অমায়িক হইত, তাহা হইলে এ জগৎসংসার স্বর্গ হইত।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বিচার

> BEHOLD where stands
> The usurper's cursed head.
>
> —*Shakespeare.*

রাজা টোডরমল্ল ইচ্ছাপুরে আসিয়াছেন, আজি আনন্দে ইচ্ছাপুরবাসিগণ মত্ত হইয়াছে।

বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রাজার সভা হইয়াছে, উপরে অতি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ লম্বিত রহিয়াছে, সেই পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ জরীতে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। চন্দ্রাতপ হইতে সুন্দর ও সুগন্ধ

পুষ্পমাল্য ভূমিতে লম্বিত রহিয়াছে, শুভ্র, রক্তবর্ণ, নীল, পীত প্রভৃতি নানা প্রকার পুষ্পে সেই চন্দ্রাতপ অধিকতর শোভিত হইয়াছে। চন্দ্রাতপের নীচে বিস্তীর্ণ শয্যা রচিত হইয়াছে, সে শয্যা পারস্য দেশীয় গালিচায় মণ্ডিত, স্থানে স্থানে সুন্দর পুষ্প, সুন্দর লতা ও অপরূপ পত্র চিত্রিত রহিয়াছে, এত সুন্দর যে সহসা সেই পুষ্পলতার উপর পদবিক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ হয়। সভার মধ্যস্থলে একটী দ্বিরদ-রদ ও রৌপ্যনির্ম্মিত এবং সুবর্ণে অলঙ্কৃত সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার চারিপার্শ্বে যোদ্ধা ও জমীদারগণ সমবেত রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে স্তূপাকারে সুগন্ধ পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে ভৃত্যগণ বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া চামর ব্যজন করিতেছে। জমীদার ও যোদ্ধৃগণ সকলেই সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বহুমূল্য বস্ত্রে শোভা পাইতেছিলেন।

সভার তিনদিকে পদাতিকগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহিগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে প্রস্তরপুত্তলীর ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে আবার মাতঙ্গশ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এইরূপে তিনদিক সৈন্য সামন্তে বেষ্টিত। সম্মুখে রাজার আসিবার জন্য প্রশস্ত ও অতি দীর্ঘ একটী পথ, সে পথ রক্তবর্ণ মকমল দিয়া মণ্ডিত, তাহার দুইপার্শ্বে আবার সৈন্যগণ সেইরূপে সন্নিবেশিত। নিকটে ধ্বজবহ পদাতিক পতাকা-হস্তে দণ্ডায়মান, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী কৃপাণপাণি হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তরুণ-অরুণকিরণে সেই নিষ্কোষিত খড়্গ ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল, প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে সেই উচ্চ পতাকা সকল পত্‌পত্‌ শব্দে উড্ডীন হইতে লাগিল। শত যুদ্ধক্ষেত্রে যে জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, আজি ইচ্ছাপুরে সেই জয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে দেখিয়া নিবাসিগণ আনন্দে নিমগ্ন হইতে লাগিল, যোদ্ধৃগণের হৃদয় সাহস ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

সূর্য্যোদয় হইবার পরই রাজা টোডরমল্ল সভায় শুভাগমন করিলেন, তদ্দর্শনে সভাসদ সকলেই একবাক্যে "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া উঠিল। তাহারা নিস্তব্ধ হইলে সৈন্যগণ ক্রমান্বয়ে সেই জয়স্তুতি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল। সে জয়নাদ চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম পর্য্যন্ত শ্রুত হইল, বোধ হইল যেন দিগন্তব্যাপী মেঘগর্জ্জন গিরিগুহায় বার বার প্রতিধ্বনিত হইল।

রাজা ধীরে ধীরে সভার দিকে আসিতেছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে নগেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ, অপর পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ। পশ্চাতে আর কতিপয় খ্যাতিসম্পন্ন জমীদার ও সৈনিক পুরুষ ধীরে ধীরে যাইতেছেন। রাজা ধীরে ধীরে যাইয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন।

তখন একবারে শত জয়ঢাক হইতে রণবাদ্য আরম্ভ হইল; সে সুশ্রাব্য গম্ভীর দিগন্তব্যাপী রণবাদ্য গ্রামে গ্রামে শ্রুত হইতে লাগিল, নির্ম্মল প্রাতঃকালের নীল গগনমণ্ডলে উত্থিত হইতে লাগিল। সে শব্দ শুনিয়া সৈনিকদিগের রণক্ষেত্রের কথা মনে পড়িল, একেবারে সহস্র অসি কোষ হইতে ঝঞ্ঝনা শব্দে বহির্গত হইয়া রবিকিরণে ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল।

সে বাদ্য নিস্তব্ধ হইল, তাহার পর কতরূপ দর্শন ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইল। আজি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি ও প্রতিনিধি বঙ্গদেশ জয় করিয়া ইচ্ছাপুরে উপস্থিত হইয়াছেন, আজি একজন হিন্দু সেনাপতি বঙ্গদেশে শাসন করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং বঙ্গদেশের মধ্যে যে স্থানে যে কোন আশ্চর্য্য বস্তু ছিল, তাহা রাজার সম্মুখে প্রদর্শিত হইবার জন্য সমানীত হইয়াছিল। দূরদেশ হইতে খ্যাতিসম্পন্ন নিপুণ বাদ্যকর আপনার বাদ্য শুনাইয়া রাজা ও সভাসদগণকে সন্তুষ্ট করিল, দেশ-বিদেশ হইতে সুন্দর গায়কগণ সুললিত গীতধ্বনিতে সকলের মন মুগ্ধ করিল, নর্ত্তকীগণ আপন অতুল্য রূপরাশি বিস্তার করিয়া সুললিত স্বরে গীত গাইয়া সকলের হৃদয় অপহরণ করিল, ঐন্দ্রজালিকগণ বিচিত্র ইন্দ্রজাল দেখাইয়া, যোদ্ধৃগণ অদ্ভুত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া, ধানুষ্কগণ বিস্ময়কর তীর বিক্ষেপ করিয়া, সভাসদগণকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

অবশেষে কবি ও কথকদিগের কথকতা আরম্ভ হইল। বঙ্গদেশে তৎকালে যাঁহারা কবিত্ব-শক্তিতে বা কথকতায় পারদর্শী ছিলেন, সকলেই রাজার নিকট আপনাপন গুণের পরিচয় দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। একে একে সকলেই আপনাপন নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। কেহ বা যুদ্ধের বর্ণনা দ্বারা সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কেহ বা দেবদেবীর স্তুতি পাঠ করিয়া সকলের মন ভক্তি-পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন, কেহ বা প্রেমের কথা আনিয়া শ্রোতাদিগের

হৃদয় দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন, আবার কেহ দুঃখের কথা বলিয়া সভাসদগণের চক্ষু জলে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। কবিতার মোহিনী শক্তিতে যোদ্ধার হৃদয়ও গলিতে লাগিল, যোদ্ধার নয়নেও জল আসিল।

পরে রাজা আদেশ দিলেন,—আর আমোদপ্রমোদে আবশ্যক নাই, এখনও আমাদিগের কার্য্য বাকী আছে, বন্দীকে লইয়া আইস।

চারিজন সৈনিক পুরুষ শকুনিকে লইয়া আসিল। তখন সুরেন্দ্রনাথ সম্মুখীন হইয়া বজ্রনাদে নিবেদন করিলেন,—মহারাজ! আমি মহাত্মা সমরসিংহের নিরাশ্রয়া বিধবা ও অনাথা কন্যার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি, এই নরাধম রাজা সমরসিংহের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করাইয়াছিল। আমি দেওয়ান সতীশচন্দ্রের অনাথা কন্যার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি, এই নরাধম সতীশচন্দ্রকে হত্যা করাইয়াছে।

শকুনির দোষের প্রমাণের অভাব ছিল না। শকুনি যে কাগজ জাল করিয়াছিলেন, তাহা রাজার হস্তেই ছিল। তাহা বার বার পাঠ করিয়া দেখিলেন; সেই পত্র সকল সমরসিংহের দ্বারা পাঠান সেনাপতিদিগকে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অভিযোগে সমরসিংহের প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু সে সকল পত্রে শকুনির হস্তাক্ষর, আর সমরসিংহের মোহর; সেই মোহরের প্রতিকৃতি একটী শকুনির নিজ কক্ষে পাওয়া গিয়াছে।

তাহার পর ছয় বৎসর কাল মহাশ্বেতা যেরূপে ছিলেন, শকুনির শত শত চর যেরূপ মহাশ্বেতাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাড়না করিয়াছিল, যেরূপে মহাশ্বেতা কন্যার সহিত পরিশেষে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে রুদ্ধ হয়েন, কোন বিষয়েই প্রমাণের অভাব ছিল না। আর সতীশচন্দ্রের হত্যার কথা রাজা আপনিই জানিতেন।

তখন রাজা টোডরমল্ল সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—পামর! তোর জীবন পাপরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখনও জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর্, পরকালে ভাল হইতে পারে, ইহকালে তোর পাপের ক্ষমা নাই।

শকুনি ধীরে ধীরে বলিল,—মহারাজ! আপনি আমার শত্রুদিগের কথা শুনিয়াছেন, আমার একটী নিবেদন আছে।

রাজা বলিলেন,—শীঘ্র নিবেদন কর্, তোর আর অধিক পরমায়ু নাই।

শকুনি গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিল,—আমার দোষ যদি প্রমাণ হইয়া থাকে, তথাপি আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ অবধ্য! আপনি হিন্দুধর্ম্মের পরম ভক্ত, হিন্দুশাস্ত্রে বিশারদ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ অবধ্য। শত সহস্র দোষ করিলেও ব্রাহ্মণ অবধ্য! আমি নিরাশ্রয় বন্দী, যে দিকে নিরীক্ষণ করি সেই দিকেই আমার শত্রু। সুতরাং আপনার আজ্ঞা বাধা দিবার কেহ নাই, আমাকে সহায়তা করিবার কেহ নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলে বধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন! প্রায় চারিশত বৎসর হইতে মুসলমান বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে, তাহারা অপকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও ম্লেচ্ছ, তথাপি তাহাদের মধ্যেও, বোধ হয়, কেহ ব্রাহ্মণকে বধ করে নাই। আজি ঈশ্বরেচ্ছায় একজন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা, ব্রাহ্মণ বধ করা কি তাঁহার শাসনের প্রথম কার্য্য হইবে? মহারাজ! আজি আপনি যে পুণ্যকর্ম্ম করিবেন, চিরকাল তাহার যশ থাকিবে, আজি আপনি যে পাপকর্ম্ম করিবেন, চিরকাল তাহার অপযশ থাকিবে। আমি নিরাশ্রয় বন্দী, আমাকে বধ করা মুহূর্ত্তের কার্য্য, কিন্তু রাজা টোডরমল্লের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক যশোরাশির মধ্যে সে কর্ম্ম কলঙ্কের স্বরূপ হইবে, রাজা টোডরমল্লের জীবনচরিত হইতে সে দুরপনেয় কলঙ্ক শত শতাব্দীতেও বিলীন হইবে না। সমস্ত ভারতক্ষেত্রে সে কলঙ্ক রটিবে; আমাদের নিকট হইতে আমাদিগের পুত্রেরা, তাহাদিগের পর আমাদিগের পৌত্রেরা, একথা স্মরণ করিয়া রাখিবে। সহস্র বৎসর পরেও বালকগণ পুরাবৃত্তে পাঠ করিবে যে, রাজা টোডরমল্ল বঙ্গদেশে আগমনের পর প্রথমেই এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছিলেন; সহস্র বৎসর পরেও বৃদ্ধেরা গল্প করিবে যে, মুসলমানদিগের সময়েও যাহা হয় নাই, রাজা টোডরমল্লের শাসন-কালে ব্রহ্মহত্যা হইয়াছিল। মহারাজ! আমাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু দেশদেশান্তরে, যুগযুগান্তরে আপনার এ কলঙ্ক অপনীত হইবে না, ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপে আপনার বিস্তীর্ণ যশোরাশি মলিন হইয়া যাইবে।

শকুনি নিস্তব্ধ হইল। তাহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তাশীল হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। সমস্ত সভা নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ!

সাদীকর্থা বলিলেন,—মহারাজ! আপনি সেনাপতি, সেনাপতির ধর্ম্ম ভুলিবেন না। আপনি শাসনকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তার ধর্ম্ম ভুলিবেন না। দোষীকে দণ্ডবিধান করুন।

রাজা উত্তর দিলেন না।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—এই বিধবা ও অনাথার আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই, ইহাদের বিচার করুন, দোষীকে দণ্ড দিন। দেওয়ান সতীশচন্দ্র মৃত্যুকালে আপনার নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহার হত্যার বিচার করুন।

রাজা উত্তর দিলেন না।

সভাসদগণ বলিল,—মহারাজ! আপনি শিষ্টের পালন করিবেন, দুষ্টের দমন করিবেন, আপনি শাস্তি না দিলে এই মহাপাপীকে কে দণ্ড দিবে?

রাজা উত্তর দিলেন না।

ইতিমধ্যে সেই সভার কিছুদূরে একটা অতিশয় গোলমাল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে একজন দীর্ঘকায়, শীর্ণকলেবর, কৃষ্ণবর্ণ, মলিনবেশ স্ত্রীলোক সেই সভার নিকট দৌড়াইয়া আসিল। চীৎকার শব্দ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী।

শকুনি এতক্ষণে স্থিরভাবে ছিল, কিন্তু পাগলিনীকে দেখিয়া একেবারে কম্পিত কলেবর হইল। পাগলিনী দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল,—

মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন। পামর আমার মাতাকে বধ করিয়াছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার মাতার বিকট মুখ এখনও দেখিতে পাইতেছি, আমি তাহার বিচার প্রার্থনা করি।

সকলে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করায় পাগলিনী রহিয়া রহিয়া আত্মবিবরণ দিতে লাগিল।

পাগলিনী গোপকন্যা, তাহার মাতা গ্রামের মধ্যে সুন্দরী ছিল, সুন্দরী গোপ বিধবাকে দেখিয়া একজন ব্রাহ্মণ মোহিত হয়েন। তাহার ঔরসে সেই গোপস্ত্রীর গর্ভে শকুনির জন্ম হয়।

শকুনির পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সে গোপবনিতা ও তাহার পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা বিশ্বেশ্বরীকে লালন পালন করিয়াছিলেন। পরে তাহার মৃত্যুর পর শকুনি অল্প বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়। সকলে তাহাকে জারজ বলাতে শকুনি অল্প বয়সে অতিশয় ক্ষুন্ন হইল। মাতার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিত ও প্রহার করিত, সে বিধবা অচিরে শরীরের ও মনের ক্লেশে পীড়িত হইল, সেই পীড়ায় প্রাণ হারাইল। বিশ্বেশ্বরী পলাইল, মাতার মৃত্যু হইতে পাগলিনী হইল। শকুনি এই মহাপাতকের পর দেশত্যাগ করিয়া সতীশচন্দ্রের গৃহে ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিল।

বিশ্বেশ্বরী প্রাণভয়ে অনেকদিন অবধি দেশদেশান্তরে লুকাইয়া বেড়াইত। অবশেষে যে দিন বনগ্রাম হইতে মহাশ্বেতা ও সরলা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে বন্দীরূপে নীত হয়েন, সেই দিন বিশ্বেশ্বরীও বন্দীরূপে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে নীত হয়। পাছে বিশ্বেশ্বরী শকুনির জন্মের কলঙ্কের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে, সেই জন্য তাহাকে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে এতদিন বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এক্ষণে শকুনি বন্দী হইলে পর বিশ্বেশ্বরী সেই কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কারাবাসে তাহাকে যে কষ্টে রাখা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার শরীরে কেবল অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট ছিল। তাহাকে দেখিয়া ও তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া সভাসদগণ ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

শকুনি দেখিল আর পরিত্রাণ নাই। স্থিরপ্রতিজ্ঞ, প্রস্তুতমতি শকুনি তখন নির্ভয়ে শেষ উপায় অবলম্বন করিল। ধীরে ধীরে বস্ত্রে লুক্কাইত ছুরিকা বাহির করিয়া সমস্ত সভার সমক্ষে আপনাকে আঘাত করিল। ছিন্ন তরুর ন্যায় শকুনির মৃতদেহ ভূমিতে পতিত হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ অঙ্গুরীয় প্রতিদান

WHY let the stricken deer go weep,
The hart ungalled play,
While some must watch, while some must sleep,
Thus runs the world away.

—*Shakespeare.*

উপরি উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই রাজা টোডরমল্ল ইচ্ছাপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রতিগমন করিলেন। নগেন্দ্রনাথ পুত্রদিগকে জমীদারীর ভার দিতে ইচ্ছা করিলেন, পিতার অনুরোধে উপেন্দ্রনাথ ইচ্ছাপুরের জমীদারীর ভার লইলেন, সুরেন্দ্রনাথ চতুর্ব্বেষ্টিত জমীদারীর ভার লইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সরলাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বের মত প্রজাবাৎসল্য, পূর্ব্বের মত অমায়িকতা এখনও রহিল। এখনও ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা জানিতেন, সাধ্যমতে সে অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে যত্নবান হইতেন।

সুরেন্দ্রনাথ পুরাতন বন্ধু নবীন দাসকে আপনার দেওয়ান করিলেন; রুদ্রপুরে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী অমলার হাত দেখিয়া যাহা বলিয়া দিয়াছিল, তাহা যথার্থ হইল, অমলা দেওয়ানের গৃহিণী হইলেন। অমলা সরলাকে সেইরূপ ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন, তাঁহার পুরাতন বন্ধু "ইন্দ্রনাথের" সহিত সেইরূপ আমোদ-রহস্য করিতেন।

আমাদের ইচ্ছা এই স্থানে আখ্যায়িকা শেষ করি, কিন্তু জগতে সকলের কপালে সুখ ঘটে না, কাহারও কপালে সুখ থাকে, কাহারও কপালে দুঃখ থাকে, দুই একটী দুঃখের কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

পাঠক মহাশয় জানেন, শত্রুজিঘাংসাই মহাশ্বেতার জীবনের গ্রন্থিস্বরূপ হইয়াছিল। বৃদ্ধাবস্থায় যে চিন্তায় ছয় বৎসর কাল অভিভূত ছিলেন, সে চিন্তা তাঁহার জীবনের প্রতিকৃতি-স্বরূপ, জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সে চিন্তা শেষ হইল, জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইল, সরলার বিবাহের কয়েকদিন পর কোন রোগ কি পীড়া বিনা মহাশ্বেতা কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

আর বিমলা! উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা, রূপলাবণ্যসম্পন্না বিমলার কি হইল? যে দিন বিমলার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই দিন তাঁহার হৃদয় শূন্য হইয়াছিল, সেই দিন অবধি বিমলার পক্ষে জগৎসংসার অন্ধকারময় হইয়াছিল। সেই দিন অবধি বিমলার কোন আশা ছিল না, কোন ভরসা ছিল না, কোন সুখের অভিলাষ ছিল না, কোন দুঃখের ভয় ছিল না। মানবজাতি যে মায়াজালে জড়িত হইয়া জগতে সুখ দুঃখ অনুভব করে বিমলার সে মায়াজাল ছিন্ন হইয়াছিল!

প্রিয় সখী সরলার বিবাহের পর বিমলা বনগ্রামের মহেশ্বর-মন্দিরে চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে অধিষ্ঠাত্রী হইয়া থাকিতে অনেক অনুরোধ করিলেন, সরলা প্রিয় সখীর হাত ধরিয়া অনেক সাধ্য সাধনা করিল, কিন্তু বিমলা সহাস্য বদনে কহিলেন,—সংসারে আমার লীলা খেলা সাঙ্গ হইয়াছে, আমাকে ছাড়িয়া দাও। অগত্যা সুরেন্দ্রনাথ ও সরলা বিমলাকে বিদায় দিলেন।

বিমলা বনগ্রামে মহেশ্বর মন্দিরে চলিয়া গেলেন। শরীরে হরিদ্রাবাস ধারণ করিলেন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিলেন, দিবারাত্রি মহেশ্বরের স্তব করিতেন, এবং গ্রামের দরিদ্র দুঃখিনীদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া পুণ্যজীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর এই পুণ্যবতী তাপসীকে মা বলিয়া ডাকিতেন, আশ্রমের সকলে তাঁহার মায়া, বাৎসল্য ও পরোপকারিতা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও পূজা করিতে লাগিল। আশ্রমবাসিনী বিমলার পুণ্যজীবন পবিত্র সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কয়েক মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। তৎপর সরলা একদিন বিমলার সহিত

সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহেশ্বর-মন্দিরে আসিল, পিতা চন্দ্রশেখরের নিকট আসিয়া প্রণিপাত করিল।

যোগিনীবেশধারিণী বিমলার হাত ধরিয়া স্নেহময়ী সরলা ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুজল ত্যাগ করিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া বলিল,—দিদি, আমার কষ্টের দিন, বিপদের দিন, তুমিই আমার প্রতি স্নেহ করিয়াছিলে, আজি কি আমি তোমার জন্য কিছু করিতে পারি না?

শান্তনয়না শান্তবদনা বিমলা সহাস্য মুখে উত্তর করিলেন,—সরলা, তুমি স্নেহময়ী, তোমার মায়ার শরীর, কিন্তু আমার এখন কি প্রয়োজন বল? এই শান্ত আশ্রম অপেক্ষা জগতে কোথায় সুখকর স্থান আছে? পিতা চন্দ্রশেখর অপেক্ষা স্নেহপরায়ণ স্বজন কোথায় পাইব? দুঃখের সময়, চিন্তার সময়, স্বয়ং দেবদেব মহেশ্বর আমাকে সান্ত্বনা করেন, তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিনী হইলে আমি এ জগতে ক্লেশ পাইব না, পরন্তু শান্তি লাভ করিব।

দুই সখীতে অনেক প্রকার কথাবার্ত্তা দ্বারা সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। আশ্রমের মধ্যে যে যে স্থানে সরলা পূর্ব্বে পদচারণ করিতে ভালবাসিত, সেই সেই স্থানে প্রিয় সখী বিমলাকে সঙ্গে লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় সরলা বিমলার নিকট বিদায় লইয়া শিবিকা আরোহণ করিল। বিমলা সখীর সঙ্গে সঙ্গে শিবিকা পর্য্যন্ত আসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—সরলা, এখন তুমি রাজরাণী, এখন কি দরিদ্র আশ্রমবাসিনীকে মনে থাকিবে?

সরলা। দিদি, তোমাকে কি আমি ভুলিতে পারি?

বিমলা। সরলা, তোমার স্নেহের শরীর, তুমি আমাকে কখনও ভুলিবে না তাহা জানি তথাপি একটী স্মরণ-চিহ্ন তোমার নিকট রাখিব,—তাহাতে না বলিও না।

এই বলিয়া বিমলা কণ্ঠমালা হইতে ধীরে ধীরে একটী স্বর্ণের অঙ্গুরীয় খসাইয়া সরলার আঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন। সরলা বিস্মিত হইয়া বলিল,—একি দিদি? এ যে স্বর্ণের অঙ্গুরীয়! এ আমি লইব না। তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অবশিষ্ট দুই একখানি গহনা যাহা আছে তাহা কি আমি লইতে পারি? সে সমস্ত তোমারই নিকট শোভা পায়।

বিমলা একটু হাসিয়া বলিলেন,—সরলা, এ অঙ্গুরীয় আমার পৈতৃক সম্পত্তি নহে, ইহাতে আমার অধিকার নাই। তুমি ইহার অধিকারিণী, আজীবন এই অঙ্গুরীয় ধারণ করিও, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।

সন্ধ্যার ছায়াতে ধীরে ধীরে বিমলা আপন কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মাধবীকঙ্কণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : বালকবালিকা

> ALL the world's a stage,
> And all the men and women
> merely players;
> They have their exits and their
> entrances.
> —*Shakespeare.*

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বীরনগর গ্রামে গ্রীষ্মঋতুর একদিন সায়ংকালে গঙ্গাসৈকতে দুইটী বালক ও একটী বালিকা ক্রীড়া করিতেছে। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া গ্রাম, প্রান্তর ও প্রশস্ত গঙ্গানদী আচ্ছাদন করিতেছে। জলের উপর কয়েকখানি পোত ভাসিতেছে, দিনের পরিশ্রমের পর নাবিকেরা রন্ধনাদিতে ব্যস্ত রহিয়াছে, পোত হইতে দীপালোক নদীর চঞ্চল বক্ষে বড় সুন্দর নৃত্য করিতেছে। বীরনগরের নদীকূলস্থ আম্র-কানন অন্ধকার হইয়া ক্রমে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিতেছে। কেবল বৃক্ষের মধ্য হইতে স্থানে স্থানে এক একটী দীপশিখা দেখা যাইতেছে আর সময়ে সময়ে পর্ণকুটীরাবলী হইতে রন্ধনাদি সংসার-কার্য্যসম্বন্ধীয় কৃষকপত্নী-দিগের কণ্ঠরব শুনা যাইতেছে। কৃষকগণ লাঙ্গল লইয়া ও গরুর পাল হাম্বারব করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। ঘাট হইতে স্ত্রীলোকেরা একে একে সকলেই কলস লইয়া চলিয়া গিয়াছে, নিস্তব্ধ অন্ধকারে বিশাল শান্ত-প্রবাহিণী ভাগীরথী সমুদ্রের দিকে বহিয়া যাইতেছে। অপর পার্শ্বে প্রশস্ত বালুকাতট ও অসীম কান্তার অন্ধকারে ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে। গ্রীষ্ম-পীড়িত ক্লান্ত জগৎ সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে নিস্তব্ধ ও শান্ত।

তিনটী বালকবালিকায় ক্রীড়া করিতেছে। বালিকার বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইবে, ললাট, বদনমণ্ডল ও গণ্ডস্থল বড় উজ্জ্বল, তাহার উপর নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। হেমলতার নয়নের তারা দুটী অতিশয় কৃষ্ণ, অতিশয় উজ্জ্বল; সুন্দরী চঞ্চলা বালিকা পরী-কন্যার মত সেই নৈশ গঙ্গাতীরে খেলা করিতেছে।

কনিষ্ঠ বালকটীর বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর হইবে, দেখিলেই যেন হেমলতার ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয়। মুখমণ্ডল সেইরূপ উজ্জ্বল, প্রকৃতি সেইরূপ চঞ্চল। কেবল উজ্জ্বল নয়ন দুটীতে পুরুষোচিত তেজোরাশি লক্ষিত হইত, আর উন্নত প্রশস্ত ললাটে শিরা এই বয়সেই কখন কখন ক্রোধে স্ফীত হইত। নরেন্দ্রকে দেখিলে তেজস্বী ক্রোধপরবশ বালক বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীশচন্দ্র ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক, কিন্তু মনুষ্যের গম্ভীর ভাব ও অবিচলিত স্থির বুদ্ধির চিহ্ন বালকের মুখমণ্ডলে বিরাজ করিত। শ্রীশচন্দ্র বুদ্ধিমান, শান্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি বালক।

দুইটী বালকে বালুকার গৃহ-নির্ম্মাণ করিতেছিল, কাহার ভাল হয় হেমলতা দেখিবে। নরেন্দ্র গৃহ-নির্ম্মাণে অধিকতর চতুর কিন্তু চঞ্চল; হেম যখন নিকটে দাঁড়ায় নরেনের ঘর ভাল হয়; আবার হেম শ্রীশের ঘর দেখিতে গেলেই নরেন রাগ করে, বালুকাগৃহ পড়িয়া যায়। মহা-বিপদ, দুই তিন বার উৎকৃষ্ট ঘর পড়িয়া গেল!

হেম এবার আর শ্রীশের নিকট যাবে না, সত্য যাবে না, যথার্থ যাবে না, নরেন আর একবার ঘর কর। নরেন মহা আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘর আরম্ভ করিল।

ঘর প্রায় সমাধা হইল। হেম ভাবিল, নরেনের ত জয় হইবে, কিন্তু শ্রীশ একাকী আছে, একবার উহার নিকট না যাইলে কি মনে করিবে। কেশগুচ্ছগুলি নাচাইতে নাচাইতে উজ্জ্বল জলহিল্লোলের ন্যায় একবার শ্রীশের নিকট গেল। শ্রীশ ক্ষিপ্রহস্ত নহে, বালুকাগৃহ-নির্ম্মাণে চতুর নহে. কিন্তু ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবলে একপ্রকার গৃহ করিয়াছে, বড় ভাল হয় নাই।

নরেন একবার গৃহ করে, একবার হেমের দিকে চাহে। রাগ হইল, হাত কাঁপিয়া গেল, উত্তম গৃহ পড়িয়া যাইল। ক্রুদ্ধ হইয়া বালুকা লইয়া হেম শ্রীশের গায়ে ছড়াইয়া দিল। শ্রীশের জিৎ, ঘর হইয়াছে, নরেনের ঘর হইল না।

নরেন্দ্রনাথ সাবধান! আজ বালুকাগৃহ-নির্ম্মাণ করিতে পারিলে না, দেখ যেন সংসার-গৃহ ঐরূপে ছারখার হয় না। দেখ যেন জীবনের খেলায় শ্রীশচন্দ্র তোমাকে হারাইয়া বিষয় ও হেমলতাকে জিতিয়া লয় না!

নরেন্দ্রনাথের ক্রোধধ্বনি শুনিয়া ঘাট হইতে একটী সপ্তদশবর্ষীয়া বিধবা স্ত্রীলোক উঠিয়া আসিল। তিনি শ্রীশের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, নাম শৈবলিনী।

শৈবলিনী আসিয়া আপন ভ্রাতাকে তিরস্কার করিল। শ্রীশ ধীরে ধীরে বলিল,—না দিদি, আমি কিছুই করি নাই, নরেন ঘর করিতে পারে না, সেই জন্য কাঁদিয়াছে, হেমকে জিজ্ঞাসা কর। “তা না পারুক, আমি নরেনের ঘর করিয়া দিব,” এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া শৈবলিনী চলিয়া গেলেন। শ্রীশ দিদির সঙ্গে চলিয়া গেল।

হেম ও নরেনের কলহ শীঘ্র শেষ হইল। হেম নরেনের ক্রন্দন দেখিয়া সজলনয়নে বলিল, ভাই তুমি কাঁদ কেন? আমি একটী বার শ্রীশের ঘর দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমারই ঘর ভাল হইয়াছিল, তুমি ভাঙ্গিলে কেন? তোমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম, শ্রীশের কাছে একবার গিয়াছিলাম বই ত নয়। তুমি ভাই রাগ করিও না, তুমি ভাই কাঁদ কেন? নরেন কি আর রাগ করিতে পারে, নরেন কি কখন হেমের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারে?

তাহার পর বালকবালিকায় কি কথা? আকাশে কেমন তারা ফুটিয়াছে? ওগুলা কি ফুল, না মাণিক? নরেন যদি একটী কুড়াইয়া পায়, তাহা হইলে কি করে? তাহা হইলে গাঁথাইয়া হেমের গলায় পরায়! ঐ দেখ, চাঁদ উঠিবার আগে কেমন রাঙ্গা হইয়াছে, ও আলো কোথা হইতে আসিতেছে? বোধ হয় নদী পার হইয়া খানিক যাইলে ঐ আলো ধরা যায়। না, তাহা হইলে ওপারের লোক ধরিত। বোধ হয় নৌকা করিয়া অনেক দূর যাইতে যাইতে চাঁদ যে দেশে উঠে তথায় যাওয়া যায়, সে দেশে কি রকম লোক, দেখিতে ইচ্ছা করে। নরেন বড় হইলে একবার যাবে, হেম তুমি সঙ্গে যেও।

বালকবালিকা কথা কহিতে থাকুক, আমরা এই অবসরে তাহাদের পরিচয় দিব। এই সংসারে বয়োবৃদ্ধ বালকবালিকারা গঙ্গার বালুকার ন্যায় ছার বিষয় লইয়া কিরূপ কলহ করে, চন্দ্রালোকের ন্যায় বৃথা আশার অনুমান করিয়া কোথায় যাইয়া পড়ে, তাহারই পরিচয় দিব। পরিচয়ে আবশ্যক কি? পাঠক চারিদিকে চাহিয়া দেখ, জগতের বৃহৎ নাট্যশালায় কেমন লোকসমারোহ, সকলেই কেমন নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ধাবমান হইতেছে! কে বলিবে, কি জন্য?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বুদ্ধিমান জমীদার

> THROUGH tattered clothes small vices
> do appear,
> Robes and furred gowns hide all.
> Plate sin with gold,
> And the strong lance of justice
> hurtless breaks;
> Arm it in rags, a pigmy's straw
> doth pierce it.
> —*Shakespeare.*

নরেন্দ্রনাথের পিতা বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী জমীদার ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া আপন নামানুসারে গ্রামের নাম “বীরনগর” রাখিলেন। তাঁহার যথার্থ সহৃদয়তার জন্য সকলে তাঁহাকে মান্য করিত, তাঁহার প্রবল প্রতাপের জন্য সকলে তাঁহাকে ভয় করিত, পাঠান জায়গীরদারগণ ও স্বয়ং সুবাদার তাঁহাকে সম্মান করিতেন।

বাল্যকালে বীরেন্দ্র, নবকুমার মিত্র নামক একটী দরিদ্রপুত্রের সহিত একত্রে পাঠশালায় পাঠ করিতেন। নবকুমার অতিশয় সুশীল ও নম্র, ও সর্ব্বদাই তেজস্বী বীরেন্দ্রের বশম্বদ হইয়া থাকিত, সুতরাং তাহার প্রতি বীরেন্দ্রের স্নেহ জন্মাইয়াছিল। যৌবনকালে যখন বীরেন্দ্র জমীদারী স্থাপন করিলেন, নবকুমারকে ডাকাইয়া আপনার অমাত্য ও দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। নবকুমার অতিশয় বুদ্ধিমান ও সুচতুর, সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নবকুমার স্বার্থপর হইলেও নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না, বীরেন্দ্রের নিকট ভিক্ষা করিয়া দুই পাঁচখানি গ্রাম আপনার নামে করিলেন, কিন্তু ভয়ে হউক, কৃতজ্ঞতাবশতঃ হউক, বীরেন্দ্রের জমীদারীর কোনও হানি করেন নাই। বীরেন্দ্রের মৃত্যুর সময় নরেন অতি শিশু, জমীদারী ও পুত্রের ভার প্রিয় সুহৃদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বীরেন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ভালবাসা যতদূর নাবে ততদূর উঠে না। অপত্যস্নেহের ন্যায় পিতৃস্নেহ বা মাতৃস্নেহ বলবান হয় না, দয়া অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা দুর্ব্বল ও ক্ষণভঙ্গুর। নবকুমারের কৃতজ্ঞতা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল।

নবকুমার নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না, কিন্তু নবকুমার দরিদ্র, ঘটনাস্রোতে সমস্ত জমীদারী প্রাপ্তির আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইল। সে লোভ দরিদ্রের পক্ষে দুর্দ্দমনীয়। বীরেন্দ্রের পুত্র অতি শিশু, বীরেন্দ্রের স্ত্রী পূর্ব্বেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, শিশুর বিষয় রক্ষা করে এরূপ জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ ছিল না, দুই একজন যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও নবকুমারের সহিত যোগ দিলেন। সংসারে যাঁহারা বীরেন্দ্রের অভিভাবক ছিলেন, তাঁহারা কিছুই জানিলেন না, অথবা জানিয়া কি করিবেন?

তথাপি নবকুমার সমস্ত জমীদারী একাকী লইবেন প্রথমে এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। বীরেন্দ্রের জীবদ্দশায়ই দুই পাঁচখানি গ্রাম আপন নামে করিয়াছিলেন, এখন আরও দুই পাঁচখানি গ্রাম আপন নামে করিতে লাগিলেন। ক্রমে লোভ বাড়িতে লাগিল। ভাবিলেন, আমার একমাত্র কন্যা হেমের সহিত নরেন্দ্রের বিবাহ দিব, অবশেষে বীরেন্দ্রের জমীদারী তাঁহার পুত্রেরই হইবে। এখন নাবালকের নামে জমীদারী থাকিলে গোলমাল হইতে পারে, সম্প্রতি আপন নামে থাকাতে বোধ হয় কোন আপত্তি হইতে পারে না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সুবাদারের সভাতে প্রধান প্রধান জমীদার ও জায়গীরদারদিগের এক এক জন উকীল থাকিত। তাহারা নিজ নিজ মনিবের পক্ষ হইতে মধ্যে মধ্যে নজর দিয়া সুবাদারের মন তুষ্ট রাখিত, ও মনিবের পক্ষ হইতে আবেদন আদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সদরে এইরূপে একটী একটী উকীল না থাকিলে জমীদারীর বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল, এমন কি, জমীদারী হস্তান্তর হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল।

বীরনগর জমীদারীর উকীল এক্ষণে নবকুমারের বেতনভোগী। বঙ্গদেশের কানঙ্গু মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেন যে, বীরেন্দ্রের মৃত্যু হইতে সে জমীদারীর খাজনা নিয়মিতরূপে আসিতেছে না, তবে নবকুমার নামে একজন কার্য্যদক্ষ লোক সেই জমীদারীর ভার লইয়া আপন ঘর হইতে যথাসময়ে খাজনা দিতেছে। নবকুমার বীরেন্দ্রের বিশেষ আত্মীয় ও বীরেন্দ্রের সমস্ত পরিবারকে প্রতিপালন করিতেছে। এই আবেদনসহ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা কানঙ্গু মহাশয়ের নিকট উপঢৌকন গেল। আবেদনের বিরুদ্ধে কেহ বলিবার ছিল না, তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্রের নাম খারিজ হইয়া নবকুমারের নাম লিখিত হইল। অদ্য নবকুমার মিত্র বীরনগরের জমীদার!

জমীদারের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। যে নরেন্দ্রের পিতাকে পূর্ব্বে পূজা করিতেন, যে নরেন্দ্রকে এতদিন অতি যত্নে পালন করিয়াছিলেন, অদ্য সেই নরেন্দ্র তাঁহার চক্ষুর শূল হইল। নবকুমারের সাক্ষাতে না হউক অসাক্ষাতে সকলেই বলিত, “নরেন্দ্রের বাপের জমীদারী”, “নবকুমারের জমীদারী” কেহ বলিত না। গ্রামের প্রজারাও নরেন্দ্রকে দেখিয়া জমীদারপুত্র বলিত, প্রকৃত জমীদার নবকুমার কি এ সমস্ত সহ্য করিতে পারেন? তিনি চিন্তা করিতেন,—আমি কি অপবাদ বহন করিবার জন্যই এই জমীদারী করিলাম? পুনরায় নরেন্দ্রের সহিত বিবাহ হইলে কে না বলিবে পিতার জমীদারী পুত্রে পাইল, আমার নাম কোথায় থাকে? এতটা করিয়া কি পরিণামে এই ঘটিবে? আমি কি জমীদার হইয়াও বালকের দেওয়ান বলিয়া পরিগণিত হইব? কার্য্যেও কি তাহাই করিব, সযত্নে জমীদারী রক্ষা করিয়া পরে নরেন্দ্রকে

ফিরাইয়া দিব? বিচক্ষণ প্রগাঢ়মতি নবকুমার এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে আপন নাম চিরস্মরণীয় করা আবশ্যক, তিনি পোষ্যপুত্র লইবেন, অথবা কোন দরিদ্রের সহিত আপন কন্যা হেমলতার বিবাহ দিবেন।

পণ্ডিতবর নবকুমার এইরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্যসাধনে যত্নবান হইলেন। নিকটস্থ একটী গ্রামে গোকুলচন্দ্র দাস নামক একজন ভদ্রলোক একটী পুত্র ও একটী বিধবা কন্যা ও অল্প সম্পত্তি রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। পুত্রটীর নাম শ্রীশচন্দ্র দাস, কন্যার নাম শৈবলিনী। নবকুমার শ্রীশচন্দ্রকে বীরনগরে আনাইয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী শ্বশুরালয়ে থাকিত, কখন কখন ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বীরনগরে আসিয়া দুই এক দিন বাস করিত। ভ্রাতা ভিন্ন বিধবার আর কেহই এ জগতে ছিল না।

বুদ্ধিমান নবকুমার দয়াশূন্য ছিলেন না, বীরেন্দ্রের জ্ঞাতি কুটুম্বকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন নাই, পরিচারিকারূপে তাহারা সকলেই আহারাদি ও কার্য্য করিত, ও দিবানিশি প্রকাশ্যে নবকুমারের গৃহিণীর সাধুবাদ ও খোসামোদ করিত, গোপনে বিধাতাকে নিন্দা করিত। নবকুমার নরেন্দ্রকে এখনও লালনপালন করিতেন, আপন অমাত্যবর্গের নিকট সর্ব্বদাই ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতেন,—কি করি! বীরেন্দ্র জমীদারী বুঝিতেন না, সমস্ত বিষয়টি খোয়াইয়াছিলেন। পরের হাতে গেলে বীরেন্দ্রের পরিবার ও পুত্রের কষ্ট হয় সেই জন্য আমিই ক্রয় করিলাম, নচেৎ জমীদারীতে বিশেষ লাভ নাই। এখনও অনাথ নরেনকে আমিই লালনপালন করিতেছি, বীরেন্দ্রের অনেকগুলি পরিবার, আমিই খাইতে পরিতে দিতেছি, কি করি, মানুষে কষ্ট পায় এ ত আর চক্ষে দেখা যায় না। আর ভাবিয়া দেখ, ভগবান টাকা দিয়াছেন কি জন্য? পাঁচ জনকে দিতেই সুখ, রাখিতে সুখ নাই, পরকে দিব, তাহাতে যদি আমার কিছু না-ও থাকে সেও ভাল।

অমাত্যেরা বলিত,—অবশ্য অবশ্য, আপনি মহাশয় লোক, আপনার দয়ার শরীর, সেই জন্যই এমন আচরণ করিতেছেন, অন্যে কি এমন করে? এই ত এত জমীদার আছে, আপনি যতটা বীরেন্দ্রের পরিবারের জন্য করেন এমন আর কে কাহার জন্য করে? আহা, আপনি না থাকিলে নরেন্দ্রকেই বা কে খাইতে দিত, অন্য অন্য লোককেই বা কে ভরণপোষণ করিত? তাহারা যে দুই বেলা দুই পেট খাইতে পায় সে কেবল আপনার অনুগ্রহে। আপনার মত পুণ্যবান লোক কি আর আছে?

হর্ষ-গদ-গদ-স্বরে ঈষৎ-হাস্য-বিস্ফারিত-লোচনে নবকুমার উত্তর করিতেন,—না বাপু, আমি পুণ্যও জানি না, কিছুই জানি না, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না, চিরকালই আমার এই স্বভাব, আজ বীরেন্দ্রের পরিবার বলিয়া কিছু নূতন নহে, ইহাতে দোষ হয় আমি দোষী, পুণ্য হয় তাহাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নবকুমার নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না। চাহিয়া দেখ, সকলেই নবকুমারকে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক বলিয়া সমাদর করিতেছে। শুন, সকলেই তাহাকে দয়াশীল ব্রাহ্মণভক্ত লোক বলিয়া সুখ্যাতি করিতেছে। অদ্যাপি নবকুমারের ন্যায় লোক লইয়া আমাদের সমাজ গর্ব্বিত রহিয়াছে, তাঁহাদের সর্ব্বস্থানে সমাদর, সর্ব্বস্থানে প্রশংসা, সর্ব্বস্থানে প্রভুত্ব! মানী জ্ঞানী বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন নবকুমার মরিলে সমাজ শিরোমণি হারাইবে, সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। যিনি সর্ব্বস্থানে আদৃত, সকলের মান্য, তোমার আমার কি অধিকার আছে, তাঁহার নিন্দা করি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাল-বিধবা

COME, pensive nun, devout and pure,
Sober steadfast and demure.

—*Milton.*

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শৈবলিনী সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ধর্ম্মপরায়ণা শান্তচিত্তা বিধবা সন্ধ্যার পূজা সমাপ্ত করিয়া বালকবালিকাগুলিকে লইয়া গল্প

করিতে বসিলেন। শৈবলিনী মাসে কি দুইমাসে একবার বীরনগরে আসিতেন। শৈবলিনী বড় গল্প করিতে পারিতেন। শৈবলিনীর সন্তানাদি নাই, সকল শিশুকেই আপনার বলিয়া মনে করিতেন। এই সমস্ত কারণে শৈবলিনী বালকবালিকাদিগের বড় প্রিয়পাত্র। শৈব আসিয়াছেন, গল্প করিতে বসিয়াছেন, শুনিয়া এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার সমস্ত বালকবালিকা একত্র হইল, কেহই শৈবলিনীর অনাদরের পাত্র ছিল না। কাহাকেও ক্রোড়ে, কাহাকেও পার্শ্বে, কাহাকেও সম্মুখে বসাইয়া শৈবলিনী মহাভারতের অমৃতমাখা গল্প করিতে লাগিলেন। আমরা এই অবসরে শৈবলিনীর বিষয় দুই একটী কথা বলিব।

শৈবলিনীর পিতা সামান্য সঙ্গতিপন্ন ও অতিশয় ভদ্রলোক ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ও শৈবলিনী পিতার গুণগ্রাম ও মাতার ধীরস্বভাব ও নম্রতা পাইয়াছিলেন, অতি অল্প বয়সে শৈবলিনী বিধবা হইয়াছিলেন, স্বামীর কথা মনে ছিল না, সংসারের সুখ দুঃখ প্রায় জানিতেন না। এ জন্মে চিরকুমারী বা চিরবিধবা হইয়া কেবল মাতার সেবা ও ছোট ভাইটীর যত্ন ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম জানিতেন না।

শৈবলিনীর পিতার মৃত্যুর পর তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল, এমন কি, অন্নের কষ্ট কাহাকে বলে অভাগিনী শৈবলিনী ও তাহার মাতা জানিতে পারিলেন। কিন্তু সেই শান্ত নম্র বিধবা একবারও ধৈর্য্যহীন হন নাই, অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান ও পূজাদি সমাপন করিয়া কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা বৃদ্ধমাতা ও শিশুর জন্য রন্ধনাদি করিতেন। প্রত্যূষে প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায় শৈবলিনী নিজ কার্য্য আরম্ভ করিতেন, শান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে শান্তচিত্তা বিধবা কার্য্য সমাপন করিয়া মাতার সেবায় ও শিশু ভ্রাতার লালনপালনে রত হইতেন। সেই কৃষ্ণকেশমণ্ডিত, শ্যামবর্ণ, বাক্যশূন্য মুখখানি ও আয়ত শান্তরশ্মি নয়ন দুইটী দেখিলে যথার্থ হৃদয় স্নেহে আপ্লুত হয়। যথার্থই বোধ হয় যেন সায়ংকালের শান্তি ও নিস্তব্ধতায় শৈবলে আবৃত মুদিত প্রায় শৈবলিনী মুখখানি নত করিয়া রহিয়াছে।

এ জগতে শৈবলিনী কিছুরই আকাঙ্ক্ষণী নহে। বিধবা শৈবলিনী সহচর চাহে না, যে আম্রবৃক্ষ ও বংশবৃক্ষ শৈবলিনীর নম্র কুটীর চারিদিকে সস্নেহে মণ্ডিত করিয়া মধ্যাহ্নে ছায়া বর্ষণ ও সায়ংকালে মৃদুস্বরে গান করিত, তাহারাই শৈবলিনীর সহচর। তাহারাও যেমন প্রকৃতির সন্তান, শৈবলিনীও সেইরূপ প্রকৃতির সন্তান, জগদীশ্বর তাহাদেরও ভরণপোষণ করিতেন, অনাথিনী শৈবলিনীকেও ভরণপোষণ করিতেন। শৈবলিনী, শৈশবে বিধবা, কিন্তু প্রেমের আকাঙ্ক্ষণী নহে, কেননা সমগ্র জগৎ শৈবের প্রেমের জিনিষ।

বৃক্ষে বসিয়া যে কপোতকপোতী গান করিত, তাহারাও শৈবের প্রেমের পাত্র, তাহাদের সঙ্গে শৈব একত্রে গান গাইত, তাহাদের প্রত্যহ তণ্ডুল দিয়া পালন করিত। শৈব যখন বৃদ্ধ মাতাকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিত, তখনই শৈবলিনীর হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হইত, মাতাকে সুখী দেখিলে শৈবের নয়ন আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইত। যখন শিশু শ্রীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিত, যখন শিশু আহ্লাদিত হইয়া “দিদি” বলিয়া শৈবকে চুম্বন করিত, তখন যথার্থই শৈবের হৃদয় নাচিয়া উঠিত, অশ্রুতে বসন ভিজিয়া যাইত। আর যখন সায়ংকালে শান্ত নিস্তব্ধ নদীর প্রশস্ত বক্ষে চন্দ্রতারাবিভূষিত স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভগবানের কথা মনে পড়িত, যিনি চন্দ্র, তারা ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি পক্ষীকে শাবক দিয়াছেন ও শৈবকে শ্রীশ দিয়াছেন, সেই ভগবানের কথা মনে পড়িত, তখনই শৈবলিনীর হৃদয় অনন্ত প্রেমে সিক্ত হইত। শৈবলিনীর স্বামী বা পুত্র নাই, শৈবলিনীর প্রেমের একমাত্র ভাগী কেহ ছিল না, সুতরাং বর্ষাকালের নদীস্রোতের ন্যায় শৈবের স্নেহবারি চারিদিকে বহিয়া যাইত। গ্রামের সমস্ত বালকবালিকাকে শৈব বড় ভালবাসিত, শৈব অনাথা দরিদ্রদিগের সমদুঃখিনী। পশুপক্ষীও শৈবের প্রেমের ভাগী, জগতে শৈবলিনীর ন্যায় প্রেমিক আর কে আছে? জগৎ যেরূপ বিস্তারিত, সমুদ্র যেরূপ গভীর, আকাশ যেরূপ অনন্ত, শৈবলিনীর প্রেম সেইরূপ বিস্তারিত, গভীর, অনন্ত।

এইরূপ কিছুকাল অতীত হইলে শৈবলিনীর মাতার কাল হইল। ধীরস্বভাব, রূপবান, ভদ্রবংশজাত শ্রীশচন্দ্রকেও নবকুমার আপন কন্যার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছায় বীরনগরে লইয়া গেলেন। যাহাদের জন্য শৈবলিনী শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা না থাকায় শৈবলিনী পুনরায় শ্বশুরালয়ে গেলেন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বালিকা কাহার?

> If love be folly the severe divine,
> Has felt that folly though be censures mine.
> —*Dryden*

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলীর পর চারি বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। চারি বৎসরে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, পাঠক মহাশয় তাহা অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের যুবক, ধীর, শান্ত, বিচক্ষণ, ধর্ম্মপরায়ণ। তাহার প্রশস্ত উদার মুখমণ্ডল ও উন্নত অবয়ব দেখিলেই তাহার গম্ভীর প্রকৃতি ও স্থির বুদ্ধি জানিতে পারা যায়।

নরেন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষের উগ্র যুবা, শ্রীশ অপেক্ষাও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উন্নতকায় ও তেজস্বী, কিন্তু অতিশয় উগ্র, ক্রোধপরবশ ও অসহিষ্ণু। নবকুমারের ঘৃণা সে সহ্য করিতে পারিত না, শ্রীশচন্দ্রের যথার্থ গুণের কথাও সে সহ্য করিতে পারিত না, সর্ব্বদা তাহার মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিত। এখন পর্য্যন্ত যে নরেন্দ্র এ সমস্ত সহ্য করিয়াছিল সে কেবল হেমলতার জন্য। মরুভূমিতে একমাত্র প্রস্রবণের ন্যায় হেমলতার অমৃতমাখা মুখখানি নরেন্দ্রের উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত ও শীতল করিত। হেমলতার জন্য নবকুমারের তিরস্কারও সহ্য করিত, আপন বিজাতীয় ক্রোধও সম্বরণ করিত।

হেমলতা ত্রয়োদশ বর্ষের বালিকা। আকাশে প্রথম ঊষাচিহ্নের ন্যায় প্রথম যৌবনচিহ্ন হেমলতার শরীরে প্রকাশ পাইতেছে। নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি লম্বমান হইয়া বক্ষঃস্থল ও গণ্ডস্থল আবরণ করিতেছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যৌবনারম্ভে অধিকতর উজ্জ্বল আভায় প্রকাশ পাইতেছে। সুন্দর আয়ত নয়ন দুইটী বাল্যকালসুলভ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ধীর ও শান্তভাব ধারণ করিতেছে, সমস্ত অবয়বও ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে।

সেই সুগঠিত, কুসুম-বিনিন্দিত শরীরে কি নব নব ভাব প্রবেশ করিয়াছে তাহা বর্ণনায় আমরা অক্ষম, তবে হেমলতার আচরণে যাহা লক্ষিত হয় তাহাই বলিতে পারি। হেম এখনও নরেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে বড় ভালবাসে, কিন্তু বালিকা অধোবদনে ধীরে ধীরে কথা কহে, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের মুখের দিকে নয়ন উঠাইয়া আবার মুখ অবনত করে। আহা! সেই আয়ত প্রশস্ত নয়ন দুইটী নরেন্দ্রের মুখের উপর চাহিতে বড় ভালবাসে, সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় নরেন্দ্রের কথা ভাবিতে বড় ভালবাসে। যখন সায়ংকালে নরেন্দ্র নৌকা আরোহণ করিয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া স্থির নয়নে তাহাই দেখে। যখন নৌকা অনেকদূর ভাসিয়া যায়, সন্ধ্যার অপরিস্ফুট আলোকে যতদূর দেখা যায়, বালিকা সেই গঙ্গার অনন্ত স্রোত নিরীক্ষণ করে। সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া যখন নরেন্দ্র “হেম” বলিয়া কথা কহিতে আইসে, তখন সেই আনন্দদায়ী কথায় হেমের হৃদয় ঈষৎ নৃত্য করিয়া উঠে। যখন দুই একদিনের জন্যও নরেন্দ্র ভিন্ন গ্রামে গমন করে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে হেম অন্যমনা হইয়া থাকে।

তথাপি হেমের মনের কথা কেহ জানে না। কপোতী যেরূপ আপন শাবকটীকে অতি যত্নে কুলায় লুকাইয়া রাখে, বালিকা এই নূতন ভাবনাটিকে অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ের হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিত। বালিকা নিজেও সে ভাবটী ঠিক বুঝিতে পারে না, না বুঝিয়াও সে প্রিয়ভাবটি সযত্নে জগতের নিকট হইতে সঙ্গোপন করিত।

বৃদ্ধ নবকুমার হেমকে এখনও বালিকা মনে করিতেন, সেই বালিকার উদার সরল মুখখানি দেখিলে কেনই বা না মনে করিবেন? বিবাহ দিলে একমাত্র কন্যা পরের হইবে, এই ভয়ে যতদিন পারিলেন বিবাহ না দিয়া রাখিলেন। শ্রীশচন্দ্রও হেমের হৃদয়ের পরিচয় পাইল না, কিরূপেই বা পাইবে? হেম তাহার সহিত সর্ব্বদাই অকপটে সরল হৃদয়ে নিঃসঙ্কোচে কথা কহিত। শ্রীশচন্দ্রের নিকট হেম প্রত্যহ কিছু কিছু পড়িতে শিখিত, পাঠ বলিয়া লইত, পড়া হইলে পড়া দিত, যত্নের সহিত শ্রীশচন্দ্রের উপদেশবাক্য গ্রহণ করিত। নরেন্দ্র পড়াইতে আসিলে বালিকা

মনস্থির করিতে পারিত না, নরেন্দ্র পড়া লইতে আসিলে বালিকা ভাল করিয়া বসিতে পারিত না, সমস্ত ভুলিয়া যাইত। সংসার-কার্য্যের তাবৎ ঘটনাই হেম শ্রীশচন্দ্রের নিকট বলিত, শ্রীশের উপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য করিত না। নরেন্দ্র উপদেশদাতা নহেন, নরেন্দ্র আসিলে অন্য কথা হইত, অথবা অনেক সময়ে কথা হইত না। সুতরাং শ্রীশ মনে করিত যে বালিকার হৃদয়ে যেটুকু প্রণয় বা স্নেহ আছে তাহা শ্রীশকেই অবলম্বন করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বিদায়

DEATH, only Death can break the lasting chain.

-Pope.

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে শ্রীশ ও নরেন্দ্র একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গায় বিচরণ করিতেছিল। নরেন্দ্র আপন বলপ্রকাশ অভিলাষে দাঁড়ীকে উঠাইয়া দিয়া দুই হস্তে দুইটী দাঁড় ধারণ করিয়া নৌকা চালাইতেছে, শ্রীশ স্থিরভাবে বসিয়া প্রকৃতির সায়ংকালীন শোভা দর্শন করিতেছিল। শ্রীশ ও নরেন্দ্রের মধ্যে কখনই যথার্থ প্রণয় ছিল না, অদ্য অল্প কথা লইয়া তর্ক হইতে লাগিল। নরেন্দ্রের হস্ত হইতে সহসা একটী দাঁড় স্খলিত হওয়াতে নরেন্দ্র পড়িয়া গেল, শ্রীশ উচ্চ হাস্য হাসিয়া বলিল,—যাহার কাজ তাহাকে দাও, বীরত্বে আবশ্যক নাই।

সেই সময় তীরবর্ত্তী অট্টালিকা হইতে হেমলতা দেখিতেছিল। হেমলতার সম্মুখে অপদস্থ হইয়া নরেন্দ্র মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিল, তাহার উপর শ্রীশের রহস্য কথা সহ্য হইল না, অতিশয় কঠোর উক্তিতে প্রত্যুত্তর করিল। ক্রমে বিবাদ বাড়িতে লাগিল, নরেন্দ্র অতি শীঘ্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অতিশয় অন্যায় কটুভাষায় শ্রীশকে তিরস্কার করিল। শ্রীশ এবার ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না; বলিল, তোমার মত অভদ্র লোকের সহিত কলহ করিলেও অপমান আছে!

এই অপমানসূচক কথায় নরেন্দ্রের ললাটের শিরা স্ফীত হইল, নয়ন প্রজ্বলিত হইল, সে শ্রীশকে প্রহার করিতে উঠিল। শ্রীশও উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্রুদ্ধ, জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র সহসা শ্রীশকে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। "বাবু জলে পড়িল, জলে পড়িল" বলিয়া মাল্লারা শব্দ করিয়া উঠিল, একজন ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল, এবং শ্রীশকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় নৌকায় উঠাইল।

সন্ধ্যার সময় নবকুমার নরেন্দ্রকে ডাকাইয়া যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—তুমি নাকি শ্রীশকে আজ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়াছিলে? মাল্লারা না থাকিলে সে আজ ডুবিয়া মরিত?

নির্ব্বোধ জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র উত্তর করিল, সে আমার সহিত কলহ করিতে আসে কেন?

নবকুমার। শ্রীশের সহিত কলহ করিতে তোমার লজ্জা হয় না? জান না তুমি কে আর শ্রীশ কে? তুমি কি শ্রীশের সমান?

নরেন্দ্র ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিল,—আমি শ্রীশের সমান নহি। আমি জমীদার বীরেন্দ্রসিংহের পুত্র, শ্রীশ পথের কাঙ্গালী, পরের অন্নে পালিত, তাহার সমান আমি কিরূপে?

নবকুমার এরূপ উত্তর কখন শুনেন নাই, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—কাহার সহিত কথা কহিতেছ, জান?

নরেন্দ্র। জানি, যে দরিদ্র সন্তান আমার পিতাকর্ত্তৃক পালিত হইয়া কালসর্পের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার বিষয়টী লইয়াছে, সেই নবকুমার বাবুর সহিত কথা কহিতেছি!

নবকুমার এক মুহূর্ত্তের জন্য নিরুত্তর হইলেন। কি বিষয় তাঁহার স্মরণ হইতেছিল, বলিতে পারি না। পরক্ষণই বলিলেন,—কৃতঘ্ন বালক! তোর পিতা নিজ দোষে জমীদারী হারাইয়াছে, অনাথকে এতদিন পালন করিলাম তাহার এই ফল! আজ শ্রীশকে ডুবাইয়াছিলি, কাল আমার গলায় ছুরি দিবি! তুই অদ্যই আমার বাড়ী হইতে দূর হ!

নরেন্দ্র। চলিলাম! কিন্তু যদি ইহজন্মে কি পরজন্মে বিচার থাকে; নবকুমার! তুমি তাহার ফলভোগ করিবে!

সায়ংকালে গঙ্গাতীরে হেমলতা একাকী বিচরণ করিতেছিল। যে যে ঘটনা হইয়াছিল,

হেমলতা সমস্ত শুনিয়াছিল। হেমলতাকে দেখিয়া নরেন্দ্র একবার দাঁড়াইল। দেখিল, হেম চক্ষুতে বস্ত্র দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতেছে।

নরেন্দ্রের ক্রোধ গেল, সে হেমের নিকট আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—হেম তুমি কাঁদিতেছ কেন?

কাতর স্বরে হেম উত্তর করিল,—নরেন্দ্র! নরেন্দ্র! আমার হাত ছাড়িয়া দাও। শ্রীশকে আমি দাদার ন্যায় মান্য করি, তাহাকে তুমি জলে ফেলিয়া দিয়াছিলে? আমার পিতাকে তুমি কালসর্প বলিয়া গালি দিলে? আমাদের তুমি ঘৃণা কর? নরেন্দ্র! আমার হাত ছাড়িয়া দাও।

শ্রীশকে জলে ফেলিয়া দিয়াও ক্রুদ্ধ নরেন্দ্রের সংজ্ঞা হয় নাই, নবকুমারের তিরস্কারেও তাহার সংজ্ঞা হয় নাই। কিন্তু এখন হেমের চক্ষুতে জল দেখিয়া ও বালিকার কয়েকটী কাতর কথা শুনিয়া নির্ব্বোধ যুবকের সংজ্ঞা হইল। ধীরে ধীরে হেমের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া, ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া নরেন কাতর স্বরে বলিল,—হেম, ক্ষমা কর, আমি অপরাধ করিয়াছি। শ্রীশ শান্ত, ধীর ও নির্দ্দোষ, তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়া আমি নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি। তোমার পিতাকে গালি দিয়া আমি চণ্ডালের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু হেম, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ভিন্ন স্নেহপূর্ব্বক কথা কহিবার জগতে আমার আর কেহ নাই। আজ আমি দেশত্যাগী হইতেছি, যাইবার পূর্ব্বে তোমার দুইটী স্নেহের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হেম, আমাকে ক্ষমা কর।

হেম ক্ষমা করিল, নরেন্দ্রকে গঙ্গাতীরে বসাইল, আপনি নিকটে বসিল, অশ্রুজল মুছিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। নরেন কেন দেশত্যাগী হইতেছে? পিতা রাগ করিয়া একটী কথা বলিয়াছেন বলিয়া নরেন কেন বীরনগর ত্যাগ করিবে? হেম নিজে পিতার নিকট অনুরোধ করিয়া পিতার ক্রোধ অপনোদন করিবে, নরেন তুমি বীরনগর ছাড়িয়া যাইও না।

কিন্তু হেমলতার এ অনুনয় ব্যর্থ হইল। উদ্ধত নরেন্দ্র হেমলতার অশ্রুজল দেখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে আজ ব্যথা লাগিয়াছে, তাহার শান্তি নাই। নরেন্দ্র বলিল,—হেমলতা, তোমার অনুরোধ বৃথা, বস্তুতঃ বীরনগরে আমার স্থান নাই। কয়েক মাস অবধি, কয়েক বৎসর অবধি, আমি এই পৈতৃক ভবনে যে যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না, সে যাতনা তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসার জন্য সহ্য করিয়াছি। যে দেশে আমার প্রাতঃস্মরণীয় পিতা রাজা ছিলেন, সে দেশে পরপালিত, ঘৃণিত পদদলিত হইয়া বাস করিয়াছি, সে কেবল তোমারই স্নেহের জন্য! হেম, তোমারই স্নেহের জন্য, তোমারই ভালবাসার জন্য, তোমারই আশায় এতদিন ছিলাম,—সে আশাও সাঙ্গ হইয়াছে!

আশা ছিল, তোমার পিতা আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন। আমার কথায় রাগ করিও না, লজ্জা করিও না, লজ্জা বা রাগ করিবার এখন সময় নাই। তোমার পিতার মন বুঝিয়াছি, বিনীত শ্রীশচন্দ্রকে তিনি স্নেহ করেন, আমি তাঁহার চক্ষের শূল। শ্রীশচন্দ্রকে তিনি কন্যাদান করিবেন, তাহা কি আমি চক্ষে দেখিব? তাহা দেখিয়া এই গৃহে বাস করিব? হেমলতা, হেমলতা, মনুষ্য সে আঘাত সহ্য করিতে পারে না। অথবা মুনি-ঋষির সেরূপ সহিষ্ণুতা আছে, হেমলতা, আমি ঋষি নহি। হেম, আমাকে বিদায় দাও, বীরনগরে আমার স্থান নাই।

ক্ষণেক পরে নরেন্দ্র পুনরায় ধীরস্বরে কহিতে লাগিল,—হেমলতা কাঁদিও না, সমস্ত জীবন কাঁদিবার সময় আছে, একবার আমার কথা শুন, আমি আজি জন্মের মত চলিলাম। কোথায় যাইতেছি, কি করিব, তাহা আমি জানি না। কিন্তু সে চিন্তা করি না, জগতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী রহিয়াছে, আমারও থাকিবার স্থান হইবে। কিন্তু এই জনাকীর্ণ জগতে আমি আজ হইতে একাকী। নানা দেশে নানা স্থানে অনেক লোক দেখিব, তাহাদের মধ্যে আমি বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, একাকী। জীবনে নরেন্দ্রকে আপনার ভাবিবে এরূপ লোক নাই, নরেন্দ্রের মৃত্যুকালে শোক করিবে এরূপ লোক নাই।

হেমলতার চক্ষুজলে বস্ত্র ও শরীর সিক্ত হইতেছিল, এক্ষণে আর থাকিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। নরেন্দ্রের চক্ষু উজ্জ্বল কিন্তু জলশূন্য, নরেন্দ্র আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—হেম ক্ষণেক স্থির হও, কাঁদিও না, আমি এক্ষণে কাঁদিতে পারি না। আমার মনে যে ভাব হইতেছে তাহা ক্রন্দনে ব্যক্ত হয় না। হেম, তুমি আমাকে ভালবাস, জগতের মধ্যে কেবল তুমি এক একবার নরেন্দ্রের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখ, নরেন্দ্রের বিষয়

সস্নেহচিত্তে ভাব। কিন্তু নরেন্দ্র তোমাকে কিরূপ গাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসে, অন্ধকার, সুখশূন্য, জীবনাকাশের মধ্যে একটী প্রণয়-তারার প্রতি কিরূপ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে, তাহা হেমলতা জান্ না, বালিকার হৃদয় সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু এ স্বপ্ন অদ্য সাঙ্গ হইল, জীবনের একমাত্র আলোক অদ্য নির্ব্বাণ হইল, অদ্য হইতে অন্ধকারে দেশে দেশে অরণ্যে অরণ্যে যাবজ্জীবন পরিভ্রমণ করিব।

নরেন্দ্র ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল,—হেমলতা, আমার আর একটী কথা আছে। বাল্যকালে আমরা দুইজনে এই মাধবীলতাটী পুতিয়াছিলাম, আমাদের ভালবাসার ন্যায় লতাটী বাড়িয়াছে, আজ আর ইহার থাকিবার আবশ্যক কি?

নরেন্দ্র সেই লতাটী উৎপাটন করিল ও তদ্দ্বারা একটী কঙ্কণ প্রস্তুত করিল। ধীরে ধীরে হেমলতাকে তাহা পরাইয়া দিয়া বলিল,—হেম, ফুল যত শীঘ্র শুকায়, লতা তত শীঘ্র শুকায় না, বোধ হয় তুমিও আমাকে কিছুদিন স্মরণ রাখিবে। যদি রাখ, যতদিন নরেন্দ্রের জন্য তোমার স্নেহ থাকিবে, ততদিন এই মাধবী-কঙ্কণটী রাখিও, যখন অভাগাকে ভুলিয়া যাইবে, নদীজলে শুষ্কলতা ফেলিয়া দিও!

শোকবিহ্বলা দগ্ধহৃদয়া হেমলতা বিস্মিত হইয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র স্থির! নরেন্দ্রের স্বর গম্ভীর ও অকম্পিত, নরেন্দ্রের চক্ষুতে জল নাই, কিন্তু অগ্নি জ্বলিতেছে! ধীরে ধীরে হেমের হাত ছাড়িয়া নরেন্দ্র চলিয়া গেল. সে অন্ধকার রজনীতে আর নরেন্দ্রকে দেখা গেল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সংসারে একাকিনী

I HEAR thee, view thee, gaze o'er all thy charm,
And round thy phantom glue my clasping arms.

—*Pope.*

সায়ংকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন গঙ্গাতীরে বসিয়া ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা অসংখ্য উর্ম্মিরাশির দিকে কি জন্য চাহিয়া রহিয়াছে? যতদূর অন্ধকারে দেখা যায়, বীচিমালা উঠিতেছে, পড়িতেছে. তাহার পর একটী ঈষৎ ধূসর রেখা, তাহার পর আর অন্ধকারে দেখা যায় না। দেখিতে দেখিতে হেমের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, তথাপি হেম কিছু দেখিতে পাইল না। রজনী গাঢ় হইয়া আসিল, ক্রমে আকাশে তারা ফুটিতে লাগিল, তথাপি হেমের দেখা শেষ হইল না।

রজনীতে জমীদারের বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইল। হেমলতার পক্ষে সে রজনী কি ভীষণ! বালিকা ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া গবাক্ষের নিকট আসিল, ধীরে ধীরে গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে দেখিল। দেখিল, তারা-পরিপূর্ণ অন্ধকার আকাশের নীচে বিশাল গঙ্গা অনন্ত-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই নৈশগঙ্গার দিকে দেখিতে দেখিতে কি হৃদয়বিদারক ভাব হেমলতার হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল! বাল্যকালের ক্রীড়া, কিশোর বয়সের প্রথম ভালবাসা, কত কথা, কত কৌতুক, একে একে জাগরিত হইয়া বালিকাহৃদয় দলিত করিতে লাগিল! এক একটী কথা মনে হয়, আর হৃদয়ে দুঃখ উথলিয়া উঠে, অবিরল অশ্রুধারায় চক্ষু ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়! আবার বালিকা শান্ত হইয়া গঙ্গার দিকে দেখে. আবার একটী কথা স্মরণ হয়, আবার শোকবিহ্বলা হইয়া অজস্র রোদন করে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিকা অবসন্ন হইল, হায়, সে ক্রন্দনের শেষ নাই, সে ক্রন্দন অবারিত, অশান্তিপ্রদ। রজনী এক প্রহর, দ্বিপ্রহর হইল, তথাপি বালিকা গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মানা, অথবা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

শোকের প্রথম বেগের উপশম হইল. কিন্তু শোকচিন্তাপরম্পরা নিবারণ হইবার নহে। গণ্ডস্থলে হাত দিয়া একাকিনী গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া হেমলতা ভাবিতে লাগিল। এক একবার হেমলতার নয়নে এক বিন্দু জল আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেটী গড়াইয়া পড়িল. আবার এক বিন্দু জল হইতে লাগিল। সে বিন্দুপরম্পরা শেষ হয় না।

রজনী শেষ হইল. পূর্ব্বাকাশে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতে লাগিল, মলিনা বালিকা তখনও গণ্ডে হস্ত দিয়া গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া আছে। তখনও চিন্তা-সূত্র শেষ হয় নাই. জীবনে কি শেষ

হইবে? রজনী প্রভাত হইল, প্রথম সূর্য্যালোকে হেমলতা চকিত হইয়া উঠিল। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, বদনমণ্ডল মলিন, শরীর অবসন্ন। ধীরে ধীরে বালিকা গবাক্ষপার্শ্ব হইতে উঠিল, শূন্যহৃদয়ে শূন্যগৃহে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সেই কি এক দিন? দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে বালিকা সেই গবাক্ষপার্শ্বে বসিত। যে গঙ্গাতীরে নরেন্দ্র বিদায় লইয়াছে, সেই গঙ্গার দিকে দেখিত। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, গভীর রজনীতে শূন্যহৃদয়া বালিকা সেই গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিত। কত ভাবিত, কত কথা মনে আসিত কে বলিবে? একদিন নরেন্দ্রনাথ হেমের কাণে কাণে কি বলিয়াছিল, একদিন ওপার হইতে হেমের জন্য কি আনিয়াছিল, একদিন গাছ হইতে আম্র পাড়িয়া হেম ও নরেন লুকাইয়া খাইয়াছিল, একদিন পিতাকে না বলিয়া হেম সন্ধ্যার সময় নরেনের সহিত নৌকায় চড়িয়াছিল, একদিন হেম নরেনকে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছিল, একদিন নরেন হেমের কেশে ফুল দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল; সহস্র সহস্র কথা একে একে নদীজলের হিল্লোলের ন্যায় হেমের হৃদয়ে উঠিত। দ্বিপ্রহর হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত, কখন কখন সন্ধ্যা হইতে গভীর রজনী পর্য্যন্ত হেমলতা ভাবিত, এক একবার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইত, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে বালিকা জল মুছিয়া ফেলিত। নবকুমারের বিপুল সংসারে সে দুঃখের ভাগিনী কে হইবে? হেম কাহাকেও মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলিত না। বালিকা সকলের নিকটেই সঙ্গোপন করিত, বাড়ীর লোকদিগের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া ভাবিত। কখন কখন শোকপারাবার উথলিলে গোপন করিতে পারিত না, নয়ন হইতে অবিরল বারিধারা বহিত।

ক্রমে বসন্তকালের পর গ্রীষ্মকাল আসিল; প্রকৃতি বঙ্গদেশকে সুস্বাদু ফল, সুদৃশ্য ফুল, সুকণ্ঠ পক্ষী দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। নবপল্লবিত বৃক্ষগণ সুমন্দ বায়ুতে মধুর গান করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সুন্দর পক্ষিগণ আনন্দে গান করিয়া নিজ নিজ কুলায় নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। মধ্যাহ্নে ছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া পক্ষিশাবক ও পক্ষিদম্পতির দিকে চাহিয়া বালিকা হস্তে গণ্ড স্থাপন করিয়া চিন্তা করিত; যতক্ষণ না সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া সেই বৃক্ষাবলী আবৃত করিত, হেমলতার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইত না। তাহার পর বর্ষা আসিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিল, বর্ষা শেষ হইল, কৃষকগণ আনন্দে ধান্য কাটিতে লাগিল, গ্রামে, গৃহে, গোলায়, ধান্য পরিপূর্ণ হইল। জগৎ আনন্দিত হইল, কিন্তু হেমের নিরানন্দ হৃদয় শান্ত হইল না। সুন্দর আশ্বিন মাসে পূজার রব উঠিল, চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল; আকাশ পরিষ্কার হইল, কিন্তু হেমলতার হৃদয়াকাশ তমসাচ্ছন্ন। আবার শীতকাল আসিল, আনন্দে কৃষকগণ আবার ধান কাটিল, আনন্দে সংসারী, গৃহস্থ, ধনী, কাঙ্গালী, সকলেই পৌষপার্ব্বণ করিল, হেমলতার পার্ব্বণের দিন কি ইহজন্মে আর আসিবে?

নবকুমারের বিপুল সংসার। কাহারও কিছু ক্ষোভ নাই, অভাব নাই, দুঃখ নাই। সেই সংসারে স্নেহপালিতা একমাত্র দুহিতা বিষণ্ণ। বিপুল সংসারেও হেমলতা একাকিনী!

সপ্তম পরিচ্ছেদ : জগতে একাকী

AND leaves the world to darkness and to me.

—*Gray.*

নরেন্দ্র অতিশয় সন্তরণপটু ছিলেন, সেই রাত্রিতে সন্তরণ দিয়া গঙ্গা পার হইয়া অপর পারে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত কেবল বালুকা, তাহার পর কেবল অনন্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছে। নরেন্দ্র সেই অন্ধকার নিশীথে সিক্তশরীর ও সিক্তবস্ত্রে সেই বালুকাক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র গঙ্গার অপরপার্শ্বের দিকে দৃষ্টি করিলেন। অন্ধকারেও বীরনগরের শ্বেত প্রাসাদ ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে, নরেন্দ্র সেই দিকে দেখিলেন, আবার চক্ষু ফিরাইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন, আবার স্থির হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। নিস্তব্ধ অন্ধকারে গঙ্গার কল্ কল্ শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, আর এক একবার দূরে শৃগালের কোলাহল শ্রুত হইতেছে। নরেন্দ্র গঙ্গা দেখিতেছিলেন না, নরেন্দ্র পেচক বা শৃগালের ধ্বনি শুনিতে-

ছিলেন না, তিনি নিঃশব্দে অন্ধকারে বিচরণ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর আবার বীরনগরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘোর অন্ধকারে আর সে গৃহ দেখা যায় না, নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ফিরিলেন। সম্মুখে যে পথ পাইলেন সেই দিকে চলিলেন।

কোথায় যাইতেছেন, নরেন্দ্র জানেন না। উপরে অসীম গগন, নীচে অসীম প্রান্তর, নরেন্দ্রের চিন্তাও অসীম ও অনন্ত, নরেন্দ্র যে দিক পাইলেন চলিলেন। পথপার্শ্বে বটবৃক্ষ হইতে নিশাচর পক্ষী নরেন্দ্রকে দেখিয়া কুলায় ছাড়িয়া পলায়ন করিল, নিশাবিহারী শৃগালপাল নরেন্দ্রকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, নরেন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

অনেক যাইয়া একটী গ্রামে আসিলেন। গ্রাম নিস্তব্ধ, সকলেই সুপ্ত। কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে, ও বৃক্ষপত্র মধ্যে কোন কোন স্থানে খদ্যোৎমালা ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিয়া গ্রাম্য কুকুর শব্দ করিতে লাগিল, দুই একজন গৃহস্থ ঘরের দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র কোন দিকে চাহিলেন না, পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ ঠিক জানেন না, স্থানে স্থানে বৃক্ষের নীচে ও ঝোপের ভিতর দিয়া যাইতে নরেন্দ্রের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল। নরেন্দ্র গ্রাহ্য করিলেন না, কতক্ষণে গ্রাম পার হইয়া আবার এক প্রান্তরে পড়িলেন।

আবার প্রান্তর পার হইলেন, অন্য গ্রামে পড়িলেন, আবার নিঃশব্দে গ্রাম পার হইয়া গেলেন। সেই রজনীযোগে কত গ্রাম অতিক্রম করিলেন, কতদূর যাইলেন, জানি না, নরেন্দ্রও বলিতে পারেন না।

সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দূর প্রান্তরে একটী আলোক দেখিতে পাইলেন, সেই আলোক অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রায় এক ক্রোশ যাইয়া আলোকের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন, কতকগুলি লোক একটী শব দাহ করিতেছে। নরেন্দ্রনাথ তখন একবার দাঁড়াইলেন, শব দেখিয়া একবার দাঁড়াইলেন, কাষ্ঠের অগ্নি এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার মধ্যে মধ্যে নিস্তেজ হইয়া যাইতেছিল। ঐরূপ স্তিমিত আলোকে নরেন্দ্রের আকৃতি ও বিকট মুখমণ্ডল এক একবার দেখা যাইতে লাগিল। যাহারা শব দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইল। শ্রান্ত পথিক মনে করিয়া নিকটে আসিতে বলিল, নরেন্দ্র নিকটে গেলেন না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র পরিচয় দিলেন না। শবদাহিগণ ক্ষণেক নরেন্দ্রের অচল দীর্ঘ অবয়ব ও বিকৃত মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শব ছাড়িয়া ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

প্রত্যূষে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা কলস লইয়া ঘাটে যাইতেছিল, এক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ, বিকৃত মনুষ্য মূর্ত্তি পথে শয়ান দেখিয়া সভয়ে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল।

প্রাতঃকাল হইল। গ্রামের লোক সমবেত হইয়া অপরিচিত ঘোর-নিদ্রাভিভূত পুরুষকে জাগাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "আমার নাম নাই, আমার নিবাস নাই. আমি জগতে একাকী।" নরেন্দ্র ঘোর উন্মত্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : রাজমহল

SELDOM alas! the power of logic reigns
With much sufficiency in royal brains.

—*Cowper.*

নরেন্দ্র সেই দিনেই পীড়াক্রান্ত হইলেন, গ্রামের একজন ভদ্রলোক তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক দিন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। অনেক দিন পর ক্রমে নরেন্দ্রনাথ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। যখন চলিবার শক্তি হইল, তখন সেই ভদ্রলোককে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া, নরেন্দ্র সে গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

প্রথম শোক ও নৈরাশ্যের বেগ তখন ক্ষান্ত হইয়াছে. নরেন্দ্র হেমলতাকে ফিরিয়া পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, সুবাদারের নিকট আপন বিষয় পাইবার আবেদন করিব। পৈতৃক জমীদারী আমার হইলে, স্বার্থপর নবকুমার অবশ্যই আমাকে কন্যাদান করিবেন।

এই উদ্দেশ্যে নরেন্দ্র সুবাদার সুজার রাজধানীতে পৌঁছিলেন। সম্রাট শাজিহানের পুত্র সুজা বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ঢাকা হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, এবং বিংশতিবৎসর সুশাসন দ্বারা বঙ্গদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দেশে প্রায় যুদ্ধ বা কোনরূপ উপদ্রব হয় নাই, প্রজাবর্গ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিয়াছিল। ইতিহাসে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুদ্ধে যেরূপ বিক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন, অন্য সময়ে সেইরূপ ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে, কি জমীদার, কি জায়গীরদার, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, কথিত আছে তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহার জন্য খেদ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উদারস্বভাব দুই একটী দোষে কলঙ্কিত ছিল, যুদ্ধের সময়ে তিনি যেরূপ সাহসী, অন্য সময়ে তিনি সেইরূপ বিলাসী। সুজা নিরতিশয় সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, এবং সর্ব্বদাই সুন্দরী রমণীমণ্ডলীতে পরিবৃত থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রধান রাজ্ঞী প্যারী বাণু বঙ্গদেশে রূপে গুণে ও চতুরতায় অদ্বিতীয়া বলিয়া খ্যাতা ছিলেন। তিনি বাকপটুতা ও সুমধুর কৌতুকে সর্ব্বদাই সুবাদারের হৃদয় প্রেমরসে সিক্ত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু প্যারী বাণুও একাকী সুজার প্রণয়-ভাগিনী ছিলেন না, শত শত বেগম উদ্যানস্থিত পুষ্পের ন্যায় সুজার রাজমন্দির আলো করিয়া থাকিত। তাহাদের রূপে বিমোহিত হইয়া সুজা রাজকার্য্য বিস্মৃত হইতেন, কখন কখন দুই তিন দিন ক্রমান্বয়ে মদ্যপান ও আমোদে অতিবাহিত করিতেন।

নরেন্দ্রনাথ সুবাদারের নিকট আবেদন করিতে যাইলেন। এরূপ সুবাদারের নিকট উচিত বিচার প্রত্যাশা সম্ভব নহে। গঙ্গাতীরে সুন্দর রাজমহল নগরী এখনও দেখিতে মনোহর, কিন্তু যখন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন রাজমহলের শোভা অতুলনীয় ছিল। সুবাদারের উচ্চ প্রাসাদ রাজবাটী, ওমরাহ ও জায়গীরদারদিগের সুদৃশ্য হর্ম্ম্যাবলী এবং বঙ্গদেশের সমস্ত ধনাঢ্য লোকের সমাগমে রাজমহল যথার্থই রাজপুরী বলিয়া বোধ হইত। স্বয়ং গঙ্গা সহস্র ধনাঢ্য বণিকের সহস্র পোত বক্ষে ধারণ করিয়া নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিত। প্রশস্ত রাজপথে যুদ্ধবিলাসী, গর্ব্বিত ওমরাহ ও মুসলমান জমীদারগণ সর্ব্বদাই অশ্ব, হস্তী, অথবা শিবিকায় গমন করিত। হিন্দু বণিক ব্যবসায়ী লোক শান্তভাবে নগরের এক পার্শ্বে বাস করিত ও নিজ নিজ ব্যবসায়ে রত থাকিত।

এ সমস্ত দেখিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ রাজমহলে যান নাই, এ সমস্ত দেখিয়া তিনি শান্ত হইলেন না। কিরূপে সুবাদারের নিকট আবেদন জানাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ধনাঢ্য হিন্দু বণিক নরেন্দ্রের পিতাকে চিনিতেন, কিন্তু নরেন্দ্র এক্ষণে দরিদ্র, দরিদ্রের জন্য কে চেষ্টা করে? নরেন্দ্র যাহার নিকট যাইলেন তিনিই বলিলেন,—হাঁ বাপু, তোমার পিতা মহাশয় লোক ছিলেন; তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম, কয়েকদিন এই স্থানে অবস্থিতি কর, পরে দেখা যাইবে, ইত্যাদি। নরেন্দ্র বিফলপ্রযত্ন হইয়া রহিলেন।

অনেক দিন পরে ঘটনাক্রমে এর্ফানখাঁ নামক কোন মোগল জায়গীরদারের সহিত নরেন্দ্রের পরিচয় হইল। এর্ফানখাঁ বীরেন্দ্রের পরম বন্ধু এবং যথার্থ মহাশয় লোক ছিলেন, তিনি সাদরে নরেন্দ্রকে আহ্বান করিয়া সত্বর তাঁহার জন্য সুবাদারের নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তথাপি দরিদ্রের আবেদন বিচারাসন পর্য্যন্ত যায় না, অনেক যত্নে, অনেক দিন পর, এর্ফানখাঁ বহু অর্থে সুবাদার ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের মন পরিতুষ্ট করিয়া এক দিন নরেন্দ্রনাথের আবেদন সুজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

সুন্দর রৌপ্য ও স্বর্ণখচিত সিংহাসনে সুবাদার বসিয়াছেন, রাজবেশ সে সুন্দর অবয়বে বড় সুন্দর শোভা পাইয়াছে। চারিদিকে অমাত্য ও বড় বড় আফগান ও মোগল যোদ্ধৃগণ শির নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও বহুবিধ লোকে বিস্তীর্ণ বিচারপ্রাসাদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সারি সারি স্তম্ভের উপর চারু খচিত ছাদ শোভা পাইতেছে ও সিংহাসনের দুই দিকে পরিচারক চামর দুলাইতেছে। প্রাসাদের বাহিরে যতদূর দেখা যায়, লোকে সমাকীর্ণ; সুবাদার সর্ব্বদা দেখা দেন না, সেই জন্য অদ্য সকলেই দেখিতে আসিয়াছে।

সুবাদারের সম্মুখে বৃদ্ধ এর্ফানখাঁ উঠিয়া আবেদন করিলেন,—জেঁহাপনা! এ দাস প্রায়

বিংশতি বৎসর সম্রাটের কর্ম্ম করিয়াছে; সুবাদারের কার্য্যে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, ললাট খড়্গে ক্ষত হইয়াছে। গোলামের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে।

সুবাদার বলিলেন,—এর্ফান, তুমি আমাদের প্রধান অনুচর ও অতিশয় প্রিয়পাত্র, তোমার এমন কি যাচ্ঞা আছে যাহা আমাদের অদেয়?

এর্ফান ভূমি পর্য্যন্ত শির নোয়াইয়া পুনরায় বলিলেন,—জেঁহাপনা! বঙ্গদেশবাসিগণ অতি দুর্ব্বল; তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে যে পরাক্রান্ত জমীদারগণ আমাদিগের যুদ্ধে সাহায্য করে, সে সুবাদারের প্রীতিভাজন সন্দেহ নাই। জমীদার বীরেন্দ্রসিংহ একজন সেইরূপ লোক ছিলেন।

সুবাদার বলিলেন,—হাঁ, আমি সেই হিন্দুর নাম শুনিয়াছি, পাঠানদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধে সে সাহায্য করিয়াছিল।

এর্ফান পুনরায় তসলীম করিয়া বলিল,—জেঁহাপনা! যাহা কহিলেন যথার্থ। এই দাস যখন উড়িষ্যার যুদ্ধে গিয়াছিল, স্বচক্ষে বীরেন্দ্রের যুদ্ধকৌশল ও রাজভক্তি দেখিয়াছিল। এই রাজসভায় অনেক পরাক্রান্ত পাঠান ও মোগল যোদ্ধা আছেন, কিন্তু বীরেন্দ্র অপেক্ষা অধিক সাহসী পুরুষ এ গোলাম এ পর্য্যন্ত দেখে নাই।

সভাস্থদিগের কোষে অসি ঝনঝনার শব্দ হইল, মুসলমানদিগের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সুজা সহাস্যবদনে বলিলেন,—এর্ফান, তুমি কাফেরের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছ, কিন্তু অযথার্থ নহে, সে হিন্দু যথার্থ সাহসী ছিল শুনিয়াছি। এক্ষণে তাহার জন্য কি বলিবার আছে বল, তোমার উপরোধে আমি তাহাকে যে কোন পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।

এর্ফান গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—যিনি সুবাদারের উপর সুবাদার, পাদশাহের উপর পাদশাহ, তিনিই কেবল এক্ষণে বীরেন্দ্রকে পুরস্কার বা শাস্তি নিতে পারেন। আমি তাঁহার অনাথ বালকের জন্য আবেদন করিতেছি। বালক এক্ষণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কানঙ্গু মহাশয়ের যোগে এক শঠ তাঁহার পৈতৃক জমীদারী কাড়িয়া লইয়াছে।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সুবাদার কানঙ্গুকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সময়ে সমস্ত খাজনা ও জমীদারী বিষয় কানঙ্গু মহাশয়ের হস্তে থাকিত, এমন কি, বঙ্গদেশের সুবাদার যে সমস্ত কাগজাৎ দিল্লীতে পাঠাইতেন, তাহাও কানঙ্গুর সহি না হইলে গ্রাহ্য হইত না। কানঙ্গু মহাশয় নবকুমারের অর্থভোগী, বিনীতভাবে বলিলেন,—সুবাদার মহাশয়ের আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য; বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর খাজনা আদায় না হওয়ায় জেঁহাপনা সেই জমীদারী নবকুমারকে দিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

সুজাকে কোন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন ছিল না, কানঙ্গু মহাশয় যাহা বুঝাইলেন, সুবাদার তাহাই বুঝিলেন; এর্ফানের আবেদন ফাঁসিয়া গেল। এর্ফান রোষে নতশির হইয়া রহিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে নরেন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া কানঙ্গু মহাশয়ের দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছিলেন।

সুবাদার শেষে বলিলেন,—এর্ফানখাঁ! সূর্য্য যে রশ্মি জগতে দান করেন তাহা ফিরাইয়া লন না, জমীদারী স্বয়ং দান করিয়া ফিরাইয়া লওয়া রাজধর্ম্ম নহে। কিন্তু বীরেন্দ্রের বালক তেজস্বী দেখিতেছি, বীরেন্দ্রের মত যুদ্ধব্যবসায় শিক্ষা করুক, অবশ্যই উৎকৃষ্ট পুরস্কার ও অন্য জমীদারী এনাম পাইবে।

সভাস্থ সকলে “কেরামৎ” “কেরামৎ” বলিয়া সুবাদারের কথার প্রশংসা করিল; এর্ফান অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া সেই দিন হইতেই নরেন্দ্রকে নিকটে রাখিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখাইতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ কাশীর যুদ্ধ

> THE diadem with mighty projects lined,
> To catch renown by ruining mankind,
> Is worth, with all its gold and glittering store
> Just what the toy will sell for and no more.
>
> —*Cowper.*

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তিন বৎসর পর ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে এক দিন ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রানগরে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আগ্রার রাজদ্বার লোকে সমাকীর্ণ, সমস্ত নগরবাসী ভীত ও শশব্যস্ত, বাজার দোকান সমস্ত বন্ধ, ওমরাহ, মনসবদার, রাজপুত, মোগল, পাঠান, সকলেই অস্থিরচিত্ত ও চিন্তাবিহ্বল। কার্য্যকর্ম্ম বন্ধ হইল, সকলেই ভীত ও উৎসুক। সম্রাট শাজিহান কয়েক দিন অবধি পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন; আজি সংবাদ রটনা হইল যে, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

মিথ্যা সংবাদে শীঘ্রই সমুদায় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইল। বঙ্গদেশ হইতে সুজা, দক্ষিণ হইতে আরংজীব, গুজরাট হইতে মোরদ, রণসজ্জায় বহিস্কৃত হইলেন, পিতৃবিয়োগে সকলেই সিংহাসনারোহণে লোলুপ হইলেন। পরে যখন প্রকৃত সংবাদ জানা গেল যে, শাজিহান জীবিত আছেন. তখনও রাজপুত্রগণ রণোদ্যম হইতে নিরস্ত হইলেন না। তাহার এক কারণ এই যে, ইতিপূর্বে কয়েক মাস হইতে সম্রাট পীড়াবশতঃ রাজকার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা এই অবসরে সমস্ত রাজকার্য্য আপনিই করিতে লাগিলেন, কোন বিষয়ে পিতার মত লইতেন না, জন্মের মত পিতাকে রুদ্ধ রাখিয়া আপনি রাজকার্য্য করিবেন এইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শঙ্কা করিয়াছিল যে, বিষপ্রয়োগ দ্বারা যুবরাজ আপন সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিবেন। দারার ভ্রাতৃগণ পিতার শাসনে সম্মত ছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতার শাসনে সম্মত ছিলেন না, এই জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইল।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দের শেষে বারাণসীর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধক্ষেত্র শীতকালের সায়ংকালেব আলোকে ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও মনুষ্যের শবরাশিতে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও মৃতদেহ সমুদয় পড়িয়া যেন আকাশের নক্ষত্রের দিকে স্থির দৃষ্টি করিতেছে; কোথাও মুমূর্ষু অবস্থায় অঙ্গহীন সিপাহী ক্ষীণস্বরে "জল জল" করিয়া চীৎকার করিতেছে; কোথাও দুই এক জন সেনা নিজ নিজ ভ্রাতা বা বন্ধুর অনুসন্ধান করিতেছে; হায়! তাহাদের এ জগতে আর ফিরিয়া পাইবে না। দুই এক জন তস্কর বহুমূল্য বস্ত্র বা স্বর্ণালঙ্কার বা অস্ত্রাদির অন্বেষণে ফিরিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, এবং শৃগালগণ মহাকোলাহলে রব করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আসিতেছে। দুই এক স্থানে অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে আলোকচ্ছটায় ক্ষেত্র ও শবরাশি উজ্জ্বল করিতেছে। দূরে গঙ্গার পবিত্র জল কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে; নদীর বিশাল বক্ষঃস্থল শান্ত, বিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল; ক্ষুদ্র মানবের সুখ বা দুঃখ জয় বা পরাজয়ে বিচলিত হয় না।

ক্রমে রজনী গভীর হইল, চন্দ্র উদিত হইল, তাহার নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক কিরণে মানবের কি কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল! প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃগণ পরস্পরের শোণিতপানে লোলুপ হইয়া এই যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছে; শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুকও স্বজাতির উপর হিংসা করে না! সেই চন্দ্রালোকে দুই জন রাজপুত কোন বন্ধুর অনুসন্ধানে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। এক স্থানে কতকগুলি শব পড়িয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে যেন বেদনা-সূচক স্বর বহির্গত হইল। রাজপুত সেনাগণ দেখিল একজন যুবক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া শব্দ করিতেছে। হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছে, ও সেই ক্ষতস্থান হইতে অনবরত শোণিত নির্গত হওয়ায় প্রায় অচেতন হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর আশু সম্ভাবনা নাই।

যুবকের আকৃতি দেখিয়া রাজপুত দুই জন বিস্মিত হইল। বয়ঃক্রম অতিশয় অল্প, বোধ হয় অষ্টাদশ বৎসরের অধিক নহে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল, সেরূপ সৌন্দর্য্য

ও উজ্জ্বলতা স্ত্রীলোকের সম্ভবে, পুরুষের প্রায় সম্ভবে না। চিন্তা অথবা বয়সের একটী রেখাও এ পর্য্যন্ত ললাটে অঙ্কিত হয় নাই, ললাট পরিষ্কার ও উন্নত। সমস্ত বদনমণ্ডল দেখিলে যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয় না, বালক বলিয়া বোধ হয়, বাল্যাবস্থাতেই হতভাগা স্বজন ও স্বদেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া আজি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে!

রাজপুতসেনা দুই জনেরই যুদ্ধব্যবসায়ে হৃদয়ের স্বাভাবিক দয়া অনেক হ্রাস হইয়াছে, বালককে দেখিয়া তাহারা হাস্য করিয়া এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিল।

প্রথম সেনা। এ বালক! এই বয়সেই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে?

দ্বিতীয় সেনা। দেখিতেছি সুজার পক্ষের সেনা। বালক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহে, আমাদের রেখা পর্য্যন্ত আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। এ কোন্ দেশের লোক?

প্রথম সেনা। জানি না।

দ্বিতীয় সেনা। আমার বোধ হয় বঙ্গদেশের হিন্দু, মোগল বা পাঠান হইলে এরূপ বেশ হইত না।

প্রথম সেনা। হা হা হা! সুজা এই বাঙ্গালী শিশু লইয়া মহারাজ জয়সিংহ ও সুলাইমানের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন? পুনরায় যখন আসিবেন, আমরা যুদ্ধে না আসিয়া আমাদের বালকদিগকে পাঠাইয়া দিব। চল এখানে আর কেন, আমাদের বন্ধুর অন্বেষণ করি।

দ্বিতীয় সেনা। এ লোকটা জীবিত আছে, একটু সাহায্য করিলে বোধ হয় বাঁচিবে, ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?

প্রথম সেনা। শত্রুকে বাঁচাইতে গেলে আমাদের সময় থাকে না, আমি এক দণ্ডে ইহার দফা শেষ করিতেছি। এই বলিয়া সেনা অসি নিষ্কোষিত করিল।

দ্বিতীয় সেনা তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল,—না, না, মুমূর্ষু লোকের প্রাণনাশ করিতে আমাদের প্রভু মহারাজা যশোবন্তসিংহ নিষেধ করিয়াছিলেন, তুমি যাও, আমি ইহাকে বাঁচাইব।

প্রথম সেনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, দ্বিতীয় সেনা জলসেচন দ্বারা মুমূর্ষু যুবাকে জীবিত করিল। যুবা নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিল চারিদিকে শব পড়িয়া রহিয়াছে, আকাশে চন্দ্র উদয় হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধ। যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—বন্ধু, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তোমার নাম কি? কোন্ পক্ষের জয় হইয়াছে, সুজা কোথায় গিয়াছেন?

সেনা বলিল,—আমার নাম গজপতিসিংহ, আমি মহারাজা যশোবন্তসিংহের এক জন সেনানী, এক্ষণে মহারাজা জয়সিংহের আজ্ঞাধীন। তোমার সুজা অতিশয় বিলাসপ্রিয়, এতক্ষণ বেগমদিগের বিচ্ছেদে পীড়িত হইয়া ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে বঙ্গদেশাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন; হা—হা!

যুবক অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া ভূমির দিকে অবলোকন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর বলিল,—তুমি আমার শত্রু, কিন্তু আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আমাকে আর একটু সাহায্য কর। একটু জল দাও, আর দুই এক দিন থাকিবার স্থান দাও। আমার দেশ অনেক দূর, এখানে আমার একজনও বন্ধু নাই, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জল দাও, জল দাও।

নরেন্দ্রের বালকাকৃতি দেখিয়া গজপতিসিংহের দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল, বালকের কাতরোক্তি শুনিয়া একটু মমতা হইল। শুশ্রূষা করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ : রাজা জয়সিংহের শিবির

> WHERE judgment sits clear-sighted and surveys
> The chain of reason with unerring gaze.
>
> —*Thompson.*

একটী প্রকাণ্ড শিবিরের অভ্যন্তরে দুইজন মহাবীর বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। একজন রাজপুত রাজা জয়সিংহ, অপর জন তাঁহার পরম সুহৃদ দেবেরখাঁ, জাতিতে পাঠান।

রাজার বয়ঃক্রম অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনও মুখমণ্ডল যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ, শরীর যৌবনের বলে বলিষ্ঠ। সে সময়ে মোগল সম্রাটদিগের প্রধান সেনাপতি অধিকাংশই রাজপুত

ছিলেন। রাজপুতদিগের বাহুবীর্য্যেই মোগলগণ সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদয় ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। যেখানে ঘোর বিপদ বা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত, সেই স্থানেই রাজপুত সেনাপতি প্রেরিত হইতেন, ও প্রায়ই বিজয় লাভ করিয়া আসিতেন। আখ্যায়িকা বিবৃতকালে রাজপুতানার রাজাদিগের মধ্যে দুইজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, রাজা জয়সিংহ ও রাজা যশোবন্তসিংহ। সম্রাট শাজিহান উভয়কেই বিশ্বাস করিতেন ও বিপত্তির সময় ইঁহাদিগকেই রণে প্রেরণ করিতেন। সে সময়ে কি পাঠান, কি মোগল, কোন সেনাপতিরই জয়সিংহের ন্যায় প্রতাপ, ক্ষমতা বা রণকৌশল ছিল না। তাৎকালিক একজন বিচক্ষণ ও প্রসিদ্ধ ফরাসী ভারতবর্ষে অনেকদিন ছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, জয়সিংহের মত কার্য্যদক্ষ লোক সে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে বোধ হয় আর কেহই ছিলেন না। শাজিহান ও যুবরাজ দারা যখন সুলাইমান শেখকে সুলতান সুজার বিরুদ্ধে পাঠান, সঙ্গে জয়সিংহকে তাঁহার রাজপুত সৈন্যের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। বারাণসীর যুদ্ধে সুজা পরাস্ত হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন।

শিবিরে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে, বাহিরে প্রহরী, তাহার চারিদিকে অন্য শিবির। সে সময়ে রাজার শিবিরের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না, কেবল রাজা ও তাঁহার সুহৃদ দেবেরখাঁ গুপ্ত কথা কহিতেছিলেন।

দেবেরখাঁ বলিলেন,—যথার্থই জয়সিংহ নাম পাইয়াছিলেন, আপনি যে স্থানে, জয় সে স্থানে।

রাজা বলিলেন,—অদ্যকার যুদ্ধের কথা বলিতেছেন? যুদ্ধ কোথায়? বঙ্গদেশের সেনার সহিত যুদ্ধ কি যুদ্ধ? সুলতান সুজাও বঙ্গদেশে থাকিয়া বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ!

দেবের। কিন্তু অদ্য যুদ্ধের সময় সুলতান সুজা কি সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করেন নাই?

রাজা। তাহা স্বীকার করি। যুদ্ধের সময় তিনি সাহসের পরিচয় দেন, কার্য্যের সময় বিলাস বিস্মৃত হয়েন। কিন্তু কেবল সাহসে কি হয়, রণকৌশল জানেন না।

দেবের। সম্রাট-পুত্রদিগের মধ্যে কাহার অধিক রণকৌশল আছে? আপনি আরংজীবকে কি মনে করেন?

রাজা। উঃ, তাঁহার নাম করিবেন না, সেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আমি দেখি নাই, যেরূপ বীরত্ব সেইরূপ কৌশল। শুনিয়াছি তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য রাজা যশোবন্তসিংহ নর্ম্মদাতীরে যাইতেছেন। যশোবন্তসিংহ রাণার জামাতাও সেইরূপ যোদ্ধা ও বিক্রমশালী; কিন্তু আরংজীবের সহিত যুদ্ধে কি হয় জানি না। যশোবন্তের সাহস আছে, কৌশল নাই। আমার বোধ হয় এই ভ্রাতৃবিরোধে অবশেষে আরংজীবের জয় হইবে।

দেবের। আপনি দারাকে পরিত্যাগ করিবেন?

রাজা। ইচ্ছামত কখনই নহে, কিন্তু যুদ্ধে যদি অবশেষে আরংজীবের জয় হয় তাহা হইলে তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা দিল্লীর সম্রাটের অধীন, যিনি যখন সম্রাট হইবেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা রাজবিদ্রোহিতা।

দেবের। ভাল, অদ্য আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সুজাকে বন্দী করিতে পারিতেন। সুজা যখন পলায়ন করিলেন আপনি অনায়াসে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলে যুবরাজ দারাও অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। আপনি সেরূপ না করিলেন কেন?

রাজা। অদ্য সুজাকে পলাইতে দিয়াছি তাহার কারণ আছে। ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ, যদি সুজাকে দারার সম্মুখে লইয়া যাইতাম, বোধ হয় যুবরাজ তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতেন, অথবা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিতেন। তাহা কি বিধেয়? বিশেষ আমি এই যুদ্ধে আসিবার সময় সম্রাট শাজিহান যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এরূপ চেষ্টা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সুজার হানি করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সম্রাটের এই কথা অনুসারে আমি সন্ধি স্থাপনের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, সুজাও একপ্রকার সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুলাইমান যুবা পুরুষ, আপন বিক্রম দেখাইবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া সহসা গঙ্গা পার হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এরূপ সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া বলিল,—মহারাজ, সেনানী গজপতিসিংহ একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। রাজা আসিতে আজ্ঞা দিলেন।

ক্ষণেক পর গজপতিসিংহ আসিয়া বলিলেন,—মহারাজ! বঙ্গদেশের একজন হিন্দু বন্দী হইয়াছে, সে আহত। তাহার নিকট হইতে বঙ্গদেশীয় অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।

রাজা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আপাততঃ আমার শিবিরে থাকিতে দাও।

নরেন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল।

পরে জয়সিংহ গজপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—গজপতি, অদ্য তুমি যুদ্ধে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছ, সেজন্য তোমাকে ও তোমার প্রভু যশোবন্তসিংহকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি।

এক্ষণে কি কথা বলিবার জন্য যশোবন্ত তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন নিবেদন কর।

উভয়ে গুপ্ত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : জেলেখা

My heart is sair, I dare na tell
My heart is sair for somebody,

I could range the world around
For the sake o' somebody.

—*Burns.*

তাহার পর কয়েকদিন নরেন্দ্রনাথ জ্বরে অচেতন অবস্থায় থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা হইত, বোধ হইত যেন তরীতে অতি দ্রুতবেগে গঙ্গার উপর দিয়া যাইতেছেন, পুনরায় কি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন? বোধ হইত যেন এক অল্পবয়স্কা রমণী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে, আবার কি হেমলতাকে ফিরিয়া পাইলেন? রোগীর চক্ষে জল আসিল।

কয়েক দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। রোগের ক্রমশঃ উপশম হইল। যখন সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল, দেখিলেন এক অপূর্ব্ব ঘরে একটী দীপ জ্বলিতেছে, তিনি একটী শয্যায় শুইয়া রহিয়াছেন, এরূপ সুরম্য ঘর তিনি কখনও দেখেন নাই। সমস্ত ঘর সুন্দর শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত! রৌপ্যের শামাদানে দীপ জ্বলিতেছে ও সমস্ত গৃহ সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে। তাঁহার পালঙ্ক দ্বিরদরদ-খচিত, সুবর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা বিভূষিত। সম্মুখে একটী রৌপ্য আধারের উপর এক রৌপ্য পাত্রে জল রহিয়াছে, নীচে শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী বিচিত্র গালিচার উপর এক যবনকন্যা ও এক খোজা বসিয়া অতি মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছে। যবনকন্যা যুবতী, তন্বঙ্গী এবং সুন্দরী। মুখে সৌন্দর্য্য ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, নয়ন হইতে সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে, ললিত বাহুলতা ও কমনীয় দেহলতায় সৌন্দর্য্য প্রবাহিত হইতেছে। হেমলতার অবয়ব নরেন্দ্রের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কিন্তু এরূপ উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নরেন্দ্র কোথাও দেখেন নাই, এরূপ স্বর্গীয় পরীর ন্যায় অবয়ব কখন দেখেন নাই। যবনকন্যার দৃষ্টিতে ও অঙ্গভঙ্গিতে যেন তেজ ও দর্পের পরিচয় দিতেছে। যবনকন্যা এক একবার পীড়িত হিন্দুর দিকে চাহিতেছে, এক একবার বিষণ্ণভাবে ভূমির দিকে চাহিতেছে, আবার মৃদুস্বরে খোজার সহিত কথা কহিতেছে। খোজা কৃষ্ণবর্ণ ও বলবান। তাহাদের কি কথা হইতেছিল নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল দুই একটা কথা শুনিতে পাইলেন।

যবনকন্যা বলিতেছিল,—মসরুর, কেন এ হিন্দুর ও আমার সর্ব্বনাশ করিবে? নির্দ্দোষী নিরাশ্রয় ব্যক্তির জীবননাশে কি তোমার আমোদ?

মসরুর। জেলেখা, তবে তুমি কাফেরকে এস্থলে আনিলে কেন?

জেলেখা। সে আমার দোষ; ইঁহার কি দোষ? ইনিত নির্দ্দোষী।

মসরুর। কেন, এত মায়া কিসের জন্য? এ কাফের কি তোমার আসেক?

জেলেখা যোদ্ধৃকন্যা; সহসা তাহার বদনে পৈতৃক ক্রোধ ও তেজের আবির্ভাব হইল; রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া যাইল। সক্রোধে বলিল,—মসরুর! যদি তুমি স্ত্রীলোক হইতে তাহা হইলে মায়ার কাতরতা বুঝিতে. যদি পুরুষ হইতে তথাপি হৃদয়ে দয়া থাকিত।

তোমার পুরুষত্বের সহিত দয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, এক্ষণে এই প্রস্তর-শাণের অপেক্ষা তোমার হৃদয় কঠিন ও দুর্ভেদ্য।

মসরুর হাসিয়া বলিল,—ঐ দেখ কাফের উঠিয়াছে, আমি চলিলাম। মসরুর বাহিরে চলিয়া যাইল।

জেলেখাও উঠিল, শয্যার দিকে আসিবার জন্যই উঠিল, কিন্তু ক্ষণেক স্থির হইয়া ভূমির দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে জেলেখা ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিল। ক্ষত প্রায় আরাম হইয়াছে, জ্বরও গিয়াছে, কেবল শরীর দুর্ব্বল। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জেলেখার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, শরীরের রক্ত বেগে ললাট, চক্ষু ও গণ্ডস্থল আরক্ত করিল।

পূর্ব্বেই এই গৃহ ও শয্যা দেখিয়া নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, কোথায় আসিয়াছেন, কে তাঁহাকে আনিল, কে সেবা করিতেছে? জেলেখা ও মসরুরের কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এখন জেলেখার আচরণ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি কোথায় আছি,—এই কি বঙ্গদেশ,—আপনি কে,—আপনার নাম কি?

নিস্তব্ধ নিশাযোগে সহসা বজ্রধ্বনি হইলে লোকে যেরূপ চমকিত হয়, জেলেখা সহসা নরেন্দ্রের এই প্রথম কথা শুনিয়া সেইরূপ চমকিত হইল। কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়ে অঙ্গুলি স্থাপন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন,—আমি অসহায় ও নিরাশ্রয়! আমি কোথায় আছি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

জেলেখা আবার ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া সহসা মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন তিনি জেলেখার উজ্জ্বল চক্ষুতে জল দেখিতে পাইলেন। কিছু বুঝিতে পারিলেন না, চিন্তা করিতে করিতে আবার নিদ্রিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল?

Ye high exalted, virtuous dames,
Tied up in godly laces,
Before ye give poor frailty names,
Suppose a change o' cases.

—*Burns.*

কয়েক দিবসের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু শারীরিক আরোগ্য হইলে কি হইবে, অন্তঃকরণ চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সেই ঘরে কেবল মসরুর বা জেলেখা ভিন্ন কেহ আইসে না, কেহই কথা কহে না, মসরুরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া চলিয়া যায়, জেলেখা ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করে। অথচ স্পষ্ট বোধ হয়, জেলেখা তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী, তাঁহার বিপদে বিপদাপন্না। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন? সুলতান সুজা নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতেন, সুলতানই কি স্বয়ং আজ্ঞা দিয়া নরেন্দ্রের পীড়ার সময় রাজমহলে আনাইয়াছেন? সম্ভব বটে: রাজ-অট্টালিকা না হইলে এরূপ বহুমূল্য দ্রব্য কোথায় সম্ভবে? কিন্তু সুজা কাশীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় হইয়া শত্রুহস্তে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অল্প অল্প স্মরণ ছিল! শত্রুরা কি অবশেষে তাঁহাকে জল্লাদহস্তে দিবার জন্য এইরূপ শুশ্রূষা করিতেছিলেন? নরেন্দ্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

রজনী দ্বিপ্রহর, নরেন্দ্রনাথ একখানি দ্বিরদ-রদ-খচিত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে একটী দীপ জ্বলিতেছে। নরেন্দ্র হস্তে গণ্ড স্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

যখন চিন্তা-রজ্জু ছিন্ন হইল, একবার বদনমণ্ডল উঠাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন? জেলেখা নিঃশব্দে সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। জেলেখার মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয়

পাণ্ডুবর্ণ, কেশপাশ আলুলায়িত, বদন বিষণ্ন, নয়নদ্বয় জলে ছলছল্ করিতেছে। নরেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—রমণি! আপনি কে জানি না, আপনার কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

জেলেখা উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে এক বিন্দু চক্ষের জল মোচন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন,—আপনাকে দেখিয়া বোধ হয়, কোন বিপদ বা ভয় সন্নিকট। প্রকাশ করিয়া বলুন, যদি উদ্ধারের উপায় থাকে আমি চেষ্টা করিব।

জেলেখা তথাপি নীরব। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। নিশাযোগে এই সহসা সাক্ষাতের অর্থ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন কোন ঘোর সংকট সন্নিকট। তিনি হস্তে গণ্ড স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্যমনস্ক হইয়া নানা বিপদের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা গৃহের দীপ নির্ব্বাণ হইল, সেই ঘোর অন্ধকারে একজন খোজা আসিয়া নরেন্দ্রকে তাহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিল। নরেন্দ্র সভয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধে কত ঘর কত প্রাঙ্গণ পার হইয়া গেলেন তাহা বলা যায় না। নরেন্দ্র রাজমহলের প্রাসাদ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ প্রাসাদ কখনও দেখেন নাই। কোথাও শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত ঘরের ভিতর সুন্দর গন্ধদীপ জ্বলিতেছে, শ্বেত-প্রস্তর স্তম্ভাকারে উন্নত ছাদ ধরিয়া রহিয়াছে, স্তম্ভে, ছাদে ও চারিদিকে বহুমূল্য প্রস্তরের ও সুবর্ণ রৌপ্যের যে কারুকার্য্য তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোথাও প্রাঙ্গণে ঈষৎ চন্দ্রালোকে সুন্দর ফোয়ারার জল খেলিতেছে, চারিদিকে সুন্দর বাগান, সুন্দর পুষ্পলতা, তাহার উপর দিয়া নৈশ সমীরণ নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে। কোথাও বা উদ্যান বৃক্ষতলে আসীন হইয়া দুই একজন উজ্জ্বলবর্ণা উজ্জ্বল বেশধারিণী রমণী বীণা বাজাইতেছে, অথবা নিদ্রার বশীভূতা হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বাহিরে খোজাগণ নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছে, আর রহিয়া রহিয়া মৃদুস্বরে নৈশ বায়ু সেই ইন্দ্রপুরীর উপর বহিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র আপন বিপদকথা ভুলিয়া গেলেন, এই সুন্দর প্রাসাদ, সুন্দর ঘর ও প্রাঙ্গণ, সুন্দর উদ্যান ও এই অপূর্ব্ব পরিবেশধারিণী রমণীদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি কোথায়? এ কোন্ স্থান?

কতক্ষণ পরে তিনি একটী উন্নত সুবর্ণ-খচিত কবাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহসা সেই কবাট ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র একটী উন্নত আলোকপূর্ণ ঘরে প্রবেশ করিলেন। সহসা অন্ধকার হইতে উজ্জ্বল আলোকে আনীত হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন, অমনি শত নারী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত হাস্যধ্বনিতে সে উন্নত প্রাসাদ ধ্বনিত হইল।

নরেন্দ্র জীবনে কখনও এরূপ বিস্মিত হয়েন নাই। কোথায় আসিলেন, এ কি প্রকৃত ঘটনা না স্বপ্ন, এ কি পার্থিব ঘটনা না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন, পুনরায় উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় তাঁহার নয়ন ঝলসিত হইল। আবার হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন, পুনরায় শত নারী-কণ্ঠ-ধ্বনিতে প্রাসাদ শব্দিত হইল।

ক্ষণেক পরে যখন নরেন্দ্র চাহিতে সক্ষম হইলেন, তখন যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময় দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। দেখিলেন, মর্ম্মর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত একটী উচ্চ প্রাসাদের মধ্যে তিনি আনীত হইয়াছেন। সারি সারি প্রস্তরস্তম্ভ উচ্চ ছাদ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে ছাদে ও সে স্তম্ভে যেরূপ বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য্য দেখিলেন, সেরূপ তিনি জগতে কুত্রাপি দেখেন নাই। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সুগন্ধ পুষ্পমাল্য লম্বিত রহিয়াছে, নীচে স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাশি সজ্জিত রহিয়াছে, শত নারীকণ্ঠ হইতে পুষ্পমাল্য দোদুল্যমান হইয়া সুগন্ধে ঘর আমোদিত করিতেছে। ছাদ হইতে, স্তম্ভ হইতে, পুষ্প ও পত্ররাশির মধ্য হইতে সহস্র গন্ধদীপ নয়ন ঝলসিত করিতেছে, ও সেই সুন্দর উন্নত প্রাসাদ আলোকময় ও গন্ধপরিপূর্ণ করিতেছে। রেখাকারে শত রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই রেখার মধ্যস্থানে দীপালোক প্রতিঘাতী রত্নরাজিবিনির্ম্মিত উচ্চ সিংহাসনে তাহাদিগের রাজ্ঞী উপবেশন করিয়া আছেন! এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল?* নরেন্দ্র আলফ্‌লায়লায় পড়িয়াছিলেন যে, এবন-হাসেন নামক একজন দরিদ্র ব্যক্তি একদিন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা দেখিলেন, যেন তিনি বাগদাদের কালিফ

হইয়াছেন! নরেন্দ্রের স্বপ্ন তদপেক্ষাও বিস্ময়কর, তিনি যেন সহসা স্বর্গোদ্যানে আপনাকে অপ্সরাবেষ্টিত দেখিলেন!

নরেন্দ্র সেই অপ্সরা ও নারী-রেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহারা নিঃশব্দে রেখাকারে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে, সকলেই বক্ষের উপর দুই হস্ত স্থাপন করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, দেখিলে যেন জীবনশূন্য পুত্তলির ন্যায় বোধ হয়। তাহাদের কেশপাশ হইতে মণিমুক্তা দীপালোক প্রতিহত করিতেছে, উজ্জ্বল বহুমূল্য বসন সেই আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তাহারা সকলেই যেন রাজ্ঞীর আদেশ সাপেক্ষ হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে।

সেই রাজ্ঞীর দিকে যখন চাহিলেন, নরেন্দ্র তখন শতগুণ বিস্মিত হইলেন। যৌবন অতীত হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ও উন্মত্ততা এখনও বিলীন হয় নাই, বোধ হয় যেন প্রথম যৌবনের বেগ ও লালসা বয়সে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্ঞীর শরীর উন্নত, ললাট প্রশস্ত, ওষ্ঠ ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, কৃষ্ণ কেশপাশ হইতে একটী মাত্র বহুমূল্য হীরকখণ্ড আলোকে ধক্ ধক্ করিতেছে। নয়নদ্বয় তদপেক্ষা অধিক জ্যোতির সহিত উজ্জ্বল, মলমলের অবগুণ্ঠনে সে উজ্জ্বলতা গোপন করিতে অক্ষম। দেখিলেই বোধ হয়, নারী হউন বা অপ্সরা হউন, ইনি কোন অসাধারণ মহিলা, জগৎ বা স্বর্গপুরী শাসন করিবার জন্যই অবতীর্ণা হইয়াছেন।

কিন্তু নরেন্দ্রের এ সমস্ত দেখিবার অবসর ছিল না। সহসা যেন স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্র হইতে কোন স্বর্গীয় তান উত্থিত হইতে লাগিল, তাহার সহিত সেই শত অপ্সরার কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। সেরূপ অপরূপ গীত নরেন্দ্র কখনও শুনেন নাই, তাঁহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই গীত ক্রমে উচ্চতর হইয়া সেই উন্নত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া নৈশ গগনে বিস্তার পাইতে লাগিল, বোধ হইল যেন নৈশ গগনবিহারী অদৃষ্ট জীবগণ সেই গীতের সহিত যোগ দিয়া শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল! ক্রমে আবার মন্দীভূত হইয়া সে গীত ধীরে ধীরে লীন হইয়া গেল, আবার প্রাসাদ নিস্তব্ধ শব্দশূন্য। এইরূপ একবার, দুইবার, তিনবার গীতধ্বনি শ্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি ক্রমে লীন হইয়া গেল।

তখন রাজ্ঞী সজোরে পদাঘাত করায় সেই প্রাসাদের এক দিকের একটী রক্তবর্ণ যবনিকা পতিত হইল। নরেন্দ্র সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার অপর পার্শ্বে চারি জন কুঠারধারী কৃষ্ণবর্ণ খোজা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করায় তাহাদের মধ্যে প্রধান এক জন রাজ্ঞীর সিংহাসন-পার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল, নরেন্দ্র দেখিলেন, সে মসরুর! নরেন্দ্রের ধমনীতে শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইল।

মসরুর রাজ্ঞীর সহিত অনেকক্ষণ অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল, কি বলিতেছিল নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু কথা কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, নয়ন আরক্ত করিয়া, যেন কি উত্তেজনা করিতে লাগিল। মসরুর কি বলিতেছিল নরেন্দ্র তাহা জানিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার আকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। নরেন্দ্রকে এই অপরিচিত দেশে জল্লাদ-হস্তে প্রাণ দিতে হইবে, তাঁহার প্রতীতি হইল।

রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অন্য পার্শ্বে একটী হরিদ্বর্ণ যবনিকা পতিত হইল। তাহার অপর পার্শ্বে চারি জন পরিচারিকা হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। দ্বিতীয় বার পদাঘাত করায় সে পরিচারিকাগণ এক জন বন্দীকে রাজ্ঞীর নিকট ধরিয়া আনিল, নরেন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন সে বন্দী জেলেখা!

জেলেখা কি বলিল নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার আকার ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইল সে রাজ্ঞীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, অশ্রুত্যাগ করিয়া, রাজ্ঞীর পদে লুণ্ঠিত হইতেছে।

রাজ্ঞী বারবার নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নরেন্দ্র স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ, তাঁহার নয়ন জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, ললাট উন্নত, বদনমণ্ডল উগ্র ও তেজোব্যঞ্জক। সাহসী, অল্পবয়স্ক, সুন্দর যুবার উন্নত ললাট ও প্রশস্ত মুখমণ্ডলের দিকে রাজ্ঞী বারবার নয়নক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের দিকে অনেকক্ষণ চাহিতে চাহিতে রাজ্ঞী নরেন্দ্রের অঙ্গুলীতে একটী অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলেন। হতভাগিনী জেলেখা নরেন্দ্রের পীড়ার সময় একদিন লীলাক্রমে সে অঙ্গুরীয়টী পরাইয়া দিয়াছিল, সেই অবধি তাহা নরেন্দ্রের হাতে ছিল! অঙ্গুরীয় রাজ্ঞীর পরিচারিকাগণ চিনিল, রাজ্ঞী স্বয়ং চিনিলেন। তখন ক্রোধে রাজ্ঞীর সুন্দর ললাট রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইল!

বিচার শেষ হইল। নির্দ্দয়হৃদয়া রাজ্ঞী আদেশ দিলেন,—জেলেখা অপরাধিনী, পাপীয়সীকে শূলে দাও! কাফেরকে লইয়া যাও, হস্তিপদে দলিত করিয়া কাফেরকে হনন কর!

একেবারে দীপাবলী নির্ব্বাণ হইল। নিঃশব্দে অন্ধকারে খোজাগণ রজ্জু দ্বারা নরেন্দ্রকে বন্ধন করিতে লাগিল।

অন্ধকারে কে নরেন্দ্রের মুখের নিকট একটী পাত্র ধারণ করিল। নরেন্দ্র বিস্ময় ও উদ্বেগে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন, সেই পাত্র হইতে পানীয় পান করিলেন, অচিরাৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর কি হইল তিনি জানিলেন না, কেবল বোধ হইল যেন সেই অন্ধকারে কে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সেই অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিল, আর কে যেন অন্ধকারে করুণস্বরে রোদন করিতেছিল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, অভাগিনী জেলেখা!

নরেন্দ্রনাথ যখন জাগ্রত হইলেন তখন দেখিলেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, সূর্য্যের রশ্মিতে তিনি একটী প্রশস্ত বাজারের মধ্যে একটী পর্ণকুটীরের ধারে শুইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যের নবজাত রশ্মি তাঁহার মুখে পতিত হইয়াছে, ও পথ, ঘাট, অট্টালিকা, দোকান, বাজার, বস্তী, আলোকময় করিয়াছে। এ কোন্ সহর? এ কি বঙ্গদেশের রাজধানী রাজমহল? সুলতান সুজা কি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বারাণসী হইতে এই স্থানে আনিয়াছেন? গত নিশায় কি তিনি এই ভূমিশয্যায় শুইয়া প্রাসাদ ও পরীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : গজপতিসিংহ

HAIL Majesty most excellent?
While nobles strive to please ye,
Will ye accept a compliment
A simple poet gies ye?

—*Burns.*

নরেন্দ্রের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে স্থানটী তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। সেই স্থান একটী প্রকাণ্ড সরাইয়ের মত বোধ হইল। মধ্যস্থানে একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহার চারিপার্শ্বে দ্বিতল হর্ম্ম্যশ্রেণী, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে দুই একটী করিয়া লোক আছে। সে সমস্ত লোক অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত পারস্য, উসবেক, পাঠান বা হিন্দু বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোক, প্রথম নগরে আসিয়া এই সরাইয়ে বাসা করিয়া আছে। সকল লোক সরাইয়ে আসিলে নিশায় দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে প্রাতঃকালে পুনরায় সরাইয়ের বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, লোকে গমনাগমন করিতে লাগিল।

এক বৃদ্ধ পারস্যদেশীয় সেখ একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। নরেন্দ্র যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেখজী এটী কোন্ স্থান? আমি এখানে নূতন আসিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সেখজী বলিলেন,—বৎস, আমিও বাণিজ্যকর্ম্মে এই সহরে কল্য আসিয়াছি, সহরের বিশেষ কিছু জানি না।

নরেন্দ্র। আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন। এই স্থানের কথা কিঞ্চিৎ আমাকে বলুন।

সেখজী। আমি যথার্থই বলিতেছি এ সহরের কিছুই জানি না। তবে শুনিলাম এই স্থানটী বেগম সাহেবের সরাই, সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা পাদশা বেগম সহরের নূতন আগন্তুকের থাকিবার সুবিধার জন্য এই উৎকৃষ্ট সরাই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমি সমরকন্দ ও বোখারা দেখিয়াছি, সিরাজ ও ইস্পাহান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর সহর দেখি নাই।

নরেন্দ্র। এ সহরের নাম কি? পাদশা বেগমই বা কে?

বৃদ্ধ বণিক অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—এ কাফের দেখিতেছি জ্ঞানশূন্য, পাগলটাকে তাড়াইয়া দাও, পাগলামি চড়িলেই এইক্ষণেই কি করিয়া বসিবে। নরেন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

পরে নরেন্দ্র দেখিলেন একজন পাঠান-স্ত্রী কতকগুলি ফলমূল লইয়া বিক্রয়ার্থ ধনী বণিকদিগের নিকট যাইতেছে। নরেন্দ্র তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিবি, এ সহরের নাম কি, এ স্থানকেই বা লোকে কি বলে? বৃদ্ধা বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিল,—কাফের, আমার সে বয়স নাই, উপহাস করিতে হয় অন্য স্থানে যাও, এ খুবসুরৎ মুখ দেখিলে অনেক কাঞ্চনীও ভুলিয়া যাইবে? নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইলেন।

দেখিলেন একজন রাজপুত সৈনিক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, একজন ভৃত্য তাঁহার অশ্বের সেবা করিতেছে, সৈনিক সসজ্জ হইয়া ভৃত্যকে শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি এই স্থানে নূতন আসিয়াছি, এ স্থানটীর নাম কি জানি না। আপনি বোধ হয় অনেক দিন এস্থানে আছেন, আমাকে এ নগরের কথা কিছু বলিতে পারেন।

রাজপুত অনেকক্ষণ নরেন্দ্রের দিকে দেখিয়া উত্তর করিলেন,—বালক, তোমার মুখ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তুমি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছ না? হাঁ স্মরণ হইয়াছে, তুমি আমাকে ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছ?

নরেন্দ্র তখন রাজপুতকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—না, বিস্মৃত হই নাই। গজপতি, তুমি কাশীর যুদ্ধের পর আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ, জীবন থাকিতে আমি তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি না।

দুই জনে অনেকক্ষণ আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। বিস্মিত হইয়া নরেন্দ্র জানিলেন, সে নগর হিন্দুস্থানের রাজধানী প্রসিদ্ধ দিল্লীনগর। কথায় কথায় গজপতি প্রকাশ করিলেন,—আমি মহারাজ জয়সিংহের নিকট হইতে কতিপয় পত্রাদি লইয়া মহারাজ যশোবন্তসিংহের নিকট যাইতেছি। তিনি আপাততঃ উজ্জয়িনীতে আরংজীবের সহিত যুদ্ধার্থে গিয়াছেন, যুদ্ধ না হইতে হইতেই আমি তথায় পৌঁছিতে পারিলেই মঙ্গল। তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমার সঙ্গে আইস, আমি মহারাজকে বলিয়া তোমাকে অশ্বারোহীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিব। নরেন্দ্র সে দেশে বন্ধুহীন ও অর্থহীন, ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎপরে দুই জনে দিল্লীনগর ভ্রমণে বাহির হইলেন।

মহাভারতে বিবৃত ইন্দ্রপ্রস্থনগর যে স্থানে ছিল, ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথুরায়ের রাজধানী দিল্লী নগর যে স্থানে ছিল, এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট শাজিহান সেই স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া ও সুন্দর প্রাসাদ ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শাজিহানাবাদ নাম দেন। কিন্তু নগরের সে নাম কেহ জানে না, অদ্যাপি শাজিহানের নগর নূতন দিল্লী নামে বিখ্যাত। পৃথুরায়ের সময়ের হিন্দু নাম অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

দিল্লী এক দিকে যমুনানদী ও অন্য তিন দিকে অর্দ্ধগোলাকৃতিরূপে প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত, সে প্রাচীর প্রশস্ত, ও তাহার উপর দিয়া যাতায়াতের একটী পথ ছিল। যমুনা ও এই প্রাচীরের মধ্যে দিল্লী নগর সন্নিবেশিত, কিন্তু প্রাচীরের বাহিরেও তিন চারিটী বৃহৎ বৃহৎ পল্লী ছিল ও ধনাঢ্য ওমরাহ ও হিন্দুরাজগণের অট্টালিকা ও বাগান অনেক দূর অবধি দেখা যাইত। দিল্লীর ভিতরে যমুনার অনতিদূরে প্রস্তর-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত দুর্গ আছে, তাহার ভিতর সম্রাটের প্রাসাদ ও জগতে অতুল্য মর্ম্মর-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাবলী।

গজপতি ও নরেন্দ্র দিল্লীর একটী প্রধান পথ দিয়া দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সমস্ত দিল্লীই প্রায় সৈনিকের বাস, সে নগরে পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য বাস করিত। সৈনিকগণের স্ত্রী, পরিবার ও বহুসংখ্যক ভৃত্য দিল্লী নগরে মৃত্তিকা ও পর্ণকুটীরে বাস করিত, সুতরাং দিল্লী এইরূপ পর্ণকুটীরেই পরিপূর্ণ। যে দিকে দেখা যায়, এইরূপ কুটীরশ্রেণীই অধিকাংশ দেখা যাইত। খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি বিক্রয়ার্থ যে দোকান ছিল তাহাও অধিকাংশ পর্ণকুটীর, সর্ব্বদাই অগ্নি লাগিত ও বৎসরে বৎসরে প্রায় বহু সহস্র পর্ণকুটীর একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইত। নরেন্দ্র দুই ধারে এইরূপ কুটীর দেখিতে দেখিতে চলিলেন। দোকানী পশারী নানারূপ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, পথ লোকারণ্য। অধিকাংশই অতি সামান্য লোক, অতি সামান্য বেশে নিজ নিজ কর্ম্মে যাইতেছে। দিল্লীতে এক্ষণে যেরূপ মধ্যশ্রেণী ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোক ইষ্টকালয়

নির্ম্মাণ করিয়া নগর পরিপূর্ণ ও সুশোভিত করিয়াছে, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। তখন কেবল মহল্লোক বা ইতর লোক ছিল, প্রাসাদ বা পর্ণকুটীর!

যাইতে যাইতে নরেন্দ্র একটী বড় রাজপথে গিয়া পড়িলেন। সে পথে অনেকগুলি প্রশস্ত ও বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। মনসবদার, কাজী, বণিক, ওমরাহ, রাজা প্রভৃতি মহল্লোকের হর্ম্ম্যশ্রেণীতে পথ সুন্দর দেখাইতেছে। নরেন্দ্র এরূপ সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী কোথাও দেখেন নাই, প্রাসাদ সমূহের পার্শ্ব দিয়া যাইতে যাইতে গজপতির সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে উভয়ে প্রসিদ্ধ জুম্মা মসজীদ দেখিতে পাইলেন, ভারতবর্ষে সেরূপ মসজীদ আর একটীও ছিল না, বোধ হয় জগতে সেরূপ নাই। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সম্মুখে এই বৃহৎ মসজীদ কি?

গজপতি। ওটী জুম্মা মসজীদ। শুনিয়াছি একটী পর্ব্বতের উপরিভাগ সমতল করিয়া তাহার উপর ঐ মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার আরক্ত বর্ণে নয়ন ঝলসাইয়া যাইতেছে, তাহার উপর শ্বেতপ্রস্তরের তিনটী গম্বুজ উঠিয়াছে। বাদশাহ যখন দিল্লীতে থাকেন স্বয়ং ঐ মসজীদে প্রতি শুক্রবার যান, সে সমারোহ তুমি একদিন দেখিলে কখনও ভুলিতে পারিবে না। দুর্গ হইতে মসজীদ পর্য্যন্ত চারি পাঁচ শত সিপাহী সার দিয়া দাঁড়ায়, তাহাদের বন্দুকের উপর হইতে সুন্দর রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতে থাকে। পাঁচ ছয় জন অশ্বারোহী পথ পরিষ্কার করিতে করিতে আগে যায়, পরে বাদশাহ হস্তীর উপর জাজ্বল্যমান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যান, তাহার পর ওমরাহ ও মনসবদারগণ অপরূপ সজ্জা করিয়া মসজীদে গমন করে। কিন্তু আর এ স্থানে দাঁড়াইয়া কি হইবে, চল আমরা দুর্গের ভিতর যাইয়া রাজবাটী দেখি।

দূর হইতেই রক্তবর্ণ উন্নত দুর্গ-প্রাচীরের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ চমৎকৃত হইলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে দেশের যে লোক আসিয়াছেন, তিনি দিল্লীর দুর্গ ও রাজবাটীর শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত মসজীদ, প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলীকে জগতের মধ্যে অতুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দুর্গপ্রবেশের স্থানে একটী বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, তাহার মধ্যে একজন হিন্দুরাজার শিবিরশ্রেণী রহিয়াছে, রাজা দুর্গের দ্বার রক্ষা করিতেছেন। অশ্বারোহী ও ওমরাহগণ সর্ব্বদাই এদিক ওদিক যাতায়াত করিতেছেন, এবং দুর্গের ভিতর হইতে সিপাহিগণ বাহিরে আসিতেছে আবার ভিতরে যাইতেছে। বিদেশীয় বণিকগণ দুর্গদ্বারে সমবেত হইতেছে, এবং সহস্র সহস্র ইতর লোকও নদীর স্রোতের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ ধাবিত হইতেছে।

দ্বারদেশে দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তীর আকৃতি, তাহার উপর দুইটী মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি। নরেন্দ্র উৎসুক হইয়া এ কাহার প্রতিমূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। গজপতি বলিলেন,—আপনি হিন্দু, আপনি জানেন না? ইহারা দুইজন রাজপুত বীরপুরুষ। চিতোরের জয়মল্ল ও পত্ত সম্রাট আকবরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সেই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন; পরে যখন আর পারিলেন না, অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়া যুদ্ধে হত হয়েন। আমার পিতামহ তিলকসিংহ সেই যুদ্ধে জীবন দান করিয়াছিলেন, পিতা তেজসিংহের নিকট বাল্যকালে সে অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিতাম। পত্তের মাতা ও বনিতা বীররমণী ছিলেন, তাঁহারাও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া হত হয়েন। তাঁহাদিগের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সম্রাট আকবর এই প্রতিমূর্ত্তি এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। পরে সগর্ব্বে গজপতি বলিলেন,—কিন্তু রাজপুতরাজদিগের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতিমূর্ত্তির আবশ্যক নাই, যত দিন বীরত্বের গৌরব থাকিবে, রাজপুত নাম কেহ বিস্মৃত হইবে না। রাজপুতানার প্রত্যেক পর্ব্বতশেখরে রাজপুতের বীরনাম খোদিত আছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বেগবতী নদীতরঙ্গে রাজপুতের বীরনাম শব্দিত হইতেছে।

প্রশস্ত পথ অতিবাহন করিয়া দুইজনে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পথের দুই ধারে অট্টালিকা, তাহার উপর রাজকর্ম্মচারিগণ রাজকার্য্য করিতেছেন। দুর্গের দ্বারের বাহিরে যেরূপ হিন্দুরাজগণ দ্বার রক্ষা করিতেন, ভিতরে এই পথের উপর মনসবদার ও ওমরাহগণ সেইরূপ দ্বার রক্ষা করিতেন।

দুর্গের ভিতর উভয়ে বড় বড় কারখানা দেখিতে পাইলেন। রাজপরিবারের যে সমুদায় বিচিত্র দ্রব্য আবশ্যক হইত, ঐ স্থানে তাহা প্রস্তুত হইত। এক স্থানে রেশমকার্য্যের কারখানা,

অন্য স্থানে স্বর্ণকারদিগের, অপর স্থানে চিত্রকরদিগের। ছুতার, দরজী, চর্ম্মব্যবসায়ী, বস্ত্রব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল প্রকার লোকের কারখানা ছিল। দেশে যত উৎকৃষ্ট কারিকর ছিল তাহারা প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কার্য্য করিত ও মাসিক বেতন পাইত।

সে সমস্ত কারখানা পশ্চাতে রাখিয়া উভয়ে ভিতরে যাইতে লাগিলেন। অনেক সমারোহের মধ্য দিয়া অনেক বিস্ময়কর হর্ম্ম্য ও প্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া যাইয়া অবশেষে জগদ্বিখ্যাত মর্ম্মর-প্রাসাদ "দেওয়ান খাস" দেখিতে পাইলেন। প্রাসাদের ছাদ সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত ও রৌদ্রতাপে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। প্রাসাদের ভিতরে সুবর্ণ ও হীরকখচিত দিবালোক প্রতিঘাতী রত্ন-বিনির্ম্মিত রাজসিংহাসনের উপর সম্রাট শাজিহান উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার গম্ভীর ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এখনও পীড়ার চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে; তিনি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন নাই। দক্ষিণপার্শ্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বসিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার ললাট ও বদনমণ্ডল সুন্দর ও প্রশস্ত, কিন্তু মুখে দুর্দ্দমনীয় দর্প ও অভিমান বিরাজ করিতেছে। বামদিকে পৌত্র সুলতান সলাইমান দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে, অবয়ব ও আকৃতি সুন্দর ও উন্নত। পশ্চাতে খোজাগণ ময়ূর-পুচ্ছ-বিনির্ম্মিত চামর হেলাইতেছে। তাহার চারিদিকে রৌপ্যনির্ম্মিত রেল আছে, রেলের বাহিরে রাজা, ওমরাহ, মনসবদার, দূত, সেনাপতি ও ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক উচিত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমির দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে! সম্মুখস্থ সমভূমি লোকে পরিপূর্ণ। কি ধনী কি নির্ধন, কি উচ্চ কি নীচ, সে স্থানে যাইয়া রাজাকে দর্শন করিবার সকলেরই অধিকার আছে। সেই অপূর্ব্ব প্রাসাদে যথার্থই লিখিত রহিয়াছে,—"যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে এই স্বর্গ, এই স্বর্গ, এই স্বর্গ।"

সম্রাটের সম্মুখে প্রথমে সুন্দর সুন্দর আরবদেশীয় অশ্ব প্রদর্শিত হইল। পরে বৃহৎকায় হস্তিশ্রেণী পরিদর্শিত হইল, হস্তিগণ কর উত্তোলন করিয়া বাদশাহকে "তসলীম" করিয়া চলিয়া গেল। পরে হরিণ, বৃষ, মহিষ, গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সকল জন্তু ও তৎপরে নানারূপ পক্ষী একে একে প্রদর্শিত হইল। সম্রাটের বর্ম্মধারী অশ্বারোহিগণ, তৎপরে বহুদর্শী কয়েক শত পদাতিক, তৎপরে অন্যান্য সেনাগণ একে একে সম্রাটের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল; তাহাদিগের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইল।

প্রদর্শন সমাপ্ত হইলে পর বাদশাহ দরখাস্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কি নীচ কি উচ্চ সকলেই আসিয়া রাজাধিরাজ ভারতবর্ষের সম্রাটের নিকট আপন আপন দুঃখ জানাইতে লাগিল, সম্রাট দুই একটী আদেশ দিয়া সকলের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। সম্রাট যে বিষয়ে যে কথা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ সকল প্রধান প্রধান ওমরাহগণ "কেরামৎ কেরামৎ" বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজকার্য্য সমাধা হইয়া গেল, সম্রাট পুত্র ও কয়েকজন প্রধান প্রধান ওমরাহের সহিত "গোসলখানায়" গেলেন। গোসলখানা কেবল হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই, তথায় প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের সহিত রাজকার্য্যের গূঢ় মন্ত্রণাদি হইত! নরেন্দ্র গোসলখানার পশ্চাতে উচ্চ প্রাচীর দেখিতে পাইলেন, তাহার ভিতরে অনেক হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ আছে। গজপতি কহিলেন,—ঐ প্রাচীরের পশ্চাতে রাজবাটীর বেগমদিগের ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে, শুনিয়াছি সে মহল অতিশয় চমৎকার। প্রত্যেক বেগমের মর্ম্মর-প্রাসাদের চারিদিকে উদ্যান ও কুঞ্জবন, গ্রীষ্মকালে দিবায় থাকিবার জন্য মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ঘর এবং নিশায় শয়নের জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ উচ্চ ছাদ আছে। কিন্তু সম্রাট ভিন্ন অন্য পুরুষের নয়ন সে সৌন্দর্য্য কখনও দেখে নাই, পুরুষের পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হয় নাই।

নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব রাত্রির কথা সহসা স্মরণ হইল। তাঁহার বোধ হইল ঐ প্রাচীরের পশ্চাতে বেগমদিগের প্রাসাদ সমূহের সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়ন দর্শন করিয়াছে, তাঁহার পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু সে পূর্ব্ব রাত্রির বিস্ময়কর কথা তিনি গজপতির নিকট প্রকাশ করিলেন না, আপনিও ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ঃ দেওয়ানা তাতার বালক

> ———BEWARE of the day
> When the lowlands shall meet thee in
> battle's array.
>
> —*Campbell.*

দুইজনে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহির্ভাগে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন, সে স্থান তখনও জনাকীর্ণ। বড় বড় লোক কেহ শিবিকায়, কেহ হস্তীর উপর, কেহ অশ্বারোহী হইয়া এদিকে ওদিকে যাতায়াত করিতেছে, এবং শত শত ব্যবসায়ী লোক নানা অপরূপ ও বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, তাহা ক্রয় করিতে বা দেখিতে সহস্র সহস্র লোক ঝুঁকিয়া আসিতেছে। কেহ গান করিয়া বা নৃত্য করিয়া অর্থলাভ করিতেছে, কেহ ভেল্কী দেখাইতেছে, কেহ সাপ খেলাইতেছে, কেহ হাত গণিয়া বলিতেছে। গণক বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকেই তথায় আসিয়াছে, এবং রৌদ্রে আপন জীর্ণ বস্ত্র পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এক দিকে একখানা যন্ত্র, আর এক দিকে একখানি করিয়া পুস্তক। অনেক লোক তাহাদের নিকট ছুটিতেছে, কুলকামিনীরাও শুভ্র বসনে মণ্ডিত হইয়া ব্যগ্র হইয়া আসিতেছে, এবং এক এক পয়সা দিয়া হাত দেখাইয়া লইতেছে।

তাহাদের মধ্যে নরেন্দ্র এক অপরূপ গণক দেখিতে পাইলেন। তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না, মুখমণ্ডল অতিশয় কোমল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, সূর্য্যতাপে আরক্ত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু, গণ্ডস্থল এবং স্কন্ধের উপর জটা পড়িয়াছে। জটা দ্বারা ঈষৎ আবৃত হইলেও চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর কৃষ্ণ বসনে আবৃত, কোমরে একটী বহুমূল্য পেটী রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। বালক তাতারদেশীয় মুসলমান, কাহারও নিকট পয়সা না লইয়া হাত দেখিতেছে।

তাতার বালকের আকৃতি দেখিয়াই অনেকে তাহার নিকট যাইতেছে। গজপতি ও নরেন্দ্র উভয়ে তাহার নিকটে গেলেন। গজপতি প্রথমে হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অদ্য সন্ধ্যার সময়েই আমরা দিল্লী নগর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব বল দেখি?

তাতার গজপতির মুখ ও বসন বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিল,—মহারাজা যশোবন্তসিংহ নর্ম্মদাতীরে গিয়াছেন, তুমি সেই স্থানে যাইবে।

গজপতি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—মহারাজা যশোবন্তসিংহ আরংজীবের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে। আর আমি রাজপুত, আমার বসন দেখিয়া সকলেই বলিতে পারে। ইহার অধিক বলিবার তোমার বিদ্যা নাই?

তাতার প্রজ্বলিত নয়নে গজপতির উপর স্থির দৃষ্টি করিয়া ক্ষণেক পর মস্তক নাড়িয়া জটাভার পশ্চাৎদিকে ফেলিয়া বলিল,—রাজপুত! আরও বলিতে পারি, আরংজীবের হস্তে সমস্ত রাজপুতের নিধন হইবে। মহারাজকে বলিও যেন দ্রুতগতি একটী অশ্ব বাছিয়া লয়েন, নতুবা পলাইবার সময় পাইবেন না। সপ্ত সহস্র রাজপুতের মধ্যে সপ্ত শতেরও রক্ষা নাই। রাজপুত! সে যুদ্ধে তোমার নিশ্চয় নিধন।

গজপতি সাহসী যোদ্ধা, কিন্তু তাতার বালকের আকার ও গম্ভীর স্বর ও প্রজ্বলিত চক্ষু দেখিয়া ও কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সে ভাব অন্তর্হিত হইল, অতিশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—ক্ষতি নাই, যদি জগদীশ্বর ললাটে তাহাই লিখিয়া থাকেন, মহারাজের যুদ্ধে হৃদয়ের শোণিতদান অপেক্ষা রাজপুত অধিকতর গৌরবের কার্য্য জানে না।

সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে নরেন্দ্র আপন হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —তুমি যদি যথার্থ হাত দেখিতে জান, বল দেখি কল্য নিশাকালে আমি কোথায় ছিলাম এবং কাহাকেই বা দেখিয়াছিলাম?

তাতার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের

দিকে চাহিয়া বলিল,—যুবক! কোন মুসলমান তোমার প্রণয়িনী, তুমি কল্য রজনীতে তাহাকে দেখিয়াছিলে!

গজপতি সিংহ হাসিয়া উঠিলেন, সকলে হাসিয়া উঠিল।

নরেন্দ্রনাথ হাসিলেন না, তাতারের কথা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর তাতার নরেন্দ্রকে এক দিকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—যুবক! দিল্লীতে তোমার মহাবিপদ, তুমি কি তাহা জান না? দিল্লী ত্যাগ করিয়া অদ্যই পলায়ন কর, তোমার বন্ধুর সহিত অদ্যই নর্ম্মদাতীরে গমন কর। এ দেওয়ানাও সেই দিকে যাইতেছে, যদি অনুমতি দাও, তোমার সঙ্গে যাইব। দেওয়ানা তোমার অপকার করিবে না, বিপদ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে।

নরেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন। এ বালক কে? বালক কি যথার্থই অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ বলিতে পারে? বালক কি যথার্থই গত রাত্রির কথা জানে? দেওয়ানা যেই হউক, নরেন্দ্রনাথের হিতাকাঙ্ক্ষী, সম্ভবতঃ নরেন্দ্রনাথকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাকে নিকটে রাখিতে সম্মত হইলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই গজপতি, নরেন্দ্র ও তাতার বালক দিল্লী ত্যাগ করিয়া নর্ম্মদাভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : রাজা যশোবন্তসিংহের শিবির

> BUT hark the trump! To-morrow thou,
> In glory's fires shalt dry thy tears!
>
> —*Campbell.*

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর ও তরঙ্গবাহিনী সিপ্রানদীর অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিল। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল কিরণে সিপ্রানদীর উভয় কূলে যতদূর দেখা যায়, শুভ্র শিবিরশ্রেণী দেখা যাইতেছে। একদিকে রাজা যশোবন্ত ও তাঁহার সহযোদ্ধা কাসেমখাঁর অসংখ্য সেনা চন্দ্রকরোজ্জ্বল শিবিরশ্রেণীর মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে, অপর তীরে এক পর্ব্বতোপরি আরংজীব ও মোরাদের মোগল সৈন্যদল রহিয়াছে। মধ্যে কলনাদিনী সিপ্রানদী প্রস্তরশয্যার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, যেন মোগল ও রাজপুতদিগের যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়া ভীত না হইয়া উপহাস করিয়া যাইতেছে। দূরে ভারতবর্ষের কটীবন্ধস্বরূপ বিন্ধ্যপর্ব্বত চন্দ্রালোকে দেখা যাইতেছে। কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অদ্য সমস্ত জগৎ সুপ্ত। কেবল সময়ে সময়ে প্রহরীর স্বর নিস্তব্ধ রজনীতে সুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে, কেবল সিপ্রানদীর তরঙ্গমালা কল্‌কল্‌ করিতেছে, কেবল দূর হইতে নৈশ শৃগালের শব্দ নদীকূলে ও পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একটী শিবিরে নরেন্দ্র শয়ন করিয়া নিদ্রিত আছেন, তথাপি যুদ্ধের নানারূপ চিন্তা স্বপ্নরূপে তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে পুরাতন কথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। সিপ্রানদীর কল্‌কল্‌ নাদ যেন ভাগীরথীর শব্দ বোধ হইল, সেই ভাগীরথীতীরে সেই কুঞ্জবনবেষ্টিত উচ্চ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তীরে বালুকারাশি, বালুকারাশিতে দুই জন বালক ক্রীড়া করিতেছে আর একজন বালিকা দাঁড়াইয়া যেন গান গাইতেছে। সে প্রেমপুত্তলি কে? সে কোথায়? ভাগীরথীতীরস্থ কুঞ্জবনে সেই তিনটী শিশু রজনীতে ক্রীড়া করিত সত্য, কিন্তু কালের নিষ্ঠুর গতিতে সে চিত্রটী বিলুপ্ত হইয়াছে।

স্বপ্ন পরিবর্ত্তিত হইল। ভাগীরথীর কল্লোলপ্রবাহ, এ রমণীর গীতধ্বনি, রমণী না অপ্সরা? উচ্চ প্রাসাদ, তাহার ছাদ ও স্তম্ভ সুবর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত, তাহার মধ্যে এক অপ্সরা গান করিতেছে। কেবল একজন অপ্সরা গান করিতেছে, সে বড় দুঃখের গীত, জেলেখা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই দুঃখের গীত গাইতেছে। ঐ যে জেলেখা দাঁড়াইয়া আছে; ঐ যে তাহার

রত্নরাজি-বিভূষিত কেশপাশে উজ্জ্বল বদনমণ্ডল কিঞ্চিৎ আবৃত রহিয়াছে; ঐ যে তাহার প্রজ্বলিত নয়নদ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু জল পড়িতেছে।

স্বপ্ন পরিবর্ত্তিত হইল। এ জেলেখা নহে, এ সেই তাতার বালক গীত গাইতেছে। যে ব্যর্থ প্রেম করিয়া প্রেমের প্রতিদান পায় নাই, দেওয়ানা হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছে, তাহারই গান। গান শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি শিবির হইতে বাহিরে আসিলেন। জগৎ নিস্তব্ধ, দ্বিপ্রহর নিশার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে, চন্দ্রকিরণে নদী, পর্ব্বত, শিবির ও মাঠ দৃষ্ট হইতেছে, আর সেই অভাগা দেওয়ানা তাতার বালক শিবিরদ্বারে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে! সপ্তস্বরমিলিত সে গান বায়ুতে বাহিত হইয়া নৈশ গগনে উত্থিত হইতেছে ও চারিদিকে আকাশে বিস্তৃত হইতেছে!

নরেন্দ্র সাশ্রুনয়নে বালকের হস্তধারণ করিয়া তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি যথার্থই প্রেমের জন্য দেওয়ানা হইয়াছ? তোমার হৃদয়ে কি কোন গভীর দুঃখ আছে? তাহা যদি হয় আমাকে বল, আমি তোমার দুঃখের সমদুঃখী হইব। মন খুলিয়া আমার নিকট সমস্ত কথা বল।

বালক এক দৃষ্টিতে নরেন্দ্রের দিকে চাহিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণেক পর হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে করুণস্বরে বলিল,—মার্জ্জনা করুন, আমি দেওয়ানা, যখন যাহা মনে আইসে তাহাই গান করি। নরেন্দ্র অনেক প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিয়া বার বার তাহার দুঃখের কারণ ও এই অল্প বয়সে ফকিরী গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তাহার উত্তর দিল না, কেবল বলিল,—আমি দেওয়ানা।

নিশা অবসানে নরেন্দ্র রণসজ্জা করিয়া আপন বন্ধু গজপতি সিংহের শিবিরে গেলেন। দেখিলেন তিনিও যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, আপন তরবারি, চর্ম্ম, বর্শা প্রভৃতি স্বয়ং শানাইতেছেন, অস্ত্রগুলি রৌপ্যের মত উজ্জ্বল হইয়াছে, তথাপি আরও উজ্জ্বল করিতেছেন। দেখিয়া নরেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইলেন; পরে শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিলেন গজপতি সমস্ত রাত্রি শয়ন করেন নাই, সমস্ত রাত্রিই এই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত। কেন? নরেন্দ্র গত কয়েক দিন অবধি গজপতির যে ভাবগতিক দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কারণ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলেন! দেওয়ানা বালক হাত দেখা অবধি গজপতি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন উজ্জয়িনীর যুদ্ধে তাঁহার নিধন হইবে। বোধ হয় গত নিশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, শয়নের অবসর পান নাই।

পাঠক, গজপতিকে ভীরু মনে করিতেছ? রাজপুত সকলেই সাহসী, তথাপি তাহাদের মধ্যেও তেজসিংহের পুত্র গজপতি অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না। তথাপি কল্য নিশ্চয় মৃত্যু জানিলে সাহসীর ললাটও চিন্তারেখায় অঙ্কিত হয়। যোদ্ধা যৌবনমদে মত্ত থাকিয়া, জীবনের সুখে মগ্ন থাকিয়া, যুদ্ধের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিয়া, জয়ের আশায় আশ্বস্ত হইয়া, মৃত্যুর চিন্তা দূর করে; যুদ্ধ তাহাদের পক্ষে আমোদমাত্র, অনেক লোক মরিতেছে, তাহারাও একদিন মরিবে, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু "কল্য মরিবে", বজ্রধ্বনিতে যদি এই শব্দ সহসা হৃদয়ে আহত হয়, তাহা হইলে সে উৎসাহ ও সে প্রফুল্লতা হ্রাস পায়। গজপতি সে সময়ের সকল লোকের ন্যায় গণনবিদ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, অদ্য যুদ্ধে তিনি মরিবেন তাহা তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, গত রজনীতে অনিদ্র হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অস্ত্র পরিষ্কার করা কেবল কাল কাটাইবার একটী উপায়মাত্র।

নরেন্দ্র আসিবামাত্র গজপতি উঠিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—দেখ দেখি অস্ত্রগুলি পরিষ্কার হইয়াছে কিনা।

নরেন্দ্র। যথার্থই কি আপনি অদ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন? দেওয়ানা ফকীরের কথা স্মরণ করুন।

গজপতি। সম্মুখে রণ করিয়া রাজপুত কখনও পশ্চাতে চাহে না, পিতা তেজসিংহ আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

গজপতি আরও বলিলেন,—নরেন্দ্র, এক যুদ্ধে আমি মহারাজা যশোবন্তসিংহের উপকার করিয়াছিলাম, রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই মুক্তাহার প্রদান করেন। সেই অবধি সকল যুদ্ধেই আমি এই হার ললাটে পরিধান করিয়াছি। অদ্যকার যুদ্ধে তুমি নিস্তার পাইবে, এই

হার রাজাকে দিও এবং বলিও দেশে আমার দুইটী শিশু সন্তান আছে, হতভাগাদের মাতা নাই। মহারাজাকে বলিও যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করেন, বালক রঘুনাথও* কালে রাজার আজ্ঞায় পিতার ন্যায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয় ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গল ইচ্ছা তাহার পিতা জানে না।

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে এক বিন্দু জল পড়িল। গজপতির নয়নদ্বয় শুষ্ক ও অতিশয় উজ্জ্বল।

সহসা ভেরী-শব্দ শুনা যাইল, আরংজীব সিপ্রানদী পার হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। গজপতি রণসজ্জা পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন, লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া তীর-বেগে নদীমুখে চলিলেন।

নরেন্দ্রও নির্গত হইয়া যুদ্ধাভিমুখে চলিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : মোগল শিবির

ONE ye brave
Who rush to glory or to grave.

—*Campbell.*

যুদ্ধের পূর্ব্বনিশায় রাজপুত-শিবির পাঠক দর্শন করিয়াছ; একবার সেই নিশায় মোগল শিবির দর্শন কর।

আরংজীব পূর্ব্বেই সেই স্থানে পোঁছিয়াছিলেন, মোরাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুই তিন দিন পর মোরাদ সসৈন্য আরংজীবের সহিত যোগ দিলেন, দুই তিন দিনের মধ্যে যদি যশোবন্ত সিংহ আরংজীবকে আক্রমণ করিতেন, আরংজীব অবশ্যই পরাস্ত হইতেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, আরংজীবের অল্পমাত্র সৈন্য আছে এ কথা যশোবন্ত জানিতেন না, সেই জন্যই আক্রমণ করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, মহানুভব রাজপুত সেনাপতি সে কথা জানিয়াও অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা রীতিবিরুদ্ধ, এই জন্যই অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

আজি আরংজীব ও মোরাদ দুই ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হইয়াছে, কালি যুদ্ধ হইবে। জয় জয় নাদে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে। পর্ণবস্ত্রমণ্ডিত উৎকৃষ্ট দীপালোকশোভিত একটী প্রশস্ত শিবিরে দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিয়াছেন, চারিদিকে জগদ্বিমোহিনী নর্ত্তকী ও গায়কীগণ নৃত্য-গীতাদি করিয়া রাজপুত্রদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিতেছে। মোরাদের প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, বীর আকৃতি, ও অকপট হৃদয়; আরংজীবের ললাট কুঞ্চিত, দৃষ্টি তীক্ষ্ন ও তীব্র, মন সর্ব্বদাই সহস্র চিন্তায় অভিভূত। তথাপি আরংজীব কি সুন্দর সরল হাসিই হাসিতেছেন, কি সম্মান সহকারে মোরাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। যেন ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি আর আনন্দ রাখিতে পারিতেছেন না, যেন ভ্রাতার কার্য্যসাধন অপেক্ষা জগতে তাঁহার অন্য আমোদ বা অন্য কোনও প্রকার উদ্দেশ্য নাই।

ভোজন সাঙ্গ হইল, ভৃত্যেরা ফল ও মদিরা লইয়া আসিল। গায়কীগণ পুনরায় সপ্তস্বরে গান আরম্ভ করিল, শিবির আমোদিত হইল। কেশের হীরকের সহিত কটাক্ষদৃষ্টির জ্যোতিঃ মিশিয়া যাইতে লাগিল, সুললিত গানের সহিত সুমিষ্ট হাস্যধ্বনি মিশিয়া যাইতে লাগিল, মোরাদ একেবারে বিমোহিত হইলেন। অবশেষে আরংজীবের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল।

আরংজীব সুবর্ণপাত্রে মদিরা ঢালিয়া মোরাদের হস্তে দিয়া বলিলেন,—আজি সেবায় আপনাকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছি, আজি আমার জীবন সার্থক।

মোরাদ। আরংজীব, আপনার ন্যায় অমায়িক ভ্রাতা আমি পাইব না। একটু মদিরা আপনার জন্য লউন।

আরংজীব। ক্ষমা করুন, আপনি জানেন আমার জীবনে সুখের বাঞ্ছা নাই। হৃদয়ে বড়

---

* যাঁহারা রঘুনাথের কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা "জীবন প্রভাত" আখ্যায়িকা পাঠ করিবেন।

মানস আছে, আপনার মত বীর পুরুষকে পিতৃ-সিংহাসনে একবার দেখিব, ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় ইচ্ছা নাই। পৈগম্বর যদি এই এরাদা সফল করেন তাহা হইলে সন্তুষ্টমনে ফাকিরী গ্রহণ করিয়া মক্কায় যাইব। এই বলিয়া আরংজীব আর এক পাত্র মদিরা দিলেন।

মোরাদ। আরংজীব, আপনি যথার্থই ধার্মিক, তাহা না হইলে আমার জন্য আপনি এরূপ যত্ন করিবেন কেন?

আরংজীব। কাহার জন্য করিব? তৈমুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত আর কে আছে? সুজা বিলাসপ্রিয় ও ভীরু, সুজা তৈমুরের সিংহাসন কলঙ্কিত করিবে? আত্মাভিমানী মূর্খ কাফের দারা তৈমুরের সিংহাসন কলুষিত করিবে? তাহা অপেক্ষা পুনরায় হিন্দুস্থান কাফেরদিগের হস্তে যাউক, তৈমুরের নাম বিলুপ্ত হউক। ইহাদের জন্য আমি যুদ্ধ করিব, না যাঁহার সাহস অপরিসীম, যাঁহার যশোরাশিতে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, যিনি মোগল-সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ, যিনি মোগলকুলের কুলতিলকস্বরূপ, তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিব। আমি আপনার সম্মুখে আপনার সুখ্যাতি করিতে চাহি না, কিন্তু যখন আমি আপনাকে দেখি, আমার যথার্থই বোধ হয় যেন আপনার উদার ললাটে "সম্রাট" শব্দ খোদিত রহিয়াছে, আপনার বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ বাহুতে "যোদ্ধা" শব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে, আমার জীবন ধন্য যে, এইরূপ বীর পুরুষের কার্য্যসাধনে আমি লিপ্ত হইয়াছি। এই বলিয়া আরংজীব সুবর্ণপাত্র আর একবার মদে পরিপূর্ণ করিলেন।

মোরাদ। আরংজীব, আমি যথার্থই আপনার বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম। কাল যুদ্ধ হইবে, সৈন্য সকল প্রস্তুত আছে?

আরংজীব। আমি তিন চারি দিন হইতেই প্রস্তুত আছি, কিন্তু যুদ্ধব্যবসায় আমি এখনও অপরিপক্ক, একাকী সাহস হয় না। আপনি নিকটে থাকিলে আমার যেন বোধ হয় আমি পর্ব্বত-পার্শ্বে নিরাপদে আছি, আমার সাহস দ্বিগুণ হয়।

মোরাদ এরূপ আত্মাভিমানী ছিলেন যে, প্রবঞ্চনা এবং চাটুবাক্যও তাঁহার সত্য বলিয়া জ্ঞান হইত, বিশেষতঃ এক্ষণে অধিক মদিরাসেবনে কিয়ৎপরিমাণ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। আরংজীবের প্রশংসাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আপনিও কালে রণপণ্ডিত হইবেন, এক্ষণে কিছুদিন আমার উপর নির্ভর করুন। তবে আমি, জগতে কাহারও উপর নির্ভর করি না, কেবল আমার সাহস ও এই অসির উপর ভরসা করি। এই বলিয়া মোরাদ অসি নিষ্কোষিত করিলেন, দীপালোকে অসি ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। পুনরায় অসি কোষে রাখিতে গেলেন, কিন্তু অতিশয় মদিরাসেবনে দৃষ্টি স্থির ছিল না, অসি মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইল। আরংজীব হাস্য সম্বরণ করিয়া আর এক পাত্র মদিরা দিলেন, মোরাদ তাহাও শেষ করিলেন।

আরংজীব বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তবে বিদায় হই, রণক্ষেত্রে আবার আপনার দর্শন পাইব।

মোরাদ। যাও, আরংজীব যাও, আমি আপনার উপর বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম, আইস আলিঙ্গন করি। মোরাদ আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন, কিন্তু অধিক মদিরাসেবন বশতঃ ভূমিতে ঢলিয়া পড়িলেন।

আরংজীবের মুখের ভাব তখন পরিবর্ত্তিত হইল, ভ্রাতাকে যে সহাস্য মুখ দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তিত হইল। মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, ললাটে দুই তিনটী ভীষণ রেখা অঙ্কিত হইল। নিঃশব্দে সেই শিবিরমধ্যে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে এক একবার হঠাৎ দণ্ডায়মান হয়েন, স্থিরদৃষ্টিতে এক একবার দেখেন যেন সম্মুখে কোন দ্রব্য দেখিতে পাইতেছেন, আবার পদসঞ্চারণ করিতে থাকেন। এক একবার মুখে ঈষৎ হাস্য লক্ষিত হয়, আবার বদনমণ্ডল কঠোরভাব ধারণ করে, ললাট কুঞ্চিত হয়।

একবার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া একদিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অর্দ্ধস্ফুট বচনে বলিতে লাগিলেন,—উজ্জ্বল মণিময় মুকুট, ময়ূর-সিংহাসন, প্রশস্ত ভারতপ্রদেশ, পিতার দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে। কে লইবে? দারা সাবধান! তোমার সাহস আছে, বল আছে, কিন্তু আমিও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করি নাই, পথ ছাড়িয়া দাও, নচেৎ অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিব। তুমি আত্মাভিমানী, দর্পী, কিন্তু তোমা অপেক্ষা ভীষণ দর্পী ও দৃঢ়তর ব্রত সহাস্য বদনের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। মোরাদ! তুমি সাহসী বীর! সিংহাসনে বসিবে? তবে শূকর যেরূপ কর্দ্দমে পড়ে, সেইরূপ তুমি ধরাতলে লুটাইয়া পড়িলে কেন? বন্য শূকরেরও

তোমার ন্যায় সাহস আছে! অচেতন? কল্য যুদ্ধ হইবে, অদ্য বিলাসবিহ্বল? যতদিন আবশ্যক তোমার দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি করিব, তাহার পর এইরূপ পদাঘাত করিয়া তোমাকে দূরে ফেলিয়া দিব! কল্য যুদ্ধ হইবে, ললাটের লিখন কি আছে? পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভীষণ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। হৃদয়! সাহসে নির্ভর কর, আরও অগ্রসর হইব। অসিহস্তে কণ্টকময় পথ পরিষ্কার করিব, আবশ্যক হয় উজ্জয়িনী হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত পথ নররক্তে রঞ্জিত করিব, কিন্তু এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইবে না। পিতামহ তৈমুর! তোমার মুকুটে এই ললাট শোভিত করিব, নচেৎ কল্য হৃদয়শোণিতে সিপ্রাবারি রঞ্জিত করিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : উজ্জয়িনীর যুদ্ধ

ANOTHER deadly blow,
Another mighty empire overthrown.
—*Wordsworth.*

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বৈশাখ মাসে ভীষণ যুদ্ধ হইল। মোরাদ ও আরংজীবের সৈন্যেরা সিপ্রানদী পার হইবার উদ্যম করিতে লাগিল, কিন্তু সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আরংজীব সৈন্যের পার হইবার জন্য অতিশয় নিপুণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উন্নত স্থানে তাঁহার কামান সাজাইয়া সম্মুখে শত্রুর আগমন রোধ করিয়া নিজ সৈন্যকে নদী পার হইতে বলিলেন। শত্রুরাও কামান সাজাইয়াছিল ও তদ্দ্বারা আরংজীবের সৈন্যের নদী পার হওয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, অনেকক্ষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। যশোবন্তসিংহ অপূর্ব্ব বীর্য্যবল প্রকাশ করিয়া মোগলদিগের গতিরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোদ্ধা কাসেমখাঁ সেরূপ যত্ন করিলেন না। তাৎকালিক লেখকেরা সন্দেহ করেন যে, তিনি আরংজীবের অর্থে বশীভূত হইয়া আপন গোলা ও বারুদ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সৈন্যের কামান অচিরাৎ নিস্তব্ধ হইল। এ অবস্থায় শত্রুর কামানের সম্মুখে যুদ্ধ করা যশোবন্তের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল; কিন্তু তিনি ভগ্নপ্রযত্ন না হইয়া অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুদিগের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। সে স্থান পর্ব্বতময়, সুতরাং আক্রমণকারিগণ সহজে নদী পার হইতে পারিল না; কিন্তু সাহসী মোরাদ কতিপয় সৈন্য লইয়া সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া জয় জয় নাদে নদী পার হইলেন, তাহা দেখিয়া সমস্ত সৈন্য নদী পার হইল। ভীরু কাসেমখাঁ তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে পলায়ন করিলেন, সুতরাং যশোবন্তসিংহের বিপদের সীমা রহিল না। কিন্তু সেই অসমসাহসী রাজপুত চতুর্দ্দিকে শত্রুকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনা-সংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল, তাঁহার প্রিয় অনুচরেরা চতুর্দ্দিকে হত হইতে লাগিল, মোগলেরা জয় জয় নাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিল, তথাপি বীর রাজপুতেরা রণে ভঙ্গ দিল না। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়া যশোবন্তসিংহ কেবলমাত্র পঞ্চ শত সেনা লইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন, সপ্ত সহস্র রাজপুত সেই দিন সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : চিতোর

WHERE like a man beloved
of God,
Through glooms, where never
woodman trod,
How oft pursuing
fancies holy,
By moonlight way o'fer flowering
weeds I wound,
Inspired beyond the guess of folly,
By each rude shape and wild
unconquerable sound!
O ye loud waves! and O ye forests
high!
And O ye clouds that far above me
soared!
Thou rising sun! and blue rejoicing
sky!
Yea, everything that is and will be
free!
Bear witness for me, wheresoe'er ye
be,
With what deep worship I have still
adored
The spirit of divine Liberty;

—*Coleridge.*

যশোবন্তসিংহের অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সেনা রাজপুতানা অভিমুখে আসিতে লাগিল। নরেন্দ্র তাঁহার পরম বন্ধু গজপতির মরণে অতিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রত্যহ নূতন নূতন দেশ দেখিতে দেখিতে সে দুঃখ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন। কয়েক দিন আসিতে আসিতে সৈন্যেরা অবশেষে রাজপুতানার অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িল। যশোবন্তসিংহ মাড়ওয়ার দেশের রাজা, সে দেশে আসিতে হইলে মেওয়ার দেশের অভ্যন্তর দিয়া আসিতে হয়।

মেওয়ার দেশের অসংখ্য দুর্গ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। দুর্গগুলি প্রায়ই পর্ব্বত-চূড়ায় নির্ম্মিত, সহসা হস্তগত করা শত্রুর দুঃসাধ্য। পর্ব্বতগুলি উন্নত শিরে মুকুটস্বরূপ দুর্গ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সে সমস্ত দুর্গে উঠিবার পথ নাই, কেবল একদিকে সোপানের ন্যায় পথ আছে, তাহার উপর দিয়া লোকে গমনাগমন করে। যুদ্ধকালে দুর্গের ভিতর খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত হয়, সেই একটীমাত্র দ্বার রুদ্ধ হয়, পরে শত্রুগণ যাহাই করুক না, দুর্গবাসিগণ নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে। শত্রুরা দুর্গে উঠিবার উপক্রম করিলে উপর হইতে প্রস্তররাশি নিক্ষিপ্ত হয়, ঐ প্রস্তরাঘাতে একেবারে বহুসংখ্যক শত্রু বিনষ্ট হয়।

এইরূপ দুর্গ দেখিতে দেখিতে সৈন্যেরা অবশেষে একদিন সন্ধ্যার সময় চিতোরের দুর্গের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈন্যেরা আহারাদি সমাপ্ত করিয়া আপন আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতে গেল, কিন্তু নরেন্দ্র কতিপয় রাজপুতের সহিত চিতোর পর্ব্বতে উঠিয়া তাহার উপরস্থ দুর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বিস্মিত নয়নে কুম্ভরাজার সুন্দর স্তম্ভ দেখিলেন, পদ্মিনী রাজ্ঞীর প্রাসাদ ও সরোবর দেখিলেন, যে সিংহদ্বারে রাজপুত যোদ্ধৃগণ বার বার অসিহস্তে

জীবন দান করিয়াছেন তাহা দেখিলেন, যে চিতায় রাজপুত রমণীগণ চিতারোহণ করিয়া কুলমান রক্ষা করিয়াছেন সে গহ্বর দেখিলেন।

সহসা তাঁহাদের সম্মুখে একজন বৃদ্ধ মনুষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুতদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তিনি চিতোরের পুরাতন "চারণ"। চারণগণ পূর্ব্বকালে রাজপুতানার রাজাদিগের গৌরবগীত গাইয়া রাজপুরুষ ও নগরবাসীদিগের মনোরঞ্জন করিতেন; রাজপুতানায় এখন পর্য্যন্ত সন্ধ্যার সময়ে লোকে সমবেত হইয়া চারণের গীত শুনিতে ভালবাসে, ও পূর্ব্বগৌরবগান শুনিতে শুনিতে তাহাদিগের নয়ন বীরাশ্রুতে আপ্লুত হয়।

নরেন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী রাজপুতগণ চারণকে একটী শিলার উপর বসাইলেন ও আপনারা চারিদিকে বসিয়া প্রতাপসিংহের গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চারণ সেই গান আরম্ভ করিলেন।

গীত

"রাজপুতগণ! এটী আমার গীত নহে, অম্বর-গর্জ্জন-প্রতিঘাতী পর্ব্বতশৃঙ্গের গীত, বজ্রনাদী জলপ্রপাতের গীত, তোমরা শ্রবণ কর। যে পর্ব্বতকন্দরে একজন রাজপুতসেনার অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে, সেই গহ্বর হইতে এই গীত বহির্গত হইতেছে। যে পর্ব্বত-তরঙ্গবাহিনীর জল এক বিন্দু রাজপুতের শোণিতেও আরক্ত হইয়াছে, সেই তটিনীর কূলে এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। প্রতাপসিংহ! এটী তোমার গীত।

"ঐ দেখ আকবরের ভীষণপ্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে, কিন্তু প্রতাপের হৃদয় কম্পিত হইল না। চিতোর নগর আর তাঁহার নাই, তাঁহার পিতার রাজত্বকালে নিষ্ঠুর আকবর চিতোর কাড়িয়া লইয়াছে। দুর্গরক্ষার্থে জয়মল্ল জীবন দিয়াছিল, পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়া জীবনদান করিয়াছিল, তথাপি রাজপুতেব বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া আকবর চিতোর কাড়িয়া লইলেন। প্রতাপ যখন রাজা হইলেন তখন চিতোর নাই, সৈন্য নাই, অর্থ নাই, কিন্তু তাঁহার বীরান্তঃকরণ ছিল, বীরের দুঃসাধ্য কি আছে? প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজপুতরাজগণ দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিলেন, প্রতাপ করিলেন না। অম্বরের ভগবানদাস ও আড়ওয়ারের মল্লদেব নিজ নিজ দুহিতাকে দিল্লীর সম্রাটহস্তে অর্পণ করিলেন, মহানুভব প্রতাপ ম্লেচ্ছের কুটুম্ব হইতে অস্বীকার করিলেন। কেন স্বীকার করিবেন? মেওয়ারাধিপতিরা সূর্য্যবংশাবতংস, সে উন্নত বংশ কেন কলুষিত করিবেন?

"সাগরতরঙ্গের ন্যায় দিল্লীর সেনা মেওয়ার প্লাবিত করিল, তাহার সঙ্গে—হা জগদীশ! এ লজ্জার অঙ্ক কেন রাজস্থানের ললাটে অঙ্কিত করিল?—তাহার সঙ্গে রাজপুতরাজগণ যোগ দিলেন। মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি নানাদেশের রাজারা আপনাদিগের দাসত্বের কলঙ্ক অপনীত করিবার জন্য, প্রতাপকেও দিল্লীর দাস করিবার জন্য, আকবরের সহিত যোগ দিলেন। অম্বরের মানসিংহ প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, মহানুভব প্রতাপ ম্লেচ্ছের কুটুম্বের সহিত ভোজন করিতে অস্বীকার করিলেন। সরোষে মানসিংহ দিল্লী যাইয়া অসংখ্য সেনাতরঙ্গে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিলেন। মানসিংহ! তুমি কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া শত্রুদমন করিয়াছিলে,—কাহার জন্য? হায়! ম্লেচ্ছের অধীন হইয়া রাজপুত নাম ডুবাইলে? ম্লেচ্ছের পদরজঃ রাজপুতের ললাটে কি সুন্দর শোভা পাইতেছে!

"অন্ধকারে ঐ জলপ্রপাতের ভীষণ তেজ দেখিতে পাইতেছ? না, তোমরা পাইবে না, কিন্তু আমি অন্ধকারে থাকি, আমি দেখিতেছি। উহার মধ্যস্থলে উন্নত শিলাখণ্ড সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, জলপ্রপাতেও কম্পিত হইতেছে না। জলপ্রপাত অপেক্ষা অধিক তেজে সাগরগর্জ্জনে মোগলসৈন্য আসিয়া মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিল, শিলাখণ্ডের ন্যায় সগর্ব্বে প্রতাপ দণ্ডায়মান রহিলেন। হল্‌দীঘাটে মহাযুদ্ধ হইল, সেনাদিগের রব পর্ব্বতকন্দর হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু সাহসে কি হইবে? মোগলের অসংখ্য সেনা! দ্বাবিংশসহস্র রাজপুতের মধ্যে কেবল অষ্ট সহস্র লইয়া প্রতাপ পলায়ন করিলেন, অবশিষ্ট হল্‌দীঘাটের ভীষণ উপত্যকায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিলেন।

“এই কি একবার? বৎসর বৎসর এইরূপ সংগ্রাম হইল, বৎসর বৎসর প্রচুর সেনা, ধন, রাজ্য হ্রাস পাইতে লাগিল, বৎসর বৎসর তাঁহার জীবনাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব হ্রাস হইল না, তিনি দিল্লীর দাস হইলেন না।

“রাজপুত! তোমাদিগের চক্ষুতে যদি জল থাকে, বিসর্জ্জন কর, হৃদয়ে যদি শোণিত থাকে, বিসর্জ্জন কর! ঐ দেখ প্রতাপের রাজরাণী পর্ব্বতকন্দরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছে, রাজরাণী পর্ব্বতকন্দরে শয়ন করিয়া আছেন, প্রতাপ খড়্গহস্তে জাগরিত হইয়া আছেন। ঐ দেখ বৃক্ষ হইতে রজ্জু লম্বিত হইয়াছে, কাষ্ঠাসনে কি দুলিতেছে? জগদীশ! রাজার শিশু পুত্রেরা ঝুলিতেছে, নীচে রাখিলে হিংস্রক জন্তু লইয়া যাইবে। ঐ দেখ প্রতাপের পুত্রবধূ শুষ্কপত্র জ্বালাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতেছেন, রুটী প্রস্তুত হইল, সকল খাইও না, অর্দ্ধেক খাও, অর্দ্ধেক রাখিয়া দাও, আবার ক্ষুধা পাইলে কোথায় পাইবে? ঐ শুন, ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল! একটী বালিকার হস্ত হইতে বন্যবিড়াল রুটী কাড়িয়া লইয়া গেল, রাজকন্যা ক্ষুধায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

“রাজপুতগণ! প্রতাপের জয়গীত গাও, তিনি পঞ্চবিংশ বৎসর মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ব্বতশিখরে বাস করিয়াছেন, পর্ব্বত উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ব্বতকন্দরে স্ত্রীপরিবারকে পালন করিয়াছেন, তথাপি ইহজন্মে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। পর্ব্বতে পর্ব্বতে এই গীত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক, সমগ্র রাজস্থানে এই গীত শব্দিত হইতে থাকুক, হিমালয় হইতে প্রতিহত হইয়া সাগরবারি পর্য্যন্ত সঞ্চরণ করুক, হিমালয় অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হউক, আর যদি সাহস ও স্বদেশানুরাগের গৌরব থাকে, এই গীত আকাশপথে উত্থিত হইয়া স্বর্গের দ্বারে আঘাত করিয়া মানবের যশঃ-কীর্ত্তি বিস্তার করুক!”

চারণের ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল; ক্ষণপরে সকলে চাহিয়া দেখিল চারণ নাই, তাঁহার চিহ্নমাত্রও নাই, কেবল আকাশে মেঘরাশি ভীষণ গর্জ্জন করিয়া যেন তাঁহার ভয়াবহ গীত বার বার ধ্বনিত করিতে লাগিল।

রাজপুতেরা স্বদেশের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিতে করিতে উৎসাহে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, যোদ্ধাদিগের চক্ষু বীরাশ্রুতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর তাহারা উঠিয়া আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিল। নরেন্দ্র তাঁহাদের সহিত প্রস্থান করিলেন না, তিনি হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া সেই মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে ভীষণ চিতোর দুর্গের তলে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। মেঘ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না। আকাশের প্রান্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল বিদ্যুল্লতা জগৎ ও গগনমার্গ চমকিত করিতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া মেঘ ভীষণ গর্জ্জনে পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসে বহিতে লাগিল, নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না।

নরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—স্বদেশেও মহাবলপরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দ্দশা কেন? যুদ্ধই রাজপুতদিগের ব্যবসা; বালক, বৃদ্ধ, সকলেই যুদ্ধশিক্ষা করে, তাহারা ধন দিয়াছে, ঐশ্বর্য্য দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহাদের গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে, নগর লুণ্ঠিত হইয়াছে, দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা গৌরব বিসর্জ্জন দেয় নাই। সে গৌরবগীত আজিও আরাবলীর কন্দরে ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর বঙ্গদেশ! বেগ-প্রবাহিনী গঙ্গানদী তাহার গৌরবগীত গায় না, ব্রহ্মপুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না, রাজা প্রজা সকলেই বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছে! জগতে তাহাদিগের নাম নাই; বীরমণ্ডলীর মধ্যে তাহাদিগের স্থান নাই!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : যোধপুর

> UPON the mountain's dizzy brink she
> stood;
> She spake not, breathed not, moved
> not,—there was thrown
> On her look the shadow of a mood
> Which only clothes the heart in
> solitude,
> A thought of voiceless death!
>
> —*Shelley.*

পরদিন প্রাতে নরেন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, উক্ত চারণ শৈশবে মেওয়ারাধিপতি প্রতাপসিংহের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালাবধি চারণ প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতগুহা ও উপত্যকায় বাস করিত, ও সেই অল্পকালেই রাজার কীর্ত্তিগান রচনা করিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

দিল্লীশ্বরের সহিত অসংখ্য সংগ্রামের পর প্রতাপের যখন কাল হইল, তখন চারণের বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর। সে আজ ষাট বৎসরের কথা, সুতরাং চারণের বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় অশীতি বৎসর। তথাপি চারণ এখনও চিতোরের পর্ব্বতদুর্গে রজনীতে বিচরণ করে, সকলেই বলে চারণ দৈববলে বলিষ্ঠ।

প্রতাপের মৃত্যুর সময়ে তিনি মৃত্যুশয্যার নিকটে পুত্র অমরসিংহকে আনিয়া শপথ করাইয়াছিলেন যে, তিনিও পিতার ন্যায় চিরকাল মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন না। পিত্রাজ্ঞা পালনের জন্য অমরসিংহ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আকবর ও তাঁহার পুত্র জেহাঙ্গীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও পিতার ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে চারণ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও সর্ব্বসময়ে পিতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উত্তেজনা করিতেন। কিন্তু সে উত্তেজনা বিফল, শেষে অমরসিংহ জেহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু সে নামমাত্র অধীনতা, তিনিই স্বদেশের রাজা রহিলেন, দিল্লীতে যে কর পাঠাইতেন তাহা দ্বিগুণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতেন। অমরসিংহকে দিল্লী যাইতে হইত না, তাঁহার পুত্র করুণ ও পৌত্র জগৎসিংহকে জেহাঙ্গীর ও তাঁহার মহিষী নূরজেহান সর্ব্বদাই সমাদরের সহিত আহ্বান করিতেন ও অনেক মণিমুক্তা দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। ইহাকে প্রকৃত অধীনতা বলে না, তথাপি চারণ রোষে ও অভিমানে অমরসিংহকে রাজা জ্ঞান না করিয়া অনেক কটূক্তি করিয়া প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহও লাঞ্ছিত হইলেন, এবং পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাজগদী ত্যাগ করিলেন, করুণ রাজা হইলেন।

আকবর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংস হওনের পরই উদয়পুর নামে এই সুন্দর রাজধানী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু চারণ ভগ্ন চিতোর দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন, এক দিন দুই দিন অন্তর দুর্গ হইতে অবতরণ করিতেন, নীচে পল্লীগ্রামবাসীরা যাহা দিত তাহাই খাইতেন, আবার দুর্গে আরোহণ করিয়া থাকিতেন। এইরূপ নির্জ্জনে বাস করিয়া চারণ উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন। পর্ব্বত গহ্বর তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে, মেঘগর্জ্জন ও ঝটিকায় বন কম্পিত হইলে তাঁহার বড় উল্লাস হয়, তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন আবার প্রতাপ আকবরশাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

রাজপুত সেনাগণ কয়েক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে আরাবলী পার হইয়া যাইল। সেনাগণ কখন উপত্যকা দিয়া যাইত, দুই দিকে পর্ব্বতরাশি মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, শেখরগুলি যেন আকাশ হইতে নীচে অবলোকন করিতেছে। সেই সমস্ত শেখর হইতে অসংখ্য জলপ্রপাত দূর হইতে রৌপ্যপুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কখন রবিকরে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে, কখন বা অন্ধকারে দৃষ্ট হইতেছে না। ঝরণার জল নিম্নে পড়িয়া কোন স্থানে শৈল নদীরূপে প্রবাহিত

হইতেছে, আবার কোথাও বা চারিদিকে পর্ব্বত থাকায় সুন্দর স্বচ্ছ হ্রদের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তাহার জল পরিষ্কার ও নিষ্কম্প, তাহার উপর চারিদিকে পর্ব্বতশেখরের ছায়া যেন নিদ্রিত রহিয়াছে।

কখন বা সেনাগণ নিশাকালে পর্ব্বতপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে লাগিল। সে নৈশ পর্ব্বতের শোভা কাহার সাধ্য বর্ণনা করে। দুইদিকে পর্ব্বতচূড়া চন্দ্রকরে সমুজ্জ্বল, কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে নিস্তব্ধ ও শান্ত, যেন যোগিপুরুষ পার্থিব সকল প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরিষ্কার আকাশে ললাট উন্নত করিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। সেই শান্ত রজনীতে উভয় দিকের পর্ব্বতের সেইরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে মধ্যস্থ পথ দিয়া সৈন্যগণ যাইতে লাগিল।

পর্ব্বতের সহস্র উপত্যকা ও কন্দরে অসভ্য আদিবাসী ভীলগণ বাস করিতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও যেরূপ, রাজপুতানায়ও সেইরূপ, আর্য্যবংশীয়েরা অসিহস্তে আসিয়া কৃষিকার্য্যোপযোগী সমস্ত দেশ কাড়িয়া লইয়াছে, আদিমবাসীরা পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেছে। তাহারা রাজপুতানার রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করে না, তথাপি মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের সময় অনেকে ধনুর্ব্বাণহস্তে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া রাজপুতদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছে।

পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যশোবন্ত অচিরাৎ আপন মাড়ওয়ার দেশে আসিয়া পড়িলেন। মেওয়ার ও মাড়ওয়ার দুই দেশ দেখিলেই বোধ হয় যেন প্রকৃতি লীলাক্রমে দুই দেশের বিভিন্নতা সাধন করিয়াছেন। মেওয়ারে যেরূপ পর্ব্বতরাশি ও বিশাল বৃক্ষাদি ও লতাপত্রের গৌরব, মাড়ওয়ারে তাহার বিপরীত। পর্ব্বত নাই, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ নাই, উর্ব্বরা ক্ষেত্র নাই, বেগবতী তরঙ্গিণী নাই, পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদ নাই, কেবল মরুভূমিতে বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, ও স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্রকায় কণ্টকময় বাবুল ও অন্যান্য বৃক্ষ দেখা যাইতেছে। এই মরুভূমির উপর দিয়া সেনাগণ যাইবার সময় মেওয়ারদেশীয় সেনাগণ মাড়ওয়ারী সেনাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—

আক রা ঝোপ, ফোক রা বার,
বাজরা রা রোটী, মোঠ রা দার,
দেখো হো রাজা তোরি মাড়ওয়ার।

মাড়ওয়ারীগণ সগর্ব্বে উত্তর করিল,—আমাদের জন্মভূমি উর্ব্বরা নহে, কিন্তু বীর-প্রসবিনী বটে! প্রকৃত মাওড়য়ারের রাজপুতেরা কঠোর জাতি, রাজপুতানায় তাহাদের অপেক্ষা সাহসী জাতি আর ছিল না।

সৈন্যগণ এইরূপে কয়েকদিন ভ্রমণ করিতে করিতে রাজধানী যোধপুরের সম্মুখে পৌঁছিল ও শিবির সন্নিবেশিত করিল। তখন নরেন্দ্র স্বীয় বন্ধু গজপতির কথা স্মরণ করিয়া একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। রাজা যশোবন্তসিংহ শিবিরে একাকী বিষন্ন-বদনে বসিয়া আছেন, নরেন্দ্র তাঁহার নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন।

রাজার আদেশ পাইয়া নরেন্দ্র কহিলেন,—মহারাজ! সিপ্রাতীরে আপনার একজন অনুচর হত হইয়াছেন। পূর্ব্বে একবার মহারাজ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই মুক্তামালা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিও আপনার দানের অপমান করেন নাই, সম্মুখযুদ্ধে হত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে গজপতিসিংহ এ মুক্তামালা আপনার হস্তে প্রত্যার্পণ করিতে আমাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন।

রাজা সেই মুক্তামালা ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—হা! গজপতি, মাড়ওয়ারে তোমা অপেক্ষা সাহসী যোদ্ধা কেহ ছিল না। তোমার পিতা তেজসিংহকে আমি জানিতাম, সূর্য্যমহল দুর্গে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। গজপতি! তুমি আমারই অনুরোধে মাড়ওয়ারে আসিয়াছিলে, বার বার যুদ্ধে পৈতৃক বিক্রম দেখাইয়াছ। একবার যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, সেই জন্য তোমাকে মুক্তামালা দিয়াছিলাম, এবার আপনার জীবন আমার জন্য বিসর্জ্জন দিয়া সেই মালা ফিরাইয়া দিলে! বৎস, নদীর জল একবার যাইলে আর ফিরিয়া আইসে না, রাজা একবার দান করিলে আর ফিরাইয়া লন না। তোমার বন্ধুর মুক্তামালা তুমি ললাটে ধারণ করিও, এবং যুদ্ধের সময়ে তাহার বীরত্ব যেন তোমার স্মরণ থাকে।

নরেন্দ্র রাজাকে শত ধন্যবাদ দিয়া সেই মালা শিরে ধারণ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ, আমার একটী আবেদন আছে। গজপতির দুইটী শিশু সন্তান আছে, তাহাদের মাতা নাই। গজপতি মহারাজকে বলিয়াছেন, যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, যেন কালে শিশু রঘুনাথও রাজাজ্ঞায় পিতার ন্যায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকামনা তাহার পিতাও জানে না।

এই করুণবাক্য শুনিয়া রাজার নয়নে জল আসিল। তিনি বলিলেন,—বৎস, ক্ষান্ত হও, আমি সে শিশুদের পিতাস্বরূপ হইব, যোধপুরের রাজ্ঞী স্বয়ং তাহাদের মাতা হইবেন। এখনও রাজ্ঞীকে আমাদের আগমন-সংবাদ দেওয়া হয় নাই, আমাদের দূত যাইতেছে। যাও তুমি স্বয়ং দূতের সঙ্গে যাইয়া রাজ্ঞীর নিকট গজপতির আবেদন জানাও, এবং তাঁহার শিশুদের জন্য দুটী কথা বলিও।

রাজার আজ্ঞানুসারে নরেন্দ্র কয়েকজন রাজপুত দূতের সহিত যোধপুরের দুর্গে গমন করিলেন। যোধপুর দুর্গ যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনও বিস্মরণ হইতে পারিবেন না। চতুর্দ্দিকে কেবল বালুকারাশি ও মরুভূমি, তাহার মধ্যে একটী উন্নত পর্ব্বত, সেই পর্ব্বতের শেখরের উপর যোধপুর দুর্গ যেন যোদ্ধার কিরীটের ন্যায় শোভা পাইতেছে! পর্ব্বততলে নগর বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং নগরের ভিতর দুইটী সুন্দর হ্রদ, পূর্ব্ব দিকে রাণীতলাও, দক্ষিণ দিকে গোলাপ সাগর। নগরবাসিনী শত শত কামিনী হ্রদ হইতে জল লইতে আসিতেছে, হ্রদের পার্শ্বস্থ সুন্দর উদ্যানে শত শত দাড়িম্ববৃক্ষ ফল ধারণ করিয়াছে, ও নাগরিকগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে সেই উদ্যানে বিচরণ করিতেছে। নগর নীচে রাখিয়া একদণ্ড ধরিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিয়া নরেন্দ্র প্রাসাদে পঁহুছিলেন! রাজ্ঞীর আদেশে দূতগণ ও নরেন্দ্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত রাজসিংহাসনে মহারাজ্ঞী বসিয়া আছেন, চারিদিকে সহচরী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ও চামর ঢুলাইতেছে। রাজ্ঞীর বদনমণ্ডল অবগুণ্ঠনে কিঞ্চিৎ আবৃত হইয়াছে, তথাপি সে নয়নের অগ্নিবৎ উজ্জ্বলতা সম্যক লুক্কায়িত হয় নাই। গরীয়সী বামা যথার্থই রাজমহিষীর ন্যায় সিংহাসনে বসিয়া আছেন, নিবিড় কৃষ্ণকেশে উজ্জ্বল রত্নরাজি ধক্‌ধক্‌ করিতেছে।

দূত প্রণত হইয়া ধীরে ধীরে সভয়ে সকল সংবাদ জানাইলেন। মহারাজ্ঞী ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন, বজ্রপাত ও ঝটিকার পূর্ব্বে আকাশমণ্ডল যেরূপ নিস্পন্দ থাকে, সেইরূপ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। সহসা অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া আরক্ত নয়নে দূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—কাপুরুষ! সেই সিপ্রানদীতে আপনার অকিঞ্চিৎকর শোণিত বিসর্জ্জন করিতে পার নাই? আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আর তোমার প্রভু সেই কাপুরুষকে বলিও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কলঙ্করাশিতে কলঙ্কিত হইয়াছেন, তিনি আমার এ পবিত্র দুর্গে প্রবেশ করিতে পাইবেন না। এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্ঞী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

রাজ্ঞীর সহচরীগণ অনেক যত্নে রাজ্ঞীর চৈতন্য সাধন করিল। তখন রাজ্ঞী ক্রোধে প্রায় জ্ঞানশূন্যা হইয়া কহিতে লাগিলেন,—কি বলিলি? তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন? যিনি পলায়ন করিয়াছেন, তিনি ক্ষত্রিয় নহেন, আমার স্বামী নহেন, এ নয়ন যশোবন্তসিংহকে আর দেখিবে না! আমি মেওয়ারের রাণার দুহিতা, প্রতাপসিংহের কুলে যিনি বিবাহ করেন তিনি ভীরু কাপুরুষ কেন হইবেন? যুদ্ধে জয় করিতে পারিলেন না, কেন সম্মুখরণে হত হইলেন না? দূতগণ! এক্ষণও দণ্ডায়মান আছ? আমার যোদ্ধৃগণ কোথায়? দূতগণকে পর্ব্বতের উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ কর, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর!

রাজ্ঞীর সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, ক্রোধে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন নরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে অতিশয় গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—মহারাজ্ঞি! আমাদের মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন, আমরা মৃত্যু ভয় করি না, কিন্তু মহারাজা যশোবন্তসিংহকে কাপুরুষ বলিবেন না। এই নয়নে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, যতদিন জীবিত থাকিব সেরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কখনও দেখিব না, সেরূপ অদ্বিতীয় বীর কখনও দেখিব না।

রাজ্ঞী ক্ষণেক স্থিরনয়নে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—যথার্থই কি যশোবন্তসিংহ সম্মুখযুদ্ধ করিয়াছিলেন? তুমি বিদেশীয়, তোমার জীবনের কোন ভয় নাই, যথার্থ কথা বিস্তার করিয়া বল।

নরেন্দ্র যুদ্ধের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। রাজপুত-সৈন্যের যেরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন, মহারাজের যেরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। শেষে বলিলেন,—যখন মেঘরাশির ন্যায় চারিদিকে মোগলসেনা আসিয়া বেষ্টন করিল, যখন ধূম ও ধূলায় ক্ষেত্র অন্ধকার হইয়া যাইল, যখন ভীরু কাসেমখাঁ পলায়ন করিল, তখনও মহারাজ রাজপুতের উচিত সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে রাজপুত শোণিতে পর্ব্বত, উপত্যকা ও সিপ্রানদী আরক্ত হইয়াছে, রাজার চতুর্দ্দিকে অল্পসংখ্যকমাত্র রাজপুত আছে, আরংজীব ও মোরাদ সহস্র মোগল-সৈন্য সহিত রাজার উপর আক্রমণ করিতেছেন, তখনও মহারাজা যশোবন্ত সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজার পদতলে শত শত রাজপুত হত হইতে লাগিল, রাজপুত-সংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল, মোগলের জয় জয়নাদে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু মহারাজের হৃদয় কম্পিত হইল না। অষ্ট সহস্র রাজপুতের মধ্যে অষ্ট শতও জীবিত ছিল না, তথাপি মহারাজ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। ঘোর কল্লোলিনী সিপ্রানদী ও ভীষণ বিন্ধ্যপর্ব্বত রাজা যশোবন্তের বীরত্বের সাক্ষী আছে!

শুনিতে শুনিতে রাজ্ঞীর নয়নদ্বয় জলে ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। বলিলেন,—ভগবন্‌! তোমাকে নমস্কার করি, আমার যশোবন্ত রাজপুতের নাম রাখিয়াছেন! বিদেশীয় দূত, এ কথায় আমার হৃদয় শীতল হইল। বল তাহার পর কি হইল?

নরেন্দ্র। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, যশোবন্ত তাহা করিয়াছেন। যখন কেবলমাত্র পঞ্চশত সৈন্য জীবিত আছে দেখিলেন, তখন রাজা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

রাজ্ঞী। পলায়ন করিলেন! হা বিধাতঃ! রাণার জামাতা পলায়ন করিলেন!—বক্ষস্থলে সজোরে করাঘাত করিয়া রাজ্ঞী পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ দাসীগণ রাজ্ঞীর মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল। রাজ্ঞীও অল্পক্ষণ মধ্যেই চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া এবার করুণস্বরে বলিলেন,—সহচরি! চিতা প্রস্তুত কর, আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইয়াছেন, তিনি স্বর্গধামে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমি তথায় যাই। যশোবন্তের নামে যে আসিয়াছে সে প্রবঞ্চক। আর তুই দূত, তোর সঙ্গিগণের সহিত এইক্ষণেই মাড়ওয়ার দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হ, নচেৎ প্রাণদণ্ড হইবে।

নরেন্দ্র ও দূতগণ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, রাজ্ঞীর আজ্ঞায় দুর্গের দ্বার রুদ্ধ হইল। বাহিরে যাইবার সময় যোধপুরের রাজমন্ত্রী দূতের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন,—মহারাজের সহিত তোমাদের দেখা করিবার আবশ্যকতা নাই, এই পত্র লইয়া শীঘ্র মেওয়ার দেশের রাজধানী উদয়পুরে যাও। তথায় রাণা রাজসিংহকে এই পত্র দিও, তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিবেন, আমাদের মহারাজ্ঞীর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, মাড়ওয়ারে আর থাকিতে পাইবে না। মহারাজ্ঞীর মাতা তথায় আছেন, এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র তিনি যোধপুরে আসিবেন, তিনি ভিন্ন তাঁহার কন্যাকে আর কেহ সান্ত্বনা করিতে পারিবেন না।

ইতিহাসে লিখিত আছে যে যোধপুরের রাজ্ঞী আট নয় দিবস অবধি উন্মত্তপ্রায় হইয়া রহিলেন। পরে উদয়পুর হইতে তাঁহার মাতা আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন, তখন তিনি যশোবন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যশোবন্তসিংহ আরংজীবের সহিত অচিরাৎ যুদ্ধ করিতে যাইবেন, স্থির হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ : উদয়পুর

> HE lingered pouring on memorials
> Of the world's youth; through the long burning day
> Gazed on those speechless; nor when the moon
> Filled the magisterial halls floating, shades,
> Suspended he that task, but ever gazed
> And gazed, till meaning on his vacant mind
> Flashed like strong inspiration.
>
> —*Shelley.*

মেওয়ার দেশে পূর্ব্বে চিতোর প্রধান নগরী ছিল, এক্ষণে উদয়পুর। মাড়ওয়ারে বালুকারাশি ও মরুভূমি হইতে পর্ব্বতপ্রধান মেওয়ার দেশে পুনরায় আসিতে নরেন্দ্রনাথ বড়ই আনন্দানুভব করিলেন। আবার আরাবলীর উচ্চ শেখর উল্লঙ্ঘন করিলেন, আবার পার্ব্বতীয় নদী ও প্রস্রবণের বেগ ও মহিমা সন্দর্শন করিলেন, আবার শান্ত নিস্তব্ধ পর্ব্বত-হ্রদের শোভা দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে অতুল আনন্দ উদয় হইল। কিছুদিন এইরূপে ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ও যোধপুরের দূতগণ উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল সেরূপ সুন্দর স্থানে সেরূপ সুন্দর নগরী পূর্ব্বে তিনি কখন দেখেন নাই। নীচে সুন্দর শান্ত প্রশস্ত হ্রদ, নির্ম্মল আকাশ ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর ছায়া সযত্নে বক্ষে ধারণ করিতেছে! চতুর্দ্দিকে সুন্দর পর্ব্বতরাশির পর পর্ব্বতরাশি, যেন প্রকৃতি এই মনোহর উচ্চ প্রাচীর দিয়া এই সুখের আবাসস্থানকে রক্ষা করিতেছে! হ্রদের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতশ্রেণীর উপর সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও শ্বেতবর্ণ সৌধমালা যেন সহাস্য বদনে নির্ম্মল দর্পণে আপনার সুন্দর প্রতিরূপ অবলোকন করিতেছে।

সূর্য্যদ্বার দিয়া যোধপুরের দূত নগরে প্রবেশ করিলেন। যোধপুরে ও উদয়পুরে তখন বন্ধুত্ব ছিল, সুতরাং যোধপুরের দূতগণকে আহ্বান করিবার জন্য নাগরিকগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রশস্ত পথ দিয়া নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণ রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতে লাগিলেন; চারণগণ "টপ্পা" অর্থাৎ মঙ্গলসূচক গীত গাইতে লাগিলেন, দুই পার্শ্বের স্ত্রীলোকগণ কলসকক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া "সুহেলিয়া" অর্থাৎ আনন্দগীত গাইয়া যোধপুরের দূতদিগকে আহ্বান করিলেন। দূতগণ সকলকেই দুই এক মুদ্রা পুরস্কার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

অনন্তর রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া রাণার অনুমতিক্রমে প্রাসাদের উপর উঠিলেন। শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত সোপান দ্বারা আরোহণ করিয়া সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিলেন। সেই মহলেই রাণা বিদেশীয় দূতদিগকে আহ্বান করিতেন, বংশের আদিপুরুষ সূর্য্যের একটী প্রতিমূর্ত্তি সেই গৃহের এক দেওয়ালে খোদিত ছিল, সেই জন্য উক্ত মহলের নাম সূর্য্যমহল।

রক্তবর্ণ বস্ত্রমণ্ডিত বহুমূল্য রত্নবিনির্ম্মিত রাজাসনে বাপ্পা রাওয়ের বংশাবতংস মহারাণা রাজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। চারিদিকে সুবর্ণখচিত রৌপ্য স্তম্ভের উপর একটী চন্দ্রাতপ মণিমুক্তায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। কিঞ্চিৎ দূরে পারিষদগণ উপবেশন করিয়া আছেন, ও চারণগণ স্তুতিবাক্যে এই অমরাবতী তুল্যা রাজসভায় রাণার সাধুবাদ করিতেছেন। এরূপ সময়ে যোধপুরের দূত প্রবেশ করিলেন।

দূত বিনীতভাবে সমস্ত সমাচার অবগত করাইলেন। যশোবন্তসিংহের পরাজয় ও দেশে প্রত্যাগমন, মহারাজ্ঞীর ক্রোধ ও রাজার দুর্দ্দশা, এই সমস্ত অবগত করাইয়া যোধপুরের মন্ত্রীর পত্র রাণার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাণা রাজসিংহ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া যশোবন্তের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া দূতগণকে বিদায় করিলেন, ও তাঁহাদের উদয়পুরে থাকিবার জন্য উপযুক্ত

স্থান নির্দ্ধারিত করিতে মন্ত্রিবরকে আদেশ করিলেন। অল্পদিন পরেই যোধপুর-রাজ্ঞীর মাতা উদয়পুর হইতে যোধপুরে গমন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে কয়েক মাস বাস করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। হেমের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছিল, হেমের চিন্তা তিরোহিত হইবার নহে। তথাপি সেই সুন্দর উপত্যকায় বাসকালীন সে চিন্তাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হইল। উদয়পুর হইতে অল্প দূরে অনেক যুদ্ধস্থান, অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ, অনেক পূজাস্থান আছে, নরেন্দ্র একে একে সমুদায় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। কখন একাকী, কখন দেওয়ানা তাতার বালককে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্র নানা পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতেন, হ্রদের এক অংশ হইতে অন্য অংশে, এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। কখন কখন প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পর্ব্বত ও উপত্যকায় বিচরণ করিতেন। প্রাতঃকালে ক্রীড়াসক্ত রাজপুত বালকগণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই অপরিচিত ভ্রমণকারীকে দেখাইত, সায়ংকালে রাজপুত মহিলাগণ কলসকক্ষে হ্রদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেই বিদেশীকে চারণ বিবেচনায় প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত।

দেওয়ানাও নিস্তব্ধে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিত, নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া আনিয়া দিত, ও সায়ংকালে নৌকা আনিয়া আপনি দাঁড় ধরিয়া প্রভুকে উদয়পুরে পুনরায় লইয়া যাইত। নিস্তব্ধ শান্ত হ্রদের উপর দিয়া ধীরে ধীরে নৌকা ভাসিয়া যাইত, সে শান্ত সায়ংকালীন আকাশ, নিস্তব্ধ পর্ব্বতরাশি, ও নির্ম্মল শব্দশূন্য হ্রদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইত। কখনও বা দেওয়ানা সপ্তস্বরে গীত আরম্ভ করিত, সে বাল-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুবিমল স্বরে সেই নৈশহ্রদ, পর্ব্বতরাশি ও আকাশমণ্ডল ভাসিয়া যাইত। তাতার ভাষায় গীত, সে গান নরেন্দ্র বুঝিতে পারিতেন না, তথাপি দুই একটী কথা শুনিয়া বোধ হইত যেন তাহা প্রেমের গান। অভাগা উন্মত্ত বালক! তুই এই বয়সে কি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিস? না হইলে সে দেওয়ানা হইবে কেন, তাহার চক্ষু এরূপ অস্বাভাবিক জ্যোতিঃতে দীপ্ত কেন, সে দেশ, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্ত হইয়া দেশে দেশে বিচরণ করে কেন? দেওয়ানা নরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত ভৃত্য!

রজনীযোগে চন্দ্রালোকে সেই হ্রদের নির্ম্মল জল বড় সুন্দর শোভা পাইত। জলহিল্লোলে চন্দ্রের আলোক বড় সুন্দর নৃত্য করিত, বায়ু রহিয়া রহিয়া সেই সুন্দর ঊর্ম্মিমালাকে চুম্বন করিয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ নৌকার উপরে শয়ান হইয়া চারিদিকের সেই অনন্ত পর্ব্বতরাশি দেখিতেন, অনন্ত আকাশে নির্ম্মল নীল আভা দেখিতেন, দুই একখানি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র মেঘ দেখিতেন। এই সমস্ত দেখিতেন আর বাল্যকালের কথা তাঁহার স্মরণ হইত, হেমলতার কথা স্মরণ হইত, অলক্ষিত অশ্রুবিন্দুতে যোদ্ধার বদন সিক্ত হইয়া যাইত।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। ক্রমে আশ্বিন মাসে অম্বিকাপূজার সময় সমাগত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ : শারদীয়া পূজা

Go where glory waits thee.
—*Moore.*

শরৎকাল উপস্থিত। রাজপুতানায় এই সময়ে যুদ্ধ আরম্ভের সময়, সুতরাং রাজস্থানে অম্বিকার পূজার সহিত খড়্গের পূজা হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে উপর্য্যুপরি দশ দিন নরেন্দ্রনাথ যেরূপ ঘটা ও সমারোহ দেখিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমস্ত অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন, যোদ্ধৃগণ এখন মহা উৎসাহে সেই সমস্ত অস্ত্র আয়ুধশালা হইতে বাহির করিয়া মহা সমারোহে তাহার পূজায় রত হইলেন। দেবীর মন্দিরে প্রতিদিন মহিষ ও মেষ বলি হইল, দশম দিবসে মহা সমারোহে দুর্গার পূজা হইল, তাহার পর দিবসে মহারাণা সমস্ত যোদ্ধৃগণকে আহ্বান করিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। সে দিন সমস্ত উদয়পুর যেন নূতন শোভায় শোভিত হইয়াছে, বাজার, দোকান, পথ-ঘাটও পুষ্পমাল্য ও বৃক্ষপত্রে পরিশোভিত হইয়াছে, দ্বারে দ্বারে সুন্দর ও সুশোভিত তোরণ দৃষ্ট

হইতেছে, গৃহে গৃহে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে। প্রাতঃকালে জয়ঢাকের শব্দে রাজপুত সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া রঙ্গস্থলে গমন করিতেছে, উদয়পুরের অধীনস্থ নানা স্থান হইতে অনেক সেনানী নিজ নিজ সৈন্য-সামন্ত লইয়া সমবেত হইয়াছে, নানাস্থানীয় লোকের নানারূপ পরিচ্ছদ, নানারূপ পতাকা ও নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র আজি উদয়পুরে সম্মিলিত হইতেছে। পঞ্চদশ সহস্র যোদ্ধা আজি মহারাণাকে বেষ্টন করিয়াছে, তাহাদিগের পদভরে যেন মেদিনী কম্পিত হইতেছে।

বেলা এক প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রঙ্গস্থল সৈন্যে সমাকীর্ণ, এবং তাহাদিগের যুদ্ধকৌশল দেখিবার জন্য সমস্ত নগরবাসী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। রাণার আদেশে সৈন্যগণ তীরনিক্ষেপে বা বর্শাচালনে, খড়্গ-যুদ্ধে অথবা অশ্বচালনে, নিজ নিজ কৌশল দেখাইতে লাগিল, এবং মেওয়ারের নানা স্থান ও নানা দুর্গ হইতে আগত নানা কুলের রাজপুতগণ নিজ নিজ রণনৈপুণ্য দর্শাইতে লাগিল। চন্দাওয়ৎকুল, জগাওয়ৎকুল, রাঠোরকুল, প্রমরকুল, ঝালাকুল প্রভৃতি নানা কুলের রাজপুতগণ অদ্য উদয়পুরে মহারাণার নিকট রাজভক্তি ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আসিয়াছে, এবং তাহাদিগের স্ব স্ব চারণগণ সেই সেই কুলের গৌরবসূচক গীত গাইতেছে। নরেন্দ্র সমস্ত দিন এইরূপ সমরোৎসব দেখিয়া এবং চারণদিগের গীত শুনিয়া পুলকিত হইলেন। অদ্যাবধি রাজস্থানে শারদীয় পূজার শেষ দিনে এইরূপ ঘটা হয়, অদ্যাবধি রাজপুত যোদ্ধৃগণ এই সময়ে নিজ নিজ রাজার নিকট সমবেত হইয়া যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করে, অদ্যাবধি রাজপুত নগরবাসিগণ দেবীপূজার অবসানে রঙ্গস্থলে সমবেত হইয়া দেশীয় রাজভক্তি প্রদর্শন করে। বর্ত্তমান লেখক রাজস্থানে ভ্রমণকালীন শারদীয় খড়্গপূজা ও শারদীয় সমারোহ অবলোকন করিয়াছে, সহস্র সহস্র নগরবাসীদিগের সমাগম ও রাজভক্তি দৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীন নিয়ম অনুসারে স্বাধীন রাজপুতদিগের শরৎকালের আনন্দোৎসব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছে।

সমস্ত দিন এইরূপ উৎসব দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় একটী বৃক্ষতলে যাইয়া কিছু ফলমূল আহারের আয়োজন করিলেন, এবং নিকটস্থ একটী কূপ হইতে জল আনিতে গেলেন। কূপের নিকট গোস্বামিবেশে একজন দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিও জল আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে কিঞ্চিৎ পরুষভাবে ঠেলিয়া দিয়া আগে নিজে জল তুলিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর এই অভদ্রাচরণ দেখিয়া নরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিরস্কার করিলেন। গোস্বামী দ্বিগুণ কটুভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—তুমি বিদেশীয়, রাজস্থানে আসিয়া রাজপুতদিগের সহিত কলহ করিতে তোমার ভয় বোধ হয় না?

নরেন্দ্র। আমি বিদেশীয় বটে, কিন্তু বহুকাল অবধি রাজপুতদিগের সহিত সহবাস করিয়াছি; তোমার ন্যায় অভদ্র রাজপুত দেখি নাই।

গোস্বামী। যদি রাজপুতদিগের সহিত সহবাস করিয়া থাক, তাহা হইলে বোধ হয় জান যে রাজপুত মাত্রেই অসি ও ঢাল চালাইতে জানে। অতএব চুপ করিয়া থাক।

নরেন্দ্র। গর্ব্বিত রাজপুত, আমিও অসি ও ঢাল চালনায় কিছু শিক্ষা করিয়াছি, আমার নিকট গর্ব্ব করিও না। তুমি গোস্বামী বলিয়া এবার ক্ষমা করিলাম।

কথায় কথায় বিবাদ বাড়িতে লাগিল, গোস্বামী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্রকে প্রহার করিলেন, নরেন্দ্রও প্রহার করিলেন, অল্পক্ষণে উভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া অসি ও ঢাল বাহির করিলেন। তখন অন্ধকার হইয়াছে, সে স্থান হইতে আর সকলে চলিয়া গিয়াছে।

দুইজনে একেবারে বেগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকাল তাহাদের কাহাকেও ভাল করিয়া দেখা গেল না। মুহূর্ত্তমধ্যে নরেন্দ্র পরাজিত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব বলবান গোস্বামীর প্রচণ্ড আঘাতে নরেন্দ্রের ঢাল চূর্ণ হইয়া গেল, নরেন্দ্রের অসি হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, নরেন্দ্র স্বয়ং ভূমিতে নিপাতিত হইলেন।

তীব্রস্বরে গোস্বামী বলিলেন,—বিদেশীয় যোদ্ধা, তুমি বালক, তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। পুনরায় রাজপুত গোস্বামীর সহিত কলহ করিও না, গোস্বামীর চিরজীবন কেবল পূজাকার্য্যে অতিবাহিত হয় নাই, সেও যুদ্ধ ব্যবসা কিছু জানে।

নরেন্দ্র কর্কশস্বরে বলিলেন,—রাজপুত! আমি তোমার নিকট জীবনভিক্ষা চাহি না। তোমার যাহা ইচ্ছা, যাহা সাধ্য কর, আমি অনুগ্রহ চাহি না।

গোস্বামী তখন গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—যোদ্ধা, আমিও যুদ্ধব্যবসা করিয়া থাকি, যোদ্ধার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যোদ্ধার কোন অপমান নাই। নরেন্দ্র, আমি তোমাকে জানি, তুমিও

আমাকে শীঘ্র জানিবে, আমার নিকট ভিক্ষাগ্রহণ করিতে কোনও অপমান নাই। তিন দিবসের মধ্যে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে, সে দিন আমিও তোমার নিকট একটী ভিক্ষা প্রার্থনা করিব। আমার নাম শৈলেশ্বর!

এই বলিয়া গোস্বামী সহসা অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ একলিঙ্গের মন্দির

FOR thee young warrior welcome? thou hast yet.
Some tasks to learn, some frailties to forget.

—*Moore.*

রাজস্থানে নূতন নূতন দেশ ও নূতন নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় কিছুদিন শান্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রস্তরে যে অঙ্ক খোদিত হয়, তাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় না। বঙ্গদেশ হইতে উদয়পুর শত শত ক্রোশ অন্তর, কত নদ, নদী, পর্ব্বত, মরুভূমি পার হইয়া নরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। তথাপি প্রাতঃকালে যখন পূর্ব্বদিকে আকাশে রক্তিমাচ্ছটা অবলোকন করিতেন, তখন সেই পূর্ব্বদেশবাসিনী বালিকা নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইত। রজনীতে যখন নরেন্দ্রনাথ একাকী ছাদের উপর অন্ধকারে বিচরণ করিতেন, বোধ হইত যেন সেই প্রণয়প্রতিমা তারার জ্যোতিঃতে নরেন্দ্রনাথের উপর প্রেম-দৃষ্টি করিতেছে! কোথায় বীরনগরের বাটী, কোথায় কলনাদিনী ভাগীরথী, আর কোথায় নরেন্দ্রনাথ? কিন্তু স্বদেশ হইতে পলায়ন করিলে কি চিন্তা হইতে পলায়ন করা যায়? মৃত্যুর আগে আর একবার সেই হেমলতাকে দেখিবেন, প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, নিশীথে তিনি যে চিন্তা করেন, হেমলতাকে একবার সেই সমস্ত কথা বলিবেন, নরেন্দ্রনাথের কেবল এই ইচ্ছা। মৃত্যুর আগে কি আর একবার দেখা হইবে না? নরেন্দ্রনাথ দেওয়ানার নিকটে শুনিলেন, ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরের কোন এক গোস্বামী ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন; নরেন্দ্রনাথ একদিন সেই মন্দিরে যাত্রা করিলেন।

রজনী এক প্রহরের পর নরেন্দ্র মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন ও মন্দিরের যে শোভা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মন্দির একটী উপত্যকায় নির্ম্মিত, তাহার চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, কেবল অন্ধকারময় পর্ব্বতরাশি অন্ধকার আকাশের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, চারিদিকে যেন প্রকৃতি অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর দিয়া রুদ্রের উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় নরেন্দ্র সেই প্রকাণ্ড মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সারি সারি শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর স্তম্ভের মধ্য দিয়া সেই বিস্তীর্ণ প্রস্তরালয়ে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে মহাদেবের ষণ্ড ও নন্দীর পিত্তল প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, ভিতরে শুভ্র প্রকোষ্ঠ ও স্তম্ভসার উজ্জ্বল সুগন্ধ দীপাবলিতে ঝলমল্ করিতেছে, মধ্যে ভোলানাথের প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মন্দিরের একজন দীর্ঘকায় তেজস্বী জটাধারী গোস্বামী এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া আছেন, প্রশস্ত ললাটে অর্দ্ধশশাঙ্কের ন্যায় চন্দনরেখা, বিশাল স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। অন্য দুই চারি জন গোস্বামী এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছেন। ঐ মন্দিরের প্রধান গোস্বামী চিরকাল অবিবাহিত থাকেন, তাঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যের মধ্যে একজন ঐ পদে নিযুক্ত হন। মন্দিরের সাহায্যার্থে অনেক সংখ্যক গ্রাম নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা ভিন্ন যাত্রীদিগের দানও অল্প ছিল না।

দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব সেই সুন্দর শিলামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, বম্ বম্ হর হর শব্দে মন্দির পরিপূরিত হইল, ও তৎপরে যন্ত্র-সম্মিলিত উচ্চ গীতধ্বনিতে ভোলানাথের স্তব আরম্ভ হইল। প্রৌঢ়যৌবনসম্পন্না নর্ত্তকীগণ তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল, গায়কগণ সপ্তস্বরে মহাদেবের অনন্ত গীত গাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণেক পর গীত সাঙ্গ হইল, সেই জটাধারী গোস্বামী ইঙ্গিত করায় নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল, গায়কগণ নিস্তব্ধ হইল, মন্দিরের দীপাবলী

নির্ব্বাপিত হইল, পূজা সাঙ্গ হইল। নরেন্দ্রনাথ সে অন্ধকারে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পর বোধ হইল, যেন অন্ধকারে সেই দীর্ঘকায় জটাধারী গোস্বামী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ সেই দিকে যাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয় কি এ মন্দিরের একজন গোস্বামী? গোস্বামী কিছুমাত্র না বলিয়া ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। তৎপরে গোস্বামী অঙ্গুলি দ্বারা দূরে এক দিক নির্দ্দেশ করিলেন, নরেন্দ্র সেই দিকে চাহিলেন, নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার চাহিলেন, বোধ হইল যেন অন্ধকারে একটী দীপশিখা দেখা যাইতেছে। গোস্বামী নরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দুইজনে অনেক পথ সেই অন্ধকারে অতিবাহিত করিলেন। এ অন্ধকারে এই মৌনাবলম্বী যোগী পুরুষ কে? ইঁহার উদ্দেশ্য কি? শৈবগণ কখন কখন নরহত্যা দ্বারা পূজাসাধন করে, এ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ বিকট যোগীর কি তাহাই উদ্দেশ্য? একবার নরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন, আবার খড়্গে হাত দিয়া ভাবিলেন,—আমি কি কাপুরুষ? এই প্রশান্তমূর্ত্তি যোগীর. সহিত যাইতে ভয় করিতেছি? আবার গোস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর শৈব গোস্বামী এক পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলেন, নরেন্দ্রও প্রবেশ করিলেন। তাহার ভিতর যাহা দেখিলেন তাহাতে নরেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন।

সম্মুখে করালবদনা কালীর ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি, তাহার নিকটে কয়েকখানি কাষ্ঠ জ্বলিতেছে, তাহার আলোক সেই গহ্বরের শিলার চারিদিকে প্রতিহত হইতেছে। অগ্নির পার্শ্বে কয়েকখানি হস্তলিপি, একখানি শোণিতাক্ত খড়্গ, ও স্থানে স্থানে প্রস্তরখণ্ড শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। দূরে জলস্রোতের ন্যায় একটী শব্দ সেই গহ্বরে শ্রুত হইতেছিল।

গোস্বামীর আকৃতি অপূর্ব্ব। ঈষৎ শ্বেতশ্মশ্রু বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে, কেশের জটাভার পৃষ্ঠে দুলিতেছে, শরীর অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় বলিষ্ঠ, অতিশয় তেজোময় বলিয়া অনুভব হয়। নয়নদ্বয় সেই অগ্নির আলোকে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, উন্নত ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনরেখা শোভা পাইতেছে।

গোস্বামী জ্বলন্তকাষ্ঠ নির্ব্বাণ করিলেন, পরে তাহার অপর পার্শ্বে যাইয়া সেই রক্তাক্ত খড়্গ হস্তে তুলিয়া লইলেন। বিকীর্ণ অগ্নিকণাতে তাঁহার মুখমণ্ডল ও দীর্ঘ অবয়ব আরও বিকট বোধ হইল, নরেন্দ্রনাথের হৃদয় স্তম্ভিত হইল। তিনি অগত্যা একপদ পশ্চাতে যাইয়া শিলারাশিতে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন, অগত্যা তিনি কোষ হইতে অসি বাহির করিলেন। সাহসে ভর করিয়া তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃৎকম্প একেবারে অবসান হইল না।

অতি গম্ভীরস্বরে গোস্বামী ডাকিলেন,—নরেন্দ্রনাথ!

নরেন্দ্রনাথ এতক্ষণে বুঝিলেন, শৈব সেই উদয়পুরের যোদ্ধা,—শৈলেশ্বর!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : পর্ব্বত-গহ্বর

THY fatal flame
Is nursed in silence, sorrow, shame,—
A passion without hope or pleasure,
In thy soul's darkness buried deep
It lies like some ill gotten treasure
Some idol without shine or name,
O'er which its pale-eyed votaries
keep
Unholy watch while others sleep.

—*Moore.*

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্রনাথ! ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে গোস্বামিগণ যোগবলে মানব-হৃদয়

জানিতে পারেন; নরেন্দ্রনাথ! তুমি পাপ-হৃদয়ে এ পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছ। তোমার মনে পাপ চিন্তা আছে।

নরেন্দ্র। আপনি কে জানি না, আপনার কথার উত্তর দিতে বাধ্য নহি।

শৈলেশ্বর। আমি ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরের গোস্বামী, মন্দির-কলুষিতকারীকে প্রশ্ন করিবার আমার অধিকার আছে।

নরেন্দ্র। আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন জানি না, আপনি আমার কি পাপ দেখিয়াছেন জানি না।

শৈলেশ্বর। এ মন্দিরে প্রতারণা অনাবশ্যক। একটা রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই নারীকে পুনরায় পাইবার লালসায় তুমি এই স্থানে আসিয়াছ।

নরেন্দ্র। যদি তাহাই হয়, তাহাতে পাপ কি? গোস্বামিগণ যদিও রমণীপ্রেমে বঞ্চিত, তথাপি রমণী-প্রেম-আকাঙ্ক্ষা পাপ নহে। স্বয়ং শূলপাণি অপর্ণার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেন।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্র! এ প্রবঞ্চনার স্থান নহে। তুমি কেবল রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহ, তুমি পরস্ত্রীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী। জগতে এরূপ যন্ত্রণা কি আছে, নরকে এরূপ অগ্নি কি আছে, যাহাতে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?

নরেন্দ্র। আমি যখন একটী বালিকাকে ভালবাসিতাম, তখন সে অবিবাহিতা ছিল। এক্ষণে যদি সে বিবাহিতা হইয়া থাকে তবে সে আমার অস্পৃশ্যা।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর, সুন্দর জাহ্নবীকূলে সেই সুন্দর অট্টালিকা স্মরণ কর। পবিত্রাত্মা শ্রীশচন্দ্র, পবিত্রহৃদয়া হেমলতা, পবিত্র সংসার! পাপিষ্ঠ, তোমার মনোরথ কি? সেই সংসার ছারখার হয়, সেই শ্রীশচন্দ্রের সর্ব্বনাশ হয়, সেই হেমলতা তোমার হয়! সেই শ্বেতপদ্ম-সন্নিভা পুণ্যহৃদয়া হেমলতা বাল্যকালে যে তোমার সহিত খেলা করিয়াছিল, এখনও সহোদরা অপেক্ষা তোমাকে যে স্নেহ করে, তোমার জন্য চিন্তা করে, সেই স্নেহময়ী পতিব্রতা নারী কুলটা হইয়া তোমাকে সেবা করে! সতীর ললাটে কুলকলঙ্কিনী, দুশ্চারিণী শব্দ অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হয়! তাঁহার দুগ্ধফেননিভ শ্বেত যশে অঙ্গারবর্ণ দেদীপ্যমান হয়! তোমার জন্য সে সংসার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়! হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না। সত্য তুমি এতদূর ভাব নাই, কিন্তু তোমার মনোরথ পূর্ণ হইলে ইহা ভিন্ন আর কি ফল হয়? এই পাপ মনোরথে তুমি এই পবিত্র মন্দিরে আসিয়াছ।

শৈলেশ্বরের কথা সাঙ্গ হইল, কিন্তু সে বজ্রধ্বনি তখনও নরেন্দ্রের কর্ণমূলে কম্পিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছিল। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ক্রোধ লীন হইল, নয়ন হইতে দুই একটী অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—স্বামিন্! আমি পাপিষ্ঠ! আমাকে সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।

শৈলেশ্বর। বৎস! এ সংসারে এরূপ ব্যাধি নাই, যাহার ঔষধি নাই, এরূপ পাপ নাই, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি তোমার সংশোধন কামনা করি, দণ্ডবিধান কামনা করি না।

নরেন্দ্র। স্বামিন্! আমি দয়ার উপযুক্ত নহি; যে পাপিষ্ঠ হেমলতার ন্যায় পবিত্রপুত্তলীর অপকার কামনা করে, তাহার ইহজীবনে প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্র, তুমি আপনাকে যতদূর পাপী বিবেচনা করিতেছ, ততদূর পাপী নহ। আমার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। তুমি হেমলতাকে পাইবার মানস কর নাই, জীবনে আর একবার তাহাকে দেখিবে, এইরূপ মানস প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই মানসেই দেবালয়ে আসিয়াছিলে। কিন্তু তুমি বালক, তুমি জান না হেমলতাকে আর একবার দেখিলে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন হইবে।

নরেন্দ্র। প্রভো! আপনি যাহা আদেশ করিলেন যথার্থ, হেমলতার হানি করা দূরে থাক, তাহার শরীরের একটী কণ্টক বিমোচন করিবার জন্য আমি জীবন দিতে পারি, ভগবান অন্তর্যামী, তিনি তাহা জানেন।

শৈলেশ্বর। তবে তাহার হৃদয়ে যে কণ্টকটী তুমিই স্থাপন করিয়াছ সেটী তুলিতে যত্নবান হও না কেন?

নরেন্দ্র। কিরূপে? আদেশ করুন।

শৈলেশ্বর। বাল্যকালাবধি তুমি তাহার হৃদয়ে প্রেমস্বরূপ কণ্টক রোপণ করিয়াছ, সেটী তুমি উৎপাটন কর, না হইলে তাহা উৎপাটিত হইবে না, হেমলতা জীবন্মৃতা থাকিবে। হেমলতা এক্ষণে সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ স্বামী পাইয়াছে, সংসারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, কেবল সময়ে সময়ে তোমার চিন্তা তাহার মনে উদয় হয়, কেবল সেই সময়ে স্বামীর প্রতি হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতিনী হয়। সেই চিন্তা তুমি দূর কর।

নরেন্দ্র। কিরূপে দূর করিব? আপনি বলিতেছেন, আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।

শৈলেশ্বর। উপায় আছে। হেমলতার সহিত একেবারে চিরজন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটান আবশ্যক। নরেন্দ্র, তুমি যদি যথার্থ হেমলতাকে ভালবাস, যদি যথার্থ তাহার কণ্টকোদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে সম্মত থাক, তবে যোগী হইয়া নারী-সংসর্গ ত্যাগ কর, কিংবা মুসলমান হইয়া মুসলমানকন্যা বিবাহ কর। হেম যখন শুনিবে, যে নরেন্দ্র আমার বাল্যকালের ভালবাসা ভুলিয়া যোগী হইয়াছে, অথবা বিধর্ম্মী হইয়া অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার হৃদয় ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইবে। মানব-হৃদয় লতার মত শুষ্ক কাষ্ঠে জড়াইয়া থাকে না। যে আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে, যাহার অন্য আশা, অন্য প্রেম, অন্য উদ্দেশ্য, অন্য চিন্তা, তাহার প্রতি অনুরক্তি কখনই চিরকাল থাকে না। নরেন্দ্র! তোমার বিষম পাপের এই বিষম প্রায়শ্চিত্ত।

নরেন্দ্র। ভগবান জানেন আমি তাহার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থা করিলেন তাহা অসহ্য। স্বামিন্! এ ঔষধ অতিশয় তিক্ত, অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করুন।

শৈলেশ্বর। উৎকট রোগে উৎকট ঔষধ আবশ্যক।

নরেন্দ্র। স্বামিন্! আপনি পরম ধার্ম্মিক শৈব হইয়া আমাকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার আদেশ করিতেছেন?

শৈলেশ্বর। পাপের জন্য মনুষ্য গোজন্ম পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়, কেবল জাতিনাশে ভীত হইতেছ?

দুইজনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দিকে চাহিয়া এক মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, শৈলেশ্বর সেই পর্ব্বতগহ্বরে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর শৈলেশ্বর গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—নরেন্দ্রনাথ, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর?

নরেন্দ্র। আমার খড়্গ গ্রহণ করুন, আর কি প্রমাণ দিব?

শৈলেশ্বর। তবে একটী কথা শুন। প্রেম নারীর একমাত্র অবলম্বন, প্রেম নারীর জীবন, পুরুষের তাহা নহে; পুরুষের অনেক আশা, অনেক অভিলাষ, অনেক মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তুমি যুবক, সাহসী, অভিমানী, এ প্রশস্ত জগতে কি আপন অসি সহায় করিয়া আপনার যশের পথ পরিষ্কার করিতে পার না? স্ত্রীলোকের মত কি কেবল ক্রন্দন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চাও? শুনিয়াছি তোমাদের বঙ্গদেশ বীরশূন্য। যশশূন্য। যাও, নরেন্দ্রনাথ! সেই দূর বঙ্গদেশে যশঃস্তম্ভ স্থাপন কর, যাও স্বদেশের গৌরব সাধন কর, সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপন কর, এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার জীবন সমর্পণ কর। আকাশে এরূপ দেবতা নাই, যিনি এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার সহায়তা না করিবেন। স্বয়ং বজ্রপাণি পুরন্দর, স্বয়ং শূলপাণি মহাদেব তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।

শৈলেশ্বর নিস্তব্ধ হইলেন। নরেন্দ্রের নয়নদ্বয় জ্বলিতে লাগিল, তিনি একদৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব শৈবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে একদিন এই শৈবকে যেরূপ যুদ্ধনিপুণ দেখিয়াছিলেন, অদ্য মানব-হৃদয় জ্ঞানে তাঁহাকে সেইরূপ নিপুণ দেখিলেন।

শৈব আবার বলিতে লাগিলেন,—নরেন্দ্র! এই ঘোর রজনীতে তুমি বিদেশে ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছ! কি জন্য? দেশের হিতসাধনের জন্য আসিয়াছ? কোন্ বীর-ব্রতে ব্রতী হইয়া আসিয়াছ? কোন্ দেবোচিত মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ আসিয়াছ? ধিক্ নরেন্দ্র! তোমার ন্যায় বীরপুরুষ একটী বালিকার মুখ দেখিবার জন্য জীবনের মহৎ

উদ্দেশ্য ভুলিয়া থাকে? প্রেমচিন্তা দূর কর; অথবা যদি প্রেম বিনা জীবন শূন্য বোধ হয়, তবে বীরোচিত প্রণয়ে বদ্ধ হও। পুরুষসিংহ! সিংহী গ্রহণ কর।

নরেন্দ্র। ভগবন্! আদেশ করুন।

শৈলেশ্বর। এ জগৎ অনুসন্ধান কর। পীড়ার সময় সাবিত্রীর ন্যায় তোমার সেবা করিবে, বিপদের সময় নৃমুণ্ডমালিনীর ন্যায় তোমার পার্শ্বে অসিহস্তে দাঁড়াইবে, কুশলের সময় বিমল প্রণয়দানে তোমার হৃদয় তৃপ্ত করিবে, যুদ্ধের সময় যশোগীতে তোমার শরীর কণ্টকিত করিবে, এরূপ রমণী যদি পাও, তাহাকে গ্রহণ কর।

নরেন্দ্র। এরূপ নারী কি জগতে আছে?

শৈলেশ্বর। স্বয়ং দেখিতে পাইবে। নরেন্দ্র! আমার যোগবল মিথ্যা নহে, এরূপ নারী না থাকিলে আমি বৃথা তোমাকে এই গহ্বরে আহ্বান করি নাই। আর একটী কথা শুন। যে নারীর কথা আমি বলিতেছি, সে হেমলতা অপেক্ষা তোমাকে ভালবাসে, এ নারীকে তুমি পূর্ব্বে দেখিয়াছ।

নরেন্দ্র। স্মরণ নাই।

শৈলেশ্বর। অদ্য স্বপ্নে দেখিবে। আমি চলিলাম, এই কলসে যে মদিরা আছে, তাহা পান করিয়া আজ এই গহ্বরে শয়ন কর। এই নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নির দিকে দেখ, যখন শেষ অগ্নিকণা সমস্ত ভস্ম হইয়া যাইবে তখন সেই স্বপ্ন দেখিবে। যে নারীকে দেখিবে, সেই এই জগতের মধ্যে তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, তোমার ন্যায় অভিমানিনী। বীরপুরুষ! সেই তোমার উপযুক্ত বীরনারী।

নরেন্দ্র। মহাশয়, আপনার কথায় বিস্মিত হইলাম।

শৈলেশ্বর। আর একটী কথা আছে, এটী মন দিয়া শুন। এই স্বপ্ন দেখিয়া কাল প্রাতে তুমি এই গহ্বর হইতে বাহিরে যাইও। তিন দিন তোমাকে সময় দিলাম, স্বপ্নদৃষ্টা নারীকে বিবাহ করিবে কি না, তিন দিনের মধ্যে স্থির করিবে। যদি সম্মত হও, তবে তিন দিন পরে শ্বেতচন্দনরেখা ললাটে ধারণ করিয়া অমাবস্যার সায়ংকালে আমার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিও, কিরূপে সে কন্যা পাইবে তাহার উপায় বলিয়া দিব। যদি এ বিবাহে সম্মত না হও, তবে রক্তচন্দনের রেখা ললাটে ধারণ করিয়া ঐ অমাবস্যার সায়ংকালে এই স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। ইহাতে প্রতিশ্রুত হও, নচেৎ কালী তোমাকে স্বপ্ন দিবেন না।

নরেন্দ্র। প্রতিশ্রুত হইলাম, তিন দিন পর অমাবস্যার সন্ধ্যায় আপনার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিব। ইহাতে যে প্রকার অঙ্গীকার করিতে বলেন, করিতে প্রস্তুত আছি।

শৈলেশ্বর। তুমি বীরপুরুষ, তোমার কথাই অঙ্গীকার। রজনী তিন প্রহর হইয়াছে, আমি বিদায় হইলাম।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ : বীণাহস্তে

WHO is this maid? What means
her lay?

—*Scott.*

নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সেই অন্ধকার গহ্বরে বিচরণ করিতে লাগিলেন, বাল্যকালের ভালবাসা, যৌবনের প্রেম, সহসা উৎপাটিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। একাকী অনেকক্ষণ সেই গহ্বরে পদচারণ করিতে লাগিলেন, কি ভীষণ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহা আমরা অনুভব করিতে সাহস করি না।

অনেকক্ষণ পর অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় দেখিয়া তিনি শৈবের আদেশ স্মরণ করিলেন, কলসে যে মদিরা ছিল, সমস্ত পান করিলেন। মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অগ্নির একপার্শ্বে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ অগ্নি দেখিতে লাগিলেন। এক একবার কাষ্ঠের এক অংশ প্রদীপ্ত হয় আবার

নির্ব্বাপিত হয়, এক একটী স্ফুলিঙ্গ দেখা যায় আবার অঙ্গার হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি প্রায় সমস্ত নির্ব্বাপিত হইল, হীনতেজ আলোকে সেই শিলাগৃহের শিলা-ভিত্তি আরও অপরূপ দেখাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ সেই ভিত্তির উপর আলোক ও ছায়ার নৃত্যতে যেন অমানুষিক জীবের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন, কালীর নয়নদ্বয় যেন ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, কালীর হস্তের খড়্গ যেন নরেন্দ্রের দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র উঠিবার চেষ্টা করিলেন, উঠিবার শক্তি নাই। নরেন্দ্র জাগ্রত না সুপ্ত?

অচিরাৎ শেষ অগ্নিকণা নির্ব্বাণ হইল। নরেন্দ্র তাহা দেখিতেছিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এতক্ষণ দূরস্থ জলের শব্দ যাহা শুনা যাইতেছিল, নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন, তাহা সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি হইল। গভীর অন্ধকারে যেন ক্রমে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। যে স্থানে গহ্বরের ভিত্তি ছিল তথায় যেন একটী প্রস্তর সহসা সরিয়া যাইল, তাহার ভিতর হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি, অপূর্ব্ব চান্দ্র-আলোকের ন্যায় আলোক বাহির হইতে লাগিল। ক্রমে যেন চন্দ্রের উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল, সে আলোকস্থান সম্পূর্ণ মুক্ত হইল। একি স্বপ্ন না যথার্থ? স্বর্গীয় রূপরাশি-বিভূষিতা একজন ষোড়শী বীণাহস্তে উপবেশন করিয়া অপূর্ব্ব বাদ্য করিতেছে। নরেন্দ্র বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া সেই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

কি অপরূপ সৌন্দর্য্য, কি উজ্জ্বল নয়ন, কি কৃষ্ণ কেশপাশ, কি ক্ষীণ অঙ্গ, এ কি মানবী? নরেন্দ্রনাথ ভাল করিয়া দেখ, এ বদনমণ্ডল, এ চারুনয়ন, ও ওষ্ঠ কি তুমি কখনও দেখ নাই? সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় স্মৃতিশক্তি নরেন্দ্রের মনে ক্রমে ক্রমে জাগরিত হইতে লাগিল। কাশীর যুদ্ধ, দিল্লী, দিল্লীতে একজন মুসলমান নারী,—উঃ! এ সেই জেলেখা!

নরেন্দ্রের চিন্তা করিবার অবসর ছিল না, সহসা সপ্তস্বরসমন্বিত অপ্সরাকণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব্ব গীত সেই পর্ব্বতকন্দর আমোদিত করিল। নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত করিল। জেলেখা সেই বীণার সঙ্গে সঙ্গে গান সংযোজনা করিয়াছে, আহা! কি মধুর, কি হৃদয়গ্রাহী, কি ভাবপরিপূর্ণ! নরেন্দ্র এক দৃষ্টিতে জেলেখার দিকে চাহিয়া রহিলেন, গাইতে গাইতে জেলেখার কণ্ঠ এক একবার রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া দুই এক বিন্দু জল গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

গীত

নারীর ধর্ম্ম কি? সতী কি সাধিতে পারে? আজীবন প্রেমবারিদানে পতির প্রেমতৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। সম্পদকালে, প্রেমালোক জ্বালিয়া লক্ষ্মীরূপিণী পতির আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে। রণের মাঝে বীর্য্যবতী প্রদীপ্ত আশারূপিণী হইয়া পতির হৃদয় বীররসে পরিপূর্ণ করিতে পারে। দুঃখ-অন্ধকারে জীবনের আশাপ্রদীপ একে একে নির্ব্বাণ হইয়া গেলে সমদুঃখে দুঃখিনী হইয়া স্বামীর ক্লেশবিমোচন করিতে পারে। জীব-আকাশ হইতে জীবতারা যখন খসিয়া যায়, পতিব্রতা নারী উল্লাসে প্রিয়ের পার্শ্বে সহমৃতা হইতে পারে।

এই মর্ম্মের সুন্দর গান সমাপ্ত হইল, কিন্তু নরেন্দ্রের কর্ণমূলে তখনও সে সঙ্গীত শেষ হইল না। এক একবার সুমধুর ধীরশব্দে, এক একবার বজ্রনাদে তাহার কর্ণে সে গান এখনও শব্দিত হইতে লাগিল। জেলেখা মানবী কি পরী কন্যা? যেই হউক, নরেন্দ্র তাহার মুখমণ্ডল বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন এখন জেলেখা তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে! তথাপি শোকের পাণ্ডুবর্ণ ললাটে ন্যস্ত রহিয়াছে, বাহু ও অঙ্গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, নয়নদ্বয়ে যেন দুঃখ নিবাস করিতেছে! নরেন্দ্র আর দেখিবার সময় পাইলেন না, আবার অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি পর্ব্বতকন্দর কাঁপাইতে লাগিল, আবার দুঃখের গানে নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত ও দ্রবীভূত হইল।

গীত

পতির নিকট পতিব্রতা নারী কি ভিক্ষা চাহে? প্রেমভিক্ষা ভিন্ন এ জগতে দাসীর আর কি ভিক্ষা আছে? প্রেমলতিকার বেশে তোমার পদযুগল ধরিয়াছে, স্নেহকণা দিয়া সজীব করিও, যেন ধরণী না লুটায়। জ্ঞাতি বন্ধু দেশ দূরে রাখিয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, যেন তোমার সুখে সুখিনী হয়, তোমার দুঃখে দুঃখিনী হয়, তোমার পদচ্ছায়া যেন পায়। যতদিন প্রাণ

থাকে ইহা ভিন্ন অন্য ভিক্ষা নাই, আয়ুঃ শেষ হইলে পতির চরণ ধরিয়া পতির মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা ভিন্ন সতীর আর কি ভিক্ষা আছে?

গান সমাপ্ত হইল। নয়নজলে সে পাণ্ডুবদনখানি ও উরঃস্থল ধৌত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে মেঘচ্ছায়ায় যেন সূর্য্যকান্তি আচ্ছন্ন হইল, আলোকদ্বার ক্রমে রুদ্ধ হইল। সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি ঢাকিয়া গেল, গভীর অন্ধকারে বীণাধ্বনি থামিয়া গেল, পূর্ব্বশ্রুত দূরস্থ জলশব্দ ভিন্ন নরেন্দ্র আর কিছু শুনিতে পাইলেন না। নরেন্দ্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, আর কি স্বপ্ন দেখিলেন প্রাতে তাহা মনে রহিল না। নিদ্রান্তে নরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার মত্ততা আর নাই, গহ্বর হইতে খড়্গ লইয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন নবজাত সূর্য্যরশ্মিতে বৃক্ষলতা ও দূর্ব্বাদল ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, ডালে ডালে পক্ষিগণ গান করিতেছে, দূরে একলিঙ্গের প্রকাণ্ড শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির সূর্য্যকিরণে বড় শোভা পাইতেছে। মন্দির লোকসমাকীর্ণ আর চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত সূর্য্যরশ্মিতে সুন্দর দেখা যাইতেছে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : খড়্গহস্তে

> A NAKED dirk gleamed in her hand.
>
> *-Scott.*

সেই তিন দিন নরেন্দ্রনাথ কি চিন্তাজালে বেষ্টিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। শত চিন্তা নরেন্দ্রনাথকে শত বৃশ্চিক দংশনাপেক্ষা অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল।

সেই পর্ব্বত-গহ্বরে শৈলেশ্বর যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নরেন্দ্রের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল না। শ্রীশচন্দ্রের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়াছে তাহা নরেন্দ্র অনেকদিন হইল শুনিয়াছেন। হেমলতা পরের গৃহিণী, তাহার চিন্তা, তাহার প্রতি ভালবাসা কি উচিত কার্য্য? নরেন্দ্রনাথ, এই কি বীরের উপযুক্ত কার্য্য? শৈবের উন্নত আদেশ গ্রহণ কর, প্রেমচিন্তা উৎপাটন কর, যশের পথ পরিষ্কার কর, দেশের গৌরব সাধন কর, ইহা অপেক্ষা বীরের উপযুক্ত কার্য্য আর কি আছে? নরেন্দ্র স্থির করিলেন শৈবের আদেশ শিরোধার্য্য।

আবার সেই গঙ্গাতীরে বিদায়ের কালে নক্ষত্রের আলোকে যে পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক মুখখানি দেখিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই দুঃখিনী হেমলতার কথা মনে পড়িল। নরেন্দ্রের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সেই হেম বাল্যকালে নরেন্দ্রের সহিত খেলা করিয়াছে, যে দিন নরেন্দ্র গৃহত্যাগী হয় সে দিন হেম যেন আপন জীবনকে বিদায় দিতেছিল, তাহা নরেন্দ্রের মনে পড়িল। বাল্যকালে হেম নরেন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না, যৌবনের প্রারম্ভে প্রাতঃসন্ধ্যায় নরেন্দ্রের মুখ দেখিলে যেন হেম উদ্বেগশূন্য ও শান্ত হইত। বাল্যকালের সহস্র কথা অজস্র বারিতরঙ্গের ন্যায় নরেন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত ও আলোড়িত করিতে লাগিল, নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না, একাকী মন্দিরপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

আবার চিন্তা আসিতে লাগিল। নরেন্দ্রের দেশ নাই, গৃহ নাই, বন্ধু নাই, পরিজন নাই, নরেন্দ্র একাকী দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেবল হেমের চিন্তাস্বরূপ নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সংসারসমুদ্রে বিচরণ করিতেছেন! নিদারুণ শৈব! অভাগার একমাত্র সুখচিন্তা, একমাত্র সুখস্বপ্ন দূর করিও না, এ নিদারুণ আদেশ করিও না। নরেন্দ্র অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছে; আরও যে ক্লেশ আদেশ কর সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। নরেন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে, বীরমর্য্যাদা ত্যাগ করিবে, অন্নকষ্ট ভোগ করিতে সম্মত আছে, জগতের নিন্দাভার বহন করিতে সম্মত আছে, অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুর সহিত ঘোর অরণ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে সম্মত আছে। শৈলেশ্বর! আদেশ কর, ইহাতে যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, নরেন্দ্র আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবে; ইহাতে যদি নরেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কোচ করে, করালবদনার সম্মুখে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিও। কিন্তু বাল্যকাল অবধি যে চিন্তা অবলম্বন করিয়া নরেন্দ্র জীবনধারণ করিতেছে, যে আলোকস্তম্ভস্বরূপ চিন্তার জ্যোতিঃতে নরেন্দ্র দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছে, নিদারুণ শৈব! সে চিন্তা দূর করিতে বলিও না। এখন হেম পরের গৃহিণী, তথাপি নরেন্দ্রের ভালবাসা বিস্মৃত হয় নাই, নরেন্দ্র তাহার চিন্তা ত্যাগ করিবে?

নরেন্দ্র মুসলমান হইয়া যবনীকে বিবাহ করিবে? হেম তাহা শুনিবে? সে ভাবনা অসহ্য। প্রবঞ্চক শৈব! হিন্দু পুরোহিত হইয়া তুমি যবনীর পাণিগ্রহণ করিতে উপদেশ দাও। বিধর্ম্মী! কপটাচারি! দূর হও।

আবার শৈলেশ্বরের গম্ভীর আদেশ মনে পড়িল। "হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না, যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর।" শৈব কি মিথ্যাবাদী? পরনারী-চিন্তা কি পাপ নহে? নরেন্দ্রনাথ, সাবধান! আপনি পাপে লিপ্ত হইতেছ, শৈব তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছেন, তাঁহার নিন্দা করিও না। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া ভাবিয়া সে দিন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তিন দিন অতিবাহিত হইল, তৃতীয় দিবস রজনীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই দণ্ড পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ গহ্বরমুখে একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এক একবার এদিক ওদিক নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতেছেন, এক একবার অন্ধকার আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টি করিতেছেন, আবার গহ্বরমুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন। হস্তে নিষ্কোষিত অসি, আকৃতি স্থির ও গম্ভীর।

ক্ষণেক পর শৈলেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নরেন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে প্রণাম করিতে বিস্মৃত হইলেন।

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছ?

গম্ভীর ও ঈষৎ কর্কশস্বরে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—হইয়াছি। উভয়ে গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরে পূর্ব্বদিনের ন্যায় অতি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোকচ্ছটায় শৈলেশ্বর যাহা দেখিলেন তাহাতে চমকিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের ললাট, গণ্ডস্থল, স্কন্ধ, বাহু ও বক্ষঃস্থল রক্তচন্দনে একেবারে প্লাবিত রহিয়াছে!

শৈলেশ্বর। পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারিলে না?

নরেন্দ্র। পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষা রাখি না।

শৈলেশ্বর। হেমলতাকে এ জীবনে আর দেখিতে চাহ না?

নরেন্দ্র। তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

শৈলেশ্বর। তবে যবনীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছ?

নরেন্দ্র। এ জীবনে নহে।

শৈলেশ্বর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিলেন,—তবে প্রতিজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হও। খড়্গ ত্যাগ কর, কালীর সম্মুখে জীবনদানে প্রস্তুত হও।

নরেন্দ্র। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা পালন করিয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়াছিলাম।

শৈলেশ্বর। মূঢ়! সিংহের গহ্বরে আসিয়াও জীবনের প্রত্যাশা আছে? এস্থলে কে তোমার সহায় হইবে?

নরেন্দ্র। এই অসি আমার সহায়।

শৈলেশ্বর নিঃশব্দে গহ্বরের এক স্থান হইতে আপন অসি বাহির করিলেন। উদয়পুরে একবার যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল অদ্য আবার দুইজনে সেইরূপ অসি ও ঢাল লইয়া যুদ্ধ হইল। নরেন্দ্র সে দিন অপেক্ষা অধিক সাবধানে অধিক যত্নে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে যত্ন বৃথা! সিংহবীর্য্য শৈব অল্পক্ষণ মধ্যেই নরেন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অসি কাড়িয়া লইলেন।

শৈলেশ্বর। কেবল পূজা-ব্যবসায়ে এই কেশ শুক্ল হয় নাই। রাজস্থান-ভূমি বীরপ্রসবিনী, যুদ্ধকালে শৈব গোস্বামিগণও বীর্য্য প্রকাশে রাজস্থানে অগ্রগণ্য। বালক! তোমার সহিত যুদ্ধ করিলাম এই আমার কলঙ্ক রহিল!

নরেন্দ্র। আমি ইহার জন্যও প্রস্তুত আছি; তোমার যাহা ইচ্ছা, যাহা সাধ্য কর।

শৈলেশ্বর একগাছি রজ্জু বাহির করিলেন, নরেন্দ্রের দুই হস্ত সেই রজ্জু দ্বারা সজোরে বন্ধন করিলেন। এরূপ জোরে বাঁধিলেন যে হস্তের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, নরেন্দ্র শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেন না। পরে পূর্ব্বের ন্যায় কলস লইয়া নরেন্দ্রের মুখের নিকট ধরিয়া মদ্যপান করিতে বলিলেন, নরেন্দ্র তাহাই করিলেন। গোস্বামী গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মত্ততাহেতু নরেন্দ্র অচিরাৎ ভূমিতে নিপতিত হইলেন, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, গহ্বর-পার্শ্বে দুইজন যেন ধীরে ধীরে কথা কহিতেছে এইরূপ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল।

শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র মদিরাপ্রভাবে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, পরে কি হইল স্মরণ রহিল না।

কিন্তু সে নিদ্রা গভীর নহে। নরেন্দ্র সমস্ত রজনী স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, কখন স্বপ্ন দেখেন কখন অর্দ্ধেক জাগ্রৎ হইয়া থাকেন। কখন স্বপ্ন দেখেন, কখন জাগ্রৎ থাকেন, মত্ততা-প্রযুক্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পর বোধ হইল, যেন পূর্ব্বেকার একদিনের ন্যায় আবার অন্ধকার হইতে আলোকচ্ছটা প্রকাশ হইতে লাগিল, আবার যেন প্রস্তরভিত্তি সরিয়া গেল, মেঘ সরিয়া গেলে যেন চন্দ্রালোক প্রকাশিত হইল। সেই আলোকে সেই উজ্জ্বল রমণী; কিন্তু জেলেখা অদ্য গান গাইতেছে না, অদ্য বীণাহস্তে আইসে নাই, অদ্য খড়্গহস্তে!

কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া রহিয়াছে, সমস্ত বদনমণ্ডল ক্রোধপ্রজ্বলিত ও রক্তবর্ণ, বামার করে সেই শৈবের দীর্ঘ খড়্গ, বামার বক্ষে একখানি তীক্ষ্ম ছুরিকা! নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, তাঁহার ললাট হইতে স্বেদ বহির্গত হইতে লাগিল: তিনি উঠিবার উদ্যম করিলেন, কিন্তু স্বপ্নে বিপদাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় পলাইতে অক্ষম, উঠিতে অক্ষম!

বামা মৃণাল-করে দীর্ঘখড়্গ ধারণ করিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল। একবার দণ্ডায়মানা হইল, একবার নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া গেল।

এবার সেই তীক্ষ্ম ছুরিকা বাহির করিল, এবার অকম্পিত হস্তে সে ছুরিকা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থলের উপর ধরিল। আবার কি চিন্তা আসিল, ছুরিকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইল, বামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন ঘর্ম্মে তাঁহার সমস্ত শরীর আপ্লুত হইয়াছে, উন্মত্ততা গিয়াছে, গহ্বর অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে তিনি গহ্বরের বাহিরে আসিলেন। রজনী অবসানপ্রায়, পূর্ব্বদিকে রক্তিমচ্ছটায় আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। নির্ব্বাণপ্রায় প্রদীপের ন্যায় দুই একটী তারা এখনও দেখা যাইতেছে, প্রত্যূষের শীতল বায়ু সেই পর্ব্বতশ্রেণী ও শিব-মন্দিরের উপর বহিয়া যাইতেছে ও নবজাত পুষ্পপরিমল বহিয়া নিদ্রোত্থিত জগৎকে আমোদিত করিতেছে। দুই একটী নিকুঞ্জবন হইতে দুই একটী পক্ষী সুন্দর গীত করিতেছে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : শ্যামনগরের যুদ্ধ

> LIKE fabled gods, their mighty war
> Shook realms and nations in its jar.
>
> —*Scott.*

উপরিউক্ত ঘটনার কিছু পর যোধপুরাধিপতি রাজা যশোবন্তসিংহ পুনরায় সৈন্য-সামন্ত লইয়া আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করণাভিলাষে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথও সেই সৈন্যের সহিত রাজস্থান ত্যাগ করিলেন। যে কয়েক মাস নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে ছিলেন তাহার মধ্যে আগ্রায় একটী রাজবিপ্লব ঘটিয়াছিল, আগ্রায় এক্ষণে সে সম্রাট নাই, সে রাজত্ব নাই। সে বিপ্লবের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এ পরিচ্ছেদ ছাড়িয়া যাইতে পারেন।

এই ভীষণ ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া অবধি প্রথমে বারাণসীতে সুলতান সুজা ও তৎপরে উজ্জয়িনীতে যশোবন্তসিংহ পরাস্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই শেষ ঘটনার বিষয় শুনিয়া সম্রাট শাজিহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক লক্ষের অধিক সেনা লইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন, ও চম্বল নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া মোরাদ ও আরংজীবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাঁহারা ঐ নদীর অপর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোরাদ যেরূপ সাহসী সেইরূপ যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ, তিনি নদী পার হইয়া সংগ্রাম করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কৌশলপটু আরংজীব তাহা না করিয়া দারাকে ভুলাইবার জন্য শিবির সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া গোপনে সৈন্যশুদ্ধ নদীর অপর এক

স্থানে পার হইলেন ও আগ্রা হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে শ্যামনগর নামক গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। শত্রু চম্বল পার হইয়াছে ও আগ্রার নিকট যমুনাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে শুনিয়া দারা একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্য লইয়া সেই গ্রামের নিকট যমুনাতীরে আপন শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

শ্যামনগরের যুদ্ধের ফল ভারতবর্ষের সিংহাসন। উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সংকুচিত হইলেন; চারি দিবসকাল উভয় সৈন্য উভয়ের সম্মুখীন হইয়া রহিল, পঞ্চম দিবসে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধের বর্ণনায় আমাদিগের আবশ্যক নাই। দারার বামপার্শ্বে রাজপুত রাজা রামসিংহ ও চত্বরপাল বীরোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হইলেন, দারার দক্ষিণ দিকে কালীউল্লা নামক মুসলমান সেনাপতি বিদ্রোহী আরংজীবের অর্থভুক, তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন না। অবশেষে আরংজীবের জয় হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলপটু আরংজীব কালীউল্লার সম্মান করিলেন, ও মোরাদকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন।

অচিরাৎ আরংজীব ছলে, বলে, কৌশলে আগ্রা হস্তগত করিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন। শাজিহানের দুই কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা রৌশনআরা সকল বিষয়ে আরংজীবকে সমাচার প্রদান করিয়া তাঁহার অনেক সহায়তা করিতেন। আরংজীবের জয় হওয়ায় রৌশনআরার প্রভুত্ব ও ক্ষমতার ইয়ত্তা রহিল না। শাজিহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেহানআরা রূপে, গুণে, কৌশলে কনিষ্ঠা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠা,—সে লাবণ্যময়ী সম্রাটপুত্রীকে পাঠক একদিন বেগম মহলে দেখিয়াছেন! আরংজীবের জয়ে জেহানআরা হতমানা হইলেন, অতঃপর পিতার সেবায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

আগ্রা হস্তগত করিয়া আরংজীব দিল্লী যাত্রা করিলেন। পথে মথুরাতে মোরাদকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মোরাদ মদিরাপানে এবং সুন্দরী গায়কী ও নর্ত্তকীগণের সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া পড়িলেন। মোরাদকে মধ্যে করিয়া সেই জগদ্বিমোহিনীগণ চারিদিক বেষ্টন করিয়া বসিল, মোরাদ একেবারে প্রমত্ত হইয়া একজন সুন্দরীর আলিঙ্গনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। আরংজীবের তাহাই উদ্দেশ্য, মোরাদ সেই রজনীতেই কারারুদ্ধ হইলেন।

তাহার পর? তাহার পর আরংজীব রাজচ্ছত্র আপন মস্তকের উপর ধারণ করিলেন। দারা সিন্ধুনদীর দিকে পলায়ন করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে সুলতান সুজা পুনরায় সৈন্য লইয়া যুদ্ধবেশে বহির্গত হইলেন। রাজস্থানে যশোবন্তসিংহ পরাজয়ের অপমান এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনিও সসৈন্যে বহির্গত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : দর্পণে প্রতিমূর্ত্তি

'TIS something yet if, as she passed,
Her shade is o'er the lattice cast.
"What is my life, my hope"—he said—
"Alas! a transitory shade"?

—*Scott.*

কয়েকদিন ভ্রমণান্তর যশোবন্তসিংহের সেনা আগ্রা নগরে উপনীত হইল। আরংজীবের পরাক্রম অসীম. তাঁহার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করা যশোবন্তসিংহের সাধ্য নহে, তিনি সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আরংজীবের মিত্রবেশে পরমশত্রু আগ্রা নগরে প্রবেশ করিল।

যমুনার অনন্ত সৌন্দর্য্য ও আগ্রা নগরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া কে না বিমোহিত হইয়াছে? শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত অপূর্ব্ব চারু শিল্পখচিত, জগতে অতুল্য তাজমহল সন্ধ্যার নীল গগনে একটী প্রতিকৃতির ন্যায় বোধ হয়; তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর পথ, সুন্দর কুঞ্জবন, সুন্দর ফোয়ারা, পার্শ্বে শ্যামা যমুনা! আগ্রার প্রকাণ্ড দুর্গ; তন্মধ্যে মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর মতি মসজীদ, দেওয়ান খাস, দেওয়ান আম, রংমহল, শীশমহল! আগ্রার সৌন্দর্য্য কত বর্ণনা করিব? পাঠিকাগণ! যদি এই অপূর্ব্ব নগরী না দেখিয়া থাকেন, অদ্যই যাইবার উদ্যোগ

করুন। "তিনি" ব্যয়ের ওজর করিবেন, তাহা শুনিবেন না, আপনাদিগের অনুরোধ অলঙ্ঘনীয়, আপনাদিগের অশ্রুজলে সকল আপত্তি ভাসিয়া যাইবে!

প্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসনে অদ্য সম্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়াছেন। প্রাসাদের শ্বেত স্তম্ভসারি বড় শোভা পাইতেছে। রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ হইতে পুষ্পমাল্যের সহিত মণি-মাণিক্য ঝুলিতেছে ও প্রাতঃকালের আলোকস্পর্শে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। চারিদিকে মহারাজা, রাজা, ওমরাহ, মন্সবদার প্রভৃতি ভারতের অগ্রগণ্য বীর, ধনী ও মান্য লোকে অদ্য রাজপ্রাসাদকে ইন্দ্রপুরী করিয়াছে!

সেই প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের চতুর্দ্দিকে রৌপ্য-নির্ম্মিত স্তম্ভ ঝক্‌মক্ করিতেছে। উপরের বস্ত্র উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, ভিতরে মসলীপত্তনের ছিট, সে ছিটে লতা পুষ্প এরূপ সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে যে শিবিরের পার্শ্বে যথার্থ পুষ্প ফুটিয়াছে, দর্শকদিগের এরূপ ভ্রম হয়! ভূমিতে অপরূপ গালিচা, তাহাতেও পুষ্পগুলি এরূপ সুন্দরভাবে বুনা হইয়াছে যে শিবিরস্থ ব্যক্তি পুষ্পদলিত হইবে ভয়ে সহসা পদক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ করেন!

তাহার বাহিরে দুর্গের প্রাচীর পর্য্যন্ত জয়পতাকা ও পুষ্পপত্র দ্বারা দুর্গ সুশোভিত হইয়াছে। সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিজয়বাদ্যে সকলের মন উত্তেজিত করিতেছে, নবজাত সূর্য্যরশ্মিতে তাহাদের বন্দুক ঝক্‌মক্ করিতেছে। দুর্গপ্রাচীরের উপর ইংরাজ, ফরাশি ও ওলন্দাজ সৈনিকগণ ঘন ঘন কামান ছাড়িতেছে। তাহারা বহুদূর হইতে রত্নগর্ভা ভারতবর্ষে রত্ন কুড়াইবার জন্য আসিয়াছে, ও সম্রাটের বেতনভোগী হইয়া অদ্য কামানের শব্দে সম্রাটের বিজয় প্রচার করিতেছে। দুর্গের বাহিরে নগরের পথে, ঘাটে, গৃহে, দ্বারে ও যমুনাতীরে রাশি রাশি লোক নিজ নিজ সুপরিচ্ছদে সজ্জিত ও দলবদ্ধ হইয়া প্রশস্ত আগ্রানগর ও যমুনাতীর পরিপূর্ণ করিতেছে।

পুরাতন রীত্যনুসারে আরংজীব সুবর্ণের সহিত ওজন হইলেন, তাহার পর প্রধান প্রধান ওমরাহগণ ঐরূপে ওজন হইলেন. প্রত্যেক ওমরাহ, রাজা ও মন্সবদার সুবর্ণ, মুক্তা ও হীরক নজর দিয়া সম্রাটের মনস্তুষ্টি করিলেন।

তাহার পর জগদ্বিমোহিনী কাঞ্চনীগণ প্রৌঢ়-যৌবন মদে উন্মত্ত হইয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা সভাসদগণের হৃদয় বিমোহিত করিল। কাঞ্চনীগণ নর্ত্তকী, বড় বড় ওমরাহদিগের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইলে তাহারা সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে যাইত। শাজিহান তাহাদিগকে সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতে ভালবাসিতেন ও বেগমদিগের আলয়েও লইয়া যাইতেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ পরাঙ্মুখ আরংজীব তাহাদিগকে প্রায় নিকটে আসিতে দিতেন না, তবে আজি আনন্দের দিনে কঞ্চনীগণ কেন না সমাদৃত হইবে?

তাহার পর দুর্গের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ যমুনাতীরে মল্লযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ প্রভৃতি নানারূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল; প্রাসাদের উপর হইতে বেগমগণ দেখিতে পাইবেন এই জন্য এই স্থলে যুদ্ধ হইত। অবশেষে দুইটী মত্ত হস্তীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মধ্যে আন্দাজ দুই হাত উচ্চ একটী মৃত্তিকার প্রাচীর, তাহার দুই দিক হইতে দুইটী মত্ত হস্তী মাহুত দ্বারা পরিচালিত হইয়া রণে লিপ্ত হইল। অনেকক্ষণ যমুনার উভয় পার্শ্ব হইতে লোকে সবিস্ময়ে এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল, শুণ্ডের চপেটাঘাতে ও দন্তজনিত আঘাতে হস্তিদ্বয়ের মস্তক ও শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইল। প্রত্যেক হস্তীর দুইজন করিয়া মাহুত ছিল; একটী হস্তীর একজন মাহুত পড়িয়া গেল ও সহসা হস্তী দ্বারা পদদলিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিল, অপর পক্ষের একজন মাহুতের ঐরূপে জন্মের মত হাত ভাঙ্গিয়া গেল। হতভাগারা এই জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াই হস্তিদ্বয়কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল. বহু অর্থলোভে স্ত্রী-পুত্র সকলের নিকট পূর্ব্বে বিদায় লইয়াই আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর একটী হস্তী অন্যকে পরাস্ত করিয়া, মৃত্তিকা-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তাহাদিগকে ছাড়াইবার জন্য অনেকে চরকী প্রভৃতি আগুনের বাজী ছুড়িল, কিন্তু সঞ্জাত-ক্রোধ হস্তী তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অপর হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অবশেষে পরাজিত হস্তী সন্তরণ করিয়া যমুনা পার হইয়া গেল, পথিমধ্যে দুই একজন লোক যাহারা সম্মুখে পড়িল তাহারাও নিহত হইল।

এ সমস্ত আমোদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে যমুনাপুলিনে যাইলেন ও হস্ত মুখ

প্রক্ষালন করিয়া একটী সুন্দর বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন। যে স্থানে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন সেটী অতি মনোহর স্থল। বিশাল তমাল বৃক্ষ সূর্য্যের কিরণ নিবারণ করিতেছে, ও বৃক্ষের উপর হইতে দুই একটী পক্ষী যেন দিনের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিতেছে। নিকটে বৃক্ষের একপার্শ্বে একটী পুরাতন কবর আছে, প্রস্তর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ লতাদি সেই কবরের উপর জন্মিয়াছে। কবরের একপার্শ্বে পারস্যভাষায় একটী বায়েৎ লেখা আছে, তাহার অর্থ, "বন্ধু! আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি? আমি জগতে অভাগা, অসুখী ছিলাম। তুমি যদি হতভাগা হও আমার জন্য একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিও।" মন্দ মন্দ যমুনা-বায়ু সেই শীতল স্থানকে আরও সুশীতল করিতেছে, কল্লোলিনী যমুনা সুমধুর কল্ কল্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্রনাথ অচিরাৎ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

তিনি কতক্ষণ নিদ্রিত রহিলেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। নিদ্রায় একটী অপরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। বোধ হইল যেন সেই অপূর্ব্ব গোরস্থান হইতে মৃত মনুষ্য পুনর্জ্জীবিত হইল, সে একটী মুসলমান স্ত্রীলোক! মৃত্যুর শ্বেতবর্ণ স্ত্রীলোকের মুখে এখনও দেদীপ্যমান। স্ত্রীলোকের চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, শরীর ক্ষীণ, সমস্ত অবয়ব দুঃখব্যঞ্জক। গোরস্থানে যে বায়েৎটী লেখা ছিল স্ত্রীলোক যেন সেই বায়েৎটী গান করিল, সে দুঃখব্যঞ্জক গীতধ্বনিতে নরেন্দ্রের মুদিত নেত্র হইতে একবিন্দু জল ভূতলে পতিত হইল। মুসলমানী যেন সহসা আর একটী গীত আরম্ভ করিল। নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন সে স্বর তাঁহার অপরিচিত নহে, বোধ হইল যেন সে স্বর সেই অভাগিনী জেলেখাকণ্ঠ-নিঃসৃত। নরেন্দ্র ভাল করিয়া দেখ! স্বয়ং জেলেখা গোরের উপর বসিয়া এই দুঃখগান গাইতেছে!

নরেন্দ্রের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ললাটে একটী উজ্জ্বল তারা বড় শোভা পাইতেছে, সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া মৃদু গান করিতেছে, যমুনার নীল জল অধিকতর নীলবর্ণ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। এই জেলেখার গান তিনি নিদ্রাযোগে ইতিপূর্ব্বে তিন চারি বার শ্রবণ করিয়াছেন। জেলেখার প্রতি কি নরেন্দ্রের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে? নরেন্দ্র হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, হৃদয় হেমলতাময়! জেলেখা কি মানবী নহে, জেলেখা কি পরী? তবে মানবের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী কেন? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে সেই গোরস্থানের দিকে আসিলেন, সহসা গোরের পার্শ্ব হইতে স্বয়ং জেলেখা দণ্ডায়মান হইল! তাহার ক্ষীণ শরীর ও পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন যথার্থই কবর-গহ্বরস্থ মৃতদেহ পুনর্জ্জীবিত হইল! বদন পাণ্ডুবর্ণ বটে, কিন্তু নয়ন হইতে পূর্ব্ববৎ তীব্র জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী বামা সরোষে অধর দংশন করিয়া নরেন্দ্রের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে, বক্ষঃস্থলে একখানি তীক্ষ্ন ছুরিকার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে! এই নারী কি দুঃখগান গাইয়াছিল? বোধ হয় না।

জেলেখা নরেন্দ্রকে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া আপনি অগ্রে চলিল। অনেক দূর যাইয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদের একটী অন্ধকার-গৃহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। এক্ষণে গৃহের ভিতর অন্ধকারে রমণীর সহিত যাইতে সঙ্কোচ করিয়া বলিলেন,—তুমি কে জানি না, আমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাই নাই।

জেলেখা। প্রাসাদে যাইবার আমার অধিকার না থাকিলে তোমাকে আসিতে বলিতাম না।

নরেন্দ্র। তথাপি তুমি কে জানি না, অজ্ঞাত স্থানে যাইব না।

জেলেখা কর্কশস্বরে বলিল,—মৃত্যুভয় করিতেছ? তোমাকে হনন করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি তাতারদেশীয়া, আমি এই ছুরিকা এতক্ষণ ব্যবহার করিতে পারিতাম না? কিন্তু এই লও, ছুরিকা ত্যাগ করিলাম, রিক্তহস্ত স্ত্রীলোকের সহিত যাইতে বোধ হয় বীরপুরুষের কোন আপত্তি নাই।

জেলেখার বিকট হাস্যধ্বনিতে নরেন্দ্রের মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি নিঃশব্দে জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্ষণেক যাইলে পর জেলেখা এক স্থানে কতকগুলি বস্ত্র দেখাইয়া নরেন্দ্রকে তাহা পরিধান করিতে কহিল। নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিলেন তাহা তাতার-দেশীয় রমণীর পরিচ্ছদ। বিস্মিত হইয়া আবার জেলেখার দিকে চাহিলেন, জেলেখা এবার

গম্ভীরস্বরে বলিল,—বিলম্ব করিও না, আমরা যে দ্বার দিয়া আসিয়াছি এক্ষণে সে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, চারিদিকে খোজাগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ বেগমদিগের প্রাসাদ, তুমি পুরুষ জানিলে এইক্ষণেই তোমার প্রাণ বিনাশ করিবে।

নরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন, জেলেখার কথা সত্য! অগত্যা নরেন্দ্র কাঁচলি ও ঘাঘরা পরিলেন, জেলেখা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে পরচুলা পরাইয়া দিয়া মস্তকের উপর খোঁপা করিয়া দিল! নরেন্দ্র এই অদ্ভুত বেশে জেলেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের অন্তঃপুরে চলিলেন!

নরেন্দ্র জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কত গৃহ ও পথ অতিবাহিত করিলেন তাহা গণনা করা যায় না। দ্বারে দ্বারে অসিহস্তে খোজাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও শত শত পরিচারিকা এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছে। জেলেখাকে দেখিয়া সকলেই দ্বার ছাড়িয়া দিল।

নরেন্দ্রনাথ বেগমদিগের মহলের অভ্যন্তরে যত যাইতে লাগিলেন ততই বিস্মিত হইলেন,—ঐশ্বর্য্য, শিল্পকার্য্য ও বিলাসপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত কত ঘর, কত প্রাঙ্গণ, কত সুন্দর স্তম্ভসারি, কত উন্নত ছাদ, তাহা গণনা করা যায় না। সেই প্রস্তরে কি অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য! দেয়ালে, স্তম্ভে, প্রকোষ্ঠে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর শ্বেতপ্রস্তরে সন্নিবেশিত হইয়া লতা, পত্র, বৃক্ষ, পুষ্পের রূপ ধারণ করিয়াছে, যেন সুন্দর শ্বেত দেয়ালের পার্শ্বে যথার্থই পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। ছাদ হইতে যেন সেইরূপ পুষ্প লম্বিত রহিয়াছে, অথবা উজ্জ্বল সুবর্ণে মণ্ডিত ও চিত্রিত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ করিতেছে। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর গবাক্ষ, সুন্দর ফোয়ারা, সুন্দর পুষ্পাধার; তাহার উপর মনোহর সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া প্রাসাদকে আমোদিত করিতেছে। শ্বেত, পীত, নীল বর্ণের আলোক সেই রঞ্জিত ঘরের ভিতর ও বাহিরে দেখা যাইতেছে। জগতে অতুল্য রূপবতী বেগমগণ কেহ বা সেই ঘরে বা প্রকোষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা পুষ্প চয়ন করিয়া কেশে ধারণ করিতেছেন, কেহ বা আনন্দে গান করিতেছেন। আজ আনন্দের দিন, রাজপ্রাসাদ আনন্দে ও নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র যে স্থানে স্বয়ং আরংজীব ছিলেন তথায় যাইয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন, সম্রাট আরংজীব বেগমদিগের সহিত পাঁচিশী খেলিতেছেন। পাঁচিশীর ঘর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত ও প্রকাণ্ড; এক একটী রূপবতী কামিনী এক একটী ঘুঁটী! ঘুঁটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হওয়া আবশ্যক, এই জন্য কামিনীগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন!

তথা হইতে নরেন্দ্র জেলেখার সঙ্গে একটী মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত ঘরে প্রবেশ করিলেন। মর্ম্মরপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত স্তম্ভসারি সাটিন ও মকমলে বিজড়িত, এবং নানা বর্ণের গন্ধদীপ আলোক ও গন্ধদানে ঘর আমোদিত করিতেছে। ভিতরে তিন চারি জন বেগম বাদ্য ও গীত করিতেছে, সপ্তস্বরমিলিত সেই গীতধ্বনি উন্নত ছাদ উল্লঙ্ঘন করিয়া যমুনাতীরে ও নৈশ গগনে প্রধাবিত হইতেছে।

সে গৃহ হইতে কিছুদূরে যমুনানদীর দিকে একটী শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত বারাণ্ডায় সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে। এ স্থানটী নিস্তব্ধ ও রমণীয়! উপরে আকাশ নীলবর্ণ, দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, শারদীয় চন্দ্র সুধাবর্ষণ করিয়া গগনকে শোভিত ও জগৎকে তৃপ্ত করিতেছে। নীচে নীলবর্ণ যমুনানদী কল্ কল্ শব্দে প্রধাবিত হইতেছে, তাহার চন্দ্রকরোজ্জ্বল বক্ষের উপর দুই একখানি ক্ষুদ্র পোত ভাসমান রহিয়াছে। দক্ষিণে সুন্দর তাজমহল চন্দ্রকরে অধিকতর সুন্দর দেখা যাইতেছে। বারাণ্ডা জনশূন্য, কেবল একজন রাজদাসী বীণাহস্তে গান করিতেছিল, এক্ষণে পরিশ্রান্ত হইয়া বারাণ্ডার শ্বেতপ্রস্তরে মস্তক রাখিয়া বোধ হয় সুখের বা দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছে। যমুনার বায়ু রমণীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল কেশপাশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, অথবা সে বীণার উপর কখন কখন সুখের গান করিতেছে। বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান হইয়া ও যমুনার সুন্দর গান ও শীতল বায়ু ভোগ করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে নব নব ভাব উদিত হইতে লাগিল। এইরূপ নিস্তব্ধ রজনীতে এইরূপ নদীতীরে নরেন্দ্র দূর বঙ্গদেশে হেমকে শেষবার দেখিয়াছিলেন! আহা! সে সুন্দর মুখখানি চন্দ্র হইতেও সুধাপূর্ণ ও জ্যোতির্ম্ময়! মুহূর্ত্তের জন্য নরেন্দ্রের হৃদয় হেমলতাপূর্ণ হইল, নরেন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে যাইলেন।

যে দিকে যাইলেন, সে দিক হইতে লোকের কলরব শুনিতে পাইলেন। প্রাসাদের মধ্যে এই কলরব শুনিয়া নরেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইলেন, এবং ঔৎসুক্যের সহিত সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। যত নিকটে আসিলেন, তত নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর কথা ও হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি আরও বিস্মিত হইয়া সেই দিকে যাইয়া অবশেষে একটী জনাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন।

দেখিলেন সম্মুখে একটী অতি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণে কত সুন্দর পুষ্পচারা ও পুষ্পলতিকা তাহা বর্ণনা করা যায় না। চতুঃপার্শ্বস্থ হর্ম্ম্যশ্রেণী হইতে পুষ্পমালা দুলিতেছে, বৃক্ষলতায় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে স্তূপাকার পুষ্প রহিয়াছে, চারিদিকে সুগন্ধ পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে। সুদর্শন ফোয়ারা যেন দ্রব রৌপ্য-স্তম্ভ নৈশ আকাশে উত্তোলন করিয়া আবার মুক্তারূপে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে। ঝোপে বৃক্ষের অন্তরালে, সম্মুখে, পার্শ্বে, উচ্চে, নীচে, নানাবর্ণের সুগন্ধদীপাবলী জ্বলিতেছে, যেন আজ ইন্দ্রের অমরাপুরী লজ্জিত করিয়া এই বেগমমহল অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছে। সেই প্রাঙ্গণে একটী বাজার বসিয়াছে, ক্রেতা বিক্রেতা দলে দলে বিচরণ করিতেছে। অন্যান্য বাজার হইতে এই ভেদ যে সকলেই রমণী। বিক্রেতা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজা মহারাজা ও ওমরাহের মহিলাগণ,—ক্রেতা সম্রাটের বেগমগণ! যে সমস্ত অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী লাবণ্যময়ী যুবতীগণ ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন, তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য, রসিকতা ও বাকপ্রগলভতায় নরেন্দ্র চকিত হইলেন!

পাঠকগণ অবগত আছেন যে বৎসর বৎসর নওরোজার দিন দিল্লীর সম্রাটগণ বেগমমহলে এইরূপ একটী করিয়া বাজার বসাইতেন, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান মহিলাগণ এই বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতেন। ওমরাহ ও রাজগণ পরিবারস্থ রমণীদিগকে বেগমদিগের সহিত পরিচিতা করিবার জন্য এই বাজারে পাঠাইতেন। পুরুষের মধ্যে কেবল স্বয়ং সম্রাট আসিতেন। পূর্ব্বপ্রথামতে এই আনন্দের দিনে আরংজীব সেইরূপ বাজার বসাইয়াছেন, ও স্বয়ং দুই একজন বেগমের সহিত এক দোকান হইতে অন্য দোকানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রাতৃযুদ্ধে আরংজীবের ভগিনী রৌশনআরা আরংজীবের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন, সে বাজারের মধ্যে রৌশনআরার ন্যায় কাহার গৌরব, কাহার প্রভুত্ব? অন্য ভগিনী জেহানআরা দারার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, অদ্য এই মহোৎসবের মধ্যে জেহানআরা নাই।

বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে নরেন্দ্রনাথ এই মহোৎসব দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন সম্রাট একজন রূপবতী মোগলকন্যার নিকটে কতকগুলি অলঙ্কার ও সাটিন ও সুবর্ণখচিত বস্ত্রের দর করিতে আরম্ভ করিতেছেন। দর করিতে উভয়পক্ষই সমান পটু, কখন কখন এক পয়সার বিভিন্নতার জন্য মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইতেছে। আরংজীব বলিলেন,—তোমার জিনিস মেকি, তুমি এখানে ঠকাইতে আসিয়াছ? চতুরা মোগলকন্যা বলিলেন,—তুমি কিরূপ খরিদদার? এরূপ জিনিস কখনও দেখ নাই, ইহার দর তুমি কি জানিবে? তুমি ইহার উপযুক্ত নও, অন্য স্থানে যাও, তোমার যোগ্য দ্রব্য পাইবে। এইরূপ বহু বাগবিতণ্ডার পর মূল্য অবধারিত হইল। ক্রেতা তখন যেন ভ্রমক্রমে দুই চারিটী রৌপ্যমুদ্রার স্থানে বিক্রেতাকে সুবর্ণমুদ্রা দিয়া চলিয়া গেলেন!

অনেকক্ষণ এইরূপ বাজার দেখিয়া নরেন্দ্র জেলেখার আদেশানুসারে "শিশমহলে" প্রবেশ করিলেন, তথায় আবার অন্যরূপ অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন। সম্রাট ও বেগমদিগের স্নানার্থ এই মহল নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সানের উপর দিয়া নির্ম্মল জল প্রবাহিত হইতেছে, এই সানে অঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখিয়া বোধ হয় যেন জলের নীচে অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে ফোয়ারার নির্ম্মল জল বেগে উঠিতেছে, আবার মুক্তারাশির ন্যায় প্রস্তরের উপর পতিত হইতেছে। ছাদ হইতে অসংখ্য দীপাবলি লম্বিত রহিয়াছে ও সেই সমস্ত দীপের বিবিধবর্ণের আলোক ফোয়ারার জলের উপর বড় সুন্দরভাবে প্রতিহত হইতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য দর্পণ রত্নরাজিখচিত হইয়া দেয়ালে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেন না স্নানকারিণী চতুর্দ্দিকেই আপনার সুন্দর অনাবৃত অবয়ব দেখিতে পাইবেন! বিলাসপটু সম্রাটগণ বেগমদিগকে লইয়া এই গৃহে স্নান ও জলকেলি করিতে পারিবেন, এই জন্য কত দেশ হইতে অর্থ আনীত হইয়া এই অপূর্ব্ব বিলাসগৃহ বিনির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে!

নানাদেশ হইতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু রমণী অদ্য প্রাসাদে সমবেত হইয়াছেন।

তাহার মধ্যে অনেকেই শিশমহলের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন। জেলেখা তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া নরেন্দ্রকে হাত ধরিয়া এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া একটী দর্পণের নিকট আনিল এবং সেই দর্পণের ভিতর একটী ছায়া দেখাইল। চকিত ও নিস্পন্দ হইয়া নরেন্দ্র সেই দর্পণের ভিতর সেই ছায়া দেখিতে লাগিলেন, তথা হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না! আলোকে আকৃষ্ট পতঙ্গবৎ নরেন্দ্র সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন, অনিমেষ লোচনে সেই দর্পণস্থ প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন! নরেন্দ্রনাথ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? নরেন্দ্র কি উন্মত্ত হইয়াছেন? নরেন্দ্রের শরীর কাঁপিতেছে, তাঁহার হৃদয় সজোরে আঘাত করিতেছে, তাঁহার নয়ন স্পন্দহীন! ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি দর্পণ হইতে সরিয়া গেল, সে রমণী অবগুণ্ঠন টানিয়া শিশমহল হইতে বাহির হইলেন, উন্মত্ত নরেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন!

রমণী রাজপুত-বেশধারিণী। নরেন্দ্র ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্য ক্রমে নিকটে আসিলেন, তথাপি রমণীর অনাবৃত বাহু ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া দেখা যায় না।

নরেন্দ্রও নারীবেশে, একবার ইচ্ছা হইল রমণীর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু নরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল। একবার ইচ্ছা হইল রমণীর হস্তে আপন হস্ত স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত উঠিল না, হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল! অচিরাৎ সেই রমণী ও তাঁহার রাজপুত-সঙ্গিনীগণ সেই বাজার পরিত্যাগ করিলেন, নরেন্দ্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনেক ঘর, অনেক দ্বার, অনেক পুষ্পোদ্যান ও প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া বাহিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক শিবিকা ছিল, রাজপুতকামিনীগণ নিজ নিজ শিবিকায় আরোহণ করিলেন। যে রমণীর দিকে নরেন্দ্র দেখিতেছিলেন তিনিও শিবিকায় আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন। বোধ হইল যেন তিনি যমুনানদী ও আগ্রার রাজপ্রাসাদ পূর্ব্বে দেখেন নাই, কেননা শিবিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে একবার প্রাসাদ ও নদীর দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যমুনার বায়ুতে তাঁহার অবগুণ্ঠন নড়িতে লাগিল, নরেন্দ্র তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল! কিন্তু সে অবগুণ্ঠন উড়িয়া গেল না, নরেন্দ্র মুখ দেখিতে পাইলেন না। অচিরাৎ শিবিকাযোগে সে রাজপুত-বেশধারিণী চলিয়া গেলেন।

এ কি হেমলতা? সেই গঠন, সেই চলন, সেই বাহু! দর্পণে সেই মধুমাখা মুখখানি প্রতিফলিত হইয়াছিল! কিন্তু হেমলতা আগ্রায় বেগমমহলে কেন? রাজপুত বেশ কি জন্য! নরেন্দ্রনাথ! প্রেমান্ধ হইয়া কাহাকে হেমলতা মনে করিতেছ? নরেন্দ্রনাথ! কেন দেশে দেশে সেই ছায়ার অনুধাবন করিতেছ?

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : ভ্রাতৃস্নেহ

BUT he who stems a stream with sand,
And fetters flame with flaxen band,
Has yet a harder task to prove
By firm resolve to conquer love.

—*Scott.*

বীরনগরের জমীদারের প্রকাণ্ড অট্টালিকার পার্শ্বে সুন্দর ও প্রশস্ত উপবন ছিল, সেই উপবন দিয়া নদীতীরে আসা যাইত। সেই উপবনে বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতা দৌড়াদৌড়ি করিত, সেই নদীকূলে বালক-বালিকার সঙ্গে খেলা করিত, হাসিত, কাঁদিত, আবার উচ্চহাস্যে উপবন আমোদিত করিত। আজি সে দিন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ শান্তিশূন্য হৃদয়ে দেশে দেশে বেড়াইতেছেন, শ্রীশচন্দ্র শ্বশুরের সম্প্রতি মৃত্যু হওয়ায় জমীদার হইয়াছেন, হেমলতা আজি বালিকা নহেন, নবজমীদারের গৃহিণী।

সায়ংকালে সেই উপবন দিয়া দুইটী রমণী ঘাটে যাইতে ছিলেন। একজন হেমলতা, অপরটী শ্রীশচন্দ্রের বিধবা ভগিনী শৈবলিনী।

হেমলতার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চদশ বর্ষ হইবে, অবয়ব ক্ষীণ, কোমল ও উজ্জ্বল রূপরাশিতে

পরিপূর্ণ। নয়ন দুইটী জ্যোতির্ম্ময়, ভ্রূযুগল সুচিক্কণ, ওষ্ঠ সূক্ষ্ম, গণ্ডস্থল রক্তিমাচ্ছটায় আরক্ত, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়। তথাপি যৌবনপ্রারম্ভের প্রফুল্লতা সে অবয়বে লক্ষিত হয় না, যৌবনের উন্মত্ততা সে মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় যেন সে সুন্দর ললাটে, সেই স্থির চক্ষুর্দ্বয়ে, সেই সুচিক্কণ ওষ্ঠে, অকালেই চিন্তার অঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে। নয়নের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ঈষৎ স্তিমিত হইয়াছে, মুখমণ্ডলের প্রফুল্ল আলোকের উপর জীবনের সন্ধ্যার ছায়া বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যৌবনের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা কৈ? প্রফুল্লতা থাকিলে কি হেম এরূপ নম্রভাবে ধীরে ধীরে যাইত? ঐ ক্ষুদ্র নতশির পুষ্পটিকে তুলিয়া কি উহার দিকে ঐরূপ স্থিরভাবে চাহিত? যে কৃষ্ণবর্ণ সুচিক্কণ কেশপাশে তাঁহার বদনমণ্ডল ও নয়নদ্বয় ঈষৎ আবৃত হইয়াছে, ধীরে ধীরে সযত্নে সরাইয়া দেখ, নয়নদ্বয়ে জল নাই, তথাপি নয়নদ্বয় স্থির, শান্ত, যৌবনোচিত চপলতাশূন্য। নিকটে যাইয়া দেখ হেমলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না, তথাপি যেন ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে। অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কোরকে দুঃখকীট প্রবেশ করে নাই, তথাপি কোরক জীবনাভাবে যেন ঈষৎ শুষ্ক ও নতশির। জীবনের অরুণোদয় যেন মেঘচ্ছায়ায় বিমিশ্রিত।

শৈবলিনীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। শৈবলিনী বিধবা, অবয়বে যৌবনের রূপ নাই, কিন্তু অনির্ব্বচনীয় পবিত্র গৌরব আছে। মস্তক হইতে নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, ললাট সুন্দর, চক্ষু বিশাল ও শান্তপ্রভ, মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ কোমল, অবয়ব উন্নত ও বিধবার শুভ্র বসনে আবৃত। শৈবলিনী হেমলতাকে কনিষ্ঠার ন্যায় ভালবাসিত, সস্নেহ বচনে তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘাটে যাইতেছিল। শৈবলিনীর জীবন যেন মেঘশূন্য, বায়ুশূন্য সায়ংকাল, গম্ভীর, নিস্তব্ধ, শান্ত।

বাল্যকালে হেমলতা নরেন্দ্রনাথের মুখ দেখিলে ভাল থাকিত। যৌবনপ্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ হেমলতার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল, হেমলতা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার হৃদয় নরেন্দ্রনাথপূর্ণ হইয়াছিল। যখন সেই নরেন্দ্রের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইল, যখন হেম আর এক জনের সহধর্ম্মিণী হইয়া নরেন্দ্রের প্রতিমাকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইল, তখন প্রেম কি পদার্থ হেম বুঝিতে পারিল, তখন মর্ম্মভেদী দুঃখ আসিয়া হেমের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বালিকা সরলা, নবোঢ়া বধূ, সে কথা কাহার কাছে বলিবে, সে দুঃখ কাহার কাছে

শৈবলিনী পঞ্চবর্ষের সময়েই বিধবা হইয়াছিল, শ্বশুরালয়েই থাকিত, কখন কখন ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। শৈবলিনী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, দুই তিন বার বীরগ্রামে আসিয়াই হেমলতার অন্তরের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিল, মনে মনে সংকল্প করিল,—যদি ধালিকাকে আমি যত্ন না করি, বোধ হয় ভ্রাতার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে। শৈবলিনী সেই অবধি বীরগ্রামে রহিল।

শৈবলিনীর সস্নেহ ব্যবহারে ও প্রবোধ বাক্যে হেমলতার দুঃখভার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। শৈবলিনী মানব-চরিত্র বিশেষরূপ বুঝিত, একবারও হেমকে তিরস্কার করিত না, কনিষ্ঠা ভগিনীকে যেন প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিত। তাহার সারগর্ভ স্নেহপরিপূর্ণ কথায় কোন্ দুঃখিনীর দুঃখ না বিদূরিত হয়? শৈবলিনী গল্প করিতে অতিশয় পটু, সর্ব্বদাই হেমলতাকে পুরাণের গল্প বলিত। সে পবিত্র গল্প শুনিতে শুনিতে হেমলতা রজনীতে নিদ্রা বিস্মরণ হইত। গভীর রজনী, গভীর বন, চারিদিকে বৃক্ষের অন্ধকার দেখা যাইতেছে, বায়ুর শব্দ ও হিংস্রক জন্তুর নাদ শুনা যাইতেছে। রাজকন্যা দময়ন্তী অদ্য স্বামীর প্রেমকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া, ধন মান রাজ্য তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ভিখারিণী বেশে বিচরণ করিতেছে। স্বামী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে গণ্ডূষ করিয়া জল দিতেছে, স্বামী বস্ত্রহীন হইলে আপনবস্ত্র দিতেছে, স্বামী পরিশ্রান্ত হইলে আপন অঙ্কে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিয়া স্বয়ং অনিদ্র হইয়া উপবেশন করিয়া আছে। সেই স্বামী যখন মায়া বিচ্ছিন্ন করিয়া অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল, তখনও অভাগিনীর স্বামি-চিন্তা ভিন্ন এ জগতে আর চিন্তা নাই, স্বামীর পুনর্ম্মিলন ভিন্ন এ জগতে আর আশা নাই।

অথবা সেই মহর্ষি বাল্মিকীর কুটীরে চিরদুঃখিনী বৈদেহী হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া এখনও হৃদয়েশ্বরকে চিন্তা করিতেছে। সম্মুখে পুত্র দুইটী খেলা করিতেছে, তাহাদিগের মুখ অবলোকন

করিতেছে, আবার শ্রীরামের চিন্তা করিতেছে। যিনি নিরাশ্রয়া, নিষ্কলঙ্কা, অন্তঃসত্ত্বা, রাজকন্যা, রাজরাণীকে চিরনির্ব্বাসিত করিয়াছেন সেই নিষ্ঠুর পতিকেও অদ্যাবধি হৃদয়ে স্থান দিয়া অভাগিনী চিন্তা করিতেছে, সেই পতিই সীতার জীবনের জীবন, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন! পতিব্রতার কি মাহাত্ম্য!

রজনী তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত হেমলতা তাহার ধর্ম্মপরায়ণা ননদিনীর নিকট এই সকল পুণ্য কথা শুনিত। দুঃখ কথা শুনিয়া হেমলতার হৃদয় আলোড়িত হইত, ননদিনীর হৃদয়ে বদন ঢাকিয়া দর-বিগলিত ধারায় রোদন করিত। আবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র কথা শুনিত, আবার শোকাকুলা হইয়া অবারিত অশ্রুজল ত্যাগ করিত। হেমলতা ভাবিত,—সংসারে সকলেই দুঃখিনী, পুণ্যাত্মা সীতা দুঃখিনী, ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রী দুঃখিনী, আমি কে অভাগিনী যে নিজ দুঃখে বিহ্বলা হইয়া রহিয়াছি। তাঁহারা সাধ্বী ছিলেন, পতিব্রতা ছিলেন, অভাগিনী হেমলতা আজিও নরেন্দ্রের চিন্তা করে, দেবতুল্য স্বামীকে বিস্মরণ হইয়া আছে। আমি অবলা, আমার বল নাই, ভগবান সহায় হও, পাপচিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত কর, অবলার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবে।

শৈবলিনীর অপরূপ স্নেহ ও প্রবোধবাক্যে হেমলতা ক্রমশঃ শান্তি লাভ করিল, হৃদয়ের প্রথম প্রেমস্বরূপ ভীষণ শেল উৎপাটিত হইল, কিন্তু অনেক দিনে, অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে, সে ফল লাভ হইল। সেই পরিশ্রম ও চেষ্টায় যৌবনের প্রফুল্লতা শুষ্ক হইয়া গেল, অবয়বে চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল। হেমলতা আজি আর দুঃখিনী নহে, কিন্তু স্বভাবতঃ ধীর, নম্র ও নতশির।।

এক্ষণে হেমলতা ও শৈবলিনী সর্ব্বদাই নরেন্দ্রের কথা কহিত, বাল্যকাল হইতে শৈবলিনী নরেন্দ্রকে ভ্রাতা বলিত, এখন হেমও তাহাকে ভ্রাতার স্বরূপ জ্ঞান করিত। ভ্রাতার বিপদে বা অবর্ত্তমানে ভগিনীর চিন্তা হয়, হেমও নরেন্দ্রের জন্য ভাবিত, কিন্তু তাহার হৃদয় আর পূর্ব্ববৎ বিচলিত হইত না। কিংবা যদি কখন কখন সায়ংকালে সেই উপবনে একাকী বিচরণ করিতে করিতে হেমের বাল্যকালের কথা মনে পড়িত, ভাগীরথীর কল্ কল্ শব্দ শুনিয়া, নীল গগন-মণ্ডলে উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া, শীতল হরিৎ কুঞ্জবনে উপবেশন করিয়া, বাল্যকালের সঙ্গীর কথা মনে পড়িত, যদি সে কথা মনে পড়িয়া হেমের চক্ষে এক বিন্দু জল লক্ষিত হইত, —পাঠক, তাহা ভ্রাতৃস্নেহের নিদর্শনস্বরূপ বলিয়া মার্জ্জনা করিও। অন্য ভাব তিরোহিত করিবার জন্য হেম অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক সহ্য করিয়াছে, অভাগিনী অনেক কাঁদিয়াছে, সে ভাব তিরোহিত করিয়াছে। যদি হৃদয়ের কন্দরে অজ্ঞাতরূপে, সে ভাবের একবিন্দুও লুক্কায়িত থাকে, পাঠক, সেটুকু অভাগিনী হেমকে ক্ষমা করিও না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পুরাণ-কথা

YET, oh yet thyself deceive not,
Love may sink by slow decay,
But by sudden wrench believe not
Hearts can thus be torn away.

—*Byron.*

ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমলতা ও শৈবলিনী গৃহের সমস্ত কার্য্যাদি সমাপন করিল। পরে দুইজনে একটী ঘরে বসিয়া হেম বলিল,—দিদি! অনেক দিন অবধি গল্প শুনি নাই, আজ একটু অবসর আছে, একটী গল্প বল না!

শৈবলিনী সস্নেহ বচনে উত্তর দিল,—বলিব বৈ কি বৌ, কোন্ গল্পটি বলিব তুমি বল।

হেম বলিল,—রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প অনেক দিন শুনি নাই, সেই গল্প বল।

শৈবলিনী হরিশ্চন্দ্রের গল্প বলিতে লাগিল। মহাভারতের কথা যথার্থই অমৃতের তুল্য, তাহার গল্প কি মিষ্ট, কি সুললিত, কি হৃদয়-গ্রাহী! রাজার রাজ্য গেল, ধন গেল, মান গেল, স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী শৈব্যা এক্ষণে রাজার

একমাত্র রত্ন। সুখের সময়, সম্পদের সময়, রমণী অস্থিরা, চঞ্চলচিত্তা, মানিনী! কত আব্দার করে, কত অভিমান করে, কত মিথ্যা ক্রোধ করে, কিন্তু যখন জীবনাকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আইসে, যখন পৃথিবীর সমস্ত সুখ নাট্যাভিনয়ের শেষে দীপশ্রেণীর ন্যায় একে একে নির্ব্বাপিত হইতে থাকে, যখন আশা মরীচিকারূপে আমাদিগকে অনেক পথ লইয়া যাইয়া শেষে মরুভূমিতে রাখিয়া অদৃশ্য হয়, যখন বন্ধুগণ আমাদিগকে ত্যাগ করে ও লক্ষ্মী বিমুখ হয়েন, তখন কে অনন্যমনা ও অনন্যহৃদয়া হইয়া অভাগার শুশ্রূষা করে? মাতা ব্যতীত আর কে হতভাগার শয্যা রচনা করে? দুহিতা ব্যতীত আর কে রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে জল দান করে? ভার্য্যা ব্যতীত আর কে নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, ক্লান্তি বিস্মৃত হইয়া, দিবানিশি হতভাগার সেবায় রত থাকে? রমণীর প্রেম অগাধ, অপরিসীম। দারিদ্র্যে, দুঃখে, কষ্টেও শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে সেবা করিতে লাগিলেন। সে দুঃখের কথা শুনিয়া হেমলতার চক্ষুতে জল আসিল।

তাহার পর আরও দুঃখ। রাজা শৈব্যাকে ও পুত্রটিকে বিক্রয় করিলেন, আপনাকে চণ্ডালের নিকটে বিক্রয় করিলেন, অভাগিনী শৈব্যা স্বামিবিরহে কায়িক পরিশ্রমে আপনার ও পুত্রটির ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। আহা! সে পুত্রটিও অকালে কাল প্রাপ্ত হইল!—হেমলতা আর থাকিতে পারিল না, ননদিনীর হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া দর-বিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিল।

গল্প সাঙ্গ হইল, রাজা রাজ্ঞীকে ফিরিয়া পাইলেন, পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন, রাজ্য সম্পদ সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন। হেমলতার হৃদয় শান্ত হইল। অনেকক্ষণ, প্রায় এক দণ্ডকাল, উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, অনেকক্ষণ পর হেমলতা ধীরে ধীরে উঠিয়া একটী বাতায়ন খুলিল। বাহিরে চন্দ্রকরে জগৎ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, নৈশ বায়ুতে বৃক্ষ সকল ধীরে ধীরে মস্তক নাড়িতেছে দূর হইতে গঙ্গার জলের কুল্ কুল্ শব্দ শুনা যাইতেছে।

শৈবলিনী ধীরে ধীরে হেমলতার নিকটে আসিয়া ভগিনীর ন্যায় সস্নেহে তাহার হস্ত ধারণ করিল। হেম কি ভাবিতেছিল? ভাবিতেছিল ঐ বৃক্ষের পাতায় পাতায় কত জোনাকী পোকা দেখা যাইতেছে, উহাদেরও জীবন আছে, সুখ, দুঃখ, ভরসা, ইচ্ছা আছে। যে ভগবান রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তিনিই এই নিশায় অনিদ্র হইয়া ঐ পোকাগুলিকে খাদ্য যোগাইতেছেন, উহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। এই বিপুল বিশ্বসংসারে সকল জীবজন্তুকে তিনিই রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে নিবিষ্ট মনে পূজা করি, আমাদিগকে তিনি রক্ষা করিবেন।

হেমলতা বালিকা-সুলভ সরলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—দিদি, যিনি দয়ার সাগর, তিনি তোমাকে অল্পবয়সে বিধবা করিলেন কেন?

শৈবলিনী। সকলের কপালে কি সকল সুখ থাকে? তিনি আমাকে বিধবা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখিনী করেন নাই। দেবতুল্য ভ্রাতা দিয়াছেন, তোমার ন্যায় সুশীলা ভ্রাতৃজায়া দিয়াছেন, এই সোনার সংসারে স্থান দিয়াছেন। আমার আর কিছুই কামনা নাই, কেবল একবার তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া পূজা করিব এই ইচ্ছা আছে।

হেমলতা। আমাদের কাশী বৃন্দাবন যাওয়ার কথা স্থির হইয়াছিল না?

শৈবলিনী। হাঁ, শ্রীশ আমার উপরোধে সম্মত হইয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই যাওয়া হইবে।

হেমলতা। দিদি, তোমার সঙ্গে তীর্থে যাইব ভাবিলে আমার বড় আহ্লাদ হয়; কত দেশ দেখিব, কত তীর্থ দেখিব। আর শুনিয়াছি নরেন্দ্র নাকি পশ্চিমে আছেন, হয় ত তাঁহার সঙ্গেও দেখা হইবে।

শৈবলিনী। হইতে পারে।

এমন সময়ে শ্রীশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন। শৈবলিনী একপার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া যাইল। তাহার ললাট চিন্তাকুল।

শৈবলিনীর কি চিন্তা? বাহিরে দণ্ডায়মানা হইয়া শৈবলিনী ভাবিতেছিল,—হেম! তুমি আমাকে বিধবা বলিয়া অভাগিনী বল, কিন্তু নারীতে যাহা কখনও সহ্য করিতে পারে না, বালিকা! তুমি তাহা সহ্য করিয়াছ। সে আঘাতে তোমার হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে, তোমার জীবন শুষ্ক হইয়াছে, এ বয়সে তোমার দুর্ব্বল শরীর ও নীরস ওষ্ঠ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এ বিষম চিন্তার কথা ভ্রাতা কিছুই জানে না, তুমি বালিকা, তুমিও ভাবিয়াছ এ চিন্তা নির্ব্বাপিত

হইয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইলে কি হয় জানি না। ভগবান অনাথার নাথ, অসহায়ের সহায় হইবেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : তীর্থযাত্রা

UPON her face was the tint of
grief,
The settled shadow of an inward
strife,
And an unquiet drooping of the
eye,
As if its lids were charged with
inshed tears.
—*Byron.*

শৈবলিনী পুনরায় ঘরের ভিতরে আসিল, ও ভ্রাতাকে আসন দিয়া ভোজনে বসাইয়া আপনি পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। হেমলতা সে ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর ভোজন দেখিতে লাগিল।

ভ্রাতা ভগিনীতে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীশচন্দ্রের খাওয়া সাঙ্গ হইল। রাত্রি অধিক হওয়ায় তিনি শয়নের উদ্যোগ করিলেন, শৈবলিনী অন্য গৃহে গেল।

তখন হেমলতা ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে আসিল, ও বিনীত ভাবে তাম্বুল দিল। অদ্য শ্রীশের অন্তঃকরণ কিছু আহ্লাদিত ছিল, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন,—আমি পান খাইব না।

হেম। কেন?

শ্রীশ। তোমার মুখে কথা নাই কেন?

হেম। কি কথা কহিব বল, কহিতেছি। আগে পানটী খাও।

শ্রীশ। চিরকালই কি এই শুষ্ক মুখখানি দেখিব? কবে তুমি শরীরে একটু সারিবে, কবে তোমার মুখখানি প্রফুল্ল দেখিব?

হেম। আমার শরীর ত এখন ভাল আছে।

শ্রীশ। হাঁ, ঈশ্বরেচ্ছায় শরীর অল্প সারিয়াছে, কিন্তু মনে উল্লাস কৈ?

হেম। উল্লাস আবার কি?

শ্রীশ। মনের স্ফূর্ত্তি কৈ? কবে তোমাকে সুখী দেখিব?

হেম। কৈ আমার মনে কোন কষ্ট নাই। তবে দিদির কাছে একটী দুঃখের গল্প শুনিতেছিলাম তাই এক বিন্দু চক্ষুর জল ফেলিয়াছিলাম।

শ্রীশ এ কথায়ও তুষ্ট হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার মুখখানি সহাস্য দেখিব কবে?

হেম আর উত্তর করিতে পারিল না। ভূমির দিকেই চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একটী কথা মনে পড়িল, এবার হেম অল্প হাসিয়া বলিল,—যবে তুমি আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিবে?

শ্রীশ। কি প্রতিজ্ঞা?

হেম। তীর্থযাত্রা।

শ্রীশচন্দ্র এবার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। হেমলতা ও শৈবলিনীর উপরোধে অনেকবার তীর্থযাত্রা করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উদ্যোগ করেন নাই। অদ্য হেমলতার কথায় কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিলেন,—যদি যথার্থই তীর্থযাত্রা করিলে তোমার শরীর ও মন ভাল থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই যাইব। কল্য হইতে আমি যাত্রার আয়োজন করিব।

হেম পরিতৃপ্ত হইল। হেমকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়া শ্রীশ আনন্দিত হইলেন, সে ক্ষীণ দেহলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সস্নেহে হেমকে চুম্বন করিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনার অল্পদিন পরেই শ্রীশচন্দ্র সপরিবারে পশ্চিম যাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ সমস্ত তীর্থস্থান দেখিয়া অবশেষে মথুরা ও বৃন্দাবন যাইবার মানসে আগ্রায় পৌঁছিলেন। তথায় শ্রীশচন্দ্র প্রধান প্রধান হিন্দু-রাজাদিগের সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন রাজার উপরোধে শ্রীশ সেই রাজার পরিবারের সহিত আপন পরিবারকে নওরোজার দিন প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হেমলতা অগত্যা রাজপুত-মহিলার বেশ ধরিয়া রাজপুত-রমণীদিগের সহিত আগ্রার বেগমমহলে গিয়াছিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ জেলেখার পত্র

THE cold in clime are cold in blood,
Their love doth scarce deserve the name,
But mine was like the lava flood,
That boils in Etna's breast of flame.

—*Byron.*

নরেন্দ্র আগ্রাদুর্গের ভিতরে দর্পণে হেমলতার মুখচ্ছবি দেখিয়া প্রায় হতজ্ঞান হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধ আকাশ ও শান্তপ্রবাহিণী নদীর দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে আপন গৃহে যাইলেন।

নরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন, একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, লোক কেহ নাই। নরেন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকের বস্ত্র খুলিতে লাগিলেন! সহসা তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে একখানি পত্র ভূমিতে পড়িয়া যাইল। নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিলেন তাহা উর্দ্দু ভাষায় লিখিত। নরেন্দ্র প্রদীপের নিকট বসিয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অধিক না পড়িতে পড়িতেই বুঝিতে পারিলেন জেলেখার পত্র। তখন অধিকতর বিস্মিত হইয়া আরও পড়িতে লাগিলেন। পত্রে এই লেখা ছিল ঃ—

"নরেন্দ্র!

"আমি পাগলিনী, আমি হতভাগিনী, সেই জন্য এই পত্র লিখিতেছি। আমি চক্ষুতে আর দেখিতে পাইতেছি না, আমার মস্তক ঘুরিতেছে তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার মনের কথা তোমাকে বলিয়া যাই। তুমি যখন এই পত্র পড়িবে তখন অভাগিনী আর এ জগতে থাকিবে না।

"আমি শাজিহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জেহানআরা বেগমের পরিচারিকা। যে দিন বারাণসীর যুদ্ধ হয়, কার্য্যবশতঃ আমি ও মসরুর নামক খোজা রাজা জয়সিংহের শিবিরে ছিলাম। সেই দিন আহত ও অচেতন হইয়া তুমি সেই শিবিরে আনীত হও, সেই দিন তোমাকে দর্শন করিয়া হৃদয়ে কালসর্প ধারণ করিলাম।

"দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, আমি হলাহল পান করিতে লাগিলাম। অশ্রান্ত হইয়া সেই পীড়াশয্যার উপর নত হইয়া থাকিতাম, অনিদ্রিত হইয়া সেই নিদ্রিত কলেবর নিরীক্ষণ করিতাম। ঐ প্রশস্ত ললাট, ঐ রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দুটীর দিকে দেখিতাম আর পাগলিনীপ্রায় হইতাম। পীড়াবশতঃ কখন তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে, আমি নিঃশব্দে মনের দুঃখে রোদন করিতাম। পীড়াবশতঃ কখন সস্নেহে আমার হস্ত ধরিতে, আমি পাগলিনী, আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইত। ঘরে কেহ না থাকিলে আগ্রহের সহিত তোমাকে চুম্বন করিতাম! ক্ষমা কর, আমি পাগলিনী!

"ক্রমে বারাণসী হইতে নৌকাযোগে তুমি দিল্লীতে আনীত হইলে। আমি কোন ছলে তোমাকে রাজপ্রাসাদের ভিতরে আনিয়া আপন ঘরে রাখিলাম; কেবল তোমাকে চক্ষে দেখিবার জন্য আপন ঘরে রাখিলাম। তোমার মুখের দিকে চাহিয়া, চাহিয়া, রজনী যাপন করিতাম; কখন কখন আত্মসংযম করিতে না পারিলে তোমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ হৃদয়ে ধারণ করিতাম!

"দুষ্ট মসরুর তোমার কথা সাহেব বেগমকে জানাইল! প্রাসাদের ভিতরে পুরুষ আনিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার ও তোমার প্রাণ সংহারের আদেশ দিলেন। আবার মসরুর যাইয়া সাহেব বেগমকে তোমার অপূর্ব্ব বীরত্ব ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা বলিল। বেগম পূর্ব্বের আজ্ঞা রোধ করিলেন, আমাকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন, ও তোমার আরোগ্যের পর স্বয়ং আমাদের দোষের বিচার করিবেন এইরূপ আদেশ দিলেন।

"আমি বন্দী হইলাম, দিবারাত্রি ঘরে একাকী বসিয়া থাকিতাম। তোমাকে না দেখিয়া অসহ্য যাতনা হইত, অবশেষে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বার-রক্ষক ও মসরুরের অনেক খোসামোদ করিয়া গোপনে তোমাকে দেখিতে যাইতাম। তখন তুমি আরোগ্যলাভ করিয়াছ, কখন কখন আমার দিকে চাহিয়া দেখিতে, তাহা কি স্মরণ হয়? আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতাম না, কথা কহিতে পারিতাম না। নিষ্ঠুর মসরুর আমাকে শীঘ্রই আপন ঘরে পাঠাইয়া দিত, তথায় যাইয়া আমি আবার সেই দেবকান্তির চিন্তা করিতাম।

"ক্রমে বিচারের দিন সমাগত হইল; সে দিন তোমার স্মরণ আছে? সিংহাসনোপবিষ্টা জেহানআরার চারিদিকে সহচরীগণ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তোমার স্মরণ আছে? সাহেব বেগম সেইদিন প্রথমে তোমাকে দেখিলেন; যে কঠোর আজ্ঞা দিলেন তোমার স্মরণ আছে? সাহজাদি! আমার পাপের কি এই উচিত দণ্ড? তুমিও স্ত্রীলোক, তোমার হৃদয় কি পাষাণ, কখনও বিচলিত হয় নাই? তবে আমি বাঁদী, আমার স্বাধীনতা নাই, সেই জন্য আমার পাপের দণ্ড দিলে। কিন্তু তুমি সিংহাসনোপবিষ্টা রাজদুহিতা আমা অপেক্ষাও যে ঘোর পাপীয়সী, তাহার কি দণ্ড নাই?*

"কি কৌশলে সেই রাত্রি আমি দুর্গ হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিলাম তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার পরই সৈনিকবেশে তুমি দিল্লী ত্যাগ করিলে, এ অভাগিনীও দেওয়ানা নাম ধারণ করিয়া পুরুষবেশে তোমার সঙ্গে যাইল। নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই, দিবারাত্রি তোমার নিকটে থাকিব, দিবারাত্রি তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, দিবসে তোমার অমৃত কথা শ্রবণ করিব, রজনীতে সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, কখন কখন দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত তোমার সুপ্ত-কান্তি দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব, কেবল এই আশায় আমি তোমার সহিত দিল্লী হইতে সিপ্রাতীরে, সিপ্রাতীর হইতে রাজস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি! জগতে কোন্ স্থল আছে, নরকে কোন্ স্থল আছে, যথায় এই সুখের আশায় অভাগিনী যাইতে পরাঙ্মুখ?

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পত্র সমাপ্ত

Or if she fell by bowl or steel
For that dark love she dared to fell.
—*Byron.*

"নরেন্দ্র! ভালবাসিয়াছ। যে হিন্দুরমণী তোমার প্রণয়ের পাত্রী তাহাকেও আমি দেখিয়াছি। কিন্তু তুমি কখনও ভালবাসার জন্য দেওয়ানা হও নাই! আমার তাতার দেশে জন্ম, তথাকার সকলেই উগ্রস্বভাব, কিন্তু আমি বাল্যকাল হইতে অতিশয় উগ্রস্বভাবা ছিলাম। আমি ক্রুদ্ধ হইলে বালকগণও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বালিকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইত। একটী যুদ্ধে আমার পিতা হত হয়েন, আমি রুদ্ধ হইয়া বাঁদী অবস্থায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট বিক্রীত হইলাম। স্বাধীনতা গেল, কিন্তু উগ্রস্বভাব গেল না, বোধ হয় ভারতবর্ষের উষ্ণতর সূর্য্যতাপে আমার শোণিত ক্রমশঃ উষ্ণতর হইল। প্রাসাদে তাতার রমণীদিগের কি কাজ বোধ হয় তুমি জান না। আমরা বেগমদিগের মহল রক্ষা করি, খড়্গ ও ছুরিকা ব্যবহারে আমরা অপটু নাই, বেগমদিগের আদেশে কত কত ভয়ঙ্কর কার্য্য সম্পাদন করি, তাহা জগৎ সাধারণ কি

---

* জেহানআরা বা সাহেব বেগমের প্রণয়ের অনেক গল্প কথা সে সময়ে প্রচলিত ছিল। ফরাসী ভ্রমণকারী বের্ণীয়ে তাহার কতকগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জানিবে? আমি এ সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সকলের অসাধ্য কার্য্যও সাধন করিতাম। আমার এই গুণের জন্যই সাহেব বেগম আমার এরূপ ক্রোধ সহ্য করিতেন।

"যখন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত আসিলাম, আমার স্বভাব কিছুমাত্র অন্যথা হইল না, দেওয়ানা হইয়া তোমার সহিত আসিলাম।

"উদয়পুরের হ্রদে নৌকা করিয়া সন্ধ্যার সময় চন্দ্রালোকে বেড়াইতে যাইতে, স্মরণ হয়? তোমাকে সর্ব্বদাই চিন্তিত দেখিতাম, কিন্তু তুমি কি ভাবিতে স্থির করিতে পারিতাম না। একদিন আমি নৌকায় বসিয়াছিলাম, তুমি আমার অঙ্কে মস্তক রাখিয়া শুইয়াছিলে ও চন্দ্রের দিকে দেখিতেছিলে, স্মরণ হয়? আমিও সমস্ত সময় তোমার চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, তোমার কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেছিলাম, তোমার অঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। সহসা তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলে, 'হেম! আর কি তোমাকে এ জীবনে দেখিতে পাইব?' আমি বঙ্গভাষা ভাল জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝিলাম। আমার মনে সন্দেহ জাগ্রৎ হইল।

"স্ত্রীলোকের মনে একবার সন্দেহ উদয় হইলে তাহা শীঘ্র তিরোহিত হয় না। দিবারাত্রি তোমার হেমের কথা জানিতে উৎসুক থাকিতাম, তোমার কাগজপত্র চুরি করিয়া পড়াইয়া লইতাম, কথায় কথায় তোমার নিকট হইতে বীরনগরের সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলাম। তখন তোমার হেমকে তোমার মন হইতে দূর করিয়া সেই স্থান অধিকার করিবার জন্য আমার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল।

"তোমার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দেখিয়া আমি একলিঙ্গ-মন্দিরের গোস্বামীদিগের নিকট আপন ইষ্টলাভের জন্য যাইলাম। প্রথমে যাঁহার নিকট যাইলাম তিনি পরম তেজস্বী ও ধার্ম্মিক, আমার সমস্ত প্রস্তাব শুনিয়া আমাকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে তিন চারি জনের নিকট অবমানিত হইয়া অবশেষে সেই শৈলেশ্বরের নিকট যাইলাম। তিনি অনেক অর্থলোভে সম্মত হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তিন শত মুদ্রার একটী হীরক-বলয় তাঁহার হস্তে দিলাম, আর সহস্র মুদ্রার একটী মুক্তামালা তাঁহার সম্মুখে দোলাইয়া বলিলাম,—যদি ছলে বলে কৌশলে নরেন্দ্রকে হেমলতার চিন্তা ত্যাগ করাইতে পার, মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করাইতে পার, আমাকে গ্রহণ করাইতে পার, তবে এই মুক্তাহার তোমার গলায় স্বহস্তে পরাইয়া দিব।

"এত অর্থ কোথায় পাইলাম জিজ্ঞাসা করিবে। জেহানআরার দাসদাসীরও অর্থের অভাব ছিল না। দেশের বড় বড় লোক সম্রাটের নিকট কোন আবেদন করিতে আসিলে বেগম সাহেবকে উপঢৌকন না দিলে কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইত না। কেহ একটী উচ্চ কর্ম্মের প্রার্থী, কেহ একটী বিষয়ের প্রার্থী, কেহ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছেন তাহার ক্ষমা চাহেন, কেহ পরের জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছেন তাহার একটী সনন্দপত্র চাহেন, কোন যোদ্ধা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন তাহার ক্ষমাপ্রার্থী, কাহারও উপর সম্রাটের অন্যায় ক্রোধ হইয়াছে, সে ক্রোধ হইতে নিস্তার পাওয়া আবশ্যক,—সকলেই রাশি রাশি হীরা, মুক্তা ও অর্থ বেগম সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আপন আপন আবেদন জানাইতেন। বেগম সাহেবের দাসীরাও অর্থে বঞ্চিত হইত না।

"তাহার পর শৈলেশ্বর যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তুমি জান। সে উপায় বিফল হইল, আমার আশা বিফল হইল। দুই দিন পর্ব্বতগহ্বরে নিজে নারীবেশে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তুমি সুরায় উন্মত্ত ছিলে, দেখিয়াছিলে কি না জানি না! প্রথম দিন তোমার পদতলে পড়িয়া রোদন করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিবস তোমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিলাম। হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া গেল, তাতারের হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া যায় কখনও জানিতাম না, আমি এরূপ ক্ষীণ তাহা জানিতাম না।

"পরে তোমার সহিত পুনরায় আগ্রায় আসিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম বঙ্গদেশ হইতে একজন ধনাঢ্য জমীদার আসিয়াছে,—তোমার হেমকে দেখিলাম। পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী তোমার হেম? উঃ—আর যাতনা সহ্য করিতে পারি না। মথুরার গোলকনাথের মন্দিরে তিন দিন পর এক প্রহর রাত্রির সময় যাইও, পরস্ত্রীকে আবার দেখিও! তুমি আমাকে হতভাগিনী করিয়াছ, তোমাকেও হতভাগা করিব, সেই জন্য এই সমাচার দিলাম! সেই জন্য আগ্রার দুর্গে লইয়া যাইয়া হেমকে দেখাইয়াছিলাম!

"আমার মৃত্যু সন্নিকট, কিন্তু জিঘাংসা তাতারের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্ম ভুলি নাই, আমার শোণিত শীতল হয় নাই।

"উঃ! আমার মস্তক ঘুরিতেছে। যদি এ তৃষ্ণার্ত্তকে স্নেহবারি দান করিতে, তবে মুসলমানী অকৃতজ্ঞ হইত না, যতদিন জীবন থাকিত—কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? নরেন্দ্র! এ জীবনের জন্য বিদায় দাও, যদি মৃত্যুর পর আর একবার দেখা হয়, নিষ্ঠুর নরেন্দ্র! এই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের ভাব তোমাকে দেখাইব। নরেন্দ্র! তখন তুমি আমাকে ভালবাসিবে,—নতুবা এই ছুরিকা দ্বারা তোমার পাষাণ-হৃদয় চূর্ণ করিব।—উন্মাদিনী জেলেখা।"

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্রের নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি পড়িল। তিনি নিস্তব্ধে চিন্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, সমস্ত নগর নিস্তব্ধ। নরেন্দ্র পদচারণ করিতে করিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িলেন, দেখিলেন সম্মুখে যমুনা।

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এরূপ সময়ে দেখিলেন যমুনা-তীরে একস্থানে কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া একটী মৃতদেহ ভূমিতে সন্নিবেশিত করিতেছে! জিজ্ঞাসা করায় সেই লোকের মধ্যে একজন উত্তর দিল,—

মৃত ব্যক্তি পূর্ব্বে বেগমমহলে দাসী ছিল, একজন কাফের সৈনিকের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়া বাহির হইয়া যায়। বোধ হয় সে সৈনিক উহাকে এক্ষণে হত্যা করিয়াছে, দাসীর বক্ষঃস্থলে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসান দেখিলাম। হতভাগিনীর নাম জেলেখা।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : মথুরা

ALLURED him, as the beacon blaze allures
The bird of passage, till he madly strikes
Against it, and beats out his weary life.

—*Tennyson.*

সায়ংকালে শান্তপ্রবাহিণী যমুনাকূলে মথুরা নগরী বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে, গগনে নক্ষত্র এক একটী করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে, যমুনার বিশাল বক্ষের উপর দিয়া সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে, সমস্ত জগৎ শীতল ও শান্ত। মথুরার প্রস্তরবিনির্ম্মিত ঘাট-শ্রেণী জল পর্য্যন্ত নামিয়াছে। বৃক্ষ ও কুঞ্জবনের ভিতর দিয়া মথুরার গোলকনাথের মন্দির দেখা যাইতেছে।

ক্রমে রজনী অধিক হইল, হেমন্তকালের চন্দ্রালোকে নদী, গ্রাম, বৃক্ষ ও মন্দির অতি সুন্দর কান্তি ধারণ করিল। নীল গগনে সুধাংশু যেন ধীরে ধীরে ভাসিতেছে; নদীবক্ষে দুই একখানি ক্ষুদ্রতরী ভাসমান রহিয়াছে। নদীর দুই পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণ বৃক্ষশ্রেণী নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রের সুধাবর্ষণে সমগ্র জগৎ তৃপ্ত হইয়া সুখে নিদ্রিত রহিয়াছে।

সহসা নগরের মধ্যে সায়ংকালীন পূজা আরম্ভ হইল, শত দেবালয় হইতে শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ শ্রুত হইতে লাগিল, সায়ংকালীন বায়ুহিল্লোলে সুদূরশ্রুত সে নিনাদ কি সুমধুর, কি মিষ্ট! সেই ঘণ্টারব ধীরে ধীরে নদীর বক্ষে ও নগরের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই নীল অনন্ত নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল, উপাসকদিগের মন যেন মুহূর্ত্তের জন্যও পৃথিবীর চিন্তা বিস্মরণ হইয়া সেই পবিত্র ঘণ্টারবের সহিত গগনের দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

নদীকূলে একটী প্রস্তরবিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণীর উপরেই গোলকনাথের দেবমন্দিরে আরতি হইতেছিল। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পূজক উচ্চৈঃস্বরে সায়ংকালীন গীত গাইতেছিল, অনেক যাত্রী সে পূজায় উপস্থিত হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, বহুদূর হইতে বহু দেশ হইতে, এই পুণ্যস্থানে সমবেত হইয়া অদ্য মন্দির দর্শন করিয়া যেন জীবন চরিতার্থ করিল।

আরতি শেষ হইল, যাত্রিগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল, কেবল দুইজন স্ত্রীলোক সেই মন্দির পার্শ্বে একটী বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছিল।

হেমতলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—দিদি, মুসলমানী বলিয়াছিল, আজ এই মন্দিরে একপ্রহর রাত্রির সময় নরেনের সঙ্গে দেখা হইবে, কৈ তাহা হইল না?

শৈবলিনী অতিশয় বুদ্ধিমতী, হেমের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, যদিও হেম হাসিতে হাসিতে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল, তথাপি হেমের হৃদয় অদ্য যথার্থই উদ্বেগে পরিপূর্ণ। সেই আশায় হেমের হৃদয় আজি সজোরে আঘাত করিতেছে, হেমের শরীর এক একবার অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে।

শৈবলিনী মনে মনে ভাবিল,—আজি না জানি কি কপালে আছে; হেম বালিকামাত্র, নরেন্দ্রকে দেখিলে আবার পূর্ব্ব কথা মনে পড়িবে, সে অসহ্য যাতনা বালিকা কি সহ্য করিতে পারিবে। প্রকাশ্যে বলিল,—সে পাগলিনীর কথায় কি বিশ্বাস করে? নরেন্দ্র কোথায়, কোন্ দেশে আছে, তাহার সহিত মথুরায় দেখা হইবার আশা করিতেছ?

হেমলতা। কিন্তু দিদি, জেলেখার অন্য কথাগুলি ত ঠিক হইয়াছিল।

শৈবলিনী। ঐ প্রকারে উহারা মিথ্যা আশা জন্মায়, দুটা সত্য কথা বলে একটা মিথ্যা কথা বলে। কৈ আমাদের দাসী আসিল না? আমি যে পথ ঠিক চিনি না, না হইলে আমরা দুই জনেই বাড়ী যাইতাম।

হেম। দেখ দিদি, আমার বোধ হইতেছে যেন এই আমাদের বীরনগর, যেন এই গঙ্গা। আর বাল্যকালে চন্দ্রালোকে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, তোমার সহিত খেলা করিতাম আর,—আর,—আর, সকলের সহিত খেলা করিতাম, সেই কথা মনে পড়িতেছে।

শৈবলিনীর মুখ আরও গম্ভীর হইল, দাসীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া শৈবলিনী যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইল। হেম তাহা লক্ষ্য না করিয়া আবার বলিতে লাগিল,—দেখ দিদি, ঐ নৌকাখানি কেমন তীরের মত আসিতেছে, উঃ! মাঝিরা কি জোরে দাঁড় বাহিতেছে, উঃ! যেন উড়িয়া আসিতেছে।

শৈবলিনী সেই দিকে দেখিল; তাহার ভয় দ্বিগুণ হইল। শৈবলিনী যাহা ভয় করিতেছিল তাহাই হইল,—নৌকা ঘাট হইতে চারি হস্ত দূরে থাকিতে থাকিতে একজন সৈনিক লম্ফ দিয়া ঘাটে পড়িল,—সৈনিক নরেন্দ্রনাথ!

হেম বৃক্ষের ছায়ায় ছিল, নরেন্দ্র তাহাকে না দেখিতে পাইয়া মন্দিরের ভিতর যাইলেন। কিন্তু হেম নরেন্দ্রকে দেখিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত হেমের মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, চক্ষু, কর্ণ, ললাট, স্কন্ধ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল! পরমুহূর্ত্তে সমস্ত মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল!

শৈবলিনী সভয়ে হেমকে ধরিল। হেম কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলে শৈবলিনী গম্ভীরস্বরে বলিল,—হেম, আমি তোমাকে ভগিনী অপেক্ষা ভালবাসি, আমি বলিতেছি, আজ নরেনের সহিত দেখা করিও না, বাড়ী চল। তুমি আমাকে ভগিনী অপেক্ষা ভালবাস, আমার এই কথাটী শুন, বাড়ী চল। তুমি বালিকা, আপনার মন জান না, নরেনের সহিত অদ্য তোমার কথোপকথন হইলে কি বিপদ ঘটিবে ভগবান জানেন।

হেমলতা মুখ নত করিয়া এই কথা শুনিল, অনেকক্ষণ ভূমির দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ অশ্রু স্বচ্ছ বালুকায় পড়িয়া অদৃশ্য হইল। আবার ধীরে ধীরে মুখখানি তুলিল, তখন উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন নাই। হেমের মুখখানি শান্ত, নির্ম্মল, স্থির; নয়নে কেবল একবিন্দু অশ্রুজল।

হেম শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া বলিল,—দিদি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিও না। দিনে দিনে, মাসে মাসে, তুমি আমাকে কত ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছ, আমি তাহা ভুলি নাই। দিদি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। আজি এইমাত্র দেবপূজা সাঙ্গ করিলাম, এই পুণ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া এই পুণ্য দেবমন্দিরে আমি অবিশ্বাসিনী হইব না। যিনি আমার প্রধান দেবতা, যে দেবতুল্য স্বামী আমাকে ভালবাসেন, আমার জীবনের যিনি সর্ব্বস্ব ধন, জীবন থাকিতে এ দাসী তাঁহার অবিশ্বাসিনী হইবে না। দিদি, আমাকে সন্দেহ করিও না, আমাকে মন্দ ভাবিও না, তুমি আমাকে মন্দ ভাবিলে এ সংসারে অভাগিনীকে কে ভালবাসিবে?

হেমলতার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িয়া সমস্ত মুখমণ্ডল সিক্ত হইতেছিল।

তখন শৈবলিনীর মন শান্ত হইল, শৈবলিনীরও চক্ষুতে জল আসিল। শৈবলিনী সস্নেহে হেমের চক্ষু মুছাইয়া বলিল,—হেম, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ধর্ম্মপরায়ণা, তুমি পতিব্রতা আমি যে মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম সে জন্য ক্ষমা কর।

হেম। দিদি, তুমি ক্ষমা চাহিও না, তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, তোমার ঋণ আমি ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। জন্মে জন্মে যেন তোমার ভগিনী হই, আর আমার কিছু প্রার্থনা নাই।

আবার দুইজনে দুইজনকে ধরিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, দুইজনেরই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। পরে শৈবলিনী বলিল,—রাত্রি হইয়াছে, যাও নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া আইস।

শৈবলিনী সেই বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে লাগিল, হেমলতা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল।

হেমলতার এক্ষণে উদ্বেগ নাই, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, ও নম্রভাবে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিল।

এতদিনের পর হৃদয়ের হেমকে পাইয়া নরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইল! নরেন কথা কহিতে পারিল না, কেবলমাত্র হেমের হাত ধরিয়া পিপাসিতের ন্যায় সেই অমৃতমাখা মুখখানি দেখিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হেম আর সহ্য করিতে পারিল না, মস্তক নত করিয়া রহিল, তাহার নয়ন ছল্ ছল্ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পর হেমলতা নরেন্দ্রের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বলিল,—"নরেন্দ্র!"

নরেন্দ্র দেখিলেন, হেমের মুখে আর উদ্বেগের চিহ্ন নাই, লজ্জার চিহ্ন নাই, মুখমণ্ডল নির্ম্মল ও পরিষ্কার, ধীরে ধীরে হেমলতা বলিল,—"নরেন্দ্র!"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : মাধবীকঙ্কণ, যমুনায় বিসর্জ্জন

So she strove against her weakness,
Though at times her spirit sank
Shaped her heart with woman's
meekness
To all duties of her rank.

—*Tennyson.*

দেবালয়ের সমস্ত দীপ তখন নির্ব্বাণ হইয়াছে ও সমস্ত লোক সুপ্ত অথবা চলিয়া গিয়াছে। স্তম্ভ ও প্রকোষ্ঠের উপর সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে ও সারি সারি স্তম্ভচ্ছায়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে। পার্শ্বে বিশাল যমুনানদী চন্দ্রকরে নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে, ও রহিয়া রহিয়া শীতল যমুনার বায়ু মন্দিরের ভিতর দিয়া গাইয়া যাইতেছে। সেই সুস্নিগ্ধ রজনীতে মন্দিরের একটী স্তম্ভচ্ছায়াতে নিস্তব্ধে নরেন্দ্র ও হেম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

হেম স্থিরভাবে বলিল,—নরেন্দ্র! অনেক দিন পর আমাদের দেখা হইয়াছে, আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না, আইস আমাদের মনের যা কথা তাহাই কহি। নরেন্দ্র! বাল্যকালে আমরা দুই জনে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, কত স্বপ্ন দেখিতাম। এক্ষণে তুমি সৈনিকের ব্রতে ব্রতী হইয়াছ, আমি পরের স্ত্রী। নরেন্দ্র, বাল্যকালের স্বপ্ন একেবারে বিস্মৃত হও।

হেমলতা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, আবার বলিল,—বিধাতা যদি অন্যরূপ ঘটাইতেন, তবে আমাদের জীবন অন্যরূপ হইত, বাল্যকালের স্বপ্ন সফল হইত। কিন্তু নরেন্দ্র, আমরা যেন ভ্রমেও বিধাতার নিন্দা না করি। যিনি তোমাকে পরাক্রম দিয়াছেন, যশ দিয়াছেন, তাঁহার নাম লও, অবশ্য তোমাকে সুখী করিবেন। যিনি আমাকে এই সংসারে স্থান দিয়াছেন, দেবতুল্য স্বামী দিয়াছেন, শৈবলিনীর ন্যায় ননদিনী দিয়াছেন, ধন ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, তিনি দয়ার সাগর, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।

হেমলতা গলায় বস্ত্র দিয়া করযোড়ে বিশ্বের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিল। তাহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, পবিত্র শান্তিরসে পরিপূর্ণ।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া হেমলতার মুখের দিকে চাহিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। হেমলতা আবার বলিতে লাগিল,—নরেন্দ্র, আমি শুনিয়াছি তুমি অনেক যুদ্ধ করিয়াছ, অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, সকল দেশেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছ। তুমি পুণ্যাত্মা, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন। কিন্তু যদি যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা কর, যদি বিপদ বা দারিদ্র্যে পতিত হও, আবার বীরনগরে যাইও, তুমি যাইলে সকলেই আহ্লাদিত হইবে। আমার স্বামীর হৃদয় আমি জানি, তিনি তোমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় ভালবাসেন, সর্ব্বদাই সস্নেহে তোমার কথা কহেন, তুমি যাইলে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন।

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া ছিল; হেমের কথাগুলি তাহার কর্ণে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাহার নয়ন দুটীও পরিপূর্ণ।

হেম আবার বলিতে লাগিল,—আর তুমি যাইলে, শৈবলিনীও কত আহ্লাদিত হইবেন। আর হেমলতা যত দিন জীবিত থাকিবে, কনিষ্ঠ ভগিনীর ন্যায় তোমার সেবা শুশ্রূষা করিবে। ভাই নরেন! আমি তোমাকে যখন দেখিব তখনই আহ্লাদিত হইব।

এই স্নেহবাক্য শুনিয়া নরেন্দ্রের চক্ষুতে আবার জল আসিল; আবার দুইজনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

শেষে হেম ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিল,—নরেন্দ্র, আর একটী কথা আছে, কিছু মনে করিও না, আমার দোষ গ্রহণ করিও না নরেন্দ্র, আমাদের বিদায়কালে প্রণয়চিহ্নস্বরূপ আমাকে একটী দ্রব্য দিয়াছিলে, সেটী এখন পরিধান করিতে আমি অধিকারিণী নহি! নরেন্দ্র! সেটী ফিরাইয়া লও।

হেমলতা আপন হস্তের বস্ত্র তুলিয়া লইল, নরেন্দ্র দেখিল, যে মাধবীকঙ্কণ নরেন দিয়াছিল তাহা এখনও রহিয়াছে। লতা শুষ্ক হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, হেমলতা সেই অসংখ্য খণ্ডকে একে একে সূতার দ্বারা গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল, অদ্য তাহাই পরিধান করিয়া আসিয়াছে।

উভয়ের পূর্ব্বকথা মনে আসিতে লাগিল, উভয়ের হৃদয় বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল, উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। নরেন্দ্র হেমলতার সেই সুন্দর বাহু ও সেই মাধবীকঙ্কণ দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাহার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, আর দেখিতে পাইল না। অবশেষে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবারি পড়িয়া হেমলতার হস্ত ও বাহু সিক্ত করিল। অবশেষে নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—হেম, তবে কি জন্মের মত আমাকে বিস্মৃত হইবে?

হেম বলিল,—জীবিত থাকিতে তোমাকে বিস্মৃত হইব না; চিরকাল সহোদরের ন্যায় তোমার কথা ভাবিব। কিন্তু এই কঙ্কণ অন্য প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ আমাকে দিয়াছিলে; নরেন্দ্র, আমি সে প্রণয়ের অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র, মনে ক্লেশবোধ করিও না, আমি এই কয় বৎসর এ কঙ্কণটী পূজা করিয়াছি, হৃদয়ে রাখিয়াছি, উহা ত্যাগ করিতে আমার যত কষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি জান না। কিন্তু উটী উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই, নরেন্দ্র, আমি অবিশ্বাসিনী পত্নী নহি।

নরেন্দ্র আর কোন কথা কহিল না। নিঃশব্দে হেমলতার হস্ত হইতে সেই কঙ্কণ খুলিয়া লইল।

তখন হেমলতা বলিল,—নরেন্দ্র! আমি চলিলাম, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, বাল্যকাল হইতেই তোমার ধর্ম্মে আস্থা আছে, সে ধর্ম্ম কখনও বিস্মৃত হইও না, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন। তিনি যাহাকে যাহা করিয়াছেন, যেন আমরা সেইরূপ থাকিতেই চেষ্টা করি। পুষ্পটী দুই এক দিন সুগন্ধ বিস্তার করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, পক্ষীটী আলোকে প্রফুল্ল হইয়া গান করে, তাহাদের সেই কার্য্য। নরেন্দ্র, তুমি বীরপুরুষ, শত্রুকে জয় কর, দেশের মঙ্গল কর, পদাশ্রিত ক্ষীণের প্রতি দয়া করিও। আর ভগবান আমাকে দেবতুল্য স্বামী দিয়াছেন, তিনি সহায় হউন, সেই স্বামীর সেবায় যেন কখনও ত্রুটি না করি, সেই স্বামীতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আমি যেন তাঁহারই চিরপতিব্রতা দাসী হইয়া থাকি। নরেন্দ্র! ভাই নরেন!

বাল্যকালে তুমি আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলে, এই পবিত্র দেবমন্দিরে আবার সেই শিক্ষা দাও। এস. ভাই আমরা প্রতিশ্রুত হই, ধর্ম্মপথ কখন ত্যাগ করিব না, আমি জন্মে মরণে চিরপতিব্রতা হইয়া থাকিব। কথা সাঙ্গ করিয়া হেমলতা দেবপ্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইল, নরেন্দ্রও নিঃশব্দে প্রণত হইল।

উঠিয়া আবার সযত্নে নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া হেমলতা বলিল,—ভাই নরেন! এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিদায় দাও, আমি চিরকাল তোমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিব, তুমিও তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে মনে রাখিও।

একবিন্দু জল নয়ন হইতে মোচন করিয়া হেমলতা ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যতক্ষণ দেখা যাইল নরেন্দ্র হেমের দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার পর? তাহার পর এ জগতের মধ্যে নিতান্ত দুর্ভাগ্য লোকও নরেন্দ্রের সে রজনীর শোক ও বিষাদ দেখিলে বিষণ্ণ হইত। অভাগার হৃদয় আজ শূন্য হইল, অভাগার প্রণয়-ইতিহাস আজ সমাপ্ত হইল।

মাধবীকঙ্কণটী হৃদয়ে ধারণ করিয়া নরেন্দ্র যমুনাতীরে বসিয়া ছিল। হেমলতার কথাগুলি তাহার মনে বারবার উদয় হইতে লাগিল,—"উটী উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই, নরেন্দ্র, আমি অবিশ্বাসিনী পত্নী নহি।" নরেন্দ্রের কি সে প্রণয় নিদর্শনটী রাখিবার অধিকার আছে? সমস্ত রজনী নরেন্দ্র সেটী হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিল, প্রাতঃকালে শূন্য হৃদয়ে সেটী বিসর্জ্জন দিল, যমুনার জলে ভাসিতে ভাসিতে শুষ্ক কঙ্কণটী অদৃশ্য হইয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : প্রয়াগের যুদ্ধ

SUDDENLY, as if arrested by fear or a
feeling of wonder,
Still she stood, with her colorless lips
apart, while a shudder
Ran through her frame * *
Sweet was the light of his eyes; but
it suddenly sank into darkness,
As when a lamp is blown out by a
gust of wind a casement.
—*Longfellow.*

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল. কেবল আখ্যায়িকার নায়ক নায়িকাদিগের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে বাকী আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে. শাসুজা বঙ্গদেশ হইতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছিলেন। শীতকালে প্রয়াগের নিকট সুজা ও আরংজীবের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়। দুই দিনের যুদ্ধের পর সুজা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যশোবন্তসিংহ এই যুদ্ধে আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন. কিন্তু সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহাযোদ্ধার অধিক ক্ষতি করিতে পারিলেন না. ক্ষোভে রাজস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সুজা প্রয়াগ হইতে পাটনা. পাটনা হইতে মুঙ্গের, মুঙ্গের হইতে রাজমহল এবং তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া তণ্ডায় পলায়ন করিলেন। আরংজীবের পুত্র মহম্মদ এবং সেনাপতি আমির-জুমলা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। তণ্ডায় রাজপুত্র মহম্মদ. সুজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুজার পক্ষাবলম্বন করিলেন. কিন্তু উভয়েই আমিরজুমলার নিকট পরাস্ত হইলেন। তৎপরে মহম্মদ পিতার কপটপত্রে বিশ্বাস করিয়া সস্ত্রীক সুজার পক্ষ ত্যাগ করিলেন. অভাগা সুজা আরাকানে পলায়ন করিলেন। তথাকার রাজার সহিত বিরোধ হওয়ায় সুজা সসৈন্যে হত হইলেন, তাঁহার কন্যাকে রাজা বিবাহ করিলেন। কথিত আছে, সুজার রূপবতী সহধর্ম্মিণী প্যারীবানু বিষাদে আত্মহত্যা করিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর বঙ্গদেশে শাসন করিয়াছিলেন, যিনি যুদ্ধে সাহস. শাসনে দয়া ও হিন্দুদিগের প্রতি বদান্যতার জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন, যাঁহার

রাজমহলের প্রাসাদ মর্ত্ত্যে ইন্দ্রপুরী ছিল ও দিবারাত্র আনন্দলহরীতে ভাসিত, তিনি মৃত্যুকালে মস্তক রাখিবার স্থান পাইলেন না, বিদেশে শত্রুহস্তে সবংশে বিনষ্ট হইলেন।

দারা শ্যামনগর অথবা ফতে আবাদের যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিন্ধুদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন, আরংজীবের সৈন্য তথা হইতে দারাকে দিল্লী লইয়া আইসে। নৃশংস সম্রাট জ্যেষ্ঠকে যথেষ্ট অপমান করিয়া পরে হত্যা করেন। কারারুদ্ধ মোরাদও অচিরাৎ রাজাজ্ঞায় হত হইলেন। ভ্রাতৃরক্তে স্নাত হইয়া আরংজীব ভারতবর্ষের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন!

যে দিন মথুরায় হেমের সহিত নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার পর নরেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলেন। হেমলতা বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্রের অনেক অনুসন্ধান করাইলেন, মহানুভব শ্রীশচন্দ্র দেশে দেশে সংবাদ পাঠাইলেন যে, নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে তাঁহার পৈত্রিক জমীদারীর অর্দ্ধ অংশ ছাড়িয়া দিবেন, কিন্তু সেই দিনের পর নরেন্দ্রকে আর কেহ কোথাও দেখিতে পাইল না।

হেমলতা বীরনগরে শ্রীশচন্দ্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন, মথুরা-মন্দিরে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন হেম তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। পতিসেবায় ধর্ম্মপরায়ণা হেমের অন্য চিন্তা তিরোহিত হইল, পতিভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম তিনি জানিতেন না। ক্রমে শ্রীশচন্দ্রের ঔরসে তাঁহার হেমন্তকুমারী ও সরযূবালা নামক দুইটী কন্যা ও প্রতাপ নামে একটী পুত্র জন্মিল। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ, নরেন্দ্র ও হেমলতা যেরূপ সায়ংকালে গঙ্গাতীরে খেলা করিত, বাষ্পোৎফুল্ললোচনে হেমলতা দেখিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সেইস্থানে সেইরূপ খেলা করিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আনন্দধ্বনিতে চারিদিকের কুঞ্জবন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সংসারের এই গতি, একদল যাইতেছে, অন্য দল আসিতেছে! শিশুদিগের ললাট পরিষ্কার, নয়ন উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল চিন্তাশূন্য, এখনও মানবজীবনের চিন্তায় স্বর্গীয় অবয়ব অঙ্কিত হয় নাই।

হেমলতার বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পর হেমলতা পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া একটী সন্ন্যাসীর আবাস দেখিতে গেলেন। বীরনগর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একটী প্রসিদ্ধ শিমূল বৃক্ষ ছিল। শিমূল বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে প্রায়ই তিন দিকে তিনটী দেওয়ালের মত পাট বাহির হয়, এই বৃক্ষের সেই পাটগুলি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, দেখিলে বোধ হয় যেন একটী উন্নত ঘর হইয়াছে। সেই অপরূপ ঘরে একজন সন্ন্যাসী কয়েক বৎসর অবধি বাস করিতেছিলেন। পল্লীগ্রামস্থ গৃহিণী ও বালিকাগণ সস্নেহে সেই সন্ন্যাসীকে প্রত্যহ দুগ্ধ ফলমূল আনিয়া দিত, তাহাতেই তিনি জীবনধারণ করিতেন। সমস্ত দিন তিনি প্রায় ধ্যানে রত থাকিতেন, সায়ংকালে সেই গ্রামের ভিতর গৃহে গৃহে যাইতেন, শোকবিদগ্ধকে সান্ত্বনা করা, পীড়িতকে শুশ্রূষা করা, দুর্ব্বলকে সাহায্য করা, মানবের কষ্ট নিবারণ করা, তাঁহার জীবনের কার্য্য। গভীর রজনী পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া আবার তিনি সেই তরুগৃহে ফিরিয়া আসিতেন, তথায় ঘাসের উপর কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, সকল কালেই তিনি সমভাবে নিদ্রা যাইতেন। সেই তরুগৃহ ও সেই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য অনেক দেশ হইতে অনেক লোক আসিত।

হেমলতা বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধীরে ধীরে পদব্রজে তরুর নিকট যাইয়া সন্ন্যাসীকে উপলক্ষ করিয়া একটী প্রণাম করিলেন। পরে আপন শিশু পুত্রটীকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া সেই সন্ন্যাসীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। সে দিক হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না, নিস্পন্দভাবে দেখিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীও হেমলতার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন। তিনি প্রীত নয়নে হেমলতাকে প্রণাম করিতে দেখিলেন, সতৃষ্ণ নয়নে হেমলতার কমনীয় কন্যা পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল যেন দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর হৃদয় একবার আলোড়িত হইল, বোধ হইল চক্ষু একবিন্দু জলে আপ্লুত হইল! অবশেষে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে হেমের নিকটে আসিয়া শিশুদিগের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে হেমলতার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার দেবতুল্য স্বামীতে যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে, জন্মে মরণে যেন চিরপতিব্রতা হইয়া থাক।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তাহার পর আর কেহ সে তরুতলে সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল না, সন্ন্যাসী সে গ্রাম হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন কেহ আর জানিতে পারিল না।

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ জীবন-উষা

দেও করতালি, জয় জয় বলি,
পুরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ।
ঐ যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ উষার সহ॥
—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুহম্মদ ঘোরী আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশ জয় করেন। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা এক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিল, বিন্ধ্যাচল ও নর্ম্মদারূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইয়া দাক্ষিণাত্য জয় করিবার কোন উদ্যম করে নাই। ১অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর যুবরাজ আলাউদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সেনার সহিত নর্ম্মদানদী পার হইলেন, এবং সহসা হিন্দুরাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল, এবং হিন্দুরাজা বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদেশ প্রদান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইলে তাঁহার সেনাপতি মালীক-কাফুর তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া নর্ম্মদাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যাতিব্যস্ত করেন। দেবগড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ টোগ্‌লক দিল্লীর সম্রাট হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস করেন, এবং দেবগড়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন। কিন্তু দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। হিন্দুগণ বিজয়নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া একটী বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল, এবং মুসলমানগণ দৌলতাবাদে একটী স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিল। কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটী প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল। প্রায় তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোনও চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু দিল্লীর উপদ্রব হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দুসাম্রাজ্য বিপদশূন্য ছিল না। হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমান রাজ্যকে স্থান দিয়াছিল। সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয় জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংসসাধন করিল। কালক্রমে দৌলতাবাদ রাজ্য বর্দ্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল ও একটীর স্থানে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটী মুসলমান রাজ্য হইয়া উঠিল। তখন মুসলমান রাজগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে তেলিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দুরাজ্যের লোপ সাধন করিলেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল; বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটী মুসলমান-রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল; কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৫৯০ খৃঃ অব্দে সম্রাট আকবর পুনরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্ত খন্দেশ ও আহম্মদনগর রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লী-সৈন্যের হস্তগত হয়। তাঁহার পৌত্র শাহজিহান ১৬৩৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র আহম্মদনগর রাজ্য অধিকার করেন, সুতরাং এই আখ্যায়িকা বিবৃতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটী পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল।

এই সমস্ত রাজবিপ্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদিগের জানা আবশ্যক। মুসলমানরাজ্যের অধীনে অর্থাৎ আহম্মদনগর,

বিজয়পুর ও গল্লখন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের দেশশাসন-কার্য্য অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখন কখন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। মহারাষ্ট্রদেশ পর্ব্বত-সঙ্কুল এবং পর্ব্বতচূড়ায় অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। মুসলমান সুলতানগণ সেই সকল পার্ব্বত্য-দুর্গও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে রাখিতে সংকুচিত হইতেন না, এবং মহারাষ্ট্রীয় কিল্লাদারগণ প্রায়ই জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন অনেক হিন্দু-মন্সবদার রাজদরবারে নিয়োজিত থাকিতেন, তাঁহারা শত কি দ্বিশত কি পঞ্চশত কি সহস্র কি তদধিক অশ্বারোহীর সেনাপতি, সুলতানের আদেশ মতে সেই সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধসময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন। তাঁহারাও সৈন্যের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য এক একটী জায়গীর ভোগ করিতেন।

বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে চন্দ্ররাও মোড়ে দ্বাদশ সহস্র পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন। তিনি সুলতানের আদেশে নীরা ও বার্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন; সুলতান পরিতুষ্ট হইয়া সেই দেশ চন্দ্ররাওকে অল্পমাত্র কর ধার্য্য করিয়া জায়গীর স্বরূপ দান করেন; এবং চন্দ্ররাওয়ের সন্তানসন্ততিগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা খেতাবে সেই প্রদেশ স্বচ্ছন্দে সুশাসন করেন। এইরূপ রাওনায়েক নিম্বালকরবংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে ফুল্তন দেশের দেশমুখ হইয়া সেই দেশ শাসন করেন। এইরূপে মল্লরী প্রদেশে, মুশ্বর প্রদেশে, কাপসী ও মুধোল দেশে, ঝট্ট প্রদেশে ও ওয়ারিপ্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বংশ অবস্থান করিতেন। তাঁহারা ঐ সকল প্রদেশে পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের কার্য্যসাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে আপনাদিগের মধ্যেও তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জ্ঞাতি-বিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই, সুতরাং পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশীয়দিগের মধ্যে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও সেগুলি কুলক্ষণ নহে, সেগুলি সুলক্ষণ। পরিচালনার দ্বারা আমাদের শরীর যেরূপ সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, কার্য্য, উপদ্রব ও বিপর্য্যয় দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয় জীবন-ঊষার প্রথম রক্তিমচ্ছটা শিবজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে যাদবরাও ও ভঁস্লা নামক দুইটী পরাক্রান্ত বংশ ছিল। সিন্ধুক্ষীরের যাদবরাওয়ের ন্যায় পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অনেকে বিবেচনা করেন দেবগড়ের প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ সমুদ্ভূত। ভঁসলাবংশ যাদবরাওয়ের ন্যায় উন্নত না হইলেও একটী প্রধান ক্ষমতাশালী বংশ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এই স্থানে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, যাদবরাওয়ের বংশ হইতে শিবজীর মাতা ও ভঁস্লাবংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রঘুনাথজী হাবিলদার

কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ তাঁহার দিব্য পঙ্কজ-নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর॥
দুইদিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥
—কাশীরাম দাস।

কঙ্কণ প্রদেশে বর্ষাকালে প্রকৃতি অতি ভীষণ রূপ ধারণ করে; ১৬৬৩ খৃঃ অব্দের বসন্তকালেই একদিন সায়ংকালে সেইরূপ ঘোর ঘটা দৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্য এখনও অস্ত যায়

নাই, অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘবিলম্বী অতি কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আবৃত ও চারিদিকে পর্ব্বতশ্রেণী ও অরণ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে, আকাশ বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই, যেন অচিরে প্রচণ্ড বাত্যা আসিবে জানিয়া সমস্ত জগৎ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ পর্ব্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি ঈষৎ দেখা যাইতেছে, দূরস্থ বিশাল পাদপাবৃত পর্ব্বতগুলি গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আর নীচে উপত্যকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বত-প্রবাহিণী জলপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্যগুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কোথাও অন্ধকারে লীন হইয়া কেবল শব্দমাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে।

সেই পর্ব্বতপথের উপর দিয়া এক মাত্র অশ্বারোহী বেগে অশ্বচালন করিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বের সমস্ত শরীর ফেনপূর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত। অশ্বারোহীর বেশ কর্দ্দমময়, দেখিলেই বোধ হয় তিনি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বর্শা, কোষে অসি, বামহস্তে বল্গা ও বাম বাহুতে ঢাল, পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ রাজস্থানদেশীয়। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ হইবে, অবয়ব উন্নত ও গৌরবর্ণ, কিন্তু পরিশ্রমে বা রৌদ্রোত্তাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ হইয়াছে। শরীর সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত. ললাট উন্নত, চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ. মুখমণ্ডল ঔদার্য্যব্যঞ্জক ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অশ্বকে অল্প বিশ্রাম দিবার জন্য লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন. বল্গা বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন. বর্শা বৃক্ষশাখায় হেলাইয়া রাখিলেন. ও হস্ত দ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া ক্ষণেক আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরাৎ তুমুল বাত্যা আসিবে তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইতেছে এবং অনন্ত পর্ব্বত ও পাদপশ্রেণী হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে। দুই একটী স্তিমিত মেঘগর্জ্জন শুনা যাইতেছে. এবং যুবকের শুষ্ক ওষ্ঠে দুই এক বিন্দু বৃষ্টিজলও পতিত হইল। এখন যাইবার সময় নহে. আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু যুবকের চিন্তা করিবার সময় ছিল না। তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব সহে না; তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন তিনি কোন আপত্তি শুনেন না; যুবকেরও আপত্তি করার অভ্যাস নাই। পুনরায় বর্শা হস্তে লইয়া লম্ফ দিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন. পরে পুনরায় বেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্ব্বত-প্রদেশের সুপ্ত প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা চমকিত হইল। মেঘের গর্জ্জনে সেই অনন্ত পর্ব্বত-প্রদেশ যেন শতবার শব্দিত হইল। অচিরাৎ কোটী-রাক্ষসবল বিদ্রূপ করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে পবন প্রবাহিত হইয়া যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতকেও সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। শত পর্ব্বতের অসংখ্য পাদপশ্রেণী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল. জলপ্রপাত ও পর্ব্বত-তরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল. ঘন ঘন বিদ্যুৎ-আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল. ও মধ্যে মধ্যে বজ্রশব্দে জগৎ কম্পিত ও স্তব্ধ হইতে লাগিল। ত্বরায় মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িয়া পর্ব্বত. অরণ্য ও উপত্যকা প্লাবিত করিল. জলপ্রপাত ও তরঙ্গিণী সমুদয়কে স্ফীতকায় ও উচ্ছলিত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ না হইয়া সাবধানে চলিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হইবে। বায়ুপীড়িত বৃক্ষশাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর উষ্ণীষ ছিন্ন হইল, তাঁহার ললাট হইতে দুই-এক বিন্দু রুধির পড়িতে লাগিল। তথাপি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য. সুতরাং যুবক মুহূর্ত্তমাত্রও চিন্তা না করিয়া যতদূর সাধ্য সতর্কভাবে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। দুই-তিন দণ্ড মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, অচিরাৎ বৃষ্টি থামিয়া গেল। অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের আলোকে সেই পর্ব্বতরাশি ও নবস্নাত বৃক্ষ সমূহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল।

যুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অশ্ব থামাইলেন ও সিক্ত কেশগুচ্ছ পুনরায় সুন্দর. প্রশস্ত ললাট হইতে অপসৃত করিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যতদূর দেখা যায়. দুই

তিন সহস্র হস্ত উন্নত পর্ব্বতশিখরগুলি শোভা পাইতেছে, ও সেই পর্ব্বতসমূহের পার্শ্বে, মস্তকে চারিদিকে, নবপল্লাত নিবিড় হরিদ্বর্ণ অনন্ত পাদপশ্রেণী সূর্য্যালোকে চিক্‌চিক্‌ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত দশগুণ স্ফীতকায় হইয়া বৰ্দ্ধিত গৌরবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে, ও সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে। পর্ব্বত ও শিখরের উপর সূর্য্যরশ্মি নানাবর্ণ ধারণ করিয়াছে, জলপ্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে, আকাশে প্রকাণ্ড ধনু নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূরে বায়ু তাড়িত হইয়া মেঘরাশি বৃষ্টিরূপে গলিত হইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহিলেন; পরে সূর্য্যের দিকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, অমনি ঝনঝনা শব্দে দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—অধিক সকালে পেঁছেন নাই: আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অদ্য রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।

যুবক। সেই একমুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই; ভবানীর প্রাসাদে প্রভুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাখিব, অদ্যই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।

দ্বাররক্ষক। কিল্লাদারও আপনার জন্য পতীক্ষা করিতেছেন।

যুবক তৎক্ষণাৎ কিল্লাদারের প্রাসাদে যাইলেন, ও সম্যক অভিবাদন করিয়া নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কিল্লাদার মাউলী জাতীয়, শিবজীর একজন বিশ্বস্ত যোদ্ধা, তিনি লিপিগুলির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশপূর্ব্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়তা করিতে পারেন, ও কোন্ বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপি পাঠে সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ করিয়া কিল্লাদার অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবকের বালকোচিত উদার মুখমণ্ডল ও আনয়নবিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ দেখিয়া কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন। লিপির দিকে দেখিলেন, আবার বালক বা যুবার দিকে মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ন নয়নদ্বয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন,—হাবিলদার! তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে রাজপুত?

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নামাইয়া প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। তুমি আকৃতি ও বয়সে বালকমাত্র। কিন্তু বিবেচনা করি কার্য্যকালে পরাঙ্মুখ নহ।

রঘুনাথজী। যত্ন ও চেষ্টা মাত্র মনুষ্যসাধ্য, বোধ হয় তাহাতে প্রভু আমার ত্রুটি দেখেন নাই। সিদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন।

কিল্লাদার। তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে?

রঘুনাথজী। প্রভুর নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

কিল্লাদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, কার্য্য-সাধনে তোমার যেরূপ যত্ন তোমার আকৃতিই তাহার পরিচয় দিতেছে। রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিক্ত, ও ললাটে ঈষৎ ক্ষত দেখা যাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনার সমস্ত অবস্থা, মহারাষ্ট্রীয়, মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী যতদূর পারিলেন উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন,—তবে কল্য প্রাতে আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিবে। আর প্রভু শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও যে, তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষম কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন সে হাবিলদার কার্য্যের অনুপযুক্ত নহে। প্রশংসাবাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে এইরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতিশয় গূঢ় রাজকীয় সংবাদ ও কতকগুলি গূঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতেছিলেন। সেগুলি লিপির দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি শত্রুহস্তে পড়িতে পারে।

রঘুনাথজীকে সেগুলি বাচনিক বলা যাইতে পারে কিনা, অর্থবলে বা কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্ত্তী হইয়া গূঢ় মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি না, কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন। রঘুনাথ নয়নপথের বহির্ভূত হইলে পর কিল্লাদার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—শিবজী এ বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত কার্য্যে যথার্থই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সরযূবালা

সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচল খসি আধবদন হাসি আধই নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আচর ভরি, তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা অতনু কাঁচল উপাম।
হরি হরি কহ মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতাপাঁতি অধর মিলায়ত মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে দুঃখ রহ, হেরি হেরি না পূরাল আশা॥
—বিদ্যাপতি।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদায় পাইয়া ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অল্পদিন পরই শিবজী ভবানীর একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ও অম্বরদেশীয় অতি উচ্চকুলোদ্ভব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত আপন কৃষ্ণকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটী যুদ্ধগীত মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন।

যখন মন্দিরের নিকটে আসিলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিমদিকের আকাশের স্তিমিত আলোকে শ্বেত মন্দির সুন্দর শোভা পাইতেছে, মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র উদ্যান প্রায় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। মন্দিরের পুরোহিত তখন বাটীতে নাই, সুতরাং রঘুনাথ উদ্যানে একটী প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সেই উদ্যানে একজন বালিকা ফুল তুলিতে আসিলেন। রঘুনাথ দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইলেন, কেননা বালিকা এ দেশের নহে, পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলেন বালিকা রাজপুত। বহুদিন পরে একজন স্বদেশীয়া রমণীকে দেখিয়া রঘুনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল রাজপুত বালিকার নিকটে যাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রঘুনাথ সে ইচ্ছা দমন করিলেন, বৃক্ষতলে সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্ষণেক সেই বালিকার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যত দেখিতে লাগিলেন, রঘুনাথের হৃদয় আরও সেই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

বালিকা অনুমান ত্রয়োদশ বর্ষীয়া। তাঁহার রেশম-বিনিন্দিত সুমার্জ্জিত অতিকৃষ্ণ কেশপাশ গণ্ডস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, এবং উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও ভ্রমর-বিনিন্দিত চক্ষুর্দ্বয় কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়াছে। ভ্রূযুগল যেন তুলি দ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ওষ্ঠদ্বয় সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, হস্ত ও বাহু সুগোল, এবং সুবর্ণের বলয় ও কঙ্কণ দ্বারা সুশোভিত। কন্যার ললাটে আকাশের রক্তিমচ্ছটা পতিত হইয়া সেই তপ্ত কাঞ্চন বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বল করিতেছে। কণ্ঠ ও ঈষদুন্নত বক্ষঃস্থলের উপর একটী কণ্ঠমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। রঘুনাথ অনিমেষলোচনে সেই সায়ংকালের স্তিমিত আলোকে সেই অপূর্ব্বদৃষ্টা রাজপুতকন্যার দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বে অননুভূত আনন্দ-স্রোতে সিক্ত হইতেছিল।

কন্যা ফুল তুলিয়া গৃহে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় রাজপুত যুবক তাঁহার দিকে অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন। ঈষৎ লজ্জায়

কন্যার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন, যুবক তখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে, কোষে খড়্গ, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা। যুবক অনিমেষলোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বহুদিন পরে একজন দেশীয় যোদ্ধাকে এই মহারাষ্ট্র দুর্গে দেখিয়া রাজপুতবালা প্রথমে বিস্মিত হইলেন, যুবকের আকৃতি ও উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি চকিত হইলেন, মুখমণ্ডল নত করিয়া ফুলের সাজি লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন রঘুনাথ যেন চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা পাঠককে পুরোহিতের পরিচয় দিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অম্বরদেশীয় উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম জনার্দ্দন দেব। তিনি অম্বরের প্রসিদ্ধ রাজা জয়সিংহের একজন সভাসদ্ ছিলেন, পরে শিবজীর বহু অনুরোধে, জয়সিংহের অনুমত্যনুসারে শিবজীর সর্ব্বপ্রথম বিজিত তোরণদুর্গে আগমন করেন। তাঁহার পুত্রকন্যা কেহই ছিল না, কিন্তু স্বদেশ ত্যাগের অচিরকাল পূর্ব্বেই তিনি এক ক্ষত্রিয়কন্যার লালনপালনের ভার লইয়াছিলেন। কন্যার পিতা জনার্দ্দনের আশৈশব পরমবন্ধু ছিলেন। কন্যার মাতাও জনার্দ্দনের স্ত্রীকে ভগিনী সম্বোধন করিতেন। কন্যার পিতামাতার কাল হওয়ায় নিঃসন্তান জনার্দ্দন ও তাঁহার গৃহিণী ঐ শিশু ক্ষত্রিয়বালার লালনপালনভার লইলেন, ও তোরণদুর্গে আসিয়া সেই শিশুকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন।

পরে জনার্দ্দনের স্ত্রীর কাল হইলে কন্যা সরযূ ভিন্ন বৃদ্ধের স্নেহের দ্রব্য আর কেহ রহিল না, সরযূবালাও জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ও ভালবাসিতেন। কালক্রমে সরযূবালা নিরুপমা লাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন, সুতরাং দুর্গের সকলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ জনার্দ্দনকে কণ্বমুনি ও তাঁহার পালিতা নিরুপমা লাবণ্যময়ী ক্ষত্রিয়বালাকে শকুন্তলা বলিয়া পরিহাস করিতেন। জনার্দ্দনও কন্যার সৌন্দর্য্য ও স্নেহে পরিতুষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্ব্বাসনের দুঃখ বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনার্দ্দন দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও এখনও বলিষ্ঠ, চক্ষুর্দ্বয় শান্তিরসপূর্ণ, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। জনার্দ্দনের বর্ণ গৌর, এবং স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। পূজকের পবিত্র মন ও সরল হৃদয় তাঁহার মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনার্দ্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সংক্ষেপে মিষ্টালাপ করিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দ্দন শিবজীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ যতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলিলেন, ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া পূজকের হস্তে কয়েকটী সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন,—প্রভুর প্রার্থনা যে তিনি এক্ষণে মোগলদিগের সহিত রণে নিযুক্ত হইয়াছেন, আপনি তাঁহার জয়ের জন্য ভবানীর নিকটে পূজা করিবেন। দেবীপ্রসাদ ভিন্ন মনুষ্যচেষ্টা বৃথা।

জনার্দ্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—সনাতন হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকালই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের প্রহরিস্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও, সে বিষয়ে ত্রুটি করিব না।

রঘুনাথ। দেবীপদে প্রভুর আর একটী আবেদন আছে। তিনি ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কথঞ্চিৎ পূর্ব্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন। ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।

জনার্দ্দন ক্ষণেক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—রজনীযোগে দেবীপদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্য প্রাতে উত্তর জানিতে পারিবে।

রঘুনাথ ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে জনার্দ্দন বলিলেন,—তোমাকে ইতিপূর্ব্বে এই দুর্গে দেখি নাই, অদ্য কি এই প্রথম এস্থলে আসিয়াছ?

রঘুনাথ। অদ্যই আসিয়াছি।

জনার্দ্দন। দুর্গে কাহারও সহিত পরিচয় আছে? থাকিবার স্থান আছে?

রঘুনাথ। পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্য প্রাতেই চলিয়া যাইব।

জনার্দ্দন। কি জন্য অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিবে?

রঘুনাথ। প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্লেশ হইবে না, আমাদিগকে সর্ব্বদাই এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়।

জনার্দ্দন। বৎস! যুদ্ধসময়ে ক্লেশ অনিবার্য্য, কিন্তু অদ্য ক্লেশ সহনের কোন আবশ্যকতা নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর, আমার পালিতকন্যা তোমার খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিবে। পরে রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া কল্য শিবজীর নিকটে দেবীর আজ্ঞা লইয়া যাইবে।

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা স্ফীত হইল, তাঁহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে আঘাত করিল। এ যাতনা না আনন্দের উদ্বেগ? জনার্দ্দনের পালিতকন্যা কে? তিনি কি সেই পুষ্পোদ্যানে দৃষ্টা লাবণ্যময়ী রাজপুতবালা?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কণ্ঠমালা

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

—ভারতচন্দ্র রায়।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরযূবালা পিতার আদেশে অতিথির খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিলেন। রঘুনাথ আসন গ্রহণ করিলেন, সরযূ পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাবধি আহূত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন একজন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার রীতি আছে।

রঘুনাথ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু রঘুনাথের হৃদয় আজি চাঞ্চল্য-পরিপূর্ণ ও অস্থির। সরযূ যত্ন করিয়া অনেক প্রকার আহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ অদ্য কি খাইলেন ঠিক জানেন না। জনার্দ্দন ঔৎসুক্য সহকারে রাজস্থানের কথা কহিতে লাগিলেন, রঘুনাথ সময়ে সময়ে উত্তর দেন, সময়ে সময়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েন।

আহার শেষ হইল। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত আধারে সরযূ মিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্রধারিণীর দিকে সোদ্বেগচিত্তে চাহিলেন, যেন তাঁহার হৃদয় সেই দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া সেই কন্যার দিকে ধাবমান হইল। চারি চক্ষুর মিলন হইল, সরযূর মুখমণ্ডল লজ্জায় ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, মুখ অবনত করিয়া সরযূ ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। রঘুনাথও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অধোবদন হইলেন।

হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য সরযূ জল আনিয়া দিলেন। রঘুনাথ বর্ব্বর নহেন, এবার তিনি মুখ অবনত করিয়া রহিলেন, কেবল সরযূর সুন্দর সুবর্ণ বলয়বিজড়িত সুগোল বাহুমাত্র দেখিতে পাইলেন। একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রঘুনাথের শয্যারচনা হইল। রঘুনাথ শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে সেই পুষ্পোদ্যানে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সেই গভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অল্পবয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ সুপ্ত হইয়াছে। দুর্গে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে, ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিস্তব্ধ দুর্গে ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে প্রতিহত হইতেছে। এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিদ্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

রঘুনাথ অদ্য কেন সেই উদ্যানে পদচারণ করিতেছেন তাহা রঘুনাথ জানেন না। এতদিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অদ্য যেন সহসা তাঁহার শান্ত, নীল, জীবনাকাশের উপর একটী নূতন আলোক উদিত হইল, তাঁহার সুপ্ত চিন্তা ও বেগবতী মনোবৃত্তি সহসা জাগরিত হইল। শত বার সেই রাজপুতবালার আনন্দময়ী মূর্ত্তি তাঁহার মনে আসিতে লাগিল, সেই আলেখ্যলিখিত ভ্রূযুগল, সেই পুষ্পবিনিন্দিত মধুময় ওষ্ঠ, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই সুগোল বাহুযুগল,

সেই আয়ত স্নেহপূর্ণ নয়ন, সেই চিত্তহারী অতুল লাবণ্য! রঘুনাথ! এ সুন্দরী কি তোমার হইবে? তুমি একজন সামান্য হাবিলদার মাত্র, জনার্দ্দন অতি উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত, তাঁহার পালিতা কন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়! কি জন্য এরূপ আশায় হৃদয় বৃথা ব্যথিত করিতেছ? রঘুনাথ! এ বৃথা তৃষ্ণায় কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ?

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ হয় না, অসাধ্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন,—

"ভগবন্, সহায় হও, অবশ্য কৃতকার্য্য হইব! যশ, মান, খ্যাতি মনুষ্যসাধ্য, কি জন্য আমার অসাধ্য হইবে? আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ? বাহু কি অন্য অপেক্ষা দুর্ব্বল? দেবগণ আমার সহায় হও, আমি যুদ্ধে পিতার নাম রক্ষা করিব, রাজপুতের উচিত সম্মান লাভ করিব। তাহার পর? যদি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে সরযূ! আমি তোমার অযোগ্য হইব না। তখন সরযূ! তোমাকে গল্পচ্ছলে অদ্যকার এই সকল কথা বলিব, তখন তোমার সুন্দর হস্তদ্বয় আমার এই কম্পিত হস্তদ্বয়ে স্থাপন করিব, তখন ঐ লাবণ্যময় দেহলতা এই উদ্বিগ্ন হৃদয়ে ধারণ করিব, তখন ঐ সুন্দর বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠদ্বয়"—রঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্মত্ত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে গৃহের দিকে ফিরিলেন। সহসা দেখিলেন একটী কণ্ঠমালা পড়িয়া রহিয়াছে,—দুইটী করিয়া মুক্তা, পরে একটী করিয়া পলা,—রঘুনাথ সে মালা চিনিলেন। সেই মালা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সরযূ কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় অসাবধানতা বশতঃ ঐ স্থানে ফেলিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ভগবন্! একি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দান করিলেন?

মালাটী হৃদয়ে ধারণ করিয়া রঘুনাথ নিদ্রা গেলেন, পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জনার্দ্দনদেবের নিকট ভবানীর আজ্ঞা জানিলেন,—ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়, স্বধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজয়।

দুর্গ ত্যাগের পূর্ব্বে রঘুনাথ একবার সরযূর সহিত দেখা করিলেন। সরযূ যখন পুনরায় উদ্যানে ফুল তুলিতে আসিয়াছেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথও তথায় যাইলেন। হৃদয়ের উদ্বেগ কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—ভদ্রে! কল্য নিশিযোগে এই কণ্ঠমালাটী এই স্থানে পাইয়াছি, সেইটী দিতে আসিয়াছি, অপরিচিতের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযূ ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, সেই কমনীয় উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত উন্নত ললাট, সেই উজ্জ্বল নয়নদ্বয়, সেই তরুণ যোদ্ধা! রমণীর গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—যদি অনুমতি করেন, তবে এই সুন্দর মালাটী উহার অভ্যস্ত স্থানে পরাইয়া দি। এই অনুগ্রহটী আমাকে প্রদান করুন, ভগবান আপনাকে সুখে রাখিবেন।

সরযূ সলজ্জনয়নে একবার রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, সে বিশাল আয়ত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় কম্পিত হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জায় আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। সম্মতির লক্ষণ পাইয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, কন্যার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিলেন না।।

ক্ষণেক পরে রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন,—তবে অতিথিকে বিদায় দিন।

সরযূ এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংযম করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন,—আপনার নিকট অনুগৃহীত রহিলাম, পুনরায় যদি দুর্গে আইসেন, ভরসা করি পুনরায় পিতার এই মন্দিরে অবস্থান করিবেন।

পিপাসার্ত্ত চাতকের পক্ষে প্রথম বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায়, পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে উষার প্রথম রক্তিমচ্ছটার ন্যায়, সরযূর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃত কথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত করিল! তিনি উত্তর করিলেন,—ভদ্রে, আমি পরের দাস, যুদ্ধ আমার ব্যবসা, পুনরায়

কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না, জানি না। কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন আপনার দেবনিন্দিত মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইব না।

সরযূ উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘুনাথ দেখিলেন সেই আয়ত নয়ন দুইটী ছল্ ছল্ করিতেছে, তাঁহার আপনার নয়নও শুষ্ক ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সায়েস্তাখাঁ

কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন?

—নবীনচন্দ্র সেন।

যদিও কয়েক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমতা, রাজ্য এবং দুর্গসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর সায়েস্তাখাঁ আমীর-উল-উমরা খেতাব প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। সায়েস্তাখাঁ সেই বৎসরই পুনা, চাকনদুর্গ ও অন্য কয়েক স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে সায়েস্তাখাঁ শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সংকল্প করেন। দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনামা যশোবন্তসিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খৃঃ) বহু সৈন্য লইয়া সায়েস্তাখাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল ও সায়েস্তাখাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। সায়েস্তাখাঁ শিবজীর চাতুরী বিশেষরূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে, অনুমতিপত্র বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শিবজী নিকটবর্ত্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসায়ে অধিক পরিপক্ক হয় নাই, দিল্লীর শিক্ষিত সেনার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে, সুতরাং শিবজী কৌশল ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্য বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষভাগে একদিন সায়ংকালে পরাক্রান্ত মোগল সেনাপতি সায়েস্তাখাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সভায় বসিয়াছেন। কিরূপে শিবজীকে পরাজয় করিবেন তাহারই পরামর্শ হইতেছিল। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহে এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে। জানালার ভিতর দিয়া সায়ংকালের শীতল বায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে।

আন্‌ওরী নামে সায়েস্তাখাঁর একজন চাটুকার বলিল,—আমিরের সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহাবাত্যার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে, অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করিবে।

চাঁদখাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কয়েক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল-বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আমি বোধ করি তাহাদের ঐ দুইটী ক্ষমতাই আছে।

সায়েস্তাখাঁ। কেন?

চাঁদখাঁ। গত বৎসর কতিপয় পার্ব্বতীয় মহারাষ্ট্রীয় যখন চাকন দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গ জয় করিয়াছে, তাহা জাহাঁপনার স্মরণ আছে। একটী দুর্গ হস্তগত করিতে অনেক মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদনগর ও আরাঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইয়া দেশ ছারখার করিয়া আসিয়াছে!

সায়েস্তাখাঁ। চাঁদখাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্ব্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন? পূর্ব্বে তাঁহার এরূপ ভয় ছিল না।

চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

আন্‌ওরী। জাহাঁপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুরবিশেষ, তাহারা যে পর্ব্বত-ইন্দুরের ন্যায় গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে, আমি অস্বীকার করি না।

চাঁদখাঁ। পর্ব্বত-ইন্দুর পুনার ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা!

সায়েস্তাখাঁ। এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নখায়ুধ বিড়াল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবে না।

সভাসদ্ সকলেই "কেরামৎ" "কেরামৎ" বলিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি সায়েস্তাখাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—এই প্রদেশ দুর্গপরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত দিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্য্যসিদ্ধ হইবে, কখনও সিদ্ধ হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই।

চাঁদখাঁ। জাহাঁপনা! দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল, উহারা সম্মুখ রণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই। কেননা দেশ পর্ব্বতময়, উহাদিগের সেনা এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্ দিক দিয়া অন্যস্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ্ পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

সায়েস্তাখাঁ। কেন? মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী সেনা নাই, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?

চাঁদখাঁ। যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাষ্ট্রীয় সেনা বিনাশ করিব তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ, অশ্বারোহী বর্ম্মাবৃত ও বহু-অস্ত্র-সমন্বিত, সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ দুর্দ্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে তাহাদিগের যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ যেন ছাগের ন্যায় তুঙ্গশৃঙ্গে লম্ফ দিয়া উঠে ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও সুরাখের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জাহাঁপনা, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন, সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন, এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবেন, দিল্লীশ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? দেখুন নিতাইজী অনায়াসে আমাদের নিকট দিয়া যাইয়া আহম্মদনগর ও আরাঙ্গাবাদ ছারখার করিয়া আসিল, রুস্তমজমান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কি করিল?

সায়েস্তাখাঁ সক্রোধে বলিলেন,—রুস্তমজমান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নিতাইজীকে পলাইতে দিয়াছে, আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদখাঁ, তুমিও সম্মুখ যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীশ্বরের সেনাগণের মধ্যে কি কেহই সাহসী নাই?

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আবার আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একবিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন, পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই, সেনাপতি যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেরূপ হুকুম হইবে, তামিল করিতে এ দাস পরাঙ্মুখ হইবে না।

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। সায়েস্তাখাঁ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আনিবার আজ্ঞা দিলেন। সভাস্থ সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

ক্ষণেক পর মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ন্যায়শাস্ত্রীর বয়স এখনও চত্বারিংশ বৎসর হয় নাই, অবয়ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় ঈষৎ খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীর বুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ

তিলক চন্দন, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর তুলার কুর্ত্তিতে আবৃত, সুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বদনমণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। সায়েস্তাখাঁ সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

সায়েস্তাখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সিংহগড়ের সংবাদ কি?

মহাদেওজী একটী সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন,—

সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটীবনে।
সরযূবিচ্ছেদশোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ॥

অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীবনে শত শত নদী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযূ নদীর বিচ্ছেদদুঃখ ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণও শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত. সে সন্তাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন?

সায়েস্তাখাঁ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও, প্রধান দুর্গ আমি হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এখনও আশা আছে।

ব্রাহ্মণ ঈষদ্ধাস্য করিয়া পুনরায় একটী সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন,

ন শক্তোহি স্বাভিলাষং জ্ঞাপয়িতুঞ্চাতকঃ।
জ্ঞাত্বা তু তং বারিধরস্তোষয়তি যাচকং॥

অর্থাৎ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ সেই অভিলাষ বুঝিয়া আপনার দয়াবশতঃই তাহা পূর্ণ করে। মহজ্জনের যাচককে দিবার এইরূপ রীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহল্লোক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া যাহা দান করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য।

সায়েস্তাখাঁ আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—পণ্ডিতজী, তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরিতুষ্ট হইলাম বলিতে পারি না, তোমাদিগের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাবপরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন?

মহাদেওজী বলিলেন,—

কেশরিণঃ প্রতাপেন ভয়বিদগ্ধচেতসঃ।
ত্রাহি দেব ত্রাহি রাজ ইতি ব্রুবন্তি ভূচরাঃ॥

অর্থাৎ দিল্লীশ্বরের সৈন্যের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল ত্রাহি ত্রাহি এই শব্দ করিতেছি।

সায়েস্তাখাঁ এবার আহ্লাদ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রালোচনায় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন কৈ?

ব্রাহ্মণ তখন গম্ভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সায়েস্তাখাঁ সেইটী দেখিলেন। পরে বলিলেন,—হাঁ, নিদর্শনপত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে বলুন।

মহাদেওজী। প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে যখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা।

সায়েস্তাখাঁ। ভাল।

মহাদেওজী। সুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন।

সায়েস্তাখাঁ। ভাল।

মহাদেওজী। এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক। জানিলে অবশ্য সেগুলি পালন করিতে যত্নবান হইবেন।

সায়েস্তাখাঁ। প্রথম দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন?

মহাদেওজী। তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই। মহাশয় যে যে

কথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেইগুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।

সায়েস্তাখাঁ। ভাল, প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার। দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কয়েকটি দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।

মহাদেওজী। সে কোন্ কোন্‌টি?

সায়েস্তাখাঁ। তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্র দ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়গীরস্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি অসম্মত তাহা যেন আমি দুই চারি দিনের মধ্যে জানিতে পারি।

মহাদেওজী। যেরূপ আদেশ করিলেন সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে, তখন যতদিন সন্ধিস্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?

সায়েস্তাখাঁ। কদাচ নহে। ধূর্ত্ত কপটাচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না, এমত ধূর্ত্ততা নাই যে তাহাদিগের অসাধ্য। যতদিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদিগের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার, আমাদিগের অনিষ্ট করিও।

"এবমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—দূত মহাশয়, কি দেখিতেছেন?

দূত উত্তর করিলেন,—এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি। এটীও তোমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয় একে একে সমস্ত দুর্গগুলিই তোমরা লইবে। হা ভগবান!

প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল,—সেজন্য আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্য্যে যাও।

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহু জনাকীর্ণ পুনানগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শুভকার্য্যের পুরোহিত

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণে।
—নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতিবাহন করিলেন, যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই একটী দোকানে দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন। প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটী গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে সুপ্ত।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন। আকাশ অন্ধকারময়, কেবল দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ। ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাহার বোধ হইল যেন পশ্চাতে তিনি পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু সে পদশব্দ আর শুনিতে পাইলেন না।

পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পরে পুনরায় বোধ হইল যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাহার অনুসরণ করিতেছে? শত্রু না মিত্র? শত্রু হইলে কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে? আবেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে নিঃশব্দে তূলা-নির্ম্মিত কুর্ত্তির আস্তিনের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটী পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন।

গভীর অন্ধকারের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, কৈ কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ।

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারে ফিরিয়া গেলেন। তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় বিস্তর লোক এখনও ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে দ্রুতবেগে অন্যান্য গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটীর, অট্টালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার দ্বারা সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছে। সহসা একটী চীৎকার শব্দ শ্রুত হইল, ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী, পাহারা দিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুক্কায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সঙ্কীর্ণ, মহাদেওজী পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে ধীরে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সেই স্থানে আসিল, মহাদেও যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই দিকে চাহিল। মহাদেওজীর হৃদয় দুরুদুরু করিতে লাগিল, তিনি শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না, ধীরে ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন।

পরে নিকটবর্ত্তী একটী দ্বারে আঘাত করিলেন, সায়েস্তাখাঁর একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনা বাহির হইয়া আসিল। দুইজনে অতি সঙ্গোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দুইজনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ। সমস্ত প্রস্তুত?

সেনা। প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণ। অনুমতি-পত্র পাইয়াছ?

সেনা। পাইয়াছি।

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ছুরিকাহস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন। অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না, ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে সেনাকে বলিলেন,—রিক্তহস্তে আসিয়াছ?

সেনা বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ভাল, সতর্ক থাকিও! বিবাহ কবে?

সেনা। কল্য।

ব্রাহ্মণ। অনুমতি পাইয়াছ?

সেনা। হ্যাঁ।

ব্রাহ্মণ। কতজন লোকের?

সেনা। বাদ্যকর দশ জন, ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন, ইহার অধিক অনুমতি পাইলাম না।

ব্রাহ্মণ। এই যথেষ্ট, কোন্ সময়ে?

সেনা। রজনী এক প্রহর।

ব্রাহ্মণ। ভাল, এই দিক হইতে বরযাত্রা আরম্ভ হইবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। বাদ্যকরেরা সজোরে বাদ্য করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। জ্ঞাতি কুটুম্ব যত পারিবে জড় করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ তখন অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন,—আমি সেই শুভকার্য্যের পুরোহিত! সে শুভকার্য্যের ঘটা সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে।

সহসা সজোরে নিক্ষিপ্ত একটী তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল। সে তীরে

প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুর্ত্তির নীচে লোহ-বর্ম্মে লাগিয়া তীর পড়িয়া গেল!

তৎপরেই একটী বর্শা। বর্শার আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, নিষ্কোষিত অসিহস্তে একজন দীর্ঘ মোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদখাঁ!

অদ্য সভাতে সেনাপতি সায়েস্তাখাঁ চাঁদখাঁকে ভীরু বলিয়াছেন। যুদ্ধব্যবসায়ে চাঁদখাঁর কেশ শুক্ল হইয়াছিল, এ অপবাদ কেহ তাঁহাকে কখনও দেয় নাই। মনে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, মনে মনে স্থির করিলেন, কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ ত্যাগ করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন। শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক দুর্গ, তাঁহার অপূর্ব্ব ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্যস্থাপনে অভিলাষ, হিন্দু-স্বাধীনতাস্থাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এসমস্ত চাঁদখাঁর অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধপ্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি যাচ্ঞা করিবেন এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শন-পত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুপ্ত অভিসন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদখাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হয় তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সন্দেহের কথা সায়েস্তাখাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ্য করিবেন? কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, এই ভণ্ড দূতকে ধরিব। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলিতে গলিতে, অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রাহ্মণ চাঁদখাঁর নয়ন-বহির্ভূত হইতে পারেন নাই।

সেনার সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয় তাহা শুনিলেন। তীক্ষ্মবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ করিয়া সেনাকে সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তি লাভের সংকল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—সায়েস্তাখাঁ! যুদ্ধব্যবসায়ে বৃথা এ কেশ শুক্ল করি নাই, আমি ভীরুও নহি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারীও নহি। অদ্য যে ষড়যন্ত্রটী ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব, তাহার পর বোধ হয় এ প্রাচীন দাসের কথা তুমি অবহেলা করিবে না। কিন্তু আশা মায়াবিনী!

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদখাঁ তীর ও বর্শা ব্যর্থ দেখিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খড়্গ দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। খড়্গ বর্ম্মে লাগিয়া সেবারও প্রতিহত হইল।

“কুক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে,”—এই বলিয়া মহাদেওজী আপন আস্তিন গুটাইয়া তীক্ষ্ম ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন। নিমেষমধ্যে বজ্রমুষ্টি চাঁদখাঁর বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল, চাঁদখাঁর মৃতদেহ ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ সুক্ষ্ম অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন,—সায়েস্তাখাঁ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে দ্বিতীয় ফল কল্য ফলিবে।

যোদ্ধার কর্ত্তব্য কার্য্যে যে সময়ে চাঁদখাঁ জীবনদান করিলেন, সেনাপতি সায়েস্তাখাঁ সে সময়ে বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, শিবজীকে বশীকরণবিষয়ে সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন!

মহারাষ্ট্রীয় সেনা এই সমস্ত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিল,—প্রভু কি করিলেন? কল্য এ বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদয় সংকল্প বৃথা হইবে।

ব্রাহ্মণ। কিছুমাত্র বৃথা হইবে না। আমি জানিয়াছি চাঁদখাঁ অদ্য সভায় অপমানিত হইয়াছেন, এখন কয়েকদিন সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে না। এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, আর স্মরণ রাখিও, কল্য রজনী এক প্রহরকালে।

সেনা। রজনী এক প্রহরকালে।

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ করিলেন। তিন চারি স্থানে প্রহরিগণ তাঁহাকে ধরিল তিনি সায়েস্তাখাঁর স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র দেখাইয়া নিরাপদে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : রাজা যশোবন্তসিংহ

> কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
> জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এসকলে দিলা
> জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
> পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
> নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা।
> —মধুসূদন দত্ত।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত রাজা যশোবন্তসিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন। হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া এই গভীর নিশীথেও তিনি কি চিন্তা করিতেছেন। সম্মুখে কেবল একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে, শিবিরে অন্য লোকমাত্র নাই। সংবাদ আসিল মহারাষ্ট্রীয় দূত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। যশোবন্ত তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁহারই জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবিরে আসিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কি চিন্তা করিতেছিলেন। মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুতের দিকে সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি করিতেছিলেন। পরে যশোবন্ত বলিলেন,—আমি আপনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি। তাহাতে যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে?

মহাদেও। প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে পাঠাইয়াছেন।

যশোবন্ত। কেবল পুনা ও চাকন দুর্গ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে মাত্র, এইজন্য খেদ?

মহাদেও। দুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহার অসংখ্য দুর্গ আছে।

যশোবন্ত। মোগল-যুদ্ধস্বরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন?

মহাদেও। বিপদে পড়িলে খেদ করা তাঁহার অভ্যাস নাই।

যশোবন্ত। তবে কি জন্য খেদ করিতেছেন?

মহাদেও। যিনি হিন্দুরাজ-তিলক, যিনি ক্ষত্রিয়কুলাবতংস, যিনি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাকে অদ্য ম্লেচ্ছের দাস দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

যশোবন্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল। মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—উদয়পুরের রাণার বংশে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাড়ওয়ারের রাজচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর ধৃত হইয়াছে, রাজস্থান যাঁহার সুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে যাঁহার বাহুবিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহাকে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে, যাঁহার জয়ের জন্য হিন্দুমাত্রেই, ব্রাহ্মণমাত্রেই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, অদ্য তাঁহাকে মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজন্! আমি সামান্য দূতমাত্র, আমি কি বলিতেছি জানি না, অপরাধ হইলে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসজ্জা কেন? এ সৈন্যসামন্ত কেন? এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি জন্য উড্ডীন হইতেছে? স্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য? হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য? ক্ষত্রিয়োচিত যশোলাভের জন্য? আপনি ক্ষত্রকুলর্ষভ! আপনি বিবেচনা করুন, আমি জানি না।

যশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন,—আপনি রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত-পুত্র, পিতাপুত্রে যুদ্ধ সম্ভবে না, স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করুন আমরা পালন করিব। রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব, রাজপুতের যশোগীত আমাদিগের রমণীগণ এখনও গাইয়া থাকে, রাজপুতদিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদিগের বালকগণ শিক্ষিত হয়। ক্ষত্রকুলতিলক! রাজপুত-শোণিতে আমাদিগের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা যেন বর্শা ও খড়্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ধারণ করিতে শিখি।

যশোবন্তসিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—দূতপ্রধান! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দিল্লীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব।

মহাদেও। এবং শত শত স্বধর্ম্মীকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে ক্ষত্রিয় শোণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে ম্লেচ্ছ সম্রাটের সম্পূর্ণ জয় হইবে!

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উদ্বেগ সম্বরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কর্কশভাবে বলিলেন,—কেবল দিল্লীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে, আমি তোমার প্রভুর সহিত কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিদ্রোহাচারী, চতুর শিবজী অদ্যকার অঙ্গীকার অনায়াসে কল্য ভঙ্গ করে।

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—মহারাজ! সাবধান, অলীক নিন্দা আপনাকে সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য দান করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিয়াছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? দেশে শত শত গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে, অনুসন্ধান করুন, শিবজী সত্য পালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, দেবদেবীর পূজা দিতে কবে পরাঙ্মুখ? তবে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ! জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা? বজ্রনখ যখন সর্পকে ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে। মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র জর্জ্জরিত-শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে। এটী বিদ্রোহাচরণ, না স্বভাবের রীতি? কুক্কুর যখন খরগোসকে ধরিবার চেষ্টা করে, খরগোস প্রাণরক্ষার জন্য কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্যদিকে যায়। এটী চাতুরী, না স্বভাবের রীতি? যাবতীয় জীব-জন্তুকে জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার যত্ন ও উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি তিনি সে উপায় শিখান নাই? আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি হরণ করিয়াছে, হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ বল, মান, দেশগৌরব ও ধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বধর্ম্ম ও জাতিগৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীয়? জীবন রক্ষার্থ পলায়নপটু মৃগের শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে অন্যদিকে লইয়া যাইতে যত্ন করে সে কি নিন্দনীয়? ক্ষত্রিয়রাজ! দিনে দিনে, মুসলমানদিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দুপ্রবর! আপনি হিন্দু-জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না।—মহাদেওজীর জ্বলন্ত নয়নদ্বয় অশ্রুজলে প্লাবিত হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। বলিলেন,—দূতপ্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি না, যদি অন্যায় বলিয়া থাকি মার্জ্জনা করিবেন। আমি কেবল এই মাত্র বলিতেছিলাম যে, রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহারা সাহস ও সম্মুখরণ ভিন্ন অন্য উপায় জানে না। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না?

মহাদেও। মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্ব্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ব্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইহার কোন্‌টী আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণশিক্ষা। আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনারা পুরাতন রীত্যনুসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্দ্ধর্ষ তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য রাজপুত সেনার সম্মুখে দিল্লীশ্বরের সেনা পলায়ন করে। আমাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? পূর্ব্ব-রীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, যাহারা আছে তাহারা কখনও রণ দেখে নাই। যখন দিল্লীশ্বর কাবুল, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থানভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ বৃহৎ ও অনিবার্য্য রণ-অশ্ব ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা সহস্র সহস্র

শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সেনা নাই, সেরূপ অশ্ব গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই। ত্বরিতগতি ও পর্ব্বতযুদ্ধ ভিন্ন তাহাদিগের আর কি উপায় আছে? ক্ষত্রিয়রাজ! জীবনপ্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন মহারাষ্ট্রীয় জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সংস্থান হইলে, দুই তিন শত বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে ললাট স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন তাঁহার বাক্যগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসাধনে সন্দেহ করিতেছেন কেন? হিন্দুধর্ম্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীরও ইহা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই। মুসলমান-শাসন ধ্বংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরবসাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষা করণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন, তবে স্বহস্তে এই কার্য্য সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদ্ঘাটিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণে বলবান, সহস্রগুণে দূরদর্শী, সহস্রগুণে উপযুক্ত, শিবজী সন্তুষ্টচিত্তে আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংসসাধন করিবেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবন্তের নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন,—মাড়ওয়ার ও মহারাষ্ট্র অনেক দূর, এক রাজার অধীনে থাকিতে পারে না।

মহাদেও। তবে আপনার উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকেই এই রাজ্য দিন, নচেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শিবজী ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে কার্য্য করিবে, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না।

যশোবন্ত। এই বিপদকালে আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এ দেশ রাখিতে পারিবে এমত আত্মীয় নাই।

মহাদেও। কোন ক্ষত্রিয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করুন। হিন্দুধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন!

যশোবন্ত। সেরূপ সেনাপতিও নাই।

মহাদেও। তবে যিনি এই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের গৌরবসাধন করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রিয়যোদ্ধাকে সহায়তা করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে এরূপ দেবতা নাই, যিনি এজন্য আপনাকে প্রশংসাবাদ না করিবেন।

যশোবন্ত। দ্বিজবর, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীশ্বর আমাকে স্নেহ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি ভদ্রোচিত?

মহাদেও। দিল্লীশ্বর যে হিন্দুগণকে কাফের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, সে কার্য্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবদেবীর অবমাননা করিতেছেন, সে কি ভদ্রোচিত? কাশীর পবিত্র মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহার প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভদ্রোচিত?

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন,—দ্বিজবর! আর বলিবেন না, যথেষ্ট হইয়াছে! অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র। অদ্যাবধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।

ব্রাহ্মণবেশধারী দূত তখন ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মণের উষ্ণীষের নীচে যোদ্ধার

শিরস্ত্রাণ দৃষ্ট হইল, তূলার কুর্ত্তির নীচে লৌহ-বর্ম্ম প্রকাশিত হইল! মহারাষ্ট্রীয় বীর ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজন্! ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম, সে দোষ গ্রহণ করিবেন না। এ দাস ব্রাহ্মণ নহে, মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয়;—নাম মহাদেওজী নহে, দাসের নাম শিবজী!

রাজা যশোবন্তসিংহ বিস্ময় ও হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সেই খ্যাতনামা মহারাষ্ট্র যোদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন, চকিত হইয়া সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, দাক্ষিণাত্যের বীরশ্রেষ্ঠ, শিবজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর গাত্রোত্থান করিয়া সানন্দে ও সজল নয়নে সেই পরম শত্রুকে আলিঙ্গন করিলেন। শিবজীও সম্মান ও প্রণয়ের সহিত খ্যাতনামা রাজপুত বীরকে আলিঙ্গন করিলেন।

সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইল, যুদ্ধের সমস্ত কথা ঠিক হইল, তৎপরে শিবজী বিদায় লইলেন। বিদায় লইবার সময়ে কহিলেন,—মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কল্য কোন ছলে পুনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।

যশোবন্ত। কেন, কল্য তুমি পুনা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?

মহারাষ্ট্রীয় বীর হাস্য করিয়া বলিলেন,—না, একটী বিবাহ কার্য্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।

যশোবন্ত। ভাল, দূরেই থাকিব। বিবাহকার্য্যের মন্ত্রাদি ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের এক্ষণে স্মরণ আছে কি?

শিবজী। আছে বৈকি! আমার শাস্ত্রবিদ্যা দেখিয়া দিল্লীর সেনাপতি সায়েস্তাখাঁ বিস্মিত হইয়াছেন। কল্য তিনি অন্যরূপ বিদ্যা দেখিবেন।

যশোবন্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময়ে বলিলেন,—তবে যুদ্ধবিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্য্য করিবেন।

শিবজী। সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব।

যশোবন্ত। হাঁ, বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেইরূপ কার্য্য করিতে আপনার প্রভুকে বলিবেন। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে যশোবন্তসিংহ শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : শিবজী

অসুর উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর?
অসুর-পদাঙ্করজঃ শোভিত মস্তকে?
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমরবীর্য্য সমরের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হবে নিঃশেষ।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড়ে প্রবেশ করিলেন। উষ্ণীষ ও তূলার কুর্ত্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ-শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ম্ম ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ন ছুরিকা, কোষে "ভবানী" নামক প্রসিদ্ধ খড়্গ। বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর ঈষৎ খর্ব্ব বটে, কিন্তু সুবদ্ধ, সুদৃঢ়-বন্ধনী ও পেশীগুলি বর্ম্মের নীচে হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পেশোয়া মুরেশ্বর ত্রিমূলে সানন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—ভবানীর জয় হউক! আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন।

শিবজী। আপনার আশীর্ব্বাদে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না পাইয়াছি?

মুরেশ্বর। সমস্ত স্থির হইয়াছে?

শিবজী। সমস্ত।

মুরেশ্বর। অদ্য রাত্রে বিবাহ?

শিবজী। অদ্যই।

মুরেশ্বর। সায়েস্তাখাঁ কিছু জানেন না? তীক্ষ্নবুদ্ধি চাঁদখাঁ কিছু জানেন না?

শিবজী। সায়েস্তাখাঁ ভীত শিবজীর নিকট হইতে সন্ধিপ্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন; যোদ্ধা চাঁদখাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না।

মুরেশ্বর। রাজা যশোবন্ত?

শিবজী। আপনি পত্রে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল। আমি যাইয়াই দেখিলাম, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল।

মুরেশ্বর। ভবানীর জয় হউক! আপনি এক রাত্রিতে একাকী যে কার্য্যসাধন করিলেন, তাহা সহস্রের অসাধ্য। যে অসমসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প হয়। প্রভো, এরূপ কার্য্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি থাকিবে?

শিবজী। মুরেশ্বর! বিপদ ভয় করিলে অদ্যাবধি জায়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদে ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকি ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন যেন মহারাষ্ট্র দেশ স্বাধীন হয়।

মুরেশ্বর। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার জয় অনিবার্য্য, স্বয়ং ভবানী সহায়তা করিবেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে, একাকী ছদ্মবেশে?

শিবজী। এ ত শিবজীর অভ্যস্ত কার্য্য! কিন্তু অদ্য সত্যই অন্য একটী মহাবিপদে পতিত হইয়াছিলাম।

মুরেশ্বর। কি?

শিবজী। এমন মূর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন? যে আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে শ্লোক স্মরণ রাখিবে?

মুরেশ্বর। কেন, কি হইয়াছিল?

শিবজী। আর কিছু নহে, সায়েস্তাখাঁর সভায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মুরেশ্বর। তাহার পর?

শিবজী। দুই একটী মনে ছিল। তদ্দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইল।

শিবজীর সহিত আমাদিগের এই প্রথম পরিচয়: এই স্থলে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এই পরিচ্ছেদের অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম শাহজী; পিতামহের নাম মল্লজী। আমরা প্রথম অধ্যায়ে ফুলতন দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর বংশের কথা বলিয়াছি, সেই বংশের যোগপাল রাওনায়কের ভগিনী দীপাবাইকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেক দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায় আহম্মদনগরনিবাসী শাহশরীফ নামক একজন মুসলমান পীরের নিকট মল্লজী অনেক অনুরোধ করেন, এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারই কিছু পরে দীপাবাইয়ের গর্ভে একটী সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।

সে সময়ে যাদবরাও নামক আহম্মদনগরে প্রসিদ্ধনামা একজন সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহীর নেতা, এবং প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে হুলীর দিনে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া যাদবরাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, যাদবরাওয়ের কন্যা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, সুতরাং বালকবালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যাদবরাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কেমন, তুই এই বালকটীকে বিবাহ করিবি?" পরে অন্যান্য লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দুইজনে কি সুন্দর যোড় মিলিয়াছে!" এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু

মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ, সাক্ষী থাকিও, যাদবরাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অদ্য প্রতিশ্রুত হইলেন।" সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যাদবরাও উচ্চবংশজ। শাহজীর সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে কখনই বাসনা করেন নাই, কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পরদিন যাদবরাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী যাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, সুতরাং মল্লজী আসিলেন না। যাদবরাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশমর্য্যাদায় অধিক অভিমানিনী। কথিত আছে যে, যাদবরাও রহস্য করিয়া আপন দুহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বিলক্ষণ দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। মল্লজী সরোষে একটী গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে, ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছেন,—মল্লজী! তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শম্ভুর ন্যায় গুণান্বিত হইবেন, মহারাষ্ট্রদেশে ন্যায়বিচার পুনঃস্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্রুদিগকে দূরীভূত করিবেন। তাঁহার সময় হইতে কাল গণনা হইবে ও তাঁহার সন্তানসন্ততি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।

সে যাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার শ্যালক যোগপালও তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হইলেন ও রাজা খেতাব প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণ ও চাকন দুর্গ এবং তৎপার্শ্বস্থ দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জায়গীরস্বরূপ পুনা ও সোপা নগর পাইলেন। তখন আর যাদবরাওয়ের কোন আপত্তি রহিল না। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে মহাসমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল, আহম্মদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবরশাহ আহম্মদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। আকবরশাহ কতক পরিমাণে জয়লাভ করিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীরও সেই উদ্যমে ব্যাপৃত রহিলেন। এই যুদ্ধকালে শাহজী সুষুপ্ত ছিলেন না। ১৬২০ খৃঃ অব্দে (জাহাঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অম্বরের অধীনে ছিলেন, ও একটী মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সম্রাট শাজিহান সেনাপতি শাহজীকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিয়া অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সম্রাটদিগের অদ্যকার অনুগ্রহ কাল থাকে না; তিন বৎসর পর সম্রাট শাহজীর কতকগুলি জায়গীর কাড়িয়া লইলেন। শাহজী বিরক্ত হইয়া বিজয়পুরের সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও মৃত্যু পর্য্যন্ত বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পতনোন্মুখ আহম্মদনগর রাজ্যের স্বাধীনতার জন্যও শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শত্রুহস্তে পতিত হইলে শাহজী সেই বংশের আর একজনকে সুলতান করিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কতকগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশ শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট শাজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার প্রভু বিজয়পুরের সুলতানকে দমন করিবার জন্য বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুলতান বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল; আহম্মদনগর রাজ্য বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭)। শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন, এবং সুলতানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন। সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পুনার নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণ কর্ণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাইয়ের গর্ভে শম্ভুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, জীজীর পিতা যাদবরাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ, এরূপ জনশ্রুতি আছে। একথা যদি যথার্থ হয়; তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভূত সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খৃঃ অব্দে শাহজী টুকাবাই নাম্নী আর একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অভিমানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পুত্র শিবজীকে লইয়া পুনার জায়গীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। শাহজী টুকাবাইকে লইয়া কর্ণাটেই থাকিতেন ও তাহার গর্ভে বেনকাজী নামে একটী পুত্র হইল।

শাহজীর দুইজন অতি বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী ছিলেন। তন্মধ্যে দাদাজী কানাইদেব পুনার জায়গীর এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খৃঃ অব্দে সুবর্ণীদুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পুনা হইতে অনুমান ২৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। শিবজীর তিন বৎসর বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ জন্মিল। জীজী সপুত্র পুনায় আসিয়া দাদাজী কানাইদেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন। শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে সেই গৃহে সায়েস্তাখাঁকে দেখিয়াছি।

মাতাপুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বাল্যকালাবধি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই, কিন্তু অল্প বয়সেই ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার, বর্শা নিক্ষেপ, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়্গ ও ছুরিকা চালন, এবং অশ্বারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় মাত্রেই অশ্বচালনায় তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন। এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায় শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না, যখন অবসর পাইতেন, দাদাজীর চরণোপান্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক হইত, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইত, সেই পূর্ব্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইত, ধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিত। এইরূপ কথা শুনিতে শিবজীর এরূপ আগ্রহ ছিল যে, অনেক বৎসর পর যখন দেশে খ্যাতি ও রাজ্য লাভ করিলেন, তখন পর্য্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে, বহু বিপদ ও বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে দাদাজীর যত্নে শিবজী অল্পকালমধ্যে স্বধর্ম্মানুরক্ত ও অতিশয় মুসলমানবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার হইবার জন্য নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন। আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন। তিনি পর্ব্বতপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। সেই পর্ব্বত কিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত। কখন কখন কয়েকদিন ক্রমাগত এই পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে যাপন করিতেন, কোনও দুর্গ, কোনও পথ, কোনও উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না। শেষে কিরূপে দুই একটী দুর্গ হস্তগত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধবাক্য দ্বারা বালককে সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া যাহাতে জায়গীর সুচারুরূপে রক্ষিত হয়, তাহাই শিখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলী জাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার যৌবনসুহৃদ্‌গণের মধ্যে যশজী-কঙ্ক, তন্নজী মালশ্রী ও বাজী-ফাসলকর নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইঁহাদের সহায়তায় ১৬৪৬

খৃঃ অব্দে তোরণদুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্ত্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণদুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে, এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎসর তোরণদুর্গের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটী তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম রাজগড় রাখিলেন।

বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন ও এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শাহজী এ সমস্ত বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ আচরণে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা, তাহা অনেক বুঝাইলেন। তাঁহার পিতা বিজয়পুরের অধীনে কার্য্য করিয়া কিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইলেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্টবাক্য দ্বারা উত্তর দান করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছুদিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভর্ৎসনা করিবেন এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি শিবজীকে সস্নেহে বলিলেন,—"বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর. দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, ব্রাহ্মণ. গোবৎসাদি এবং কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিতকারীদিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুসরণ কর।" এই বলিয়া বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। শিবজীর হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষ মাত্র।

সেই বৎসরেই চাকন ও কান্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন ও কান্দানার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া সিংহগড় নাম রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকাবাইয়ের ভ্রাতা বাজী. সোপা দুর্গের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনীতে আপন মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাঁহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরেই পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়. শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার সহায়তা করিবার ছলে আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন. কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতারক্ষারূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে ব্যক্ত করিলেন. যখন সেই উদ্দেশ্যসাধন-জন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন. তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহাদিগের নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবজীর কর্ম্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় করিলেন। তখন বিজয়পুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন ও আদেশ করিলেন যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই কারাগৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা একেবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারিবৎসর কাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দীস্বরূপ রহিলেন।

জোলীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও যখন তাহা একেবারে অস্বীকার করিলেন. তখন শিবজী নিজ লোক দ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সহসা রাত্রিযোগে আক্রমণ করতঃ সেই দুর্গ হস্তগত করেন। তিনি সমস্ত জোলীপ্রদেশ অধিকার করিলেন এবং ঐ বৎসরেই প্রতাপগড় নামক একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহার দুই বৎসর পর শিবজী

মুরেশ্বর ত্রিমুল পিঙ্গলীকে পেশোয়া করেন এবং সমস্ত কঙ্কণপ্রদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।

এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে আবুল ফাজেল নামক একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি গর্ব্বিতভাবে প্রকাশ করিলেন যে, শীঘ্রই অকিঞ্চিৎকর বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সুলতানের পায়তখতের নিকট উপস্থিত করিবেন।

এত সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে দূতের সহিত সাক্ষাৎ ও নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল, রজনী যাপনার্থে গোপীনাথের জন্য একটী স্থান নির্দ্দেশ করা হইল।

রজনীযোগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাকপটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি যাহা করিয়াছি সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্ম্মের জন্য করিয়াছি। স্বয়ং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দু দেব ও দেবালয়ের নিগ্রহকারীদিগকে দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্ম্মের শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন এবং আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করুন।

গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে স্বীকার করিলেন; পরামর্শ স্থির হইল যে, কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নিকটেই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজেলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত শিবিকারোহণে নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজী সেই দিন বহু যত্নে প্রাতে স্নান-পূজাদি সমাপন করিলেন। স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন; তুলার কুর্ত্তি ও উষ্ণীষের নীচে লৌহবর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন; অবশেষে শিবজী দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ও বাল্যসহচর তন্নজী মালশ্রীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজেলের নিকটে আসিলেন। সহসা আলিঙ্গনচ্ছলে তীক্ষ্ম ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভূতলশায়ী করিলেন! তৎক্ষণাৎ শিবজীর সেনা আবুল ফাজেলের সেনাকে পরাস্ত করিল এবং শিবজী অনেক দুর্গ হস্তগত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া আসিলেন।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে শাহজী মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন, শিবজী পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন, ও পিতা বসিতে আদেশ করিলেও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না। কয়েক দিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন, ও সন্ধিসংস্থাপন করিয়া দিলেন। শিবজী পিতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, শাহজীর জীবদ্দশায় বিজয়পুরের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করেন নাই। তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয়, সে সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধিস্থাপন হয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বৎসরেই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সেনা ছিল। শিবজীর বয়স তখন পঞ্চত্রিংশ বৎসর।

নবম পরিচ্ছেদ : শুভকার্য্য সম্পাদন

যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর,
জ্বলুক গগনব্যাপী অনন্ত বহ্নিতে।
জ্বলুক সে দেবতেজে স্বর্গ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্র-পরম্পরা দগ্ধ চির শোকানলে।
—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্যগণ নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে, এরূপ নিঃশব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকও দুর্গের ভিতর কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারে নাই।

দুর্গের একটী উন্নত স্থানে কয়েকজন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সেই দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর। পূর্ব্বদিকে সুন্দর নীরানদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্তকালের নব পুষ্পপত্র ও দূর্ব্বাদলে সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্য্যন্ত সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনানগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধৃগণ প্রায় সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অদ্য রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায়, অনন্ত পর্ব্বত অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। কিন্তু বোধ করি যোদ্ধৃগণ এই চমৎকার পর্ব্বতদৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না, অন্য চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে একেবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে, বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রাক্কালে মুহূর্ত্তের জন্য অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ হয়। অদ্য সায়েস্তাখাঁ ও মোগল-সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা অসমসাহসে মহারাষ্ট্র-সূর্য্য একেবারে চির অন্ধকারে অস্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা অগত্যা যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন না, তথাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ করিবেন, এরূপ ভীষণ কার্য্যে শিবজী কখনও লিপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। কেনই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশোয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধ-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্ম্মাণ করেন।. চারি বৎসরাবধি পেশোয়াপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজেলকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হওয়াবধি তিনিই পদাতিক সৈন্যের সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদকালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর কেহ ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতীয় একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলপন্ত স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন, এবং সম্প্রতি রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্তও অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি পবনগড় হস্তগত করেন, এবং শিবজীর কর্ম্মচারী মধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্য্যদক্ষ ছিলেন।

অশ্বারোহীর সরনোবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইজী সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে মোগুল-সৈন্যের সম্মুখ দিয়া যাইয়া আরঙ্গাবাদ ও আহম্মদনগর ছারখার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা সায়েস্তাখাঁর সভায় চাঁদখাঁর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্ত্তাজী গুজ্জর নামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে শিবজীর তিনজন প্রধান মাউলী বাল্য-সুহৃদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। তন্নজী মালশ্রী ও যশজী-কঙ্ক অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্দ্য, যৌবনের বিষম সাহস, ইহারা এখনও ভুলেন নাই। ইঁহারা শিবজীকে প্রাণসম ভালবাসিতেন, শতবার রজনীযোগে মাউলী-সৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত শত পর্ব্বতদুর্গে নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার ছায়া যেমন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধৃমণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান, এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক, ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ম্ম ও অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

শিবজী ধীরে ধীরে বলিলেন,—সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ বিদায় দিন।

মুরেশ্বর। তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন্! বিপদকালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি?

শিবজী। পেশোয়াজী! ক্ষমা করুন, আর অনুরোধ করিবেন না। আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই, কিন্তু অদ্য ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য্য সাধন করিব, নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আশীর্ব্বাদ করুন, জয়লাভ করিব; কিন্তু যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্য্যে নিধনপ্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিনজন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দুগৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।

পেশোয়া বুঝিলেন আর অনুরোধ করা বৃথা, সুতরাং আর কিছু বলিলেন না। তখন অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে শিবজী পেশোয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য; আশীর্ব্বাদ করুন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী! অন্নজী! আশীর্ব্বাদ করুন, আমি কার্য্যে প্রস্থান করি।

মুরেশ্বর, আবাজী ও অন্নজী সজলনয়নে মহারাষ্ট্র-বীরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপর শিবজী তাঁহার মাউলী সুহৃদদ্বয় তন্নজী ও যশোজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বাল্যসুহৃদ! বিদাও দেও।

তন্নজী। প্রভো! কি অপরাধে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গজয়ের সময়ে আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্ব্বকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পর্ব্বতগহ্বরে, তরঙ্গিণীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্য্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই। অনুমতি করুন অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, আমাদের এস্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই। আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে, রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল্যসুহৃদকে বঞ্চিত করিবেন না।

শিবজী দেখিলেন, তন্নজীর চক্ষে জল। মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই, শীঘ্র রণসজ্জা করিয়া লও।

তৎপরে শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দুঃখিনী জীজী একাকিনী একটী ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অদ্যকার বিপদে রক্ষাপ্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিবজী আসিয়া বলিলেন,—মাতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।

জীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন,—বৎস! আইস, একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি। কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে, কবে এ দুখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে?

শিবজী। মাতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে কবে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি? কোন্ যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি?

জীজী। বৎস! দীর্ঘজীবী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া মাতা সস্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন; এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল। এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। উদ্বেগকম্পিতস্বরে শিবজী বলিলেন,—স্নেহময়ী জননি! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি, আপনার আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিব।

বৃদ্ধা জীজী বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন,—বৎস! হিন্দুধর্ম্মের জয়সাধন কর, স্বয়ং দেবরাজ শম্ভু তোমার সাহায্য করিবেন। আমার পিতৃকুল দেবগড়ের অধিপতি ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন ছিলেন। বাছা, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমিও মহারাষ্ট্র দেশে রাজা হও, দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন হও।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিলেন, নিঃশব্দে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নামাইল; শিবজী তাহাকে চিনিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রঘুনাথজী হাবিলদার! এ সময়ে তোমার কি প্রার্থনা?

রঘুনাথ। প্রভু, যেদিন তোরণদুর্গ হইতে পত্রাদি আনিয়াছিলাম সেদিন প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

শিবজী। অদ্য এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?

রঘুনাথ। এই পুরস্কার চাই যে, ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে যাইতে দিন। যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত যাইতে আদেশ করুন।

শিবজী। রাজপুতবালক! কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সঙ্কটে আসিতেছ? অল্প বয়সে কেন প্রাণ হারাইতে উৎসুক হইয়াছ?

রঘুনাথ। রাজন্! আপনার সঙ্গে যাইলে প্রাণ হারাইব এরূপ আশঙ্কা করি না। যদি হারাই, আমার জন্য আক্ষেপ করিবে জগতে এরূপ কেহই নাই। আর যদি প্রভুকে কার্য্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি, তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।

রঘুনাথের সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনিন্দিত নয়নের উপর পড়িয়াছে, বালকের সরল উদার মুখমন্ডলে যোদ্ধার স্থিরপ্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এই কথা শুনিয়া ও উদার মুখমন্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন, ও সঙ্গে পুনার ভিতর যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া পরে লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটী দীপ জ্বালিলে বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনায় তাঁহার এই কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল। শিবজী, তন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটী বৃহৎ বাগানে পৌঁছিয়া তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গূঢ়তর অন্ধকার সেই আম্রকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতল বায়ু আসিয়া

সেই কাননের মধ্যে মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল। সন্ধ্যায় পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্ম্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলী নির্ব্বাণ হইল, নিস্তব্ধ নগরে কেবল প্রহরিগণ এক একবার উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শৃগালের স্বর বায়ুপথে আসিতে লাগিল।

ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল, শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল। সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার শিবজী চাহিয়া দেখিলেন। বহুলোকে দীপাবলী হইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে;—এই বরযাত্রা!

বরযাত্রা নিকটে আসিল। পুনার চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পথ লোকে সমাকীর্ণ, ও নানা বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চ রব হইতেছে। অনেক অশ্বারোহী, অধিকাংশ পদাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বাল্যসুহৃদ তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র। "হয়ত এই শেষ বিদায়"—এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্য অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রিগণ সায়েস্তাখাঁর বাটীর নিকট দিয়া যাইল, বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহুলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রিগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন, যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন খাঁসাহেবের গৃহের নিকট লুক্কায়িত রহিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। ক্রমে বরযাত্রার গোল থামিয়া গেল।

রজনী আরও গভীর হইল। সায়েস্তাখাঁর রন্ধনগৃহের উপর একটী গবাক্ষ ছিল, তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল। খাঁসাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, ঝর্ ঝর্ করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা পিপীলিকা-সারের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিতেছে! তখন চীৎকার-শব্দ করিয়া যাইয়া সায়েস্তাখাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধিপ্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খাঁসাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনা হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন!

পলায়নার্থে খাঁসাহেব এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন, বর্ম্মধারী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা! অন্য দ্বারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময়ে সভয়ে শুনিলেন, "হর হর মহাদেও" বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত ও আহত হইয়াছিল। তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টন করিল।

শীঘ্রই ভীষণরবে সেই প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। প্রাসাদের আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ চীৎকার করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, অন্ধকারে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে। কবাটের ঝন্ঝনা শব্দ, আক্রমণকারীদিগের মুহুর্মুহুঃ উল্লাসরব, এবং আক্রান্ত ও আহতদিগের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্শা-হস্তে লম্ফ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন, "হর হর মহাদেও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরিগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্শাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া সায়েস্তাখাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল। শিবজী দেখিলেন, সম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর বিক্রমশালী পুত্র শমশেরখাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য। শিবজী এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান

হইলেন, কোষে খড়্গ রাখিয়া বলিলেন,—যুবক, তোমার পিতার রক্তে এক্ষণও আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দাও।

শম্‌শেরখাঁ উত্তর করিলেন না। শম্‌শেরখাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলন্ত। শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বেই শম্‌শেরের উজ্জ্বল খড়্গ আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

শিবজী মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভবানীর নাম লইলেন, সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটী বর্শা আসিয়া খড়্গধারী শম্‌শেরকে ভূতলশায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন, রঘুনাথজী হাবিলদার!

শিবজী। হাবিলদার! এ কার্য্য আমার স্মরণ থাকিবে। কেবল এইমাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ষ দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া সায়েস্তাখাঁ পলাইলেন। কয়েকজন মাউলী সেই গবাক্ষমুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল, তাহা সায়েস্তাখাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটী অঙ্গুলী ছেদন করিল, কিন্তু সায়েস্তাখাঁ আর পশ্চাতে না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার পুত্র আবদুল ফতেখাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইল। তখন শিবজী দেখিলেন ঘর, বারান্দা, প্রাঙ্গণ, রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরিগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলাতকগণের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, মাউলীগণ মোগলদিগের ধ্বংসসাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অস্পষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্ত-প্রণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে, সকল যুদ্ধেই, তিনি জয়লাভ করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন, এবং শত্রুরও সেরূপ প্রাণনাশ যাহাতে না হয় সেজন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেন। শিবজী আদেশ করিলেন,—আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, ভীরু সায়েস্তাখাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইয়া সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন। প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মশাল জ্বলিল। পুনা হইতে সায়েস্তাখাঁ দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্র সেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পরদিন প্রাতে ক্রুদ্ধ মোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। কর্ত্তাজী গুর্জ্জর ও তাঁহার অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহিগণ বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গেল।

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সায়েস্তাখাঁ সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন, ও যশোবন্ত অর্থে বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে এইরূপ জানাইলেন। আরংজীব দুই জনকেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং নিজপুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য যশোবন্তকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া পরে রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন, ও নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। আমরা এখন এই নবভূপতির নিকট বিদায় লইব।

পাঠক! বহুদিবস হইল তোরণ দুর্গ হইতে আসিয়াছি; চল, এই অবসরে একবার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি।

দশম পরিচ্ছেদ : আশা

মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে,
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ।

—মধুসূদন দত্ত।

যেদিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই দিন প্রথম-প্রেমের আনন্দময়ী লহরীতে একটী বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল। উদ্যানে সন্ধ্যার সময় সরযূর দৃষ্টি সহসা সেই স্বদেশীয় যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকা সহসা চমকিত হইলেন। আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদনমণ্ডল, সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অবয়ব দেখিলেন, পরে ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর যাইলেন।

রজনীতে সরযূ সেই স্বদেশীয় তরুণ যোদ্ধাকে ভোজন করাইতে যাইলেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-বিনিন্দিত অবয়বের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন লজ্জাবৃতবদনা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে একটী নূতন ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহার দিকে সোদ্বেগে দৃষ্টি করিলেন কেন? রঘুনাথ কি স্বদেশীয় বালিকার প্রতি একটু স্নেহের সহিত নয়নক্ষেপ করিয়াছেন? তরুণ যোদ্ধার কি সরযূর প্রতি একটু মমতা জন্মিয়াছে?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয় একটু উদ্বিগ্ন হইল। পরে যখন রঘুনাথের আনন্দনীয় বাক্যগুলি শুনিলেন, রঘুনাথ যখন সরযূর গলায় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় আনন্দ ও উদ্বেগে প্লাবিত হইল। যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অশ্বারূঢ় হইয়া চলিয়া গেলেন, সরযূ গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিঃস্পন্দে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দিবালোকে পর্ব্বতমালা অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বতবৃক্ষ সমুদ্রের লহরীর মত বায়ুতে দুলিতেছে। উপরে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছ জল একটী নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। নীচে সুন্দর উপত্যকায় গ্রামের কুটীর দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সকল দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্ব্বতকন্যা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে ও মেঘবিবর্জ্জিত সূর্য্য এই সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোকহিল্লোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছে। কিন্তু সরযূ এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন এ সমস্ত দৃশ্যে ন্যস্ত ছিল না।

সরযূ অদ্য সমস্ত দিন একটু অন্যমনস্কা রহিলেন। সায়ংকালে পিতার ভোজনের সময় নিকটে বসিলেন, স্বহস্তে পিতার শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শয়নাগারে যাইলেন। নিস্তব্ধ রজনীতে সরযূ উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষপার্শ্বে যাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া চন্দ্রালোক দেখিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : চিন্তা

এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ,
ত্যজি রথ পদব্রজে এস মোর পাশে।

—মধুসূদন দত্ত।

জনার্দ্দন স্বভাবতঃই সরলস্বভাব লোক ছিলেন, সারাদিন শাস্ত্রানুশীলন বা দেবপূজায় রত থাকিতেন; প্রভাতে, সায়ংকালে কিল্লাদারের নিকট সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, কদাচ বাটীতে

থাকিতেন। পালিতকন্যাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, ভোজনের সময় কন্যাকে নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহার হইত না, রজনীতে কখনও কখনও শাস্ত্রের গল্প বলিতেন, সরযূ বসিয়া শুনিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই আপন কার্য্যে রত থাকিতেন, বালিকার মনে একদিন একটী নূতন ভাব উদয় হইল, বৃদ্ধ জনার্দ্দন কেমন করিয়া জানিবেন?

বালিকার হৃদয়ে একদিন সহসা যে ভাব উদয় হয়, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। একদিন সন্ধ্যাকালে সরযূর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা দুই চারি দিবসের মধ্যে অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তথাপি নারীর হৃদয়ে এরূপ ভাব একেবারে লীন হয় না, মধ্যে মধ্যে সেই তরুণ যোদ্ধার কথা সরযূর হৃদয়ে জাগরিত হইত। বিশেষ সরযূ জন্মাবধি একাকিনী, জনার্দ্দন ভিন্ন তিনি ভালবাসিবার লোক কাহাকেও কখনও দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না, সুতরাং বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চিন্তাশীল। প্রথম যৌবনে যে রূপ দেখিয়া একদিন সরযূর হৃদয় আলোড়িত হইল, সায়ংকালে, প্রভাতে ও গভীর রজনীতে সেই রূপটি সময়ে সময়ে সরযূর হৃদয়ে জাগরিত হইত।

কল্পনা মায়াবিনী! সরযূ যখন দিনান্তে একাকিনী গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন, অথবা নিশীথে চন্দ্রালোকে সেই পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেন, তখন কত রূপ কল্পনা তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইত! সেই তরুণ যোদ্ধা এতদিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিয়াছেন, শত্রু ধ্বংস করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীর নাম ক্রয় করিতেছেন, সরযূর কথা কি একবার তাঁহার মনে জাগরিত হয়? পুরুষের মন নানা কার্য্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, নানা আশায় অতিবাহিত হয়, আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, জীবন সর্ব্বদা উল্লাসপূর্ণ থাকে। রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্য্যে, নানা চিন্তায় পূর্ণ থাকে, তাহারা কি এক চিন্তা চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করে? তথাপি মায়াবিনী আশা সরযূকে কানে কানে বলিয়া দিত,—বোধ হয় কখন কখন সরযূর কথা সেই তরুণ যোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হয়।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণ যোদ্ধা কি এখনও এ তোরণ দুর্গের কথা ভাবেন? এ কালে এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির আছে? হায়! নদীর ঊর্ম্মি পার্শ্বস্থ পুষ্পটীকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে; তাহার পর ঊর্ম্মি কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটী শুকাইয়া যায়, কিন্তু জল আর ফেরে না! তথাপি মায়াবিনী আশা সরযূর কানে কানে বলিয়া দিত,—বোধ হয় একদিন সেই তরুণ গোদ্ধা তোরণ দুর্গে ফিরিয়া আসিবেন।

নিশীথে যখন সেই উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পর্ব্বতমালা চন্দ্রের সুধাকিরণে নিস্তব্ধে সুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র চন্দ্রের দিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত কল্পনা উদয় হইত, কে বলিবে? বোধ হইত যেন সেই পর্ব্বত-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতেছেন, অশ্ব শ্বেতবর্ণ, আরোহীর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট ও নয়ন ঈষৎ আবৃত করিয়াছে। যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিলেন, যেন তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ-খচিত শিরস্ত্রাণ, বলিষ্ঠ সুগোল বাহুতে সুবর্ণের বাজু, দক্ষিণহস্তে দীর্ঘ বর্শা। যেন যোদ্ধা আবার আহার করিতে বসিলেন, সরযূ তাঁহাকে ভোজন করাইতেছেন। অথবা রজনীতে সেই ছাদে সরযূ সেই যোদ্ধার নিকট সলজ্জ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, যোদ্ধাও যেন আনন্দের সহিত সরযূর নিকট যুদ্ধকথা বর্ণনা করিতেছেন।

কল্পনার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্র-হিল্লোলের ন্যায় একটীর পর একটী আইসে, তাহার পর আর একটী। সরযূ আবার ভাবিলেন, যেন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরযূকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার সহিত সরযূর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দীপ জ্বলিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে সরযূ জানেন না, ভাল দেখিতে পাইতেছেন না। যেন সরযূ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সেই দেব-প্রতিমূর্ত্তির নিকট বসিলেন। যেন যুবকের হস্তে আপন স্বেদাক্ত কম্পিত হস্তটী রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। আনন্দে বালিকা-হৃদয় স্ফীত হইল, সরযূ! সরযূ! পাগলিনী হইও না।

আবার কল্পনা আসিল। রঘুনাথ খ্যাতাপন্ন হন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযূকে বিবাহ করিয়াছেন। পর্ব্বতের নীচে ঐ যে সুন্দর উপত্যকা

দেখা যাইতেছে, যেখানে শান্তপ্রবাহিণী নদী চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, যেখানে হরিদ্বর্ণ সুন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রালোকে সুপ্ত রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুটীরের মধ্যে যেন একটী ক্ষুদ্র কুটীর সরযূর! যেন দিবাবসানে সরযূ স্বহস্তে রন্ধন কার্য্য সমাপন করিয়াছেন, যেন যত্নপূর্ব্বক জীবিতনাথের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটীরসম্মুখে সুন্দর দূর্ব্বার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। যেন দূর ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়াছেন, যেন সেই দিক হইতেই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটীরাভিমুখে আসিতেছেন। সরযূর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া সরযূকে একটী নূতন কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন। পুলকে বালিকার হৃদয় আবার স্ফীত হইল, সরযূ! সরযূ! পাগলিনী হইও না।

এইরূপে একমাস, দুইমাস, তিন মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল, কিন্তু সরযূর কল্পনালহরী শেষ হইল না। যে স্বদেশীয় তরুণ যোদ্ধাকে সরযূ এই বিদেশে একদিন সযত্নে খাওয়াইয়াছিলেন তাঁহার কমনীয় মুখখানি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে বালিকার মনে জাগরিত হইত! যে দীর্ঘকায় পুরুষ সযত্নে সরযূবালার গলায় প্রিয় কণ্ঠহার পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার অনিন্দনীয় রূপ ও দেবতুল্য আকৃতি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই সরযূর হৃদয়ে উদিত হইত! কল্পনা কি মায়াবিনী?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : পুনর্ম্মিলন

—চেতন পাইয়া
মেলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে!

—মধুসূদন দত্ত।

কল্পনা মায়াবিনী নহে, সরযূবালার চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে, বালিকার আশা বিশ্বাসঘাতিনী নহে।

একদিন সন্ধ্যার সময় সরযূ পুনরায় সেই পুষ্পোদ্যানে পুষ্প তুলিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে কি মনে করিয়া হৃদয়ের সেই কণ্ঠহারের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সরযূর রূপ পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ ও অনিন্দনীয়; সরযূর মুখমণ্ডলও পূর্ব্ববৎ কমনীয় ও শান্ত। তথাপি এক বৎসরে সে রূপের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, নব আশা ও নব উল্লাসে সে মুখমণ্ডল অধিকতর কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে। নূতন জ্যোতিঃতে সে চক্ষুর্দ্বয় আলোকিত হইয়াছে, নূতন উদ্বেগ ও নূতন লাবণ্যে সে শরীর টলমল করিতেছে, সরযূর হৃদয়, মন, দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সরযূ বালিকা নহেন, প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। রূপবতী, চিন্তাবতী, যৌবনসম্পন্না সরযূবালা পুষ্প তুলিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই কণ্ঠমালার দিকে দেখিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে দ্বারদেশে একজন তরুণ রাজপুত যোদ্ধা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। পুষ্প তুলিতে তুলিতে রাজপুতকুমারী সেই দিকে চাহিলেন,—সহসা শিহরিয়া উঠিলেন,—সে দিক হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না।

রাজপুত যোদ্ধাও সেই পুষ্পোদ্যানে সেই রাজপুতবালাকে পুনরায় দেখিতে পাইলেন। একদিন নিশীথে যাঁহার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন, একদিন প্রভাতে যাঁহার পবিত্র কণ্ঠে প্রিয় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিয়াছিলেন, যুদ্ধে ও সঙ্কটে, শিবিরে ও সৈন্যমধ্যে যাঁহার চিন্তা মধ্যে মধ্যে যোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে, নিশীথে, স্বপ্নযোগে যাঁহার কমনীয় লজ্জারঞ্জিত মুখখানি সর্ব্বদাই যোদ্ধার সম্মুখে উদয় হইয়াছে, অদ্য বহুদিন পর সেই অনিন্দনীয় রূপলাবণ্য, সেই লজ্জারঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া রঘুনাথ ক্ষণেক বাক্যশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

চন্দ্র! রঘুনাথ ও সরযূর উপর সুধাবর্ষণ কর, তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখ নাই। তরুণ বয়সে যখন মন প্রথম প্রণয়োল্লাসে উৎক্ষিপ্ত হয়, যখন নবজাত চন্দ্রকরের ন্যায় নবজাত প্রণয়ের আনন্দহিল্লোল মানস-জগতে গড়াইতে থাকে, যখন যৌবনের প্রথম প্রণয়ে সমস্ত জগৎ সিক্ত করে, আকাশ ও মেদিনী প্লাবিত করে, তখনই যেন এ জগতে চন্দ্রপুরী অবতীর্ণ হয়! ক্ষণেক পর সরযূবালা অবনতমুখী হইয়া

মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, ও পিতাকে রঘুনাথজীর আগমনের সংবাদ দিলেন। জনার্দ্দনদেবও বহু সম্মান সহকারে শিবজীর দূতকে আহ্বান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুরোহিতের সম্মুখে উপবেশন করিয়া সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। সায়েস্তাখাঁ পরাস্ত হইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, শিবজী রাজগড়ে যাইয়া রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, দেশশাসনের সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু দিল্লীর সম্রাট শিবজীকে জয় করিবার জন্য অম্বরাধিপতি মহাপরাক্রান্ত রাজা জয়সিংহকে প্রেরণ করিতেছেন, তাহা শুনিয়া মহারাষ্ট্ররাজ চিন্তিত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ সম্ভবতঃ রাজা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন, এবং সেই কার্য্য সম্পাদনার্থ অম্বরদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ জনার্দ্দনদেবকে স্মরণ করিয়াছেন। রাজার আজ্ঞায় রঘুনাথ পুরোহিতকে লইতে আসিয়াছেন, শিবিকাদি প্রস্তুত আছে। যদি পুরোহিত মহাশয়ের সুবিধা হয়, দুই চারি দিনের মধ্যেই রাজগড় গমন করিলে ভাল হয়, রাজা এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন।

ঘরের একপার্শ্বে সরযূবালা আহারের আয়োজন করিতেছিলেন, পাঠককে বলা বাহুল্য যে এ কথাগুলি সমস্ত সরযূর কানে উঠিল। পিতা রাজধানীতে যাইবেন? রাজাদেশে এই তরুণ যোদ্ধা আমাদিগকে লইতে আসিয়াছেন?—সরযূর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, হস্ত হইতে জলের পাত্র পড়িয়া গেল, লজ্জাবনতমুখী পুলকিতগাত্রী সরযূবালা ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তখন রঘুনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে জনার্দ্দনদেবের সহিত কি কথা কহিতে লাগিলেন। আপনার দেশের কথা কহিলেন, জাতিকুলের পরিচয় দিলেন, পিতামাতার পরিচয় দিলেন, জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। জনার্দ্দনও রঘুনাথের উন্নত কুলের পরিচয় পাইয়া এবং যুবকের বীর্য্য সৌন্দর্য্যগুণ ও বিনয় আলোচনা করিয়া তুষ্ট হইলেন, এবং রঘুনাথকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রঘুনাথের আহারের সময় হইয়াছে, সরযূ সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। বৃদ্ধ জনার্দ্দন গাত্রোত্থান করিয়া হৃষ্টচিত্তে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বৎস রঘুনাথ, এখন আহার করিতে বইস। আজ তোমার পরিচয় পাইয়া বড় তুষ্ট হইলাম, তোমার বংশ আমার অপরিচিত নহে, তোমার গুণও বংশোচিত। মা সরযূকে আমি কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তোমাকেও আজি পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আর যদি ভগবান করেন, এই যুদ্ধশেষে তোমার ন্যায় উপযুক্ত পাত্রে সরযূকে সমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া এই মানবলীলা সম্বরণ করিব। জগদীশ্বর তোমাকে ও মা সরযূকে সুখে রাখুন।

এই কথা শুনিয়া রঘুনাথের চক্ষুতে জল আসিল, ধীরে ধীরে পুরোহিতের চরণতলে প্রণত হইয়া কহিলেন,—পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ দরিদ্র সৈনিক আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে। রঘুনাথ দরিদ্র হাবিলদার মাত্র, এক্ষণে তাহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই। কিন্তু জগদীশ্বর সহায় হউন, পিতা আশীর্ব্বাদ করুন, রঘুনাথ এ অমূল্য রত্ন লাভ করিতে যত্নবান হইবে।

এ আনন্দময়ী কথা সরযূবালার কানে পঁহুছিল, বায়ু-তাড়িত পত্রের ন্যায় তাঁহার দেহলতা কম্পিত হইতেছিল।

সেদিন রঘুনাথ কিছুই আহার করিতে পারিলেন না, আরক্তমুখী সরযূও ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ রাজগড়যাত্রা

দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে।
—মধুসূদন দত্ত।

যাত্রার আয়োজন করিতে পাঁচ-সাত দিন বিলম্ব হইল। রঘুনাথ পুরোহিতের আলয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় সরযূকে উদ্যানে ফুল তুলিতে দেখিতেন, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সরযূর প্রিয় হস্ত হইতে আহার গ্রহণ করিতেন। এ পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে রঘুনাথ সাহস করিয়া সরযূর সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। সরযূকে দেখিলেই রঘুনাথের হৃদয় সজোরে আঘাত করিত, কুমারীও অবগুণ্ঠন টানিয়া সরিয়া যাইতেন।

তোরণ দুর্গ হইতে রাজগড় যাত্রাকালে সরযূর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে একজন অশ্বারোহী চলিত, পর্ব্বত-পথে বা জঙ্গলে, বৃক্ষশূন্য ময়দানে বা নদীতীরে, সে অশ্বারোহী মুহূর্ত্তের জন্যও শিবিকা হইতে দূরে যাইত না। নিশীথে যখন সরযূ সহচরীর সহিত সামান্য কোন মন্দিরে, দোকানে বা ভদ্রগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, রজনীতে সময়ে সময়ে একজন অনিদ্র যোদ্ধা বর্শা হস্তে তথায় পদচারণ করিত।

নারীমাত্রেই এ সকল বিষয় বুঝিতে পারে, এ সকল বিষয় দেখিতে পায়। পুরুষের যত্ন, পুরুষের আগ্রহ, পুরুষের হৃদয়ের আবেগ নারীর চক্ষুতে গোপন থাকে না। সরযূ শিবিকার ভিতর হইতে সেই অবিশ্রান্ত অশ্বারোহীকে দেখিতেন, নিশীথে সেই অনিদ্র যোদ্ধাকে দেখিতেন। সেই দেব-নিন্দিত আকৃতি দেখিতে দেখিতে সরযূর নয়ন ঝলসিত হইল, সেই দুর্দ্দমনীয় আগ্রহচিহ্ন দেখিয়া সরযূর হৃদয় আনন্দ, প্রেম ও উদ্বেগে প্লাবিত হইল।

সন্ধ্যার সময় যখন সরযূ সেই যোদ্ধাকে ভোজন করাইতে আসিতেন, মৌনাবলম্বী যোদ্ধার দর্শনে সরযূ অবনতমুখী হইতেন, ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে শিবিকায় আরোহণের সময় যখন সরযূ সেই যোদ্ধাকে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দেখিতেন, তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল হইতে সরযূ সহজে নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না।

কয়েক দিন এইরূপে ভ্রমণানন্তর সকলে রাজগড়ে উপস্থিত হইলেন। জনার্দ্দন সন্ধ্যার সময় দুর্গের নীচে একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্ররাজের নিকট সমাচার পাঠাইলেন, রাজার অনুমতি হইলে পরদিবস দুর্গে প্রবেশ করিবেন।

সেই দিন রজনীতে আহারাদি প্রস্তুত করিতে কিছু বিলম্ব হইল। জনার্দ্দন কিছু জলযোগ করিয়া শয়ন করিতে যাইলেন, রাত্রি এক প্রহরের সময় সরযূবালা রঘুনাথকে ভোজন করাইলেন।

ভোজনান্তে রঘুনাথ অন্যদিনের ন্যায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন না, ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর যেখানে সরযূ একাকী বসিয়াছিলেন, তথায় ধীরে ধীরে যাইয়া নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন। হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া স্থিরস্বরে কহিলেন,—দেবি, এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন।

রঘুনাথের উচ্চারিত এই কথাগুলি যেন তৃষিতের পক্ষে বারিধারার ন্যায় সরযূর কানে লাগিল। সরযূর হৃদয় নাচিয়া উঠিল, সরযূ আরক্ত মুখ নত করিয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইলেন।

রঘুনাথ পুনরায় বলিলেন,—দেবি, বিদায় দিন, কল্য আপনারা রাজপ্রাসাদে যাইবেন, এ দরিদ্র সৈনিক পুনরায় নিজ কার্য্যে যাইতে বাসনা করে।

এই কথা শুনিয়া সরযূ লজ্জা বিস্মৃত হইলেন, নয়নদ্বয়ে জল মুছিয়া নারীর মমতাপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—আপনি আমাদিগের জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, পিতার জন্য, আমার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য ভগবান আপনাকে যুদ্ধে জয়ী করুন, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আমরা সে যত্নের কি প্রতিদান করিতে পারি?

রঘুনাথ বিনীতস্বরে উত্তর দিলেন,—রাজাদেশে আপনাদিগকে রাজগড়ে নিরাপদে আনিতে পারিয়াছি এটী আমার পরম ভাগ্য, ইহাতে আমার কিছু গুণ নাই। তথাপি দরিদ্র সৈনিকের যত্নে যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে,—তবে,—এ দরিদ্র সৈনিককে বিস্মৃত হইবেন না।

কথাটী সরযূ বুঝিলেন, মুখখানি অবনত করিলেন। রঘুনাথ তখন সাহস পাইয়া, লজ্জা বিস্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—এ দরিদ্র সৈনিক যদি উচ্চ আশা করিয়া থাকে, আপনি অপরাধ লইবেন না। আপনার পিতা প্রসন্ন চক্ষুতে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, ভরসা করি আপনিও আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন না। যদি ভগবান আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, যদি জীবনের চেষ্টা ও আশা ফলবতী হয়, তবে একদিন মনের কথা বলিব, সে পর্য্যন্ত এ দরিদ্র সৈনিককে এক একবার স্মরণপথে স্থান দিবেন।

বিনীতভাবে বিদায় লইয়া রঘুনাথ চলিয়া গেলেন। সরযূ একদণ্ড কাল সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। দ্বিপ্রহর রজনীর সময় একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—সৈনিকশ্রেষ্ঠ! তুমি চিরকাল এ দাসীর স্মরণপথে জাগরিত থাকিবে, ভগবান সাক্ষী থাকিবেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ঃ রাজা জয়সিংহ

নরকুলোত্তম তুমি—
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে।
—মধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আরংজীব সায়েস্তাখাঁ ও যশোবন্তসিংহ উভয়কেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, ও নিজ পুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায় সম্রাট অবশেষে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলওয়ারখাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে চৈত্র মাসের শেষভাগে জয়সিংহ পুনায় উপস্থিত হইলেন। সায়েস্তাখাঁর ন্যায় নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া তিনি দিলওয়ারখাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং সিংহগড় বেস্টন করিয়া রাজগড় পর্য্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

শিবজী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না। সেইরূপ পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধহয় সম্রাট আরংজীবের আর কেহই ছিলেন না। তাৎকালিক ফরাসী ভ্রমণকারী বের্ণীয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের ন্যায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভগ্নোৎদ্যম হইলেন, ও বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধি-প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ প্রথমে এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থ ন্যায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন, ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুরতা করিতেছেন না, তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়োচিত সম্মান তিনি জানেন! শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—দ্বিজবর! আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম। রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে, দিল্লীর সম্রাট তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, সেজন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না।

ইহার কয়েক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল,—মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।

সভাসদ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে যাইলেন। বহু সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরাভ্যন্তরে আনিলেন ও রাজগদিতে আপনার দক্ষিণদিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক মিস্টালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন,—রাজন্! আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এই শিবির আপন গৃহের ন্যায় বিবেচনা করিবেন।

শিবজী। রাজন্! এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিমুখ? রঘুনাথপন্থ দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।

জয়সিংহ। হাঁ, রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে। রাজন্! আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা করিব, দিল্লীশ্বর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, রাজপুতের কথা অন্যথা হয় না।

এইরূপে ক্ষণেক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল, শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিল না। তখন শিবজী কপট আনন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে জল।

জয়সিংহ। রাজন্! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন, সে খেদ নিষ্প্রয়োজন। আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। অদ্যাই রজনীতে আমার অশ্বশালা হইতে অশ্ব বাছিয়া লউন, পুনরায় প্রস্থান করুন। আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে যাইবেন, আমার আদেশে কোনও রাজপুত আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কদাচ বিস্মৃত হইব না।

শিবজী। মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয়স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দুধর্ম্মের জন্য, যে হিন্দুগৌরবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহৎ উদ্যম, সে উন্নত উদ্দেশ্য শেষ হইল, সেই চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সেজন্যও এখন খেদ করিতেছি না।

জয়সিংহ। তবে কিজন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন?

শিবজী। বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব-গীত গাইতে ভালবাসিতাম, অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য, ধর্ম্ম থাকে তবে রাজপুত-শরীরে আছে। এ রাজপুত কি যবনের অধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজ জয়সিংহ কি যবন আরংজীবের সেনাপতি?

জয়সিংহ। ক্ষত্রিয়রাজ! সেটী প্রকৃত দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুতেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করে নাই। যতদিন সাধ্য দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, বিধির নির্ব্বন্ধে পরাধীন হইয়াছে। মেওয়ারের বীরপ্রবর প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ অসাধ্য-সাধনেও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ততিও দিল্লীর করপ্রদ, এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত আছেন।

শিবজী। আছি। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাঁহাদের সহিত আপনাদিগের এত দিনের বৈরভাব, তাঁহাদের কার্য্যে আপনি এরূপ যত্নশীল কি জন্য?

জয়সিংহ। যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যদান করিয়াছি। যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি তাহা করিব।

শিবজী। সকলের নিকট সকল সময় কি সত্য পালনীয়? যাহারা আমাদের দেশের শত্রু, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী, তাহাদের সহিত সত্য সম্বন্ধ কি?

জয়সিংহ। আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতের ইতিহাস পাঠ করুন, তাহারা বহুশত বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, কখনও সত্য লঙ্ঘন করে নাই। কখনও জয়লাভ করিয়াছে, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছে, কিন্তু জয়ে পরাজয়ে, সম্পদে বিপদে সর্ব্বদা সত্যপালন করিয়াছে। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সত্যপালনের গৌরব আছে। দেশে, বিদেশে, মিত্রমধ্যে, শত্রুমধ্যে, রাজপুতের নাম গৌরবান্বিত! ক্ষত্রিয়রাজ টোডরমল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন, কেহ কখনও ন্যস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকট যাহা সত্য করিয়াছিলেন তাহা পালন করিতে ত্রুটি করেন নাই। মহারাষ্ট্ররাজ! রাজপুতের কথাই সন্ধিপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের কথা লঙ্ঘন হয় নাই।

শিবজী। মহারাজ যশোবন্তসিংহ হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রধান প্রহরী, তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

জয়সিংহ। যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী, সন্দেহ নাই। তাঁহার মাড়ওয়ার দেশ মরুভূমিময়, তাঁহার মাড়ওয়ার সেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশোবন্ত সেই মরুভূমিতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেনার সাহায্যে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম। যদি জয়ী হইয়া আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, আমি তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্মান

শিবজী অশ্রুপূর্ণলোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—ধর্ম্মাত্মন! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন সার্থক হয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়-প্রবর! আর একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর একদিন পিতার চরণোপান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : দুর্গবিজয়

চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে।
—মধুসূদন দত্ত।

শীঘ্রই সন্ধি স্থাপন হইল। শিবজী মোগলদিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ জয় করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিলেন, বিলুপ্ত আহম্মদনগর রাজ্যের মধ্যে যে দ্বাত্রিংশৎ দুর্গ অধিকার বা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও বিংশটী ফিরাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট দ্বাদশটীমাত্র আরংজীবের অধীনে জায়গীর স্বরূপ রাখিলেন। যে প্রদেশ তিনি সম্রাটকে দিলেন তাহার বিনিময়ে বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ কতক প্রদেশ সম্রাট শিবজীকে দান করিলেন, ও শিবজীর অষ্টম-বর্ষীয় বালক শম্ভুজী পাঁচহাজারীর মন্সবদার পদ প্রাপ্ত হইলেন।

শিবজীর সহিত যুদ্ধসমাপ্তির পর রাজা জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই প্রদেশ দিল্লীশ্বরের অধীনে আনিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। শিবজীর পিতা বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন করেন নাই, কিন্তু শিবজীর বিপৎকালে বিজয়পুরের সুলতান সন্ধি বিস্মৃত হইয়া শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করিতে সংকুচিত হন নাই। সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের সুলতান আলী আদিলশাহের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউলী সৈন্য দ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সদ্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং পরস্পরের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মিল। উভয়ে সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন ও যুদ্ধে পরস্পরের সহায়তা করিতেন। বলা বাহুল্য যে, শিবজীর একজন তরুণ হাবিলদার সর্ব্বদাই জয়সিংহের একজন পুরোহিতের সদনে যাইতেন। নাম বলিবার কি আবশ্যক আছে?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দ্দন ক্রমে রঘুনাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগিলেন, সর্ব্বদাই গৃহে আহ্বান করিতেন। রঘুনাথও অবসর পাইলেই সেই সরলস্বভাব পুরোহিতের নিকট আসিতেন, তাঁহার নিকট রাজস্থানের সংবাদ পাইতেন, রাজা জয়সিংহের কথা শুনিতেন, স্বদেশের কথা শুনিতেন। কখন কখন বা রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বসিয়া যুদ্ধের কথা কহিতেন, পর্ব্বতদুর্গ আক্রমণের কথা, শত্রুশিবির আক্রমণের কথা, জঙ্গল বা গিরিচূড়ায় ভীষণ যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিতেন। এ সকল কথা বলিতে বলিতে যোদ্ধার নয়ন প্রজ্বলিত হইত, স্বর কম্পিত হইত, মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিত।

বৃদ্ধ জনার্দ্দন সভয়ে যুদ্ধবার্ত্তা শুনিতেন, পার্শ্বের ঘরে নীরবে বসিয়া সরযূবালা সেই জ্বলন্ত কথাগুলি শুনিতেন, নীরবে অশ্রুজল ত্যাগ করিতেন, নীরবে ভগবানের নিকট সেই তরুণ যোদ্ধাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। রজনী দ্বিপ্রহরের সময় কথা সাঙ্গ হইত, সরযূবালা আহার আনিয়া দিতেন, যতক্ষণ রঘুনাথ আহার করিতেন, সরযূ নীরবে সেই দেব-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন না। ভোজনান্তে যদি যোদ্ধা মৃদুস্বরে বিদায় চাহিতেন, বা অন্য দুই-একটী কথা কহিতেন, বেপথুমতী উদ্বিগ্না সরযূবালা তাহার উত্তর দিতে পারিতেন না। লজ্জায় তাঁহার গণ্ডস্থল আরক্তবর্ণ হইত, নয়ন দুইটী মুদিত হইত, অবগুণ্ঠন টানিয়া সরযূ সরিয়া যাইতেন, সহচরীকে দিয়া উত্তর পাঠাইয়া দিতেন।

কিন্তু উত্তরের আবশ্যক কি? সরযূর নয়নের ভাষা রঘুনাথ বুঝিতেন, রঘুনাথের নয়নের ভাষা সরযূ বুঝিতেন। উভয়ের জীবন, মন, প্রাণ, প্রথম প্রণয়ের অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত হইতেছিল, উভয়ের হৃদয় প্রথম প্রণয়ের উদ্বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।

অল্পদিন মধ্যে বিজয়পুরের অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটী অতিশয় দুর্গম পর্ব্বতদুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পুর্ব্বে কাহাকেও তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্যেরাও পুর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটেই তাহার শিবির ছিল, সায়ংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক প্রহর রজনীর সময় গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে, রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসমেত দুর্গাভিমুখে গমন করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটী উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর রুদ্রমণ্ডল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে যুদ্ধকালে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্য দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল জঙ্গল ও শিলারাশি পরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম স্থান দিয়া সেনাগণকে পর্ব্বত আরোহণ করিতে আদেশ দিলেন, তাঁহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন পর্ব্বত-বিড়ালের ন্যায় বৃক্ষ ধরিয়া শৈল হইতে শৈলান্তরে লম্ফ দিতে দিতে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও বৃক্ষের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও লম্ফ দিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্য এরূপ পর্ব্বত আরোহণে সমর্থ কিনা সন্দেহ।

অর্দ্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন, উপরে দুর্গ-প্রাচীরের উপর কতকগুলি মশালের আলোক জ্বলিল। চিন্তাকুল হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, শত্রুরা কি তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছে? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক জ্বলিল কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুকে প্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বালিয়াছে, যেন অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। শিবজী নিজ সৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে বৃক্ষ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় বৃক্ষ, যেখানে ঝোপ, যেখানে শৈলরাশি সেই সেই স্থান দিয়া বুকে হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল। শব্দ মাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর মহারাষ্ট্রীয়গণ একটী পরিষ্কার স্থানের নিকট আসিয়া পড়িল, উপর হইতে আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সেস্থান দিয়া সৈন্য যাইলে উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন, বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিলেন। সম্মুখে দেখিলেন প্রায় শত হস্ত পরিমাণ স্থানে বৃক্ষমাত্র নাই, পরে পুনরায় বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। এই শত হস্ত কিরূপে যাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, যাইবার কোন উপায় নাই, নীচে দেখিলেন, অনেক দূরে আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে যাইয়া অন্যপথ অবলম্বন করিলে দুর্গে আসিবার পুর্ব্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী ক্ষণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বাল্যকালের সুহৃদ্ বিশ্বাসী মাউলী যোদ্ধা তন্নজী-মালশ্রীকে ডাকাইলেন, দুইজনে সেই বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর তন্নজী চলিয়া যাইল, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিল। শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কি কহিল, শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন,—তাহাই হউক, অন্য উপায় নাই।

বৃষ্টির জল অবতরণে এক স্থান ধৌত ও ক্ষত হইয়া প্রণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পার্শ্ব উচ্চ, মধ্যস্থল গভীর, সেই প্রণালী দিয়া বুকে হাঁটিয়া যাইলে সম্ভবতঃ দুই পার্শ্বে উচ্চ পাড় থাকায় শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল। সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই প্রণালীর মধ্য দিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত শত শিলাখণ্ডের উপর দিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে সহস্র সেনা নিঃশব্দে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। অচিরাৎ উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহসা তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা পতিত হইল, শিবজী দেখিলেন তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে! আর একটী তীর, আর একটী, আরও বহুসংখ্যক তীর! শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্য প্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহারা দেখিতে পাইয়াছে, এবং সেইদিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীর নিক্ষেপ থামিয়া গেল, কিন্তু শিবজী বুঝিলেন শত্রুরা তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াছে। তিনি দুর্গদিকে চাহিয়া দেখিলেন, এখন অনেকগুলি আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরিগণ এদিক ওদিক যাইতেছে। তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবলমাত্র পঞ্চাশ হস্ত দূরে। বুঝিলেন সৈন্যগণ সতর্ক হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবার নহে!

শিবজীর চিরসহচর তন্নজী এ সমস্ত দেখিল; ধীরে ধীরে বলিল,—রাজন্! এখনও নামিয়া যাইবার সময় আছে, অদ্য দুর্গ হস্তগত না হয় কল্য হইবে, কিন্তু অদ্য চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা।

শিবজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—জয়সিংহের নিকট যাহা বলিয়াছি তাহা করিব, অদ্য রুদ্রমণ্ডল লইব অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব।

শিবজী নিস্তব্ধে সেই বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল, সেই দিক হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্যসকল সেই দিকে ধাবমান হইল, এদিকে প্রাচীরোপরি যে আলোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া যাইল। তখন শিবজী বলিলেন,—মহারাষ্ট্রীয়গণ! শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও। তন্নজী! বাল্যকালের সৌহৃদ্যের পরিচয় অদ্য প্রদান কর।

প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূরিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইল, অচিরে দুর্গপ্রাচীরের নিকট পৌঁছিল। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্ব্বত-বৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্ম্মরশব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীর হইতে শিবজী বিংশ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময় দেখিলেন প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী, বৃক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এইদিকে আসিয়াছে। একজন মাউলী নিঃশব্দে একটী তীর নিক্ষেপ করিল, হতভাগ্য প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত জন সৈনিক প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল। শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিলেন, আর লুক্কায়িত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, সৈন্যকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের "হর হর মহাদেও" যুদ্ধনাদ গগনে উত্থিত হইল, একদল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য দৌড়িয়া গেল, আর একদল বৃক্ষের ভিতর থাকিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীরারোহী মুসলমানদিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া "আল্লাহু আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহ পরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া আসিয়াই বৃক্ষমধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রাচীরের উপরিস্থ মুসলমানেরা বর্শাচালনে আক্রমণকারীদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীরসঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি মৃতদেহে প্রাচীরপার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, যোদ্ধৃগণ সেই মৃতদেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়াই খড়্গ বা বর্শাচালন করিতে লাগিল। শত শত মুসলমান বৃক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রবলপ্রতাপ আফগানেরাও যুদ্ধে অপটু নহে, রক্তস্রোত সেই পর্ব্বত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। বৃক্ষের অন্তরালে, ঝোপের ভিতর, শিলারাশির

পার্শ্বে শত শত মহারাষ্ট্রীয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর সঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া সেই অবারিত তীরশ্রেণী মুসলমান-সংখ্যা ক্ষীণতর করিতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে "শিবজীকি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ উত্থিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া, রক্তাপ্লুত বর্শার উপর ভর দিয়া, একজন রাজপুত যোদ্ধা এক লম্ফে রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন। তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী প্রহরীকে খড়্গচালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে "শিবজীকি জয়" শব্দ করিয়াছিলেন। সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবিলদার!

হিন্দু ও মুসলমান এক মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে চক্‌মক্‌ করিতেছে, হস্ত ও বাহুদ্বয় রক্তে আপ্লুত, বিশাল বক্ষের উপর দুই-একটী তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘহস্তে রক্তাপ্লুত দীর্ঘ বর্শা, উজ্জ্বল নয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে আবৃত। পোতের সম্মুখে উর্ম্মিরাশির ন্যায় শত্রুরা এই যোদ্ধার দুই পার্শ্বে মুহূর্ত্তের জন্য সচকিত হইয়া সরিয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ বর্শা হস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ক্ষণকালমাত্র সকলে নিস্তব্ধ রহিল, পরে আফগানগণ শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে দেখিয়া চারিদিক হইতে বেগে আসিতে লাগিল, রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল কৃষ্ণমেঘের ন্যায় আসিয়া বেষ্টন করিল। রঘুনাথ খড়্গ ও বর্শা চালনে অদ্বিতীয়, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের জীবন সংশয়।

তখন মাউলীগণ রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল, ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল! দশ, পঞ্চাশ, দুই, তিন শত জন সেই প্রাচীরের উপর বা উভয় পার্শ্বে আসিয়া জড় হইল, ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে দুর্গ পরিপূরিত করিল! সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত দুই-তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, তাহারা মহারাষ্ট্রীয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না।

তখন শিবজী ও তন্নজী প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইতেছেন; সৈন্যগণ বুঝিল, আর এ স্থানে যুদ্ধের আবশ্যক নাই, সকলেই প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের ভিতর দিকে ধাবমান হইল।

শিবজী বিদ্যুদ্‌গতিতে কিল্লাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সে প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও সুরক্ষিত। শিবজীর আদেশ অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই প্রাসাদ বেষ্টন করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত করিল। শিবজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন,—দ্বার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব! নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন,—অগ্নিতে দাহ হইব, কিন্তু কাফেরের সম্মুখে দ্বার খুলিব না!

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়গণ মশাল আনিয়া দ্বারে জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গিগণ তীর নিক্ষেপ দ্বারা প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন। অনেক মহারাষ্ট্রীয় মশাল হস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জ্বলিল।

প্রথমে দ্বার, গবাক্ষ, পরে কড়িকাষ্ঠ, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণনাদে আকাশের দিকে উত্থিত হইল, ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বত ও উপত্যকা হইতে সেই আলোক দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল শিবজীর দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে।

বীরের যাহা সাধ্য পাঠান কিল্লাদার রহমৎখাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে বীরের ন্যায় মরিতে বাকী ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, রহমৎখাঁ ও সঙ্গিগণ লম্ফ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। এক এক জন এক এক মহাবীরের ন্যায় খড়্গচালনা করিতে লাগিলেন, সেই খড়্গচালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেষ্টন করিল, তাহারা শত্রুর মধ্যে একে একে হত হইতে

লাগিল। একজন, দুইজন, দশ জন, হত হইল। রহমৎখাঁ আহত ও ক্ষীণ, কিন্তু তখনও সিংহবীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছেন, খড়্গ চারিদিকে উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এইরূপ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর আদেশ শ্রুত হইল,—কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণ সংহার করিও না। ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে শিবজীর সেনাগণ খড়্গ কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে, এমন সময় শিবজী দেখিলেন, দুর্গের অপর দিকে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় প্রায় পাঁচশত আফগানসৈন্য সজ্জিত হইয়া পর্ব্বতে উঠিতেছে। শিবজী দুর্গ-প্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেই দিকে গোল করাতে দুর্গের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল। চতুর মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্ষণেক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্ব্বতের সেই একশত মহারাষ্ট্রীয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্ব্বত, ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া পুনরায় দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। শিবজী অল্পসংখ্যক সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন, পাঁচশত যোদ্ধা দ্রুতবেগে সেই পর্ব্বত-দুর্গ আরোহণ করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল।

সুতীক্ষ্ন নয়নে দেখিলেন, দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। প্রাসাদের দ্বার ও গবাক্ষ জ্বলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তর স্তূপাকার হইয়াছে। তীক্ষ্ননয়ন শিবজী মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিলেন, অধিক সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর হইতে পারে না।

মুহূর্ত্তমধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন। তন্নজী ও দুইশত সেনাকে সেই প্রাসাদে সন্নিবেশিত করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তীরন্দাজ রাখিলেন, দ্বার ও গবাক্ষের পার্শ্বে তীরন্দাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্শাধারী যোদ্ধৃগণকে সন্নিবেশিত করিলেন। কোথাও প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। তখন হাস্য করিয়া তন্নজীকে কহিলেন,—তন্নজী, শত্রুরা যদি এই প্রাসাদ আক্রমণ করে, তুমি ইহা রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আসিতে দিবার পূর্ব্বেই বোধহয় পরাস্ত করা যাইতে পারে, তাহারা এখনও পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে, এই সময়ে আক্রমণ করা উচিত। তন্নজী, দুইশত সৈন্য সহিত এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি একবার উদ্যোগ করিয়া দেখি।

তন্নজী। তন্নজী এস্থানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহারাষ্ট্রীয়ও এস্থানে অবস্থিতি করিবে না! ক্ষত্রিয়রাজ! আপনি এই প্রাসাদ রক্ষা করুন, সমস্ত সুশৃঙ্খলা করুন। আগন্তুক শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিতে আপনার ভৃত্যেরা কি সক্ষম নহে?

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—তন্নজী! তোমার কথাই ঠিক! আমি সম্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধ-লুব্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পরামর্শই উৎকৃষ্ট, এই স্থানেই আমার থাকা কর্ত্তব্য। আমার হাবিলদারদিগের মধ্যে কে দুইশত মাত্র সেনা লইয়া ঐ আফগানদিগকে অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে?

পাঁচ, সাত, দশ জন হাবিলদার একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ তাহাদের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া, পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন,—হাবিলদার! তুমি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাহুতে তুমি অসুরবীর্য্য ধারণ কর, অদ্য তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। রঘুনাথ! তুমিই অদ্য দুর্গবিজয় আরম্ভ করিয়াছ, তুমিই শেষ কর।

রঘুনাথ নিঃশব্দে ভূমি পর্য্যন্ত শির নামাইয়া দুইশত সেনার সহিত বিদ্যুদ্গতিতে নয়নের বহির্গত হইলেন। শিবজী তন্নজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ঐ হাবিলদার রাজপুতজাতীয়, উহার মুখমণ্ডল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু হাবিলদার কখনও বংশের বিষয় একটী কথাও বলে না, আপন অসাধারণ সাহস-সম্বন্ধে একটী গর্ব্বিত বাক্যও উচ্চারণ করে না। একদিন পুনায় রঘুনাথ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিল। আমি এ পর্য্যন্ত কোনও পুরস্কার দিই নাই, কল্য রাজসভায় রাজা জয়সিংহের সম্মুখে রাজপুত হাবিলদারকে উচিত পুরস্কার দিব।

রঘুনাথজী যে কার্য্যের ভার লইলেন, তাহা সম্পন্ন করিলেন। আফগানগণ এখনও পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রাচীরের উপর হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ বর্শা নিক্ষেপ করিল; পরে "হর হর মহাদেও" ভীষণনাদে যুদ্ধের উপক্রম করিল। সে যুদ্ধ হইল না। প্রাচীরের উপর মশালের আলোকে অসংখ্যক শত্রু দেখিয়া আফগানগণ দুর্গ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য জানিয়া পুনরায় পর্ব্বত অবতরণ করিয়া পলাইল। মাউলীগণ পশ্চাদ্ধাবন করিল, উন্মত্ত মাউলীদিগের অবারিত ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে আফগানগণ নিপাতিত হইতে লাগিল।

রঘুনাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন,—পলাতককে যাইতে দাও, হত্যা করিও না, শিবজীর আদেশ পালন কর। যুদ্ধ শেষ হইল, আফগানগণ পর্ব্বত অবতরণ করিয়া পলাইল।

তখন রঘুনাথ দুর্গের প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রহরী সংস্থাপন করিলেন, গোলা বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘরে আপন প্রহরী সন্নিবেশিত করিলেন, দুর্গের সমস্ত ঘর, সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া শিবজীর নিকট যাইয়া শির নামাইয়া সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

যখন ঊষার রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইল, প্রাতঃকালের সুমন্দ শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, তখন সমস্ত দুর্গ শব্দশূন্য নিস্তব্ধ। যেন এই সুন্দর শান্ত পাদপমণ্ডিত পর্ব্বত-শেখর যোগী ঋষির আশ্রম, যেন যুদ্ধের পৈশাচিক রব কখনও এস্থানে শ্রুত হয় নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : বিজেতার পুরস্কার

ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা বায়ু প্রহারে।
প'ড়ে থাকে দূর গত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে॥
—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরদিন অপরাহ্ণে সেই দুর্গোপরি অপরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল। রৌপ্য-বিনির্ম্মিত চারি স্তম্ভের উপর রক্তবর্ণের চন্দ্রাতপ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত রাজগদির উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন, চারি পার্শ্বে সৈন্যগণ বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্ণের বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে শত শত লোক দিল্লীশ্বরের, জয়সিংহের ও শিবজীর জয়নাদ করিতেছে।

জয়সিংহ সহাস্য বদনে শিবজীকে বলিলেন,—আপনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অবধি তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়াছেন। এ উপকার দিল্লীশ্বর কখনই বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টায় জয় হইয়াছে।

শিবজী। যেখানে জয়সিংহ সেইখানেই জয়!

জয়সিংহ। বোধ করি, আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে এই দুর্গ অধিকার করিবেন, তাহা আমি কখনই আশা করি নাই।

শিবজী। মহারাজ! দুর্গবিজয় বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছি। তথাপি যেরূপ অনায়াসে দুর্গ লইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, সেরূপ পারি নাই।

জয়সিংহ। কেন?

শিবজী। মুসলমানদিগকে সুপ্ত পাইব বিবেচনা করিয়াছিলাম। দেখিলাম, সকলে জাগ্রত ও সসজ্জ! পূর্ব্বে কখনও দুর্গ জয় করিতে আমার এত সৈন্য হত হয় নাই।

জয়সিংহ। বোধ করি এক্ষণ যুদ্ধের সময় বলিয়া রজনীতে সর্ব্বদাই শত্রুরা সসজ্জ থাকে।

শিবজী। সত্য, কিন্তু এত দুর্গ জয় করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে এরূপ প্রস্তুত দেখি নাই।

জয়সিংহ। শিক্ষা পাইয়া ক্রমেই সতর্ক হইতেছে। কিন্তু সতর্কই থাকুক আর নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতিরোধ করা অসাধ্য, শিবজীর জয় অনিবার্য্য!

শিবজী। মহারাজের প্রসাদে দুর্গজয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কল্য রজনীর ক্ষতি জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে দুই-তিন শত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পাইব না।

শিবজী ক্ষণেক শোকাকুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্দিগণকে আনয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎখাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যকার যুদ্ধের পর কেবল দুই-এক শত বন্দিরূপে আছে, অন্য সমস্ত হত বা পলায়ন করিয়াছে। বন্দীদিগের হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বদ্ধ, তাহারা সভাসম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন,—সকলের হস্ত খুলিয়া দাও। আফগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয় দিল্লীশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও, আমার আদেশে কেহ তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না। সকল যুদ্ধে সকল দুর্গ-বিজয়ের পর, তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন, তাঁহার বন্ধুগণ কখন কখন তাঁহাকে এজন্য দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া আফগানগণ অনেকেই দিল্লীশ্বরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎখাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাহারও হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বদ্ধ, তাহার ললাটে খড়্গের আঘাত, বাহুতে তীর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে! বীর সদর্পে সভাসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া স্বয়ং আসন ত্যাগ করিয়া খড়্গের দ্বারা হস্তের রজ্জু কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—বীরবর! যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার হস্ত বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দিরূপে ছিলেন। আমার দোষ মার্জ্জনা করুন। আপনি এক্ষণে স্বাধীন। জয়পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।

রহমৎখাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন; তাহাতেও তাঁহার স্থির গর্ব্বিত নয়নের একটী পত্রও কম্পিত হয় নাই, কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভদ্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধসময়ে শত্রুমধ্যে কেহ কখনও রহমৎখাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অদ্য বৃদ্ধের দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহমৎখাঁ মুখ ফিরাইয়া তাহা মোচন করিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি বাদশাহের উপর বাদশাহ, জমীন ও আশমানের সুলতান, তিনি এই জন্য আপনাকে নূতন রাজ্যবিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন।

জয়সিংহ। পাঠান-সেনাপতি, আপনারও উচ্চপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাইলে আরও পদবৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে পারি যে, আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন?

রহমৎখাঁ। মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাঁহার কার্য্য করিয়াছি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না। যতদিন এ হস্ত খড়্গ ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্য ধরিবে।

শিবজী। তাহাই হউক। আপনি অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করুন; কল্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবে।

রহমৎখাঁ। ক্ষত্রিয়প্রবর! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলে প্রভুভক্ত নহে। কল্য দুর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সসজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধানদাতা আপনারই একজন সেনা। ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্যলঙ্ঘন করিব না।

এই বলিয়া রহমৎখাঁ ধীরে ধীরে প্রহরিগণের সহিত প্রাসাদাভিমুখে চলিয়া গেলেন। রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুগণ বুঝিলেন, এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বৃথা, তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল, অদ্য প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদবস্থায় দেখিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া পরে সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে তোমরা কখন জানিয়াছিলে?

সৈন্যগণ উত্তর দিল,—এক প্রহর রজনীতে।

জয়সিংহ। তাহার পূর্ব্বে কেহই এ কথা জানিতে না?

সৈন্যগণ। রজনীতে কোন একটী দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে তাহা জানিতাম না।

জয়সিংহ। ভাল, কোন্ সময়ে তোমরা দুর্গে পেঁৗছিয়াছিলে?

সৈন্যগণ। অনুমান দেড়প্রহর রজনীর সময়।

জয়সিংহ। উত্তম, একপ্রহর হইতে দেড়প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে? কেহ অনুপস্থিত ছিল না? যদি হইয়া থাকে, প্রকাশ কর। একজনের দোষের জন্য সহস্র জনের গ্লানি অনুচিত। তোমরা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে রাজা শিবজীর অধীনে যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরা এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে তাহাকেও আনিয়া দাও। যদি সে কল্য রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে তাহার নাম কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের নাম কলুষিত হইতেছে?

সৈন্যগণ তখন কল্যকার কথা স্মরণ করিতে লাগিল, পরস্পরে কথা কহিতে লাগিল, শিবজীর ক্রোধ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া শিবজী বলিলেন,—মহারাজ! অদ্য যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমি চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।

চন্দ্রাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজন্! কল্য একপ্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবিলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। যখন দুর্গতলে পেঁৗছিলাম তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।

শিবজী। সে কে, এখনও জীবিত আছে?

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ! শিবজীর ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে, সভাতলে একটী সূচিকা পড়িলে বোধ হয় তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চন্দ্রাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—রঘুনাথজী হাবিলদার!

সকলে নিৰ্ব্বাক, বিস্ময়-স্তব্ধ!

চন্দ্রাও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্রাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানব-প্রকৃতিতে ঈর্ষ্যার ন্যায় ভীষণ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্ত স্থাপন করিয়া চন্দ্রাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন,—রে কপটাচারি! বৃথা এ কপট অভিযোগ করিতেছিস! তোর নিন্দা রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু মিথ্যা নিন্দুকের শাস্তি সৈন্যেরা দেখুক।

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্শা উত্তোলন করিয়াছেন, সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—মহারাজ! প্রভু চন্দ্রাওয়ের প্রাণ সংহার করিবেন না, তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ, সকলে নিৰ্ব্বাক, বিস্ময়-স্তব্ধ।

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি রঘুনাথ, তুমি এই কার্য্য করিয়াছ? তুমি যে প্রাচীর লঙ্ঘনের সময় একাকী দুর্দ্দমনীয় তেজে অগ্রসর হইয়াছিলে, তুমি যে দুইশত মাত্র সৈন্য লইয়া পাঁচশত আফগানকে দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছিলে,—তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদারকে পূর্ব্বে আক্রমণ-সংবাদ দিয়াছিলে?

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—প্রভু, আমি সে দোষে নির্দ্দোষী।

দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিষ্কম্প হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটী পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে এবং চারিদিকে অসংখ্য লোক রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে, রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত, তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্ফীত হইতেছে। কল্য যেরূপ অসংখ্য শত্রুমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা অধিক সংকটমধ্যে যোদ্ধা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—তবে কিজন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্ব্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, নয়নদ্বয় পুনরায় রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন,—কপটাচারিন্‌! এইজন্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে? কিন্তু কুক্ষণে শিবজীর নিকট ছলনা-চেষ্টা করিয়াছিলে।

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিত স্বরে বলিলেন,—রাজন্‌! ছলনা ও কপটাচরণ আমার বংশের রীতি নহে, বোধ হয় প্রভু চন্দ্ররাও তাহা জানিতে পারেন।

রঘুনাথের স্থিরভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতি স্বরূপ হইল, তিনি কর্কশ ভাবে বলিলেন,—পাপিষ্ঠ! পরিত্রাণ-চেষ্টা বৃথা, ক্ষুধার্ত্ত সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জ্বলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই।

রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জ্জনা করুন।

ক্ষিপ্তপ্রায় শিবজী বর্শা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে আদেশ করিলেন,—বিদ্রোহাচরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড।

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে তীক্ষ্ন বর্শা দেখিলেন, তথনও সেই অবিচলিত স্বরে বলিলেন, —যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্শা কম্পিত হইতেছে, এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান বিস্মৃত হইয়া কর্কশস্বরে কহিলেন,—হস্ত ত্যাগ করুন, রাজপুতদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সনাতন নিয়ম, বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! অদ্য যাহা করিবেন, কল্য তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলে চিরকাল সেজন্য অনুতাপ করিবেন! যুদ্ধ-ব্যবসায়ে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, আমার মত গ্রহণ করুন, এ যোদ্ধা বিদ্রোহী নহে। কিন্তু সে বিচার এক্ষণে আবশ্যক নাই; আপনি আমার সুহৃদ্‌, সুহৃদের নিকট আমি এই রাজপুত যোদ্ধার প্রাণভিক্ষা করিতেছি। আমাকে ভিক্ষা দান করুন।

শিবজী জয়সিংহের ভদ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন. কহিলেন,—তাত! আমার পরুষবাক্য মার্জ্জনা করুন, আপনার কথা কখনও অবহেলা করিব না, কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে, তাহা কখনও মনে ভাবে নাই। হাবিলদার! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখ দর্শন করিতে চাহে না।

রঘুনাথ সভাস্থল ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় শিবজী পুনরায় বলিলেন,—

অপেক্ষা কর। দুই বৎসর হইল তোমার ঐ কোষের অসি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অসির অবমাননা হইবে না, প্রহরিগণ! অসি কাড়িয়া লও, পরে বিদ্রোহীকে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দাও।

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময় অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু প্রহরিগণ যখন অসি কাড়িয়া লইতেছিল তখন তাঁহার শরীর কম্পিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সে উদ্বেগ সংযত করিলেন, শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত শির নামাইয়া নিঃশব্দে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে। একজন পথিক একাকী নিঃশব্দে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রান্তর পার হইলেন, একাকী গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটী পার হইয়া আর একটী প্রান্তরে আসিলেন। অন্ধকার গভীরতর হইল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : চন্দ্ররাও জুমলাদার

আমা হইতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ,
হৃদে জ্বলে হলাহল।—
—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্ররাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীর্য্য, অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, তাঁহার বয়স রঘুনাথ অপেক্ষা ৫।৬ বৎসর অধিক মাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাহাকে ৪০ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত ললাটে এই বয়সেই দুই একটী চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটী শুক্ল। নয়ন ক্ষুদ্র ও অতিশয় উজ্জ্বল। চন্দ্ররাওকে যাহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন, তাঁহারা বলিতেন যে চন্দ্ররাওয়ের তেজ ও সাহস যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিন্তা এবং ভীষণ অনিবার্য্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটী ভাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইত। দেহ যেন লৌহনির্ম্মিত। যাঁহারা চন্দ্ররাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ, গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সে অল্পভাষী স্থিরপ্রতিজ্ঞ জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না। এ সমস্ত ভিন্ন চন্দ্ররাওয়ের আর একটী গুণ বা দোষ ছিল, তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না। বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দিবারাত্র জ্বলিত। অসাধারণ বুদ্ধিসঞ্চালনে তিনি আত্মোন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেন, অতুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়্গহস্তে সেই পথ পরিষ্কার করিতেন। শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, অপরাধী হউক বা পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্ররাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাঁহাকে পদদলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন। অদ্য বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন। এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশ বৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

চন্দ্ররাও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেন না। রাজা যশোবন্ত সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতি সিংহ চন্দ্ররাওকে বাল্যকালে লালন-পালন করিয়াছিলেন! অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য্য করিত, গজপতির পুত্র-কন্যাকে যত্ন করিত, অথবা গজপতির সহিত যুদ্ধে যুদ্ধে ফিরিত।

যখন চন্দ্ররাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ মাত্র তখন গজপতি তাঁহার গভীর চিন্তা, দুর্দ্দমনীয় তেজ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজ পুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্দ্ররাওকে ভালবাসিতেন ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

সৈনিকের ব্রত ধারণ করিয়া অবধিই চন্দ্ররাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন,

তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধৃগণও বিস্মিত হইত। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ, যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রাশিকৃত হইতেছে, যে স্থানে ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যে স্থানে বিজেতার হুংকারে ও আর্ত্তের আর্ত্তনাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে,—তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের অল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালককে তথায় পাইবে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রজনীতে গীত-বাদ্য করিতেছে, হাস্য ও আমোদ করিতেছে, চন্দ্ররাও তথায় নাই। অল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরে অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে, অথবা কুঞ্চিত-ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী স্বায়ংকালে পদচারণ করিতেছে। চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল। তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত রাজপুত-শিশু নহেন। তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছে, গজপতি সিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্ররাও এক্ষণে একজন অসাধারণ তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্য্যাদাবৃদ্ধির সহিত চন্দ্ররাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটী যুদ্ধে চন্দ্ররাও গজপতিকে পরম বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। গজপতি যুদ্ধের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন,—চন্দ্ররাও! অদ্য তোমার সাহসেই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে; ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি?

চন্দ্ররাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে রহিলেন।

গজপতি সস্নেহে বলিলেন,—মনে ভাবিয়া দেখ, যাহা ইচ্ছা হয় প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্ধি, চন্দ্ররাও! তোমাকে কিছুই অদেয় নাই।

তখন চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন,—রাজপুত-বীর কখনও অঙ্গীকার অন্যথা করেন না জগতে বিদিত আছে। বীরশ্রেষ্ঠ আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন।

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ! গজপতির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্রোধে তাহার শরীর কম্পিত হইল, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক নিষ্কোষিত হইল। কিন্তু সেই ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া গজপতি উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন,—অঙ্গীকার পালনে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্র দেশে জন্ম, রাজপুত দুহিতাদিগের মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর সহিত পর্ব্বত-কন্দরে ও জঙ্গলমধ্যে থাকিবার অভ্যাস নাই। অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, জঙ্গল কুটীরের পরিবর্ত্তে দুর্গ প্রস্তুত কর, দস্যুর পরিবর্ত্তে যোদ্ধার নাম গ্রহণ কর, তৎপরে রাজপুত দুহিতার বিবাহ কামনা জানাইও। এখন অন্য কোন যাচ্ঞা আছে?

চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—অন্য কোন যাচ্ঞা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে প্রভুকে জানাইব।

সভা ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদারচেতা গজপতি চন্দ্ররাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরাৎ বিস্মৃত হইলেন, সেই দিনকার কথা বিস্মৃত হইলেন। চন্দ্ররাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেইদিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধকার চন্দ্ররাওয়ের হৃদয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছিল।

দুই দণ্ডের পর চন্দ্ররাও একটী দীপ জ্বালিলেন, একখানি পুস্তকে সযত্নে কি লিখিলেন। পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন। ঈষৎ বিকট হাস্য মুখমণ্ডলে দেখা গেল। তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—চন্দ্র, কি লিখিতেছ? চন্দ্ররাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি তাহাই লিখিতেছি।

বন্ধু চলিয়া গেল, চন্দ্ররাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেটী যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্ররাও একটী ঋণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরংজীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী-সন্নিধানে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতিসিংহ হত হয়েন, "মাধবীকঙ্কণ" নামক উপন্যাসের পাঠক তাহা অবগত আছেন।

গজপতির অনাথ বালক ও বালিকা মাড়ওয়ার হইতে পুনরায় মেওয়ার প্রদেশে সূর্য্যমহল নামক দুর্গে যাইতেছিল। রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল

একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। পথিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালক-বালিকাকে মহারাষ্ট্র দেশে লইয়া যাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী, রজনীযোগে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও!

তীক্ষ্নবুদ্ধি চন্দ্ররাওয়ের মনোরথ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে কিছু অর্থ আনিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্র-দেশে একজন সমাদৃত সম্ভ্রান্ত লোক হইলেন। চন্দ্ররাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অবিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতি সিংহের একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন, সকলে দেখিতে পাইল। তাঁহার সাহস ও বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ ও জায়গীর দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সমাদর করিলেন। দিনে দিনে চন্দ্ররাওয়ের যশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন সময় কুক্ষণে বালক রঘুনাথ তাঁহার উন্নতির পথে আসিয়া পড়িল। জুমলাদার অচিরে পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : লক্ষ্মীবাই

স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা॥

—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দস্যুবেশী চন্দ্ররাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজস্থান হইতে মহারাষ্ট্র-দেশে নীত হইয়াছিলেন। একদিন রজনীযোগে তিনি পলায়ন করেন, পর্ব্বত-কন্দরে, বনমধ্যে, প্রান্তরে বা গৃহস্থের বাটীতে কয়েকদিন লুক্কায়িত থাকেন। সুন্দর অনাথ অল্পবয়স্ক বালককে দেখিয়া কেহই মুষ্টিভিক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ হইত না।

তাহার পর পাঁচ-ছয় বৎসর রঘুনাথ নানাস্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত করিল। সংসার-স্বরূপ অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল। নানা দেশে পর্য্যটন করিল, নানা লোকের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিল। পূর্ব্ব গৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথা বালকের মনে সর্ব্বদাই জাগরিত হইত, কিন্তু অভিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ কাহাকেও বলিত না। কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি উপবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ভরিয়া রোদন করিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন করিয়া স্বকার্য্যে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হৃদয়ে যেন আপনিই জাগরিত হইতে লাগিল। অল্পবয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিত, প্রভুর অসি কোষে ঝুলাইত! সন্ধ্যার সময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চারণদিগের গান উচ্চৈঃস্বরে গাইত, নৈশ পথিকেরা পর্ব্বতগুহায় সংগ্রামসিংহ বা প্রতাপের গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স তখন রঘুনাথ শিবজীর কীর্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্য্যের কথা চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের ন্যায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণ দেশে হিন্দু রাজ্য বিস্তার করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট যাইয়া একটী সামান্য সেনার কার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অদ্বিতীয়, কয়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন, একটী হাবিলদার পদে নিযুক্ত করিলেন ও তাহার কয়েক দিবস পরে তোরণ দুর্গে পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম রঘুনাথসিংহ; কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে হাবিলদারী কার্য্য পাওয়া অবধি সকলে তাঁহাকে রঘুনাথজী হাবিলদার বলিয়া ডাকিত।

রঘুনাথ হাবিলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিবজীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাও জুমলাদারের অধীনে একজন হাবিলদারের মৃত্যু হয়, তাহারই পদ

রঘুনাথ প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে পিতার পুরাতন ভৃত্য ও আপন বাল্যসুহৃৎ বলিয়া চিনিলেন, তাঁহাকে সদ্য বা ভগিনীপতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং তিনি সানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইলেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অল্পভাষী জুমলাদারের ললাট অদ্য পুনরায় কুঞ্চিত হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বিক্রমের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল, চন্দ্ররাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। চন্দ্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইবে না, গভীর মন্ত্রণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অদ্য রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য্য হইতে দূরীভূত হইলেন।

চন্দ্ররাও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইলেন। পাঠক! চল, আমরাও একবার বড়লোকের বাটী সভয়ে প্রবেশ করি। –

জুমলাদার বাটী আসিলে, বহির্দ্বারে নহবৎ বাজিতে লাগিল, অসংখ্য দাস-দাসী সম্মুখে আসিল, অনেক প্রতিবেশী সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অচিরে চন্দ্ররাওয়ের আগমন-বার্ত্তা সমগ্র দেশে রাষ্ট্র হইল। জুমলাদারের বাটীর অন্তঃপুরে ধুমধাম পড়িয়া গেল, সেই ধুমধামের মধ্যে শান্তনয়না ক্ষীণাঙ্গী লক্ষ্মীবাই নীরবে স্বামীর অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা; বাল্যকালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল বয়সে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে অল্পভাষী কঠোর-স্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত কোমল পুষ্পের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে দুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে? বালিকা পূর্ব্বকথা স্মরণ করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা স্মরণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন সহিষ্ণু হয়।

বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবায় রত হইলেন। হিন্দু রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সহৃদয় ও সদয় হয়েন, নারী আনন্দে ভাসিয়া তাহার সেবা করেন, স্বামী নির্দ্দয় ও বিমুখ হইলেও নারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? কিন্তু যদিও চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে অভিমান, জিঘাংসা ও উচ্চাভিলাষ বিরাজ করিত, তথাপি তিনি অসহায় নারীর প্রতি নির্দ্দয় ছিলেন না। নম্রমুখী, নম্র-হৃদয়া লক্ষ্মীবাইয়ের পরিচর্য্যায় চন্দ্ররাও তুষ্ট হইতেন; যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইলে পতিপরায়ণা লক্ষ্মীবাইয়ের নিকটে আসিয়া শান্তি লাভ করিতেন; লক্ষ্মীবাইয়ের স্নিগ্ধ কথাগুলি শুনিয়া তাহাকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। লক্ষ্মীবাই তখন জগতের মধ্যে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন, স্বামীর সামান্য যত্নে তিনি পুলকিত হইতেন, স্বামীর একটী মিষ্ট কথায় তাহার হৃদয় প্লাবিত হইত। যে পুষ্প চারাটীকে উদ্যান হইতে আনিয়া গৃহমধ্যে অন্ধকারে রাখা যায় সে চারাটী গৃহমধ্যস্থ একটী আলোকরেখার দিকে কত পুলকের সহিত ধায়!

এইরূপে সংসার-কার্য্য ও পতিসেবায় এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষ্মী যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শান্ত, নিরুদ্বেগ! লক্ষ্মী পূর্ব্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বাল্যকালের সুখ, বাল্যকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাথের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে দুই-এক বিন্দু অশ্রু সেই সুন্দর রক্তশূন্য গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া যাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

অদ্য চন্দ্ররাও আহারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। ভ্রূযুগল কি সুন্দর ও সুচিক্কণ, যেন সেই পরিষ্কার শান্ত ললাটে তুলিদ্বারা অঙ্কিত। শান্ত, কোমল কৃষ্ণ নয়ন দুটীতে যেন চিন্তা আপনার আবাসস্থান করিয়াছে। গণ্ডস্থল সুন্দর সুচিক্কণ, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ; সমস্ত শরীর শান্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা উন্মত্ততা কৈ? আহা! রাজস্থানের এই অপূর্ব্ব পুষ্পটী মহারাষ্ট্রে সৌন্দর্য্য ও সুঘ্রাণ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে ঈষৎ শুষ্ক।

লক্ষ্মীবাইয়ের চারু নয়ন, সুদীর্ঘ কেশভার, কোমল বাহুদ্বয় ও কোমল দেহলতায় মুক্তার লাবণ্য আছে, কিন্তু হীরকের উজ্জ্বল কিরণ নাই।

একদিন চন্দ্ররাও লক্ষ্মীকে জানাইয়াছিলেন যে, তোমার ভ্রাতা আমার অধীনে হাবিলদার হইয়াছে ও যশোলাভ করিয়াছে। কথাটী সাঙ্গ হইলে চন্দ্ররাওয়ের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া লক্ষ্মীর মনে সন্দেহ হইয়াছিল।

আর একদিন স্বামীর দুই-একটী মিষ্টবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদযুগলের নিকট বসিয়া বলিলেন,—দাসীর একটী নিবেদন আছে, কিন্তু বলিতে ভয় করে।

চন্দ্ররাও শয়ন করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, নম্রমুখীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—কি বল না। তোমার নিকট আমার অদেয় কি আছে?

লক্ষ্মী বলিলেন,—আমার ভ্রাতা বালক, অজ্ঞান।

চন্দ্ররাওয়ের মুখ গম্ভীর হইল।

লক্ষ্মী। সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অধীন।

চন্দ্ররাও। না, সে আমা অপেক্ষাও সাহসী বলিয়া পরিচিত।

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন, তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে, চন্দ্ররাও রঘুনাথের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ! ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন,—বালক যদিও দোষ করে, আপনি না মার্জ্জনা করিলে কে করিবে?

চন্দ্ররাওয়ের ললাটে আবার সেই মেঘচ্ছায়া দেখা গেল। লক্ষ্মী স্বামীকে জানিতেন, সে কথা আর উল্লেখ করিলেন না।

তাহার পর চন্দ্ররাও অদ্য প্রথমে বাটী আসিয়াছেন। রঘুনাথের যাহা ঘটিয়াছে লক্ষ্মী তাহা জানেন না, কিন্তু তাহার হৃদয় চিন্তাকুল। তিনি মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিদ্রিত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট ভ্রাতার সংবাদ লইবেন মনে স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্ররাওয়ের আহার সমাপ্ত হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাম্বূল হস্তে তথায় যাইলেন। দেখিলেন স্বামীর ললাট চিন্তাযুক্ত। লক্ষ্মী তাম্বূল দিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্ররাও সতর্কভাবে দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

ধীরে ধীরে একটী গুপ্তস্থান হইতে চন্দ্ররাও একটী বাক্স বাহির করিলেন, সেটী খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন, দেখিতে হিসাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে গজপতি কর্তৃক যেদিন সভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, সেদিন সেই পুস্তকে একটী ঋণের কথা লিখিয়াছিলেন, সেই পাতা খুলিলেন, সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে:—

“মহাজন........................গজপতি:
ঋণ..............................অবমাননা:
পরিশোধ........................তাঁহার শোণিতে; তাঁহার বংশের অবমাননায়।”

একবার, দুইবার এই অক্ষরগুলি পড়িলেন, ঈষৎ হাস্য সেই বিকট মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেই স্থানে লিখিলেন, “অদ্য পরিশোধ হইল।” তারিখ দিয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন।

দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী ভক্তিভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন। চন্দ্ররাও লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—অনেক দিনের একটী ঋণ অদ্য পরিশোধ করিয়াছি।

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : ঈশানী-মন্দিরে

হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল।
—মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাওয়ের বাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটী মন্দির ছিল। অনতিউচ্চ একটী পর্ব্বতশৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তররাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটী পর্ব্বত-তরঙ্গিণী কুল্ কুল্ শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল হইতে অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্যজলে স্নাত হইয়া সোপানারোহণ পূর্ব্বক ঈশানীর পূজা দিত, অদ্য পর্য্যন্তও মন্দিরের গৌরব বা যাত্রিসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ বহু পুরাতন বৃক্ষদ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতলভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাভাগেও সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়াতে ঈশানী মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্যময় সুস্নিগ্ধ স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণকথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপবৃন্দ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ ও আহবে মহারাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এই ক্ষুদ্র প্রশান্ত পর্ব্বত-মন্দির বিগ্রহের রবে কলুষিত করে নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় উদ্বেগ পরিপূর্ণ, প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিষাদে, অদ্য রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না। রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়! এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক! এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে! উন্মত্ততাই কত শত হতভাগার আরোগ্য! কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না!

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণপাঠ করিতেছিলেন। আহা! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্ত নিশীথে শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র বিভূষিত নৈশগগনমণ্ডলে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল। সেই পুণ্যকথা শান্ত নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে লাগিল। শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতূহলে পান করিতে লাগিল। বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানবহৃদয় শান্তিরসে বিগলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুন্দর বঙ্গদেশে, তুষারপূর্ণ পর্ব্বতবেষ্টিত কাশ্মীরে, বীরপ্রসূ রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র ভূমিতে, সাগর প্রক্ষালিত কর্ণাট ও দ্রাবিড়ে, কত সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখনই বিস্মৃত না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, হস্তিনা, অযোধ্যা, মিথিলা, কাশী, মগধ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দ্দিনে এই গীত গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ ধর্ম্মরক্ষার্থ হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্ব্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল এই পূর্ব্ব গীত মাত্র, যেন বিপদে, বিষাদে, দুর্ব্বলতায় আমরা পূর্ব্বকথা বিস্মৃত না হই, যতদিন জাতীয় জীবন থাকে, যেন হৃদয়-যন্ত্র এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে।

নব্য পাঠক! তুমি ইলিয়দ ও ইনিয়দ পাঠ করিয়াছ, দান্তে ও সেক্সপীয়র, গেতে ও হিউগো পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরসভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতর আলোড়িত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কথা, দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য-কথা হিন্দু মাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখনও বিস্মৃত না হয়!

পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন

সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুন্ন হইবে না।

শান্ত কাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্গীত রঘুনাথের উত্তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শান্তি সেচন করিতে লাগিল। হতভাগার উন্মত্ততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনাথকে অঙ্কে গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শ্রান্ত অবসন্ন শরীর সেই বৃক্ষমূলে শায়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন? দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন যশোবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়! রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকাপূর্ণ সংসারের সে মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন? দুর্গজয় করিতেছেন? যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শ্রান্ত বন্ধুহীন যুবকের বহুদিনের কথা পূর্ব্বজীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইয়াছে। শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা ও সুখ আমাদের নিকট বিদায় লইলে বন্ধুহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর সূর্য্যমহলে ক্রীড়া করিতেন, হাস্য-ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শান্ত, ধীর প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল। আহা! সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইবেন? আজ সে সোনার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল সুখের জগৎ কোথায়, সে হৃদয়ের সহোদরা কোথায়? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন? বোধ হইল যেন স্বয়ং লক্ষ্মী ভ্রাতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতলহস্ত ভ্রাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরা স্নেহপূর্ণ নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আহা! বোধ হইল যেন শোকে বা চিন্তায় লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি ঈষৎ শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটী সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, কিন্তু চিন্তার আবাসস্থান!

রঘুনাথ নয়ন মুদিত করিলেন, আর একবিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিলেন, বলিলেন,—ভগবন্, অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যথিত করিতেছ? আমি যেন উন্মত্ত না হই।

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল। রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে, তাঁহার প্রাণের সহোদরাই তাহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন।

রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটী আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেই তরুণ যোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! তোমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম? অন্য সুখ দূর হউক, অন্য আশা দূর হউক, লক্ষ্মি! তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এ জীবনে আর কিছু চাহে না।

লক্ষ্মীও শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন। আহা! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রত্ন আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে যাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান না করে?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেকক্ষণ বাকশূন্য হইয়া রহিলেন, বহুদিনের

কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয়ে উথলিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভগিনীর ন্যায় এজগতে আর স্নেহময়ী কে আছে, ভ্রাতৃস্নেহের ন্যায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে? আমরা সে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ত, পাঠক, ক্ষমা কর।

অনেকক্ষণ পরে দুই জনের হৃদয় শীতল হইল। তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন,—ঈশানীর ইচ্ছায় কত অনুসন্ধানের পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম, আহা! আজ আমার কি পরম সুখ, দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল? ভাই, এ শীতল বাতাসে আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে, চল মন্দিরের ভিতর যাই, আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।

ভ্রাতা ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আসিলেন, লক্ষ্মী একটী স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ব্বকথা কহিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথ বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গো-বৎস বা মেষপাল রক্ষা করিতেন, মেষের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন, বা নির্জ্জনে বসিয়া চারণদিগের গীত গাইতেন। কখন সায়ংকালে নদীকূলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন প্রত্যূষে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ প্রদেশে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন, অবশেষে একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনানীর অধীনে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত রঘুনাথের যুদ্ধব্যবসায়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন। আজি তিন বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু প্রভু শিবজীর অযথা সন্দেহে অপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতেছেন! এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার দুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অবারিত অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, ভ্রাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সেকথা শেষ হইল, কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া আপনার কি পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররাওয়ের নাম করিলেন না; ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন,—মহারাষ্ট্রদেশে আসিবার অনতিকাল পরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র জায়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম করে না,—গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরবজ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী সুখে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে দাসী সুখে আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভাইকে সুখে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়। রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য কতদিন চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সেই কামনায় মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, সহসা মন্দির পার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভাইকে পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার হৃদয়ের শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের কথা জানিতেন। লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সান্ত্বনা করিতে জানিতেন। সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ্য করা, সান্ত্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করা, এই নারীর ধর্ম্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধবাক্য দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার মন শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—আমাদিগের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকে না! ভগবান যে সুখ দেন তাহা আমরা

ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানবজন্মই দুঃখময়, যদি আমরা দুঃখ সহ্য না করিব, তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দ্দিন সকলেরই আছে, দুর্দ্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম করিয়া নিজ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন। ভাই! এ নৈরাশ দূর কর, এরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কতদিন থাকিবে? আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কতদিন থাকে?

রঘুনাথ। থাকিবার আবশ্যক কি? যে দিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জন্য?

লক্ষ্মী। তোমার ভগিনী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই, আমার এ জগতে আর কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎসংসারে কেহ নাই। তুমিও কি দুঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা ভুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হইলেন?

রঘুনাথ। লক্ষ্মি! তুমি আমাকে ভালবাস তাহা জানি, তোমাকে যেদিন কষ্ট দিব সেদিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনি! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই। তুমি স্ত্রীলোক, সৈনিকের শোক বুঝিবে কিরূপে? জীবন অপেক্ষা আমাদিগের সুনাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক ও অপযশ সহস্রগুণে কষ্টকর! সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলঙ্কিত হইয়াছে!

লক্ষ্মী। তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মহানুভব শিবজীর নিকট যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে তিনি অবশ্য তোমার কথা শুনিবেন, তোমার দোষ নাই, বুঝিবেন।

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন, পিতার অভিমান, পিতার দর্প পুত্রে বর্ত্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে এরূপ আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন,—মার্জ্জনা কর, আমি স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকট যাইতে অসম্মত হও, কার্য্য দ্বারা কেন আপন যশ রক্ষা কর না? পিতা বলিতেন, "সেনার সাহস ও প্রভুভক্তি কার্য্যে প্রকাশ হয়।" যদি বিদ্রোহী বলিয়া কেহ তোমাকে সন্দেহ করিয়া থাকে, অসিহস্তে কেন সে সন্দেহ খণ্ডন কর না?

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন প্রজ্বলিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে?

লক্ষ্মী। শুনিয়াছি শিবজী দিল্লী যাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি স্ত্রীলোক, আমি কি জানি বল? তোমার পিতার ন্যায় সাহস, তাঁহারই ন্যায় বীরপ্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য না সফল হইতে পারে?

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তার সময় থাকিত, তবে বুঝিতেন কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানবহৃদয়-শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞা নহেন। যে ঔষধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে শোক সন্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন ও মুখমণ্ডল সহসা নবগৌরব ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—লক্ষ্মি! তুমি স্ত্রীলোক, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য নহে, ভগবান সহায় হউন, রঘুনাথ বিদ্রোহী নহে, ভীরু নহে, একথা এখনও প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা, তোমার নিকট এ সমস্ত কহি কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে?

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন,—রোগ নির্ণয় করিলাম আমি, ঔষধি দিলাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না? প্রকাশ্যে বলিলেন,—ভাই, তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব? কিন্তু যাহাই হউক, তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী যতদিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিবে।

রঘুনাথ। আর লক্ষ্মি! আমি যতদিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা কখনও বিস্মৃত হইব না।

অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন,—আমার আর একটী কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।

রঘুনাথ। লক্ষ্মি! আমার নিকট তোমার কি কথা বলিতে ভয় হয়? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয়?

লক্ষ্মী। চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার বোধ হয় তোমার অপকার করিয়াছেন।

রঘুনাথের হাস্য দূর হইল, মুখ রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু সে উদ্বেগ দমন করিয়া রঘুনাথ কহিলেন,—চন্দ্ররাও রাজার নিকটে যে কথা কহিয়াছিলেন তাহা অযথার্থ নহে। তিনি আমার অন্য কোন অপকার করিয়াছেন কি না তাহা আমি জানি না।

লক্ষ্মী। তিনি যাহাই করিয়া থাকেন, ভাই, অঙ্গীকার কর তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।

রঘুনাথ নিরুত্তর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী পুনরায় বলিলেন,—ভ্রাতার নিকট পূর্ব্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটী কথা বলিলাম, ভাই আমাকে যদি ভালবাস এ কথাটি রাখিও।

সে অনুরোধে রঘুনাথের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ভগিনীর হাত দুইটী ধরিয়া বলিলেন, —লক্ষ্মি, আমার মনে সন্দেহ হয় চন্দ্ররাওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, কিন্তু তোমাকে অদেয় কিছুই নাই। এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি চন্দ্ররাওয়ের কোন অনিষ্ট করিব না। আমি তাহার দোষ মার্জ্জনা করিলাম, জগদীশ্বর তাহাকে মার্জ্জনা করুন।

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন,—জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।

পূর্ব্বদিকে প্রভাতের আলোকচ্ছটা দেখা যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সস্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন,—আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে, এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এইক্ষণে আমি না যাইলে জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।

পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন,—এই বলিয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল, আমরা হতভাগিনী সরযূর নিকট বিদায় লইয়া আসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ : সীতাপতি গোস্বামী

যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক,

* * *

যাও যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণদিনে রঘুনাথের যাইতে কি জন্য বিলম্ব হইতেছিল পাঠক মহাশয় অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। সেদিন যুদ্ধে কে রক্ষা পাইবে কেহ জানিত না, যুদ্ধে গমন করিবার পূর্ব্বে রঘুনাথ প্রাণ ভরিয়া একবার সরযূকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সাশ্রুনয়নে সরযূ রঘুনাথকে বিদায় দিয়াছিলেন।

একদিন, দুইদিন অতিবাহিত হইল, রঘুনাথের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আশা প্রথমে কানে কানে বলিতে লাগিল,—রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ রাজ-সম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী রঘুনাথ শীঘ্র উল্লাসিত হৃদয়ে আবার আসিতেছেন, পরম কুতূহলের সহিত পিতার নিকট যুদ্ধকথা কহিবেন। কিন্তু রঘুনাথ আর আসিলেন না, সেদিনকার যুদ্ধকথা বর্ণনা করিলেন না।

সহসা বজ্রের ন্যায় সংবাদ আসিল, রঘুনাথ বিদ্রোহী, বিদ্রোহাচরণ জন্য অবমানিত হইয়া দূরীকৃত হইয়াছেন। প্রথম মুহূর্ত্তে সরযূ চকিতের ন্যায় রহিলেন, কথার অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ললাট রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। দাসীকে বলিলেন,—কি

বলিলি, রঘুনাথ বিদ্রোহী? রঘুনাথ মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন? কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, তোকে কি বলিব, সম্মুখ হইতে দূর হ!

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে লাগিল, "রঘুনাথ বিদ্রোহী!" সরযূর সখীগণ সরযূকে এই কথা বলিলেন; বৃদ্ধ জনার্দ্দনও সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন,—কে জানে সেই সুন্দর উদারমূর্ত্তি বালকের মনে এরূপ ক্রূরতা ছিল? সরযূ সমস্ত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। জগৎশুদ্ধ লোকে রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিতেছে, সরযূর হৃদয় কহিল, জগৎ মিথ্যাবাদী, রঘুনাথের চরিত্রে দোষ স্পর্শে না।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর একদিন সন্ধ্যার সময় সরযূ সরোবর-তীরে যাইলেন। দেখিলেন সরোবরের কূলে সেই নৈশ অন্ধকারে জটাজূটধারী দীর্ঘকায় একজন গোস্বামী বসিয়া রহিয়াছেন। সরযূ ঈষৎ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, যতই গোস্বামীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযূর হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল।

গোস্বামী সরযূর দিকে চাহিলেন, ক্ষণেক স্থিরভাবে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—ভদ্রে! এ গোস্বামীর নিকট কি তোমার কোন প্রয়োজন আছে? কোনও বিশেষ অভীষ্টে আমার নিকট আসিয়াছ? রমণি, তোমার ললাটে দুঃখচিহ্ন দেখিতেছি কেন? চক্ষুতে জল কেন?

সরযূ উত্তর করিতে পারিলেন না। গোস্বামী পুনরায় বলিলেন,—বোধ হয় আমি তোমার উদ্দেশ্য অবগত আছি, বোধ হয় কোন বন্ধুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ।

সরযূ তখন কম্পিতস্বরে বলিলেন,—ভগবান্! আপনার শক্তি অসাধারণ, যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু বলেন, তবে বাধিত হই। সেই বন্ধু বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

গোস্বামী। জগতে সকলে তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানে।

সরযূ। প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই।

গোস্বামী। মহারাজ শিবজী তাঁহাকে বিদ্রোহী জানিয়াই দূর করিয়া দিয়াছেন।

সরযূর মুখ রক্তবর্ণ হইল, আরক্ত-নয়নে কহিলেন,—তপস্যা প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করিব, কিন্তু রঘুনাথ বিদ্রোহী বিশ্বাস করিব না! গোস্বামিন্, আমি বিদায় হই।

গোস্বামীর নয়ন জলপূর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—আমার আর কিছু বক্তব্য আছে।

সরযূ। নিবেদন করুন।

গোস্বামী। মনুষ্যহৃদয় অবগত হওয়া মনুষ্যগণনার অসাধ্য, রঘুনাথের হৃদয়ে কি ছিল জানিবার একমাত্র উপায় আছে। প্রণয়িনীর হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ; যদি রঘুনাথের যথার্থ প্রণয়িনী কেহ থাকে, তাঁহার নিকট গমন কর, তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে।

সরযূ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—জগদীশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তি দান করিলে। সেই উন্নতচরিত্র যোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের সত্যতায় তাহার স্থির বিশ্বাস বিচলিত হইবে না।

ক্ষণেক পর গোস্বামী আবার বলিলেন,—ভদ্রে! তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমিই সেই যোদ্ধার প্রকৃত প্রণয়িনী। আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাঁহাকে কিছু বক্তব্য আছে? আমার নিকট লজ্জার কারণ নাই, আমি সংসারের বহির্ভূত।

সরযূ ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—প্রভুর সহিত তাঁহার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

গোস্বামী। কল্য রজনীতে ঈশানী-মন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

সরযূ। তিনি আপাততঃ কি করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কি বলিয়াছেন?

গোস্বামী। নিজ বাহুবলে, নিজ কার্য্যগুণে, অন্যায় অপযশ তিরোহিত করিবেন অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণ দান করিবেন।

সরযূ। ধন্য বীরপ্রতিজ্ঞা! যদি তাঁহার সহিত পুনরায় আপনার সাক্ষাৎ হয়, বলিবেন, সরযূ রাজপুত-বালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে। বলিবেন, সরযূ যতদিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই যশোগীত গাইবে। ভগবান অবশ্যই রঘুনাথের যত্ন সফল করিবেন।

গোস্বামী। ভগবান তাহাই করুন, কিন্তু ভদ্রে! সত্যের সর্ব্বদা জয় হয় না। বিশেষতঃ রঘুনাথ যে দুরূহ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ-সংশয়ও আছে।

সরযূ। রাজপুতের সেই ধর্ম্ম! আপনি তাঁহাকে জানাইবেন, যদি কর্ত্তব্য সাধনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়, সরযূবালা তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে!

উভয়ে ক্ষণিক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন,—রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলিয়াছিলেন?

গোস্বামী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী বলিয়া জগৎ তাঁহাকে ঘৃণা করিবে, আপনি কি তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন? জগৎ যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি কি তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন? ঘৃণিত, অবমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে কি সরযূবালা মনে রাখিবেন?

সরযূ বলিলেন,—প্রভু! তাঁহাকে জানাইবেন, সরযূ রাজপুতবালা, অবিশ্বাসিনী নহে।

গোস্বামী। জগদীশ্বর! তবে আর তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই। লোকে যদি মন্দ বলে, তিনি জানিবেন, একজন এখনও রঘুনাথকে বিশ্বাস করে! এক্ষণে বিদায় দিন, আমি এই কথাগুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন হইবে!

সজলনয়নে সরযূ বলিলেন,—তাঁহাকে আরও বলিবেন, তিনি অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ, তিনি তাঁহার সহায় হইবেন!

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন। সরযূ বলিলেন,—প্রভু! আমার হৃদয় শান্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

গোস্বামী বলিলেন,—সীতাপতি গোস্বামী!

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে একজন গোস্বামী একাকী রায়গড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতেছেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ : রায়গড় দুর্গ

ধিক্ দেব, ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এতদিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, বীরত্ব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, শিবজীর তদানীন্তন রাজধানী রায়গড়ে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটী সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী, পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত যোদ্ধা, ধীশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণতনু শুক্লকেশ বহুদর্শী ন্যায়শাস্ত্রী সভাতল সুশোভিত করিয়াছেন। যুদ্ধ ব্যবসায়ে, বুদ্ধি সঞ্চালনে বা বিদ্যাবলে ইঁহারাই শিবজীর চির সহায়তা করিয়াছেন, শিবজীর ন্যায় ইহাদেরও হৃদয় স্বদেশানুরাগে পূর্ণ। কিন্তু অদ্য সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ অদ্য মহারাষ্ট্রীয়-গৌরব-লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন!

অনেকক্ষণ পর শিবজী মুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—পেশোয়াজী! আপনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জায়গীরদার হইয়া থাকিব?

মুরেশ্বর। মনুষ্যের যাহা সাধ্য আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে?

শিবজী। স্বর্ণদেব! যখন আপনি আমার আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রায়গড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজার রাজধানীস্বরূপ নির্ম্মাণ করেন, না জায়গীরদারের আবাসস্থান বলিয়া নির্ম্মাণ করেন?

আবাজী স্বর্ণদেব ক্ষুন্নস্বরে উত্তর করিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! ভবানীর আদেশে একদিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয়। ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন।

অন্নজী দত্তও কহিলেন,—যাহা অনিবার্য্য তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীগমনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করুন।

শিবজী। অন্নজী! আপনার কথা সত্য, কিন্তু যে আশা, যে চেষ্টা হৃদয়ে বহুকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না। ঐ যে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বাল্যকালে ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে করিতে বা উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে করিতে হৃদয়ে কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত! পুনরায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, পুনরায় হিন্দুরাজা হিমালয় হইতে সাগরকূল পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ শাসন করিবেন! ঈশানী! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নমাত্র, তবে এরূপ স্বপ্নে কেন বালকের হৃদয় চঞ্চল করিয়াছিলে?

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে নীরব, সভায় শব্দমাত্র নাই। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরের একপ্রান্তে ঈষৎ অন্ধকার স্থান হইতে একটী গম্ভীর স্বর শ্রুত হইল,—ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না! মনুষ্যের যদি অধ্যবসায় ও বীরত্ব থাকে, ঈশানী সহায়তাদানে কুণ্ঠিত হইবেন না!

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, নবীন গোস্বামী সীতাপতি!

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন,—গোঁসাইজি! তুমি আমার হৃদয়ে বাল্য উৎসাহের পুনরুদ্রেক করিতেছ, বাল্যকথা পুনরায় স্মরণ করাইতেছ! তাত দাদাজী কানাইদেব মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া আমাকে এরূপ বলিয়াছিলেন,—বৎস! তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিতকারীকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর। বিংশতি বৎসর পরে অদ্য দাদাজীর গম্ভীর স্বর আমার কর্ণকুহরে শব্দিত হইতেছে, দাদাজী কি প্রবঞ্চনা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন?

পুনরায় সেই গোস্বামী সেইরূপ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—কানাইদেব প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে। পথিমধ্যে যদি আমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া নিরস্ত হই, সে কি দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা, না আমাদের ভীরুতা?

"ভীরুতা" শব্দ উচ্চারণ মাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদিগের কোষে অসি ঝন্-ঝনা শব্দ করিল।

গোস্বামী পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—রাজন্! গোস্বামীর বাচালতা ক্ষমা করুন। যদি অন্যায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি ক্ষমা করুন। কিন্তু মদীয় উপদেশ সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়রাজ, আপন বীরহৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুন। যিনি জায়গীরদারের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পর্ব্বতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন, সে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিবেন? বালসূর্য্যের ন্যায় যে হিন্দুরাজ্যের জ্যোতিঃ চারিদিকে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিস্তৃত হইতেছে, সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত যাইবে? রাজন্! হিন্দু গৌরব-লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন? আমি ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্র, আমার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।

সভাস্থ সকলে নীরব, শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল!

অল্পক্ষণ পরে শিবজী গোস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—গোস্বামিন্! আপনার সহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে, আপনি দেব কি মনুষ্য জানি না, কিন্তু দৈববাণী হইতেও আপনার কথা হৃদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু সেনাপতির

তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ম রণ-কৌশল, অসংখ্য রাজপুতসেনা, তাহার সহিত যুদ্ধ করে এরূপ সৈন্য আমাদের কোথায়?

সীতাপতি। রাজপুতগণ বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করেন না। জয়সিংহ রণপণ্ডিত, কিন্তু শিবজীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই পরাজয় হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ তুচ্ছ করিয়া, দৈবকে সংহার করিয়া, কার্য্য সাধন করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই যে আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে এমন দেবতা নাই যিনি আপনার সহায়তা না করিবেন!

শিবজী। মানিলাম, কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া রুধির-স্রোতে দেশ প্লাবিত করিবে, সে কি মঙ্গল, সে কি পুণ্যকর্ম্ম?

সীতাপতি। সে পাপে কে পাতকী? যিনি স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করেন, তিনি, না যিনি মুসলমানদিগের অর্থভুক্ হইয়া স্বজাতির বৈরাচরণ করেন, তিনি?

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন, প্রায় একদণ্ড কাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভীষণ চিন্তা-লহরীতে আলোড়িত হইতেছিল, কে বলিবে? একদণ্ড কাল পর ধীরে ধীরে মস্তক উঠাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সীতাপতি! অদ্য জানিলাম মহারাষ্ট্রদেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এখনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধের দিনে আপনা অপেক্ষা বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছি না, স্বধর্ম্মনাশ আশঙ্কা করিতেছি না, অন্য একটী কারণে আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ করুন।

যে মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াছি তাহা সাধনার্থ অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি। ম্লেচ্ছগণ সন্ধিবাক্য রাখে নাই, আমিও তাহাদিগের সহিত সন্ধি রাখি নাই।

অদ্য হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন স্বরূপ, হিন্দু প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ সত্যনিষ্ঠ জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি, শিবজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপারগ। মহানুভব রাজপুতের সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, শিবজী জীবন থাকিতে তাহা লঙ্ঘন করিবে না।

ধর্ম্মাত্মা একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্ঘনে হইবে।' সে কথা অদ্যাপি আমি বিস্মৃত হই নাই, সে কথা অদ্য বিস্মরণ হইবে না।

সীতাপতি! চতুর আরংজীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী দুর্ব্বল হস্তে খড়্গ ধরিবে না। কিন্তু সত্যপরায়ণ জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারগ।"

সভাসদ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর অন্নজী বলিলেন,—মহারাজ! আর একটী কথা আছে—আপনি কি দিল্লী যাওয়া স্থির করিয়াছেন?

শিবজী। সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাক্য দান করিয়াছি।

অন্নজী। মহারাজ! আরংজীবের চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবেন? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না?

শিবজী। অন্নজী! জয়সিংহ স্বয়ং বাক্যদান করিয়াছেন যে দিল্লীগমনে আমার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না।

অন্নজী। কপটাচারী আরংজীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন?

শিবজী। সন্ধি লঙ্ঘনের ফল আরংজীব অবশ্যই ভোগ করিবেন। দত্তজী! মহারাষ্ট্র-ভূমি বীরপ্রসবিনী, আরংজীব এরূপ আচরণ করিলে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবে সাগরের জলে তাহা নিবারিত হইবে না, আরংজীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে! পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে।

শিবজীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিষেধ করিলেন না। ক্ষণেক পর শিবজী বলিলেন,—পেশোয়াজী মুরেশ্বর! আবাজী স্বর্ণদেব! অন্নজী দত্ত! আপনাদিগের ন্যায় প্রকৃত বন্ধু আমার অতি বিরল, আপনাদিগের ন্যায় কার্য্যক্ষম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্রদেশে বিরল। আমার অবর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রদেশ আপনারা তিনজনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের ন্যায় সকলে পালন করিবে, এরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।

মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মালশ্রী তখন বলিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! আমার একটী আবেদন আছে। বাল্যকাল হইতে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অনুমতি করুন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।

সজল নয়নে শিবজী বলিলেন,—মালশ্রী! তোমার নিকট আমার অদেয় কিছুই নাই, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

সীতাপতি ক্ষণেক পর বলিলেন,—রাজন্! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমাকে ব্রতসাধনার্থ বহু তীর্থে যাইতে হইবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।

শিবজী। নবীন গোস্বামিন্! কুশলে তীর্থযাত্রা করুন। যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিব, আপনা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আমি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনার মত অল্প বয়সেই এরূপ তেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।

পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—কেবল আর একজনকে দেখিয়াছিলাম!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : চাঁদ কবির গীত

চলেছে চাহিয়া দেখ,
যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।

*　　　*　　　*

জন্মিবে পুরুষগণ
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দের বসন্তকালে পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে, শিবজী চিন্তিত মনে এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই? এইরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মহৎ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডল ও ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত, বিপদকালে ও যুদ্ধকালে কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাঙ্কিত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার তেজস্বী উগ্রস্বভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন! রঘুনাথ পন্থ ন্যায়শাস্ত্রী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পর শিবজী মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ন্যায়শাস্ত্রী, আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন?

ন্যায়শাস্ত্রী। বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।

শিবজী। দূরে ঐ বহুবিস্তীর্ণ প্রাচীরের ন্যায় কি দেখা যাইতেছে বলিতে পারেন? আপনি অনন্যমনা হইয়া ঐদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্য?

ন্যায়শাস্ত্রী। মহারাজ! দিল্লীর শেষ হিন্দু-রাজা পৃথুরায়ের দুর্গপ্রাচীর দেখা যাইতেছে।

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ! এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল! এই স্থানে দিল্লীর শেষ হিন্দু-রাজা রাজ্যশাসন করিতেন? ন্যায়শাস্ত্রী, স্বপ্নের ন্যায় সেদিন-গত হইয়াছে! দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্র-কুসুম বসন্তে আবার দেখা যায়। আমাদের গৌরবদিন কি আর দেখা দিবে না?

ন্যায়শাস্ত্রী। ভগবানের প্রসাদে সকলই হইতে পারে। ভগবান করুন, আপনার বাহুবলে যেন আমরা পুনরায় গৌরবলাভ করিতে পারি।

শিবজী। ন্যায়শাস্ত্রী! বাল্যকালে কঙ্কণপ্রদেশের কথকদিগের যে কথা শুনিতাম, চাঁদ কবির যে গীত শুনিতাম, তাহা কি আপনার মনে পড়ে? ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ ও বহু জনাকীর্ণ ছিল, পতাকা ও তোরণ-শোভিত একটী বিস্তীর্ণ নগর ছিল। রাজসভায় যোদ্ধৃবর্গ-বেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন, বাহিরে যতদূর দেখা যায়, পথে, ঘাটে, বাটীতে, প্রাঙ্গণে ও নদীতীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে! বহু বিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে, উদ্যানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরোবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদ-সম্মুখে সেনাগণ সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বাদ্যকর সানন্দে বাদ্য করিতেছে। প্রভাতের সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে মহম্মদ ঘোরীর দূত রাজসভায় প্রবেশ করিল। সে কথা কি আপনার মনে পড়ে?

ন্যায়শাস্ত্রী। রাজন্! চাঁদ কবির কথা মনে আছে, কিন্তু আপনি আর একবার সে কথা বলুন। আপনার মুখে সে কথা বড় মিষ্ট লাগিতেছে।

শিবজী। মুসলমান-দূত পৃথুরায়কে বলিল,—মহারাজ! মহম্মদ ঘোরী আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশমাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন; তাহাতে আপনার কি মত?

মহানুভব পৃথুরায় উত্তর করিলেন,—যবে সূর্য্যদেব আকাশে অন্য একটী সূর্য্যকে স্থান দিবেন, পৃথুরায় সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থান দিবেন।

মুসলমান-দূত পুনরায় বলিল,—মহারাজ! আপনার শ্বশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরীর সহিত সন্ধি করিয়াছেন, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন।

পৃথুরায় উত্তর করিলেন,—শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম জানাইবেন ও বলিবেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছি, অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব।

অবিলম্বে চোহান সৈন্য ঐ প্রশস্ত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তিরোরীর যুদ্ধে যবন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখে বায়ু-তাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল, আহত ঘোরী কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল!

রঘুনাথ! সে দিন গিয়াছে, এক্ষণে চাঁদ কবির গীত কে গাইবে, কে শ্রবণ করিবে? তথাপি এস্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে, স্বপ্নের ন্যায় নব নব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না, ভারতের গৌরবের দিন এখনও উদিত হইবে। জগদীশ্বর রুগ্নকে আরোগ্য দান করেন, দুর্ব্বলকে বলবান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারত-সন্তানকে তিনি এখনও উন্নত করিতে পারেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : রামসিংহ

বাপের সদৃশ বীর সমান সমান।
—কাশীরাম দাস।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন, এমত সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল,—মহারাজ! জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অন্য একজন সৈনিকের সহিত সম্রাটের আদেশে মহারাজকে দিল্লীতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন। উভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।

শিবজী। সাদরে লইয়া আইস।

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন,—পিতঃ! আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন?

শিবজী আরংজীবকৃত এই অবমাননায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ক্ষণেক পরেই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত যুবক পিতার ন্যায় তেজস্বী ও বীর, পিতার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী, যুবকের মুখ-মণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লী-প্রবেশে বিপদ আছে কি না, কথাচ্ছলে জানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীর্য্য ও প্রতাপের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন,

সবিস্ময় নয়নে মহারাষ্ট্র-বীরপুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন।

ক্ষণেক পর রামসিংহ কহিলেন,—মহারাজকে পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু পিতার নিকট আপনার যশোবার্ত্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অদ্য আপনার ন্যায় স্বদেশপ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।

শিবজী। আমারও অদ্য পরম সৌভাগ্য। আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজস্থানেও বিরল। দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

রামসিংহ। রাজন্! দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সম্রাট আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন নগর প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন?

শিবজী। প্রবেশ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?

অকপটস্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন,—আমার বিবেচনায় এইক্ষণেই প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম দুঃসহনীয় হইবে।

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকট কোন সংবাদ অবিদিত নাই। আমার পক্ষে দিল্লীপ্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।

উদারচেতা রামসিংহ শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—ক্ষমা করুন, আমি আপনার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি আপনার অবস্থায় হইলে চিরকাল পর্ব্বতে বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি অজ্ঞমাত্র, পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার পরামর্শ কখনও ব্যর্থ হয় না।

শিবজী বুঝিলেন, দিল্লীতে তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে, রামসিংহ তাহা জানেন না। তখন পুনরায় বলিলেন,—হাঁ, আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন, আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্যদান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় অবগত আছেন।

রামসিংহ। আছি, দিল্লী আগমনে আপনার কোন বিপদ হইবে না, কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাক্যদান করিয়াছেন, তিনি আমাকেও আদেশ করিয়াছেন।

শিব। তাহাতে আপনার মত কি?

রাম। পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়, রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন হয় না। পিতার বাক্য যাহাতে লঙ্ঘন না হয়, আপনি নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারেন, সে বিষয়ে দাসের যত্নের কোনও ত্রুটি হইবে না।

শিবজীর মন নিরুদ্বেগ হইল। আর সন্দেহ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব। বিলম্ব করিলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, চলুন এইক্ষণেই দিল্লী প্রবেশ করি।

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট আপনাদিগের রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সম্রাটদিগের মসজীদ, প্রাসাদ ও সমাধিমন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট সেই স্থানে দৃষ্ট হয়, জগদ্বিখ্যাত কুতুব মিনার এই স্থানে নির্ম্মিত। কালক্রমে নূতন নূতন সম্রাট আরও উত্তরে নূতন নূতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল। শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ, কত মসজীদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন তাহা গণনা করিতে পারিলেন না। রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ হয়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পথিমধ্যে লোদীবংশীয় সম্রাটদিগের প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক রাজার কবরের উপর এক একটী গম্বুজ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। আফগানদিগের গৌরব-সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন এই স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর হুমায়ুনের প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির। তাহার পরে "চৌষট্ খম্বা", অর্থাৎ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত চতুঃষষ্টিস্তম্ভযুক্ত প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা! তাহার পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান। পৃথুরায়ের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এক একটী প্রাসাদ ও অট্টালিকা সেই ইতিহাসের এক একটী পত্র, এক একটী গোরস্থান এক একটী অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাস-লেখক, নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকট আসিলে রামসিংহ সগর্ব্বে একটী মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,—রাজন্! এই যে মন্দির দেখিতেছেন, পিতা জ্যোতিষগণনার্থ ঐ মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহুদেশের পণ্ডিতেরা ঐ মন্দিরে আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।

শিবজী। আপনার পিতা যেরূপ বীর সেইরূপ বিজ্ঞ, জগতে এইরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন লোক অতি বিরল। শুনিয়াছি পুণ্য কাশীধামেও তিনি ঐরূপ মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর ঈষৎ হৃৎকম্প হইল, তিনি অশ্ব থামাইলেন। একবার পশ্চাদ্দিকে চাহিলেন, একবার মনে চিন্তার উদয় হইল যে এখনও স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারি। তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মপরায়ণ জয়সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন, নিজ কোষে "ভবানী" নামক অসির দিকে দর্শন করিয়া দিল্লীদ্বার প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্ত্তে বন্দী হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ : দিল্লীনগরী

ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক।

* * *

দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফলফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতী;
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে।

—মধুসূদন দত্ত।

দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকার্য্য সাধনার্থ সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অদ্য শিবজী দরিদ্র মহারাষ্ট্রদেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আসিয়াছেন, মোগলদিগের ক্ষমতা, সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লী নগরী উৎসবের দিনে কুলললনার ন্যায় অপূর্ব্ববেশ ধারণ করিয়াছে!

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে, বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য রাশি করিয়া রাখিয়াছে, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব্ব খাদ্যসামগ্রী ও অপর্য্যাপ্ত গৃহানুকরণ দ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের উপর নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদ গৃহস্থেরা বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র

যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব, রাজা, মন্সবদার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে। অশ্বারোহিগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুণ্ড নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে; শিবিকাবাহকগণ হুহুঙ্কার শব্দে যেন আরোহীর পদমর্য্যাদা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে! শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়!

যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটি শ্বেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন,—ঐ দেখুন জুম্মা মসজীদ! সম্রাট শাজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি ওরূপ মসজীদ জগতে আর নাই।

শিবজী বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত মসজীদের প্রাচীর বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে!

এই অপরূপ মসজীদের সম্মুখেই রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য। সেই স্থানের ন্যায় সমারোহপূর্ণ আর একটী স্থানও ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কিনা সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর শত শত নিশান বায়ুবেগে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে। দুর্গদ্বারে একজন প্রধান মন্সবদারের প্রশস্ত শিবির, মন্সবদার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। দুর্গের বাহিরে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের কিরীচশ্রেণী সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, প্রত্যেক কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের নিশান বায়ুমার্গে উড়িতেছে। দুর্গ সম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গ-প্রাচীর হইতে মসজীদ-প্রাচীর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ শব্দপূর্ণ ও লোকপূর্ণ! অশ্বারোহী, গজারোহী ও শিবিকারোহী, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষগণ, বহুলোকে সমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্ব্বদাই দুর্গদ্বারের ভিতর যাইতেছেন ও বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-শোভায় নয়ন ঝলসিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে। সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে দুর্গের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে, ও রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবার্ত্তা জগৎ সংসারে প্রচার করিতেছে। বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে অনেকক্ষণ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবশেষে শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখিলেন তাহাতে আরও বিস্মিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ "কারখানায়" অসংখ্য শিল্পকারগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে;—অপূর্ব্ব সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র, মলমল, মসলিন বা ছিট; বহুমূল্য গালিচা, চন্দ্রাতপ, তাম্বু বা পর্দ্দা; সুন্দর পরিধেয় উষ্ণীষ, শাল বা গাত্রাবরণ; অপরূপ সুবর্ণ মণিমাণিক্যের বেগম-পরিধেয় অলঙ্কার; সুন্দর চিত্র; সুন্দর কারুকার্য্য, সুন্দর শ্বেত-প্রস্তরের গৃহানুকরণ দ্রব্য; রাশি রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনা দ্রব্য;—কত বর্ণনা করিব! ভারতবর্ষে [illegible] অপূর্ব্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আদেশে তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। সম্রাট রাজকার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাসপ্রিয়া বেগমগণ যতরূপ অপূর্ব্ব দ্রব্য আদেশ করিতেন, প্রাসাদবাসীদিগের যত প্রকার সামগ্রী প্রয়োজন হইত, তৎসমস্তই এই স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া "দেওয়ান আম" নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট সচরাচর এই স্থানে সভার অধিবেশন করিতেন, কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার জন্যই সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং জগতে অতুল্য "দেওয়ান খাস" নামক প্রাসাদে সভা অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন, প্রাসাদের ভিতর রত্ন-মাণিক্য-বিনির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মি-প্রতিঘাতী ময়ূর সিংহাসনের উপর সম্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন, সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্য-বিনির্ম্মিত রেল, রেলের বাহিরে

ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মন্সবদার, ওমরাহ ও সেনাপতিগণ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রামসিংহ শিবজীর পরিচয় দান করিয়া রাজ-সদনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অদ্য দিল্লীনগরীর অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য অনুমান করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর যুদ্ধ করিয়া আপনার ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সম্প্রতি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, যিনি মহারাষ্ট্র দেশ হইতে সম্রাটকে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সম্রাট তাঁহাকে কিরূপে আহ্বান করিলেন? শিবজী অদ্য একজন সামান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় নম্রভাবে রাজসদনে দণ্ডায়মান! শিবজীর ধমনীতে উষ্ণ শোণিত বহিতে লাগিল, কিন্তু এক্ষণে তিনি নিরুপায়! সামান্য রাজকর্ম্মচারীর ন্যায় সম্রাটকে "তসলীম" করিয়া রীতিমত "নজর" দান করিলেন। আরংজীবের দূর উদ্দেশ্য সাধন হইল,—জগৎসংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, ক্ষীণের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূর্খতা!

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আরংজীব "নজর" গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ সমাদর না করিয়া শিবজীকে "পাঁচ হাজারী" অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদিগের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন,—শিবজী পাঁচ হাজারী? সম্রাট যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন, শিবজীর অধীনে কত জন পাঁচ হাজারী আছে। দেখিবেন, তাহারা দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না!

আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন হইলে সভা ভঙ্গ হইল। সম্রাট গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত বেগম মহলে যাইলেন। তখন নদীর স্রোতের ন্যায় দুর্গ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। যে যাহার আবাস স্থানে যাইল. সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ দিল্লীনগরে অচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটী বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রোষে, অভিমানে, সন্ধ্যার সময় শিবজী সেই বাটীতে আসিলেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল যে অদ্য সম্রাটের সম্মুখে শিবজী রুষ্ট হইয়া যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সম্রাট তাহা শুনিয়াছেন। সম্রাট শিবজীকে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। ব্যাধে যেরূপ সিংহকে ধরিবার জন্য জাল পাতে, ক্রূর দুষ্টবুদ্ধি আরংজীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন! শিবজী মনে মনে ভাবিলেন,—এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব? হা সীতাপতি গোস্বামিন্! চিরযুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়াছিলে, তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে। আরংজীব! সাবধান! শিবজী এ পর্য্যন্ত তোমার নিকট সত্য পালন করিয়াছে, তাহার সহিত চতুরতা করিও না, কেননা শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু নহেন। যদি কর ভবানী সাক্ষী থাকুন, মহারাষ্ট্র দেশে যে সমরানল প্রজ্বলিত করিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : নিশীথে আগন্তুক

কে তুমি—
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ?

—মধুসূদন দত্ত

কয়েকদিনের মধ্যে শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য! শিবজী সম্রাটের এই কপটাচরণে যৎপরোনাস্তি

রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থ ন্যায়শাস্ত্রী সর্ব্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন। অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে প্রথমে দেশপ্রত্যাগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়, অনুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

ন্যায়শাস্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর ও বাকপটুতায় অগ্রগণ্য, তিনি শিবজীর আবেদন রাজসদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। আবেদনপত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল। শিবজী মোগল-সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে কার্য্য-সাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অঙ্গীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে,—আমি যে কার্য্যসাধন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ-রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে যতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট আমার সহায়তা গ্রহণ না করেন, অনুমতি দিলে আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি, কেন না, হিন্দুস্থানের জলবায়ু আমার পক্ষে, আমার সঙ্গিগণ ও আমার সৈন্যগণের পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।

রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদনপত্র সম্রাট সদনে উপস্থিত করিলেন। সম্রাট উত্তর পাঠাইলেন, সে উত্তরে নানা কথা লিখা আছে, কিন্তু শিবজীর প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি নাই। শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পর একদিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্য্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে! কখন কখন দুই একজন শ্বেতাঙ্গ মোগল সদর্পে চলিয়া যাইতেছে, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এবং দুই একজন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে। পারশ্য আরব, তাতার ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক বা মুসাফের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে. মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি, রাজা বা মন্সবদার বহুলোক সমন্বিত হইয়া মহা সমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছে। সৈনিক পুরুষগণ হাস্যকৌতুক করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিতেছে, বিক্রেতৃগণ আপন আপন পণ্যদ্রব্য মস্তকে লইয়া চীৎকার করিয়া যাইতেছে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সহস্র লোক সহস্র কার্য্যে জলের স্রোতের ন্যায় যাতায়াত করিতেছে।

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত কলরব ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল, দুই একটী বাটীর গবাক্ষ-ভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল, দূরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটী তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমচ্ছটা আর নাই। শিবজী পূর্ব্বদিকে চাহিলেন, দেখিলেন, শান্ত বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রবাহিণী যমুনানদী সায়ংকালের নিস্তব্ধতায় অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে!

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জুম্মা মসজীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উত্থিত হইল, যেন সে গম্ভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! শিবজী মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূর-উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মসজীদের শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত গম্বুজগুলি সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল প্রাসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত নগরী অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিস্তব্ধতায় স্তব্ধ।

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না, কেন না অদ্য পূর্ব্ব-

কথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। বাল্যকালের সুহৃদ্বর্গ, বাল্যকালের আশা ভরসা ও উদ্যম, সাহসী ও উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্যসুহৃদ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী! সেই বীরমাতা শিশু শিবজীকে মহারাষ্ট্রের জয়ের কথা বলিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা বালক শিবজীকে বীরকার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা শিবজীকে বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন!

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, উন্নত কার্য্যপরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, দেশ-বিজয়, বিপদের পর বিপদ, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব্ব জয়লাভ, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ! শিবজী বিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, প্রতিবৎসরই অপূর্ব্ব বিজয়ে বা অসম সাহসী কার্য্যে অঙ্কিত ও সমুজ্জ্বল!

সে কার্য্যপরম্পরা কি ব্যর্থ? সে আশা কি মায়াবিনী? না, এখনও ভবিষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তীর মস্তকের উপর রাজচ্ছত্র উন্নত হইবে?

শিবজী এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে এক প্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল, রাজপ্রাসাদের নাগরাখানা হইতে সে শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর পরিব্যাপ্ত হইল, নৈশ নিস্তব্ধতার গম্ভীর শব্দ বহুদূরে পর্য্যন্ত শ্রুত হইল। আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটী দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আকাশপটে যেন একটী দীর্ঘ নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি।

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষ-ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রূযুগলের উপর হইতে নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ন নয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাজুট, শরীরে বিভূতি, হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা কোন প্রকার অস্ত্র নাই। তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট-প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ন নয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতরও শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন,—মহারাজের জয় হউক!

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল, বিপদের সময় এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামীকে প্রণাম ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটী দীপ জ্বালিলেন, পরে ঔৎসুক্য সহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বন্ধুপ্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এত দূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন? অদ্য নিশীথে গবাক্ষদ্বার দিয়া আমার নিকট আসিবারই বা অর্থ কি?

সীতাপতি। মহারাজ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল। আপনি যে সচিব-প্রবরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেননা আপনি রায়গড় পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার ব্রতসাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে হয়, সেই প্রয়োজনেই মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি, নিশাই কি?

শিবজী। তথাপি কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয়া নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ প্রকাশ করিয়া বলুন।

সীতাপতি। নিবেদন করিতেছি। কিন্তু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন?

শিবজী। শারীরিক কুশলে আছি, শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায়?

সীতাপতি। প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধি আছে, আপনার শত্রু কোথায়?

শিবজী। সর্পের সহিত ভেকের সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী? সীতাপতি! আপনি অবশ্যই

সমস্ত অবগত আছেন, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার পরামর্শ শুনিতাম, তাহা হইলে কঙ্কণদেশের পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে অদ্যাপি স্বাধীন থাকিতে পারিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া দিল্লী নগরে বন্দী হইতাম না।

সীতাপতি। প্রভু, আত্মতিরস্কার করিবেন না, মনুষ্যমাত্রই ভ্রান্তির অধীন, এজগৎ ভ্রম-পরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষ মাত্র নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সদাচরণ প্রদর্শন করিয়া এ স্থানে আসিয়াছেন, যিনি সদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহাকেই দণ্ড দিবেন। প্রভু! খলতার জয় নাই, অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিয়াছেন, সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন। মহারাজ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্র দেশে সে কথা এখনও কেহ বিস্মৃত হয় নাই; আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন, তবে মহারাষ্ট্র দেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে!

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন,—সীতাপতি! সে ভরসা এখনও লোপ পায় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন মহারাষ্ট্র জীবন লোপ পায় নাই! কিন্তু হায়! যে সময় আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্যেরা মোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দীস্বরূপ থাকিব?

সীতাপতি। যবে গগনসঞ্চারি-বায়ুকে আরংজীব জালমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন আপনাকে দিল্লীর প্রাচীরমধ্যে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—তবে বোধ করি আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন!

সীতাপতি। প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এরূপ সম্ভাবনা নাই।

শিবজী। সে উপায় কি?

সীতাপতি। অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্ব্বদিকে একস্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয় বীরের অসাধ্য নহে। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে আটজন মাল্লা আছে, নিমেষমধ্যে মথুরায় পৌঁছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছেন, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।

শিবজী। আমি আপনার উদ্যোগে তুষ্ট হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু, তাহার আর একটী নিদর্শন পাইলাম। কিন্তু প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় যদি কেহ আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে পলায়ন দুঃসাধ্য, আরংজীবের হস্তে মৃত্যু নিশ্চয়!

সীতাপতি। প্রাচীরের যে স্থানে লৌহশলাকা দেওয়া আছে, তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশজন তীরন্দাজ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

শিবজী। ভাল, নৌকায় গমনকালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ-প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?

সীতাপতি। অষ্টজন ছদ্মবেশী নৌকা-বাহক আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তূণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

শিবজী। মথুরা পৌঁছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?

সীতাপতি। আপনার পেশওয়ার ভগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চিরপরিচিত ও বিশ্বস্ত তাহা আপনি জানেন। আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন।

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সীতাপতি, শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—আপনি পাঠ করিয়া শুনান।

সীতাপতি লজ্জিত হইলেন, তাঁহার তখন স্মরণ হইল যে শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না, কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই!

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন, পত্রে বিস্তৃত লিখা আছে।

শিবজী বলিলেন,—গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগ-যজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে কখনই বোধ হয় না, শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনা অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না! কিন্তু এখনও একটী কথা আছে। আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থ ও প্রিয়সুহৃদ তন্নজী মালশ্রী কোথায় থাকিবে? আমার বিশ্বস্ত সৈন্যগণই বা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?

সীতাপতি। আপনার পুত্র, প্রিয়সুহৃদ ও মন্ত্রিবর আপনার সহিত অদ্য রজনীতেই যাইতে পারে। আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই, আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।

শিবজী। সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না; তিনি ভ্রাতাদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

সীতাপতি। যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাষ্ট্রসেনা আপনার নিরাপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণবিসর্জ্জন না করিবে?

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন, পরে মহানুভব ধীরে ধীরে বলিলেন,—গোস্বামিন! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্‌যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাধিত রহিলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না, এরূপ ভীরুতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন।

সীতাপতি। অন্য উপায় নাই।

শিবজী। তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে শিবজী কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।

সীতাপতি। সময় নাই! অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন, নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ!

শিবজী। আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন জানি না, কিন্তু আপনার কথা যদি যথার্থই হয়, তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই। শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।

সীতাপতি। প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আরংজীবকে শাস্তিদান করুন। সেই দূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন। অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে।

শিবজী। সীতাপতি! যিনি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।

সীতাপতি। প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন, কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না, কল্য আপনি বন্দী!

শিবজী। তাহাই হউক। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর এ প্রতিজ্ঞা অবিচলিত।

সীতাপতি নীরব হইয়া রহিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার নয়নে জলবিন্দু।

তখন সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—গোস্বামিন্! দোষ গ্রহণ করিবেন না, আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না। রায়গড়ে আপনার বীরপরামর্শ ও দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্‌যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে! আপনি আমার সহিত অবস্থান করুন, আপনার পরামর্শে শীঘ্র সকলেরই উদ্ধার সাধন করিব।

সীতাপতি। প্রভু! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম, জগদীশ্বর জানেন

আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলাষ নাই। কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রতসাধনের জন্য নানা স্থানে নানা কার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।

শিবজী। এ কি অসাধারণ ব্রত জানি না, সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন?

সীতাপতি। সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটী অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ।

শিবজী। ভাল, এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন,—আমার ললাটে একটী অমঙ্গল লিখিত আছে, আমার ইষ্টদেবতা, যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছি, বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আমার উপর বিমুখ। সেই অমঙ্গল খণ্ডনার্থ ব্রত ধারণ করিয়াছি।

শিবজী। এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেই বা আপনাকে অমঙ্গল খণ্ডনার্থ এ বিষম ব্রত ধারণ করিতে বলিল?

সীতাপতি। কার্য্যবশতঃ আমি স্বয়ংই এটী জানিতে পারিলাম, ঈশানী-মন্দিরে একজন আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, সমস্ত আপনার নিকট নিবেদন করিব, যদি অকৃতার্থ হই, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার পূজার্থ জীবন ধারণ করিতেছি, তিনি বিমুখ হইলে এ জীবনে আবশ্যক কি?

শিবজী। সীতাপতি! যাহা বলিলেন যথার্থ। যাঁহার জন্য প্রাণপণ করি, যাঁহার জন্য আত্মসমর্পণ করি, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।

সীতাপতি। প্রভু! আপনি কি এ যাতনা কখন ভোগ করিয়াছেন?

শিবজী। জগদীশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একজন নির্দ্দোষী বীরপুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি। সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।

সীতাপতি। সে হতভাগার নাম কি?

শিবজী বলিলেন,—রঘুনাথজী হাবিলদার!

ঘরের দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল।

শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সীতাপতি বলিলেন,—দীপ অনাবশ্যক, বলুন, শ্রবণ করিতেছি।

শিবজী। আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই বালকবেশী বীরপুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার, সীতাপতি! আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প। আপনার ন্যায় তাহার বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায়ই দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব ও সাহস সর্ব্বদা বিরাজ করিত! আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি, আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়।

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। সেই বালককে যেদিন প্রথম দেখিলাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম, সেইদিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম, রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্ব্বদা আমার ছায়ার ন্যায় আমার নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুরেখা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইত। এখনও বোধ হয় তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ কেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন আমি দেখিতে পাইতেছি!

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। সেই বালক এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গজয় হইয়াছিল, অনেক যুদ্ধে সে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল!

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য? আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম। শেষ পর্য্যন্তও

রঘুনাথ একটীও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই, যাইবার সময়ও আমার দিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।

শিবজীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন,—তাহাতে আক্ষেপের কারণ কি? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম।

শিবজী। দোষী? রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কুক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম! মহানুভব জয়সিংহ পরে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধপূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেইজন্যই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দ্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণবিনাশ করিয়াছি।

শিবজীর কথা সমাপ্ত হইল, তাঁহার বাকশক্তি রুদ্ধ হইল, তিনি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন,—সীতাপতি!

কোনও উত্তর পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন, দেখিলেন, সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ : আরংজীব

সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমূর্খ।
বল্লে কথা বুঝিস্ নাহি এই বড় দুঃখ॥

—কৃত্তিবাস ওঝা।

পরদিন প্রায় একপ্রহর বেলার সময় শিবজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি জাগরিত হইয়াই রাজপথে একটী গোলযোগ শুনিলেন। উঠিয়া গবাক্ষ দিয়া নিম্নদিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

দেখিলেন বাটীর পশ্চাতে দুই পার্শ্বে ও সম্মুখদ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরিগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিশেষ পরিচয় না পাইলে প্রহরিগণ বাহিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে যাইতে দিতেছে না। দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ হইল,—কল্য শিবজী পলাইতে পারিতেন, অদ্য তিনি আরংজীবের বন্দী!

তখন শিবজী বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জানিলেন যে তিনি সম্রাটের নিকট স্বদেশে যাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল এবং সেই সন্দেহপ্রযুক্ত সম্রাট নগরের কোতোয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন যে শিবজীর বাটীর চতুর্দ্দিকে দিবারাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, সীতাপতি গোস্বামী আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। শিবজী মনে মনে সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটাচারিতা এতদিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। সম্রাট প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর পূর্ব্বক পত্র লিখিয়া দিল্লীতে আহ্বান করিলেন, শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজসভায় অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভায় যাইতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে প্রকৃত বন্দী করিলেন। কোন কোন সর্প গোমহিষাদি ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ক্রমে চুষিতে চুষিতে ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ক্রুর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে ধীরে ধীরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানসচক্ষে অতীত ও বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ়

উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দ্রুত পদবিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন,—আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না, চতুরতায় আপনাকে অদ্বিতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিদ্যায় বালক নহে। এই ঋণ একদিন পরিশোধ করিব, সেদিন দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবজী বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, নিঃশব্দে সম্মুখে উপবেশন করিলেন। শিবজী বলিলেন,—পণ্ডিতপ্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন, এই খেলা আমাদেরও খেলিতে হইবে, আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলায় অপরিপক্ক নহে। অদ্য আমরা বন্দী হইব, আমি কল্য রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম! কিন্তু অনুচরবর্গকে পূর্ব্বে পরিত্রাণ না করিয়া আমার আত্মপরিত্রাণের ইচ্ছা নাই, সেই বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?

ন্যায়শাস্ত্রী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আপনার অনুচরদিগের স্বদেশগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করুন। এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, আপনার অনুচরসংখ্যা যত হ্রাস হয় তাহাতে সম্রাট আহ্লাদিত ভিন্ন দুঃখিত হইবেন না। আমি বিবেচনা করি, অনুমতি চাহিলেই পাইবেন।

শিবজী। মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয় ধূর্ত্ত আরংজীব এ বিষয়ে আপত্তি করিবে না।

সেই মর্ম্মে একখানি আবেদনপত্র প্রস্তুত হইল। শিবজী যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল, শিবজীর অনুচর সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সম্রাট আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগের যাইবার জন্য এক একখানি অনুমতিপত্র দান করিলেন। শিবজী কয়েকদিন মধ্যে সেই সমস্ত অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—মূর্খ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে? এখন একজন অনুচরের বেশ ধরিয়া ইহার মধ্যে একখানি অনুমতিপত্র লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলে কি করিতে পার? যাহা হউক, অনুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাউক, শিবজী আপনার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম।

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধি-কৌশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া, দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয় পূর্ব্বক সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহাসঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অসামান্য চতুরতা দ্বারা মহাবীর সুচতুর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল একবার সেই কপটাচারী অদূরদর্শী আরংজীবের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি।

রাজকার্য্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব "গোসলখানা" নামক একটী ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটী মন্ত্রীদিগের সহিত গুপ্ত পরামর্শের স্থল, কিন্তু অদ্য আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। কখন তাঁহার ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নয়নে রোষ বা অভিমান বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণাসফলতা-জনিত সন্তোষে তাঁহার ওষ্ঠ-প্রান্ত হাস্যরেখায় অঙ্কিত হইতেছে। সম্রাট কি করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন, সেই কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দুধর্ম্মের আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আরও পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী করিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইতেছেন? জানি না সম্রাটের কি চিন্তা, তাঁহার সভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও মন্ত্রীকে সন্দিগ্ধমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না, মনের ভাব বলিতেন না। নিজের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে সকলকে পুত্তলিকার ন্যায় চালাইবেন, সমগ্র দেশ সুন্দর শাসন করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বাসুকি যেরূপ নিজের মস্তকে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, বিশ্রাম চাহেন না, কাহারও সহায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসাধারণ মানসিক বলে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য একাকী বহন করিবার মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহিতেছেন না।

অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন, এরূপ সময় একজন সৈনিক তসলীম করিয়া বলিল,—

সম্রাটের জয় হউক! জাহাঁপনা! দানেশমন্দ্‌ নামক আপনার সভাসদ আপনার সাক্ষাৎ-অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। সম্রাট দানেশমন্দ্‌কে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, চিন্তা-রেখাগুলি ললাট হইতে অপসৃত করিলেন, মুখে সুন্দর হাস্য ধারণ করিলেন।

দানেশমন্দ্‌ আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন না, রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস করিতেন না, তবে তিনি পারস্য ও আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং সম্রাট তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন, কখন কখন কোন কোন কথায় বাক্যচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা দানেশমন্দ্‌ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন, এমন কি আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারা যখন বন্দী হয়েন, দানেশমন্দ্‌ তাঁহার প্রাণরক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবম্বিধ পরামর্শ, কুটিল আরংজীবের মনোগত হইত না; আরংজীব তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শী বলিয়া মনে করিতেন, তথাপি তাঁহার বিদ্যা, ধন ও পদমর্য্যাদার জন্য সম্যক আদর করিতেন। সরলস্বভাব বৃদ্ধ দানেশমন্দ্‌ সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

দানেশমন্দ্‌। এ সময়ে জাহাঁপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা দাসের ধৃষ্টতা, কেননা এ সময় সম্রাট রাজকার্য্যের পর বিশ্রাম করেন। তবে যে আসিয়াছি, কেবল আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত। পারস্যকবি সুন্দর লিখিয়াছেন, 'সূর্য্যের দিকে জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া দেখে, সূর্য্য কি তাহাতে বিরক্ত বা কিরণদানে বিরত হয়েন'?

সম্রাট সহাস্যবদনে বলিলেন,—দানেশমন্দ্‌! অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক, আপনি সর্ব্বসময়েই সমাদরের পাত্র।

ক্ষণেক এইরূপ মিষ্টালাপ হইলে পর দানেশমন্দ্‌ অন্য কথা আনিলেন; বলিলেন,—জাহাঁপনা! "আলমগীর" নাম সার্থক করিবেন! সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।

ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন,—কেন, সে বিষয়ে আমার কি উদ্যোগ দেখিলেন?

দানেশমন্দ্‌। দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু আপনার পদতলে।

আরংজীব। শিবজীর কথা বলিতেছেন? হাঁ, ইন্দুর কলে পড়িয়াছে।

তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রণা গোপনার্থে বলিলেন,—দানেশমন্দ্‌! আপনি আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই সম্মান করা আমার উদ্দেশ্য। শিবজী ধূর্ত্ত ও বিদ্রোহী হউক, যোদ্ধা বটে, তাহাকে সম্মানার্থই দিল্লীতে আনিয়াছিলাম। রাজসভায় সমুচিত সম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ মূর্খ যে রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং অন্য শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায় আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি যে দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক সন্ন্যাসী ও বিদ্রোহীর সহিত পরামর্শ করে, সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে না পারে এই জন্যই কোতোয়ালকে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছি। কয়েকদিন পর সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিব।

দানেশমন্দ্‌। সম্রাটের এ আদেশ শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

আরংজীব। কেন?

উদারচেতা দানেশমন্দ্‌ বলিলেন,—সম্রাটকে পরামর্শ দিই আমার কি সাধ্য, কিন্তু জাহাঁপনা! যদি শিবজীর প্রতি দয়ালু আচরণ না করিতেন, যদি তাহাকে চিরকালের জন্য বন্দী করিতেন, তাহা হইলে মন্দ লোকে নানারূপ অখ্যাতি করিত, বলিত যে শিবজীকে আহ্বান করিয়া রুদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

আরংজীব ঈষৎ কোপ সঙ্গোপন করিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন, দানেশমন্দ্‌! মন্দলোকের কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে সুবিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়া শিবজীর দোষের জন্য তাহাকে সতর্ক করিয়া দিব, পরে দয়া প্রকাশে তাহাকে সসম্মান বিদায় দিব।

দানেশমন্দ্‌। এরূপ সদাচরণেই জাহাঁপনার প্রপিতামহ আকবরশাহ্‌ দেশ শাসন করিয়াছিলেন, এরূপ সদাচরণে আপনারও খ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

আরংজীব। সে কিরূপ?

দানেশমন্দ্‌। সম্রাটের অগোচর কিছুই নাই। দেখুন, আকবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে

আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রুসঙ্কুল ছিল, রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে, সর্ব্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশূন্য ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে সমস্ত সাম্রাজ্য নিঃশত্রু ও নির্ব্বিরোধ হইয়াছিল, যাহারা পূর্ব্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুতেরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়পতাকা উড্ডীন করে। জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল? কেবল বাহুবলে? কেবল সাহসে? তৈমুরের বংশে কাহারও সাহস বা বাহুবলের অভাব নাই, তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন করিতে পারেন নাই কি জন্য? না, জাহাঁপনা! কেবল সদাচরণেই এরূপ জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি শত্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবম্বিধ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত। মানসিংহ, টোডরমল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগণই মুসলমান সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছিলেন। উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়, অধম কাফেরের প্রতিও সদাচরণ ও বিশ্বাস করিলে তাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়, মানবের এই প্রকৃতি, শাস্ত্রের এই লিখন। আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শিবজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন, জাহাঁপনা! তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ থাকিবেন!

দানেশমন্দ্ কি জন্য সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক বোধ হয় এক্ষণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীশ্বর শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্দী করায় জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ মাত্রই লজ্জিত হইয়াছিলেন। দানেশমন্দ্‌কে সম্রাট সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে কথাচ্ছলে সম্রাটের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শিবজীর প্রতি ভদ্রাচরণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে দেন, দানেশমন্দ্ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। দানেশমন্দ্ জানিতেন না যে হস্ত দ্বারা প্রকান্ড ভূধরকে বিচারিত করা সম্ভব, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরংজীবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বিচালিত করা যায় না।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথাগুলি কুটিল আরংজীবের নিকট অতিশয় নির্ব্বোধের কথার ন্যায় বোধ হইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—হাঁ, দানেশমন্দ্ যেরূপ শাস্ত্রবিশারদ, মানবহৃদয়ও সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শিবজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবে, রাজস্থানে ত বিদ্রোহিগণ স্তম্ভস্থাপন পূর্ব্বেই করিয়াছে। কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব ও বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিব। এই চতুঃস্তম্ভের উপর মোগল-সাম্রাজ্য সুন্দর ও সদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবে!

দানেশমন্দের মুখমন্ডল রক্তবর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—সম্রাটের পিতা দাসকে অনুগ্রহ করিতেন, সম্রাটও যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, সেইজন্য কখন কখন মনের কথা বলি, নচেৎ জাহাঁপনাকে পরামর্শ দিই, এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই।

আরংজীব দানেশমন্দ্‌কে নির্ব্বোধ সরল ব্যক্তি জানিয়াও তাঁহার সেই সরলতার জন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন,—দানেশমন্দ্! আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিও না। আকবরশাহ বুদ্ধিমান ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিয়া তিনি কি ধর্ম্মসঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন? আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের সামান্য দৈনিক কার্য্য সম্পাদনকালেও দেখিতে পাই যে আপনি করিলে যেরূপ হয়, পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য-শাসন-কার্য্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না? নিজ বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ হই, কিজন্য ঘৃণিত কাফেরদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব? আরংজীব বাল্যকালাবধি নিজ অসির উপর নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা দেশ শাসন করিবে, কাহারও সহায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।

দানেশমন্দ্। জাহাঁপনা! স্বহস্তে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ সাম্রাজ্য শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয়? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে কি সর্ব্বসময়ে আপনি বর্ত্তমান থাকিতে পারেন? অন্য কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে?

আরংজীব। অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভৃত্যের ন্যায় থাকিবে, যেন

প্রভু হইতে না চাহে! অদ্য আমি যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব, কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে; অদ্য যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে। এ অবস্থায় ক্ষমতা ও বিশ্বাস অন্যে ন্যস্ত না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্দ্, তুমি যখন অশ্বে আরোহণ কর, অশ্বকে বলগা ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যেদিকে ফিরাও সেই দিকে যাইতে বাধ্য হয়। সম্রাটেরও সেইরূপ শাসন করা উচিত, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না। সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবে, কর্ম্মচারী ও সৈনাপতিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের নিকট কার্য্য গ্রহণ করিবে।

দানেশমন্দ্। প্রভু! মনুষ্য ত অশ্ব নহে, তাহাদিগের মহত্ত্ব আছে, নিজ নিজ সম্মানজ্ঞান আছে।

আরংজীব। মনুষ্য অশ্ব নহে তাহা জানি, সেই জন্যই অশ্বকে বলগা দ্বারা চালাই, মনুষ্যকে উন্নতির আশা ও শাস্তির ভয়ের দ্বারা চালাই। যে উত্তম কার্য্য করিবে তাহাকে পুরস্কার দিব, যে অধম কার্য্য করিবে তাহাকে শাস্তি দিব। পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয়ে সকলে কার্য্য করিবে, ক্ষমতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা আরংজীব নিজ হৃদয়ে ও নিজ বাহুবলে ন্যস্ত রাখিবে।

দানেশমন্দ্। প্রভু! পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয় ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ত অন্য ভাবও আছে। মনুষ্যের মহত্ত্ব আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, নিজ সম্মানজ্ঞান আছে। যে শাস্তিভয়ে কার্য্য করে, সে কোনরূপে কেবল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিরস্ত থাকে, কিন্তু যাহাকে আপনি সম্মান করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার জন্য প্রভুকার্য্যে নিজের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছে. এরূপ উদাহরণও শাস্ত্রে দেখা যায়।

আরংজীব। দানেশমন্দ্! আমি তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ নহি; কবিতায় যাহা লিখে তাহা বিশ্বাস করি না। মানবপ্রকৃতি আমার শাস্ত্র। মানবের মহত্ত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি, শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক দেখিয়াছি, সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজহস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি। সেই জন্য কাফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিব, বিদ্রোহোন্মুখ রাজপুতদিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিঃশত্রু করিব, বিজয়পুর ও গলখন্দ জয় করিব, হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত একাকী শাসন করিব। কাহারও সহায়তা লইব না, আলমগীর নিজের নাম সার্থক করিবে।

উৎসাহে সম্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অদ্য কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দানেশমন্দের উদার চরিত্র জানিতেন, তাঁহার নিকট দুই একটী কথা কহিলে কোনও হানি নাই জানিতেন।

ক্ষণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন,—সরলস্বভাব বন্ধু! অদ্য আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে?

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সেই দিন সরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না!

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন এমন সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল,—রামসিংহ জাহাঁপনার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।

সম্রাট আদেশ করিলেন,—আসিতে দাও।

ক্ষণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহ। সম্রাটকে এরূপ সময়ে সাক্ষাৎ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়, কিন্তু পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।

আরংজীব। আপনার পিতার নিকট হইতে আমরাও অদ্য পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত সংবাদ অবগত আছি।

রামসিংহ। তবে সম্রাট অবগত আছেন যে পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া শত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যের অল্পতাবশতঃ

সে নগর এ পর্য্যন্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ গলখন্দের সুলতান বিজয়পুরের সাহায্যার্থ নেকনামখাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিয়াছেন।

আরংজীব। সমস্ত অবগত হইয়াছি।

রামসিংহ। চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অল্প সংখ্যক সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

আরংজীব। আপনার পিতা বীরাগ্রগণ্য! তিনি নিজের সৈন্যে বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না?

রামসিংহ। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, পিতা তাহা করিবেন। শিবজী পূর্ব্বে পরাস্ত হয়েন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন; বিজয়পুর পূর্ব্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন; এখন আপনার নিকট অল্পমাত্র সৈন্য-সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য শেষ হয়, দক্ষিণ দেশে মোগল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।

এরূপ অবস্থায় অন্য কোন সম্রাট সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশ-বিজয়কার্য্য সাধন করিতেন। আরংজীব আপনাকে বহুদূরদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ করিলেন না। বলিলেন,—রামসিংহ! আপনার পিতা আমাদের সুহৃদপ্রবর, তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম। তাঁহাকে পত্র লিখিবেন যে তিনি নিজের অসাধারণ বাহুবলে জয়সাধন করিবেন, সম্রাট দিবানিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন কিন্তু এখন দিল্লীতে সেনাসংখ্যা অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে অক্ষম।

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন,—জাহাঁপনা! পিতা দিল্লীশ্বরের পুরাতন দাস, আপনার কালে, আপনার পিতার কালে অসংখ্যক যুদ্ধে যুঝিয়াছেন, অনেক কার্য্যসাধন করিয়াছেন, দিল্লীশ্বরের কার্য্যসাধন ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সাহায্য দান না করিলে তিনি বোধ হয় সসৈন্যে নিধন প্রাপ্ত হইবেন।

বালক জানিত না যে তাহার কাতরস্বরে ও অশ্রুজলে আরংজীবের গভীর উদ্দেশ্য, গূঢ়-মন্ত্রণা বিচলিত হয় না!

সে উদ্দেশ্য, সে মন্ত্রণা কি? রাজা জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতাপান্বিত সেনাপতি, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বিস্তীর্ণ যশ, অনন্ত প্রতাপ! আজীবন তিনি নিষ্কলঙ্কে দিল্লীশ্বরের কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোনও সেনাপতির বিধেয় নহে, সম্রাট জয়সিংহকে এতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ যুদ্ধে যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ করিতে না পারিয়া অবমানিত হয়েন, তবে সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। যদি সসৈন্যে বিজয়পুর-সম্মুখে নষ্ট হয়েন, দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের একটী কণ্টকোদ্ধার হইবে। ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় আরংজীবের উদ্দেশ্যগুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অদ্য জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উদ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সেজন্য কি সূক্ষ্ম মন্ত্রণাজাল অদ্য ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচিত্ত পুত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছেন বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী সম্রাট উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন?

দয়া মায়া প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তিসমূহে আরংজীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ হৃদয়েও স্থান দিতেন না। আত্মপথ পরিষ্কারার্থ অদ্য একটী পতঙ্গ সরাইয়া ফেলিলেন, কল্য একজন সহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উভয় কার্য্য একই রূপ ধীর নিরুদ্বেগ হৃদয়ে করিতেন। একদিন পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয়বর্গ সেই উন্নতিপথে পড়িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে মায়াবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা নাই, আপন উদ্দেশ্যসাধনে কোনও প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জীবিত থাকিলে উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে! জল্লাদ! তাঁহাকে সরাইয়া সম্রাট আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও!

মন্ত্রণাসাধনের জন্য অদ্য আবশ্যক যে জয়সিংহ সসৈন্যে হত হইবেন। তিনি ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী, অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, তিনি সসৈন্যে মরিবেন! এই পরিচ্ছেদ-

বিবৃত সময়ের পর কয়েক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ আসিল, অবমানিত, অকৃতার্থ জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! তখনকার ইতিহাস-লেখক কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন, সম্রাটের আদেশে বিষ প্রয়োগে জয়সিংহের মৃত্যু হয়।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন,—প্রভু! আমার একটী যাচ্ঞা আছে।

আরংজীব। নিবেদন করুন।

রামসিংহ। শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্য দান করিয়াছিলেন যে দিল্লীতে শিবজীর কোনও আপদ ঘটিবে না।

আরংজীব। আপনার পিতা সে-কথা আমাদের অবগত করাইয়াছেন।

রামসিংহ। রাজপুতদিগের মধ্যে বাক্য দান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে অতিশয় নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা যে শিবজীর যে কোনও দোষ হইয়া থাকে, প্রভু ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিন।

আরংজীব ক্রোধ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—সম্রাটের যাহা উচিত কার্য্য সম্রাট তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না।

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটী কীট সম্রাটের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়াছেন, দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না!

জয়সিংহের যে দোষ, শিবজীরও সেই দোষ। শিবজীও সন্ধিস্থাপনাবধি প্রাণপণে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছেন, নিজ সৈন্য দ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা। আরংজীব কোনও ভৃত্যের উপর বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারেন না, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না।

যাহাদিগকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহারা ক্রমে অবিশ্বাসের যোগ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা ও রাজপুতেরা দিল্লীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্বালিত করিল, মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ পীড়া

দূরে গেল জটাজুট।
—মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক এক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লী নগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবানিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ, দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহস্থল, অদ্য যেরূপ রোগবৃদ্ধি হইয়াছে কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে শিবজী আর নাই! রাজপথ দিয়া বহুসংখ্যক লোক গমনাগমন করিত ও সেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত। অশ্বারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ ক্ষণেক অশ্ব থামাইয়া প্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। শিবিকারোহী রাজা বা মন্সবদার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এইরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্ব্ব সময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্ব্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল তাহা পূর্ব্বমত রাখিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিন্দা না হইয়াই অনায়াসে কণ্টকোদ্ধার হইবে।

সন্ধ্যাকাল সমাগত, এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান হাকিম শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল,—কি উদ্দেশ্যে শিবজীর সাক্ষাৎ

প্রার্থনা করেন? হাকিম উত্তর করিলেন,—সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি। সসম্মানে প্রহরিগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার ভৃত্য সংবাদ দিল যে সম্রাট একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিষপ্রয়োগের জন্য সম্রাট এ কাণ্ড করিতেছেন। তিনি ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে, আমি হিন্দু, অন্যরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সম্রাটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাইবে।

ভৃত্য এই আদেশ লইয়া ঘর হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই হাকিম অনাহূত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। শিবজীর হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সঙ্গোপন করিয়া তিনি অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে হাকিমের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে, অতি শুক্ল শ্মশ্রু লম্বিত হইয়া উরঃস্থল আবৃত করিয়াছে. মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, হাকিমের স্বর ধীর ও গম্ভীর।

হাকিম বলিলেন.—মহাশয়! ভৃত্যকে আদেশ করিয়াছিলেন. তাহা শুনিয়াছি, আপনি আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না। তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্মসাধন করিব।

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন এ বিপদ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হাকিম। আপনার পীড়া কি?

কাতরস্বরে শিবজী বলিলেন,—জানি না এ কি ভীষণ পীড়া! শরীর সর্ব্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বস্থানে বেদনা।

হাকিম গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসায় শরীর অধিক জ্বলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্লেশসঞ্জাত। আপনার কি সেই পীড়া?

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপরূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন, মুখ সেইরূপ গম্ভীর, কোন ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। শিবজী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন। শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন,—আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ী সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সজোরে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এ সমস্ত কি প্রবঞ্চনা মাত্র?

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূর্ব্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখমণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোনও কপট ভাব লক্ষিত হইল না। শিবজীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিলেন, —আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যান্য চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন। এ মহৎ পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবন নাশ করিতেছে।

হাকিম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আলফ্‌লায়লা ও লায়লুন" নামক আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দ্দেশ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটী বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়ার চিকিৎসার কথা লিখিত আছে। একটীর চিকিৎসা "বকুস্‌তনে আসিরী ইশারাৎ কর্দ্দ।" কয়েদিগণ কাজ না করিবার জন্য যে পীড়ার ভাণ করে, তাহার চিকিৎসা শিরশ্ছেদন। আর একটী পীড়ার নাম "দিগরান দোজখ্‌ এখতিয়ার কুনন্দ।" যুবকগণ এই পীড়ার ভাণ করিয়া নরক-পথগামী হয়, তাহার ঔষধি পাদুকা প্রহার। তৃতীয় এক প্রকার বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, তাহার নাম "আয়েবহা বরগেরেফ্‌তা জেরেবগল।" প্রবঞ্চকগণ নিজ প্রবঞ্চনা গোপনার্থে এই পীড়ার ভাণ করে। তাহারও ঔষধি নির্দ্দেশ আছে, আমি সেই ঔষধি আপনাকে দিতেছি।

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও

চতুর, শিবজীর মনের ভাব বুঝিয়াছেন, তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন। ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে ঔষধ কি?

হাকিম উত্তর করিলেন,—সে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকট বিষও বটে। 'রব্বুল আলমিনা'র নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ যথার্থ হয় অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা হয় অব্যর্থ বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে।

শিবজীর হৃৎকম্প হইল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল! ঔষধিসেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু!

হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিয়া আনিলেন, শিবজী বলিলেন,—মুসলমানের স্পৃষ্ট পানীয় আমি পান করিব না।

শিবজী সজোরে হস্ত-সঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হাকিম কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে বলিলেন,—এরূপ সজোরে হস্ত-সঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে।

শিবজী অনেকক্ষণ অতিকষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। সহসা উঠিয়া বসিলেন,—"রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি"—এই বলিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের শুক্লশ্মশ্রু সজোরে আকর্ষণ করিলেন।

বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই মিথ্যা শ্মশ্রু সমস্ত খসিয়া আসিল, চপেটাঘাতে উষ্ণীষ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহার বাল্যসুহৃদ তন্নজী মালশ্রী খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

তন্নজী অনেকক্ষণ পরে হাস্য সম্বরণ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন,—প্রভু কি সর্ব্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন? তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে! বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে!

শিবজী সহাস্যে বলিলেন,—বন্ধু, ব্যাঘ্রের সহিত খেলা করিলে কখন কখন আহত হইতে হয়। যাহা হউক, তোমাকে দেখিয়া কতদূর আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না, এ কয়দিনই তোমাকে প্রত্যাশা করিতেছিলাম। এখন সংবাদ কি বল।

তন্নজী। প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত করিয়াছি, একে একে নিবেদন করিতেছি। সম্রাট যে অনুমতিপত্র দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আপনার অনুচরবর্গ সকলেই নিরাপদে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।

শিবজী। সে জন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি। এখন আমার মন শান্ত হইল, আমি আপনার পলায়নের জন্য তত ভাবি না। গগনবিহারী পক্ষী সামান্য পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া থাকে না।

তন্নজী। সেই সমস্ত অনুচর দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোস্বামীর বেশ ধরিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছে, মথুরায় অনেক দেবালয়ের পুরোহিতগণও প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও করিয়াছি।

শিবজী। চিরবন্ধু! তুমি যেরূপ কার্য্যদক্ষ অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারিব।

তন্নজী। দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেরূপ একটী তীব্রগতি অশ্ব রাখিতে বলিয়াছিলেন তাহাই রাখিয়াছি। যে দিন স্থির করিবেন সেই দিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে।

শিবজী। ভাল।

তন্নজী। রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। রামসিংহ পিতার ন্যায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা, শুনিয়াছি স্বয়ং সম্রাটের নিকট যাইয়া আপনার জন্য সাশ্রুনয়নে আবেদন করিয়াছিলেন।

শিবজী। সম্রাট কি বলিলেন?

তন্নজী। বলিলেন, সম্রাটের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন।

শিবজী। বিশ্বাসঘাতক! কপটাচারী! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে।

তন্নজী। রামসিংহ সে বিষয়ে নিষ্ফলপ্রযত্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু যুবক সরোষে আমার

নিকট বলিলেন যে রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না। অর্থ দ্বারা, সৈন্য দ্বারা, যেরূপে পারেন, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায় তাহাতে স্বীকৃত আছেন।

শিবজী। পিতার উপযুক্ত পুত্র! কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চাহি না। আমি পলায়নের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি তাহা তুমি তাঁহাকে জানাইয়াছ?

তন্নজী। জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শিবজী। ভাল।

তন্নজী। এতদ্ভিন্ন দানেশমন্দ্ প্রভৃতি যাবতীয় আরংজীবের সভাসদকে মিষ্ট কথায়, বা অর্থদ্বারা আপনার পক্ষবর্ত্তী করিয়াছি। দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান এরূপ বড়লোক কেহ নাই, যিনি আপনার পক্ষবর্ত্তী নহেন। কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন না।

শিবজী। তবে সমস্ত প্রস্তুত! আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারি?

সহাস্যে তন্নজী বলিলেন,—আমার ন্যায় বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি থাকিতে পারে? কিন্তু আপনার পানের জন্য সুন্দর মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন?

শিবজী আর একপাত্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তন্নজী সেই পাত্র লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন, শিবজী তাহা পান করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—চিকিৎসক! আপনার ঔষধ যেরূপ মিষ্ট সেইরূপ ফলদায়ী, আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে!

শিবজীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় উষ্ণীষ ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া তন্নজী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—পীড়া কিরূপ দেখিলেন?

হাকিম উত্তর করিলেন,—পীড়া অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে অনেক উপশম হইয়াছে। বোধ করি অল্পদিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন।

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গেলেন। একজন প্রহরী অন্যকে বলিল,—হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্যে যে পীড়া আরাম করিতে পারিল না, হাকিম একদিনে তাহা আরাম করিলেন কিরূপে?

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল,—হবে না কেন, এ যে রাজবাটীর হাকিম।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ আরোগ্য

এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে॥
হে বীর, কমলচক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার॥

—কাশীরাম দাস।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পর নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে। নগরে পুনরায় ধুমধাম পড়িয়া গেল, সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল। হিন্দুমাত্রেই এ কথা শুনিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিল, মহদাশয় মুসলমানগণ এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে, দোকানে, মসজীদে, সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল। আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল। শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড়লোকের বাটীতে পাঠাইতে লাগিলেন। পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট ভেট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি, প্রতি মসজীদে ও ফকীরগণের সেবার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। সম্রাটের মনে যাহাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই বদান্যতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা

করিতে লাগিলেন। "দিল্লীকা লাড্ডু"র ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তাহাতে আর কেহ পস্তিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি শীঘ্রই পস্তিয়াছিলেন!

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আধার কখন কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ হইত, আট কি দশ জন লোক বহিয়া লইয়া যাইত। কয়েকদিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটী প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল,—এ কাহার বাটীতে যাইবে? বাহকেরা উত্তর করিল,—রাজা জয়সিংহ-সদনে।

প্রহরিগণ। তোমাদের প্রভু আর কত দিন মিষ্টান্ন পাঠাইবেন?

বাহকেরা। অদ্যই শেষ।

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।

কতক পথ যাইয়া বাহকেরা একটী অতি সঙ্গোপন স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুইটী আধার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে। বাহকেরা একটী ইঙ্গিত করিল, একটী আধার হইতে শিবজী, অপরটি হইতে শম্ভুজী বাহির হইলেন। উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরাভিমুখে যাইলেন। সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি রাজপথে দুই একজন লোক যখন নিকট দিয়া যায়, শম্ভুজীর হৃদয় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পিত হইয়া উঠে। শিবজীর চিরজীবন এইরূপ বিপদপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে এ বিপদ কিছু নূতন নহে, তথাপি তাঁহারও হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

উভয়ে কম্পিতহৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন। একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—কে যায়?

শিবজী উত্তর করিলেন,—গোস্বামী। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্!

প্রহরী। কোথায় যাইতেছ?

শিবজী। মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

উভয়ে প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক ধনাঢ্য ও উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন। সে সকল দুই পার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও শম্ভুজী ত্বরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

দূরে একটী বৃক্ষতলে একটী অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেইদিকে যাইলেন, দেখিলেন, তন্নজী-বর্ণিত অশ্বই বটে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভাই অশ্বরক্ষক! তোমার নাম কি?

রক্ষক। জানকীনাথ।

শিবজী। কোথায় যাইবে?

রক্ষক। মথুরা।

শিবজী বলিলেন,—হাঁ, এই অশ্ব বটে।

শিবজী অশ্বে আরোহণ করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে পল্লী বা প্রান্তর দিয়া নির্ব্বাক হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন। আকাশে নক্ষত্রগুলি মিট্ মিট্ করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণকলেবরা যমুনা প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথঘাট কর্দ্দম বা জলপূর্ণ। শিবজী উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল। শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বৃক্ষ বা কুটীর নাই, অগত্যা পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তিনজন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী অভিমুখে আসিতেছেন, তাঁহাদিগের কোষে অসি। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সেইদিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। শিবজীর হৃদয় উদ্বেগে দুরু-দুরু করিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে যায়?

শিবজী। গোস্বামী।

অশ্বারোহী। কোথা হইতে আসিতেছ?

শিবজী। দিল্লীনগর হইতে।

অশ্বারোহী। আমরা দিল্লীনগরীতে যাইব, কিন্তু পথ হারাইয়াছি, আমাদের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দেও, পরে তুমি মথুরায় যাইও।

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা বলপ্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে, কেন না দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ! ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল, অপর দুইজন অস্পষ্টস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ?

একজন বলিল,—এ স্বর আমি জানি, আমি দক্ষিণ দেশে শায়েস্তাখাঁর অধীনে অনেক দিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি পথিক গোস্বামী নহে।

অপরজন বলিল,—তবে কে?

প্রথম। আমি সন্দেহ করি, এ স্বয়ং শিবজী, দুইজন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ঠিক একরূপ হয় না।

দ্বিতীয়। দূর মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।

প্রথম। সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে পুনা ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল!

দ্বিতীয়। ভাল, মস্তকের বস্ত্র তুলিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে।

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, শিবজী তাঁহাকে চিনিলেন, তিনি সায়েস্তাখাঁর অধীনস্থ একজন প্রধান সেনানী!

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত, শিবজী একাকী তিনজনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মুষ্টি আঘাতে অচেতন করিলেন, এমন সময় আর দুইজন অসিহস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন। আবার বন্দী হইলেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরংজীব কর্ত্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শম্ভুজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু জলে আপ্লুত হইল।

সহসা একটী শব্দ হইল, শিবজী দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটী তীর, আর একটী তীর; শিবজীর তিনজন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিন জনই গতজীবন!

শিবজী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে সেই অশ্বরক্ষক জানকীনাথ তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। বিস্মিত হইয়া জানকীনাথকে নিকটে ডাকিয়া জীবন রক্ষার জন্য শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে শিবজী আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সে অশ্বরক্ষক নহে, অশ্বরক্ষকবেশে সীতাপতি গোস্বামী!

তখন সহস্রবার গোস্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—সীতাপতি! আপনি ভিন্ন শিবজীর বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে? আপনাকে অশ্বরক্ষক মনে করিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন। আপনার এ কার্য্যের জন্য আমি কি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি?

সীতাপতি শিবজীর সম্মুখে জানু গাড়িয়া করযোড়ে বলিলেন,—রাজন্! ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন, আমি অশ্বরক্ষকও নহি, গোস্বামীও নহি, আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবিলদার। জ্ঞান হইয়া অবধি আপনার সেবা করিয়াছি, আজীবনকাল আপনার সেবা করিব, ইহা ভিন্ন অন্য কামনা নাই, অন্য পুরস্কার চাহি না। প্রভুর কাছে যদি না জানিয়া কখন কোন দোষ করিয়া থাকি, প্রভু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দোষ ক্ষমা করুন।

শিবজী চকিত হইয়া সেই বালক রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সজলনয়নে রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,—রঘুনাথ! রঘুনাথ!

তোমার নিকট শিবজী শত অপরাধে অপরাধী, কিন্তু এই মহৎ আচরণে আমাকে যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছ। তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তোমাকে অবমাননা করিয়াছিলাম, স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শিবজী যতদিন জীবিত থাকিবে তোমার গুণ বিস্মৃত হইবে না, প্রণয় ও যত্নে যদি সে মহৎ ঋণ পরিশোধ করা যায়, তবে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিবে।

শান্ত নিস্তব্ধ রজনীতে উভয়ে পরস্পরের আলিঙ্গনসুখে বিমুগ্ধ হইলেন। রঘুনাথের ব্রত অদ্য শেষ হইল, শিবজীর হৃদয়বেদনা অদ্য দূর হইল, বালকের ন্যায় উভয়ে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রাসাদে

কি দারুণ বুকের ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরিতের কথা॥
সই! কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥
হায় বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী
প্রেমে ছল-ছল আঁখি।
চণ্ডিদাস কহে, সে গতি হইয়া,
পরাণ সংশয় দেখি॥

—চণ্ডীদাস।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরযূ দেখিলেন হৃদয় শূন্য! যে স্বদেশীয় যোদ্ধাকে প্রথম দর্শন করিয়াই সরযূ চকিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন, যাঁহাকে কয়েকমাস অবধি সরযূ হৃদয়েশ্বর বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে বৃদ্ধ জনার্দ্দন বিবাহের বাক্যদান করিয়াছিলেন, সে রঘুনাথের অদর্শনে আজি সরযূর হৃদয় শূন্য!

সে দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, সরযূ হৃদয়ের ধন আর ফিরিয়া পাইলেন না। অন্ধকার নিশীথে কখন কখন বালিকা একাকী গবাক্ষপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেন। দিবসে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নীরবে সেই গবাক্ষ দিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া রঘুনাথ আর আসিলেন না!

কখন বা অপরাহ্ণে একাকী সরযূ আম্রকাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত! তোরণ দুর্গের কথা, কণ্ঠমালার কথা, রায়গড়ে আগমনের কথা, বিদায়ের কথা। নীরবে সরযূর গণ্ডস্থল দিয়া এক এক বিন্দু অশ্রু বহিত। কখন কখন রজনীতে সহসা হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত, ভাদ্রমাসের নদীর ন্যায় শোক পারাবার উথলিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযূ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেন, শ্রাবণ মাসের ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিত। রজনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিত। বালিকা তখনও শোকে বিবশা হইয়া লুণ্ঠিত থাকিত।

প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন করিতে উদ্যানে যাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি চিন্তা করিতেন কে বলিবে? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের দিকে চাহিতেন, পুষ্পদলগত প্রাতঃ-শিশির-বিন্দুর সহিত দুই একটী পরিষ্কার স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু মিশাইয়া যাইত। সায়ংকালে বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন,

আহা! সে শোকের গীত শুনিয়া শ্রোতৃদিগের নয়নেও জল আসিত। এরূপ চিন্তায় ক্রমে সরযূর শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন কালিমাবেষ্টিত হইল। সরলস্বভাব জনার্দ্দন এখনও সরযূর হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সরযূর শরীরের অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন, কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরযূ অনেক যত্নে শোক সঙ্গোপন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু অনুমান করিয়াছিল। তাহারা কথাচ্ছলে বৃদ্ধ জনার্দ্দনকে বলিল,—সরযূর বয়স হইয়াছে, বিবাহ স্থির করুন। সরযূর কানে এ কথা উঠিল। সরযূ বলিয়া পাঠাইলেন,—পিতাকে বলিও আমার বিবাহে রুচি নাই, চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব।

জনার্দ্দন ,সে কথা মানিলেন না. বিবাহের পাত্র স্থির করিতে লাগিলেন। রাজপুরোহিত দ্বারা পালিতা ভদ্র ক্ষত্রিয়কন্যার পাত্রের অভাব ছিল না, অবশেষে রাজা জয়সিংহের একজন প্রধান সেনানীর সহিত বিবাহ স্থির হইল। সরযূর কানে এ কথা উঠিল, সরযূ শিহরিয়া উঠিলেন। লজ্জার মাথা খাইয়া পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—পিতাকে বলিও, তিনি অন্য একজন সেনানীকে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তিনিই আমার বাগ্দত্ত পতি। অন্য কাহারও সহিত বিবাহ হইলে ব্যভিচার দোষ ঘটিবে।

জনার্দ্দন এ-কথা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন, সরযূকে তিরস্কার করিলেন, আবার নিজের ঘরে গিয়া মনের দুঃখে কাঁদিলেন। অবশেষে কন্যার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন, রাজা জয়সিংহকে জানাইলেন। সরযূর কানে এ-কথা উঠিল। সরযূ তখন নিজে পিতার পদে লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিলেন,—পিতা, ক্ষমা করুন, এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন, নচেৎ আপনার চিরপালিতা এই অভাগিনী কন্যাকে জন্মের মত হারাইবেন। জনার্দ্দন কন্যাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু কন্যার কথা কে গ্রাহ্য করে, পাঁচজন ভদ্রলোকে যেরূপ পরামর্শ দেয়, সমাজে থাকিলে সেইরূপ কাজ করিতে হয়। বিবাহের দিন নিকটে আসিতে লাগিল, জনার্দ্দন অনেক বুঝাইলেন, অনেক কাঁদিলেন, অনেক তিরস্কার করিলেন। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিবাহের পূর্ব্বদিন সরযূকে বলিলেন,—পাপীয়সি, তোমার জন্য কি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অবমানিত হইব? তুই তোর পিতার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবি?

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সরযূ উত্তর করিলেন,—পিতঃ! আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া থাকি, মার্জ্জনা করুন। কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমা হইতে আপনার অবমাননা হইবে না।

এ কথার অর্থ তখন জনার্দ্দন বুঝিলেন না, এ কথার অর্থ তাহার পরদিন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন। বিবাহের দিন কন্যাকে কেহ আর দেখিতে পাইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : কুটীরে

দুঃখে সুখে খুল্লনা শরৎকাল ভাবে।
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ।
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস॥

—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

শরৎকালের প্রাতের কমনীয় আলোকে বেগবতী নারানদী বহিয়া যাইতেছে, সূর্য্যকিরণে জলের হিল্লোল হাস্য করিতে করিতে যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উভয় পার্শ্বে সুন্দর শস্যক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পূজায় যেন সন্তুষ্ট হইয়া মেদিনী সে হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্য করিতেছে। উত্তর ও পূর্ব্বদিকে সেইরূপ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা সুদূরে দুই একটী গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্ব্বতরাশির পর পর্ব্বতরাশি বালসূর্য্যকিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করিতেছে।

সেই নদীকূলে শ্যামলক্ষেত্রবেষ্টিত একটী সুন্দর গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল। গ্রামের একপ্রান্তে একটী কৃষকের কুটীরের নিকট একটী বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে একজন দাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কৃষকপত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সম্ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটী গোলাঘর রহিয়াছে, পার্শ্বে চারি পাঁচটী গরু বাঁধা রহিয়াছে, বাটীর ভিতর তিন চারিখানি ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ হয়, গৃহস্বামী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন মাতব্বর লোক, ব্যবসা ও মহাজনী কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া ও শ্যামবর্ণা, চঞ্চল প্রফুল্ল ও উজ্জ্বলনয়না। একবার নদীকূলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, একবার মাতা যে ঘরে রন্ধন করিতেছে তথায় দৌড়াইয়া যাইতেছে, এক একবার বা দাসীর নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে।

বালিকা বলিল,—দিদি, আয় না কালকের মত ঘাটে যাই, কাপড় দিয়া মাছ ধরিব।

দাসী। না দিদি, মা বারণ করিয়াছেন, ঘাটে যেও না।

বালিকা। মা টের পাবে না।

দাসী। না, ছি, মা যা বারণ করেন তা করিতে নাই, মার কথা কি অন্যথা করে?

বালিকা। আচ্ছা দিদি, মা কি তোরও মা হয়?

দাসী। হয় বৈ কি।

বালিকা। না, সত্য করিয়া বল।

দাসী। সত্যই মা হয়।

বালিকা। না দিদি, তুই যে রাজপুতের মেয়ে, আমরা ত রাজপুত নই।

দাসী বালিকাকে চুম্বন করিল। বলিল,—তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?

বালিকা। জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই মাকে মা বলিস কেন?

দাসী। যিনি আমাকে খাইতে পরিতে দিতেছেন, যিনি আমাকে থাকিবার স্থান দিয়াছেন, যিনি আমাকে মেয়ের মত লালন-পালন করেন তাঁকে মা বলিব না ত কি বলিব? এ জগতে আমার অন্য স্থান নাই, মা আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন।

বালিকা। ছি দিদি, তোর চক্ষে জল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস কেন দিদি?

দাসী। না দিদি, কাঁদিব কেন?

বালিকা। তোর চক্ষে জল দেখলে আমার চক্ষে জল আসে।

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিল,—তুমি যে আমাকে ভালবাস।

বালিকা। আর তুই আমাকে ভালবাসিস?

দাসী। বাসি বৈ কি।

বালিকা। বরাবর ভালবাসবি, কখনও আমাকে ভুলবিনি?

দাসী। না। আর তুমি দিদি, তুমি আমাকে ভালবাসবে, কখনও ভুলিবে না?

বালিকা। না।

দাসী। হাঁ, তুমি আমাকে একদিন ভুলিবে।

বালিকা। কবে?

দাসী। যবে তোমার বর আসিবে।

বালিকা। সে কবে?

দাসী। আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই।

বালিকা। না দিদি, কখনও তোকে ভুলিব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভালবাসব। আর তুই দিদি, তোর যখন বর আসবে, তখন আমাকে ভুলবিনি?

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, সে বলিল,—না, কখনও ভুলিব না।

বালিকা। বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাসবি?

দাসী হাস্য করিয়া বলিল,—সমান সমান।

বালিকা। তোর বর কবে আসবে দিদি?

দাসী। ভগবান জানেন। ছাড়, রান্নার বেলা হইয়াছে, আমি যাই।

পাঠককে বলা অনাবশ্যক যে, অনাথিনী সরযূবালা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন

কৃষকের বাটীতে দাসীবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনী ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহযুক্ত, নিরাশ্রয় রাজপুত-কন্যাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত, নিরাশ্রয় ভদ্র রাজপুত-কন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার ন্যায় লালন-পালন করিতেন। সরযূও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুই বেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, সুতরাং কৃষক ও কৃষকপত্নীর কার্য্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরযূর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথের অবর্ত্তমানে যদি সরযূর কোথাও সুখের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরলা গৃহিণীর বাটীতে থাকিয়া সরযূ পরম সুখলাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে, কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটী পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটী ত্যাগ করিয়াছে। শেষে যে একটী কন্যা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাহাকে ভালবাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্য্যে বা অন্য কার্য্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরযূ গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন,—বাছা, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব। সরযূ সস্নেহে উত্তর করিতেন,—মা, তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও। স্নেহবাক্যে সরলস্বভাব বৃদ্ধা গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন,—সরযূ! বাছা তোর মত মেয়ে আমি কখন দেখি নাই। যদি তোর মত আমাদের জাতের একটী মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিই। পুত্র অনেক দিন গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে-কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীনা ক্ষণেক রোদন করিলেন।

এইরূপে কয়েকমাস অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়া আছেন, একপ্রান্তে সরযূ বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন,—গৃহিণী, শান্ত হও, আজ সুসংবাদ আছে।

গৃহিণী। আহা তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পাইয়াছ?

গোকর্ণ। শীঘ্রই পাইব। পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল, অদ্য শুনিলাম শিবজী দুষ্ট বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন। আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবে।

গৃহিণী। আহা ভগবান তাহাই করুন, প্রায় এক বৎসর হইল বাছাকে না দেখিয়া যে মন কি অবস্থায় আছে তা ভগবানই জানেন।

গোকর্ণ। ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হাবিলদারের অধীনে কার্য্য করিত, রঘুনাথজীরও সংবাদ পাইয়াছি।

সরযূর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উদ্বেগে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—যেদিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন সেদিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল মনে আছে?

গৃহিণী। আমি মেয়েমানুষ, আমার কি অত মনে থাকে?

গোকর্ণ। পুত্র বলিয়াছিল,—পিতা, আমি হাবিলদারকে চিনি, তাঁহার ন্যায় বীর শিবজীর সৈন্যে আর নাই। কি ভ্রমে পতিত হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন, পশ্চাৎ জানিবেন, তখন তিনি রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন। পুত্রের কথা এতদিনে সত্য হইল।

সরযূর হৃদয় উল্লাসে, উদ্বেগে দুরু-দুরু করিতে লাগিল, তাঁহার মস্তক হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন,—রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেন, আপন বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, শিবজী রঘুনাথের নিকট আপন দোষের ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, হাবিলদারের পদ হইতে একেবারে পাঁচহাজারী করিয়া

দিয়াছেন। সহরে অন্য কথা নাই, হাটে-বাজারে অন্য কথা নাই, গ্রামে অন্য কথা নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্ব-কথা শুনিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধন্যবাদ দিতেছে।

আনন্দে, উল্লাসে সরযূ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : স্বপ্নদর্শন

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে গোকুলে দুকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি কমল পায়॥

—চণ্ডীদাস।

সেই দিন অবধি সরযূর আকৃতি ফিরিল! বহুদিন পর আশা, আনন্দ ও উল্লাস আবার সেই হৃদয়ে স্থান পাইল। নয়ন দুইটী আবার হাসিল, ওষ্ঠ দুইটী আবার প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় পরিমল ধারণ করিল, ললাট ও সুন্দর গণ্ডস্থলে আবার লাবণ্য ফুটিল, রেশম-বিনিন্দিত কেশগুলি আবার সেই সুন্দর, মধুময়, লাবণ্যময় মুখখানিকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। প্রাতঃকালের সুন্দর সমীরণের সহিত দূরবৃক্ষ হইতে কোকিলরব আসিলে সরযূ উল্লাসিত-হৃদয়ে সেই রব শুনিতেন; অপরাহ্নে গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া নয়ন দুইটী সূর্য্য-উত্তাপ হইতে হস্তদ্বারা আবরণ করিয়া নদীর অপর পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকিতেন। আবার সন্ধ্যার সময় দূরে বংশীধ্বনী হইলে চকিত মৃগের ন্যায় সহসা চমকিয়া উঠিতেন।

গোকর্ণের কন্যা পর্য্যন্ত সরযূর এই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল। একদিন সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে যাইবার সময় কন্যা জিজ্ঞাসা করিল,—দিদি, দিন দিন তোর রূপ কেমন ফুটে বেরুচ্ছে।

সরযূ। কে বলিল?

বালিকা। বলিবে কে? আমি বুঝি দেখিতে পাই না?

সরযূ। না, ও তোমার দেখিবার ভুল।

বালিকা। হাঁ, ভুল বৈ কি? আর আগে মাথায় কিছু থাকিত না, এখন মধ্যে মধ্যে চুলের ভিতর ফুল গোঁজা হয়, তা বুঝি দেখিতে পাই না?

সরযূ। দূর।

বালিকা। আর লুকাইয়া লুকাইয়া গলায় একটী কণ্ঠমালা পরা হয়, তাহাতে দুইটী করিয়া মুক্তা, একটী করিয়া পলা, তা বুঝি আমি দেখিতে পাই না?

সরযূ। দূর।

বালিকা। আর নদীর তীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া সুন্দর মুখখানি জলে দেখা হয়, তা বুঝি আমি দেখি না?

সরযূ। মিথ্যা কথা বলিও না।

বালিকা। আর গাছতলায় লুকাইয়া মধ্যে মধ্যে কুহুস্বরে গান করা হয়, তা বুঝি আমি শুনি না?

সরযূ এবার আসিয়া বালিকার মুখ চাপিয়া ধরিল।

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল,—আমি এ সব কথা মাকে বলিয়া দিব।

সরযূ। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, বলিও না।

বালিকা। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলিবে?

সরযূ। বলিব।

বালিকা। এর অর্থ কি? এ পুষ্প, এ কণ্ঠমালা, এ গীত কাহার জন্য? তোর চক্ষু দুইটী যে সদাই হাসিতেছে, তোর ওষ্ঠ দুটী যে রক্তে ফেটে পড়িতেছে, তোর সমস্ত শরীর যে লাবণ্যে ঢল্ ঢল্ করিতেছে, এ কাহার জন্য?

সরযূ। তোমার মা তোমার খোঁপা বাঁধিয়া দেন, গহনা পরাইয়া দেন, সে কাহার জন্য?

বালিকা এবার একটু লজ্জিত হইল, বলিল,—মা বলিয়াছেন, আগামী বৎসর আমার বিবাহ হইবে, আমার বর আসিবে।

সরযূ। আমারও বর আসিবে।

বালিকা। সত্য?

সরযূর সহিত বালিকার কথা হইতেছিল এরূপ সময় একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী "হর হর মহাদেও" শব্দ উচ্চারণ করিয়া নদীতীরে উপনীত হইলেন, সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে তাঁহার বিভূতি-ভূষিত দীর্ঘ শরীর বড় সুন্দর দেখাইল। বালিকা ভয়ে পলায়ন করিল, সরযূ তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী সীতাপতি গোস্বামী!

সরযূর হৃদয় সহসা কম্পিত হইল, মনের আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সরযূ সে আবেগ সংযম করিয়া লজ্জা বা ভয় ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া স্থিরস্বরে বলিলেন,—প্রভু, আপনি যে অভাগিনীকে একদিন জনার্দ্দনের প্রাসাদে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে অদ্য এই কুটীরে দাসীকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতেছেন। পিতা কলঙ্কিনী বলিয়া আমাকে দূরীকৃত করিয়াছেন, কিন্তু ভগবান জানেন আমি বাগ্দত্ত পতির অনুচারিণী, ইহা ভিন্ন আমার অন্য দোষ নাই।

সন্ন্যাসীর নয়ন জলে পূর্ণ হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন,—রঘুনাথের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াছ?

সরযূ। নারী যতদিন পতির নাম জপিতে পারে, ততদিন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করে না।

সন্ন্যাসীর বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতে লাগিল।

সরযূ আবার বলিলেন,—প্রভুর সহিত কি সেই দেবপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

গোস্বামী। হইয়াছিল।

সরযূ। প্রভু তাঁহাকে দাসীর কথা জানাইয়াছিলেন?

গোস্বামী। জানাইয়াছিলাম।

সরযূ। কি জানাইয়াছিলেন?

গোস্বামী। আপনার একটী বাক্য, একটী অক্ষরও বিস্মৃত হই নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—সরযূ রাজপুত্রবালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে। সরযূ যতদিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই যশোগীত গাইবে।

সরযূ। ভাল।

গোস্বামী। আমি তাঁহাকে আরও বলিয়াছিলাম, যদি কর্ত্তব্য-সাধনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়, সরযূ তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে।

সরযূ। ভাল।

গোস্বামী। আমি তাঁহাকে আরও বলিয়াছিলাম, যে সরযূ তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্য প্রতিরোধ করিবে না। রঘুনাথ অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ তিনি তাঁহার সহায় হইবেন।

উদ্বেগ-গদগদস্বরে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কি উত্তর প্রদান করিয়াছেন?

জ্বলন্ত স্বরে গোস্বামী উত্তর করিলেন,—রঘুনাথ উত্তর দান করেন নাই, কেবল আপনার কথাগুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গোস্বামীর নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেই নদীতীরে ও বৃক্ষমধ্যে গোস্বামীর জ্বলন্ত বাক্যগুলি বার বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

"যিনি জগতের আদিপুরুষ তাঁহাকে প্রণাম করি।"—এই বলিয়া সরযূবালা আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া যোড় করে প্রণাম করিলেন। গোস্বামীও জগতের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, সন্ধ্যার সুশীতল সমীরণে উভয়ের শরীর শীতল হইল, নয়নের জল শুকাইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর গোস্বামী কহিলেন,—দেবতার প্রসাদে কার্য্যসিদ্ধি করিবার পর রঘুনাথ একটী কথা আমার দ্বারা আপনার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

সরযূ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি?

গোস্বামী। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এতদিন সরযূ তাঁহার দাসকে মনে রাখিবেন? আমি যাইলে সরযূ আমাকে চিনিতে পারিবেন?

সরযূ। এ জীবনে কি আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারি?

গোস্বামী। আপনার ভালবাসা তিনি জানেন, তথাপি নারীর মন সর্ব্বদাই চপল, কি জানি যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন।

গোস্বামীর চপলতা ও ঈষৎ হাস্য দেখিয়া সরযূ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কহিলেন,—নারীর মন চপল তাহা আমি জানিতাম না।

গোস্বামী। আমিও জানিতাম না, কিন্তু অদ্য দেখিতেছি।

সরযূ। কিসে দেখিলেন?

গোস্বামী। যিনি আমার বাগ্দত্তা বধূ, তিনি আমাকে অদ্য ভুলিয়াছেন, দেখিয়াও আমাকে চিনিতে পারেন নাই।

সরযূ। সে কোন্ হতভাগিনী?

গোস্বামী। তিনি সেই ভাগ্যবতী যাঁহাকে তোরণদুর্গে জনার্দ্দনের গৃহের ছাদে প্রথম দর্শন করিয়া আমি মন প্রাণ হারাইয়াছিলাম! তিনি সেই ভাগ্যবতী যাঁহার কণ্ঠে একদিন মুক্তামালা পরাইয়া দিয়া আমি জীবন চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলাম! তিনি সেই ভাগ্যবতী, যিনি তোরণদুর্গে ও জয়সিংহের শিবিরে, যুদ্ধের সময় ও সন্ধির সময়, সর্ব্বদাই আমার নয়নের মণির ন্যায় ছিলেন! তিনি সেই ভাগ্যবতী যাঁহার দর্শন আমার নয়নে সূর্য্যালোক, যাঁহার শব্দ আমার কর্ণে সঙ্গীত, যাঁহার স্পর্শ আমার শরীরে চন্দন-প্রলেপ, যাঁহার প্রীতি আমার জীবনের জীবন! তিনি সেই ভাগ্যবতী যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া, যাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, আমি দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলাম, যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছি, অনন্ত বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি। বহুদিন পর, বহু বিপদ পার হইয়া, অদ্য সেই ভাগ্যবতীর চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি কি আজ আমাকে চিনিতে পারিবেন?

সেই কোকিল-বিনিন্দিত স্বর সরযূর হৃদয় মন্থন করিল, তারকালোকে ছদ্মবেশধারী সেই দীর্ঘকায় পুরুষশ্রেষ্ঠকে সরযূ চিনিতে পারিলেন। সরযূ হৃদয়ের আবেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার মস্তক ঘূরিতেছিল, নয়ন মুদিত হইয়াছিল। "রঘুনাথ! ক্ষমা কর।"—এই মাত্র কহিয়া সরযূ রঘুনাথের দিকে হস্তপ্রসারণ করিলেন। পতনোন্মুখ প্রিয় দেহ রঘুনাথ নিজ অঙ্গে ধারণ করিলেন, সেই উদ্বেগপূর্ণ হৃদয় আপন হৃদয়ে স্থাপন করিলেন।

ক্ষণেক পর চৈতন্য লাভ করিয়া সরযূ নয়ন উন্মীলিত করিলেন, কি দেখিলেন? হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, চিরপ্রার্থিত পতি আজ সরযূবালাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছেন!

বহুদিন পর আজ সরযূর তপ্ত হৃদয় রঘুনাথের প্রশান্ত হৃদয় স্পর্শে শীতল হইল, সরযূর ঘনশ্বাস রঘুনাথের নিশ্বাসে মিশ্রিত হইল, সরযূর কম্পিত রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় জীবনের মধ্যে প্রথমবার রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল।

সে সংস্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল! সেই প্রিয় প্রগাঢ় আলিঙ্গনে, সেই বারংবার ঘন চুম্বনে বালিকা কাঁপিতে লাগিল।

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন?

বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযূ মনে মনে বলিলেন,—জগদীশ্বর! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখনিদ্রা হইতে কখনও না জাগরিত হই!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : জীবন নির্ব্বাণ

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন্।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন॥
ধর্ম্ম অনুসারে জয় ঈশ্বর বচন।
—কাশীরাম দাস।

মহারাষ্ট্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল! শিবজী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, ম্লেচ্ছদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন! নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল।

একদা রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার সৈন্যসমেত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন তিনি বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় কার্য্য করিলেন। আরংজীব তাঁহার প্রতি অভদ্র আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও সম্রাটের কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না। যখন নিশ্চয় দেখিলেন মহারাষ্ট্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তখন পর্য্যন্ত যতদূর সাধ্য সম্রাটের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করিলেন। লোহগড়, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে সম্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, তদ্ভিন্ন যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন, যেন আর শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এজগতে এরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার নাই। জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণদেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে তলব করিলেন, যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধ্যমতে দিল্লীর কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন; শেষদশায় এ অবমাননায় তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পথেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন!

অবমানিত, পীড়িত বৃদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন, এরূপ সময় একজন দূত সংবাদ দিলেন,—মহারাজ, একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী, তিনি আপনার চরণোপান্তে বসিয়া একদিন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর একবার উপদেশ পাইবার জন্য আসিয়াছেন।

রাজা উত্তর করিলেন,—সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইস। যে মহাপুরুষ আসিয়াছেন, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি। তিনি আইসুন, আমি তাঁহাকে নির্ভয় দিতেছি।

ক্ষণেক পর একজন মহারাষ্ট্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন,—সুহৃদ্বর শিবজী! মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার আপনার সহিত দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম। উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না।

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন,—পিতঃ! যখন শেষ আপনার নিকট বিদায় লইয়াছিলাম, তখন আপনাকে এত শীঘ্র এরূপ অবস্থায় দেখিব, কখনও মনে করি নাই।

জয়সিংহ। রাজন্! মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি? শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আপনি মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলেন; এখন কি দেখিতেছেন?

শিবজী। মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি, তখন মোগল-সাম্রাজ্যের আর আশা নাই।

জয়সিংহ। বৎস! তাহা নহে! রাজস্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে অন্য জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের ন্যায় শত যোদ্ধা এখনও বর্ত্তমান আছেন। মাদৃশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

শিবজী। আপনার অমঙ্গল অপেক্ষা সাম্রাজ্যের আর অধিক কি অনিষ্ট হইতে পারে?

জয়সিংহ। শিবজী! একজন যোদ্ধা যাইলে অন্য যোদ্ধা হয়, কিন্তু পাতকে যে ক্ষয়সাধন করে, তাহার পুনঃসংস্কার হয় না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যথায় পাপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও মৃত্যু। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।

শিবজী। নিবেদন করুন।

জয়সিংহ। যখন আপনাকে আমি দিল্লী পাঠাইয়াছিলাম, তখন আপনার হৃদয়ও দিল্লীশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, আপনার স্থির সঙ্কল্প ছিল, দিল্লীশ্বর যতদিন আপনাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি ততদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আপনার প্রতি সদাচরণ করিলে সম্রাটের দক্ষিণদেশে একজন পরাক্রান্ত বন্ধু থাকিত, কপটাচরণবশতঃ সেই স্থানে একজন দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়াছে।

শিবজী। মহারাজ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, জগতে সকলে যথার্থই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।

জয়সিংহ। আমি আরংজীবের পিতার সময় হইতে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছি। বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যতদূর সাধ্য, দিল্লীশ্বরের উপকার করিয়াছি। স্বজাতি বিজাতি বিবেচনা করি নাই, আত্মপর বিবেচনা করি নাই, যাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, জীবন পণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়াছি। বৃদ্ধকালে সম্রাট আমার প্রতি প্রথমে অসদাচরণ করিলেন, পরে অবমাননা করিলেন। তথাপি ঈশ্বরেচ্ছায় আমার কার্য্যে বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, আমি যে সমস্ত সৈন্য প্রধান প্রধান দুর্গে রাখিয়া যাইলাম, শিবজী, তাহারা বিনাযুদ্ধে আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না। কিন্তু এ আচরণে আরংজীব স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। অম্বরাধিপেরা দিল্লীশ্বরের চিরবিশ্বস্ত অনুচর ও সহায়, অম্বরের ভবিষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রধান শত্রু হইবে।

শিবজী। আপনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আরংজীব আপন অসদাচরণে অম্বর ও মহারাষ্ট্র এই দুইটী দেশকে তাঁহার শত্রু করিয়াছেন।

জয়সিংহ। দুইটী উদাহরণ দিলাম, মহারাষ্ট্রদেশ ও অম্বরদেশ। সমস্ত ভারতবর্ষ এইরূপ। শিবজী! আরংজীব সমস্ত ভারতবর্ষের বিশ্বস্ত অনুচরের অবমাননা করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন। বারাণসী-মন্দির বিনষ্ট করিয়া তথায় মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে হিন্দুদিগের অবমাননা করিতেছেন, সর্ব্বদেশে হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিতেছেন।

ক্ষণেক পরে নয়ন মুদিত করিয়া জয়সিংহ অতি গম্ভীরস্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, যেন মৃত্যুশয্যায় মহাত্মার দিব্য-চক্ষু উন্মীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,—শিবজী! আমি দেখিতেছি যে এই কপটাচারিতায় চারিদিকে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইল, রাজস্থানে অনল জ্বলিল, মহারাষ্ট্রদেশে অনল জ্বলিল, পূর্ব্বদিকে অনল জ্বলিল! আরংজীব বিংশতি বৎসর যত্ন করিয়া সে অনল নির্ব্বাণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁহার অসামান্য কৌশল, তাঁহার অসাধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; বৃদ্ধবয়সে পশ্চাত্তাপ করিয়া দিল্লীশ্বর প্রাণত্যাগ করিলেন! অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক হইতে ধূ ধূ শব্দে অগ্রসর হইতেছে, সেই অনলে মোগলসাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল! তাহার পর? তাহার পর মহারাষ্ট্র জাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীয়গণ! অগ্রসর হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর!

রাজার বচনরোধ হইল। চিকিৎসকেরা পার্শ্বে ছিলেন, তাঁহারা নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন, গোপনে, অস্পষ্টস্বরে রোগের প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে জয়সিংহ বলিলেন,—কপটাচারী আপনাকেই শাস্তিদান করে—সত্যমেব জয়তি।

শ্বাসরোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ বহির্গত হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে।
—মধুসূদন দত্ত।

রজনী একপ্রহর মাত্র আছে, এরূপ সময়ে শিবজী রাজপুত-শিবির ত্যাগ করিলেন। প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই প্রধান প্রধান সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করিলেন, ক্ষণেক পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত সৈন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! প্রায় এক বৎসর হইল, আমরা আরংজীবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলাম, আরংজীবের নিজের দোষে ও কপটাচারিতায় সে সন্ধি খণ্ডন হইয়াছে। অদ্য আমরা সে কপট আচরণের প্রতিশোধ দিব, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিব।

"যিনি আরংজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ঈশানীদেবী যাঁহার সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন, যাঁহার নিকট শিবজী বিনাযুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কল্য নিশীথে সেই মহাত্মা রাজা জয়সিংহ আরংজীবের অসদাচরণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সৈন্যগণ! দিল্লীতে আমার কারারোধ, হিন্দুপ্রবর জয়সিংহের মৃত্যু, এ সমস্ত এক্ষণে আমরা পরিশোধ করিব।

"মৃত্যুশয্যায় রাজা জয়সিংহের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখিলেন, মোগলদিগের ভাগ্যনক্ষত্র অবনতিশীল, মহারাষ্ট্রীদিগের ভাগ্যনক্ষত্র উন্নতিশীল, দিল্লীর সিংহাসন ত্বরায় শূন্য! বন্ধুগণ! অগ্রসর হও, পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার করিব।

"পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখিতে পাইতেছ, ও প্রভাতের রক্তিমাচ্ছটা। কিন্তু উহা আমাদের পক্ষে সামান্য প্রভাত নহে; মহারাষ্ট্রগণ! অদ্য আমাদের জীবন-প্রভাত।"

সমস্ত সেনানী ও সৈন্যগণ এই মহৎ বাক্য শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—অদ্য আমাদের জীবন-প্রভাত।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বিচার

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।
—কাশীরাম দাস।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী নদীতীরে পদচারণ করিতেছিলেন। আপনার পদোন্নতি, সরযুর সহিত পুনর্ম্মিলন, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দুদিগের ভাবী স্বাধীনতা, এরূপ নূতন নূতন বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিলেন,—রঘুনাথ!

রঘুনাথ পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্ররাও জুমলাদার। রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু ঈশানী-মন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই।

চন্দ্ররাও বলিলেন,—রঘুনাথ! এ জগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই, একজন মরিব।

রঘুনাথ রোষ সম্বরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন,—চন্দ্ররাও! কপটাচারী মিত্রহন্তা চন্দ্ররাও! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরশ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন, জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

চন্দ্ররাও। বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই। তোমার আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথাগুলি শুন। জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমি তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাকে আমি বিষচক্ষুতে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছে। তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয় নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিদ্রোহী বলিয়া অপমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি! চন্দ্ররাওয়ের ভীষণ জিঘাংসা তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইয়াছিল।

তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নতপদ লাভ করিয়া সৈন্যমধ্যে আসিয়াছ। চন্দ্ররাওয়ের স্থিরপ্রতিজ্ঞা জীবনে কখন নিষ্ফল হয় নাই, এখনও হইবে না! অন্য উপায় ত্যাগ করিলাম, এই অসি দ্বারা তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া এ ভীষণ পিপাসা নির্ব্বাণ করিব। ভীরু! অদ্য আমার হস্তে রক্ষা নাই।

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতেছিল, কম্পিতস্বরে বলিলেন,—পামর! সম্মুখ হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব, তোর পাপের দণ্ড দিব।

চন্দ্ররাও। ভীরু! এখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ? তবে আরও শোন। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সে শত্রুনিক্ষিপ্ত নহে, চন্দ্ররাও তোর পিতৃহন্তা!

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কর্ণে শুনিতে পাইলেন না, রোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া চন্দ্ররাওকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্ররাও ক্ষীণহস্তে অসিধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের ঢাল ক্ষত হইল, শরীরও ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার ন্যায় উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। চন্দ্ররাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর তিনি চন্দ্ররাওকে পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জানু স্থাপন করিলেন, পরে বলিলেন,—পামর! অদ্য তোর পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হইল, পিতার মৃত্যুর পরিশোধ হইল।

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তিনি বিকট হাস্য হাসিয়া বলিলেন,—আর তোর ভগিনী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া সুখে প্রাণবিসর্জ্জন করিব।

বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত কথা তখন রঘুনাথের মনে উপলব্ধি হইল! এই জন্য লক্ষ্মী স্বামীর নাম করেন নাই, এই জন্য চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন! পিতৃহন্তা রক্তপিশাচ চন্দ্ররাও বলপূর্ব্বক প্রাণের লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছে! রোষে রঘুনাথের নয়ন দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না। তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্ররাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

উভয় যোদ্ধা পরস্পরের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া রোষে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চন্দ্ররাও অসিযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধূলি ও কর্দ্দমে ধূসরিত হইয়া বিকট অসুরের ন্যায় আরক্ত নয়নে রঘুনাথের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুনাথ পিতার হত্যাকথা ও ভগিনীর অবমাননাকথা স্মরণ করিয়া রোষে, অভিমানে ও জিঘাংসায় বিদগ্ধচেতা, অথচ শাস্তিদানে অপারক হইয়া চিত্রার্পিত বৃত্রহন্তার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময় বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সহসা একজন যোদ্ধা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উভয়ে সভয়ে দেখিলেন—শিবজী!

শিবজী কোন কথা কহিলেন না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। আপনার সহচর চারিজন সৈন্যকে ইঙ্গিত করিলেন। সেই চারিজন সৈনিক নিস্তব্ধে চন্দ্ররাওয়ের নিকট আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে অসি ও চর্ম্ম কাড়িয়া লইয়া তাঁহার হস্তদ্বয় পশ্চাতে বদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেল। শিবজী অদৃশ্য হইলেন, রঘুনাথ চকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

পরদিন প্রাতে চন্দ্ররাওয়ের বিচার। তিনি রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রঘুনাথকে কল্য অন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে। রুদ্রমণ্ডল-দুর্গ আক্রমণের পূর্ব্বে শত্রু রহমৎখাঁকে চন্দ্ররাওই গুপ্ত সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অদ্য তাহারই বিচার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আফগান সেনাপতি রহমৎখাঁ রুদ্রমণ্ডলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎখাঁ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন তখন রহমৎখাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটী যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হয়েন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎখাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন জয়সিংহ রহমৎখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—খাঁসাহেব! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত যত্ন ও চিকিৎসা বৃথা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

রহমৎখাঁ বলিলেন,—আমার মরণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্তু আপনি শত্রু হইয়া আমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করিয়াছেন তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না, এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন, আপনার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই।

জয়সিংহ। রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের পূর্ব্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল। সে কে আমরা জানি না, আমার বোধ হয় একজন অন্যায়রূপে দণ্ডিত হইয়াছে।

রহমৎ। আমি জীবিত থাকিতে সে নাম প্রকাশ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। রাজপুত! আপনার ভদ্রাচরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি, কিন্তু পাঠান প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত।

জয়সিংহ। যোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোন নিদর্শন থাকে, তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?

রহমৎ। প্রতিজ্ঞা করুন, সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঠ করিবেন না?

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন রহমৎখাঁ তাঁহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন। রহমতের মৃত্যুর পর রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দ্ররাও।

চন্দ্ররাও রহমৎখাঁকে স্বহস্তলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে কাগজ ছিল তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্ররাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন তাহার প্রাপ্তিস্বীকার পর্য্যন্ত রাজা জয়সিংহ দেখিলেন। জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচারকার্য্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন, যখন পাঠ সমাধা হইল তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্ররাও বিদ্রোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দ্দোষী নিষ্কলঙ্ক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এ কথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন!

তখন শিবজী বলিলেন,—পাপাচারী বিদ্রোহী, তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে?

মৃত্যুসময়েও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় দর্প ও অভিমান এখনও পূর্ব্ববৎ। বলিলেন,—আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার ক্ষমতা প্রসিদ্ধ! একদিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর একদিন আর একজনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন চন্দ্ররাও এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানে না, এ সমস্ত প্রমাণ জাল।

এই বিদ্রূপে শিবজী মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন,—জল্লাদ, চন্দ্ররাওয়ের দুই হস্ত ছেদন কর, তাহা হইলে আর ঘুস লইতে পারিবে না। তাহার পর তপ্ত লৌহ দ্বারা ললাটে 'বিশ্বাসঘাতক' অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।

জল্লাদ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে যাইতেছিল, এরূপ সময় রঘুনাথ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,—মহারাজ! আমার একটী নিবেদন আছে।

শিবজী। রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব, কেন না এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।

রঘুনাথ। মহারাজের অঙ্গীকার অলঙ্ঘ্য, আমি এই প্রতিহিংসা যাচ্ঞা করি যে চন্দ্ররাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে;—অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্তি দিন।

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ!

শিবজী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল, তোমার অনুরোধে সেজন্য চন্দ্ররাওকে ক্ষমা করিলাম। রাজবিদ্রোহাচরণের শাস্তি দিবার অধিকারী রাজা। সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি, জল্লাদ, আপন কার্য্য কর।

রঘুনাথ। মহারাজের বিচার অনিন্দনীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তিদান করুন।

শিবজী। এ ভিক্ষাদানে আমি অসমর্থ, রঘুনাথ তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম, অন্যকে এতদূর ক্ষমা করিতাম না। শিবজীর আদেশের উপর কথা কহিও না।

রঘুনাথ। প্রভু দুই একটী যুদ্ধে এ দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অদ্য সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্ত করুন।

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতেছিল; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—রঘুনাথ! রঘুনাথ! কখন কখন আমাদের উপকার করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য আমাদিগের বিচার অন্যথা করিতে চাহ? রাজ-আদেশ অন্যথা হয় না; তুমিও আপনার বীরত্বের কথা আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও।

এ তিরস্কার বাক্যে রঘুনাথের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে উত্তর করিলেন,—প্রভু! পুরস্কার চাহা দাসের অভ্যাস নাই। অদ্য জীবনের মধ্যে প্রথমবার পুরস্কার চাহিয়াছি, প্রভু যদি এ পুরস্কার দানে অসম্মত হয়েন এ দাস দ্বিতীয়বার চাহিবে না। দাসের কেবল এই মাত্র ভিক্ষা, প্রভু সদয় হইয়া তাহাকে বিদায় দিন, রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করিবে, পুনরায় গোস্বামী হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে।

শিবজী ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তখন একজন অমাত্য নিকটে আসিয়া কানে কানে জানাইল, চন্দ্ররাও রঘুনাথের ভগিনীপতি, সেই জন্য রঘুনাথ ভগিনীপতির প্রাণ-ভিক্ষা করিতেছেন।

তখন বিস্ময়পূর্ণ হইয়া শিবজী চন্দ্ররাওকে খালাস দিবার আদেশ করিলেন। শেষে বজ্রনাদে বলিলেন,—যাও চন্দ্ররাও, শিবজীর রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হও। অন্য দেশে যাও, অন্য আত্মীয় কুটুম্বকে বধ কর, অন্য মিত্রের সর্ব্বনাশ সাধন কর, শত্রুর নিকটে উৎকোচ গ্রহণ, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহাচরণ করিতে করিতে পাপজীবনের অবশিষ্ট ভাগ সমাপ্ত কর।

চন্দ্ররাও ভীরু নহেন। ধীরে ধীরে ক্রোধ-জর্জ্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট যাইয়া বলিলেন,—বালক! তোর দয়া আমি চাহি না. তোর দেওয়া জীবন আমি তুচ্ছ করি। পরক্ষণেই আপন ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অভিমানী ভীষণ-প্রতিজ্ঞ চন্দ্ররাও জুমলাদার আপনার চিরনিষ্কৃতি সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেহ সভাস্থলে পতিত হইল!

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ভ্রাতা ভগিনী

সুত পরিবার,
কেবা বল কার,
যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব প্রায়,
সকল মিছাময়,
কেবল ভবের মায়া॥
—কৃত্তিবাস ওঝা।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে; এক্ষণে উপন্যাস-লিখিত ব্যক্তিদিগের বিষয় দুই একটী কথা বলিয়া বিদায় লইব।

বৃদ্ধ জনার্দ্দন পালিত কন্যাকে হারাইয়া বাতুলের ন্যায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযূকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পুলকিত হৃদয়ে রঘুনাথকে আহ্বান করিলেন, সানন্দহৃদয়ে শুভদিনে কন্যাদান করিলেন। সরযূর সুখ কে বর্ণনা করিবে? চারি বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষদেব যখন সরযূকে কোমল হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সরযূর ওষ্ঠে উষ্ণ ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন সরযূ উন্মাদিনী হইলেন।

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদুর্গে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা অদ্য সার্থক হইল। সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সরযূর হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিন্দিত দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সেই বিশাল স্নেহপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জগৎ বিস্মৃত হইলেন!

সরযূ তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া “দিদি”কে বিস্মৃত হইলেন না। রঘুনাথের অনুরোধে শিবজী গোকর্ণকে একটী জায়গীর দান করিলেন, ও গোকর্ণের পুত্র ভীমজীকে উন্নীত করিয়া হাবিলদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরযূ দিদিকে সর্ব্বদাই আপন গৃহে রাখিতেন ও বরের সহিত "সমান সমান" ভালবাসিতেন, এবং কয়েক বৎসর পরে একটী সদ্বংশীয় সুচরিত্র পাত্র দেখিয়া দিদির বিবাহ দিলেন। বিবাহদিবসে সরযূ ও রঘুনাথ স্বয়ং উপস্থিত রহিলেন, সরযূ কন্যার কানে কানে বলিলেন,—দেখিও দিদি! যাহা বলিয়াছিলে, সে কথা মনে রাখিও, বরের চেয়ে আমাকে ভালবাসিবে!

রঘুনাথ আখ্যায়িকাবিবৃত সময়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যশোবন্তসিংহ যখন জানিতে পারিলেন যে রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয় অনুচর গজপতিসিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে স্বদেশে আহ্বান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে যাইতে দিলেন না, যতদিন জীবিত ছিলেন, রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দের চৈত্র মাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, তখন শিবজীর অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী পিতার পুরাতন ভৃত্যদিগকে একে একে অবমানিত বা কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপকার নাই দেখিয়া সরযূ ও জনার্দ্দনের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সূর্য্যমহলের পুরাতন দুর্গে তিলকসিংহের প্রপৌত্র প্রবেশ করিলেন!

পাঠক! ইচ্ছা এই স্থানেই আপনার নিকট বিদায় লই, কিন্তু আর একজনের কথা বলিতে বাকী আছে, শান্ত চিরসহিষ্ণু লক্ষ্মীরূপিণী লক্ষ্মীর কথা বলিতে বাকী আছে।

যেদিন চন্দ্ররাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ সেই দিনই ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আলুলায়িত কেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন মোহ যাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন! হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ যাতনা হয়, কে বর্ণনা করিতে পারে? অদ্য লক্ষ্মীর নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়াছে, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে! শোকে, বিষাদে, নৈরাশ্যে, নব বৈধব্যের অসহ্য যাতনায়, বিধবা ঘন ঘন আর্ত্তনাদ করিতেছে!

রঘুনাথ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, সান্ত্বনা দূরে থাকুক, লক্ষ্মী প্রাণের ভ্রাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, লক্ষ্মীর নয়নে জল নাই, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ সুন্দর সুগন্ধ পুষ্প দিয়া সাজাইতেছেন। বালিকা যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া পুত্তলি সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূপ মনোনিবেশ পূর্ব্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদু পদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হইলে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে! অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল, আমার পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোন কষ্ট থাকিল না।

সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ বলিলেন,—প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এসময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি?

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন,—সত্য ভাই, তোমার দয়ার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের জন্য রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে শুনিয়াছি। আমার ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকালই জানি, এ অসহ্য শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মনুষ্যের জীবন শোকময়, তোমার কপালে যাহা ছিল, ঘটিয়াছে, সে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর। আইস, আমার গৃহে আইস, ভ্রাতার ভালবাসা, ভ্রাতার যত্নে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ত্রুটী করিব না।

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন, সে হাস্য দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—ভাই, তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সান্ত্বনা করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। হৃদয়েশ্বর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি

জীবদ্দশায় দাসীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শান্ত ভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন। লক্ষ্মী সহমরণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন রঘুনাথ অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন. অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন। ধীর শান্ত লক্ষ্মীর একই উত্তর,—হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

অবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন,—লক্ষ্মী, একদিন আমার জীবন নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবন ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগিনি, তোমার প্রবোধে, তোমার স্নেহময় কথায় সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্য্যজগতে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্মী, তুমি কি ভ্রাতার কথা রাখিবে না? তুমি কি ভ্রাতাকে ভালবাস না?

লক্ষ্মী পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন,—ভাই. সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা শুনিয়াছিলে. তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্যম. অনেক অবলম্বন. একটী যাইলে অন্যটী থাকে, একটী চেষ্টা নিষ্ফল হইলে দ্বিতীয়টী সফল হয়। ভাই, তুমি সেদিন ভগিনীর কথাটী রাখিয়াছিলে, অদ্য তোমার কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুযশ দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অদ্য আমি যে নয়নের মণিটী হারাইয়াছি তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভালবাসিতেন, এত অনুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ. অদ্য সদয় হও। লক্ষ্মীর একমাত্র সুখের পথে কণ্টক হইও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন তাঁহার সহিত যাইতে দাও!

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন. স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় ঝর্ ঝর্ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসার কপট সংসারে ভ্রাতা ভগিনীর অখন্ডনীয় প্রণয়ের ন্যায় পবিত্র স্নিগ্ধ প্রণয় আর কি আছে? স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় যাইলে পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল। চন্দ্ররাওয়ের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল। হাস্যবদনা লক্ষ্মী সুন্দর পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন. স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূলি লইলেন। সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে লক্ষ্মী রঘুনাথের নিকট আসিলেন, বলিলেন,—ভাই! বাল্যকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে বড় ভালবাসিতে. অদ্য লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অদ্য চিরসুখিনী হইবে. একবার ভালবাসার কাজ কর. সস্নেহে কনিষ্ঠ ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।

রঘুনাথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দুটী হাত ধরিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন! লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল!

সস্নেহে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন,—ছি ভাই, শুভকার্য্যে চক্ষুর জল ফেল কি জন্য? পিতার ন্যায় তোমার সাহস. পিতার ন্যায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জগদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করিবেন. জগৎ তোমার যশে পূর্ণ হইবে! লক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘুনাথকে সুখে রাখেন! ভাই, বিদায় দাও, দাসীর জন্য স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান হইতেছে, জগতে আর

রঘুনাথের কি আছে? প্রাণের লক্ষ্মী! তোকে কিরূপে বিদায় দিব, তোকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আর্ত্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। অনেক সান্ত্বনা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন,—ভাই, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, পুরুষের যাহা ধর্ম্ম তাহা তুমি পালন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর ধর্ম্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব করিও না, বাধা দিও না। ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।

গদ্‌গদ্‌স্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এ জগতে তোমাকে বিদায় দিলাম, ঐ আকাশে, ঐ পুণ্যধামে আর একবার তোমাকে পাইব। সে পর্য্যন্ত জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম।

ভ্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন,—হৃদয়েশ্বর! জীবনে তুমি বড় ভালবাসিতে, এখন অনুগ্রহ কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন তোমাকে স্বামী পাই, জন্ম জন্ম যেন লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পায়।

ধীরে ধীরে লক্ষ্মী চিতা আরোহণ করিলেন, স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তিভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নয়ন মুদ্রিত করিলেন, বোধ হইল যেন সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জ্বলিল; অতিশয় ঘৃত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লেহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারিদিক বেষ্টন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবমান হইল। লক্ষ্মীর একটী অঙ্গ নড়িল না, একটী কেশ কম্পিত হইল না।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আহেরিয়া

> ভুবঃ কম্পমিব জনয়তা চরণশব্দেন, কর্ণাকৃষ্টজ্যানাঞ্চ
> মদকলকুরর-কামিনী-কণ্ঠকূজিতকলেন
> শরনিকরবর্ষিণাং ধনুষাং নিনাদেন * *
> প্রচলিতমিব তদরণ্যমভবৎ।
>
> —কাদম্বরী।

১৫৭৬ খৃঃ অব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবসে মেওয়ার প্রদেশের অভ্যন্তরে সূর্য্য-মহলনামক পর্ব্বতদুর্গে মহাকোলাহল শ্রুত হইল। একটী উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে এই দুর্গ নির্ম্মিত, দুর্গের চারিদিকে কেবল পাদপপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী বা বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। প্রাতঃকালের বালসূর্য্য-কিরণ এই অনন্ত পর্ব্বত ও উপত্যকাকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে, এবং প্রাতঃকালের মন্দ মন্দ বায়ু-হিল্লোলে সেই অনন্ত পাদপশ্রেণী হইতে সুন্দর মর্ম্মর শব্দ নিঃসৃত হইতেছে। পত্রে পত্রে শিশিরবিন্দু মুক্তাসৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতেছে, বসন্তের পক্ষিগণ ডালে ডালে গান করিতেছে, এবং সেই দুর্গ-প্রাচীর হইতে যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বত ও উপত্যকা সূর্য্যকিরণে নবস্নাত হইয়া শোভা পাইতেছে। ঝনঝনা শব্দে দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, শত অশ্বারোহী বর্শা লইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। ধীরে ধীরে সেই অশ্বারোহিগণ সেই দুর্গের পর্ব্বত অধিরোহণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের শাণিত বর্শাফলক সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল, অশ্বক্ষুরাহত শিলাখণ্ড হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। অচিরে অশ্বারোহিগণ পর্ব্বততলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, একটী বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অদ্য আহেরিয়া, অর্থাৎ বসন্ত প্রারম্ভে বাৎসরিক মৃগয়ার দিন। অদ্যকার মৃগয়ার ফলাফল দ্বারা বৎসরের যুদ্ধের ফলাফল পরিগণিত হইবে, সুতরাং সূর্য্যমহলের দুর্গেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহ শত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহিষ্কৃত হইয়াছেন। মেওয়ার প্রদেশে চন্দাওয়ৎকুল আহবে ও বিপদে অগ্রগামী, সেই প্রসিদ্ধ বংশমধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা বা ভীষণপ্রতিজ্ঞ সেনানী কেহ ছিল না। দেখিলে বয়স ত্রিংশৎ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আকৃতি দীর্ঘ, নয়নদ্বয় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, শরীর অসুর-বলে বলিষ্ঠ। যোদ্ধা দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক পেশী স্ফীত ও যেন লৌহনির্ম্মিত। দুর্জ্জয়-সিংহের সহচরগণও সেই চন্দাওয়ৎ-বংশোদ্ভূত, এবং দুর্জ্জয়সিংহের অযোগ্য সহচর নহে।

দুর্গ হইতে অধিরোহণ করিয়া অশ্বারোহিগণ একটী নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকজন পাইককে পশুর সন্ধানে এইস্থানে পাঠান হইয়াছিল। পাইকগণ একে একে আসিয়া বনচর পশুর কোনও অনুসন্ধান না পাওয়ার সংবাদ দিল, কিন্তু যোদ্ধৃগণ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সে বনের সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোহর। কোথায় বা সূর্য্যকর পত্রের ভিতর দিয়া আসিয়া বনপুষ্প বা দূর্ব্বার সহিত ক্রীড়া করিতেছে; কোথায় বা বন এরূপ নিবিড় যে দিবাভাগেই অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইতেছে। কখন পর্ব্বত ও শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, কখন সুন্দর ঝর্ণার পার্শ্ব দিয়া, কখন ঝোপের নিকট দিয়া, যোদ্ধৃগণ নিঃশব্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে ক্ষেত্র, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও উপত্যকা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। যোদ্ধৃগণও জীবনের বসন্তকালের উদ্বেগ ও বীরমদে মত্ত হইয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সকলেই উৎসাহে পূর্ণ, সকলেই গর্ব্বিত, সকলেই আনন্দময়। মৃগয়ার ন্যায় উৎসাহপূর্ণ ব্যবসাই রাজস্থানে আর নাই, আহেরিয়ার ন্যায় আনন্দময় দিন আর নাই।

কতক্ষণ বনের ভিতর বিচরণ করিয়া যোদ্ধৃগণ একটী প্রান্তরে পড়িলেন; সেই প্রান্তরের সম্মুখে একটী পর্ব্বতদুর্গ প্রায় বৃক্ষাবৃত রহিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ঐ না পাহাড়জী ভূমিয়ার দুর্গ দেখা যায়?

অমাত্য বলিলেন,—হাঁ। এরূপ দুর্গ যদি নিকৃষ্ট ভূমিয়াদিগের হস্তে না থাকিয়া প্রকৃত যোদ্ধাদিগের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে মহারাণা এই যুদ্ধকালে অধিক সহায়তা পাইতেন।

দুর্জ্জয়। ভূমিয়াগণ রণশিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আপন দুর্গ ও আবাসস্থল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে যথোচিত সাহস প্রকাশ করে।

অমাত্য। সত্য, কিন্তু বর্শাচালন অপেক্ষা লাঙ্গল চালনে অধিক তৎপর।

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আর একজন যোদ্ধা কহিলেন,—ভূমিয়া দুর্গ রক্ষা হইতে ভূমি রক্ষায় অধিক তৎপর। যোদ্ধা কখন কখন আপন দুর্গচ্যুত হয়েন, কিন্তু ভূমিয়ার ভূমি পুরুষানুক্রমে তাহার সন্তানসন্ততি ভোগ করে; শত্রুতেও লইতে পারে না, রাণাও লইতে পারেন না।

অমাত্য। ইন্দুর মৃত্তিকায় একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে বাহির করা দুঃসাধ্য। পুনরায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

যোদ্ধৃদল অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন। জঙ্গল, ঝোপ, পর্ব্বত, গহ্বর, সমস্ত অন্বেষণ করিলেন; যে যে স্থানে পূর্ব্ব বৎসরে বরাহ দেখা গিয়াছিল, সমস্ত দৃষ্টি করিলেন। নিবিড় অন্ধকারময় বন, সুন্দর পর্ব্বত তরঙ্গিণীর তীর, শান্ত শব্দশূন্য প্রান্তর, সমস্ত বিচরণ করিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু কোনও বনচর পশুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাইকগণ নিবিড় জঙ্গলের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই একটীও পশু দেখিতে পায় নাই। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যোদ্ধৃগণ ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতেছেন। অদ্য বন কি বরাহশূন্য? একটী মৃগও দেখিতে পাইলাম না! এ বৎসর কি সূর্য্যমহলের অমঙ্গলের জন্য? এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন,—বন্ধুগণ! আমাদের অশ্ব শ্রান্ত হইয়াছে, আমরাও শ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আর বৃথা অন্বেষণ আবশ্যক নাই; চল, অশ্বগণকে বিশ্রাম দি, আমরাও বিশ্রাম করি। পরে যদি এই প্রশস্ত বনপ্রদেশে একটী বরাহ লুক্কায়িত থাকে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা হনন করিবে, নচেৎ আর বর্শা ধারণ করিবে না। সকলেই এই কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া একটী নিবিড় নিকুঞ্জবনের দিকে গমন করিলেন।

সে স্থলটী অতিশয় রমণীয়। পাদপশ্রেণী এরূপ নিবিড় পত্রপুঞ্জে আবৃত রহিয়াছে যে দ্বিপ্রহরের সূর্য্যরশ্মি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না; কেবল স্থানে স্থানে পত্ররাশির মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি যেন একটী সুবর্ণরেখার ন্যায় ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে। ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে, নবদূর্ব্বাদল সেই শ্যামল সুস্নিগ্ধ ছায়াতে অতিশয় কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই নিবিড় বনে শব্দমাত্র নাই, দ্বিপ্রহর দিবায় সেই নিকুঞ্জবন শান্ত, শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। এরূপ নিস্তব্ধ যে বৃক্ষ হইতে দুই একটী শুষ্কপত্র পতিত হইলে তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে, দুই একটী বনবিহঙ্গিনীর দ্বিপ্রহরের স্তিমিত রব শুনা যাইতেছে, এবং অদূরে একটী নির্ঝরিণীর সুন্দর সঙ্গীত ধীরে ধীরে কর্ণে পতিত হইতেছে। শ্রান্ত যোদ্ধৃগণ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া সেই স্থানের শোভা সন্দর্শন করিলেন। বোধ হইল, যেন কোন বনদেবীর পূজার জন্য প্রকৃতি অনন্ত স্তম্ভসারস্বরূপ পাদপশ্রেণী দ্বারা এই শান্ত হরিদ্বর্ণ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন, নির্ঝরিণী স্বয়ং বীণাবাদ্য করিতেছেন।

যোদ্ধৃগণ অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর উপবেশন করিলেন। ক্ষণেক শ্রমদূর করিয়া নির্ঝরের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন। কিছু ফলমূলের আয়োজন করা হইয়াছিল, দুর্গেশ্বর ও তাঁহার যোদ্ধৃগণ আনন্দে তাহা আহার করিতে বসিলেন। পুরাতন রীতি অনুসারে দুর্গেশ্বর সহসা যোদ্ধাদিগকে "দোনা", অর্থাৎ আপন পাত্র হইতে আহার পাঠাইলেন, তাঁহারাও এই সম্মানচিহ্ন সাদরে গ্রহণ করিলেন। নানারূপ কথা ও হাস্যধ্বনিতে বন ধ্বনিত হইল। পূর্ব্বঘটনার, পূর্ব্বযুদ্ধের কথা হইতে লাগিল। কিরূপে উপস্থিত যোদ্ধৃগণ দুর্গ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিরূপে শত্রুকে হনন করিয়াছিলেন, সালুম্ব্রাপতির প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, স্বয়ং রাণার সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা হইতে লাগিল। এবার মেওয়ার প্রদেশের বহু শত্রু, স্বয়ং দিল্লীশ্বর আসিতেছেন। মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর ও বুন্দির রাজগণ ম্লেচ্ছের সহিত যোগ দিয়া মেওয়ার আক্রমণে আসিতেছেন। কিন্তু রাণার অবশ্য জয় হইবে। অথবা যদি পরাজয় হয়, চন্দাওয়ৎকুল সেই যুদ্ধভূমিতে প্রাণ

দান করিবে, চন্দাওয়ৎকুল পলায়ন জানে না। দুর্জ্জয়সিংহ একথা বলিতে না বলিতে যোদ্ধারা উৎসাহে ও উল্লাসে সাধুবাদ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন,—আট বৎসর পূর্ব্বে যখন এই আকবরশাহ চিতোর হস্তগত করেন, রাণা উদয়সিংহ দুর্গত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সালুম্ব্রাপতি সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই, চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই। চারণদেব! সেদিনকার কথা একবার যোদ্ধৃগণকে শুনাও, চন্দাওয়ৎকুল কিরূপে যুদ্ধ করে একবার শ্রবণ করি।

আহেরিয়ার দিনে চারণদেব অনুপস্থিত থাকেন না। দুর্গেশ্বরের অভিপ্রায়মতে চারণদেব সাহীদাসের বীরত্ব-গীত আরম্ভ করিলেন। চিতোর ধ্বংসের সময় দুর্জ্জয়সিংহ ও তাঁহার যোদ্ধৃগণ সেই দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, চারণদেবের গীত শুনিতে শুনিতে সেদিনকার কথা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল।

গীত।

"যোদ্ধৃগণ! আপনারা সেদিনকার যুদ্ধ দেখিয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ সালুম্ব্রাপতির দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, তিনি সাহীদাসের বীরত্ব দেখিয়াছেন। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎদিগের রণস্থল, সেই সূর্য্যদ্বার সাহীদাস সেদিন ত্যাগ করে নাই, সেই সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ৎকুল ত্যাগ করে নাই।

"বায়ু-তাড়িত হইয়া উদয়সাগরের ক্ষিপ্ত তরঙ্গ যখন কূলে আঘাত করে তাহা দেখিয়াছ। তুর্কীদিগের অগণ্য সৈন্য সেইরূপ সূর্য্যদ্বারে বার বার আঘাত করিতে লাগিল, ভীষণ রবে সেই সৈন্যতরঙ্গ দুর্গের দিকে ধাবমান হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎরেখায় আহত হইয়া বারবার প্রতিহত হইল। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

"বনে অগ্নি লাগিলে কিরূপে লেলিহমান অগ্নিজিহ্বা আকাশপথে আরোহণ করে তাহা দেখিয়াছ। তুর্কীদিগের সৈন্য সেইরূপ দুর্গকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইরূপ বারবার দুর্গোপরি ধাবমান হইতে লাগিল। চন্দাওয়ৎ অল্পসংখ্যক, কিন্তু চন্দাওয়ৎ হীনবল নহে, বারবার ভীষণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিহত করিল, সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করিল না। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

"বর্ষাকালের মেঘরাশি অপেক্ষা তুর্কীদিগের সৈন্য অধিক। রাশি রাশি হত হইল, পুনরায় রাশি রাশি সেই দ্বার বজ্রনাদে আক্রমণ করিল। চন্দাওয়ৎকুল অসুরবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সেই পর্ব্বতচূড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল প্রতিহত হইল না! সাহীদাস তখনও একাকী শতের সহিত যুঝিতেছিলেন, সাহীদাস চিতোরের জন্য হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু দান করিয়া ছিন্নতরুর ন্যায় পতিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ সাহীদিগের রক্ষার্থ যুঝিতেছিলেন, আহত ও অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। যোদ্ধৃগণ! দুর্জ্জয়সিংহের ললাটে তুর্কীয় খড়্গ-অঙ্ক এখনও দেখিতে পাইতেছ, চন্দাওয়ৎকুল সমস্ত হত বা আহত হইল, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ সেই সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করেন নাই। চিতোরের সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎকুল সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।"

এই গীত হইতে হইতে চন্দাওয়ৎ যোদ্ধাদিগের নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল। গীত শেষ হইলে সকলে হুহুঙ্কারনাদে বন পরিপূরিত করিলেন। তন্মধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ ভীষণনাদে কহিলেন,—যোদ্ধৃগণ! অদ্য আমাদিগের চারিদিকে বিপদরাশি, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল বিপদের অপরিচিত নহে। অদ্য আমাদিগের চিতোর নাই, কিন্তু সহস্র পর্ব্বতশেখর ও পর্ব্বত-গহ্বর শিশোদিয়ার হস্ত হইতে কে লইতে পারে? মহারাণা উদয়সিংহ গত হইয়াছেন, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করেন না। মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় হউক, শিশোদিয়া জাতির জয় হউক, চন্দাওয়ৎকুলের জয় হউক।

ভীষণনাদে শত যোদ্ধা এই কথা উচ্চারণ করিলেন, সে শব্দ বন অতিক্রম করিয়া মেওয়ারের অনন্ত পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল! দুর্জ্জয়সিংহ পুনরায় বলিলেন,—চারণদেব! আমরা এক্ষণে পুনরায় মৃগয়ায় যাইব, একটী আহেরিয়ার গীত শুনাও, যেন অদ্য আমাদিগের আহেরিয়া

নিষ্ফল না হয়। চারণদেব পুনরায় বীণা লইলেন, উদ্ধ্বদিকে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে গীত আরম্ভ করিলেন।

গীত।

"যোদ্ধৃগণ! আট বৎসর হইল দিল্লীশ্বর চিতোর লইয়াছেন, কিন্তু দিল্লী ও শিশোদিয়ার এই প্রথম বিবাদ নহে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আর একজন দিল্লীশ্বর আল্লাউদ্দীন আর একবার চিতোর লইয়াছিলেন; কিন্তু চিতোর শিশোদিয়ার কণ্ঠমণি, চিতোর তুর্কী হস্তে কতদিন থাকে? সেবার হামির এই কণ্ঠরত্ন তুর্কীদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন; এবার প্রতাপসিংহ লইবেন। হামিরের জন্মকথা শ্রবণ কর, আহেরিয়ার একটী গীত শ্রবণ কর!

"লক্ষ্মণসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র উরুসিংহ। যুবরাজ উরুসিংহ দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণদান করেন, তাহা শিশোদিয়ার মধ্যে কোন্ বীর না জানে? চিতোর আক্রমণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই উরুসিংহ একদিন আহেরিয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন, শত যোদ্ধা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন। আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে?

"আন্দাওয়াকানন যুবকদিগের বীরনাদে প্রতিধ্বনিত হইল, তাঁহারা একটী বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। পর্ব্বত ও নির্ঝর উত্তীর্ণ হইয়া বরাহ ধাবমান হইল, মহানাদে যোদ্ধৃগণ ধাবমান হইলেন। আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে?

"অনেকক্ষণ পর সেই বরাহ এক শস্যক্ষেত্রের ভিতর লুকাইল, শস্য দ্বাদশ হস্ত উচ্চ, বরাহ আর দেখা গেল না। একজন মাত্র দরিদ্র রমণী একটী মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া শস্য রক্ষা করিতেছিলেন। রমণী বীরদিগের নৈরাশ দেখিয়া বলিলেন,—সম্বরণ করুন, আমি বরাহ শস্যক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিতেছি!

"এ কি মানুষী না নগবালা মহিষমর্দ্দিনী? নারী-বাহুতে কি এ বল সম্ভবে? নারী-হৃদয়ে কি এ বীর্য্য সম্ভবে? রমণী একটী বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তাহার অগ্রভাগ সূচীর ন্যায় শাণিত করিলেন, সেই অপূর্ব্ব বর্শা দ্বারা বরাহকে বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধৃদিগের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। বিস্মিত যোদ্ধৃগণ বাক্যশূন্য হইয়া রহিলেন।

"বরাহ রন্ধন করিয়া যোদ্ধৃগণ আহারে বসিয়াছেন, সহসা পার্শ্বস্থ একটী অশ্বের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, দেখিলেন একটী পদ একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই দরিদ্র রমণী মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া শস্যক্ষেত্র হইতে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া পক্ষী তাড়াইতেছিলেন, তাহার এক টুকরা মৃত্তিকা অশ্বপদে লাগিয়া অশ্ব আহত ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল!

"যোদ্ধৃগণ আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে যাইতেছেন, দেখিলেন, সেই দরিদ্র রমণী মস্তকে দুগ্ধপূর্ণ পাত্র লইয়া যাইতেছেন, ও দুই হস্তে দুইটী দুর্দ্দমনীয় মহিষকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিস্মিত উরুসিংহ রমণীর বল পরীক্ষার জন্য একজন যোদ্ধাকে সেই রমণীর দিকে বেগে অশ্বধাবন করিতে বলিলেন। অশ্ব তাঁহার উপর আসিয়া পড়িবে, রমণী বুঝিতে পারিলেন; কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, দুগ্ধ মস্তক হইতে না নামাইয়া, কেবল একটী মহিষকে অশ্বের শরীরের উপর ঠেলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্ব ও অশ্বারোহী ভূমিসাৎ হইল।

"উরুসিংহ অনুসন্ধানে জানিলেন যে সে কুমারী চোহানজাতির চন্দানবংশের এক দরিদ্র লোকের কন্যা। উরুসিংহ সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই কন্যার পুত্র বীরচূড়ামণি হামির। আল্লাউদ্দীন যখন চিতোর অধিকার করেন, তখন যুবরাজ উরুসিংহ প্রথমে জীবনদান করেন, পরে তাঁহার পিতা রাণা লক্ষ্মণসিংহ প্রাণদান করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক হামির তখন মাতার সহিত মাতুলালয়েই ছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হামির চিতোর উদ্ধার করিলেন।

"বীরগণ! উরুসিংহের আহেরিয়ার ফল চিতোর উদ্ধার। অদ্য দুর্জ্জয়সিংহ আহেরিয়ায় বহিষ্কৃত হইয়াছেন, সকলে দৃঢ়হস্তে বর্শা ধারণ কর। আহেরিয়ায় সফল হও—পুনরায় চিতোর উদ্ধারেও সফল হইবে।"

লম্ফ দিয়া যোদ্ধৃগণ অশ্বে আরোহণ করিলেন, তীরবেগে শত যোদ্ধা ধাবমান হইলেন। এবার যোদ্ধৃগণ নিরাশ হইলেন না, তিন চারিদণ্ড বন অন্বেষণ করিতে করিতে একটী ঝোপের ভিতর একটী প্রকাণ্ড বরাহ দেখা গেল। বরাহের বৃহৎ আকৃতি ও অসাধারণ বল দেখিয়া

আরোহীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। বরাহ যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া সে ঝোপ হইতে বাহির হইয়া অন্যদিকে পলাইল। মহাউল্লাসে অশ্বারোহিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

সে উল্লাস বর্ণনা করা যায় না। বরাহ যে দিকে পলাইল, অশ্বারোহিগণ বেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন। অশ্বগণ যেন সেই ভূখণ্ড পদভরে কাঁপাইয়া ছুটিল, পথের মধ্যে উন্নত শিলাখণ্ড বা পর্ব্বততরঙ্গিণী লম্ফ দিয়া অতিক্রম করিল, কণ্টকময় ঝোপ বা বৃক্ষ অগ্রাহ্য করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া ছুটিল। আরোহীদিগের জ্বলন্ত নয়ন সেই বরাহের দিকে স্থিরীকৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের উন্নত দক্ষিণ হস্ত শূন্যে বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের হৃদয় উল্লাসে ও উৎসাহে উৎক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বরাহ ক্ষণেক দৌড়াইয়া দেখিল অশ্বারোহিগণ নিকটে আসিতেছে। একবার স্থির হইয়া যেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চিন্তা করিল, কিন্তু শত যোদ্ধার হস্তে শত বর্শার শাণিত ফলা দেখিয়া সম্মুখ-রণচিন্তা ত্যাগ করিল, লম্ফ দিয়া একটী নিবিড় ও বিস্তীর্ণ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। নিমেষমধ্যে শত অশ্বারোহী সেই ঝোপ চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। উচ্চশব্দ করিয়া বরাহকে ঝোপ হইতে বাহির করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু বরাহ প্রাণভয়ে লুকাইয়াছে, বাহির হইবে না। কেহ কেহ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, কেহ বা সেই বিস্তীর্ণ ঝোপের কোন অংশে পত্রের শব্দ শুনিয়া অনুমান করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। অনেকক্ষণ সময় নষ্ট হইল, অনেক উদ্যম ব্যর্থ হইল, বরাহ ঝোপ হইতে বাহির হইল না।

তখন দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন,—বন্ধুগণ, আর এরূপ বৃথা উদ্যমে আবশ্যক কি ? দেখ সূর্য্য অস্তাচলে বসিয়াছেন, আর অধিক সময় নাই। সতর্কভাবে সকলে পদব্রজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। বরাহ এই ঝোপের মধ্যে আছে, আমরা চারিদিক হইতে মধ্যভাগে অগ্রসর হইলে বরাহ অবশ্য একদিক হইতে পলাইবার চেষ্টা করিবে, অথবা মধ্যদেশেই মরিবে।

যোদ্ধৃগণ ইহা ভিন্ন উপায় দেখিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণহস্তে বর্শা ধারণ করিয়া রহিলেন, তীক্ষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন। এবার বরাহ অবশ্যই বাহির হইবে, সহসা আক্রমণ করিতে না পারে, এই জন্য সকলে সতর্কভাবে সম্মুখে ও চারিদিকে দেখিতে দেখিতে ঝোপের ভিতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বরাহ বোধ হয় আরোহীদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সহসা লম্ফ দিয়া একদিক হইতে বাহির হইল; বিদ্যুৎবেগে নিকটস্থ যোদ্ধার পদ বিদীর্ণ করিল, নিমেষ মধ্যে দূরে পলাইল।

দুই একজন যোদ্ধা আহতের সেবার জন্য রহিলেন, অবশিষ্ট সকলে অশ্বারোহণ করিয়া পুনরায় বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পুনরায় ভূমি ও শিলাখণ্ড কম্পিত করিতে লাগিলেন, বায়ুবেগে কণ্টক ও তরঙ্গিণী অতিক্রম করিতে লাগিলেন, মহানাদে বন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। দুর্জ্জয়সিংহ উন্মত্তের ন্যায় অশ্ব ছুটাইলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা কম্পিত হইতেছিল।

পুনরায় বরাহ লুকাইল, পুনরায় বাহির হইয়া পলাইল, আবার লুকাইল। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ শ্রেণীভঙ্গ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ নিকটে, কেহ দূরে, কেহ প্রান্তরে, কেহ নিবিড় বনে, বরাহ অনুসন্ধান করিতেছেন।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অশ্বের শরীর ফেনময়, তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়ন স্থির, শত যোদ্ধামধ্যে তিনিই কেবল বরাহের গতি অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। অন্ধকারে বরাহ সকলের পক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে হয় নাই। তিনি যে জঙ্গলের দিকে স্থির নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তথায় বরাহ নিহিত ছিল।

এবার বরাহ রুষ্ট হইল। অদ্য একপ্রহর কাল জঙ্গল হইতে জঙ্গলে, গহ্বর হইতে গহ্বরে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তথাপি একজন যোদ্ধা অব্যর্থ নয়নে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় ঝোপের ভিতর লুকাইয়াছে, সেই একজন যোদ্ধা তাহাকে হনন করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে। একেবারে বিদ্যুতের ন্যায় গতিতে বরাহ দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিতে আসিল। দুর্জ্জয়সিংহ বামহস্তে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া লম্বমানকেশ সরাইলেন, তীব্র দৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্তের কম্পমান বর্শা ছাড়িলেন। শ্রান্তিবশতঃ বা অন্ধকারবশতঃ সে বর্শা

ব্যর্থ হইল, একটী বৃহৎ শিলাখণ্ডে লাগিয়া সে শিলাখণ্ড চূর্ণ করিল, বরাহ নিমেষমধ্যে অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি দুর্জ্জয়সিংহ পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া দশ হস্ত দূরে পড়িলেন। বরাহ মৃত অশ্বকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মৃত্যু অনিবার্য্য! রাজপুত যোদ্ধা অকম্পিত নয়নে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, মৃত্যু আসিল না।

অদৃষ্ট-হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটী বর্শা আসিল, বরাহের মুখের উপর লাগাতে দন্ত চূর্ণ হইয়া রক্তধারা বাহির হইল। সে আঘাতে বরাহ মরিল না, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহকে ত্যাগ করিয়া একেবারে জঙ্গলের মধ্যে পলাইল, রজনীর অন্ধকারে আর বরাহকে দেখা গেল না।

রজনীর অন্ধকারে দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, পর্ব্বত হইতে একজন দীর্ঘাকার যুবক অবতরণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তেজসিংহ

তদারভ্যাহং বিরাতকৃতসংসর্গো বন্ধুকুলমুৎসৃজ্য
* * অস্মিন্ কাননে দূরীকৃতকলঙ্কো বসামি।
—দশকুমারচরিতম্।

আহেরিয়ার দিন বরাহ পলায়ন করিল, দুর্জ্জয়সিংহের হস্তনিক্ষিপ্ত বর্শা ব্যর্থ হইল, অপরের সাহায্যে অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা হইল—এইরূপ শত চিন্তা দুর্জ্জয়সিংহকে দংশন করিতে লাগিল। দুর্জ্জয়সিংহ রোষে, অভিমানে, তাঁহার প্রাণরক্ষাকারীকে ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইলেন। ঈষৎ কর্কশস্বরে কহিলেন,—আমি আপনাকে চিনি না, বোধ করি আপনি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছেন।

অপরিচিত যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন,—মনুষ্যমাত্রেই মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা করা রাজপুতের বিশেষ কর্ত্তব্য, কেননা, তিনি যোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদকালে তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।

সামান্য পরিচ্ছদধারী অপরিচিত লোকের নিকট এইরূপ বাক্য শুনিয়া দুর্জ্জয়সিংহ ঈষৎ বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

যুবক বলিলেন,—পরে জানিবেন, এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছেন, কুটীরে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক ধীরে ধীরে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অন্ধকার রজনীতে বনপথের ভিতর দিয়া দুইজন যোদ্ধা নিস্তব্ধে যাইতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ দুর্ব্বল পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু অপরিচিতের দীর্ঘ ও ঋজু অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বাহু এবং ধীরগম্ভীর-পদবিক্ষেপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ উন্নতকায় পুরুষ তিনি দেখেন নাই, অথবা, আট বৎসর পূর্ব্বে কেবল একজনকে দেখিয়াছিলেন।

ক্ষণেক পর যুবা সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ আছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনার উষ্ণীষ দিয়া আপনার নয়ন আবৃত করুন, পরে আমি আপনার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইব। যদি অস্বীকৃত হয়েন এইস্থানে বিদায় হইলাম।

দুর্জ্জয়সিংহ আরও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু যুবকের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, অস্বীকার করা বৃথা। বিবেচনা করিলেন, যুবক কখনই আমার অনিষ্ট করিবেন না, এইক্ষণেই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। যুবকের সহায়তা ভিন্নও এই নিবিড় বন হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। ক্ষণেক এইরূপ চিন্তা করিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া নিঃশব্দে যুবকের হস্তে দিলেন, নিঃশব্দে যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়ন বন্ধন করিলেন।

তাহার পর যুবক দুর্জ্জয়সিংহের হস্ত ধরিয়া প্রায় একক্রোশ পথ লইয়া যাইলেন, এই পথের মধ্যে দুইজনের একটী কথাও হইল না। দুর্জ্জয়সিংহ কোন্ দিকে যাইতেছেন কিছুই জানিলেন না, কেবল বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে লাগিলেন, এবং একটী পর্ব্বত আরোহণ করিতেছেন,

বুঝিতে পারিলেন। শেষে যুবক সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহও দাঁড়াইলেন। যুবক তাঁহার চক্ষুর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্ব্বতগহ্বরে অপরিচিত লোক দ্বারা বেষ্টিত দেখিলেন। গহ্বরে একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে, সেই দীপালোকে দুর্জ্জয়সিংহ আপনার চতুর্দ্দিকে কেবল অসভ্য ভীলজাতীয় লোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা পরস্পরে কি কথা কহিতেছে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখন গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরক্ষণেই বাহিরে যাইতেছে, তাহার কারণও জানিতে পারিলেন না। তিনি রাজপুত ভাষায় কথা কহিলেন, পার্শ্বস্থ যুবক ভিন্ন কেহ সে কথা বুঝিতে পারিল না। যুবক তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, যুবক তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য এই গুহায় আনিয়াছেন, যুবক এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি দুর্জ্জয়সিংহ সেই যুবকের দিকে চাহিতে সংকুচিত হইতেছেন কি জন্য? দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না; কিন্তু সেই অন্ধকার গুহা, সেই ভীলযোদ্ধা, সেই অল্পভাষী যুবকের দিকে যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একজন দাস একটী ঝরণা হইতে জল আনিয়া দিল, দুর্জ্জয়সিংহ তাহাতে হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। পরে সেই ভৃত্য কতকগুলি ফলমূল ও আহারীয় সামগ্রী দুর্জ্জয়সিংহের সম্মুখে স্থাপন করিল। দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল; তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিলেন, সে যুবক নাই। ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—আমি সেই রাজপুত যুবকের অতিথি হইয়াছি, অতিথির সম্মুখে স্বয়ং আহার পাত্র স্থাপন করা রাজপুতের ধর্ম্ম। বিবেচনা করি ভীলদিগের মধ্যে থাকিয়া যুবক রাজপুতধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন।

এ কর্কশ বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভৃত্য স্থিরভাবে উত্তর করিল,—প্রভু রাজপুত ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েন নাই, কিন্তু কোন ব্রতবশতঃ আপাততঃ চন্দাওয়ৎকুলের সহিত তাঁহার আহার নিষিদ্ধ, এই জন্য এইক্ষণ আসিতে পারেন নাই।

দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। অস্পৃষ্ট আহার ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণেক পর সেই অপরিচিত যুবক পুনরায় দর্শন দিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন,—আতিথেয় ধর্ম্মে অশক্ত হইয়াছি, তাহার কারণ ভৃত্য নিবেদন করিয়াছে; যদি আপনার আহারে রুচি না হয়, বিশ্রাম করুন; আপনার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ চারিদিকে চাহিলেন। একে একে বহুসংখ্যক ভীলযোদ্ধা একবার গুহায় প্রবেশ করিতেছে, একবার বাহির হইতেছে। সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সকলে নিস্তব্ধ, সকলে অপরিচিত রাজপুত যুবকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন রাজপুত একটী আজ্ঞা দিলে, একটী ইঙ্গিত করিলে, তাহারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত! রাজপুত সে ইঙ্গিত করিলেন না।

দুর্জ্জয়সিংহ সাহসী, যুদ্ধ বা বিপদকালে তাঁহার অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না, কিন্তু এই অপূর্ব্ব স্থানে অসংখ্য অসভ্য যোদ্ধাদিগের মধ্যে আপনাকে অসহায় দেখিয়া তাঁহার হৃদয় একবার স্তম্ভিত হইল। তিনি এই পর্ব্বতগুহার মধ্যে একাকী ও নিরস্ত্র, তাঁহার চারিদিকে শত যোদ্ধা বেষ্টন করিয়া আছে, সকলে তীক্ষ্ণনয়নে অপরিচিত রাজপুতের দিকে চাহিতেছে, সকলে নিস্তব্ধ! দুর্জ্জয়সিংহ সেই অপরিচিত রাজপুতের দিকে পুনরায় চাহিলেন, তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল ও স্থির নয়ন দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

যুবক পুনরায় বলিলেন,—শয্যা রচনা হইয়াছে।

যুবক দুর্জ্জয়সিংহের মিত্র না শত্রু? যদি শত্রু হয়েন, তবে অদ্য বিপদের সময় দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণ বাঁচাইলেন কেন, শ্রান্তির সময় আপন আবাসস্থলে আহ্বান করিলেন কেন, ফলমূল ও আহারীয় দান করিলেন কেন, এই বহুসংখ্যক ধনুর্দ্ধর ভীল হইতে এখনও তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন কেন? দুর্জ্জয়সিংহ কিজন্য মিথ্যা সন্দেহ করিতেছেন? অবশ্যই যুবক কোন বিপদগ্রস্ত উন্নতবংশীয় রাজপুত হইবেন। স্বস্থানচ্যুত হইয়া ভীলদিগের আশ্রয় লইয়াছেন, অদ্য রাজপুত ধর্ম্ম অনুসারে দুর্জ্জয়সিংহের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ কেন তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন?

দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না; কিন্তু যখন সেই উন্নত কলেবর, সেই স্থিরনয়ন, সেই অল্পভাষী যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহ হয়। আহবক্ষেত্রে শত শত্রু মধ্যে যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, অদ্য এই যুবককে দেখিয়া কি জন্য সে বীর হৃদয় বিচলিত হইতেছে? সালুম্ব্রাধিপতি ও স্বয়ং মহারাণার নয়নের দিকে যে যোদ্ধা স্থিরনয়নে চাহিয়াছেন, অদ্য একজন বন্য যুবকের দিকে কি জন্য তিনি চাহিতে অক্ষম?

আপনার প্রতি ঘৃণা করিয়া, সন্দেহ দূর করিয়া, দুর্জ্জয়সিংহ যুবকের সহিত একবার সহজভাবে বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন,—যুবক! এই পর্য্যন্ত আমি এই অপরূপ গুহা ও আপনার অপরূপ সঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমার যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য একবার ধন্যবাদ দিতেও বিস্মৃত হইয়াছি।

যুবক। ধন্যবাদ আবশ্যক নাই, আমি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়াছি।

দুর্জ্জয়। তথাপি এ ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিতে পারি?

যুবক। আপনাকে অদ্য যেরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ অসহায় পাইয়া কোন পতিহীনা নারীর প্রতি বা কোন পিতাহীন বালকের প্রতি যদি কখন অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি এখন ধর্ম্মাচরণ করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। আমার নিজের কোন যাচ্ঞা নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ চকিত হইলেন! যুবক কি পূর্ব্বকথা জানেন? অদ্য কি শত ভীলযোদ্ধার দ্বারা পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিফল লইবেন? সভয়ে সেই ভীলযোদ্ধাদিগের দিকে দেখিলেন, সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত! সভয়ে যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক সেইরূপ গম্ভীর, নিশ্চেষ্ট! দুর্জ্জয়সিংহের অসমসাহসিক হৃদয়ে অদ্য প্রথম ভয়ের সঞ্চার হইল; এ যুবক কে?

যুবক পুনরায় বলিলেন,—শয্যা রচনা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া সদর্পে উত্তর দিলেন,—অদ্যই সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিব, অন্যের আবাসে বাস করা দুর্জ্জয়সিংহের অভ্যাস নাই।

যুবক। যেরূপ রুচি হয় সেইরূপ করিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ ছিল, অন্যের আবাসস্থলে বাস করা আপনার অভ্যাস আছে।

দুর্জ্জয়। আপনি কে জানি না, ইচ্ছা হয়, এই অসভ্য যোদ্ধা দ্বারা দুর্জ্জয়সিংহকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিবে না। রাঠোর তিলকসিংহের সহিত আমার বংশানুগত বিরোধ, সেই বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সম্মুখ সমরে তাঁহার সূর্য্যমহল দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছি, এ ক্ষত্রধর্ম্মমাত্র।

যুবক। সম্মুখসমরে আপনি সুপটু, সন্দেহ নাই, সেই জন্যই তিলকসিংহের মৃত্যু হইলে পর আপনি তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবার সহিত সম্মুখরণে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নারীকে হত্যা করিয়াছিলেন। আপনি ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একেবারে শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় এই কথা দুর্জ্জয়সিংহকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল, রোষে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া, দেশকাল বিস্মৃত হইয়া, লম্ফ দিয়া অপরিচিত যুবকের গলদেশ ধারণ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ শত ভীলযোদ্ধা ধনুকে তীর সংযোজনা করিল। অপরিচিত যুবক বামহস্তে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, দক্ষিণহস্তে ধীরে ধীরে দুর্জ্জয়সিংহকে শূন্যে উঠাইয়া অসুর-বীর্য্যের সহিত দশহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক অবিচলিত ও নিষ্কম্প। যুবকের কোষে অসি রহিয়াছে, যুবক তাহা স্পর্শ করেন নাই। পূর্ব্ববৎ স্থির অবিচলিত স্বরে কহিলেন,—শয্যা রচনা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ নতশিরে কহিলেন,—অদ্যই সূর্য্যমহলে যাইব।

তখন যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নিকটে আসিলেন, পুনরায় উষ্ণীষ দিয়া নয়নদ্বয় আবৃত করিলেন ও স্বয়ং অতিথির হস্তধারণ করিয়া গুহা হইতে বাহির হইলেন। একক্রোশ পথ দুইজনে পর্ব্বত নামিতে লাগিলেন, একটী কথামাত্র নাই। নৈশ বায়ুতে বৃক্ষপত্র মর্ম্মর শব্দ করিতেছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে দুরস্থ শৃগাল বা

বন্যপশুর শব্দ পাথিকের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সে নৈশ বায়ুতে দুর্জ্জয়সিংহের জ্বলন্ত ললাট শীতল হইল না, সে নিস্তব্ধতায় তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ স্তব্ধ হইল না।

একক্রোশ পথ আসিয়া যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়নের বস্ত্র খুলিয়া দিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, যে স্থানে যুবক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এ সেই স্থান। যুবক এইস্থানে দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে তাঁহার মুখ পুনরায় আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি কোনও কথা উচ্চারণ না করিয়া সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া একাকী দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

প্রাতঃকালের রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিয়াছে, এরূপ সময় দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এতক্ষণ আইসেন নাই বলিয়া দুর্গে সকলেই উৎসুক হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে সকলেই দৌড়াইয়া আসিল, দুর্জ্জয়সিংহের মুখের ভঙ্গি ও রক্তিমাবর্ণ দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া গেল। দুর্জ্জয়সিংহকে তাহারা চিনিত।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যাইয়া প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রীকে ডাকাইলেন। তিনি যুদ্ধে দুর্জ্জয়সিংহের ন্যায় সাহসী, মন্ত্রণায় অতুল্য। দুর্জ্জয়সিংহ ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়। এ দুর্গ যখন অধিকার করি, সে কথা স্মরণ আছে?

প্রধান। । সে কেবল আট বৎসরের কথা। অবশ্য স্মরণ আছে।

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের বিধবা হত হইলে পুত্রের কি হইয়াছিল?

প্রধান। এই দুর্গ হইতে নিম্নস্থ হ্রদে পড়িয়া বালক প্রাণ হারাইয়াছে।

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের পুত্র অদ্যাবধি জীবিত আছে।

প্রধান। তিলকসিংহের পুত্র?

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের পুত্র।

প্রধান। বালক তেজসিংহ?

দুর্জ্জয়। তেজসিংহ; কিন্তু সে অদ্য বালক নহে।

প্রধান। প্রভু ভ্রান্ত হইয়াছেন, এ দুর্গ হইতে হ্রদে পতিত হইলে মনুষ্য বাঁচে না, বালকের কথা কি?

দুর্জ্জয় উত্তর করিলেন না, কিন্তু মন্ত্রী দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধলক্ষণ সঞ্চার হইতেছে।

প্রধান। আপনি কিরূপে চিনিলেন? যাহাকে দশম বৎসরের বালক অবস্থায় একবার দেখিয়াছিলেন, তাহার মুখ দেখিয়া চিনা দুঃসাধ্য।

দুর্জ্জয়। তাহার মুখ দেখিয়া চিনি নাই, তাহার কথায় চিনিয়াছি, আরও একটী উপায়ে চিনিয়াছি।

প্রধান। সে কি?

দুর্জ্জয়। তিলকের সহিত আমি একবার বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার অসুরবীর্য্য মেওয়ারে আর কেহ ধারণ করিত না। তাহার একটী বিশেষ যুদ্ধকৌশল মেওয়ারে আর কেহ জানিত না। তেজসিংহ পিতার অসুরবীর্য্য ধারণ করে, তেজসিংহ পিতার কৌশল জানে।

দুইজনে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। প্রধান প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে প্রভুর কথা বিশ্বাস করিলেন না। বিবেচনা করিলেন, রজনীতে অদ্য কাহারও অসুরবীর্য্য দেখিয়া দুর্জ্জয়সিংহের ভ্রম হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ ক্ষণেক পর কহিলেন,—আরও একটী কথা আছে।

প্রধান। কি?

দুর্জ্জয়। তেজসিংহ অদ্য আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দুর্জ্জয়সিংহ একাকী ছাদে পদচারণ করিতেছেন, অদ্য তাঁহার মুখের ভঙ্গি দেখিলে তাঁহার যোদ্ধৃগণও চমকিত হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পুত্রশোক

ভীতেষ্বপি প্রহারিণঃ প্রীতিপরেষ্বপি ঘোষিণো
বিনীতেষ্বপি উদ্ধতাঃ দয়াপরেষ্বপি
নির্দ্দয়াঃ স্ত্রীষ্বপি শূরাঃ ভৃত্যেষ্বপি ক্রূরাঃ
দীনেষ্বপি দারুণাঃ।

—কাদম্বরী।

প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যমহলের সৈন্যসামন্ত সসজ্জ হইতে লাগিল। পূর্ব্বদিক হইতে নবজাত সূর্য্যরশ্মি সৈন্যদিগের বর্শা, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণের উপর প্রতিফলিত হইতে লাগিল, সৈন্যগণ উৎসাহ ও আনন্দে কোলাহল করিয়া দুর্গসম্মুখে একত্রিত হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ সৈন্যদিগের আনন্দরব শুনিয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধ-সজ্জা করিলেন, ও অচিরে অশ্বারোহণ করিয়া সৈন্যগণের মধ্যে আসিলেন। সহস্র সৈন্যের জয়নাদে সেই পর্ব্বতদেশ পরিপূরিত হইল।

আনন্দময় বসন্তের প্রাতঃকালে সৈন্যগণ পর্ব্বত, উপত্যকা ও ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে বসন্তপক্ষী এখনও গান করিতেছে, শাখা ও পত্র হইতে শিশির-বিন্দু এখনও সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখাইতেছে, প্রভাত-সমীরণ যোদ্ধাদিগের পতাকা লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন নিষ্কম্প, নির্ব্বাক প্রহরীর ন্যায় সেই সুন্দর দেশ রক্ষা করিতেছে। যোদ্ধৃগণ একটী পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য সেই পর্ব্বতের উপর সমরবাদ্য ও লোককোলাহল শ্রুত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য পর্ব্বতে উড্ডীন পতাকা ও সৈন্যসার দৃষ্ট হইল। অচিরে সৈন্যসার পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করিল, পর্ব্বত পুনরায় নির্জ্জন, শান্ত, নিস্তব্ধ!

বনের আনন্দময়ী শোভা দেখিয়া অশ্বারোহীদিগের হৃদয় উল্লাসপূর্ণ হইল। নিবিড় বনের ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, অথবা দুই এক স্থলে পত্রের ভিতর দিয়া দুই একটী রশ্মিরেখা দেখা যাইতেছে। বসন্তের সহস্র পক্ষী প্রাতঃকালে সুন্দর গীত আরম্ভ করিয়াছে, যেন সে নির্জ্জন বনস্থলী তাহাদিগের উৎসবগৃহ, আজি উৎসবের দিন! সেই নির্জ্জন ছায়াপূর্ণ বনস্থলী একবার সৈন্যরবে পরিপূরিত হইল, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে সৈন্যকোলাহল প্রতিধ্বনিত হইল। অচিরে সৈন্যগণ বন পার হইয়া যাইল, পুনরায় বন নির্জ্জন, নিঃশব্দ, অথবা কেবল বিহঙ্গ-বিহঙ্গিনীদিগের আনন্দনীয় কলরবে জাগরিত।

বন অতিক্রম করিয়া সৈন্যগণ একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; চারিদিকে কেবল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে, মধ্যে সমতল ভূমিতে সুপক্ক যবধান্য বায়ুতে হ্রদের লহরীর ন্যায় দুলিতেছে। কোন কোন স্থলে অহিফেনের রক্তপুষ্পসমুদয় সেই হরিদ্র যবশস্যের মধ্যে শোভা পাইতেছে। নীল নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বসন্তের সূর্য্য সেই আনন্দময় ক্ষেত্রচয়ের উপর সুবর্ণরশ্মি বর্ষণ করিতেছে।

এইরূপে সৈন্যগণ পর্ব্বত ও ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কয়েক ক্রোশ এইরূপে অতিবাহিত করিয়া চন্দ্রপুর গ্রামে উপস্থিত হইল। সূর্য্যমহল দুর্গের অধীনে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী "বশী" গ্রাম ছিল। যুদ্ধ ও বিপদকালে কোন কোন গ্রামের লোক আপনাদিগের জীবন, শস্য ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য উপায় না দেখিয়া কোন কোন পরাক্রান্ত যোদ্ধার বশ্যতা স্বীকার করিত। সেই অবধি উক্ত যোদ্ধা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন, এবং তাহারা ঐ যোদ্ধার "বশী" অর্থাৎ অধীন নিবাসী হইয়া থাকিত। পূর্ব্ববৎ তাহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা পূর্ব্ববৎ স্বাধীন নহে। তাহারা যোদ্ধার দাস, যোদ্ধার ভূমিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না, যোদ্ধার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

এইরূপে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের প্রজাগণ মেওয়ারের অনন্ত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপনাদিগের রক্ষার জন্য উপায় না দেখিয়া বহুকালাবধি সূর্য্যমহলেশ্বরদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

যতদিন রাঠোরগণ সূর্য্যমহল দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন, ততদিন চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের

"উত্তরে কমলমীর হইতে ক্ষণে রুক্মনাথ পর্য্যন্ত পর্ব্বত-প্রদেশমাত্র মহারাণার অধীন; অবশিষ্ট সমস্ত প্রশস্ত ভূমি মোগলের করকবলিত। কিন্তু এই প্রশস্ত ভূমি হইতে মোগলের কোন লাভ নাই; মহারাণার আদেশে এ মোগলের-কবলিত প্রদেশ জনশূন্য অরণ্য। এস্থানে এক্ষণে কৃষক চাষ করে না, গোরক্ষক গোরক্ষা করে না, মনুষ্য বাস করে না। মহারাণার আদেশে এ প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী পর্ব্বতপ্রদেশের মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছে; বুনাস ও রবীনদীর তীরে উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয় এক্ষণে জঙ্গলময় ও হিংস্রক পশুর আবাসস্থল হইয়াছে; আরাবলি পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থ সমস্ত মেওয়ার-প্রদেশ প্রদীপশূন্য।

"মহারাণার আদেশ কে লঙ্ঘন করিতে পারে? মহারাণা স্বয়ং সতত এই প্রদেশ দর্শন করিতে যান, সালুম্ব্রা সতত মহারাজের সঙ্গে গিয়াছে। সমস্ত প্রদেশে অরণ্যের নির্জ্জনতা দর্শন করিয়াছি, অরণ্যের নিস্তব্ধতা শ্রবণ করিয়াছি, শস্যের স্থানে উচ্চ তৃণক্ষেত্র দর্শন করিয়াছি, গমনাগমনের পথে কণ্টকময় বাবুল বৃক্ষ ও নিবিড় জঙ্গল দেখিয়াছি, মানবগৃহে হিংস্রক পশুকে বাস করিতে দেখিয়াছি। একজন ছাগরক্ষক বুনাস-নদী-তীরে নিভৃতে ছাগরক্ষা করিতেছিল, তাহার মৃতদেহ এখনও বৃক্ষে লম্বমান রহিয়াছে! অন্য কেহ মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

"মোগলগণ বুঝিবে, মেওয়ারের উদ্যানখণ্ড এক্ষণে অরণ্য ও অফলপ্রদ। তাহারা জানিবে, মহারাণার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এক্ষণে অরণ্য পার হইতে হইবে, তথায় মনুষ্য নাই, সৈন্যের খাদ্য নাই, আবাসস্থল নাই। তাহারা আরও জানিবে, সুরাট প্রভৃতি পশ্চিমসাগরের বন্দরের সহিত দিল্লীর যে বাণিজ্য ছিল তাহা এক্ষণে নিষিদ্ধ। এক্ষণে অরণ্যের ভিতর দিয়া তথায় যাইতে হইবে, গমনের সময় আমরা সুষুপ্ত থাকিব না।

"বীরগণ! এইরূপে আমরা মেওয়ারের বহির্দ্বার রক্ষা করিয়াছি। পর্ব্বত-প্রদেশের ভিতরে প্রতি দুর্গে, প্রতি উপত্যকায় সৈন্য আছে। চন্দাওয়ৎকুল শীঘ্রই মহারাণার নিকট উপস্থিত হইবে, অন্যান্য যোদ্ধৃকুল চারিদিক হইতে আসিতেছে, সম্মুখ রণের জন্য মহারাণার সৈন্যের অপ্রতুলতা হইবে না, ভূমিয়গণ যুদ্ধ জানে না, তাহারা নিজ নিজ উপত্যকা ও নিজ নিজ আবাস-পর্ব্বত রক্ষা করিবে। বন্যজাতিগণও ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধ দান করিবে। দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ, তুর্কীদিগকে সমর-উৎসবে আহ্বান করিবে। শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহ দিল্লীশ্বরের পুত্রের সহিত বড় ধূমধামে আসিতেছেন, আমরাও তাঁহাকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছি।

"বীরগণ! এক্ষণে হোলীর সময় নাগরিকগণ হইতে আপনাদিগেরও পরিত্রাণ নাই, আমারও পরিত্রাণ নাই। আপনাদিগের মস্তকে, বক্ষে, বাহুতে, পরিচ্ছদে আবীর দেখিতেছি, দুষ্ট নাগরিকগণ আমারও শুক্লকেশ ও শ্বেতশ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। প্রাসাদ, কুটীর, পথ, ঘাট, সমস্ত রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। আর এক হোলীর দিন আসিতেছে, সে যোদ্ধার প্রকৃত আনন্দের দিন। যোদ্ধার মস্তক ও বক্ষ অন্য প্রকারে রঞ্জিত হইবে, এই পর্ব্বত-সঙ্কুল প্রদেশের প্রত্যেক গিরি ও উপত্যকা মনুষ্য-শোণিতে রঞ্জিত হইবে। ঐ নাগরিকদিগের গীত ও বাদ্য শুনিতেছি, সেদিন মেওয়ারের অন্যরূপ বাদ্য হইবে, অন্যরূপ গীত গগনে উত্থিত হইবে। সেই আনন্দের দিনের জন্য আমার যোদ্ধৃগণ প্রস্তুত হও।"

সালুম্ব্রাধিপতির এই উৎসাহ-বাক্যে যোদ্ধৃগণ বীরমদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, ঝন্ঝনাশব্দে কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল। সে শব্দ, সে হুঙ্কার, সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, সালুম্ব্রার পর্ব্বতশিখর অতিক্রম করিয়া গগনে উত্থিত হইল। এই উল্লাসরব থামিতে থামিতেই সেই প্রশস্ত সভাগৃহে উন্নত গীতধ্বনি শ্রুত হইল, সালুম্ব্রার বৃদ্ধ চারণদেব পূর্ব্বকালের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।

গীত।

"যোদ্ধৃগণ! আপনারা যুবক, আপনাদিগের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, আপনাদিগের আশা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয়। বৃদ্ধের দৃষ্টি অতীতে। সেই অতীতকাল কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার ন্যায় আমার মানসচক্ষু আচ্ছাদন করিতেছে, আমি বহির্জগৎ দেখিতেছি না। সেই মেঘমালার মধ্যে অন্য একটী জগৎ দেখিতেছি, অন্য বীর আকৃতি দেখিতেছি, শ্রবণ করুন।

"অদ্য আমাদের মহারাণা চিতোরে নাই, মহারাণা পর্ব্বত-কন্দরে বাস করেন, মহারাণা বৃক্ষতলে শিশুদিগকে লালনপালন করেন, শব্দশূন্য নিবিড় জঙ্গল মহারাণার শুদ্ধান্তঃপুর। বাল্যকালে আমি আর একজনকে এইরূপ দেখিয়াছিলাম, তিনিও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেন, পর্ব্বতশিখর তাঁহার উন্নত প্রাসাদ ছিল। সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় পূর্ব্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, সেকথা শ্রবণ করুন।

"সেই বালক একদিন ভ্রাতার সহিত চারণীদেবীর পর্ব্বতে গিয়াছিলেন; নির্ভীক বালক অন্য আসন ত্যাগ করিয়া সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন। চারণীদেবী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—যিনি সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন, একদিন তিনি সিংহাসনে বসিবেন। রোষে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালককে আক্রমণ করিল, কেননা উভয়েই রাজপুত্র। বালক আঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া এক চক্ষু অন্ধ হইয়া পলাইল। কোথায় পলাইল?

"ছাগরক্ষকদিগের নিকট অন্বেষণ কর। তাহাদিগের ঐ মলিন বেশধারী অথচ তেজঃপূর্ণ ভৃত্যটী কে? ছাগরক্ষকগণ জানে না, জানিলে কি ছাগরক্ষণে অপটু বলিয়া বালককে অবমাননা করিয়া দূর করিয়া দিত? অবমানিত, দূরীকৃত বালক কোথায় যাইল?

"জঙ্গলের ভিতর অন্বেষণ কর, শ্রীনগরের বীর করিমচাঁদের একজন সামান্য সেনা পরিশ্রান্ত হইয়া কি সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বটবৃক্ষই তাহার চন্দ্রাতপ, তৃণই তাহার শয্যা, খড়্গই তাহার উপাধান। বৈকালিক সূর্য্যকিরণ সেই পত্ররাশি ভেদ করিয়া বালকের মুখের উপর পড়িয়াছে, একটী সর্প চক্র-বিস্তার করিয়া সেই রৌদ্র নিবারণ করিতেছে। করিমচাঁদের সামান্য সেনার জন্য কি সর্প চক্র-বিস্তার করিয়াছে? এ সামান্য সেনা নহে, এ বালক গুপ্তবেশে রাজপুত্র, সর্প বালকের রাজচ্ছত্রধারী।

"দিন গেল, মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল, সেই বালক সিংহাসনে বসিলেন, রাজচ্ছত্রধারী তাঁহার উপর ছত্র ধরিল। ঐ শুন বজ্রনাদ, ঐ দেখ, সংগ্রামসিংহের অশীতি সহস্র অশ্বারোহী মেদিনী কম্পিত করিতেছে! ঐ দেখ, তাঁহার অসংখ্য জয়পতাকায় আকাশ রক্তবর্ণ হইতেছে! ঐ দেখ, শতদ্রু হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত ও সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে, অষ্টাদশ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি এ রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন! পুনরায় কি পৃথ্বীরাজের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত একচ্ছত্র করিবেন? কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে মেঘরাশি জড় হইতেছে, সে তুমুল ঝটিকা ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল, নূতন আগন্তুক বাবরের মোগল-সৈন্য ভারতক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল! সিংহবল প্রকাশ করিয়াও সংগ্রামসিংহ বাবরের নিকট পরাস্ত হইলেন। কিন্তু বীরের বীরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর—যতদিন বাবরকে পরাস্ত না করিব, ততদিন চিতোর প্রবেশ করিব না; মরুভূমি আমার শয্যা, আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! সংগ্রামসিংহ প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন করে না; পৃথুরাজের সিংহাসনে কি আবার হিন্দুরাজা উপবেশন করিবেন? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর দেখিতে পাই না, সংগ্রামসিংহ কোথায় গেলেন? তাঁহার অধীনস্থ ষোড়শ রাজা ও শতাধিক রাওয়ৎ ও রাওয়ল কোথায় গেলেন? পঞ্চশত হস্তী, অশীতি সহস্র অশ্বারোহী কোথায় গেল? সে আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে! সে মহাতেজ চিরকালের জন্য লীন হইয়াছে।

"লীন হয় নাই। যোদ্ধৃগণ, সবল হস্তে খড়্গ ধারণ কর, তীক্ষ্ন বর্শা মস্তকের উপর উত্তোলন কর, হুঙ্কার-রবে যুদ্ধে ধাবমান হও, বায়ু-তাড়িত তৃণবৎ তুর্কীদিগকে দূরে তাড়াইয়া দাও, চিতোর নগর জয় জয়-নাদে পরিপূরিত কর। বৃদ্ধের পূর্ব্বস্মৃতি কেবল স্বপ্ন নহে, মেওয়ারের পূর্ব্বদিন আসিবে। পর্ব্বত-কন্দর ও নিবিড় বন ত্যাগ করিয়া সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপ-সিংহও সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপসিংহের নামও দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত, সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত, হিমাচলের তুষারাবৃত উন্নত শেখর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে।"

বৃদ্ধ নীরব হইল। ক্ষণমাত্র সভাস্থল নীরব, সহসা শত যোদ্ধার বজ্রনাদ ও হুঙ্কার শব্দে সালুম্ব্রার পর্ব্বত কম্পিত হইল। পর্ব্বতের নীচে সৈন্যগণ সে শব্দ শুনিল, শতগুণ উচ্চরবে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত করিল।

চারণদেব নিজস্থানে উপবেশন করিলে পর সালুম্ব্রাধিপতি যোদ্ধাদিগের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—বীরগণ, যুদ্ধের অধিক বিলম্ব নাই। যুদ্ধ-সময়ে সালুম্ব্রা সর্ব্বদাই রাণার দক্ষিণে থাকেন, আমি কেবল সৈন্যসংগ্রহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। চন্দাওয়ৎকুলের প্রধান প্রধান বীরগণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছেন, চল কল্যই আমরা মহারাণার আধুনিক

রাজধানী কমলমীরাভিমুখে যাত্রা করি। বীরগণ, আমাদের সভাভঙ্গ হইল। বন্ধুগণ, অদ্য হোলীর দিন, চল একবার বাৎসরিক আনন্দে মগ্ন হই, আগামী বৎসরে পুনরায় হোলী দেখিব, কে বলিতে পারে?

প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত ছাদে যোদ্ধৃগণ অশ্বারোহণে হোলী খেলিতে লাগিলেন, অশ্বচালনে ও আবীরনিক্ষেপে নিপুণতা দেখাইতে লাগিলেন, পরস্পরের কুম্‌কুমে পরস্পরের মস্তক, দেহ ও অশ্বদেহ রঞ্জিত হইল, অশ্বের পদশব্দ ও যোদ্ধাদিগের আনন্দরব চারিদিকে শ্রুত হইল। অশ্বগণ কখন তীব্রগতিতে যাইতেছে, কখন সহসা দণ্ডায়মান হইতেছে, কখন লম্ফ দিয়া পলাইতেছে, যেন তাহারাও এই ক্রীড়ায় উন্মত্ত। অশ্বারোহিগণ অসাধারণ নিপুণতার সহিত অশ্বচালনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষা ও অপরের উপর আবীর নিক্ষেপ করিতেছেন। নীচে সৈন্যগণ, নগরে নাগরিকগণ এই ক্রীড়ায় লিপ্ত হইল, সম্বৎসরিক আনন্দরবে সালুম্ব্রা-পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেনানী ও সৈন্যগণের মধ্যে কয়জন পরবৎসরে পুনরায় এই ক্রীড়া করিবে? আর কত সহস্র জন তাহার পূর্ব্বে হল্‌দীঘাটার ভীষণ পর্ব্বততলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রতাপসিংহ

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
—ভগবদ্গীতা।

কয়েকদিবস মধ্যে চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সালুম্ব্রাধিপতি সমস্ত চন্দাওয়ৎকুলের সৈন্য লইয়া কমলমীরে মহারাণার সহিত যোগ দিলেন। অন্যান্য কুলের যোদ্ধৃগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। দেবগড় হইতে সঙ্গাওৎকুলেশ্বর দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া আসিলেন, তাঁহারাও চন্দাওয়ৎকুলের এক শাখামাত্র। বেদনোরের মৈর্ত্ত্যকুলেশ্বরগণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আসিলেন। তাঁহারা রাঠোরবংশীয়, মেওয়ারে তাঁহাদিগের অপেক্ষা সাহসী যোদ্ধা ছিল না। এই বংশের জয়মল্লই আকবর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বয়ং আকবরহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা এখনও সে কথা বিস্মরণ হন নাই, পিতার বীরত্ব অনুকরণ করিতেই মহারাণার নিকট আসিয়াছেন। কৈলওয়া হইতে জগাওয়ৎকুল বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কমলমীরে আসিলেন, তাঁহারাও চন্দাওয়ৎকুলের শাখা মাত্র। এই জগাওয়ৎকুলোদ্ভব পত্ত নামক বীরশ্রেষ্ঠ চিতোর ধ্বংসকালে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সালুম্ব্রাধিপতির মৃত্যুর পর যোড়শবর্ষীয় পত্ত চিতোর দ্বার রক্ষা করেন, অকম্পিত হৃদয়ে সম্মুখযুদ্ধে নিজ মাতা ও বনিতার মৃত্যু দেখেন, অকম্পিত হৃদয়ে সেই দ্বারদেশে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করেন। তাঁহারই জ্ঞাতিবন্ধু এক্ষণে জগাওয়ৎকুলেশ্বর, জগাওয়ৎকুলের নাম রাখিতে কৈলওয়া হইতে আসিয়া এক্ষণে মহারাণার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দৈলওয়ারা হইতে ঝালাকুল, বৈদলা ও কোটারি হইতে চোহানকুল, বিজলী হইতে প্রমরকুল, অন্যান্য স্থান হইতে অন্যান্য কুলের যোদ্ধৃগণ, মেঘরাশির ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল। অচিরে দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য কমলমীরে উপস্থিত হইল, সমগ্র ভারতক্ষেত্রে এরূপ দ্বাবিংশ সহস্র বীরাগ্রগণ্য দেশানুরাগী যোদ্ধা আর ছিল না।

অদ্য ফাল্গুন মাসের শেষদিন, বসন্তোৎসবের শেষদিন, সুতরাং রজনী দ্বিপ্রহরে সেনাগণ এই উৎসবে মত্ত রহিয়াছে। পর্ব্বতশিখরে, উপত্যকায়, নগরের পথে, গৃহস্থের বাটীতে, অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড দেখা যাইতেছে, রজনীর অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিতেছে, সেই কৃষ্ণ পর্ব্বতরাশিকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে সেনাগণ আবীর ও অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেছে, হোলীকে দগ্ধ করিতেছে, গীতরবে ও হাস্যধ্বনিতে নৈশনিস্তব্ধতা বিদূরিত করিতেছে। পর্ব্বতশিখর হইতে সেই অন্ধকারময় উপত্যকা যতদূর দেখা যায়, বৃক্ষরাশির ভিতর দিয়া এইরূপ অগ্নিকুণ্ড দৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ আনন্দরব শ্রুত হইতেছে। কল্‌ কল্‌ রবে পর্ব্বত-নদী সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে, আপন স্বচ্ছবক্ষে এই অসংখ্য অগ্নিশিখা প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। বসন্তগীতের মধ্যে মধ্যে চারণ দিনের যুদ্ধ বর্ণনা স্থানে স্থানে শ্রুত হইতেছে,

মেওয়ারের গৌরব, মেওয়ারের বিপদরাশি, মেওয়ারের আসন্ন বিজয়, এই সমস্ত বিষয়ের গীত সৈন্যমণ্ডলীকে প্রোৎসাহিত করিতেছে, আনন্দ গীতের সঙ্গে সঙ্গে সেই গীত নৈশ গগনে উত্থিত হইতেছে।

এ সমস্ত উৎসব ব্যাপার হইতে বহুদূরে একটী অন্ধকারময় পর্ব্বতস্থলীর উপর একজন যোদ্ধা একাকী পদচারণ করিতেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সহসা দণ্ডায়মান হইতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের গীত শুনিবার জন্য নহে। মধ্যে মধ্যে সেই উপত্যকার মধ্যে যতদূর দেখা যায়, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের অগ্নিকুণ্ড দেখিবার জন্য নহে। কখন কখন কমলমীরের অপূর্ব্ব শৈলদুর্গের উপর নয়ন নিক্ষেপ করিতেছিলেন, কখন অসংখ্য সৈন্যের দিকে চাহিতেছিলেন, কখন বা আপন হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া সেই নক্ষত্রবিভূষিত অন্ধকারময় নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ইনি মহারাণা প্রতাপসিংহ।

প্রতাপসিংহের কোষে অসি লম্বমান রহিয়াছে, নিকটে বৃক্ষতলে তৃণশয্যা রচিত হইয়াছে, চিতোর পুনরায় হস্তগত না করিয়া যোদ্ধা অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই ব্রত যতদিন না সিদ্ধ হয়, ততদিন সুবর্ণ রৌপ্য স্পর্শ করিবেন না, জটা শমশ্রু বিমোচন করিবেন না, বৃক্ষপত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবেন না, বেশভূষায় সামান্য দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু স্পর্শ করিবেন না। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণও ইষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা কঠোর ব্রতসাধন করেন নাই, জগতের বীরাগ্রগণ্যগণও অভীষ্ট সাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা জীবনব্যাপী উদ্যম করেন নাই।

সমগ্র ভারতভূমির ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব, বুদ্ধিবল, বাহুবল, অস্ত্রবল প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছে; তাহার সঙ্গে রাজস্থানের অসাধারণ বীরত্ব, মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের যুদ্ধবল একত্রিত হইয়াছে। ঐ নির্জ্জন পর্ব্বতস্থলীতে যে যোদ্ধা অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, উনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একাকী যুঝিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথবা স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য শেষ রণস্থলে, মেওয়ারের শেষ উপত্যকায় বা পর্ব্বত-কন্দরে হৃদয়ের শোণিত দিবেন, স্থিরসংকল্প করিয়াছেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর মহারাণার কয়েকজন প্রধান সেনানী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, মহারাণা তাঁহাদিগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাণার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, তিনি সাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন।

সেই পর্ব্বতস্থলীতে সকলে উপবেশন করিলেন। প্রতাপসিংহ বলিলেন,—বীরগণ! আপনাদিগের সাহস, আপনাদিগের উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি, এই শিখর হইতে এই অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া আমি উল্লসিত হইয়াছি, সেই জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতে এই নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিয়াছি।

সালুম্ব্রাধিপতি রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ রাণার দক্ষিণদিকে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—মহারাণা! যুদ্ধের সময়, বিপদের সময়, কবে মেওয়ারের যোদ্ধৃগণ মেওয়ারের মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে? ঐ যে অসংখ্য সৈন্য দেখিতেছেন, উহাদের হৃদয়ের শোণিত, আমাদের হৃদয়ের শোণিত মহারাণার। আজ্ঞা করুন, সে শোণিত বহিবে।

প্রতাপ। কৃষ্ণসিংহ, আপনার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। যেদিন পিতার মৃত্যু হয়, যেদিন ভ্রাতা যোগমল্ল সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেদিন সভার মধ্যে আপনিই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—মহারাজ! আপনার ভ্রম হইয়াছে, ঐ স্থান আপনার ভ্রাতার! সেইদিন আপনিই আমার কোষে এই অসি ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন; যতক্ষণ অসি আমার হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সালুম্ব্রাধিপতি আমার দক্ষিণে থাকিবেন।

কৃষ্ণসিংহ। সালুম্ব্রা ইহা ভিন্ন অন্য পুরস্কার চাহে না। স্বামিধর্ম্মই সালুম্ব্রার পুরুষানুগত পুরস্কার।

পরে রাঠোর বংশীয় জয়মল্ল ও জগাওয়ৎ বংশীয় পত্তের সন্ততি ও আত্মীয়গণকে আহ্বান করিয়া মহারাণা বলিলেন,—চিতোর ধ্বংসের সময় জয়মল্ল ও পত্ত জীবন দান করিয়া যে যশ ক্রয় করিয়াছেন; পুনরায় চিতোর অধিকার করিয়া আপনারাও কি সেই যশ ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন?

তাঁহারা উত্তর করিলেন—সাধন জগদীশ্বরের হস্তে, চেষ্টায় যোদ্ধৃগণের ত্রুটি হইবে না।

পরে কোটারির চোহানকুলেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন,—পিতা যখন হত্যাকারক রণবীরের করকবল হইতে গোপনে আনীত হইয়া এই কমলমীরে গোপনে বাস করিতেছিলেন, যখন পিতাকে সকলে সন্দেহ করিয়াছিলেন, চোহানকুলেশ্বরই তাঁহার সহিত আহার করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন! চোহানকুল সে স্বামিধর্ম্ম এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই।

চোহান। চোহানকুল স্বামিধর্ম্ম কখনও বিস্মৃত হয় না।

প্রতাপ। বিজলীপতি! আপনার পিতাই পিতার সেই দূরবস্থায় তাঁহাকে কন্যাদান করিয়াছিলেন। মাতুল! আপনি প্রতাপের প্রতি যত্ন ভুলিবেন না, এই আসন্ন যুদ্ধে প্রতাপের গৌরব রক্ষা করিবেন।

উল্লাসে বিজলীপতি কহিলেন,—সে গৌরব রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিবে।

পরে দৈলওয়ারার অধীশ্বরের দিকে চাহিয়া মহারাণা কহিলেন,—ঝালাকুল মেওয়ারের স্তম্ভস্বরূপ, আসন্ন বিপদে তাঁহারাই আমাদিগের প্রহরিস্বরূপ।

দৈলওয়ারাপতি উত্তর করিলেন,—ঝালা স্বামিধর্ম্ম জানে, যুদ্ধকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।

এইরূপে সকল যোদ্ধার সহিত ক্ষণেক কথোপকথন হইলে পর মহারাণা কহিলেন,—"বীরগণ! আপনাদিগকে আহ্বান করিবার কারণ আপনাদিগের নিকটে অজ্ঞাত নাই। সমগ্র ভারতক্ষেত্রের সৈন্যবল মেঘরাশির ন্যায় একত্রিত হইতেছে; বর্ষাকালের প্রারম্ভেই মেওয়ারভূমির উপর আসিয়া পড়িবে। শত্রুগণ আমাদিগকেও সুষুপ্ত দেখিবে না। তাহারা মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্র জঙ্গলময় দেখিবে; মেওয়ারের পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশে তাহাদিগের প্রবেশ নাই।

"বাপ্পারাওয়ের বংশ কি বিদেশীয়দিগের নিকট শির নত করিবে? সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্তানগণ কি তুর্কীর দাস হইবে? তাহা অপেক্ষা জগৎ হইতে শিশোদীয়কুল একেবারে বিলুপ্ত হউক, সুন্দর মেওয়ার দেশের পর্ব্বত ও উপত্যকা সাগরজলে মগ্ন হউক।

"প্রতাপসিংহ মাতৃমুখ উজ্জ্বল করিবে, প্রতাপসিংহ তুর্কীদিগের সহিত যুঝিবে, পূর্ব্বপুরুষদিগের বাহুবল এ বাহুতে আছে কিনা, দেখিবে। যোদ্ধৃগণ! আমরা কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিব, বাপ্পারাওয়ের কুল স্বাধীন রাখিব, সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্ততিগণ দাসত্ব জানে না—কখনও জানিবে না।

"উৎসবের দিন অদ্য শেষ হইল, আমাদিগের কার্য্যের দিবস উদয় হইতেছে। যোদ্ধৃগণ! সে কার্য্যে ব্রতী হও, দৃঢ়হস্তে অসি ধারণ কর, এখনও মানসিংহ ও আকবরশাহ দেখিবেন, মেওয়ারের রাজপুতগৌরব বিলুপ্ত হয় নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মানসিংহ

যেনাস্যভ্যুদিতেন চন্দ্র গমিতকান্তিং রবৌ তত্ততে।
যুজ্যতে প্রতিকর্ত্তুমেব ন পুনস্তস্যৈব পাদগ্রহঃ॥

—কাব্যপ্রকাশ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল। এই কয়েক মাস প্রতাপসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি যে পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশখণ্ড রক্ষা করিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দুর্গ, প্রত্যেক উপত্যকা, প্রত্যেক পর্ব্বতকন্দর বারবার দর্শন করিলেন। দুর্গে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সৈন্যগণকে ও সমস্ত মেওয়ারবাসীদিগকে উৎসাহিত করিলেন। দুর্গেশ্বরগণ সসৈন্যে রাণার সহিত যোগ দিলেন। ভূমিয়াগণ সম্মুখ রণ জানে না, কিন্তু নিজ নিজ ভূমিরক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। মেওয়ারের অসভ্য জাতিগণও মহারাণার উৎসাহে উৎসাহিত হইল; দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে আসিয়া রাজপুত যোদ্ধাদিগের সহিত যোগ দিল। সমস্ত প্রদেশ রণরঙ্গে উন্মত্ত হইল।

সর্ব্বদাই মহারাণা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে নির্গত হইতেন। দেখিতেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে মেওয়ারের সমভূমি ও উদ্যানস্থল এক্ষণে জনশূন্য ও অরণ্যময়। লোকালয়ে হিংস্রক জীব বাস করিতেছে, শস্যক্ষেত্র অরণ্য হইয়াছে, বুনাস ও রবী-

নদীর উপকূলে মনুষ্যাকৃতি দৃষ্ট হয় না, মনুষ্যরব শ্রুত হয় না। প্রতাপের সৈন্য দেখিয়া অরণ্যবিচারী পক্ষী কুলায় ছাড়িয়া উচ্চশব্দে আকাশের দিকে উড্ডীন হইল, অরণ্যবাসী জন্তুগণ দূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পলাইল। যতদূর দৃষ্টি হয়, যেন দৈবসম্পাতে এই মনুষ্যের আবাসস্থল নির্জ্জন হইয়া গিয়াছে। কণ্টকময় বাবুলবৃক্ষে ও জঙ্গলে এই বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত হইয়াছে। নিঃশব্দে এই বন বিচরণ করিয়া প্রতাপসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; বলিতেন,—সমগ্র মেওয়ারদেশ এইরূপ নির্জ্জন অরণ্যভূমি হউক কিন্তু সে পবিত্রভূমি তুর্কী-পদ-বিক্ষেপে যেন কলঙ্কিত না হয়।

রাণা সমস্তদিন যুদ্ধের আয়োজনে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় আপন পর্ব্বতকন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। দেখিতেন, পাটেশ্বরী স্বহস্তে অগ্নি জ্বালিয়া রন্ধন করিতেছেন, পুত্রগণ চারিদিকে হীনপরিচ্ছদে ক্রীড়া করিতেছে। রাণা রণপরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে করিতে সস্নেহে কহিতেন,—জগদীশ্বর, যেন অমরসিংহ ও অমরসিংহের মাতা চিরকাল এই পর্ব্বতকন্দরে বাস করে, কিন্তু তুর্কীর করপ্রদ হইয়া প্রাসাদে বাস না করে।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। অবশেষে সম্রাট আকবরের পুত্র যুবরাজ সলীম মানসিংহের সহিত অসংখ্য সৈন্য লইয়া মেওয়ার আক্রমণ করিতে আসিলেন। সাগরতরঙ্গের ন্যায় অসংখ্য সেনা মেওয়ারের বহির্ভাগ অধিকার করিল, সতর্ক প্রতাপসিংহ কোন প্রতিরোধ করিলেন না। ক্রমে মোগলসৈন্য সুরক্ষিত পর্ব্বতপ্রদেশের নিকট আসিল, দেখিল সে দুর্গম প্রদেশের দ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার, সেই একমাত্র প্রবেশস্থল—হল্‌দীঘাটা! দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সেই দ্বারের প্রহরী! মানসিংহ চিন্তাকুল হইয়া নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন, সমগ্র মোগলসৈন্য যুদ্ধার্থে একীভূত ও প্রস্তুত হইল।

পাঠক! যুদ্ধের প্রাক্কালে চল, আমরা একবার মোগলশিবিরে প্রবেশ করি। যে মহাবীর অম্বরাধিপতি দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিয়া দিল্লীর বিজয়পতাকা বঙ্গদেশ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। হায়! জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই, জ্ঞাতিবিরোধের জন্য অদ্য রাজপুতকুলতিলক মানসিংহ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু!

রজনীতে বহুসংখ্যক মোগলশিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের আলোকে সেই অন্ধকারময় পর্ব্বতপ্রদেশ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, স্থানে স্থানে সৈন্যগণ একত্র হইয়া কলরব করিতেছে। মেওয়ারীদিগের যেরূপ প্রতিজ্ঞা, অবশ্যই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধ হইতে কয়জন পুনরায় দূর দিল্লী প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে?

এই শিবিরশ্রেণীর মধ্যে রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত অসংখ্য দীপ ও পতাকা-বিভূষিত যুবরাজের শিবির দৃষ্ট হইতেছে। প্রশস্ত শিবিরের মধ্যে যুবরাজ সলীম প্রফুল্লচিত্তে গীত শুনিতেছেন, সম্মুখে সুরাপাত্র, নিকটে কলকণ্ঠা প্রৌঢ়যৌবনা কয়েকজন গায়িকা। যুবরাজের অবয়ব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট প্রশস্ত ও সুন্দর। কল্য যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অদ্য সেই প্রশস্ত ললাট চিন্তাশূন্য, সেই সুন্দর আনন নিরুদ্বেগ ও হাস্যরঞ্জিত।

শিবির হইতে এখনও আনন্দের শব্দ উত্থিত হইতেছে, এরূপ সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—জাঁহাপনা, রাজা মানসিংহ আসিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।

যুবরাজ বুঝিলেন, রাজা যুদ্ধপরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। গীত ক্ষান্ত হইল, যুবরাজ সকলকে বিদায় দিলেন। ক্ষণেক পর বীরশ্রেষ্ঠ অম্বরাধিপতি মানসিংহ শিবির প্রবেশ করিয়া যুবরাজকে তসলীম করিলেন। সহাস্যবদনে সলীম তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক দ্বাররুদ্ধ করিয়া দুইজনে নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন।

মানসিংহ ও সলীম উভয়েই যুবক, উভয়েই সাহসী যোদ্ধা, উভয়েই যৌবনোচিত উৎসাহে উৎসাহী। কিন্তু সলীম সম্রাট-পুত্র, সুতরাং সুখপ্রিয় ও বিলাসী, তাঁহার ন্যায় বিলাসী কখনও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তাঁহার স্বভাব সরল ও উদার, যৌবনেই কার্য্যপ্রিয়তা অপেক্ষা সুখপ্রিয়তা প্রবল হইয়াছিল। পরে এই সুখপ্রিয়তা এরূপ প্রবল হয় যে নুর্জাহান ঐ রাজ্য শাসন করেন, দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বন্ধু ও অমাত্য, রমণী ও মদিরা লইয়া কালযাপন করিতেন। মানসিংহ অসাধারণ ধীসম্পন্ন, অসাধারণ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও কার্য্যপটু, অসাধারণ যোদ্ধা।

দিল্লী হইতে নির্গত হইয়া অবধি মানসিংহ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সলীম মানসিংহের উপরেই নির্ভর করিতেন।

সলীম কহিলেন,—রাজন! শত্রুদিগের রণসজ্জা আপনি দেখিয়াছেন। কবে যুদ্ধ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?

মানসিংহ। এ দাস কল্যাই যুদ্ধদান উচিত বিবেচনা করে। বর্ষাকালের বিলম্ব নাই, যত শীঘ্র দিল্লীশ্বরের কার্য্য সমাধা হয়, ততই ভাল।

সলীম। আমারও সেই মত। দিল্লীশ্বরের সেনার সম্মুখে এ পর্য্যন্ত মেওয়ারীগণ দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কল্যও পারিবে না।

মানসিংহ। তাহার সন্দেহ নাই। তথাপি আজ্ঞা দিলে ইহাও নিবেদন যে কল্য প্রকৃত যুদ্ধ হইবে। এতদিন আমরা যে শ্রম সহ্য করিয়াছি, কল্যকার কার্য্যের সহিত তুলনা করিলে সে কেবল বাল্যক্রীড়া মাত্র।

সলীম। প্রকৃত যুদ্ধই তৈমুরলঙ্গ-বংশীয়দিগের রঙ্গস্থল, কিন্তু কতক্ষণ সে যুদ্ধ স্থায়ী? মৃগ ও ব্যাঘ্রে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভব? পিতার সেনার সম্মুখে ভীরু প্রতাপ দূরে পলাইবে।

মানসিংহ। আপনার পিতার সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এরূপ সেনা ভারতক্ষেত্রে নাই. তথাপি প্রতাপসিংহ সহসা পালাইবে না, এদাস তাহাকে জানে—

সলীম। মানসিংহ! আপনি আরও কি বলিতেছিলেন, সহসা থামিলেন কেন? এই প্রতাপের সাহসের কথা আমিও শুনিয়াছি। তাহা ভিন্ন আর কি অবগত আছেন?

মানসিংহ। প্রতাপসিংহের সহিত পূর্ব্বে একবার এ দাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই জন্যই বিশেষ করিয়া তাহাকে জানি।

সলীম। কি জানেন?

মানসিংহ। প্রতাপ ঘোর বিদ্রোহী, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারী, কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কেবল এই কথা দাস নিবেদন করিতে আসিয়াছিল।

সলীম। সে কথা ত আমিও অবগত আছি. আপনার কি আর কিছু বক্তব্য নাই? মানসিংহ! দিল্লী ত্যাগ করিয়া অবধি আপনি আমার দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, আপনার উপর সকল কার্য্যে নির্ভর করিয়াছি, আপনার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছি; আপনি কি আমার নিকট হইতে কোন পরামর্শ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন?

মানসিংহ। প্রভুর নিকট কোনও পরামর্শ এদাস গোপন করে নাই; কেবল প্রতাপের নিকট আমার একটী ঋণ আছে, সেই কথা স্মরণ হওয়ায় আমার সহসা বাক্‌রোধ হইয়াছিল।

সলীম। প্রতাপও হিন্দু, আপনিও হিন্দু, ঋণ ও সৌহৃদ্য থাকা সম্ভব। আপনি যদি সুহৃদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, দূরে থাকিবেন, সলীম একাকী যুদ্ধদান করিবে, দেখিবে প্রতাপ বাহুতে কত বলধারণ করে।

মানসিংহের নয়ন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন,—প্রতাপের নিকট যে ঋণ আছে তাহা তাহার হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ হইবে। আপনার নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, পূর্ব্বের অবমাননার কথাও গোপন করিব না। আপনার পিতার নিকট কহিয়াছি, আপনাকেও কহিব, শ্রবণ করুন।

“যখন শোলাপুর হইতে আমি হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, আমি মহারাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎ অভিলাষে মেওয়ারে আসিয়াছিলাম। মেওয়ারের রাণা সূর্য্যবংশীয় এবং রাজপুতকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য, সুতরাং রাজস্থানের সকল রাজার পূজনীয়। প্রতাপসিংহ সম্প্রতি রাণা হইয়াছেন এইজন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

“চিতোর ধ্বংসের পর উদয়সিংহ উদয়পুরে রাজধানী করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কমলমীরের পর্ব্বতদুর্গে থাকেন। আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আমাকে আহ্বান করিবার জন্য তিনি কমলমীর হইতে উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

“উদয়সাগরের কূলে মহাসমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত হইল। আমি ভোজনে বসিলাম, কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না! প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার পিতার শিরোবেদনা হইয়াছে, তিনি সেই হেতু আসিতে না পারিয়া আতিথেয় করিবার জন্য সন্তানকে প্রেরণ করিয়াছেন, সে জন্য আমি যেন দোষ গ্রহণ না করিয়া ভোজন আরম্ভ করি।

"মানসিংহ জগৎ দেখিয়াছে, মানবচরিত্র পাঠ করিয়াছে, এ শিরোবেদনার কারণ বুঝিল। দিল্লীশ্বরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছি বলিয়া গর্ব্বিত বিদ্রোহী প্রতাপসিংহ আমার আতিথেয় করিতে অস্বীকার করিলেন।" মানসিংহের স্বর ক্রোধে রুদ্ধ হইল।

সলীম। তাহার পর?

মানসিংহ রুদ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আমি অমরকে বলিলাম, রাণাকে জানাইবেন, আমি শিরোবেদনার কারণ অবগত আছি, যাহা হইয়াছে তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই; সেজন্য মহারাণা যদি আমার সম্মুখে পাত্র না দেন, কে দিবেন?

"প্রতাপসিংহ আমার সে ভদ্র অভ্যর্থনায় যে অভদ্র উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মানসিংহ এ জীবনে ভুলিবে না; অথবা কল্য রণস্থলে ভুলিবে।

"প্রতাপ বলিয়া পাঠাইলেন, তুর্কীকে যিনি রাজপুত ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত যাঁহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রাণা খাইতে পারেন না।

"এই উত্তর পাইয়া আমি অস্পৃষ্ট অন্ন রাখিয়া উঠিলাম; কেবল কয়েকটী দানা অন্নদেবের নাম করিয়া উষ্ণীষে রাখিলাম; সেই দিন পণ করিলাম, যদি সেই গর্ব্বিতের গর্ব্ব নাশ না করি, আমার নাম মানসিংহ নহে। সেই অবমাননা-ঋণ কল্য প্রতাপের হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ করিব।"

মানসিংহের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, নয়ন হইতে যেন জ্বলন্ত অগ্নি বহির্ভূত হইতেছিল। সলীমও অবিচলিত ছিলেন না, সরোষে বলিলেন,—বীরপ্রবর! আপনার যে অবমাননা করিয়াছে, সে আমাদের তদপেক্ষা অধিক অবমাননা করিয়াছে, সলীম তাহার পরিশোধ দিতে সক্ষম। আমাদিগের একই অবমাননা, একই পরিশোধ। কল্য একত্রে সেই অবমাননার পরিশোধ দিব, অদ্য ব্যস্ত হইবেন না।

সলীমের এই প্রতিজ্ঞায় মানসিংহের হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল; চক্ষুতে একবিন্দু জল আসিল; সলীমকে নিস্তব্ধে আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

সে রজনীতে যুবরাজের শিবিরে আর গীত বা বাদ্যধ্বনি বা আনন্দরব শুনা গেল না। প্রভাত হইতে না হইতেই অন্য বাদ্য শ্রুত হইল, অন্য রবে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : হল্‌দীঘাটার যুদ্ধ

স ঘোষঃ * * *
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্॥
—ভগবদ্‌গীতা।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ বাঞ্ছা, অপরদিকে শিশোদীয়কুলের চিরস্বাধীনতা রক্ষার স্থির প্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য ও সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরদিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব।

হলদীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে; দলে দলে যোদ্ধৃগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণ দিতেছে; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্ব্বতশিখরের উপর অসভ্য জাতিগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না। চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দাওয়ৎ ও জগাওয়ৎ, সকল কুলের যোদ্ধৃগণ ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। একদল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়, অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে? দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবন দান করিল।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে তিনি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ, সলীম যথায় হস্তি-আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইদিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্ব্বততরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন; বর্শা ও অসির আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা খণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন। সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুইপক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগনভেদী জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লৌহে সেই বর্শা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সেদিন জীবন রক্ষা পাইলেন। রোষে গর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান করাইলেন, অশ্ববর চৈতকও প্রতাপের যোগ্য, লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখের পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল। হস্তী তখন প্রভুর বিপদ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল। তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ আর্জ্জুনির কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধৃগণ ভীরু নহে, পঞ্চশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবার "আল্লাহ আক্‌বর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে হত হইতে লাগিল। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ জানেন না, তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধা মহারাণার বিপদ দেখিলেন এবং হুঙ্কারশব্দ করিয়া শিশোদীয়র পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে সেই নিশ্চয় মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয় মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অদ্য ক্ষিপ্ত—উন্মত্ত! জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয়বার মোগলসৈন্যরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল, প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল না। এবার মোগলগণ এই কাফের বীরকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে, মানসিংহের অবমাননার পরিশোধ দিবে!

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল। কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, এবার প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বারবার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধার চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রু

বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল। মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দেলওয়ারার অধিপতি এই ব্যাপার দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন, পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন সুবর্ণসূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন, এবং মহাকোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীর দেলওয়ারাপতি শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল, যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল। সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শত্রুরেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, ও সেই উদ্যমে সম্মুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন,—দেলওয়ারা! অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। দেলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন,—ঝালা স্বামিধর্ম্ম জানে; বিপদকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করেন না।

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষদিন রজনীতে দেলওয়ারাপতি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দেলওয়ারাপতির জীবনশূন্যদেহ ভূতলে পড়িল।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সেদিন ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট আট সহস্র মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। প্রতাপসিংহ অগত্যা হল্‌দীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন; মোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন মোগলযোদ্ধৃগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হল্‌দীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ ভ্রাতৃদ্বয়

> দিনকরকুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো সরভসমেহি পরিষ্বজস্ব।
> তুহিনশকলশীতলৈস্তবাঙ্গৈঃ শমমুপযাতু মমাপিচিত্তদাহঃ॥
> —উত্তরচরিতম্‌।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিপদ-শান্তি হয় নাই; দুইজন মোগল, একজন খোরাসানী, অপরজন মুলতানী, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক লম্ফ দিয়া একটী পর্ব্বতনদী পার হইয়া গেল, মোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব হইল। কিন্তু চৈতকও আহত, প্রতাপও আহত। পশ্চাদ্ধাবক সন্নিকটে আসিতেছে, তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পর্ব্বতরাশিতে শব্দিত হইতেছে, প্রতাপ শুনিতে পাইলেন। এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু বীরের ন্যায় মরিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে স্বর শুনিলেন,—"হো নীলা ঘোড়ারা আসওয়ার!" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন অশ্বারোহী। সেই অশ্বারোহী তাঁহার বিষম শত্রু ও সহোদর ভ্রাতা শক্ত!

রোষে প্রতাপসিংহ কহিলেন,—সংগ্রামসিংহের পৌত্র হইয়া মোগলদের দাস হইয়াছ, ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই; এক্ষণে ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছ? কুলকলঙ্ক! প্রতাপসিংহ অদ্য সংগ্রামসিংহের বংশ নিষ্কলঙ্ক করিবে। শক্ত প্রতাপের কথায় ভীত হইলেন না, রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকট আসিয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ, একদিন তোমার প্রাণনাশে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য সে ইচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে। অদ্য তোমার বীরত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, পূর্ব্বদোষ ক্ষমা কর, ভ্রাতাকে আলিঙ্গন দান কর।

প্রতাপসিংহ দেখিলেন শক্তের নয়নে জল। বহুদিনের বৈরভাব দূরে গেল, ভ্রাতৃস্নেহে উভয়ের হৃদয় উথলিল, উভয়ে উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের মহত্ত্ব ও প্রতাপের বীরত্ব দেখিয়া অদ্য শক্তের বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, বহু বৎসরের ভ্রাতৃবিরোধ তিরোহিত হইয়াছে। ভ্রাতার নিকট ভ্রাতা ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছে, প্রতাপ

কি সেই স্নেহদানে বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইলেন, সাশ্রুনয়নে হৃদয়ের ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

যে দুই জন মোগল প্রতাপকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? শক্ত দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, ভ্রাতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া অব্যর্থ বর্শায় সে মোগলদিগের প্রাণনাশ করিয়াছেন।

সন্ধ্যার ছায়া সেই নির্জ্জন উপত্যকায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, জগৎকে ব্যাপ্ত করিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন, নিঃশব্দ উপত্যকায় দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপহৃত ভ্রাতৃস্নেহ পাইলেন, অনেক দিনের হারাধন পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একেবারে শুষ্ক হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অদ্য বীরদ্বয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রতাপসিংহ কহিলেন,—ভাই শক্ত! আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন নহে, আজি বিজয়ের দিন; আজি যে অপহৃত ধন ফিরিয়া পাইলাম, যুদ্ধে পরাজয় তাহার নিকট কি তুচ্ছ? ভাই! যেন আমরা পূর্ব্বের বিদ্বেষ চিরকাল বিস্মৃত হই, যেন আমাদের চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া স্বদেশ রক্ষা করিব; বিদেশীয় শত্রুকে ভয় করিব না, দিল্লীশ্বর বা মানসিংহকে ভয় করিব না।

নবম পরিচ্ছেদ : নাহারা মগ্‌রো

অন্তর্ধৈর্য্যভরেণ বদ্ধবচনাৎ সংপীড্য পিণ্ডোকৃতো
ক্ষন্মর্ম্মাশ্রিতশল্যবৎ পরিদহন্ মন্যুশ্চিরং যঃ স্থিতঃ।
স্ফূর্য্যত্যেব স এষ সম্প্রতি মম ন্যক্কারাভিন্নস্থিতেঃ
কল্পাপায়মরুৎ প্রকীর্ণৎপয়সঃ সিন্ধোরিবৌর্ব্বানলঃ॥

—বীরচরিতম্।

যেদিন রজনীতে তেজসিংহ দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়া আপন গহ্বরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে সেই দিনের কথা পুনরুত্থাপন করিব।

রজনী দ্বিপ্রহরে দুর্জ্জয়সিংহের নিকট বিদায় লইয়া তেজসিংহ গহ্বরাভিমুখে যাইলেন না; অন্ধকার নিশীথে, কেবল তারকালোকে নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতপথ একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে কখন কখন গভীর বনের ভিতরে আসিয়া পড়িতেন। একে অন্ধকারময় রজনী, তাহাতে পাদপশ্রেণী অতিশয় নিবিড়, সুতরাং সে অন্ধকারে আপন হস্তও দেখা যায় না। কিন্তু সে পর্ব্বতপ্রদেশে কোনও স্থান, কোনও গহ্বর, কোনও উপত্যকা তেজসিংহের অজ্ঞাত ছিল না; অদ্য আট বৎসর অবধি গৃহচ্যুত হইয়া ভীলদিগের সহিত পর্ব্বতে বিচরণ করিতেন, গহ্বরে শয়ন করিতেন, কাননে লুকাইয়া থাকিতেন। সেই আলোকশূন্য, শব্দশূন্য, নৈশকানন একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বতপথ অতিশয় দুস্তর, কিন্তু পর্ব্বতীয় বরাহ শার্দ্দূলও তেজসিংহের অপেক্ষা পর্ব্বত অতিক্রমে সক্ষম নহে। তেজসিংহের দক্ষিণ হস্তে সেই দীর্ঘ বর্শা; সেই বর্শাধারীর দীর্ঘ উন্নত অবয়ব দেখিলে ভীষণ বন্যজন্তুও ধীরে ধীরে পথ হইতে সরিয়া যাইত।

প্রায় একপ্রহরকাল এইরূপে ভ্রমণ করিয়া তেজসিংহ অবশেষে একটী পর্ব্বততলে উপস্থিত হইলেন। তখন মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ললাট হইতে দীর্ঘকেশ পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলেন, স্থিরনয়নে আকাশের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে প্রণত হইলেন, পরে পুনরায় নিঃশব্দে একাকী সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

প্রায় একদণ্ডের মধ্যে সেই পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলেন। চূড়ার অনতিদূরে একটী গহ্বর ছিল, সেই গহ্বরমুখে উপস্থিত হইয়া তেজসিংহ আর একবার দণ্ডায়মান হইলেন। স্থিরনয়নে গগনের নক্ষত্রের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, পরে নিম্নে সেই আলোকশূন্য, শব্দশূন্য, সুষুপ্ত জগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে কি গম্ভীর চিন্তার উদ্রেক

হইতেছিল কে বলিতে পারে? কতক্ষণ পরে চিন্তা সম্বরণ করিয়া নিঃশব্দে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন!

গহ্বরে কবাট। তেজসিংহ সবলে সেই কবাট নাড়িলেন, সে দীর্ঘ বাহুর অমানুষিক বলে কবাট ঝন্‌ঝনা শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোনও উত্তর পাইলেন না।

পুনরায় শব্দ করিলেন, পুনরায় প্রতিধ্বনি হইল, কিন্তু কোনও উত্তর নাই, পুনরায় গহ্বর নিস্তব্ধ!

সেই নিস্তব্ধ রজনীতে সেই ভয়াকুল পর্ব্বতগহ্বরে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া তেজসিংহ নির্ভয়ে তৃতীয়বার কবাটে শব্দ করিলেন। সে বাহুর আঘাতে এবার কবাট ও সমস্ত গহ্বরসুদ্ধ কম্পিত হইল।

এবার ভিতর হইতে একটী গম্ভীর শব্দ আসিল—নিশীথে নাহারা মগ্‌রোতে কে?

যুবক উত্তর করিলেন,—তিলকসিংহের পুত্র গহ্বরবাসী তেজসিংহ। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজসিং ক্ষণেক নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই, কেবল বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বতগর্ভস্থ একটী জলপ্রপাতের স্তিমিত শব্দ শ্রুত হইতেছে। তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অনন্ত শব্দ শুনিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তরে একটী দীপ দেখা যাইল; ক্রমে আলোক নিকটে আসিল! দীর্ঘকায়া, শুক্লকেশী চারণীদেবী তেজসিংহের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ও অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক তেজসিংহকে একটী ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিতে আদেশ করিলেন। তেজসিংহ উপবেশন করিলেন ও সেই শীর্ণ দীর্ঘ অবয়বের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

চারণীদেবীর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও অধিক হইবে। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘ ও তেজঃপূর্ণ, মস্তকের সমস্ত কেশ শুক্ল, ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত. নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টিহীন। সময়ে সময়ে সেই স্থিরনেত্র ঊর্দ্ধদিকে চাহিত, সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত, তখন বোধ হইত যেন চারণীদেবী এ জগতে থাকিতেন না, যেন এ জগৎ তাঁহার নিকটে অন্ধকারময় হইলেও সেই দৃষ্টিহীন নয়ন ভবিষ্যৎ জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নশ্বর মানবজাতিসম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে পারিত! সবিস্ময়ে তেজসিংহ দীর্ঘকায়া চারণীদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে চারণীদেবী আদেশ করিলেন,—রাঠোরপ্রবর তিলকসিংহের নাম মেওয়ারে অবিদিত নাই; তাঁহার পুত্র কি বাসনায় চারণীর সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষী?

তেজসিংহ। তিলকসিংহের নাম চিরস্মরণীয়, কেননা চিতোর রক্ষার্থ তিনি প্রাণদান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাঁহার সূর্য্যমহলে চন্দাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহ বাস করিতেছেন, তিলকসিংহের বিধবা হত, তিলকসিংহের পুত্র ভীলপালিত ও গহ্বরনিবাসী।

চারণী। চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরকুলের বহুকাল প্রচলিত "বৈরি" চারণীর অবিদিত নাই। সূর্য্যমহল পূর্ব্বে চন্দাওয়ৎদিগের ছিল, বালক! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ মাড়ওয়ার হইতে অসিহস্তে আসিয়া সে দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই অবধি দুই কুলে যে বিরোধ চলিতেছে, যতদিন রাজস্থানে বীরত্ব থাকিবে ততদিন সে "বৈরি" নির্ব্বাণ হইবে না। চন্দাওয়ৎগণ দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না, তাহারা সহজে এ দুর্গ ত্যাগ করিবে না।

তেজসিংহ। দেবি! রাঠোরগণও দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করে না। অনুমতি দিন, একবার চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিবে, যদি পরাস্ত হই, তবে সূর্য্যমহল আর চাহিব না, পুনরায় মাড়ওয়ারে প্রত্যাগমন করিব, অথবা চিরকাল বন্য ভীলদিগের সহিত বাস করিব।

চারণী। মেওয়ার শিশোদীয়বংশের আদিম স্থান। তিলকসিংহের পুত্র! তোমরা রাঠোর. মাড়ওয়ারে তোমাদিগের আদিম স্থান। কি অধিকারে অদ্য চন্দাওয়তের শোণিতপাত করিতে চাহ, চন্দাওয়তের দুর্গ অধিকার করিতে বাঞ্ছা কর?

তেজসিংহ। যে অধিকারে ভীলদিগকে দূর করিয়া মাড়ওয়ারে রাঠোরগণ বাস করে, মেওয়ারে শিশোদীয়গণ বাস করে, রাঠোর বংশ সেই অধিকারে সূর্য্যমহল অধিকার করিয়াছে। তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে মেওয়ারে আপনাদিগের স্থান পরিষ্কার করিয়াছে. পরে পুরুষানুক্রমে মেওয়ার রক্ষার্থ নিজ প্রাণদান করিয়া নিজ অধিকার স্থিরীকৃত করিয়াছে। এক্ষণে

মেওয়ার-ভূমিতে কি রাঠোর অপেক্ষা চন্দাওয়ৎদিগের প্রবলতর অধিকার আছে? মেওয়ার রক্ষার্থ রাঠোর অপেক্ষা কোন্‌ চন্দাওয়ৎ-বীর অধিক বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন? আকবর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসকালে রাঠোর জয়মল্ল ও পিতা তিলকসিংহ অপেক্ষা কোন্‌ বীর অধিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন? তাঁহারা সেই আহবে প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের শোণিতে মেওয়ারে রাঠোর অধিকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। রাঠোরবংশ অন্য অধিকার জানে না, রাজস্থানে অন্যরূপ অধিকার বিদিত নাই।

সেই গহ্বরে তেজসিংহের উন্নতরব এখনও কম্পিত হইতেছে, এমত সময় পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীরস্বরে চারণীদেবী উত্তর করিলেন,—বালক! ভীলদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম তোমার নিকট অবিদিত নাই; যথার্থই বীরদিগের ও নদীসমূহের আদি ও উৎপত্তি কেহ সন্ধান করে না। বীর্য্যই তাহাদিগের ভূষণ, বীর্য্যই তাহাদিগের অধিকার। সেই অধিকারে চন্দাওয়ৎ যদি সূর্য্যমহল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিলকসিংহের পুত্র তাহার প্রতি রুষ্ট কেন?

তেজসিংহ। বীর্য্যবলে যদি দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল পাইত, সে পরম শত্রু হইলেও তেজসিংহ তাহাকে ক্ষমা করিত। কিন্তু নরাধম রাজধর্ম্ম জানে না, পিতার মৃত্যুর পর অনাথা বিধবার নিকট হইতে দুর্গ লইয়াছে, মাতার সহিতও যুদ্ধে অক্ষম হইয়া তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই তস্কর মাতার প্রাণবধ করিয়াছে, সে ভীষণ পাতকের যদি শাস্তি থাকে, দেবি! অনুমতি দিন, তেজসিংহ নরাধমকে শাস্তিদান করিবে।

চারণী। তিলকসিংহের বালক! তোমার রোষের কারণ আমার নিকট অবিদিত নাই, রাঠোরের বীরত্ব আমার নিকট অবিদিত নাই। কিন্তু তুমি বালক, এইজন্য তোমার পরিচয় গ্রহণ করিতেছিলাম। এক্ষণে জানিলাম, তিলকসিংহের পুত্র তিলকসিংহের অযোগ্য নহে, রাঠোর বংশের অযোগ্য নহে। তোমার বাক্যে আমি রুষ্ট হই নাই, তোমার পিতাকে জানিতাম, তাঁহার পুত্রকে তাঁহার উপযুক্ত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা নিবেদন কর, তিলকসিংহের পুত্রকে চারণীর কিছুই অদেয় নাই।

তেজসিংহ। দেবি! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই অবিদিত নাই। বিধির নির্ব্বন্ধ নশ্বর মানবের নিকট লুক্কায়িত, কিন্তু দেবীর দূরবিচারিণী দৃষ্টি হইতে বিধির লিখন লুক্কায়িত নহে। একদিন বালক সংগ্রামসিংহ এই নাহারা মগ্‌রোতে* আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছিলেন; অদ্য তিলকসিংহের পুত্র—দুর্গচ্যুত, ভীলপালিত, অনাথ তেজসিংহ সেই নাহারা মগ্‌রোতে আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছে। মাতার হত্যা ও বংশের অবমাননার প্রতিহিংসার কতদিন বিলম্ব আছে, দেবীর চরণে তাহাই জানিতে আসিয়াছে। যদি আজ্ঞা হয়, তবে সেই কথা বলিয়া এ তাপিত হৃদয়কে শান্তিদান করুন।

চারণী। তিলকসিংহের বালক! ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না, এ দুরাশা ত্যাগ কর। নশ্বর মানবজীবন ক্লেশপরিপূর্ণ, চিন্তাপরিপূর্ণ, কিন্তু তথাপি দুর্ব্বহনীয় নহে। কেননা, মিষ্টভাষিণী আশা সঙ্গে সঙ্গে আপন ঐন্দ্রজালিক দীপ জ্বালিয়া সম্মুখে নানা সুন্দর দ্রব্য পরিদর্শন করে; ক্লেশের শান্তি, সুখের আবির্ভাব, এই সমস্ত মরীচিকা পরিদর্শন করিয়া হৃদয় শান্ত রাখে। তেজসিংহ! ভবিষ্যৎ যবনিকা উত্তোলন করিও না, তাহা হইলে মায়াবিনী আশার দীপ নির্ব্বাণ হইবে, সুন্দর মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, জীবন আশাশূন্য, আলোকশূন্য, ভোগশূন্য হইবে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কোন্‌ নশ্বর এই দুঃখক্ষেত্রে জীবন বহন করিতে চাহিত? বালক! এখনও ক্ষান্ত হও, ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিও না, আর কোন যাচ্ঞা থাকে, নিবেদন কর।

তেজসিংহ। দেবি! এই নাহারা মগ্‌রোর চারণীদেবী সংগ্রামসিংহের ভবিষ্যৎ কহিয়াছেন. সেই সংগ্রামসিংহ দেবীর আদেশে অবশেষে সিন্ধু নদ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। দেবী আদেশ করিলে তিলকসিংহের পুত্রের যত্নও কি সফল হইতে পারে না?

চারণী। সংগ্রামসিংহের রাজ্যবিস্তার ললাটের লিখন, দেবীর আদেশের ফল নহে। দেবীর নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভ্রাতাকর্ত্তৃক আহত ও এক চক্ষু অন্ধ হইলেন, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, বহুদিন অবধি সামান্য মেষপালকদিগের সহিত বাস করিয়া অসহ্য

---

* নাহারা মগ্‌রো অর্থাৎ ব্যাঘ্র পর্ব্বত।

ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। বালক! সংগ্রামসিংহের কথা স্মরণ করিয়া ললাটের লিখন জানিবার উদ্যম হইতে নিরস্ত হও। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য চারণী আর কি করিতে পারে নিবেদন কর।

তেজসিংহ। অন্যায় সমরে যাহার মাতা হত হইয়াছেন, তস্করে যাহার দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলদিগের দয়ায় যাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে, ভীলদিগের ভিক্ষায় যে প্রতিপালিত, তাহার জীবনে আর কি অসহ্য ক্লেশ হইতে পারে? দেবি! নিষেধ করিবেন না, প্রতিহিংসা ভিন্ন এ দাসের অন্য আশা নাই, অন্য সুখ নাই, ভবিষ্যৎ জানিলে কোন্ আশা, কোন্ সুখ বিলুপ্ত হইবে? দেবি! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই, তথাপি যদি অনুমতি করেন, একবার এ জীবনের কাহিনী নিবেদন করি। সমস্ত শুনিয়া আজ্ঞা করুন, ভবিষ্যৎ জানিলে আমার পক্ষে অধিক ক্লেশ কি হইতে পারে?

চারণী। জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে চারণী অপসৃত হইয়াছে, সে গণ্ডগোলের কথা শুনিলে এক্ষণে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়! তথাপি তিলকসিংহের পুত্র যাহা বলিতে চাহে, চারণী তাহা শুনিবে।

তেজসিংহ। দেবীর অনুমতি দ্বারা চিরবাধিত হইলাম; শ্রবণ করুন।

তেজসিংহ পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকথা স্মরণে তেজসিংহের হৃদয় আলোড়িত হইল, রোষে বিষাদে ঘনঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। তেজসিংহ কম্পিত স্বরে কাহিনী আরম্ভ করিলেন, সেই স্বর সেই পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ : দেবীর আদেশ

ধ্বংসেত হৃদয়ং সদ্য পরিভূতস্য মেপরৈ।
যদ্যমর্শ প্রতিকার ভুজালম্বং ন লম্ভয়েৎ॥

—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

"দেবি! আমি চিরকাল এরূপ ছিলাম না, তেজসিংহের চিরদিন এরূপে যায় নাই! দিবস-যামিনী জিঘাংসা-চিন্তা ছিল না, যশের চিন্তা, বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভীলদিগের ভিক্ষাভোজী ছিলাম না, রাজপুতদিগের মধ্যে রাজপুত ছিলাম!

"রাঠোরকুলে তিলকসিংহের নাম কে না শুনিয়াছে? সূর্য্যমহলের গৌরব কে না শুনিয়াছে? রাঠোরকুলেশ্বর জয়মল্ল স্বয়ং তিলকসিংহকে দক্ষিণহস্তে স্থান দিতেন, স্বয়ং সূর্য্যমহলে আসিয়া তিলকসিংহের বীরত্বের সাধুবাদ করিয়াছিলেন। দেবি! আমি তখন অনাথ পর্ব্বতবাসী ছিলাম না, আমি তখন তিলকসিংহের পুত্র, সূর্য্যমহলের যুবরাজ ছিলাম!

"চন্দাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত রাঠোর তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিরকাল বিরোধ। বংশানুক্রমে "বৈরি" চলিয়া আসিতেছে। বংশানুক্রমে তুমুল সংগ্রাম হইয়া আসিতেছে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, ততদিন সে বিরোধ, সে ক্রোধাগ্নি জীবিত থাকিবে। এই নির্ব্বাসিতের শরীরে বংশানুগত রোষ দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়-শোণিতে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে।

"রাঠোরদিগের নিবাসস্থল মাড়োয়ার। সেই স্থান হইতে তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে আসিয়া চন্দাওয়ৎদিগের নিকট হইতে সূর্য্যমহল কাড়িয়া লইয়াছে, বংশানুক্রমে তথায় বাস করিতেছে, তাহা দেবীর অবিদিত নাই। পুনরায় অসিহস্তে রাঠোরকুল সেই দুর্গ লইবে, চন্দাওয়ৎদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিবে।

"পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত বার বার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। সিংহের আবাসে শৃগাল কবে স্থান পাইয়াছে? যতবার সে পামর সূর্য্যমহল আক্রমণ করিয়াছিল, ততবার পিতা তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

"অদ্য আট বৎসর হইল তিলকসিংহ রাঠোরপতি জয়মল্লের সহিত চিতোর রক্ষার্থ গিয়াছিলেন। চিতোর রক্ষা হইল না, কিন্তু দেবি! জয়মল্ল ও তিলকসিংহের বীরত্ব স্বয়ং আকবরশাহের নিকট অবিদিত নাই। কিরূপে সালুম্ব্রাপতির মৃত্যুর পর তাঁহারা চিতোর-দ্বার রক্ষা

করিয়াছিলেন, কিরূপে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন, চারণগণ সে গীত এখনও দেশে দেশে গাহিতেছে। সে গীত শুনিয়া সূর্য্যমহলে আমার বিধবা মাতার হৃদয় কম্পিত হইল, এ বালকের হৃদয় কম্পিত হইল। উল্লাসে মাতা কহিলেন,—হৃদয়েশ্বর সশরীরে স্বর্গধামে গিয়াছেন, দাসীগণ! চিতা প্রস্তুত কর, তিনি দাসীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কেননা জীবনে এ দাসী তাঁহার বড় সোহাগিনী ছিল।”

সহসা তেজসিংহের স্বর রুদ্ধ হইল; নয়ন হইতে একবিন্দু জল সেই বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

“দেবি। ক্ষমা করুন, তেজসিংহ ক্রন্দন অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে, অদ্য স্নেহময়ী মাতার কথা স্মরণ করিয়া সম্বরণ করিতে পারিল না। যখন চিতারোহণে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন, তখন বাটীর সকলে আসিয়া নিষেধ করিল। আমাকে কে প্রতিপালন করিবে, সকলে এইরূপ যুক্তি দেখাইতে লাগিল। মাতা তাহা শুনিলেন না, তিনি স্বামীর অনুমৃতা হইবার জন্য স্থির-সঙ্কল্পা হইয়াছিলেন।

“শেষে আমি আসিয়া বলিলাম,—মাতা, এখনও আমার হস্ত দুর্ব্বল, তুমি যাইলে সূর্য্য-মহল কে রক্ষা করিবে? দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কে যুদ্ধদান করিবে? এবার তিনি স্থির সঙ্কল্প ভুলিলেন, বলিলেন,—দাসীগণ! আমার চিতারোহণে বিলম্ব আছে। শুনিয়াছি চিতোর রক্ষার্থ পত্তের মাতা ও বনিতা নাকি স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়াছিল। আর একজন রাজপুত-রমণী স্বহস্তে যুঝিবে, সূর্য্যমহল রক্ষা করিবে।

“পিতার অস্ত্রাগার অন্বেষণ করিলেন, তাঁহার ব্যবহৃত একটী ছুরিকা পাইলেন, সেই অবধি ছুরিকা মাতার কণ্ঠমণি হইয়াছিল।

“দুর্জ্জয়সিংহ মাতার এ পণ শুনিল, নারী-রক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিতে ভীরু ভীত হইল। অর্থবলে দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তস্করের ন্যায় রজনীযোগে দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গে প্রবেশ করিল।

“তথাপি যোদ্ধৃগণ বিনা যুদ্ধে দুর্গ ত্যাগ করে নাই। তোরণে, সিংহদ্বারে, গৃহের ভিতর, সেই অন্ধকার রজনীতে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তস্করেরা বুঝিল, রাঠোরেরা মৃত্যুকে ডরে না, শত শত্রু হত্যা করিয়া উল্লাসে প্রাণদান করে।

“হ্রদের উপর যে গবাক্ষ আছে, মাতা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন, বামহস্তে আমাকে ধরিয়া-ছিলেন, দক্ষিণহস্তে সেই ছুরিকা!

“ক্রমে আমাদিগের যোদ্ধৃগণ হত হইল; ক্রমে যুদ্ধতরঙ্গ ও যুদ্ধনাদ সেদিকে আসিতে লাগিল; শেষে সেই গৃহের কবাট ভগ্ন হইল। চন্দাওয়ৎগণ সেই গৃহে মহাকোলাহলে প্রবেশ করিল; সর্ব্বাগ্রে রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহ।

“সেই রুধিরাক্ত কলেবর দেখিয়া মাতা কম্পিত হইলেন না, সেই প্রচণ্ড যুদ্ধনাদ শুনিয়া মাতা নয়ন মুদিত করেন নাই! স্বর্গীয় স্বামীর নাম লইয়া মাতা তীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তোলন করিলেন, জ্বলন্তনয়নে সেই নরাধমের দিকে চাহিলেন। নারীর তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে ভীরুর গতি সহসা রোধ হইল, তস্কর সেই ছুরিকার অগ্রে স্তব্ধ হইয়াছিল। মাতা সেই ছুরিকাহস্তে দুর্জ্জয়সিংহের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে এই জগৎ হইতে সেই রাজপুত-কলঙ্ক অন্তর্হিত হইত, কিন্তু তাহার একজন সৈনিক আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর প্রাণ বাঁচাইল, মাতার ছুরিকা সৈনিকের হৃদয়ের শোণিত পান করিল। তৎক্ষণাৎ দশজন সৈনিক অসহায় বিধবাকে হত্যা করিল!”

তেজসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ক্ষণেক পর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন—“আমি তখন দশ বর্ষের বালকমাত্র, কিন্তু মাতার হস্ত হইতে সেই ছুরিকা লইয়া দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলাম। বালকের সম্মুখে ভীরু সরিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন পদাঘাতে গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলাম। সেই ভীরুকে আর একদিন দেখিতে পাইব, মাতার হত্যার পরিশোধ লইব, বংশের কলঙ্ক অপনয়ন করিব, কেবল এই আশায় সেই ,অবধি আট বৎসর জঙ্গলে ও গহ্বরে জীবন ধারণ করিয়াছি।

“দেবি! তাহার পর বিজনবনে ও পর্ব্বতকন্দরে বাস করিয়াছি, রাঠোর হইয়া ভীলদিগের

শরণাগত হইয়াছি, হৃদয়ের দুরন্ত জ্বালায় জীবনধারণ করিয়াছি, কেবল আর একদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এইজন্য! অনুমতি দিন, আর একবার দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব—এবার যদি সে পলাইতে পারে, তেজসিংহ আর কিছুই প্রার্থনা করিবে না!”

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিলেন না, তেজসিংহের গম্ভীর স্বর বারবার সেই গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া লীন হইয়া গেল, অনেকক্ষণ সেই গহ্বর নিস্তব্ধ!

পরে চারণীদেবী শান্ত ধীরস্বরে কহিলেন,—বংশানুগত শত্রুতা ও “বৈরি” রাজপুতধর্ম্ম; তিলকসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহের বংশের মধ্যে “বৈরি” নির্ব্বাণ হইবে না। এই ক্রোধানলে তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয় জ্বলিবে তাহাতে বিস্ময় নাই, কিন্তু বিদেশীয় যোদ্ধার বর্ত্তমানে মেওয়ারে গৃহ-কলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।

তেজসিংহ। বিদেশীয় যুদ্ধসত্ত্বেও কি পামর দুর্জ্জয়সিংহ তস্করের ন্যায় সূর্য্যমহল হস্তগত করে নাই?

চারণী। আকবরকর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসের পর রাণা উদয়সিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছিল; উদয়পুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাণা নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন; সেই সময়ে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল হস্তগত করিয়াছিলেন।

তেজসিংহ। এখনও কি যুদ্ধ ক্ষান্ত হয় নাই? মানসিংহ রোষে দিল্লীতে গিয়াছেন বটে, মহারাণা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন বটে, কিন্তু শত্রু কোথায়?

চারণী। বর্ষাপ্রারম্ভে বালকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করে, মেঘ কোথায়? বালক! বর্ষার মেঘ অপেক্ষা অধিক সমারোহে শত্রু আসিতেছে। যে খড়্গ দ্বারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণবধ করিতে চাহ, সেই খড়্গহস্তে হল্‌দীঘাটায় যাইয়া উপস্থিত হও। চারণীর কথা গ্রাহ্য কর, হল্‌দীঘাটায় অচিরে অনেক খড়্গ ও অনেক বীরের আবশ্যক হইবে, দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহের আবশ্যক হইবে, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে গৃহকলহ রাজস্থানের প্রথানুগত নহে।

তেজসিংহ। দেবি! মেওয়ার রক্ষার্থ যদি যুদ্ধ আবশ্যক হয়, রাঠোর সে যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকিবে না। কিন্তু সে পর্য্যন্ত যে পামর রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছে, তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, অসহায় বিধবাকে হত্যা করিয়াছে, পিতার কুল কলঙ্কিত করিয়াছে, সে রাজপুতকলঙ্ক জীবিত থাকিবে?

চারণী। বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে গৃহকলহ নিষিদ্ধ!

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন; চিন্তার পর ঊর্দ্ধ্বনেত্রা চারণী অতিশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—বালক! অদ্য তুমি সেই দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছ!

তেজসিংহ চমকিত হইলেন; কহিলেন,—দেবীর নিকট কিছুই অবিদিত নাই। স্বহস্তে সে পামরকে নিধন করিব, এই জন্য বরাহের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি।

চারণী। পরে দুর্জ্জয়সিংহকে আপন আবাসস্থানে আশ্রয়দান করিয়াছিলে, তখনও তাহার প্রাণনাশ কর নাই।

তেজসিংহ। পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ রাজধর্ম্ম নহে; বিশেষ পৈতৃক দুর্গে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিব, আমার এই পণ। অনুমতি দিন, সূর্য্যমহল আক্রমণ করিব, তস্করের হস্ত হইতে পৈতৃক দুর্গ কাড়িয়া লইব, সম্মুখ আহবে সেই তস্কর দুর্জ্জয়সিংহকে উচিত শাস্তি দিব।

চারণী। শত্রুকে বরাহ হইতে রক্ষা করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন করিয়াছ; পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ না করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন করিয়াছ; যাও, তেজসিংহ! বিদেশীয় যুদ্ধের সময় গৃহকলহ বিস্মরণ করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন কর। তিলকসিংহের পুত্র! তিলকসিংহের বীরত্ব তোমার দেহে অঙ্কিত রহিয়াছে, বিজয়ের টীকা তোমার ললাটে শোভা পাইতেছে, তিলকসিংহের ন্যায় রাজপুতধর্ম্ম পালন কর। দশ বৎসরমধ্যে বিদেশীয়যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে, পরে সূর্য্যমহলে রাঠোর সূর্য্য পুনরায় উদ্দীপ্ত হইবে! সহসা গহ্বরের দীপ নির্ব্বাণ হইল; অন্ধকারময় গহ্বরে চারণীর শেষ আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অন্ধকার গহ্বর হইতে তেজসিংহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন; পরদিন মহারাণা প্রতাপসিংহের সৈন্যের সহিত যোগ দিলেন; পরে হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের দিনে রাঠোর-খড়্গ নিশ্চেষ্ট ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ : ভীলপ্রদেশ

অহো মোহপ্রায়মেষাং জীবিতং, সাধুজন-
বিগর্হিতঞ্চ চরিতং, তথাহি
পুরুষপিশিতোপহারে ধর্ম্মবুদ্ধিঃ, আহারঃ সাধুজন-
বিগর্হিতো মধুমাংসাদিঃ,
শ্রমো ভৃগয়া, শাস্ত্রং শিবারুতং, উপদেষ্টারঃ কৌষিকাঃ।
—কাদম্বরী।

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, একদিন অপরাহ্নে তেজসিংহ একাকী ভীলপ্রদেশের মধ্য দিয়া পথ অতিবাহন করিতেছিলেন।

তেজসিংহ যদি নিজ চিন্তায় অভিভূত না থাকিতেন, তবে সেই নির্জ্জন ভীলপ্রদেশের শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন। পথের উভয় পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ সহস্র হস্ত উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পর্ব্বতরাশি উত্থিত হইয়া যেন সেই নির্জ্জন পথকে গোপনে রক্ষা করিতেছে। পর্ব্বতচূড়ায় ও পার্শ্বদেশে অসংখ্য পর্ব্বত-বৃক্ষ ও লতা-পুষ্প বায়ুহিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে ও অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্য্যালোকে হাস্য করিতেছে। সে সূর্য্যালোক বহুদূর-নীচস্থ পর্ব্বত-তলের পথ পর্য্যন্ত পঁহুছিতেছে না। তেজসিংহ যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সে পথ অপরাহ্নেই প্রায় অন্ধকারময়। কোন কোন স্থলে উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া সেই পথের উপর ঈষৎ আলোক বিতরণ করিতেছিল; অন্য স্থলে সেই বৃক্ষাচ্ছাদিত পথ একেবারে অন্ধকারময়। সেই নির্জ্জন পথের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতনদী কল্ কল্ শব্দে শিলাশয্যার উপর দিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতেছে, যেন পার্শ্বস্থ প্রহরি-স্বরূপ উন্নত ও কঠোর পর্ব্বতরাশিকে উপহাস করিয়া কোন ক্রীড়াপটু বালিকা হাসিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে স্তিমিত দিবালোকে সেই নদীর জল চক্‌মক্ করিতেছে, অন্য স্থানে সে নদীর গতি কেবল শব্দমাত্রে অনুমেয়। সেই উন্নত পর্ব্বতের কঠোর বক্ষ হইতে কোন কোন স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ রৌপ্যসূত্রের ন্যায় নির্ঝরিণী বহিষ্কৃত হইয়া নীচস্থ সেই নদীর সহিত কল্ কল্ শব্দে মিশিয়া যাইতেছে। ভীলপ্রদেশের বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য জগতের অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়; একজন আধুনিক ফরাশীস্ ভ্রমণকারী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপের সমস্ত মনোহর স্থল অপেক্ষাও রাজস্থানের ভীলপ্রদেশ সুন্দর ও বিস্ময়কর!

তেজসিংহ এইরূপ নির্জ্জন পথ একাকী অতিবাহন করিতেছিলেন। পর্ব্বতচূড়ার উপর স্থানে স্থানে ভীলদিগের "পাল" অর্থাৎ নিবাসস্থান দৃষ্ট হইতেছে, নীচের পথ হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যের আবাস নহে, যেন ঈগল পক্ষী নিজ কঠোর শাবকগুলিকে লালনপালন করিবার জন্য পর্ব্বতচূড়ায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে! প্রত্যেক পালের চতুর্দ্দিকে বা নীচে অল্পমাত্র ভূমি কর্ষিত, সেই ভূমির উৎপন্ন ভীলদিগের আহারের অবলম্বন, দ্বিতীয় অবলম্বন বংশানুগত দস্যুতা! স্থানে স্থানে সেই পর্ব্বতচূড়ার উপর, সায়ংকালীন গগনে বিন্যস্ত ভয়ানক প্রতিকৃতির ন্যায়, এক এক জন কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় কৌপীনধারী ভীল ধনুর্ব্বাণ-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা এই নির্জ্জন পথ ও ভীলপ্রদেশের প্রহরী। তেজসিংহের বীরাকৃতি যদি প্রত্যেক ভীলের পরিচিত না হইত, তাহা হইলে সেই প্রত্যেক ধনুকে শর সংযোজিত হইত।

সেই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া কতকদূর আসিতে আসিতে তেজসিংহ একটী রমণীয় ও অতি বিস্তীর্ণ হ্রদের কূলে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বত-নদী সেই স্বচ্ছ সুন্দর পর্ব্বত-হ্রদে আসিয়া মিশিয়াছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে, যতদূর মনুষ্যনয়নে দৃষ্ট হয়, কেবল পর্ব্বতরাশির পর পর্ব্বতরাশি পর্ব্বতবৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া সায়ংকালীন গগনে বিস্ময়কর চিত্রের ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। হ্রদের কূলে যাইয়া তেজসিংহ একবার সম্মুখে অবলোকন করিলেন, এবং সেই মনোহর প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নিজের চিন্তা একবার ভুলিলেন।

সায়ংকালের লোহিত আলোকে সেই হ্রদের জলের উপর পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! জলের নিস্তব্ধ বক্ষের উপর চারিদিকের উন্নত পর্ব্বতের ছায়া কি সুন্দর পতিত

হইয়াছে! এখানে শব্দ নাই, মনুষ্যের গমনাগমন নাই, জীব-আবাসের চিহ্নমাত্র নাই, যেন প্রকৃতি এই সুন্দর জগৎ-রচয়িতার পূজার জন্য এই উন্নত পর্ব্বতবেষ্টিত, শান্ত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ হ্রদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তেজসিংহ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সেই চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন। হ্রদের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তেজসিংহ একটী শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন।

আমরা এই অবসরে সেই অপূর্ব্ব দেশবাসী ভীলদিগের বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব।

ভারতবর্ষের যে সুন্দর প্রদেশে রাজপুতগণ আসিয়া অসিহস্তে আপনাদিগের আবাসস্থান পরিষ্কার করিয়া পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, রাজপুতদিগের আগমনের পূর্ব্বে সেই রাজস্থান ভীলদিগের আবাসস্থান ছিল। যখন রাজপুতগণ আসিয়া উর্ব্বরাক্ষেত্র ও রম্য উপত্যকাগুলি কাড়িয়া লইল, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলগণ বিন্ধ্যাচল ও আরাবলী পর্ব্বতে যাইয়া আপনাদিগের মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। বোধ হয়, খৃষ্টের জন্মের কিছু পরেই এই সমস্ত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

সেই অবধি ভীল ও রাজপুতদিগের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মিত্রতা রহিল। ভীলগণ নামমাত্র রাজপুত রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু ফলে আপন আপন পর্ব্বতস্থিত "পাল" সমূহে বাস করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল, এবং অবসরমতে কি রাজপুত কি মুসলমান, সকলকেই লুণ্ঠন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তথাপি রাজপুত-রাণাদিগের সিংহাসন আরোহণের সময় একজন ভীল-সর্দ্দার রাজনিদর্শনগুলি রাণাকে অর্পণ করিত, এবং রাজপুতদিগের যুদ্ধ ও বিপদের সময় ভীলযোদ্ধৃগণ যথাসাধ্য রাজপুতদিগের সহায়তা করিত।

ভারতবর্ষের সমস্ত বর্ব্বরজাতিই হিন্দুদিগের দুই একটী দেবকে আপন দেব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এবং হিন্দুদেব হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত করিয়াছে। ভীলগণ কহে—আমরা মহাদেবের তস্কর, মহাদেব-ঔরসে আমাদের জন্ম। মহাদেব একটী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী বন্য বালিকার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সেই বালিকার গর্ভজাত একটী কৃষ্ণবর্ণ সন্তান কোন একদিন মহাদেবের বৃষকে হত্যা করে, এবং সেই অবধি শাপগ্রস্ত হইয়া ভীলনামে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। আমরা ভীলগণ তাহারই সন্তান।

পর্ব্বতের শিখরে ভীলদিগের "পাল" বা গ্রাম নির্ম্মিত হয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পালের মধ্যে প্রত্যেক ভীলের গৃহ এক একটী দুর্গের ন্যায় চারিদিকে কণ্টক ও বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। এই পালসমূহ হইতে হিংস্রক পক্ষীর ন্যায় সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সভ্য জাতিদিগকে লুণ্ঠন করিয়া ভীলগণ বহুশতাব্দী অবধি জীবনধারণ করিয়াছে। শত্রুরা যদি কখন এই পাল আক্রমণ করে, তবে ভীল নারী ও শিশুগণ গোমহিষাদি লইয়া নিকটস্থ নিবিড়, দুর্ভেদ্য পর্ব্বত ও জঙ্গলে যাইয়া লুকাইয়া থাকে; পুরুষগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে বা প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা নিজ নিজ পাল রক্ষা করে।

ভীলদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল আছে, প্রত্যেক দল নিজ দলপতি বা সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। এই দলের মধ্যে সর্ব্বদাই বিরোধ ও বিবাদ হয়, কিন্তু আবার যুদ্ধ বা বিপদকালে সকল দল একত্রিত হয়। তখন তাহাদিগের যুদ্ধরব প্রতি উপত্যকায় শব্দিত হয়, পাল হইতে অন্য পালে সংবাদ প্রেরিত হয়। নিশাকালে ব্যাঘ্র, শৃগাল অথবা পক্ষীর রব অনুকরণ করিয়া ভীলগণ সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে শত শত যোদ্ধা দলবদ্ধ হইয়া ঐক্যভাবে শত্রু বিনাশের চেষ্টা করে! রাজস্থানে অদ্যাপি প্রায় বিশ লক্ষ ভীল বাস করে।

ভীলদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই। তাহারা দুই একটী হিন্দুদেবকে ও নানারূপে পীড়াকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। মৌয়া বৃক্ষকে বিশেষ সমাদর করে, এবং ঐ বৃক্ষ হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া সেবন করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণকায় এবং কার্য্যগুণে অসাধারণ শারীরিক বল ও ক্ষমতা লাভ করে। স্ত্রীলোকগণ পুরুষ অপেক্ষা ঈষৎ গৌরবর্ণ ও সুশ্রী, এবং বস্ত্রদ্বারা কক্ষ ও একটী স্তন আচ্ছাদন করে এবং হস্তপদে লাক্ষানির্ম্মিত বলয় প্রভৃতি ধারণ করে। বিবাহের রীতি বড় সহজ। নির্দ্দিষ্ট দিবসে গ্রামের সমস্ত যুবক ও কন্যা একত্রিত হয়, পরে যুবকেরা

আপন আপন মনোনীত এক একটী কন্যাকে বাছিয়া লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন তথায় কালহরণ করে। পরে স্ত্রীপুরুষ গ্রামে ফিরিয়া আইসে।

বর্ব্বর ভীলদিগের দুইটী অসাধারণ গুণ লক্ষিত হয়। তাহাদের উপকার করিলে তাহারা কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না, এবং তাহারা বাক্যদান করিলে কদাচ তাহা লঙ্ঘন করে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : হ্রদতটে ভীল বালিকা

> কা উণ ধস্যা ইত্তিআ জা ইমিণাং পরিমাগমাণা
> অত্তালঅং বিণোদেদি।
> —বিক্রমোর্ব্বশী।

যে পর্ব্বতের নীচে তেজসিংহ হ্রদতটে এই নিস্তব্ধ সায়ংকালে এখনও বসিয়া আছেন, সেই পর্ব্বতের চূড়ায় ভীমচাঁদ নামক এক ভীল সর্দ্দারের পাল ছিল। সেই পালের নিকটে একটী পর্ব্বতগহ্বর ছিল, পাঠক দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সেই গহ্বর একদিন দৃষ্টি করিয়াছেন।

হ্রদের তটে একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর তেজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। সহসা একটী ভীল-বালিকা করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল, এবং বাল্যোচিত চপলতার সহিত হ্রদের জল লইয়া তেজসিংহের গায়ে ছিটাইয়া দিল! তেজসিংহ সে বালিকাকে চিনিতেন। বালিকার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া বালিকার কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন।

ভীলকন্যা ভীলদিগের ন্যায়ই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু নয়ন দুটী উজ্জ্বল, মুখকান্তি মন্দ ছিল না। চঞ্চলা ভীল-বালিকা পর্ব্বত আরোহণে বন্য বিড়াল অপেক্ষাও পটু; আজন্ম অন্যান্য ভীলদিগের ন্যায় চতুরতা ও সতর্কতা শিখিয়াছিল। একটী শব্দ, একটী ছায়া, একটী স্থানান্তরিত বস্তু দেখিলেই কারণ অনুভব করিত। মস্তকে কৃষ্ণকেশ সর্ব্বদাই দুলিতেছে, নয়ন দুইটী সর্ব্বদাই চঞ্চল। বালিকা সর্ব্বদাই চঞ্চল ও ক্রীড়াপটু, কখন উপলখণ্ড লইয়া খেলা করিত, কখন জল লইয়া ক্রীড়া করিত, কখন অপরের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিত। তথাপি তেজসিংহকে চিন্তাকুল দেখিলে আবার তাঁহার পার্শ্বে কখন কখন দুইতিন দণ্ড পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। বালিকার কখন ধীর চিন্তাশীল ভাব, কখন অতিশয় চঞ্চলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। সকলেই বলিত,—মেয়েটী দেখিতে বালিকা, কিন্তু মনটী বালিকার মন নহে।

তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন? বর্ষাগমে শত্রুগণ মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তেজসিংহ যুদ্ধচিন্তা করিতেছিলেন না। বিদেশীয় শত্রু থাকিতে গৃহকলহ নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি সূর্য্যমহলের চিন্তা করিতেছিলেন না। তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন?

ভীল-বালিকা অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া হ্রদের জলে আপন হস্ত সিক্ত করিতেছিল ও তেজসিংহের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। অনেকক্ষণ তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা মৃদুস্বরে একটী গীত আরম্ভ করিল।

বাল্যকালের স্বপ্ন কখন কখন হৃদয়ে জাগরিত হয়, বাল্যকালে দৃষ্ট মুখচ্ছবি কখন কখন নয়নপথে আবির্ভূত হয়, বাল্যকালের প্রেম-নিহিত অগ্নির ন্যায় কখন কখন জ্বলিয়া উঠে, এই মর্ম্মের একটী সরল গীত বালিকা গাইতে লাগিল।

তেজসিংহ সহসা চমকিত হইলেন। তিনি বাল্যকালের একটী স্বপ্ন চিন্তা করিতেছিলেন, ভীল-বালিকা কি তাঁহার মনের কথা জানিল? বালিকার নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

বালিকা জলখেলা ছাড়িয়া তেজসিংহের দিকে চাহিল, কৈ বালিকার মুখে ত কোনও চিন্তার লক্ষণ নাই! তেজসিংহ বালিকার মুখ দেখিয়া বিচার করিলেন—বালিকা আমার মনের কথা কি জানিবে? যে গীত জানে আপন মনে তাহাই গাইতেছে!

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তেজসিংহ সন্দিগ্ধমনা হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আমি বাল্যস্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?

হাসিয়া ভীলবালা বলিল,—এই তুমি বলিলে, না হইলে আমি কিরূপে জানিব তুমি কি ভাবিতেছিলে? কি স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলে, পুষ্পের?

এবার তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল, ভ্রূকুঞ্চিত হইল, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি পুষ্পের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?

ভীলবালা বাল্যোচিত সরলতার সহিত সভয়ে তেজসিংহের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল,—তাহা আমি কি প্রকারে জানিব? তবে বাল্যকালে লোকে ফল-ফুলের কথা স্বপ্ন দেখে না ত আর কিসের স্বপ্ন দেখে?

তেজসিংহ বালিকার সরল মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—আমি মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলাম। বলিলেন,—আমি বাল্যকালে সত্য সত্যই পুষ্পের স্বপ্ন দেখিতাম, তাহাই ভাবিতেছিলাম; তুই যথার্থই সন্দেহ করিয়াছিস।

ভীল-বালিকা। ভীল অনেক বিষয় দেখিতে পায়, অনেক কথা শুনিতে পায়! তুমি যদি ভীল হইতে!

তেজসিংহ। তাহা হইলে কি হইত?

তেজসিংহের হাতে বালিকার হাত ছিল, বালিকা নিঃশব্দে তাহাই দেখাইল।

তেজসিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহা হইলে কি হইত?

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ভীলবালা কহিল,—তুমি কি অন্ধ? বিভিন্নতা দেখিতে পাও না? তাহা হইলে তোমার হাত কি শ্বেত হইত, না আমার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইত?

ভীলবালা যথার্থই বালিকা, গম্ভীরভাবে বর্ণবিভেদের কথা ভাবিতেছিল!

তেজসিংহ পুনরায় সস্নেহে কহিলেন,—বালিকা, শীঘ্র বাড়ী যা; এইক্ষণেই বৃষ্টি হইবে।

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। আমি মেঘ দেখিতে ভালবাসি।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। কেমন সাদা বিদ্যুতের সঙ্গে কালমেঘ একত্রে খেলা করে!

তেজসিংহ পুনরায় বালিকার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সারল্যের সহিত বালিকা সাদা বিদ্যুৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!

অস্পষ্টস্বরে তেজসিংহ বলিলেন,—বালিকা, তুই কি সরলা বালিকা, না চিন্তাশীলা নারী? আমি তোকে কখনই ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না।

পরক্ষণে তেজসিংহ চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা নাই, পর্ব্বত ও শিলারাশির মধ্যে চঞ্চলা বালিকা অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে খিল্ খিল্ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল, বালিকা সত্যই বালিকা!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : ভীলদিগের পালে

অংশাবতারমিব কৃতান্তস্য, সহোদরমিব পাপস্য,
সারথিমিব কলিকালস্য,
ভীষণমপি মহাসত্ত্বতয়া গম্ভীরমিব উপলক্ষ্যমাণং অনভিভবনীয়াকৃতিং
শবরসেনাপতিমপশ্যাম্।
—কাদম্বরী।

তখন তেজসিংহ সে হ্রদ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিয়া বালিকার পিতার কুটীরে যাইলেন। ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদই দশমবর্ষীয় বালক তেজসিংহকে আপন পালের নিকটস্থ গহ্বরে লুকাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; ভীমচাঁদের দয়া ও প্রভুভক্তিগুণে অদ্য তেজসিংহ অষ্টাদশবর্ষীয় যোদ্ধা হইয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় সেই পালের প্রতি কুটীরে ভীলনারীগণ আপন আপন গৃহকার্য্যে রত রহিয়াছে। সকলের শরীর বলিষ্ঠ ও উপরিভাগ অনাবৃত অথবা অর্দ্ধাবৃত। কেহ কেহ

গোবৎসকে আহার দিতেছে, কেহ বা শিশুকে স্তন দিতেছে, কেহ বা আহার প্রস্তুত করিতেছে, আবার কেহ বা এই যুদ্ধের সময়ে পালের কণ্টকবেষ্টনে আরও কণ্টক রোপণ করিতেছে। পালের প্রত্যেক কুটীরে রন্ধনের অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির চতুর্দ্দিকে বা গৃহের বাহিরে উলঙ্গ বর্ব্বর শিশুগণ খেলা করিতেছে। মনুষ্যের বাসস্থান হইতে বহুদূরে, পর্ব্বতের শিখরে দুর্ভেদ্য জঙ্গল-আবৃত ও কণ্টকবৃক্ষবেষ্টিত এই তস্করের উপনিবেশ কি বিস্ময়কর! সভ্য মনুষ্য তাহাদিগকে ঘৃণা করে, সভ্য মনুষ্য তাহাদিগের উর্ব্বরা ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলগণ তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। হিংস্রক পক্ষীর ন্যায় এই পর্ব্বতবাসী ভীলগণ শতবার লোকালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে, সভ্য মনুষ্যের লুণ্ঠিত ধনে ভীলনারী ও ভীলশিশু পালিত হইয়াছে। ভীমচাঁদের কুটীরে অদ্য সেই পালের সমস্ত যোদ্ধা আসিয়া জড় হইয়াছে, এবং কুটীরের অগ্নিতে সেই ভীলদিগের বিকৃত মুখ ও বিকৃত অবয়ব অধিকতর বিকৃত বোধ হইতেছে।

ভীমচাঁদের সমস্ত শরীর প্রায় উলঙ্গ, কেবল মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল বস্ত্রাবৃত, বহু ও পদদ্বয় অনাবৃত ও সুবদ্ধ পেশী-বিজড়িত। মুখমণ্ডল দেখিলে ভয় হয়, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু বাল্যকাল অবধি নৃশংস আচরণে মনের সুকুমার কোমল প্রবৃত্তি সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছে, পর্ব্বত অপেক্ষাও ভীমচাঁদের সে হৃদয় কঠিন! তথাপি সেই কঠিন হৃদয়েও একটী গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত। বিপদের সময় ভীমচাঁদ যেরূপ সাহসী, সেইরূপ উপায় উদ্ভাবনে তৎপর, তাহার তীক্ষ্ন নয়ন বহুদূর হইতে বিপদের চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারিত। ভীমচাঁদ স্বামিধর্ম্ম জানিত, মিত্রের মধ্যে সত্যপালন করিত। একমাত্র দুহিতার জন্য সে কঠিন হৃদয়েও মমতা ছিল।

ভীমচাঁদের উভয় পার্শ্বে অন্যান্য যে ভীলগণ বসিয়াছিল, তাহাদিগের শরীর অনাবৃত; কেবল একখানি কৌপীন ভিন্ন অন্য বস্ত্র ছিল না।

সেই ভীলপালে অদ্য দুই জন আগন্তুক উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়জী ভূমিয়া ও চন্দ্রপুরের গোকুলদাস আজি ভীমচাঁদ ও তেজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পাহাড়জী জাতিতে ভূমিয়া, ভূমিকর্ষণ করা তাঁহার ব্যবসায়। নয়নে ও ললাটে যোদ্ধার দর্প নাই, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমে দৃঢ়বদ্ধ। ভূমিয়াগণ সম্মুখযুদ্ধ জানে নাই, কিন্তু যুদ্ধকালে নিজ নিজ দুর্গ, নিজ নিজ ভূমি প্রাণপণে রক্ষা করিত, দেশের ভিতর শত্রুর গতিরোধ করিত। ফলতঃ মেওয়ারের ভূমিয়া রাজপুতগণ "মিলিশীয়া" বিশেষ ও অন্যান্য রাজপুতের ন্যায় বিদেশীয় আক্রমণ হইতে দেশরক্ষায় যৎপরোনাস্তি তৎপর থাকিত। গোকুলদাস একজন "বশী", পাঠক, পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। অনেক বয়সে, অনেক ক্লেশে শরীর শীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু নয়নের উজ্জ্বলতা বা হৃদয়ের উদ্যম ও উৎসাহ এখনও অপনীত হয় নাই। তাঁহার পুত্র হত হইয়াছে: হত্যাকারীকেও দণ্ড দিবে, কেবল এই আশায় বৃদ্ধ জীবনধারণ করিয়াছে।

ভীলকুটীরে অগ্নির আলোকের চতুর্দ্দিকে এই সকল লোক বসিয়া আছেন, এরূপ সময় প্রায় ৪।৬ দণ্ড রজনীতে তেজসিংহ সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে আহ্বান করিল।

পরস্পরে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মহারাণা প্রতাপসিংহের কথা হইল, হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের কথা হইল, দুর্জ্জয়সিংহ ও সূর্য্যমহলের কথা হইল। পরে তেজসিংহ কবে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবেন, সকলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। পাহাড়জী নিজ ভূমিয়া সৈন্যসহিত, ভীমচাঁদ আপন ভীলদিগের সহিত, গোকুলদাস বশীদিগের সহিত, তেজসিংহের সহায়তা করিবেন।

তেজসিংহ সকলকে ধন্যবাদ দিয়া ভীমচাঁদের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন,—লোকালয় ত্যাগ করিয়া দশম বৎসর অবধি তিলকসিংহের পুত্র পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছে। সর্দ্দার ভীমচাঁদের অনুগ্রহে সে দুর্জ্জয়সিংহের বিজাতীয় ক্রোধ হইতে লুক্কায়িত রহিয়াছে, সর্দ্দার ভীমচাঁদের অনুগ্রহে সে এই আট বৎসর নিরালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। ভীমচাঁদের পিতা আমাদের মহারাণার পিতা রাণা উদয়সিংহকে বিপদের সময় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন; ভীমচাঁদ এক্ষণে আমাদিগের উপর সেই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভীলগণ শত যুদ্ধে, শত বিপদে, রাজপুতদিগের সহযোদ্ধা ও প্রকৃত বন্ধু।

ভীমচাঁদ কহিল,—আমি তিলকসিংহকে জানিতাম; সেরূপ রাজপুত আর দেখিব না। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য ভীমচাঁদের যাহা সাধ্য তাহা করিবে, ভীমচাঁদের ভীলগণ ধনুর্ব্বাণ-হস্তে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবে। রাজপুত ভীলদিগের প্রভু, রাজপুতদিগের সহায়তা করা ভীলদিগের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহাগতদিগকে আশ্রয়দান করা ভীলদিগের জাতিধর্ম্ম।

পাহাড়জী কহিল,—আমিও তিলকসিংহকে বিশেষ জানিতাম।

পরে বৃদ্ধ গোকুলদাস কহিল,—দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে যখন পাহাড়জী ভূমিয়া এরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তখন ক্ষুদ্র বশীগণ কতদূর উৎপীড়িত হইবে আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন। চন্দ্রপুরে এরূপ বৎসর নাই, এরূপ মাস নাই, এরূপ সপ্তাহ নাই যে দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ উৎপীড়িত না হইতেছে। তাহারা বশী, তাহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা কি করিবে? কেবল স্বর্গীয় তিলকসিংহের কথা স্মরণ করে, তাঁহার পুত্র জীবিত আছেন কি না জিজ্ঞাসা করে! পূর্ব্বে আপনার জীবিত থাকার কথা তাহারা জানিত না, সম্প্রতি না কি দুর্জ্জয়সিংহের সহিত আহেরীয়ার দিন আপনার দেখা হইয়াছিল, এইরূপ শুনিতে পায়। মনে মনে তাহারা দিন গণে, মাস গণে, কবে পিতার গদিতে আপনি বসিবেন সর্ব্বদা সেই প্রার্থনা করে। তিলকসিংহের পুত্র! আদেশ করুন, চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের আবালবৃদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিবে। বৃদ্ধ আর কি বলিবে? তাহার নিজের উপর এ বৃদ্ধবয়সে যে অত্যাচার হইয়াছে, জগদীশ্বর তাহার বিচার করুন, কেবল চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আপনি নিবারণ করুন।

বৃদ্ধের পুত্রহত্যার কথা সকলেই জানিতেন, সকলেই বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। তেজসিংহ কহিলেন,—পিতার পুরাতন ভৃত্য! তোমার দুঃখ কেবল জগদীশ্বরই সান্ত্বনা করিতে পারেন; কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিলাম, পুনরায় পিতার গদি পাইলে চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের বশীদিগকে আমি সুখী করিব।

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর তেজসিংহ কহিলেন,—আর একটী কথা আছে, আমি আহেরীয়ার দিন নাহারা মগ্‌রোতে গিয়াছিলাম।

সে ভয়ানক স্থলের নাম শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন, চারণীদেবীর নিকট হইতে তেজসিংহ কি জানিয়াছেন, জানিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তেজসিংহ কহিলেন,—চারণীদেবীর আদেশ, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে মেওয়ারের গৃহকলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।

অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধ গোকুলদাস বলিল,—ভগবান জানেন, জিঘাংসায় এ বৃদ্ধের শরীর দগ্ধ হইতেছে, পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম শোক এ সংসারে নাই! তথাপি বৃদ্ধের মতে চারণী মাতা যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, যতদিন দিল্লীশ্বরের সহিত মহারাণার যুদ্ধ হয়, ততদিন গৃহকলহ ক্ষান্ত হউক।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : রাঠোর দুর্গে

ননু কলভেন যূথপতেরনুকৃতম্।
—মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

রজনী এক প্রহর হইয়াছে; তেজসিংহ ভীলকুটীর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে রাঠোর যোদ্ধা দেবীসিংহের ভীমগড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিলকসিংহের যাবতীয় যোদ্ধার মধ্যে দেবীসিংহ অপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর বা সাহসী সহযোদ্ধা আর কেহ ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে যখন তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যমহল প্রথম হস্তগত করিয়াছিলেন, দেবীসিংহের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সকল বিপদে সহায়তা করিয়াছিলেন। সূর্য্যমহলের বিজেতা সন্তুষ্ট হইয়া নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে ভীমগড় নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া অনুচরকে সেই দুর্গ প্রদান করিলেন।

সেই অবধি পুরুষানুক্রমে ভীমগড়ের যোদ্ধৃগণ সূর্য্যমহলের অধীশ্বরদিগের অধীনে যুদ্ধ করিত, শত আহবে আপনাদিগের শোণিত দান করিয়া "স্বামিধর্ম্ম" প্রদর্শন করিয়াছিল।

দুর্জ্জয়সিংহ কর্ত্তৃক সূর্য্যমহল অধিকার সময়ে সেই নৈশ যুদ্ধে তিলকসিংহের অধিকাংশ সৈন্য হত হইয়াছিল, কিন্তু সকলে হত হয় নাই। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সে দুর্গ ত্যাগ করিয়া বহুদিন অবধি জঙ্গল ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে লাগিল, অবশেষে ভীমগড়ে দেবীসিংহের অধীনে কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বালক তেজসিংহকে সেই রজনীতে সন্তরণ দ্বারা হ্রদ পার হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বালক এখনও জীবিত আছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল। অনেক বৎসর বৃথা অনুসন্ধান করিয়া শেষে দুই একজন পুরাতন ভৃত্য ভীলবেশধারী তিলকসিংহের পুত্রকে চিনিল; সানন্দে সেই দরিদ্র ভীলভিক্ষাহারীকে প্রভু বলিয়া অভিবাদন করিল।

তখন পুরাতন সৈন্যগণ একে একে তেজসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল ও বালককে পিতার ন্যায় বিক্রমশালী ও দীর্ঘাকার দেখিয়া আনন্দিত হইল। ক্রমে ক্রমে এ সংবাদ তিলকসিংহের সমস্ত অনুচরদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইল। তাহারা সকলে বালককে পুনরায় পাইয়া একবাক্যে কহিল,—আমরা তিলকসিংহের লবণ আস্বাদন করিয়াছি, আমাদের খড়্গ, আমাদের জীবন তিলকসিংহের পুত্রের! আদেশ করুন, পুনরায় সূর্য্যমহল অধিকার করিয়া আপনাকে পিতার গদিতে উপবেশন করাই।

প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সানন্দে প্রভুপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া ভীমগড়ে আসিয়া বাস করিবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তেজসিংহ উত্তর করিলেন,—দুর্দ্দিনে ভীলগণ আমাকে আশ্রয়দান করিয়াছেন, আমি যতদিন সূর্য্যমহল জয় না করি, ততদিন ভীলকুটীরেই থাকিব।

অদ্য রজনীতে সেই রাঠোরগণ দুর্গের উপর একটী প্রশস্ত স্থলীতে উপবেশন করিয়াছিল। নিকটে বৃক্ষ বা ঘর নাই, পরিষ্কার অন্ধকার নীল আকাশ চন্দ্রাতপের ন্যায় সেই বীরমণ্ডলীর উপর লম্বিত রহিয়াছিল। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাইতেছে, নীচে স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, এক এক অগ্নির চতুর্দ্দিকে দুই চারি জন রাঠোর উপবেশন করিয়া অগ্নিসেবন করিতেছে। যোদ্ধাদিগের কথাবার্ত্তা বা হাস্যধ্বনি বা গীতরব সেই নিশার নিস্তব্ধতায় বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে। স্থানে স্থানে দুই একজন যোদ্ধা অগ্নিপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে কোন চারণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চারিদিকে রাঠোরগণ চারণের গীত, রাঠোরের পূর্ব্বগৌরব গীত শুনিতেছে। তিলকসিংহের পুত্রকে সহসা দূর হইতে দেখিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিল ও একেবারে পঞ্চশত রাঠোর উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে উৎসাহ দেখিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন।

অগ্নির আলোক সেই প্রাচীন যোদ্ধাদিগের ললাট ও মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছে। বাল্যাবস্থা হইতে যুদ্ধব্যবসায়ে তাহাদিগের শরীর দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, কাহারও ললাটে, কাহারও বদনমণ্ডলে, কাহারও বক্ষঃস্থলে বা বাহুতে খড়্গচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। কেশপাল কাহারও শুক্ল, কাহারও ঈষৎ শুক্ল, নয়ন সকলেরই উজ্জ্বল। সকলেই রাঠোরশ্রেষ্ঠ তিলকসিংহের অধীনে শতবার যুদ্ধ করিয়াছে, আকবর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংস স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে তেজসিংহকে সেনাপতি করিয়া প্রথমে সূর্য্যমহল, তৎপরে চিতোর উদ্ধার করিবার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তেজসিংহ যখন পিতার প্রাচীন সেনাদিগকে আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিলেন, তাহাদিগের উল্লাসরব ও আনন্দধ্বনি শুনিলেন, যখন সেই প্রাচীন রাঠোরদিগের যুদ্ধাঙ্কিত বদনে ও উজ্জ্বল নয়নে কেবল স্বামিধর্ম্ম ও উৎসাহের লক্ষণ পাঠ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় উৎসাহে প্লাবিত হইল, তিনি সজল নয়নে পিতার যোদ্ধাদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিলেন। তিলকসিংহের পুত্রের এই সৌজন্য দেখিয়া পুরাতন রাঠোরগণ পুনরায় উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

তেজসিংহ বলিলেন,—বীরগণ! তোমরাই যথার্থ স্বামিধর্ম্ম প্রদর্শন করিলে, রাঠোরকুল তোমাদের স্বামিধর্ম্মে গৌরবান্বিত হইবে, তেজসিংহ তোমাদের স্বামিধর্ম্ম বিস্মৃত হইবে না।

রাঠোরগণ উত্তর করিল,—আমরা স্বর্গীয় তিলকসিংহের প্রতিপালিত, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের খড়্গ তেজসিংহের।

প্রাচীন দেবীসিংহ বলিলেন,—(শুক্ল কেশে তাঁহার প্রশস্ত ললাট আবরণ করিয়াছে, কিন্তু নয়নের দীপ্তি আবৃত করিতে পারে নাই) এ দাস তিলকসিংহকে সূর্য্যমহলের গদিতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তেজসিংহকে সেই গদিতে বসাইবার বাসনা করে। বৃদ্ধের জীবনে অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ! পিতার রাঠোরদিগের মধ্যে তোমার ন্যায় প্রাচীন কেহই নাই; অথচ হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরদিগের মধ্যে তোমা অপেক্ষা বীর কেহ ছিল না। তথাপি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব আছে।

দেবীসিংহ। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু প্রভু কি বিজয়ে সন্দেহ করেন? শুনিয়াছি চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের এক সহস্র সেনা আছে; পঞ্চশত রাঠোর কি এক সহস্র চন্দাওয়ৎদিগের সহিত যুদ্ধদানে অসমর্থ?

তেজসিংহ। রাঠোরের বীরত্বে আমি সন্দেহ করি না, বিশেষ পিতার অন্যান্য বন্ধুও আমার সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পাহাড়জী ভূমিয়ার প্রায় এক সহস্র ভূমিয়া আছে, ভীমচাঁদের প্রায় দ্বিশত ধনুর্দ্ধর ভীল যোদ্ধা আছে, চন্দ্রপুরে প্রায় দ্বিশত বশী প্রজা আছে, তাঁহারা সকলেই তিলকসিংহের পুত্রের জন্য জীবনদানে প্রস্তুত।

দেবীসিংহ। তবে যুদ্ধের বিলম্ব কি?

তেজসিংহ। সূর্য্যমহল আক্রমণ করিলে বিজয়লাভ করিতে পারি, কিন্তু পিতার যোদ্ধৃগণ! তোমাদিগের অধিকাংশকে হারাইব।

দেবীসিংহ। প্রভুর জন্য জীবনদান ভিন্ন রাঠোরের আর কি গৌরব আছে? রাঠোর কি মৃত্যু ডরে?

তেজসিংহ। রাঠোর মৃত্যু ডরে না—পিতা চিতোর রক্ষার্থে প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যমহলে তোমরা প্রাণদান করিলে পুনরায় হল্‌দীঘাটায় কে যুঝিবে? বীরগণ! মাতার হত্যা ও কুলের অবমাননার কথা তেজসিংহ বিস্মৃত হয় নাই, ধমনীতে যতদিন শোণিত থাকিবে ততদিন বিস্মৃত হইবে না। কিন্তু বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে "বৈরি" নিষিদ্ধ। রাজপুতগণ! রাজপুতধর্ম্ম পালন কর।

প্রাচীন রাঠোর যোদ্ধৃগণ সকলে নতশির হইল। অনেকক্ষণ পর দেবীসিংহ গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—তিলকসিংহের পুত্র যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই রাঠোর মাত্রের শিরোধার্য্য, বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমানে রাঠোর চন্দাওয়তের ভ্রাতা, চন্দাওয়ৎ রাঠোরের ভ্রাতা, ম্লেচ্ছ ভিন্ন রাজপুতের আর শত্রু নাই। কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণাম পর্য্যন্ত যদি দেবীসিংহ জীবিত থাকে, চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ, সাবধান!

সকল রাঠোর গর্জ্জিয়া উঠিল—চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ, সাবধান!

এইরূপ উৎসাহবাক্য চারিদিকে শ্রুত হইতেছে, ইহার মধ্যে দেবীসিংহের চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র চন্দনসিংহ ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে অগ্রসর হইল। বালকের সুন্দর ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণনয়নে বাল্যের চপলতা বিরাজ করিতেছে। বালকের মুখমন্ডল কোমল, ওষ্ঠ দুটী রক্তবর্ণ, কিন্তু অবয়ব দীর্ঘ, শরীর এই বয়সেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ। বালক ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে আসিয়া নতশির হইল।

বালককে দেখিয়া তেজসিংহের পূর্ব্বকথা একবার স্মরণ হইল। একবিন্দু অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন,—চন্দন! বাল্যকালে সূর্য্যমহলে তুমি আমার ক্রীড়ার সঙ্গী ছিলে, তোমার কি মনে পড়ে? আমার দেখাদেখি ছয় বৎসর কালের সময় তুমি তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে, তাহা কি মনে পড়ে? পিতা একদিন তোমার ললাট দেখিয়া কহিয়াছিলেন,—চন্দন দেবীসিংহের ন্যায় বীর হইবে, তাহা কি মনে পড়ে?

সকৃতজ্ঞস্বরে চন্দন কহিলেন,—প্রভুই আমার বাল্যগুরু ছিলেন, প্রভুই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি? প্রভুই আমাকে প্রথম রণশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে এই তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধকালে যদি প্রভু আমাকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দান করেন, তবেই কৃতার্থ হই।

তেজসিংহ। চন্দন! তোমার বয়স অল্প, এক্ষণে দুর্গে রণশিক্ষা কর, যথাসময়ে তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধে লইয়া যাইবেন।

চন্দনসিংহ। চতুর্দ্দশবর্ষীয় রাঠোর কি তুর্কীদিগের সহিত যুঝিতে সক্ষম নহে?

হাস্য করিয়া তেজসিংহ কহিলেন,—সিংহের ঔরসে সিংহশাবকই জন্মগ্রহণ করে; দেবীসিংহের পুত্র কেন না যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইবে? চন্দনসিংহ! অচিরেই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সম্ভবতঃ আমাদিগের সকলেরই যুদ্ধের সাধ মিটিবে। তোমার পিতা সর্ব্বদা মহারাণার সহিত

থাকিবেন, তুমি এস্থানে না থাকিলে ভীমগড় কে রক্ষা করিবে? বালক! এই অল্প বয়সেই তুমি বীর; এই অল্প বয়সেই তোমাকে আমি ভীমগড় দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত করিলাম; তোমার হস্তে রাঠোর-অসির অবমাননা হইবে না।

ধীরে ধীরে চন্দনসিংহ কোষ হইতে অসি বাহির করিল, সেই স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে আকাশের দিকে চাহিয়া অল্পবয়স্ক বীর কহিল,—তাহাই হউক। চন্দনসিংহ প্রভু-আদেশে ভীমগড় অদ্য হইতে রক্ষা করিবে। ভগবান সহায় হউন, যতক্ষণ চন্দনসিংহ জীবিত থাকিবে, যতক্ষণ দুর্গে একজন রাঠোর জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ এদুর্গে তুর্কীর প্রবেশ নাই।

বালকের এই পণ শুনিয়া রাঠোরমণ্ডলী সাধুবাদ করিতে লাগিল, প্রাচীন দেবীসিংহের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। কিন্তু রাঠোরগণ জানে না, প্রাচীন দেবীসিংহ জানে না, কিরূপে ভয়ানক শোণিতস্রোত ও অগ্নিরাশির মধ্যে এই বিষম পণ রক্ষা হইবে!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : চন্দাওয়ৎ দুর্গে

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগলভবাক্ জ্বলন্নিব
ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং শরীরবদ্ধঃ
প্রথমাশ্রমো যথা॥

—কুমারসম্ভবম্।

পাঠক! চল আমরা ভীমগড় ত্যাগ করিয়া একবার সূর্য্যমহলে গমন করি, তথায় সূর্য্যমহলেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি।

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধান্তে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যমহল-পর্ব্বতচূড়া হইতে চন্দাওয়ৎ পতাকা উড্ডীন হইতেছে ও চন্দাওয়ৎ-রণবাদ্য চারিদিকে শব্দিত হইয়াছে। “দরীশালায়” অর্থাৎ সভাগৃহে দুর্জ্জয়সিংহ উপবেশন করিয়াছেন, উভয় পার্শ্বে তাঁহার সহযোদ্ধৃগণ ঢাল ও খড়্গহস্তে উপবেশন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে দুর্গবাসিগণ দুর্গেশ্বরকে দেখিতে আসিয়াছে; নাগরিকগণ পরস্পরে হল্‌দীঘাটার ও তুর্কীদিগের বিষয় কথোপকথন করিতেছে; পুরনারীগণ “সুহেলায়া” অর্থাৎ মঙ্গলগীত গাইয়া যুদ্ধপ্রত্যাবৃত্ত চন্দাওয়ৎ বীরদিগকে আহ্বান করিতেছে।

সভাগৃহের ভিতর দুর্জ্জয়সিংহের উভয় পার্শ্বে তাঁহার যোদ্ধৃগণ বসিয়াছিলেন; কয়েক মাস পূর্ব্বে এই সভাস্থলে যে সমস্ত বীর উপবেশন করিয়াছেন, হায়! তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অদ্য আর এ জগতে নাই। তাঁহাদিগের বীরত্ব ও অকালমৃত্যু স্মরণ করিয়া সকলেই শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন; বীরগণ সেইরূপ সম্মুখযুদ্ধে স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন, এই আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধাঙ্ক বহন করিতেছিলেন; কাহারও ললাট, কাহারও দীর্ঘ বাহু, কাহারও বিশাল বক্ষঃস্থল, খড়্গ বা বর্শা বা গুলির অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে।

সভাগৃহের একপ্রান্তে দুর্জ্জয়সিংহের “গোলা” অর্থাৎ দাসগণ দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহারা যুদ্ধকালে প্রভুর পার্শ্ব কখনও পরিত্যাগ করে না। হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে দুর্জ্জয়ের সহিত প্রায় একশত “গোলা” গমন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে পঞ্চাশৎ জনও ফিরিয়া আইসে নাই! গোলাগণ চিরদাস; তাহাদিগের “গোলী” ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাদিগের পুত্রকন্যাও দাসদাসী। গোলাদিগের জীবনমরণ প্রভুর হস্তে, তাহারাও প্রভুভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম জানিত না। গৃহপ্রান্তে দুর্জ্জয়ের ত্রিংশৎ কি চত্বারিংশৎ “গোলা” বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদিগের দক্ষিণ পদে রৌপ্যনির্ম্মিত বলয় শোভা পাইতেছে।

দুর্জ্জয়সিংহ যুদ্ধের কথা কহিতেছিলেন। বর্ষার শেষে যুবরাজ সলীম ও তুর্কীগণ কি পুনরায় আসিবেন? রাজা মানসিংহ কি স্বদেশবাসীদিগের শোণিতপাতে এখনও তুষ্ট হয়েন নাই? যদি না হইয়া থাকেন, মেওয়ারের শিশোদীয়গণ আরও শোণিতদানে সম্মত আছেন, তুর্কীগণ পুনরায় আসিলে শিশোদীয়গণও পুনরায় রণরঙ্গে তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন।

যতদিন শিশোদীয়ের একজন বীর জীবিত থাকিবে, যতদিন চন্দাওয়ৎ-ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততদিন মেওয়ারভূমি পরাধীনতার কলঙ্করেখা ললাটে ধারণ করিবে না!

এইরূপ কথা হইতে হইতে চারণদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহের অনুমতিক্রমে চারণদেব হল্‌দীঘাটার একটী গীত আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ চারণ স্বয়ং সেই যুদ্ধ অবলোকন করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের দুর্দ্দমনীয় সাহস অবলোকন করিয়াছিলেন, চন্দাওয়ৎকুলের অপ্রতিহত বীর্য্য অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাই গাইলেন। বাক্যসাগর মন্থন করিয়া গর্ব্বিত ভাষায়, গর্ব্বিতস্বরে হল্‌দীঘাটার গর্ব্বিত গীত গাইলেন। সভা নিস্তব্ধ ও শব্দশূন্য, চারণের উচ্চগীত সভাগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শেষে যখন চারণদেব চন্দাওয়ৎদিগের বীরত্বকথা বলিতে লাগিলেন, যখন বর্শাধারী রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহের ভীমমূর্ত্তি ও দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব বর্ণনা করিয়া গীত সমাপ্ত করিলেন, তখন একেবারে সভাগৃহ যোদ্ধাদিগের উল্লাসরবে পরিপূরিত হইল।

বৃদ্ধ চারণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী যুবা চারণ সভাগৃহে আসিয়াছিল, সেও একটী গীত গাইবার অনুমতি চাহিল।

দুজ্জয়সিংহের দিকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল,—চন্দাওয়ৎবীর! রাজচারণ যে গীত গাইলেন, আমি সেরূপ গাইব এরূপ সাধ্য নাই। তথাপি সভাস্থ সকলে যদি প্রসন্ন হয়েন, তবে আকবর কর্ত্তৃক চিতোরদুর্গ অপহরণের একটী গীত গাইব। আকাশের যে বৃষ্টিতে শাল, তমাল, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ পুষ্ট হয়, তৃণদুর্ব্বাও কি তাহাতে পুষ্ট হয় না? সাধুদিগের অনুমতি হইলে এ ক্ষুদ্র কবিও একটি কবিতা রচনা করিতে সক্ষম, সাধুগণ কি সে অনুমতি দান করিবেন?

দুর্জ্জয়সিংহ। চারণদেব! তোমার বিনীতভাব দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। তুমি আমাদিগের অপরিচিত, কিন্তু বীর ও কবিদিগের গুণই পরিচয়। গীত আরম্ভ কর।

তীব্রস্বরে কবি গীত আরম্ভ করিলেন, সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

যাহারা বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগের? অথবা যাহারা তস্করের ন্যায় অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের?

তস্করের অবমাননা হইবে! তস্করের হৃদয়শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে।"

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

যে নারী দুর্গরক্ষার্থ যুদ্ধদান করে, তাহার অথবা যে নারী-হত্যা করিয়া* দুর্গ অধিকার করে, তাহার?

নারী-হত্যাকারী অবমানিত হইবে। নারী-হত্যাকারীর হৃদয়-শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে।"

"সে উন্নত দুর্গ কাহার? যে বালকের সম্পত্তি অপহরণ করে, তাহার অথবা যে বীরবালক† অদ্য পর্ব্বতকন্দরে বাস করিতেছে তাহার?

বালক এখন খড়্গধারণ করিয়াছে, হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে যুদ্ধস্নাত হইয়াছে! তস্করের হৃদয়-শোণিতে তাহার খড়্গ রঞ্জিত হইবে।"

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

দুর্গরক্ষার্থ যে বীরগণ হত হইয়াছে, দুর্গচ্যুত হইয়া যাহারা পর্ব্বতে বাস করিতেছে, দুর্গ তাহাদিগের।

---

* চিতোর-দুর্গ-বিজয়ের সময় পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধদান করিয়া হত হয়েন।

† চিতোর-বিজয়ের সময় প্রতাপসিংহের পিতা জীবিত ছিলেন, সুতরাং প্রতাপ যুবরাজ মাত্র। হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের সময় প্রতাপ পর্ব্বতে ও কন্দরে সপরিবারে বাস করিতেন।

পুনরায় রাজপুতগণ দুর্গ আক্রমণ করিবে, শত্রুরক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া দুর্গ অধিকার করিবে!”

গীত ক্ষান্ত হইল; যুবকের জ্বলন্ত নয়ন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল! সকলে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল,—তুর্কীরক্তে অসিরঞ্জিত করিয়া রাজপুতগণ চিতোর দুর্গ অধিকার করিবে!

দুর্জ্জয়সিংহ উৎসাহবাক্য দিলেন না, দুর্জ্জয়সিংহ সাধুবাদ করিলেন না, ভ্রূকুটীপূর্ব্বক ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর পুনরায় চারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, চারণ সভাস্থলে নাই!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : গায়ক কে?

জ্বলজ্জটাকলাপস্য ভ্রূকুটীকুটিলং মুখম্।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে মম যো ন গতো ভয়ম্॥

—বিষ্ণুপুরাণম্।

রজনী একপ্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ ছাদে শয়ন করিয়া রহিলেন, তাঁহার মস্তক একজন গোলীর অঙ্কে স্থাপিত, অন্য একজন গোলী তাঁহার পদসেবা করিতেছে। উভয়ে প্রৌঢ়যৌবন-সম্পন্না ও রূপবতী, কিন্তু তাহাদের সেবায় অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের চিন্তা দূর হইতেছে না।*

দুর্জ্জয়সিংহ অনেকক্ষণ চিন্তাকুল হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, অবশেষে প্রধানকে ডাকাইবার আদেশ দিলেন। উঠিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন, গোলীগণ গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পর প্রধান, অর্থাৎ মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন,—আমি যুদ্ধযাত্রাকালে যে আদেশ দিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইয়াছে?

প্রধান। সেইক্ষণেই আমি নানাদিকে চর পাঠাইয়াছি। কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় পাঠাইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তিলকসিংহের পুত্রের কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ। বন্য ভীলদিগের মধ্যে, পর্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্যে, বিশেষ অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন?

প্রধান। তাহাদিগের মধ্যেই বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছে।

দুর্জ্জয়সিংহ অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রধান। প্রভু, এরূপ চিন্তিত হইবেন না। যদি সেই তেজসিংহ এখন জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে প্রভুর কি করিতে পারে?

দুর্জ্জয়সিংহ। যদি? তেজসিংহের জীবিত থাকার বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে?

প্রধান। প্রভু বলিয়াছিলেন, রজনীতে কেবল একদিন মাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ভ্রম কি সম্ভব নহে? সে জীবিত থাকিলে আমাদের চর তাহাকে পায় না কি জন্য? সেই বা এতদিন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে কি জন্য? প্রভু, মিথ্যা চিন্তা করিবেন না, ঐ হ্রদগর্ভে তেজসিংহ বহুদিন প্রাণত্যাগ করিয়াছে!

দুর্জ্জয়সিংহ। প্রধান! সেই একদিন নিশীথে দেখিলে সন্দেহ করিবার স্থল ছিল বটে কিন্তু সেই বালককে দুইবার, বোধ করি, তিনবার দেখিয়াছি।

প্রধান। কবে?

---

* পাঠক জানেন, রাজস্থানের রাজতন্ত্র অনেক অংশে ইউরোপের ফিউডল রাজতন্ত্রের সদৃশ। মহারাণার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কুলাধিপতি যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে নিম্নশ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন, প্রত্যেকের স্ব স্ব দুর্গ ও ভূমি-সম্পত্তি ও প্রজা ছিল, আবার সকলেই শ্রেণীক্রমে মহারাণার অধীন। রাজস্থানের দুইপ্রকার দাস—“রনা” ও “গোলা”; ফিউডল সময়ের “colonii” এবং “slaves”দিগের সদৃশ। “ভূমিয়াগণ” এক কৃষিজীবী “Militia” সম্প্রদায়।

দুর্জ্জয়সিংহ। ভীলগণ বা ভূমিয়াগণ কবে বর্শা নিক্ষেপ করিতে জানে? হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের দিন একদল ভীল ও ভূমিয়াবেশী বর্শা ও অসি হস্তে মানসিংহের সেনাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

প্রধান। এ যথার্থই বিস্ময়ের কথা।

দুর্জ্জয়সিংহ। বিস্ময় কিছুমাত্র নাই, তাহারা ভীল নহে। কয়েকজন রাঠোরযোদ্ধা ভীলবেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের সর্দ্দারকে আমি চিনিয়াছিলাম, সে সেই যুবক! চিতোর-ধ্বংসের সময় জয়মল্লের পার্শ্বে তিলকসিংহকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, অসুরবলে চিতোরের দ্বার রক্ষা করিতে দেখিয়াছি, তিলকসিংহের বালক পিতা অপেক্ষা যুদ্ধে ন্যূন নহে!

মন্ত্রীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। দুর্জ্জয়সিংহ আরও বলিতে লাগিলেন,—সেই হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের দিন বালককে দেখিয়া আমার হস্তের বর্শা কম্পিত হইয়াছিল! দুর্জ্জয়সিংহের বর্শা মিথ্যা হয় না, এক আঘাতে জগৎ হইতে দুর্জ্জয়সিংহের চিরশত্রুকে দূরে করিবার অভিলাষ হইয়াছিল! কিন্তু আহেরীয়ার দিন স্মরণ হইল, বর্শা আমার হস্তেই রহিল।

প্রধান। আহেরীয়ার দিন বালক আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কি সে অবধ্য?

দুর্জ্জয়সিংহ। তাহা নহে। কিন্তু বিদেশীয় শত্রু উপস্থিত আছে বলিয়া তেজসিংহ আহেরীয়ার দিন আমার সহায়তা করিয়াছিল, বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমান থাকিতে দুর্জ্জয়সিংহ গৃহকলহে হস্ত কলুষিত করিবে না।

প্রধান। তবে অন্বেষণ কি জন্য?

দুর্জ্জয়সিংহ। যে দিন দিল্লীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইবে, সেইদিন দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে! সেই জন্য পূর্ব্ব হইতে তাহার আবাস জানা আবশ্যক।

প্রধান। অন্বেষণে আমার ত্রুটি নাই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উদ্দেশ পাই নাই। প্রভু তৃতীয়বার তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলেন?

দুর্জ্জয়সিংহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, তাঁহার মুখ ক্রমে ভ্রূকুটী ধারণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর দুর্জ্জয়সিংহ ক্রোধকম্পিতস্বরে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অদ্য যে চারণের গীত শুনিলেন, তাহার অর্থ কি?

মন্ত্রী। চারণ চিতোর পুনরুদ্ধারের গীত গাইয়াছিল।

সরোষে দুর্জ্জয়সিংহ উত্তর করিলেন,—বৃথা মন্ত্রিত্ব কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন! উঃ, সেই অবধি আমার মন সন্দেহপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু সন্দেহের আর কারণ নাই। নয়নের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু জিঘাংসাপূর্ণ-হৃদয় ভ্রান্ত হয় না। সেই চারণকে দেখিয়া অবধি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় আমার জিঘাংসা উদ্দীপ্ত হইয়াছে! মন্ত্রিবর! সেই তীব্র গীত চিতোর-ধ্বংসবিষয়ক নহে, সে দুর্জ্জয়সিংহ কর্তৃক সূর্য্যমহল ধ্বংসবিষয়ক! জটাচ্ছাদিত সেই জ্বলন্ত নয়নধারী চারণ নহে, তিলকসিংহের পুত্র তেজসিংহ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : উদ্যানের পুষ্প

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং করহৈ
রনাবিদ্ধং রত্নং মধুনবমনাস্বাদিতম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং।
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

পাঠক! চল, দুর্জ্জয়সিংহের প্রাসাদ হইতে অনতিদূরে সেই পর্ব্বতের উপর অন্য একটী স্থানে আমরা গমন করি। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, যাইতে কষ্ট হইবে না। যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, সুন্দর পুষ্পোদ্যানে ক্ষণেক বিশ্রাম করিব।

রজনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু এই নিঃশব্দ রজনীতে এখনও সূর্য্যমহল পর্ব্বতের উপর একটী পুষ্পোদ্যানে একজন রাজপুত বালিকা একাকী পদচারণ করিতেছেন। উদ্যানে জীবমাত্র শব্দমাত্র নাই, বালিকা একাকী সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে পদচারণ করিতেছেন। কখন স্থির

উজ্জ্বল নয়নে সেই নীলনভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন দুই একটী শিশিরসিক্ত পুষ্প তুলিতেছেন, কখন বা চিন্তাকুল হইয়া দুই একটী গীতের অংশমাত্র মৃদুস্বরে গাইতেছেন।

সেই দীর্ঘাকৃতি তন্বঙ্গীকে চন্দ্রকরে একাকিনী দেখিলে মানবী বলিয়া বোধ হয় না, চন্দ্রলোকবাসিনী উদ্যানবিচারিণী অপ্সরা বলিয়া ভ্রম হয়! বালিকার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ হইবে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর, ললাট পরিষ্কার, নয়ন দুইটি উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, মুখমণ্ডল ও শরীর লাবণ্যময় ও পুষ্প অপেক্ষা কোমল, বালিকার নাম পুষ্পকুমারী। মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয়, অল্প বয়সেই কোন চিন্তা সেই সুন্দর ললাটে আপন আবাসস্থল করিয়াছে। নয়ন দুটী ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন কোন অচিন্তনীয় শোক সেই সুন্দর নয়নে আশ্রয় লইয়াছে।

চন্দ্রালোক বৃক্ষপত্র ও পুষ্পের উপর রৌপ্যের ন্যায় পতিত হইয়াছে। নিশীথে পুষ্পগণ যেন নিজ নিজ বক্ষের আবরণ ত্যাগ করিয়া শীতল বায়ুতে শরীর জুড়াইতেছে। পুষ্প রজনীতে শিশিরাক্ত পুষ্প চয়ন করিতে বড় ভালবাসিতেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল উদ্যানে নীরবে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছিলেন।

সেই ললিত বাহুর উপর, সেই অনাবৃত স্কন্ধের উপর, সেই পরিষ্কার ললাটের উপর, শীতল চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের মধ্যে চন্দ্রকর যেন নীরবে প্রবেশ করিতেছে, যেন নীরবে সেই প্রশস্ত উজ্জ্বল নয়নদ্বয় চুম্বন করিতেছে!

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন? ঐ চন্দ্রদেশ হইতে কি চন্দ্রসম্ভবা কোন অপ্সরা জগতের পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছেন? কল্পনাশক্তি কি এই অপূর্ব্ব সুন্দর নিশীথে একটী অপরূপ মায়ামূর্ত্তি গঠন করিয়াছে?—না জগতের কোন মানবীর ঐ ললিত বাহুযুগল, ঐ সুগোল ললাট ও গণ্ডস্থল, ঐ সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, ঐ চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রশান্ত স্নেহগর্ভ নয়নদ্বয়! নিশীথের শীতল বায়ু ধীরে ধীরে গণ্ডস্থলের উপর দুই একটী কেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, নিশীথের চন্দ্রকর নীরবে সেই বিম্বোষ্ঠের পরিমল পান করিতেছে। সহসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে দূর হইতে একটী বীণাধ্বনি শ্রুত হইল, যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ মোহিত করিল, আবার ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হইল! সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-বিনিন্দিত স্বরে যেন একটী নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প"!

নিস্তব্ধ রজনীতে এই মধুর শব্দ পুষ্পের কর্ণে আঘাত করিল, চকিতের ন্যায় পুষ্প ফিরিয়া দেখিলেন। সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত নয়ন ফিরাইয়া পুষ্প চাহিয়া দেখিলেন, গ্রীবা ঈষৎ বক্র, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ ভিন্ন, যেন সেই শব্দটী পুনরায় প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।

পুনরায় সঙ্গীতশব্দ হইল, পুনরায় নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প"!

যেদিক হইতে সঙ্গীত আসিতেছিল, পুষ্প সেদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাচীরের বাহিরে একটী নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া একজন চারণ বীণা বাজাইয়া গীত আরম্ভ করিতেছে। পুষ্প চারণদিগের গীত বড় ভালবাসিতেন, ধীরে ধীরে চারণের নিকটে আসিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গীত শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

"রাজপুত কামিনীগণ", পুরাকালের একটী গীত শুন, সত্যপালনের একটী গীত শুন। সপ্তমবর্ষীয়া একটী বালিকা ও দশম বর্ষের একটী বালকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বালকবালিকা পরস্পরকে বরণ করিল। বালিকা সত্য করিলেন, সেই বালক ভিন্ন আর কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না। রাজপুত বালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।

"বিপদ মেঘরাশির ন্যায় গগন আচ্ছন্ন করিল। সে বালক কোথায় গেল? যুদ্ধে হত হইল বা জলে মগ্ন হইল, কে বলিবে বালক কোথায় যাইল? জগৎ সে বালককে বিস্মৃত হইল, বালিকাও কি তাহাকে বিস্মৃত হইলেন? রাজপুতবালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।

"চন্দাওয়ৎকুলের পরাক্রান্ত বীর সেই বালিকার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেন; সে বীরের ঐশ্বর্য্য অতুল, পরাক্রম অসীম, যশে দেশ পরিপূরিত হইয়াছে! বালিকা কি সে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সত্যকথা ভুলিলেন? রাজপুতবালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।

"চন্দাওয়ৎ লোভ প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন,—'আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি।'

চন্দাওয়ৎ ভয় প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন,—'আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি।' চন্দাওয়ৎ বলপূর্ব্বক বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন, বালিকা বলিলেন,—'চন্দাওয়ৎবীর অপেক্ষা মৃত্যু বলবান।' রাজপুতবালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।'

"রাঠোর কোথায়? পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছে, ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতেছে, মহারাণার যুদ্ধ যুঝিতেছে। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাজপুতবীর অবশ্য জয়ী হইবেন। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাঠোর সত্য ভঙ্গ করিবেন না। রাজপুতবালিকা কখনও সত্য ভঙ্গ করে না।"

পুষ্প এই গীত শ্রবণ করিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, যতক্ষণ বায়ুতে সেই সঙ্গীতের মিষ্টত্ব লীন না হইল, ততক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সে গীতে যেন বালিকার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, হৃদয়ের গূঢ়ভাবসমূহের উদ্রেক হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন।

চারণদেব সেই লাবণ্যময়ীর দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন, পুনরায় ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন,—এ নিস্তব্ধ রজনীতে কি আমার অকিঞ্চিৎকর গীতে কুমারী পুষ্পকে বিরক্ত করিলাম? কাননবাসী চারণের শ্রোতা কেহ নাই, কুমারীও যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, আদেশ করিলে চারণ পুনরায় কাননে ফিরিয়া যাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া আপন গীত গাইবে।

আহা! সঙ্গীত হইতেও চারণের এই নম্র কথাগুলি মিষ্ট! বলিতে বলিতে চারণ ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, চন্দ্রালোকে তাঁহার অবয়ব দেখিয়া পুষ্প আরও বিস্মিত হইলেন। যৌবনের তেজঃপূর্ণ কান্তিতে সে উন্নত বপুঃ পূর্ণ রহিয়াছে, দীর্ঘ বাহুতে বীণা লম্বিত রহিয়াছে, উন্নত ললাটে ও উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে! তথাপি সেই ললাট ও সেই নয়ন যেন পরিশ্রমে বা শোকে ঈষৎ ম্লান, ঈষৎ চিন্তাশীল। চারণ পুনরায় সেইরূপ ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন,—কুমারী আদেশ করিলে চারণ আপন নির্জ্জন কাননে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কুমারীর শ্রবণের উপযুক্ত গীত সে কোথায় পাইবে?

পুষ্প আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—চারণদেব, এ গীত কোথায় শিখিলেন?

পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে চারণদেব কহিলেন,—গহ্বরে ও কাননে যাহার বাস, গহ্বরে ও কাননে তাহার নিকট শিখিয়াছি!

পুষ্প। গহ্বরে ও কাননে কাহার নিবাস?

চারণ। যিনি পৈতৃক দুর্গ হারাইয়াছেন, শিশুকাল অবধি বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।

পুষ্প আর উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এবার উচ্চতরস্বরে কহিলেন,—চারণদেব! একজন অভাগিনী রাজপুতবালার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, সে রাঠোরবীর কি জীবিত আছেন?

চারণ। হল্দীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরের খড়্গ দৃষ্ট হইয়াছিল; পুনরায় ম্লেচ্ছগণ আসিলে পুনরায় রাঠোরখড়্গ দৃষ্ট হইবে?

সাশ্রুনয়নে পুষ্পকুমারী কহিলেন,—জগদীশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন!

চারণদেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবি! যদি চারণের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, সে রাঠোরকে কি কখনও আপনি দেখিয়াছিলেন? যাহাকে জগৎ বিস্মৃত হইয়াছে, যাহাকে বন্ধুবান্ধব বিস্মৃত হইয়াছে, যে ভীল বা ভূমিয়াদিগের ভিক্ষাহারী নিবিড় কানন বা পর্ব্বতকন্দরবাসী, এ জগতে কি একজনও তাহার চিন্তা করে?

চারণের স্বর কম্পিত হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি কষ্টে শেষে কহিলেন,—আমিও গহ্বরবাসী, সেই রাঠোরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে, কেবল এইজন্য জিজ্ঞাসা করি, তাহার নিকট কি কিছু বলিবার আছে?

পুষ্প। কেবল এইমাত্র বলিবার আছে, রাজপুতরমণী সত্যপালন করিতে জানে, রাজপুতবালা সত্যপালন করিবে!

চারণ। তবে কি সে রাঠোর দেবীর পূর্ব্ব পরিচিত?

এবার পুষ্প লজ্জিতা হইলেন, ধীরে ধীরে কহিলেন,—সে বীর এ অভাগিনীর অপরিচিত নহেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ রহিলেন, অনেকক্ষণ পর চারণ পুনরায় কহিলেন,—দেবি! যেদিন আমাকে তেজসিংহ এই গীত শিখাইয়াছিলেন, সেইদিন এই সুবর্ণ অঙ্গুরীয়টী আমাকে দেখাইয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন—গীতোল্লিখিতা বীরনারীর সহিত যদি কখনও দেখা হয়, আমার সত্যের নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী তাঁহাকে দিও। অদ্য দেবীকে দেখিতে পাইলাম, যদি আদেশ করেন, যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, ঐ অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়টী পরাইয়া দি!

লজ্জাবতী পুষ্প সেই দেবনিন্দিত তরুণবয়স্ক চারণের দিকে চাহিলেন, ঈষৎ কম্পিত হইয়া হস্তপ্রসারণ করিলেন। তাঁহার দেহলতা কাঁপিতেছিল—কি জন্য?

চারণদেব ধীরে ধীরে সেই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পাবিনিন্দিত কোমল হস্ত অনেকক্ষণ আপন হস্তে ধারণ করিয়া রাখিলেন। পুষ্প নয়ন মুদিত করিয়াছিলেন, পুষ্পের বোধ হইল যেন চারণের দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার হস্তের উপর পড়িতেছে, যেন চারণের তপ্ত ওষ্ঠ সে হস্ত একবার স্পর্শ করিল।

প্রকৃতই কি চারণদেব এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলেন? না, এ কেবল পুষ্পকুমারীর কল্পনামাত্র? পুষ্প চাহিলেন, পুনরায় সেই দেববিনিন্দিত বপুঃ ও উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল বিশালনয়ন দেখিলেন, ঈষৎ চেষ্টা দ্বারা হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য পুষ্পের ললাট ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তোচ্ছ্বাসে রঞ্জিত হইল!

চিত্তসংযম করিয়া পুষ্প পূর্ব্ববৎ অকম্পিতস্বরে কহিলেন,—চারণদেব! সে বীরপুরুষকে প্রতিদান করিতে পারি, এরূপ অলঙ্কার আমার নাই। কিন্তু যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, অভাগিনীর নিদর্শনস্বরূপ এই পুষ্পটি তাঁহাকে দান করিবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : বন্যপুষ্প

গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু
গচ্ছৎসুবালাং।
জাতাং ভন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং
বাহন্যরূপাম্ ॥
—মেঘদূতম্।

রজনী শেষ প্রায়, এরূপ সময়ে তেজসিংহ সূর্য্যমহল পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া চারণের বেশ ত্যাগ করিয়া ভীমচাঁদের পালের নিকট হইতে সেই পর্ব্বতহ্রদে প্রাতঃস্নান করিতে গমন করিলেন। নিকটে আসিয়াছেন এরূপ সময়ে হ্রদতট হইতে ভীল-ভাষায় একটী গীত শুনিতে পাইলেন। এই নিস্তব্ধ রজনীতে কে গীত গাইতেছে? উৎসুক হইয়া তিনি হ্রদপার্শ্বস্থ একটী ঝোপের ভিতর যাইলেন, দেখিলেন, একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর সেই চন্দ্রালোকে একজন বালিকা বন্যফুল চয়ন করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে গীত গাইতেছে। বিস্মিত হইয়া চিনিলেন, সে ভীমচাঁদের কন্যা।

তেজসিংহ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকিলেন—বালিকা!

বালিকা তাঁহার দিকে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিল,—আমি তোমার জন্য বনের ফুল তুলিতেছি।

তেজসিংহ। এ কি বালিকা! এত রাত্রে একাকী এস্থানে ফুল তুলিতেছিস কেন? আমার সঙ্গে ঘরে আয়।

বালিকা। এই তুমি 'পুষ্প' ভালবাস, তোমার জন্য পুষ্প তুলিয়াছি। বালিকা হাসিয়া উঠিল!

তেজসিংহ ভ্রূকুটী করিলেন; কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকা পুনরায় হাস্য করিয়া কহিল,—আমার এ মালা লইবে না?

তেজসিংহ। লইব বৈকি, দে না।

বালিকা। আমি পরাইয়া দিব।

তেজসিংহ। দে, পরে বাড়ী আয়।

বালিকা। ওকি, তোমার বুকে কি?

তেজসিংহ। একটী ফুল।

বালিকা। ফেলিয়া দাও।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। ও যে বাগানের ফুল।

তেজসিংহ। তাহা হইলই বা, আমি ফেলিব না।

বালিকা। তবে আমি এ মালা পরাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। মালা পরাইলে 'পুষ্প' রাগ করিবে।

চকিতস্বরে তেজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি?

বালিকা। বাগানের ফুল বড়লোক, বনের ফুল ছোটলোক, বন্যফুলের মালা গলায় দেখিলে তোমার ঐ বাগানের ফুলটী রাগ করিবে।

তেজসিংহ কখনও বালিকার কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—ফুল কি আবার রাগ করে?

বালিকা। করে না? তবে তুমি ঐ ফুল ফেলিয়া দিতে ভয় করিতেছ কেন?

তেজসিংহ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—এত রাত্রে একাকী কোথায় গিয়াছিলে?

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। পথে যে ভয় আছে।

তেজসিংহ। কিসের ভয়?

বালিকা। চোরের।

তেজসিংহ। কৈ, আমি ত তাহা জানি না।

বালিকা। তোমার কিছু চুরি করে নাই?

তেজসিংহ। না।

বালিকা তেজসিংহের আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল,—তোমার হাতের অঙ্গুরীয়টী তবে কোথায় গেল?

এবার তেজসিংহ যথার্থ বিস্মিত হইলেন! এই ভীলবালিকা কি সমস্ত জানে, সমস্ত দেখিয়াছে? বালিকা কি সঙ্গে সঙ্গে লুকাইয়া গিয়াছিল, অঙ্গুরীয় দান কি লুকাইয়া দেখিয়াছে? না, তাহা ত সম্ভব নহে, এই মাত্র ত সে একটী প্রস্তররাশির উপর বসিয়া ফুল তুলিতেছিল। তেজসিংহকে চিন্তিত দেখিয়া ভীলবালা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—কেমন, একটী জিনিস চুরি হইয়াছে কি না?

তেজসিংহ। না, চুরি হয় নাই, কোথাও রাখিয়া আসিয়া থাকিব।

বালিকা। আমি খুঁজিয়া দেখিব?

তেজসিংহ। দেখিস।

বালিকা। যদি পাই তবে আমার?

তেজসিংহ। হাঁ।

বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। শেষে বলিল,—আমার এ মালা লইবে না?

তেজসিংহ। না লইব না, তুই বাড়ী আয়।

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। এ চাঁদ দেখিয়া গান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হ্রদে স্নান সমাপন করিয়া তেজসিংহ চলিয়া গেলেন, পশ্চাতে সেই বালিকাকণ্ঠনিঃসৃত গীতধ্বনি শুনিলেন। এবার সে ধ্বনি পরিষ্কার ও সপ্তস্বরমিলিত, বোধ হইল যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতরাশিকে আকুল করিয়া সে খেদনিঃসৃত গীত ধীরে ধীরে নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! ভীলবালার হৃদয়ের সেই সরল গীতটী কিরূপে আমরা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিব?

গীত

বন্যফুলের পুষ্পমালা কে লভিতে চায়?
ভীলবালার পুষ্পমালা ভূমিতে লুটায়!
উদ্যানে সুগন্ধ ফুল, দেখে ধায় অলিকুল
গন্ধশূন্য বন্যফুল ভূমিতে লুটায়!
গন্ধ-পুষ্প মনোলোভা, হৃদয়নয়নশোভা,
কিবা গন্ধ, কিবা আভা হৃদে স্থান পায়!
নীরবেতে বার বার, বন্যফুল চাহে সার,
জীবন-বিহনে তার, জীবন শুকায়!

উনবিংশ পরিচ্ছেদ : অন্ধকারে আলোকচ্ছটা

> ন পৃথগ্‌জনবৎ শুচোবশং বশীনামুত্তম
> গন্তুমর্হসি
> দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ো-
> ঙ্কিতয়েপি তেহচলা ॥
> —রঘুবংশম্।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত স্বদেশের জন্য জীবনদান করিল। সে বৎসর বর্ষার কারণ মোগলেরা কিছু করিতে পারিল না, অগত্যা মেওয়ার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রতাপসিংহ কয়েক মাসের জন্য বিশ্রাম পাইলেন।

মাঘ মাসে শত্রুগণ পুনরায় সসৈন্যে দেখা দিল। বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনরায় যুদ্ধদান করিলেন, কিন্তু বহুসংখ্যক মোগলের সহিত যুদ্ধ বৃথা চেষ্টা, পুনরায় পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মোগল-সেনানী শাহবাজখাঁ কমলমীর দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। প্রতাপ উদয়সিংহের প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া এই স্থলেই রাজধানী করিয়াছিলেন। মেওয়ার হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মাড়ওয়ারে যাইবার জন্য যে পর্ব্বত-উপত্যকা ছিল, সেই উপত্যকার উপরই এ পর্ব্বতদুর্গ নির্ম্মিত। পার্শ্বে উন্নত পর্ব্বতরাশির মধ্যে পর্ব্বততরঙ্গ ও প্রস্তররাশির উপর দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। এক্ষণে মাড়ওয়ারও শত্রুদলস্থ, সেইদিক হইতেই শত্রুগণ আক্রমণ করিয়াছিল, সুতরাং সে দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রতাপসিংহ কমলমীরে রাজধানী করিয়াছিলেন। যতদিন সাধ্য, ততদিন এই পর্ব্বতদুর্গ রক্ষা করিলেন, অবশেষে পানীয় জল মন্দ হইল, সেনার পীড়া হইতে লাগিল, প্রতাপসিংহ অগত্যা সে দুর্গ মাতুলহস্তে অর্পণ করিয়া অন্য দুর্গ রক্ষা করিতে যাইলেন! প্রতাপসিংহের মাতুল বিজলীর প্রমরকুলাধিপতি যুদ্ধপ্রারম্ভে মহারাণার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন, গৌরব-রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিলেন। কমলমীর শত্রুহস্তে পতিত হইল।

কমলমীর হইতে আসিয়া প্রতাপসিংহ মেওয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিমে চাওয়ন্দ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এ প্রদেশ অতিশয় পর্ব্বতময়, অতিশয় দুরাক্রম্য, এ স্থানে কেবল পর্ব্বতীয় ভীলগণ বাস করিত। এ বিপদের সময় ভীল রাজপুতদিগের পরম হিতকারী, প্রতাপ চাওয়ন্দদুর্গে ভীল ও রাজপুত সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে শত্রুগণও নিরস্ত রহিল না। কমলমীর হস্তগত করিবার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিংহ ধর্ম্মেতী ও গগুন্দ দুর্গ বেষ্টন করিলেন, মহবৎখাঁ উদয়পুর হস্তগত করিলেন, ফরিদখাঁ প্রতাপের চাওয়ন্দ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া, অসংখ্য সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও প্রতাপসিংহ সাহস ও অধ্যবসায় হারাইলেন না, যতদিন মেওয়ার দেশে একটী পর্ব্বতদুর্গ বা উপত্যকা স্বাধীন থাকিবে, ততদিন সেই নির্ভীক যোদ্ধা পর্ব্বত-কন্দরে ভীলদিগের মধ্যে বাস করিয়া শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন, স্থির করিলেন! পর্ব্বতে পর্ব্বতে রাজপুতসেনা লুক্কায়িত থাকিত; উপত্যকা ও কন্দরে প্রতাপসিংহের অনুচরগণ

প্রতাপসিংহের আদেশ লইয়া যাইত, নিশীথে পর্ব্বত-চূড়ায় দীপালোক দেখিলে প্রতাপের সেনাগণ তাহার অর্থ বুঝিত! এইরূপ ইঙ্গিতে প্রতাপ নিজ সৈন্য জড় করিতেন ও শত্রুদিগকে অজ্ঞাতে সহসা আক্রমণ করিতেন। প্রতাপ দূরে পলাইয়াছে বা লুকাইয়া আছে ভাবিয়া শত্রুগণ যখন নিশ্চিন্ত থাকিত, সহসা প্রতাপ সসৈন্যে দেখা দিতেন, শত্রুসেনা বিনাশ করিতেন! চিতোর গিয়াছে, উদয়পুর গিয়াছে, কমলমীর গিয়াছে, পর্ব্বতদুর্গ একে একে শত্রুহস্তগত হইতেছে, উপত্যকায় শত্রুসেনা রাশীকৃত হইতেছে, মানসিংহ, শাহবাজখাঁ, ফরিদখাঁ, মহব্বৎখাঁ চারিদিক হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া আসিতেছে, কিন্তু মেওয়ারের যোদ্ধা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত! প্রতাপসিংহ শিশোদীয় নাম রাখিবেন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন!

ফরিদখাঁ সসৈন্যে চাওয়ন্দদুর্গ হস্তগত করিতে আসিতেছিলেন। উন্নত পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ জয় করিয়া মুসলমান মহা উল্লাসে প্রতাপকে বন্দী করিতে আসিতেছিলেন। সহসা প্রতাপের আদেশ গোপনে সেই পর্ব্বতের চারিদিকে নীত হইল, ইঙ্গিতে প্রতাপের সেনাগণ প্রতাপের উদ্দেশ্য বুঝিল। অবিলম্বে ফরিদখাঁ চারিদিকে অবিশ্রান্ত রাজপুতসৈন্য দেখিলেন, সেই গভীর পর্ব্বতগুহা হইতে ফরিদখাঁ ও তাঁহার একজন সৈন্য আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না!

চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় বিপদ যত রাশীকৃত হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ গগন যত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, অর্থ, সৈন্যসংখ্যা, দুর্গসংখ্যা যত হ্রাস পাইতে লাগিল, নির্ভীক প্রতাপের সাহস ও অধ্যবসায় ততই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! সেই পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ তিনি জগতের বিরুদ্ধে একাকী খড়্গহস্তে রক্ষা করিবেন, সেই পর্ব্বতের প্রত্যেক শিলাখণ্ডে বীরত্বের নাম অঙ্কিত করিবেন!

ভবিষ্যৎ গগন আরও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, আরও অন্ধকারময় হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রতাপের সাহস ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিদ্যুতালোকের ন্যায় উজ্জ্বলতর চমকিত হইতে লাগিল! দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত সে আলোকচ্ছটা দৃষ্ট হইল, জগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত সে আলোক চমকিত হইল!

পুনরায় বর্ষা আসিল, মানসিংহ ও মোগলগণ ব্যর্থযত্ন হইয়া সে বৎসরও মেওয়ার ত্যাগ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ অস্থায়ী জগতে স্থায়িত্ব

শস্ত্রেণ রহ্যং যদশক্যরহ্যং নতন্ধুশঃস্ত্রভৃত্যাং
ক্ষিণোতি।

—রঘুবংশম্।

আবার বসন্তকাল আসিল। বসন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্য আসিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবেন।

পুনরায় পর্ব্বত ও উপত্যকা শত্রুগণ আচ্ছাদিত করিল, পুনরায় পর্ব্বতদুর্গ একে একে হস্তগত করিতে লাগিল, পুনরায় পর্ব্বতকন্দর ও নির্জ্জন গুহা হইতে অল্পসংখ্যক নির্ভীক রাজপুতদিগের তাড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন; স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন; সে বৎসর অতীত হইল, নূতন বৎসর আসিল, নূতন বৎসর অতিবাহিত হইল, পুনরায় আর এক বৎসর আসিল, অনন্ত যুদ্ধের অন্ত হইল না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল, বৎসরে বৎসরে অধিকতর সৈন্য মেওয়ার আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সেনানী সুশিক্ষিত সৈন্যতরঙ্গের সহিত মেওয়ারের উপর প্রধাবিত হইল। নির্ভীক প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

প্রতাপসিংহ অনেক সময়ে পর্ব্বতকন্দরে ও নির্জ্জন গহ্বরে বাস করিতেন, মেওয়ারের মহারাজ্ঞী ও রাজপুত গহ্বর হইতে গহ্বরান্তরে বাস করিতেন, শত্রুর আগমনে অনাহারে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে পলায়ন করিতেন, কখন বন্য ভীলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কখন বন্যপশুর

গহ্বরে লুকাইতেন। রাজপরিবার তাপসের ক্লেশ তুচ্ছ করিতেন, শীতে, গ্রীষ্মে, ঘোর বর্ষায় পর্ব্বত ভিন্ন অন্য আশ্রয় পাইতেন না, কখন কখন ক্ষেত্রের দুর্ব্বা ভিন্ন অন্য খাদ্য পাইতেন না। এ কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

প্রতাপসিংহের এ বীরত্বকথা দিল্লীতে শ্রুত হইল, সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রুত হইল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলে জয় জয় রব করিতে লাগিলেন, যাঁহারা প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারাও শত্রুর বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই!

মহানুভব আকবর এই ক্ষত্রিয়ের বীরত্বকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, সম্রাটের পারিষদবর্গ চমৎকৃত হইলেন। দিল্লীর মণিমাণিক্যবিভূষিত উন্নত সিংহাসনে দরিদ্র গহ্বরবাসী প্রতাপসিংহের সাধুবাদ হইতে লাগিল, সমগ্র ভারতবর্ষে জয় জয় শব্দ হইল!

প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা মনে হয়, মহাভারতের বীরদিগের কথা মনে পড়ে। প্রতাপসিংহ সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটী লোকের অধীশ্বর আকবরশাহের সহিত যুঝিয়াছিলেন! তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন, স্বাধীনতা দান করেন নাই।

প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর, কিন্তু উপন্যাস নহে। বিশ্বাস না হয়, নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ কর। উহা আমাদিগের অসার লেখনী নিঃসৃত নহে, প্রতাপসিংহের পরম শত্রু আকবরশাহের রাজসভার প্রধান সভাসদ্ খান্‌খানান সেই দরিদ্র হিন্দুদিগকে উপলক্ষ করিয়া উহা লিখিয়াছেন।

খান্‌খানানের কবিতা

"জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী,
"ভূমি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে,
"কেবল মহৎ নামের গৌরব নষ্ট হয় না।
"প্রতাপ ভূমি ও সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন,
"প্রতাপ মস্তক নত করেন নাই,
"ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে তিনিই
"একাকী স্বজাতির নাম রাখিয়াছেন!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ : অপরিচিতা

কা স্বিদ্ অবগুণ্ঠনবতী ?
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, মেওয়ারের আকাশ মেঘচ্ছায়ায় আরও আবৃত হইতে লাগিল। শত্রুগণ পঙ্গপালের ন্যায় নগর, গ্রাম ও পর্ব্বতউপত্যকা আচ্ছাদিত করিল, সমুদয় দুর্গ একে একে হস্তগত করিল। কিন্তু কন্দরবাসী প্রতাপসিংহ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না।

একদা সমস্ত দিন সংগ্রাম হইল। অসংখ্য মোগলসৈন্য প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, প্রতাপসিংহ কখন আনায়বেষ্টিত সিংহের ন্যায় যুদ্ধদান করিতেছেন, কখন বা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে সরিয়া যাইতেছেন, পুনরায় নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বজ্রের ন্যায় সহসা অন্যদিক হইতে শত্রুকে আক্রমণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস এইরূপ যুদ্ধ হইল, রজনীর আগমনেও সে বিষম যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল না।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর বনের অন্ধকারের ভিতর দিয়া কতকগুলি ভীল অতি সতর্কতার সহিত একটী কাষ্ঠাধার লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছিল। রজনীর অন্ধকারে মনুষ্য মনুষ্যকে দেখিতে পায় না, সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভীমচাঁদের ভীলগণ ঝোপের ভিতর দিয়া সেই আধার ভীমচাঁদের পালে আনিতেছিল। আকাশে তারা নাই, জগতে আলোক নাই, ভীল ভিন্ন

আর কেহ সেই অন্ধকার রজনীতে সে জঙ্গলাচ্ছাদিত পর্ব্বতপথ দিয়া আসিতে পারিত না। ভীলদিগের পদশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিশ্বাস শব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিঃশব্দে সেই আধার পালের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই পালের ভিতর একটী পর্ব্বতগহ্বর ছিল, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছেন। আধার সেই গহ্বরে প্রবেশ করিল, ভীলগণ তথায় আধার রাখিয়া অদৃশ্য হইল।

সেই অন্ধকারময় নিশীথে সেই ভীলবাহিত আধারে পাঠকের পূর্ব্বপরিচিতা পুষ্পকুমারী গহ্বরে আনীতা হইলেন। এ অনন্ত যুদ্ধে সূর্য্যমহলে রাণীদিগেরও স্থান নাই, সুতরাং দুর্জ্জয়সিংহের পরিবার পূর্ব্বেই অন্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্য কোন অপরিচিত যোদ্ধার আদেশে পুষ্প সূর্য্যমহল হইতে এই গহ্বরে আনীতা হইলেন।

গহ্বরের ভিতরে একটী দীপ জ্বলিতেছিল। সেই দীপালোকে পুষ্প বিস্মিতা হইয়া দেখিলেন, তথায় আর একজন গরীয়সী রাজপুতরমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। রমণীর শরীর উন্নত, পরিষ্কার ললাটে একটী হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে, নয়ন হইতে নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, কণ্ঠে একটী মুক্তাহার লম্বিত রহিয়াছে। উন্নত অবয়ব ও জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল দেখিলে রমণীকে উন্নতকুলসম্ভবা বলিয়া বোধ হয়, তথাপি পরিশ্রম বা ক্লেশ বা চিন্তায় সে বিশাল নয়ন আজি কালিমাবেষ্টিত, সে সুন্দর ললাট আজি ঈষৎ রেখায় অঙ্কিত। গরীয়সী বামার বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর হইবে, তিনি পাঠকের অপরিচিতা, কিন্তু মেওয়ারে তিনি অপরিচিতা ছিলেন না।

সূর্য্যমহল ত্যাগ করিয়া অবধি পুষ্প অন্য নারীর মুখ দেখেন নাই, অন্য নারীর সহিত কথাবার্ত্তা কহেন নাই। ভীলদিগের আবাসে আসিয়া পুষ্প চকিত হইয়াছিলেন, ভীলদিগের গহ্বরে আসিয়া ভীত হইয়াছিলেন! ক্রমে সেই গহ্বরে স্তিমিত দীপালোকে যখন আর একজন রাজপুত রমণীকে দেখিতে পাইলেন, যখন তাঁহার উজ্জ্বল রূপলাবণ্য এবং মুখের কমনীয়তা ও মধুরতা দেখিতে পাইলেন, তখন পুষ্পের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে অপরিচিতা রমণীর নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ দুইটী ধরিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—দেবি! আমি কোথায় আসিয়াছি জানি না, কাহাকে আমার সম্মুখে দেখিতেছি জানি না। বোধ হয় আপনি কোন উন্নতবংশীয়া রমণী হইবেন, বোধ হয় এই যুদ্ধের সময় বিপদে পড়িয়া এই গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছেন, বোধ হয় আমার প্রতি দয়া করিয়া আমাকেও এই নিরাপদ স্থানে আনাইয়াছেন। আপনি যিনিই হউন, আমি আপনার শরণাপন্না হইলাম। আমাকে আশ্রয় দান করুন—পুষ্পকুমারী আশ্রয়হীনা ও অভাগিনী।

পুষ্পকুমারীর করুণস্বর ও নয়নজল দেখিয়া অপরিচিতা রমণী বাৎসল্যের সহিত তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া অনেক আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—মা পুষ্প, অদ্য তোমারও যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা। এ গহ্বর ভীলদিগের, ভীলগণ বিপদের সময় আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে। একজন রাজপুত যোদ্ধাও এই স্থানে বাস করেন, তিনিও আমাদিগের রক্ষায় যত্নবান হইয়াছেন। তিনিই আমাকে শত্রু-হস্ত হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য কয়েকদিন হইল এই স্থানে আনিয়াছেন, তিনিই তোমাকেও নিরাপদে রাখিবার জন্য অদ্য এই স্থানে আনাইয়াছেন। যদি ইচ্ছা কর, তুমি আমারই নিকটে থাকিও, আমার পুত্রকন্যা যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে, ইহার অধিক আশ্বাস দিতে পারি না।

এ বাৎসল্যপূর্ণ স্নেহের কথাগুলি কাহার? পুষ্প অনেক দিন হইতে এরূপ স্নেহের কথা শুনে নাই, বহুদিন পর স্নেহবাক্য শুনিয়া পুষ্পের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। নিঃশব্দে দরবিগলিত ধারায় পুষ্প রোদন করিতে লাগিল, দরবিগলিত ধারায় অপরিচিতার পদযুগল সিক্ত করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অপরিচিতা অধিকতর অনুকম্পার সহিত পুষ্পকে আশ্বাস দান করিলেন ও কহিলেন,—শান্ত হও, আমার স্বামী মেওয়ারে অপরিচিত নহেন, এই ভীষণ যুদ্ধের অন্তে বোধ হয় তিনি তোমাকে সহায়তা করিতে পারিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : ভবিষ্যৎ-বাণী

লভ্যা ধরিত্রী তব বিক্রমেন জ্যায়াংশ্চ বীর্য্যাস্ত্র-
বর্ধৈর্ব্বিপক্ষঃ।
অতঃ প্রকর্ষায় বিধির্ব্বিধেয়ঃ প্রকর্ষতন্ত্রাহি রণে
জয়শ্রীং॥

—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

অপরিচিতা রমণী পুষ্পের সহিত কথা কহিতেছেন, এরূপ সময় নাহারা মগ্‌রোর বৃদ্ধা চারণী দেবী সহসা সেই ভীল-গহ্বরে উপস্থিত হইলেন।

চারণীদেবী অগ্রসর হইয়া আপন ধীর ও গম্ভীরস্বরে অপরিচিতাকে বলিলেন,—দেবি! অদ্য জানিলাম এই অন্ধকারময় ভীমচাঁদের গহ্বর পবিত্র ও আলোকপূর্ণ, সেই আলোক দর্শন করিতে আসিলাম। অবগুণ্ঠন ত্যাগ করুন, মহারাজ্ঞি! চারণীর নিকট অবগুণ্ঠন অনাবশ্যক।

তখন মহারাজ্ঞী প্রতাপসিংহের মহিষী অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিলেন, গরীয়সী বামার উজ্জ্বল মুখকান্তিতে সে পর্ব্বত গহ্বর আলোকপূর্ণ হইল। সেই উন্নত ললাটে একটী হীরকখণ্ড ঝক্‌মক্ করিতেছে, বক্ষঃস্থলে এক ছড়া মুক্তাহার দোদুল্যমান রহিয়াছে। প্রতাপসিংহের মহারাজ্ঞী তখন চারণীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, স্তব্ধ হইয়া পুষ্প সেই কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী। চারণী মাতা, আজি তোমাকে দেখিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইলাম, বিপদের দিনে তুমি চিরকালই আমাদের সহায়। বিপদ ও সংকট মহারাণার অপরিচিত নহে, আমার নিকটও অবিদিত নহে, তথাপি এরূপ ঘোর বিপদরাশি পূর্ব্বেও কখন বোধ হয় মেওয়ার প্রদেশে দেখা দেয় নাই। বহুদিন হইতে মহারাণার সাক্ষাৎ লাভ করি নাই, অনন্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি স্ত্রীপুত্রকে দেখিবারও অবকাশ পান নাই। পুত্রকন্যা লইয়া আমি দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে আশ্রয় লইয়াছি, অবশেষে কয়েক দিন হইতে এই ভীলদিগের গহ্বরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি। এখানেও আমরা নিরাপদ নহি, তুর্কীগণ বোধ হয় আমাদের কোন সন্ধান পাইয়া এই দিকে আসিতেছে। ঐ দূরে উপত্যকায় অদ্য মহারাণার সহিত তুর্কীদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে, সে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, তুর্কীদিগের যুদ্ধনাদ এখনও শুনা যাইতেছে। আমার হৃদয় চিন্তাকুল হইয়াছে, চারণী মাতা, মহারাণার কুশল সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর কর।

চারণী। মহারাজ্ঞি! শান্ত হউন, চিন্তা করিবেন না। স্বয়ং ঈশানী আপনার স্বামীকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি কুশলে আছেন।

রাজ্ঞী। মাতা, তোমার কথায় আমি আশ্বস্ত হইলাম, তোমার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী নিজের বিপদ ডরে না, সে বিপদ তুচ্ছ করিয়া শত্রুগণকে উপহাস করিয়া শিশোদীয় ধর্ম্মানুসারে জীবনত্যাগ করিয়া আপন মানরক্ষা করিতে জানে। কিন্তু রাজা ও রাজশিশুগণের জন্যই আমার চিন্তা। মেওয়ার প্রদেশে রাজশিশুগণের মস্তক রাখিবার স্থান নাই, মেওয়ারের রাজশিশুগণ কি তুর্কীহস্তে পতিত হইবে? মেওয়ারের ইতিহাস কি অদ্যই শেষ হইল?

শিশুদিগের বিপদ স্মরণে সেই বীরহৃদয় একবার দ্রবীভূত হইল, সেই উজ্জ্বল নয়নদ্বয় একবার জলে পূর্ণ হইল। পুষ্প নিজের দুঃখ ও বিপদ ভুলিয়া গেলেন, সেই দেবীতুল্যা মহারাজ্ঞীর দিকে তিনি ভক্তিভাবে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন. মহারাজ্ঞীর নয়নের জল দেখিয়া পুষ্পের নয়নও শুষ্ক ছিল না।

চারণী। শিশোদীয়কুলে যতদিন বীরত্ব আছে, মেওয়ারের ইতিহাস ততদিন লুপ্ত হইবে না। মহারাজ্ঞি, শান্ত হউন, রাজশিশুদিগের এখনও নিরাপদ স্থান আছে। ভীলগণ শিশোদীয়ের চিরবিশ্বাসী, মহারাণা উদয়সিংহকে এই ভীল-সর্দ্দার ভীমচাঁদের পিতা এই গহ্বরে স্থান দিয়াছিল, মহারাণা প্রতাপসিংহের পরিবারকে ভীমচাঁদ স্থান দিবে। মহারাজ্ঞি! শান্ত হউন, এই গহ্বরের অনতিদূরে জাউরার খনির ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না, আহবের

শব্দ প্রবেশ করে না, মহারাণার পরিবার তথায় নিরাপদে থাকিবেন। এ কালসময় শীঘ্রই অবসান হইবে।

রাজ্ঞী। চারণী, তোমার বচনে আমি আশ্বস্ত হইলাম। যুদ্ধে, বিপদে, রাজপুতের হৃদয় বিচলিত হয় না, কিন্তু বৎসদিগের কথা স্মরণ করিয়া একবার নারীর মন ব্যাকুল হইয়াছিল। যদি শিশুগণ নিরাপদে থাকে, তবে এ যুদ্ধ যুগান্তরব্যাপী হউক, মেওয়ারের মহারাণা তাহাতে কাতর নহেন, মেওয়ারের রাজমহিষী তাহাতে কাতর নহে। এই ভীল-গহ্বর আমার প্রাসাদ-স্বরূপ হইবে।

চারণী। এ স্থানে রাজপরিবার কোন ক্লেশ পাইবেন না, কেননা এ গহ্বর এক্ষণে একজন প্রধান রাজপুত যোদ্ধার আশ্রয়স্থান।

মহারাজ্ঞী। তাহাও শুনিয়াছি। সেই রাঠোর যোদ্ধাই আমাদিগকে ভীমগড়ে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের নিরাপদে রাখিবার জন্য এই ভীলদিগের গহ্বরে আনাইয়াছেন। যোদ্ধার বিশেষ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে, কি জন্য সেই বীরাগ্রগণ্য আশৈশব লোকালয় ত্যাগ করিয়া ভীলদিগের সঙ্গে এই গহ্বরে বাস করিতেছেন, কি মহাব্রত সাধনার্থ পর্ব্বত ও অরণ্যবাসী হইয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। আমাদের এই সংকট ও বিপদের মধ্যে তাঁহার বিশেষ পরিচয় লইবার অবকাশ পাই নাই, পরিচয়দান করিতেও তিনি বড় ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু এই বিপদরাশি হইতে যদি উত্তীর্ণ হই, তাহা হইলে আমাদিগের দুর্দ্দিনের বন্ধুকে আমি বিস্মৃত হইব না, মহারাণাও বিস্মৃত হইবেন না।

উদ্বেগে পুষ্পের হৃদয় স্তম্ভিত হইল, তাঁহার নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইল। মহারাজ্ঞী কি সেই রাঠোর যোদ্ধার কথা কহিতেছেন? সেই রাঠোর যোদ্ধা পিতৃদুর্গচ্যুত হইয়া অবধি কি এই ভীষণ গহ্বরে বাস করিতেছেন?

চারণী। দেবি! সে যোদ্ধার দীর্ঘ ইতিহাস অন্য একদিন কহিব, অদ্য ক্ষমা করুন। অদ্য কেবল এইমাত্র কহিতেছি যে, ভীলপালিত তেজসিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা এবং বিশ্বাসী অনুচর মহারাণার আর কেহ নাই। তেজসিংহের হস্তে যতদিন খড়্গ আছে, তেজসিংহের ধমনীতে যতদিন শোণিত আছে, আপনাদিগের ততদিন বিপদ নাই।

পুষ্পের শরীর কণ্টকিত হইল, হৃদয় আনন্দে ও উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল।

রাজ্ঞী। আকাশের দেবগণ তেজসিংহের সহায়তা করুন। দেবি! আমি তাহার স্বামিভক্তির কি পুরস্কার দিতে পারি?

পুষ্পের হৃদয় পুনরায় উদ্বেগপূর্ণ হইল, তিনি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া চারণীর উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারণী। মহারাজ্ঞী! সেই তেজসিংহের নিরাশ্রয়া বাগ্‌দত্তা পত্নী আপনার চরণতলে! বালিকা পুষ্পকুমারীকে আশ্রয়দান করুন, পুষ্প অপেক্ষা বিশ্বাসিনী সহচরী আপনি পাইবেন না। পুষ্প! অবগুণ্ঠন ত্যাগ কর, চারণীর নিকট সঙ্গোপনচেষ্টা বৃথা। যিনি শিশোদীয় জাতির একমাত্র পূজ্যা, যিনি মেওয়ার প্রদেশের আশ্রয়ভূতা, অদ্য সেই মহারাজ্ঞীর আশ্রয় গ্রহণ কর।

বিস্ময় ও লজ্জা, আনন্দ ও উৎকণ্ঠায় বিহ্বলা হইয়া পুষ্পকুমারী সাশ্রুনয়নে মহারাজ্ঞীর চরণ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মহারাজ্ঞী অনেক আশ্বাস-বাক্য দিয়া পুষ্পকে উঠাইলেন, অবশেষে বলিলেন,—পুষ্প তোমাকে পূর্ব্বেই আমি বাক্যদান করিয়াছি, তুমি আমার কন্যা, আমি তোমার মাতা; আমার অন্য সন্তান যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে। মেওয়ারের রাজ্ঞী অদ্য ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্বাস দিতে পারে না।

অন্যান্য অনেক কথার পর মহারাজ্ঞী চারণীদেবীকে পুনরায় যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চারণীদেবী উত্তর করিলেন,—মহারাজ্ঞী চিন্তা করিবেন না, মেওয়ারের আকাশ পরিষ্কার হইতেছে, বীরত্ব ও অধ্যবসায়ের জয় অনিবার্য্য।

রাজ্ঞী। কিরূপে সে বিজয় সাধন হইবে তাহা কি জানিতে পারি?

চারণী। রাজার বল অস্ত্রে ও মন্ত্রণায়। অস্ত্রে যাহা সাধ্য, মহারাণা তাহা করিয়াছেন, এক্ষণে মন্ত্রী ভামাশাহ সহায়তা করুন। ভামাশাহের স্বামিধর্ম্মে মেওয়ারের বিজয়।

রাজ্ঞী। দেবি! তোমার বাক্য আমার চিন্তিত হৃদয়ে শান্তি দান করিল, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

চারণী। মহারাজ্ঞী যাহা আদেশ করিবেন, চারণী তাহা সানন্দে পালন করিবে।

রাজ্ঞী। চারণী দেবি! তোমাদিগের মুখে শুনিতে পাই, দিল্লীর সিংহাসন ও সমস্ত হিন্দুস্থান পূর্ব্বে রাজপুতদিগের ছিল। রাণা পৃথ্বীরায় নাকি পূর্ব্বে দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন, ৫০ বৎসর হইল রাণা সংগ্রামসিংহ নাকি দিল্লী অধিকার করিবার জন্য যুঝিয়াছিলেন। পুনরায় কি আমরা কখনও দিল্লী অধিকার করিব? হিন্দুস্থানের দূর ভবিষ্যতে কি আছে? তুর্কীর বিজয়, না শিশোদীয়ের বিজয়?

চারণীদেবী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দৃষ্টিহীন স্থিরনয়ন অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধ্বদিকে চাহিয়া রহিল। পরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—মহারাজ্ঞি! আমার বয়স অধিক হইয়াছে, নয়ন ক্ষীণ, ভবিষ্যৎ আকাশে আমি বহুদূর দেখিতে পাই না। অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার! রাজপুত বহুদিন তুর্কীর সহিত যুঝিতেছে; তৎপরে রাজপুত দক্ষিণাবাসী হিন্দুর সহিত যুঝিতেছে; তাহার পর এ কি! মহাসমুদ্র হইতে শ্বেত তরঙ্গের উপর শ্বেত তরঙ্গ আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছে। বৃদ্ধার নয়ন ক্ষীণ! সে আর কিছু দেখিতে পায় না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : সূর্য্যমহল ধ্বংস

হাহাকারঃ সমভবৎ তত্র তত্র সহস্রশঃ।
অন্যোঽন্যং ছিন্দতাং শস্ত্রৈরাদিত্যে লোহিতায়তি॥
—মহাভারতম্।

কি জন্য ও কি অবস্থায় রাজ-পরিবার ভীল-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক।

মোগলদিগের সহিত যুদ্ধহেতু মহারাণা প্রতাপসিংহ সর্ব্বদাই সপরিবারে কন্দরে ও পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতেন। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী স্বামীর ন্যায় স্বদেশপ্রিয়া ছিলেন, ক্লেশযাতনা তুচ্ছ করিয়া প্রস্তরের উপর রজনীতে শয়ন করিতেন, স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া শিশুকে খাওয়াইতেন, বিপদের সময়ে পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, কন্দর হইতে অন্য কন্দরে পলাইতেন. তথাপি সন্ধি প্রার্থনার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতেন না। হিংস্রক জন্তুর আবাসস্থানে মহারাজ্ঞী আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, শীতকালে পাহাড়ের উপর অগ্নি জ্বালিয়া সন্তানদিগের শীত নিবারণ করিতেন, বর্ষাকালে কখন কখন পর্ব্বতকন্দর ভাসিয়া যাইলে সিক্তবস্ত্রে সমস্ত রজনী শিশুক্রোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতেন না। ক্ষেত্রের দুর্ব্বার রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতেন, কখন প্রস্তুত রুটী ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুদিগকে লইয়া শত্রুভয়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, তথা হইতে পুনরায় আর এক স্থানে পলায়ন করিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতেন না।

এইরূপ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও মহারাণা মোগলদিগের সহিত প্রতি বৎসর যুদ্ধদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রায় সমস্ত দুর্গ, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত উপত্যকা শত্রুহস্তে পতিত হইল, প্রতাপসিংহ বিশাল মেওয়ার রাজ্যে মস্তক রাখিবার স্থান পাইলেন না। অবশেষে তিনি চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সূর্য্যমহলে আপন পরিবার রাখিলেন, স্বয়ং আপন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুদিগকে নানাদিক হইতে বারবার গোপনে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ সসম্মানে রাজপরিবারকে আপন প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন। অসংখ্য মোগল শত্রু আসিয়া সূর্য্যমহল বেষ্টন করিল। মেওয়ারের প্রধান যোদ্ধৃগণ কেহ প্রতাপসিংহের সঙ্গে রহিলেন, কেহ বা সূর্য্যমহল রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তেজসিংহ সূর্য্যমহলেই রহিলেন; বিপদের সময় রাজপুত, রাজপুতের ভ্রাতা! দুর্জ্জয়সিংহ নিঃসঙ্কোচে তেজসিংহ ও তাঁহার রাঠোরগণকে সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিতে দিলেন, কেননা তেজসিংহ রাজপুত, বিশ্বাসঘাতকতা জানেন না, রাজকার্য্যসাধনার্থ দুর্গে প্রবেশ পাইয়া আপন

অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন না। তেজসিংহ নিঃসঙ্কোচে শত্রুদুর্গে শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপন অল্প সৈন্য লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কেননা দুর্জ্জয়সিংহ রাজপুত, বিদেশীয় যুদ্ধের সময় তেজসিংহের উপর কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই অসাধারণ সাহসী, কিন্তু এক্ষণে পরস্পরের বর্ত্তমানে অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে স্থানে অতিশয় বিপদ হইত, যে স্থানে শত্রুগণ অসংখ্য বলে আক্রমণ করিত, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই সেই স্থানে প্রথমে যাইবার উদ্যম করিতেন, কেননা রাঠোর চন্দাওয়ৎ অপেক্ষা হীন নহে, চন্দাওয়ৎ রাঠোর অপেক্ষা হীন নহে। একদিন নিশার যুদ্ধে শত্রুগণ দুর্গের একটী দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিল, ও সেই পথ দিয়া মোগলগণ দুর্গে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। দুর্গবাসী এই বিপদ দেখিয়া যেন চকিতের ন্যায় রহিল, সহসা তেজসিংহ বজ্রনাদে কতিপয় মাত্র রাঠোর সঙ্গে লইয়া শত্রুমধ্যে পড়িলেন, অসুরবলে তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। অমানুষিক বেগে শত্রুসেনা ছিন্নভিন্ন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন, পরেপশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইলে লম্ফ দিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া শোণিতাপ্লুতদেহে দুর্গে প্রবেশ করিলেন! এই অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত দুর্গবাসী জয়নাদে দুর্গ পরিপূর্ণ করিল। দুর্জ্জয়সিংহ সে বীরত্ব দেখিলেন, সে জয়নাদ শুনিলেন, রজনী প্রভাত হইলে দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিবার আদেশ দিলেন। দ্বিশতমাত্র চন্দাওয়ৎ লইয়া দুর্দ্দমনীয় তেজে সহসা পঞ্চশত মোগলকে আক্রমণ করিলেন, সহসা আক্রান্ত মোগলগণ সে সরোষ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পলাইল। অসমসাহসী চন্দাওয়ৎ পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, চন্দাওয়তের বীরত্বযশে দুর্গ পরিপূরিত হইল!

এইরূপ পরস্পর পরস্পরের বীরত্বে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই অসাধারণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রজনীতে শয্যা তুচ্ছ করিয়া চন্দ্রালোকে উভয়ে প্রাচীরের উপর পদচারণ করিতেন, শত্রুসেনা লক্ষ্য করিতেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেন, আপন আপন সৈন্যগণকে সাহস দান করিতেন। শত্রুগণকে অসতর্ক দেখিলেই উভয়ে মিলিত হইয়া নৈশ আক্রমণে শত্রুসেনা ছারখার করিতেন, ভ্রাতার ন্যায় একের পার্শ্বে অন্যে যুদ্ধ করিতেন, উভয়েই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেন, কেহই অন্য অপেক্ষা অগ্রসর হইতে পারিতেন না। শত্রুসেনা ছারখার করিয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর একত্রে দুর্গে প্রবেশ করিতেন, পরিশ্রান্ত তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ প্রাচীরের উপর একই স্থানে উপবেশন করিয়া সামান্য রুটী ও অপরিষ্কার জলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিতেন, পরে যখন পূর্ব্বদিক রক্তিমাচ্ছটায় রঞ্জিত হইত, সেই প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের উপর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দুইজন পরম শত্রু নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেন।

রাজপুত-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ কর, কপটাচারিতার পরিচয় নাই, সত্যভঙ্গের পরিচয় নাই, পরম শত্রুর সহিতও অন্যায় সমরের বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই। সম্রাটের বাক্য লঙ্ঘন হইয়াছে, সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের সত্য লঙ্ঘন হয় নাই।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, অবশেষে সূর্য্যমহলের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল, তখন রাজপরিবারকে আর এ দুর্গে রাখা বিধেয় বোধ হইল না। অতিশয় যত্নে রাজপরিবারকে ভীমগড় দুর্গে প্রেরণ করা হইল, দুর্জ্জয়সিংহ ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণ নিজ নিজ পরিবারকে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন, পরে যোদ্ধৃগণ অর্দ্ধেক ভোজনে প্রাণধারণ করিয়া তখনও দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা করিল। আরও একমাস দুর্গ রক্ষা করিল, কিন্তু অনাহারে প্রাণধারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সূর্য্যমহলের দ্বার অবশেষে উদ্ঘাটিত হইল. মোগলগণ ভীষণনাদে দুর্গে প্রবেশ করিল, দুর্গের মধ্যে মোগল ও রাজপুতে মহাকোলাহলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সে যুদ্ধ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম, বর্ণনা করিবার আবশ্যকও নাই। রাজপুতগণ মৃত্যু নিশ্চয় জানিলে মানরক্ষার জন্য কিরূপে যুদ্ধ করে, ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রে তাহা বর্ণিত আছে। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা সাধিল. কিন্তু দশের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে না, রাজপুত হীনসংখ্য হইয়া ক্রমে হটিতে লাগিল।

যুদ্ধতরঙ্গ প্রাঙ্গণ হইতে তোরণে, তোরণ হইতে গৃহমধ্যে গড়াইতে লাগিল, বন্দুকের ধূমে

ও মনুষ্যের কোলাহলে সূর্য্যমহল প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল, অল্পসংখ্যক রাজপুত ছিন্নভিন্ন শত্রুবেষ্টিত হইয়া তখনও অসুরবীর্য্যে প্রাসাদ রক্ষা করিতেছে।

প্রাসাদের শেষ কুটীরে দুর্জ্জয়সিংহের সহিত তেজসিংহের সহসা দেখা হইল, উভয়েই খড়্গহস্ত, উভয়েই রক্তাপ্লুত! তেজসিংহ ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—দুর্জ্জয়সিংহ! চন্দাওয়ৎ রাঠোরের বীরত্ব দেখিয়াছে, রাঠোর চন্দাওয়তের বীরত্ব দেখিয়াছে, আর যুদ্ধ নিষ্ফল, এ যুদ্ধে জীবনদান করাও নিষ্ফল। কিন্তু অদ্য আমরা রক্ষা পাইলে মহারাণার অন্য কার্য্য সাধন করিতে পারিব।

দুর্জ্জয়সিংহ। মহারাণার কার্য্যসাধন রাজপুতের প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু অদ্য পরিত্রাণ পাওয়ার কি পথ আছে?

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একটী গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—শুনিয়াছি, ঐ গবাক্ষ দিয়া একজন রাঠোর বালক লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িয়াছিল, পরে সন্তরণ দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছিল। রাঠোর বালক যাহা করিয়াছিল, চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা বোধ হয় তাহা করিতে পারেন।

লজ্জায়, রোষে, পূর্ব্বকথা স্মরণে দুর্জ্জয়ের মুখ রক্তবর্ণ হইল, হস্তের অসি কাঁপিতে লাগিল। রোষে পদাঘাত করিয়া সে গবাক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলেন।

তেজসিংহও সে গবাক্ষ দিয়া হ্রদে পড়িলেন, উভয়ে সন্তরণ দ্বারা হ্রদ পার হইলেন। সূর্য্যমহল শত্রু হস্তগত হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ভীমগড় ধ্বংস

ক্ব গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
প্রমাণসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি॥

—মহাভারতম্।

উপরি উক্ত ঘটনার পর প্রায় একমাস কাল কোন যুদ্ধ হইল না। ভীমগড়নিবাসী রাজপুতগণ মনে করিল, যুদ্ধ বোধ হয় এ বৎসরের জন্য ক্ষান্ত হইল, কিন্তু সে আশায় তাহারা অচিরে নিরাশ হইল।

মহারাণা প্রায়ই দুর্গে থাকিতেন না। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিতেন। স্থানে স্থানে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিতেন, সুযোগ পাইলেই অন্ধকার নিশীথে সমস্ত সৈন্য লইয়া নিশ্চিন্ত মোগলদিগকে সহসা আক্রমণ করিতেন, পুনরায় বহুসংখ্যক মোগল জড় হইবার পূর্ব্বে যেন ভূগর্ভে বা পর্ব্বত গহ্বরে লীন হইয়া যাইতেন। দিবসে, যামিনীতে, শীতে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে, অবিশ্রান্ত প্রতাপসিংহ এইরূপে মেওয়ার রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মেওয়ার বিজয় হইল না।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে মুসলমানগণ সহসা একদিন রজনীতে দ্বিসহস্র সৈন্যসমেত ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল। ভীমগড়ে রাজপরিবার আছেন এ সংবাদ কোনরূপে তাঁহারা জানিয়াছিল। রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলে অবশেষে প্রতাপ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য অবশ্যই অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই আশায় অদ্য সহসা মহাকোলাহলে ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল।

রাজপুতগণ নিশাযোগে এই সহসা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রতাপসিংহ দুর্গে ছিলেন না, দেবীসিংহও কয়েক শত রাঠোর লইয়া মহারাণার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরিতেছিলেন। কেবল বালক চন্দনসিংহ পাঁচশত মাত্র রাঠোর লইয়া দুর্গে ছিল, আর তেজসিংহও দুর্গে ছিলেন। তিনি রাজপরিবার রক্ষার ভার লইয়াছিলেন, কদাপি দুর্গ ত্যাগ করিতেন না।

মুসলমানদিগের সহসা এই ভীষণ আক্রমণ দেখিয়া তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, দুর্গপ্রাচীর হইতে চারিদিকে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় মুসলমানদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর বালক চন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—চন্দন! অদ্য দুর্গরক্ষা সংশয়ের বিষয়, রাজপরিবারকে সংশয়ের স্থানে রাখা বিধেয় নহে।

ভীমগড় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার জন্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটী গোপনীয় পথ আছে, তাহা কেবল আমার বিশ্বস্ত ভীলগণ ও আমি জানি। কিন্তু সে পথ অতিশয় বক্র, নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইবে। বালক! পঞ্চ শত রাঠোর লইয়া সমস্ত রজনী দুর্গ রক্ষা করা অদ্য তোমার কার্য্য!

উল্লাসে চন্দনসিংহ উত্তর করিলেন,—প্রভু পূর্ব্বেই দুর্গরক্ষার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, দাস তাহা করিবে। আমাদিগের ধন, সম্পত্তি, জীবন মহারাণার; মহারাণার জন্য এ দাস অদ্য যুঝিবে। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া রাজপরিবার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন, ভীমগড় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এ দাস রক্ষা করিবে।

বালকের এ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন; কহিলেন,—চন্দনসিংহ! তুমি যখন এ কার্য্যের ভার লইয়াছ, আমার আর চিন্তা নাই। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন,—কিন্তু যখন দেবীসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তেজসিংহ তাঁহাকে কি বুঝাইবে?

আর বিলম্ব না করিয়া তেজসিংহ রাজপরিবার রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বয়ং ভীলবেশে সমস্ত পথ যাইলেন, কোন্ স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইলেন, পাঠক পূর্ব্বেই তাহা অবগত আছেন।

এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গ-প্রাচীরের উপর মশালের আলোক দৃষ্ট হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে তিনশত রাঠোর দুর্গদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যে স্থানে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, আরোহণ অতিশয় কষ্টসাধ্য, রাজপুতগণ সেই স্থানে শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজপুতদিগের সংখ্যা অতিশয় অল্প, কিন্তু সাহস অসাধারণ, এবং সেই পর্ব্বতরাশি অপেক্ষা তাহাদিগের হৃদয় স্থির ও অকম্পিত। বালক চন্দনসিংহ অদ্য দৈবজ্ঞানে জ্ঞানী, দৈববলে বলিষ্ঠ, নিঃশঙ্কহৃদয়ে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট দুইশত যোদ্ধা দুর্গের ভিতর রহিল।

দেখিতে দেখিতে তরঙ্গতেজে মুসলমান আসিয়া পড়িল, যুদ্ধনাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল। সে ঘোর রজনীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্ণনা করা যায় না। অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবে, অদ্য মহারাণার পরিবার বন্দী হইবেন, এই আশায় ঘোর উল্লাসে মুসলমানগণ রাজপুতশ্রেণীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। মুসলমানের অসংখ্য সেনা, কিন্তু সে পর্ব্বত আরোহণ করিবার একমাত্র পথ, সুতরাং মুসলমানেরা সেই অল্পসংখ্যক রাজপুত সেনাকে চারিদিকে বেষ্টন করিতে পারিল না। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বারবার মহাগর্জ্জনে মুসলমান সেই রাজপুত রেখার উপর পড়িতে লাগিল, কিন্তু জলধিসীমাস্থ পর্ব্বত প্রাচীরের ন্যায় রাজপুতরেখা বার বার সে তরঙ্গ প্রতিহত করিতে লাগিল।

মহারাণার সম্মান, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের মাতা, বনিতা, ভগিনী, কুটুম্বিনীর জাতিধর্ম্ম সমস্তই আমাদিগের অসির উপর নির্ভর করে—প্রত্যেক রাঠোর নিঃশব্দে এই চিন্তা করিল, নিঃশব্দে অসংখ্য শত্রুকে যুদ্ধদান করিল। এ চিন্তায় যতদিন স্বাধীন যোদ্ধার ধমনীতে রক্ত বহিতে থাকে, ততদিন জগতে সে যোদ্ধার পরাজয় নাই। মোগলদিগের সেনা অধিক, কিন্তু রাজপুতগণ যবনের অধীনতা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নে প্রত্যেক রাঠোরের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেবল নিঃশব্দ অসিচালনে সে প্রশ্নের উত্তর করিল।

সমস্ত রজনী যুদ্ধ হইল। রাজপুত যোদ্ধৃগণ প্রায় সমস্তই সম্মুখরণে হত হইল। পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা দিল, অসংখ্য মুসলমানগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধনাদ করিয়া অবশিষ্ট কতিপয় রাজপুতকে আক্রমণ করিল, উদ্বেল সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যেন উপরে আসিয়া পড়িল।

তখন রক্তাপ্লুত কলেবরে বালক চন্দনসিংহ পলাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনুমান পঞ্চাশজন মাত্র রাঠোর দুর্গে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের আরক্ত নয়ন, রক্তপূর্ণ পরিচ্ছদ, দীর্ঘ কলেবর ও ভীষণ মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন ব্রহ্মবলে অসুরযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দেবগণ ধীরে ধীরে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মহাকোলাহলে মুসলমানগণ তখন দুর্গ আরোহণ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা পাইল, কিন্তু ঝন্‌ঝনাশব্দে দুর্গকবাট রুদ্ধ হইল। কবাটের পশ্চাতে অবশিষ্ট নির্ভীক রাঠোর বীরগণ শেষ পর্য্যন্ত যুঝিবে, মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে রাজপুতবীর্য্য দেখাইবে!

তখন মুসলমানগণ কিঞ্চিৎ হতাশ্বাস হইল। সমস্ত রজনী যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে দেখিল দুর্গদ্বার রুদ্ধ, বোধ হয় পুনরায় সমস্ত দিবস যুদ্ধ না করিলে দুর্গ বিজয় হইবে না। সেনাপতি সেনাদিগকে অবসন্ন ও শ্রান্ত লক্ষ্য করিলেন; আদেশ দিলেন, অদ্যই ভীমগড় লইব, অদ্যই প্রতাপসিংহের পরিবার বন্দী হইবে, সৈন্যগণ ক্ষণেক বিশ্রাম কর।

মুসলমানদিগের উদ্যম ভঙ্গ দেখিয়া চন্দনসিংহ প্রাচীরের উপর উঠিলেন। দেখিলেন, প্রায় এক সহস্র মুসলমান দ্বারের বাহিরে বিশ্রাম করিতেছে, বুঝিলেন, যুদ্ধ শেষ হয় নাই, ক্ষণেক নিবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। দুর্গের ভিতরে চাহিলেন; দেখিলেন, কেবল দুইশত জন রাঠোর। যুবকের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ললাট চিন্তাচ্ছন্ন হইল। ক্ষণমাত্র চিন্তার পরই যেন প্রতিজ্ঞা স্থির হইল, তখন ঈষৎ হাসিয়া প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

যোদ্ধৃগণকে চারিদিকে ডাকিয়া কহিলেন,—বন্ধুগণ, মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, তাহা করিয়াছি। আমার পণ রক্ষা করিয়াছি, সূর্য্যদেব আকাশে উদিত হইয়াছেন। এক্ষণে দুর্গবাহিরে সহস্র যবন, ভিতরে কেবলমাত্র আমরা জীবিত আছি। এক্ষণে তোমাদিগের কি পরামর্শ?

একজন রাঠোর উত্তর করিলেন,—রাঠোর সম্মুখরণে প্রাণত্যাগ ভিন্ন অন্য পরামর্শ জানে না।

চন্দনসিংহ। তাহার পর? তাহার পর আমাদিগের মাতা, ভগিনী, বনিতা, যবনের গোলী হইবে। রাজপুত-রমণী দিল্লীতে বিলাসের দ্রব্য হইবে!

রোষে সকলের মুখ রক্তবর্ণ হইল, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত হইল। তথাপি রাজপুতমণ্ডলী সকলে স্তব্ধ ও বাক্যশূন্য। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কেহ কেহ একটী ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করিল—"চিতারোহণ।" ক্রমে সকলে সমস্বরে কহিল,—"পুরুষের রণশয্যা, রমণীর চিতারোহণ।"

চন্দনসিংহ তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার মাতা অন্যান্য রাঠোর-রমণী বেষ্টিতা হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, পুত্র মাতার চরণে প্রণত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—যুদ্ধের সংবাদ কি?

চন্দনসিংহ। সংবাদ ভাল। কোনও রাজপুত যোদ্ধা যুদ্ধস্থান ত্যাগ করে নাই, শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই। সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, দুর্গ এখনও আমাদিগের হস্তে।

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে পুত্র ধীরে ধীরে কহিলেন,—মাতঃ! যদি অনুমতি করেন, তবে আরও নিবেদন করি, রজনীর যুদ্ধে প্রায় তিন শত যোদ্ধা রাঠোরের ন্যায় জীবনদান করিয়াছেন, এক্ষণে দুর্গের ভিতর দুইশত পঞ্চাশ জনের অধিক রাঠোর নাই, শত্রুগণ প্রায় এক সহস্র, ক্ষণপরেই যুদ্ধারম্ভ করিবে—অবশিষ্ট কথা চন্দনসিংহ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, বীর বালক অলক্ষিত ভাবে অশ্রুমোচন করিলেন।

তীব্রস্বরে দেবীসিংহের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—দুইশত পঞ্চাশ জন রাজপুত কি সহস্র তুর্কীর সহিত যুঝিতে ভয় করে?

স্থিরস্বরে চন্দনসিংহ কহিলেন,—রাজপুত মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করে না, যুদ্ধদান করিবে। কিন্তু রাজপুতরমণীর সম্মান প্রথম রক্ষণীয়।

হাসিয়া চন্দনসিংহের মাতা উত্তর দিলেন—বৎস! এই কথা কহিতে ভয় করিতেছিলে? রাজপুত বীর মরিতে জানে, রাজপুতরমণী কি মরিতে জানে না? যাও বৎস! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, আমরাও প্রস্তুত হইতেছি।

পরে অন্যান্য রমণীদিগকে আহ্বান করিয়া চন্দনের মাতা সহাস্যবদনে কহিলেন,—সখিগণ! অদ্য আমরা সতী হইব, স্বামীর সোহাগিনী হইব, ইহা অপেক্ষা রাজপুতকামিনীর অদৃষ্টে কি সুখ আছে? ম্লেচ্ছ তুর্কীগণ দেখুক, রাজপুত যোদ্ধৃগণ বীর, রাজপুতরমণীগণ সতী।

নবোদিত সূর্য্যালোকে সহস্র নারী স্নানাদি সমাপন করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা সমাপন করিলেন, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদ্বারে একত্রিত হইলেন। বালা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সকলে একত্রিত হইলেন, সকলে আনন্দে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর?—তাহার পর রাজপুতের পুরাতন ধর্ম্ম অনুসারে অলঙ্কার-বিভূষিতা সহস্র রমণী উল্লাসরব করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন। যখন পরাজয়, অবমাননা ও ধর্ম্মনাশ অনিবার্য্য হয়, রাজপুতরমণীগণ এইরূপে সতীত্ব রক্ষা করেন!

সেই অগ্নিশিখার চতুর্দ্দিকে দুই তিন শত রাঠোর বীর দণ্ডায়মান ছিলেন। নিঃশব্দে

তাঁহারা অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে দেখিলেন; মাতা, বনিতা, ভগিনী ও দুহিতাকে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদিগের জীবনে আর মায়া রহিল না, জগতে আর আশা রহিল না। তাঁহারা প্রাতঃকালে পবিত্র জলে স্নান করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা শেষ করিলেন, পরে নিঃশব্দে শরীরে বর্ম্ম ধারণ করিলেন, তদুপরি রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন। শিরে উজ্জ্বল মুকুটের উপর তুলসীপত্র স্থাপন করিলেন, গলদেশে শালগ্রাম ধারণ করিলেন, শেষবার নিঃশব্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। জীবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, সন্তান পিতাকে, নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিলেন।

দুই তিন দণ্ড বেলা হইয়াছে, এরূপ সময় ঝন্‌ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার খুলিল। বিস্মিত মুসলমানেরা দেখিল, সেই দ্বার দিয়া সমুদ্রতরঙ্গবেগে অল্পসংখ্যক রাজপুত বীর আসিয়া সহস্র মুসলমানকে আক্রমণ করিল।

সে রাজপুত সংখ্যা শীঘ্র নিঃশেষিত হইল, দুর্গ মোগলের হস্তগত হইল। কিন্তু সেই যুদ্ধে যে মুসলমানগণ পরিত্রাণ পাইল, তাহারা সেই দুইশত যোদ্ধার যুদ্ধকথা বিস্মৃত হইল না। পঞ্চাশৎ বর্ষ পরও দিল্লীর কোন কোন বৃদ্ধ মোগল নিজ পুত্র বা পৌত্রকে ভীমগড় দুর্গ-বিজয়ের কথা গল্প করিত, রাঠোরদিগের যুদ্ধকথা গল্প করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : বীরত্বে কাতরতা

পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাং সুদুঃসহম্প্রাপ্য
নিকারমীদৃশম্।
ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্ব্বতে রতিং নিরাশ্রয়া হন্ত হতা
মনস্বিতা॥

—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

যেদিন ভীলদিগের গহ্বরে মহারাজ্ঞীর সহিত পুষ্পের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেদিন প্রতাপসিংহ সহসা মোগলসৈন্য আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, সমস্ত দিনও অর্দ্ধেক রজনী বৃথা চেষ্টা করিয়া প্রতাপসিংহ সসৈন্যে পুনরায় চাওন্দ দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। মোগলসৈন্য ক্রমে ভীমচাঁদ ভীলের আবাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাজ্ঞী আর তথায় থাকা উচিত বিবেচনা না করিয়া, সন্তান ও পুষ্পকে সঙ্গে লইয়া ভূগর্ভস্থ জাউরার খনিতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। ভীমচাঁদের আবাসে প্রতাপসিংহের পরিবারকে না পাইয়া মোগলসৈন্য তথা হইতে চলিয়া গেল, মহারাজ্ঞী তখন জাউরার খনি হইতে বাহির হইয়া চাওন্দদুর্গে স্বামীর নিকট আসিলেন।

চাওন্দদুর্গ রক্ষা করাও দুরূহ হইয়া উঠিল। সৈন্যের খাদ্য হ্রাস হইয়া আসিতেছে, যোদ্ধৃগণ হীনবল হইয়া আসিতেছে, চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় শত্রুসৈন্যের শিবির দেখা যাইতেছে। একদিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পরামর্শ করিবার জন্য দুর্গের সমস্ত প্রধান যোদ্ধাদিগকে ডাকাইলেন।

প্রতাপসিংহের চারিদিকে কুলপতিগণ বসিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাচীন যোদ্ধা কমলমীরে প্রতাপকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়জন আছেন? দৈলওয়ারার ঝালা-কুলেশ্বর হত হইয়াছেন, বিজলীর প্রমরকুলপতি হত হইয়াছেন, অন্যান্য প্রাচীন কুলপতি হত হইয়াছেন। প্রতাপ আপনার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহার পুরাতন সঙ্গী অনেকেই আর নাই। নব নব বালকগণ এক্ষণে কুলপতি হইয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারাও মহারাণার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রতাপ আপনার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র অমরসিংহ পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, বাল্যাবস্থা হইতেই পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখিতেছেন। অমরসিংহ যুদ্ধে পিতার সহযোদ্ধা, বিপদ সংকটে ভাগগ্রাহী।

অনেকক্ষণ পর পরামর্শ শেষ হইল, ভৃত্যগণ খাদ্য আনিল। বৃক্ষপত্র বিনির্ম্মিত পাত্রে

সামান্য আহার লইয়া সকলে আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু মেওয়ারের গৌরবের দিনে রাজসভায় যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

সভার মধ্যে সাহসী ও সম্মানিত যোদ্ধা মহারাণার পাত্র হইতে ফল বা আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে "দুনা" কহিত। প্রতাপসিংহ অদ্য কাহাকে "দুনা" দিবেন, স্থির করিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তাঁহার পার্শ্বে পুত্র অমরসিংহ বসিয়াছেন, অল্পবয়সেই শত যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতাপ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—অমরসিংহ! এই ঘোর বিপদকালে তুমি বীরের শিক্ষা শিখিতেছ, বীরের কার্য্য সাধন করিতেছ! কিন্তু অদ্য অন্য এক যোদ্ধা আমার খাদ্যের ভাগগ্রাহী।

কিছু দূরে দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহকে দেখিয়া বলিলেন,—চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর! ধন্য তোমাদের বীরত্ব, ধন্য তোমাদের স্বামিধর্ম্ম। তোমরা উভয়েই আমার জন্য জীবন পণ করিয়াছ, উভয়েই বিপদের সময় রাজপরিবারকে স্থান দিয়াছ, উভয়েই ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহু শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছ। তোমরা উভয়েই অতুল্য বীর, কিন্তু অদ্য অন্য এক যোদ্ধা আমার খাদ্যের ভাগগ্রাহী।

সম্মুখে প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন,—দেবীসিংহ! এ কালসমরে তুমি আমার জন্য সর্ব্বস্ব হারাইয়াছ, তোমার বীরত্ব, তোমার স্বামিধর্ম্মের পুরস্কার কি দিব? এ কালযুদ্ধে তুমি দুর্গ হারাইয়াছ, বীর পুত্র হারাইয়াছ, পরিবার কুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছ, তথাপি খড়্গহস্তে পর্ব্বতে পর্ব্বতে আমার সঙ্গী হইয়া ফিরিতেছ! প্রতাপসিংহ অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তোমার ন্যায় স্বামিধর্ম্মরত যোদ্ধার এ অবস্থা দেখিলে প্রতাপসিংহের পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। বীরকুলচূড়ামণি! তোমার বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া মনুষ্যসাধ্য নহে। অদ্য আমার আহারের ভাগগ্রাহী হইয়া আমাকে অনুগৃহীত কর।

মহারাণার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যোদ্ধা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বৃদ্ধের নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু পতিত হইল। অশ্রু মোচন করিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে কহিলেন, —মহারাণা! কাতরতা চিহ্ন ক্ষমা করুন, বৃদ্ধের একবিন্দু অশ্রু ক্ষমা করুন। আশা ছিল, এই বৃদ্ধ বয়সে বৎস চন্দনকে দুর্গভার অর্পণ করিব, বৎস চন্দনকে আমার পৈতৃক খড়্গ দিয়া শান্তি লাভ করিব, কিন্তু ভগবান অন্য রূপ ঘটাইলেন! ভগবানকে নমস্কার করি, পুত্র বীরনাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীরনাম কলঙ্কিত করিবে না।

আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না, যোদ্ধাদিগের নয়ন সিক্ত হইল, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নীরবে ভোজন শেষ হইল, মহারাণা মহিষী ও পুত্রদিগের নিকট যাইলেন।

অন্ধকার নিশীথে একটী পর্ব্বতগহ্বরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে, রাজশিশুগণ সেই অগ্নির চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, অথবা বিশ্রান্ত হইয়া সেই প্রস্তরের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছে। রাজমহিষী ও পুষ্প রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন, পুত্র-কন্যাগণ উঠিয়া খাইবে। প্রতাপসিংহ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক নীরবে এই দৃশ্যটী দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আজি চিন্তাপূর্ণ।

দুর্গ সকল একে একে শত্রুহস্তগত হইয়াছে, সৈন্যসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। প্রতাপসিংহের আর অর্থ নাই, সম্বল নাই, রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, সেই প্রস্তর ভিন্ন মস্তক রাখিবার স্থান নাই, হৃদয়ের কলত্রপুত্রদিগকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু এ সমস্ত ক্লেশ প্রতাপসিংহ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রাজমহিষী কোন পর্ব্বতগহ্বরে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সহসা শত্রুর আগমনে সেই প্রস্তুত খাদ্য ত্যাগ করিয়া দূরে পলাইয়াছেন! পুনরায় তথায় খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, পুনরায় তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত রোরুদ্যমান সন্তান লইয়া পলাইয়াছেন! অবশেষে সেই মেওয়ারে থাকিবার স্থান পান নাই, ভীলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভূগর্ভে ও খনিতে লুকাইয়া ছিলেন, তথায় ভীলগণ তাঁহাকে রক্ষা করিত, ভীলগণ তাঁহাকে আহার যোগাইত! কিন্তু এ সমস্ত বিপদ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রজনীতে স্বামিপার্শ্বে রাজমহিষী শয়ন করিয়া আছেন, সহসা রাত্রিযোগে

মুষলধারায় বৃষ্টি আসিল, সেই অনাবৃত স্থল ভাসাইয়া লইয়া গেল, সমস্ত রাত্রি সিক্তদেহে রাজমহিষী বালিকাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন, কিন্তু সে ক্লেশ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রাজপরিবার সমস্ত দিবস অনাহারে জঙ্গলে জঙ্গলে পলাইয়াছেন। সন্ধ্যার সময় কোন পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় লইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। খাদ্য সহসা মিলে না। ক্ষেত্রের "মল" নামক দূর্ব্বার আটা প্রস্তুত করিয়া মহারাজ্ঞী স্বহস্তে তাহারই রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশু-সন্তানকে দিয়াছেন। একদিন কন্দরবাসী একটী বন্যবিড়াল আসিয়া শিশুর গ্রাস হইতে সেই রুটী লইয়া পলাইল, শিশু অনাহারে রাত্রি কাটাইল, ক্রন্দন করিতে করিতে মাতৃবক্ষে সুপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতাপসিংহ এরূপ ক্লেশও তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কিন্তু অদ্য মহারাণার হৃদয় কাতর, তাঁহার প্রশস্ত ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত।

মহারাণাকে দূর হইতে দেখিয়া মহারাজ্ঞী পুষ্পের হস্তে রুটী রাখিয়া সত্বরে স্বামীকে সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। দেখিলেন, স্বামীর চক্ষু জলপূর্ণ! বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—এ কি? অদ্য মহারাণা কাতর কেন? তুর্কীরা বলিবে, এতদিনে মহারাণা যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, বিপদে কাতর হইয়াছেন!

প্রতাপসিংহ। জগদীশ্বর জানেন, প্রতাপ পরিশ্রান্ত নহে, বিপদে কাতর নহে।

রাজ্ঞী। তবে কি পুত্রকন্যার এই দুরবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়াছেন? মহারাণা যদি কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে কি এই কষ্ট অসহ্য হইল?

প্রতাপসিংহ। জগদীশ্বর আমার পুত্রকন্যাকে সুখে রাখিয়াছেন, তোমাকেও সুখে রাখিয়াছেন। রাজ্ঞি! এই কালসমরে অনেক যোদ্ধা শিশুদিগকে হারাইয়াছে, বৎস অমরসিংহের ন্যায় বীর পুত্র হারাইয়াছে, বীরপ্রসবিনী কলত্র হারাইয়াছে, জ্ঞাতিকুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছে। রাজ্ঞি! এ কালযুদ্ধে অনেক যোদ্ধার সংসার মরুভূমি হইয়াছে, জীবন শূন্য হইয়াছে!

রাজ্ঞী। ঈশানী তাহাদিগকে শান্তি দান করুন, এরূপ শোক মনুষ্যের অসহ্য।

প্রতাপসিংহ। রাজ্ঞি! দেবীসিংহ নামক একজন রাঠোর যোদ্ধা আমাদের যুদ্ধকার্য্যে কেশ শুক্ল করিয়াছেন, রাঠোরদিগের মধ্যেও তাঁহার অপেক্ষা বীর কেহ নাই। অধুনা তুর্কীগণ তাঁহার দুর্গ লইয়াছে, তাঁহার স্ত্রীপরিবার চিতারোহণ করিয়াছে, তাঁহার একমাত্র বীর পুত্র তুর্কী হস্তে হত হইয়াছে। বৃদ্ধ দেবীসিংহ স্বামিধর্ম্ম পালন করিয়া কবে নিজ জীবন দান করিবেন, এই আশায় অদ্যাবধি জীবিত আছেন!

রাজ্ঞীর নয়ন দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলিলে? দেবীসিংহের পরিবার সমস্ত গিয়াছে? দেবীসিংহ একমাত্র বীর পুত্র হারাইয়াছে? হা বিধাতঃ! পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম বজ্র সৃজন করিতে তুমিও অক্ষম!

প্রতাপসিংহ। বীর পুত্র গিয়াছে, পরিবার গিয়াছে, দুর্গ গিয়াছে, বংশ বিনাশ হইয়াছে। সেই বৃদ্ধ আজি আমাকে কহিলেন,—ভগবানকে নমস্কার করি, পুত্র বীর নাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীরনাম কলঙ্কিত করিবে না। এইরূপ স্বামিধর্ম্মের কি এই পুরস্কার? বীর অনুচরগণকে উৎসন্ন করিয়া মেওয়ার রক্ষায় কি ফল?

অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাজ্ঞী সন্তানদিগকে খাওয়াইতে বসিলেন, প্রতাপসিংহ চিন্তাতে শান্তি পাইলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—যদি রাজ্যলাভের এই দুঃসহ যন্ত্রণাই ফল হয়, প্রতাপসিংহ সে রাজ্য চাহে না, রাজনামে জলাঞ্জলি দিবে! পরদিন মহারাণা আকবরশাহের নিকট পত্রদ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : অপবিত্রে পবিত্রতা

> কিমপেক্ষ্য ফলং পায়োধরান্ ধ্বনতঃ
> প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ।
> প্রকৃতিঃ খলু সা মহীয়সঃ সহতে নান্য-
> সমুন্নতিং যথা॥
> —কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

একদিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পুনরায় যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; রাঠোর ও চোহানকুল, প্রমর ও ঝালাকুল, চন্দাওয়ৎ, সঙ্গাওয়ৎ, জগাওয়ৎ প্রভৃতি শিশোদীয়কুলের অধিপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা বাল্যাবধি যুদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষা পাইয়াছেন, শত যুদ্ধে আপন আপন বীরত্ব ও আপন আপন কুলের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্য সভাস্থলে সকলে নীরব!

প্রতাপসিংহ আকবরকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা যোদ্ধাদিগের নিকট কহিলেন। আকবর অবশ্যই সন্ধিদান করিবেন, কিন্তু শিশোদীয়গণ কি অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি গ্রহণ করিবে? প্রতাপসিংহ এই কথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই রাজপুতমণ্ডলীর মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এরূপ কেহ নাই। সভাস্থলে সকলে নীরব!

যতদিন যুদ্ধ সাধ্য ততদিন যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে মেওয়ার দেশের একটী উপত্যকা বা পর্ব্বতদুর্গ আর রক্ষা করা মনুষ্যের দুঃসাধ্য! শত্রুগণ নূতন সৈন্য লইয়া মেওয়ারের প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা আচ্ছাদন করিয়াছে, প্রত্যেক দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধ? প্রতাপসিংহ আর কি লইয়া যুদ্ধ করিবেন। মেওয়ারের আর সৈন্য নাই, সৈন্যদিগকে খাইতে দিবার অর্থ নাই, রক্ষা করেন এরূপ দুর্গ নাই, থাকিবার স্থান নাই। চাওন্দদুর্গে থাকিয়া অচিরে শত্রুহস্তে বন্দী হইবেন, বীরগণ কি এই পরামর্শ দান করেন? অথবা অম্বর ও মাড়োয়ারের রাজাদিগের ন্যায় তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিবার পরামর্শ দেন? অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

যে স্বাধীনতার জন্য এতদিন পর্ব্বতে ও উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, রাজপুত-শোণিতে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিয়াছেন, গৃহ ও প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কন্দরে ও গহ্বরে বাস করিয়াছেন, দিবসে ও রজনীতে ক্লেশ ও বিপদ সহ্য করিয়াছেন, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবেন? রাজস্থানের সকল রাজাদিগের উপর ম্লেচ্ছ পদ স্থাপন করিয়াছে, এক্ষণে কি মহারাণার বংশ সেই পদতলে উন্নত মস্তক অবনত করিবেন? বাপ্পারাওয়ের বংশ, নির্ম্মল শিশোদীয় বংশ কি এতদিনে তুর্কীর দাস হইবে?

রাজপুত বীরগণ নিস্তব্ধ! ইহার মধ্যে কোন্‌টী কর্ত্তব্য? ইহা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? সভাস্থলে সকলে নীরব!

অদ্য দাসত্ব স্বীকার করিলে কল্য পুনরায় স্বাধীন হওয়া সম্ভব। আকবর মহাবলপরাক্রান্ত ও অতিশয় বুদ্ধিমান, কিন্তু আকবরের মরণের পর দিল্লীশ্বর সেরূপ ক্ষমতাপন্ন না হইতে পারেন। তখন মেওয়ার পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে শিশোদীয়বংশ একবারে বিনষ্ট হইলে জগতে তাহার নাম থাকিবে না। এইরূপ তর্ক কাহারও কাহারও জাগরিত হইতে লাগিল।

এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এমন সময়ে একজন পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া আসিল। প্রতাপ দেখিলেন, বিকানীর রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ এই পত্র লিখিয়াছেন। এ পত্র নহে, কয়েকটী কবিতা; পৃথ্বীরাজের ন্যায় সুকবি সে সময়ে রাজস্থানে আর কেহ ছিলেন না।

বিকানীর দিল্লীর অনুগত, পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে থাকিতেন, তথাপি প্রতাপের বীরত্ব শুনিয়া আনন্দিত হইতেন, মেওয়ারের স্বাধীনতা স্মরণ করিয়া আপন অপমান বিস্মৃত হইতেন, মনে মনে প্রতাপসিংহকে পূজা করিতেন। সে সময়ে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কে না মনে মনে মেওয়াররাজকে পূজা করিতেন?

আকবর যখন প্রতাপসিংহের সন্ধিপ্রার্থনাপত্র পাইলেন, তখন উল্লাসে পূর্ণ হইলেন। প্রতাপের ন্যায় মহৎ শত্রু ভারতবর্ষে আর ছিল না, সেই প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থনা করিয়াছেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই চিন্তায় আনন্দিত হইলেন, দিল্লীতে আনন্দসূচক বাদ্য ও ধুমধাম হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, দিল্লীশ্বরকে কহিলেন,—এ পত্র জালমাত্র, প্রতাপের কোন শত্রু প্রতাপের গৌরবনাশের জন্য এই পত্র সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীশ্বর! আমি প্রতাপসিংহকে জানি, আপনার রাজমুকুটের জন্য প্রতাপসিংহ অধীনতা স্বীকার করিবেন না।

পরে পৃথ্বীরাজ প্রতাপকে কবিতাগর্ভ একখানি পত্র লিখিলেন; অদ্য রজনীতে রাজসভায় প্রতাপসিংহ সেই পত্র পাইলেন। প্রতাপসিংহ পাঠ করিতে লাগিলেন।—

পৃথ্বীরাজের কবিতা।

“হিন্দুর আশাভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর
করে।
“তথাপি রাণা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন॥
“প্রতাপ না থাকিলে সমস্ত সমভূমি হইত।
“কারণ আমাদিগের যোদ্ধৃগণ সাহস
হারাইয়াছেন, রমণীগণ ধর্ম্ম হারাইয়াছেন।
“আকবর আমাদিগের জাতিস্বরূপ বাজারের
ব্যাপারী।
“উদয়ের পুত্র ভিন্ন সমস্ত ক্রয় করিয়াছে—
তিনি অমূল্য॥
“নরোজার জন্য কোন্ প্রকৃত রাজপুত
সম্ভ্রম বিক্রয় করিবে?
“তথাপি কতজনে বিক্রয় করিয়াছে॥
“সকলেই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম বিক্রয়
করিয়াছেন।
“চিতোরও কি এই বাজারে আসিবেন?
“প্রতাপ সমস্ত ধন ব্যয় করিয়াছেন।
“কিন্তু রত্নটী রক্ষা করিয়াছেন।
“নৈরাশে অনেকে এই স্থানে আসিয়া
নিজের অবমাননা দেখিতেছেন।
“হামিরবংশজ কেবল এই অপযশ হইতে
রক্ষা পাইয়াছেন।
“জগতে জিজ্ঞাসা করে, প্রতাপ গোপনে
কোথা হইতে সহায়তা পায়?
“তাঁহার বীরত্ব এবং তাঁহার খড়্গ হইতে!
তদ্দ্বারা ক্ষাত্রধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।
“ব্যাপারী চিরজীবী নহে, একদিন
ঠকিবেন।
“তখন আমাদিগের শূন্য ক্ষেত্র বপন করণার্থ প্রতাপের নিকট
রাজপুত বীজ লইতে আসিবে।
“তিনিই রাজপুতবীজ রাখিবেন, সকলে
এরূপ আশা করে!
“যেন তাঁহার পবিত্রতা পুনরায় উজ্জ্বল
হয়।”

প্রতাপসিংহ একবার, দুইবার, তিনবার এই পত্র পাঠ করিলেন। অবশেষে গর্জ্জন করিয়া

কহিলেন,—বীরগণ! চারিদিকে অপবিত্রতার মধ্যে প্রতাপসিংহ রাজপুতকুল পবিত্র রাখিবে। মেওয়ারে যদি স্থান না হয়, আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইব, অন্যদেশে যাইব, কিন্তু শিশোদীয়বংশ কলুষিত করিব না!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : দেওয়ীরের যুদ্ধ

দমিতারিঃ প্রশান্তোন্মাদপূরিতদিঙ্মুখঃ।
জঘান রুষিতো রুষ্টাং স্মরিতস্তূর্ণমাগতান ॥
তেষাং নিহন্যমানানাং সুধৃষ্টৈঃ কর্ণভেদিভিঃ।
অভূদভ্যমিতত্রাসমাস্বাস্তাশেষদিক্ জগৎ ॥

—ভট্টিকাব্যম্।

প্রতাপসিংহ দেশ ত্যাগ করিয়াছেন। মেওয়ারে শিশোদীয়কুলের স্থান নাই, শিশোদীয়কুল সিন্ধুনদীতীরে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিবে, তথাপি তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিবে না।

প্রতাপসিংহ ও মেওয়ারের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ সসৈন্যে ও সপরিবারে মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছেন, আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, মরুভূমির প্রান্তে পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সম্মুখে, পশ্চিমদিকে, মরুভূমি সন্ধ্যার আলোকে ধূ ধূ করিতেছে; পশ্চাতে আরাবলী পর্ব্বত ও মেওয়ারদেশ! সেই পর্ব্বতরাশি এখনও দেখা যাইতেছে, যোদ্ধৃগণ সেইদিকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলে চিন্তাকুল। সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, পুনরায় যখন উদয় হইবেন, স্বদেশ নয়ন হইতে বহির্ভূত হইবে, ঐ অনন্ত পর্ব্বতমালা আর দেখা যাইবে না। যে প্রদেশে শিশোদীয় বংশ বহু শতাব্দী বাস করিয়াছে, যে দেশে সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভূপতিগণ রাজ্য করিয়াছেন, সে দেশ চিরদিনের জন্য নয়ন-বহির্ভূত হইবে! মেওয়ারের প্রত্যেক পর্ব্বতদুর্গ ও উপত্যকা যোদ্ধাদিগের মনে উদয় হইতেছে, যে যে উপত্যকায় পূর্ব্ব-পুরুষগণ যুদ্ধ করিয়াছেন, যে যে পর্ব্বতে প্রতাপ অনন্ত যুদ্ধে শোণিতপাত করিয়াছেন, সে সমস্ত মানসচক্ষে চিত্রের ন্যায় উদয় হইতেছে। যোদ্ধৃগণ নীরব ও শোকাকুল, নীরবে অনন্ত যশঃপূর্ণ আরাবলী পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেক শিবিরে রাজপুতনারীগণ শিশুগণকে ক্রোড়ে লইয়া সজল-নয়নে আরাবলী পর্ব্বত দেখাইতেছেন।

"শিশোদীয় বংশ নির্ব্বাসিত হইবে! সুন্দর মেওয়ারে শিশোদীয় বংশের আর স্থান নাই!"—প্রতাপসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সভায় এই কথা কহিলেন। সভায় সকলে নিস্তব্ধ। তন্মধ্যে একটী স্বর শুনা গেল—"এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে!" বিস্মিত হইয়া সকলে সেইদিকে চাহিলেন, দেখিলেন, বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ভামাশাহ। বংশানুক্রমে ইঁহারা মেওয়ারে মন্ত্রিত্ব-কার্য্য করিয়াছেন।

ভামাশাহ কয়েকমাস অবধি প্রতাপসিংহের নিকট ছিলেন না। প্রতাপ যখন যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভামাশাহ যুদ্ধার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। সহসা তিনি শুনিলেন, প্রতাপসিংহ ও সমস্ত শিশোদীয়কুল দেশত্যাগী হইতেছেন, যোদ্ধৃগণ আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী তখন দ্রুতগতিতে পশ্চাতে পশ্চাতে যাইলেন, অদ্য তিনি প্রতাপসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন, অদ্য সভামধ্যে কম্পিত স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন,—"এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।"

প্রতাপ চমকিত হইলেন, উৎসাহ ও নবজাত আশার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রিবর! আপনার কথা ব্যর্থ হয় না, কিন্তু আর যুদ্ধের কি উপায় আছে, প্রতাপসিংহ দেখিতেছে না, আপনি নির্দ্দেশ করুন।

বৃদ্ধ করজোড়ে রাজসম্মুখে পুনরায় সেই স্থির গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—দাস বহুদিন মন্ত্রিত্ব করিয়াছে, দাসের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বহুপুরুষ পর্য্যন্ত মেওয়ারের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন সে কার্য্যে বংশানুক্রমে যে ধন সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা এখনও অস্পৃষ্ট। সে ধনের দ্বারা পঞ্চবিংশ সহস্র সেনার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভরণপোষণ হইতে পারে, অনুমতি করিলে দাস সে ধন প্রভু উপস্থিত করে।

পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই স্বামিধর্ম্ম ও প্রভুভক্তি দেখিয়া প্রতাপসিংহের নয়ন জলপূর্ণ হইল, সে জল ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কহিলেন,—মন্ত্রিবর! আপনার এই ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইলাম, কিন্তু রাজপ্রদত্ত ধন কিরূপে পুনরায় লইব? প্রতাপসিংহ অদ্য দরিদ্র, তথাপি তাঁহার অধীনদিগের ধন হরণ করিতে অক্ষম।

ভামাশাহ। মহারাণা! এ দাস প্রভুকে ধন দিতেছে না, মেওয়াররক্ষার্থ মেওয়ারকে দিতেছে, মেওয়ারের অনুপযুক্ত সুত মাতার জন্য আর কি উপকার করিতে পারে? শিশোদীয়ের ধন-প্রাণ সমস্তই মেওয়ারের, তাহা কি মহারাণার অবিদিত? মেওয়ারের জন্য আপনারা শোণিত দিতেছেন, আমি তুচ্ছ ধন দিতে কুণ্ঠিত হইব?

প্রতাপ। মন্ত্রিবর! আপনার যুক্তি অখণ্ডনীয়, আপনার উদার স্বদেশভক্তি দেবতুল্য! আপনার বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম। আপনার দত্ত অর্থ গ্রহণ করিব, সেই অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিব, মেওয়ার উদ্ধার হয় কিনা দেখিব!

প্রতাপ সসৈন্যে ফিরিলেন, পুনরায় আরাবলী অতিক্রম করিয়া মেওয়ারে আসিলেন। সেই বিপুল অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিলেন, মেওয়ার উদ্ধার হয় কিনা, আর একবার দেখিলেন।

সে উদ্যমের ফল ইতিহাসে লেখা আছে, দেওয়ীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। শাহবাজখাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, প্রতাপ দেশ-ত্যাগ করিয়া পলাইতেছেন, এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। সহসা ঝটিকার ন্যায় চারিদিকে প্রতাপের সৈন্য আসিয়া পড়িল, দেওয়ীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহবাজখাঁ সসৈন্যে হত হইলেন।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। আমাইত পর্ব্বতদুর্গ হস্তগত হইল, তথাকার মুসলমান দুর্গ-রক্ষক হত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। কমলমীর দুর্গ হস্তগত হইল, তথাকার দুর্গরক্ষক আবদুল্লা সসৈন্যে হত হইল। উদয়পুর হস্তগত হইল, এক বৎসরের মধ্যে একে একে দ্বাত্রিংশৎ পর্ব্বতদুর্গ প্রতাপসিংহের হস্তগত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। চিতোর, আজমীড় ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মেওয়ার পুনরায় প্রতাপের হস্তগত হইল। ভগ্নদূত দিল্লীতে যাইয়া আকবরশাহকে জানাইল যে ক্রমাগত দশ বৎসর বিপুল অর্থব্যয়ে মহাবলপরাক্রান্ত আকবরশাহ মেওয়ারে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের এক বৎসরের উদ্যমে সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মেওয়ার অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু মান-সিংহের অম্বর প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। দেশ বিপর্য্যস্ত ব্যতিব্যস্ত করিলেন, মল্লপুর নামক প্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থান লুণ্ঠন করিলেন।

ইতিহাসের কথা আর এখানে লিখিবার আবশ্যক নাই। উপন্যাসে আমরা উপন্যাস-বর্ণিত দুর্গের কথাই লিখিব। সূর্য্যমহলদুর্গ পুনরায় রাজপুতগণ আক্রমণ করিল। সে দুর্গ আক্রমণকালে, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরগণ পরস্পরের সম্মুখে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, সে দুর্দ্দমনীয় বেগের সম্মুখে মুসলমানগণ দাঁড়াইতে পারিল না।

ক্রমে যুদ্ধের গতিতে তেজসিংহ একদিকে ও দুর্জ্জয়সিংহ অন্যদিকে যাইয়া পড়িলেন, কিন্তু উভয়েই দুর্গে প্রথমে প্রবেশ করিবার মানসে অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসেনা ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তেজসিংহই প্রথমে প্রবেশ করিলেন, ক্ষণেক পরই চন্দাওয়ৎগণ মহাকোলাহলে শত্রুসেনা মন্থন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

তখন তেজসিংহ পুরাতন শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—দুর্গস্বামিন্! আপনার অনুমতি বিনা আপনার দুর্গে পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছি, সে দোষ ক্ষমা করিবেন, কেবল মহারাণার কার্য্য-সাধনার্থ এইরূপ আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার দুর্গ আপনি অধিকার করুন, অনুমতি দিলে আমি নিষ্ক্রান্ত হই।

এ কথায় জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন,—রাঠোর, ঘটনাক্রমে তুমিই প্রথমে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছ। তাহাই হউক, আপন রাঠোর লইয়া দুর্গ রক্ষা কর, আমি তোমার নিকট

ভিক্ষা চাহি না। আমি সসৈন্যে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর, পরে যদি চন্দাওয়ৎ অসিতে বল থাকে সে আক্রমণ করিয়া দুর্গ কাড়িয়া লইবে।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন,—আমি রাজকার্য্যসাধনার্থ আপনার দুর্গে আসিয়াছি, এই সুযোগে দুর্গ অধিকার করিলে বিশ্বাসঘাতকতা হইবে, রাঠোর বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। চন্দাওয়ৎ! এখনও বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হয় নাই, এখনও আমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। যখন বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হইবে, তখন রাঠোর পুনরায় সূর্য্যমহলে আসিতে বিলম্ব করিবে না।

ধীরে ধীরে আপন রাঠোর সৈন্য লইয়া তেজসিংহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহ আরক্তনয়নে সেই রাঠোর বীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইহার কয়েকদিন পর ভীমগড় দুর্গের উদ্ধার হইল, কিন্তু প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সেই বিস্তীর্ণ দুর্গ ও প্রাসাদে কেবল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এ জগতে তাঁহার যাহা কিছু প্রিয়দ্রব্য ছিল, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে বা চিতায় বিলুপ্ত হইয়াছে!

দেবীসিংহ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন, নবজাত সূর্য্যরশ্মি দেবীসিংহের মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে, নবজাত প্রাতের বায়ু সেই শুক্লকেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। এ শোকপূর্ণ অসার জগতে পুত্রশোক অপেক্ষা আর দারুণ ব্যথা কি আছে? দেবীসিংহ যোদ্ধা, কিন্তু দেবীসিংহ মনুষ্য।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ নিকটে আসিয়া কহিলেন,—পিতার চিরসুহৃদ্! আপনাকে আমি কি সান্ত্বনা দিব? কেবল এই জিজ্ঞাসা করি, মহারাণার জন্য সম্মুখযুদ্ধে রাজপুত বালক প্রাণ দিয়াছে, সে জন্য কি রাজপুতপিতা কাতর?

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবীসিংহ উত্তর করিলেন—রাজপুতের ধন, মান, পরিবার সমস্তই মহারাণার, মহারাণার কার্য্যে শিশু চন্দনসিংহ জীবন দিয়াছেন, সে জন্য খেদ নাই। এ কালসমর বৃদ্ধকে রাখিয়া শিশুকে লইল কি জন্য, কেবল এই চিন্তা করিতেছি। শিশু চন্দন! পিতাকে কেন সঙ্গে লইলি না?

সেই প্রাচীন মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্তের জন্য কাতরতা-চিহ্ন দৃষ্ট হইল, বৃদ্ধের নয়ন হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, দেবীসিংহ সামান্য ব্যথায় ব্যথিত হন নাই, তিনি সে ব্যথারও ঔষধ জানিতেন। দেবীসিংহের প্রাচীন হস্ত আপন মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন,—পিতঃ! আপনি একটী পুত্র হারাইয়াছেন, আর একজন এখনও জীবিত আছে। তেজসিংহ পিতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দেবীসিংহ। জগদীশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন, পিতৃগদিতে পুনরায় স্থাপন করুন।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ সহায়তা না করিলে পিতৃদুর্গ কিরূপে পাইব? রাঠোর বীর! আপনি পিতাকে গদিতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছেন, পুত্রকে কি সহায়তা করিবেন না?

ধীরে ধীরে দেবীসিংহ নয়নের জল মোচন করিলেন, কাতরতা বিস্মৃত হইলেন, সবলহস্তে অসিধারণ করিয়া কহিলেন—দেবীসিংহের জীবনের এখনও আর একটী উদ্দেশ্য আছে, দেবীসিংহ আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : প্রসন্ন আকাশে মেঘরাশি

অসারং সংসারং পরিভূষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনং।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্ম্মাণনফলং।
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ॥

—মালতীমাধবম্।

একদিন সন্ধ্যার সময় তেজসিংহ ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদকে দেখিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পর্ব্বততলে হ্রদতটে সেই ভীলবালিকাকে দেখিতে পাইলেন। বালিকা এখনও দেখিতে সেইরূপ, হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, গীত গাইতে গাইতে নিকটে আসিল।

বালিকা গাইল।—

প্রভাতে বাগানে গিয়া দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই।

তেজসিংহ। আজ কি দেখেছিলি? কি শুনেছিলি?

বালিকা। এই শুন না।

ফুটেছে মালতী ফুল গন্ধেতে করি আকুল,
ধেয়ে এল অলিকুল, দেখে এলেম সই।

তেজসিংহ। এই দেখেছিলি, আর কিছু না?

বালিকা। এই শুন না।

অলি এসে গান গায়, ফুল শুনে মুগ্ধ হয়,
‘তুমি নাথ’ ফুল কয়, শুনে এলেম সই।

তেজসিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—তুই অতিশয় দুষ্টা, তোর গান বুঝিয়াছি, এ ফুলের নাম কি বল দেখি?

বালিকা। ফুলের আবার নাম কি? ফুলের নাম পুষ্প। পুনরায় গাইতে লাগিল।—

অলিরাজ ধেয়ে যায়, বায়ু ফুলের মধু খায়,
ফুলে কবে সত্য কয়, দেখিতে পাই কই?
প্রভাতে বাগানে গিয়ে, দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই।

তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। রোষে বালিকার হাত ধরিয়া কহিলেন,—বালিকা, তুই যদি পুরুষ হইতিস, তোর চপলতার শাস্তি দিতাম।

বালিকা। আমি কি করিয়াছি?

আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমি গীত গাইব না। গীত গাইলে তুমি রাগ করিবে তাহা কি আমি জানিতাম?

তেজসিংহ। পাপীয়সি! তুই কি জন্য এ গীত গাইলি? পুষ্পের যদি মিথ্যা নিন্দা করিস, অদ্য আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই।

বালিকা। আমি পুষ্পের কি জানি, পুষ্প কে? আমি দরিদ্র ভীলকন্যা, আমি ফুল তুলি, ফুলের গান করি, আমি পরের কথা কি জানিব? আমাকে ছাড়িয়া দাও।

বালিকা কি সত্যই বালিকা? যথার্থই কি কেবল ফুলের গীত গাইতেছিল? তেজসিংহ কখনও বালিকাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া ভাবিলেন—আমি অনর্থক রাগ করিয়াছি।

ধীরে ধীরে বালিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন,—না, আমি রাগ করিব না, তুই আর একটী গীত গা।

বালিকা এবার হাসিয়া করতালি দিয়া গাইল।—

আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই,
পুষ্পের হইবে বিয়ে কিন্‌তে যাই গো খই।

তেজসিংহ। কাহার সহিত বিবাহ হইবে?

বালিকা। ফুলের আবার কার সঙ্গে বিবাহ হয়? অলির সঙ্গে, আর কার সঙ্গে?

তেজসিংহ। ভীলবালা! তোর হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি! পুষ্পকুমারীর সহিত কাহার বিবাহ হইবে তাহা কিছু শুনিয়াছিস?

বালিকা। তাহা কি জানি? তুমি কি শুনিয়াছ?

তেজসিংহ। পুষ্পকুমারীর সহিত দুর্জ্জয়সিংহের একবার সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কন্যা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, সে বিবাহ অপেক্ষা মৃত্যু পণ করিয়াছিলেন।

বালিকা। তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। কি শুনিস নাই?

বালিকা। সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। তবে কি শুনিয়াছিস?

বালিকা। শুনিয়াছি, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কোন একটী মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, এমন সময়ে তুর্কীরা সূর্য্যমহল অধিকার করিল, আর—

তেজসিংহ। আর কি?

বালিকা। কিছু নয়।

তেজসিংহ। আর কি বল্, না হইলে প্রহার করিব।

বালিকা। আর সেই কন্যা সেই দুর্গ হইতে পলাইবার আগে নাকি বরকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছিল।

তেজসিংহের নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, —তুই বন্য অসভ্য ভীল, তোর উপর রাগ করিয়া কি করিব? সম্মুখ হইতে দূর হ! সজোরে বালিকাকে ঠেলিয়া হ্রদের জলে ফেলিয়া দিলেন।

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সন্তরণ করিয়া হ্রদ পার হইল। অপর পার্শ্বে সিক্তকেশে সিক্তবসনে একটী তুঙ্গ শিলাখণ্ডে দাঁড়াইয়া সেই নৈশ আকাশ ধ্বনিত করিয়া গীত গাইতে লাগিল।—

আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই,
পুষ্পের হইবে বিয়ে আনতে যাই গো থই।
ধেয়ে এল বায়ুরাজ, গায়ে পরিমল সাজ,
অলির মাথায় পড়ে বাজ, শুনলে কিনা সই!

তেজসিংহ উঠিলেন। দুষ্টা বালিকার অলীক কথায় তেজসিংহের হৃদয়ও বিচলিত হইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি নানাস্থানে জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন, পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন, সে প্রবাদ ভীলবালিকার সৃষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন না। এ কথা এতদিন বিশ্বাস করেন নাই, পুষ্পকুমারীর সত্যে সন্দেহ করেন নাই, যুদ্ধের সময় পুষ্পকে কোনও কথা জিজ্ঞাসার অবসর পান নাই। কিন্তু অদ্য ভীলকন্যার কথায় সন্দেহ জাগরিত হইল, সে সন্দেহ ক্রমে হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগিল।

অন্ধকারে সেই পর্ব্বত-পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভীলবালার গীত এখনও তাঁহার কর্ণে শব্দিত হইতেছিল, তাঁহার মন অসুস্থ ও বিচলিত। বালিকা মিথ্যাকথা বলিবে কি জন্য?

তবে কি পুষ্প যথার্থই দুর্জ্জয়সিংহের অনুরক্তা হইয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছেন, তেজসিংহকে ভুলিয়াছেন? তেজসিংহের হৃৎকম্প হইল।

আবার তিনি পুষ্পের পুষ্পবিনিন্দিত মুখখানি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই ম্লান নয়ন, ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠদ্বয়, শান্ত ললাট ও সরল কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন। পুষ্প কখন, কখন, কখনও সত্য লঙ্ঘন করিবে না, তেজসিংহ কেন আশঙ্কা করিতেছে?

আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয় মনে জাগরিত হইতে লাগিল, হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল, সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, হৃদয় উদ্বিগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল।

পর্ব্বতের কুজ্ঝটিকা যেমন ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে থাকে, ক্রমে বৃহৎ রূপ ধারণ করে, উন্নত স্থির পর্ব্বতকে আবৃত করে, গগনের সূর্য্য ও প্রকৃতির প্রসন্ন মুখচ্ছবি আবৃত করে, অবশেষে দীর্ঘবিলম্বী মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগৎ কলুষময় ও গভীর অন্ধকারময় করে সেইরূপ সন্দেহ-মেঘ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য তেজসিংহের প্রসন্ন উদার হৃদয়কে আবৃত করিল। হৃদয়ের সে অন্ধকার দুর্ভেদ্য, সুন্দর পরিষ্কার ধীশক্তির আলোক তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : সত্য পালন

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী।
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্ ॥

—মেঘদূতম্।

দ্বিপ্রহর রজনীতে চন্দ্রকরোজ্জ্বল পুষ্পোদ্যানে পাঠক পুষ্পকুমারীকে একবার দেখিয়াছেন, কিন্তু সেদিন চারণদের তথায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং পুষ্পকুমারী পরিচয় দান করেন নাই।

যদি পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, চলুন, অদ্য নিরালয়ে যাইয়া সে লাবণ্যময়ীর সহিত আলাপ করিব। অদ্য তিনি মহারাজ্ঞীর সহচরীরূপে রাজপরিবারের সহিত বাস করিতেছেন।

পুষ্পকুমারী রাজপুত-বালিকা। পুষ্পের পিতার সহিত তিলকসিংহের অতিশয় প্রণয় ছিল, সেই কারণ তিলকসিংহ নিজ পুত্রের সহিত পুষ্পের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দশমবর্ষীয় বালক ও সপ্তমবর্ষীয়া বালিকার একদিন সাক্ষাৎ হইল; সেইদিন একে অন্যকে মনে মনে বরণ করিলেন। বিবাহের বাক্যদান হইল, সম্বন্ধ স্থির হইল, সমস্ত আয়োজন স্থির হইল, শুভকার্য্যের দিনস্থির হইল, এরূপ সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর আসিয়া চিতোরনগরী আক্রমণ করিলেন। সে নগর রক্ষার্থ পুষ্পের পিতা ও তিলকসিংহ উভয়েই হত হইলেন। কিছুদিন পরে তেজসিংহ পৈতৃক দুর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ভীলদিগের সহায়তা গ্রহণ করিলেন।

সপ্তমবর্ষের বালিকা ও দশমবর্ষের বালক প্রণয়ের কি জানিবে? কিন্তু রাজপুতগণ বাল্যকাল হইতে সত্যপালন করিতে শিখিত, রাজপুতবালিকা সত্য বিস্মৃত হইলেন না। একদিনদৃষ্ট সেই বালকের প্রতিমূর্ত্তি বালিকা কয়েক দিনের মধ্যে বিস্মৃত হইলেন, কিন্তু সপ্তমবর্ষে যে সত্য করিয়াছিলেন, জীবনে তাহা বিস্মৃত হইলেন না।

তিলকসিংহের কুলের অধিকতর অবমাননা করিবার জন্য দুর্জ্জয়সিংহ তেজসিংহের বাগ্‌দত্তা বধূকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার মানস করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুষ্পকুমারীর রক্ষক কেহই ছিল না, অথবা যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা দুর্জ্জয়সিংহের পক্ষাবলম্বী ও অর্থভুক্‌। তাঁহারাও দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার জন্য বালিকাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বালিকা উত্তর পাঠাইলেন—আমার স্বামী হত হইয়াছেন, আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া। সেইদিন হইতে বালিকা সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন; তখন পুষ্পের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষমাত্র।

তরুণবয়সে শারীরিক কিছু কিছু পরিশ্রম ও চেষ্টায় আমাদিগের শরীর সবল হয়, দৃঢ়বদ্ধ হয়। তরুণবয়সে কিছু কিছু ক্লেশ, চিন্তা ও শোকে আমাদিগের মন গঠিত হয়, মানসিক প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয়, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়, মানসিক পেশীগুলি যেন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও বদ্ধ হয়। চিন্তা ও ক্লেশ অপেক্ষা মনের উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর নাই, মানসিক দুর্ব্বলতার নিপুণতর চিকিৎসক নাই। চিন্তা লোহকর্ম্মকারের ন্যায় বার বার নির্দ্দয় ও সবল আঘাত করিয়া হৃদয়কে গঠিত করে, সে আঘাতে আমরা কাতর হই, আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু কর্ম্মকার নির্দ্দয়, আপন কার্য্য বিস্মৃত হয় না। পরিশেষে আমাদের মন গঠিত হয়, হৃদয় গঠিত হয়, প্রবৃত্তিগুলি স্থিরীকৃত হয়, প্রতিজ্ঞা লৌহবৎ দৃঢ় হয়। যিনি বাল্যকাল হইতে অন্যের চেষ্টায় পালিত, অন্যের হস্তদ্বারা নীত, যাঁহাকে কখনও চিন্তা করিতে হয় নাই, ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই, তাঁহার মন এখনও গঠিত হয় নাই, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয় নাই; তাঁহার সুখ ও স্বচ্ছন্দতা আমি হিংসা করি না।

বাল্যকালে ক্লেশে পড়িয়া কোমল রাজপুতবালিকার মন গঠিত হইল, লৌহবৎ দৃঢ়ীকৃত হইল। আত্মীয়ের ভর্ৎসনা ও ভয়প্রদর্শনে পরিচারিকাদিগের অনুরোধে, দুর্জ্জয়সিংহের দূতীদিগের প্রলোভনে, বালিকার হৃদয় বিচলিত হইল না, বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। লোকে যত দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার অনুনয় করিতে লাগিল, বালিকা ততই অধিকতর ভক্তিভাবে সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত, বীরপুরুষের নামমাত্র পূজা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়ের ভ্রূকুটী ও বন্ধুজনের ভর্ৎসনা নীরবে সহ্য করিতে শিখিলেন, নিরানন্দ গৃহে বাস করার ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিলেন, আপন প্রতিজ্ঞা আপন হৃদয়ে গোপন করিতে শিখিলেন। বহু পরিজন-মধ্যে বালিকা একাকিনী বিচরণ করিতেন, একাকিনী চিন্তা করিতেন, একাকিনী পুষ্পচয়ন করিতেন ও হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতেন। অভ্যাসে আমাদিগের কোন্‌ ক্লেশ না সহ্য হয়? পুষ্পকুমারী পরের স্নেহ আর চাহিতেন না, পরের মিষ্টকথা চাহিতেন না, পরের ভ্রূকুটী বা মর্ম্মভেদী রহস্যে তাঁহার লৌহবৎ হৃদয়ে আর ক্লেশ হইত না, বিধবা-বেশধারিণী নবীনা রাজপুতবালা বাল্যকালের সত্যপালন করিতেন। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, দীপালোক তত প্রস্ফুটিত ও প্রজ্বলিত হয়; সকলের ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের মধ্যে পিতৃমাতৃহীনা, বন্ধুহীনা রাজপুতবালিকার স্থির, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ অনেক প্রলোভন দেখাইয়া পুনরায় পুষ্পকুমারীর হস্ত প্রার্থনা করিলেন। দূতী শতমুখে দুর্জ্জয়সিংহের যশ, পরাক্রম, সাহস ও বিপুল অর্থের কথা বর্ণনা করিল।

পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন, স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন,—আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া।

পুষ্পের আত্মীয়গণ এ কথা শুনিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইলেন, পুষ্পকে অনুরোধ ও ভয়প্রদর্শন করিলেন, বালিকা অধিকদিন অবিবাহিতা থাকিলে নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইবে বুঝাইলেন। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন, স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন,—আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া।

অবশেষে পুষ্পের আত্মীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ পুষ্পকে সূর্য্যমহলে আনাইলেন। পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—চন্দাওয়ৎরাজ! শুনিয়াছি আপনি অতিশয় বিক্রমশালী, সকলই করিতে পারেন; কিন্তু পুষ্প আপনাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে আত্মঘাতিনী হইবে, তাহাও কি নিবারণ করিতে পারিবেন? শুনিয়াছি তিলকসিংহের বিধবাকে হত্যা করিয়াছেন, আর একজন নারীহত্যার পাতকে পাতকী হইবেন?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : মেঘগর্জ্জন

হিঅঅ কিং এব্বং বেপসি।

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌।

কয়েক বৎসর অবধি পুষ্প এইরূপে একাকিনী চিন্তা করিতেন। সহসা একদিন নিশীথে স্বপ্নের ন্যায় একজন চারণদেব সাক্ষাৎ দিয়া পুষ্পকে বলিলেন,—সে অজ্ঞাত, অপরিচিত, বাল্যদৃষ্ট রাঠোর বীর জীবিত আছেন, তিনি দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন, তিনি বাল্যসত্য পালন করিতেছেন!

স্বপ্নের ন্যায় সে চারণদেব ও চারণের গীত লয় হইয়া গেল, কিন্তু সে বার্ত্তা পুষ্পের হৃদয় হইতে লয় হইল না। বিধবার হৃদয়ে নব উল্লাস জাগরিত হইল, শুষ্ক লালসার উদ্রেক হইল। প্রাতঃকালের প্রথম আলোকচ্ছটায় যেরূপ সেই উদ্যানের পুষ্পগুলি বিকশিত হইত, সেইরূপে চারণবার্ত্তায় বিধবার হৃদয়ে নিহিত আশা, নিহিত ভাব, নিহিত লালসা সহসা প্রস্ফুটিত হইল।

যে অজ্ঞাত বাল্যস্বামীর নাম জপিয়া এতদিন সত্যপালন করিয়াছেন, তিনি জীবিত আছেন! তিনি নিদর্শন প্রেরণ করিয়াছেন, বাল্যসত্য ভুলেন নাই। পুষ্পকুমারী সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই বাল্যসুহৃদের মুখমণ্ডল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, এখন যিনি বলিষ্ঠ হইয়া দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন, তাঁহার দীর্ঘ অবয়ব ও মুখকান্তি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেন। বাল্যদৃষ্ট মুখমণ্ডল স্মরণপথে আসিত না, অথবা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলে কিছু কিছু মনে পড়িত। একখানি উদার মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট, উন্নত দেবকান্তি শরীর, স্মরণে আসিত। কল্পনা হইত, যেন চন্দ্রালোকে সেই বীর দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পের হস্ত ধারণ করিয়াছেন, যেন বীরের উষ্ণ নিশ্বাস, বীরের তপ্ত ওষ্ঠ, সেই হস্ত স্পর্শ করিল। এ যে সেই চারণদেবের মূর্ত্তি!

পুষ্প বিশ্বাসঘাতিনী নহেন, মনের নিহিত কন্দরেও সেই অজ্ঞাত স্বামী ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা ছিল না। তথাপি কল্পনা অতিশয় মায়াবিনী; যে স্থানের কথা বার বার শুনি, সে স্থান না দেখিলেও কল্পনাবলে মানসচক্ষে যেন সৃষ্ট হয়, যে অদৃষ্ট পুরুষের কথা ধ্যান করি, কল্পনা-বলে তাহার একটী চিত্র মনে সৃষ্ট হয়। সেই পুরুষের কল্পিত একখানি আকৃতি মনের সম্মুখে থাকে, অপরিচিতের মানসিক যে সমস্ত গুণ আমরা জানি, তদনুযায়ী একখানি মুখচ্ছবি গঠন করিয়া লই। পুষ্প যখন অজ্ঞাত ও বাল্যসুহৃদের কথা মনে করিতেন, চারণের দেবতুল্য মুখকান্তি হৃদয়ে জাগরিত হইত। তেজসিংহের অসাধারণ বীরত্বের কথা যখন শুনিতেন, চারণের উন্নত দীর্ঘ অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ বাহু স্মরণ হইত। তেজসিংহের কণ্ঠস্বর যখন কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই চারণের সঙ্গীত-বিনিন্দিত রজনীশ্রুত মিষ্ট ভাষা কর্ণকুহরে শব্দিত হইতে থাকিত। পুষ্প অবিশ্বাসিনী নহেন, সত্যপালনের জন্য জগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়াবিনী কল্পনাশক্তি অজ্ঞাত হৃদয়েশ্বরের আকৃতির সহিত, স্বপ্নবৎ দৃষ্ট চারণদেবের সহিত সততই বিজড়িত করিত! কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও কি সেই মূর্ত্তির দিকে প্রধাবিত হইত? পুষ্পকুমারী জানেন না, আমরাও জানি না।

চাতক যেরূপ মেঘের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিভ্রান্ত হয় না, পুষ্পকুমারী সেইরূপ পর্ব্বত-পথ চাহিয়া রহিলেন, পুনরায় স্বপ্নবদ্দৃষ্ট সেই নবীন চারণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুষ্প চন্দ্রালোকে পদচারণ করিতেন, নিস্তব্ধ রজনীতে একাকী জাগরিতা থাকিতেন। দিবা গেল, মাস গেল, রৌপ্যবিনিন্দিত চন্দ্রালোকে সে নবীন মূর্ত্তি আর দৃষ্ট হইল না, রজনীর নিস্তব্ধতায় সে স্বর্গীয় সঙ্গীত আর শ্রুত হইল না।

আকাশে যেরূপ কৃষ্ণমেঘের সহিত বিদ্যুল্লতা ক্রীড়া করে, পুষ্পের হৃদয়ে নৈরাশ্যের সহিত আশা সেইরূপ খেলা করিত। কিন্তু জগৎ সে আশা বা চিন্তার কোন পরিচয় পায় নাই, বিধবা বালার নির্ম্মল ম্লান মুখমণ্ডলে কোনও ভাব লক্ষিত হইত না।

সহসা মুসলমানেরা সূর্য্যমহল আক্রমণ করিল, নিশীথে অপরিচিত ভীলযোদ্ধার দ্বারা পুষ্পকুমারী অন্যস্থানে নীত হইলেন। তাহার পর রাজপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প ফিরিতে লাগিলেন। ভীমচাঁদের পাল হইতে জাউরার খনিতে, তাহার পর কখন কন্দরে, কখন গহ্বরে, কখন উপত্যকায়, কখন চাওন্দদুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। এখন যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিতেন, চিতোর শত্রুহস্তে রহিয়াছে বলিয়া এখনও তাপসের ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া কুটীরে বাস করিতেন। রাজরাজ্ঞী ও রাজবধূ সেই কুটীরে থাকিতেন, রাজশিশুগণ সেই কুটীরের চারিদিকে ক্রীড়া করিত! যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন প্রতাপসিংহ অন্য আবাসে বাস করিবেন না। প্রতাপসিংহ জীবিত থাকিতে চিতোর উদ্ধার হইল না; ইতিহাসে লিখিত আছে, প্রতাপ সেই পর্ণকুটীরে প্রাণত্যাগ করেন।

পর্ণকুটীরের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইত, পুষ্পকুমারী তথায় সর্ব্বদা জল আনিতে যাইতেন। অদ্য রজনীতে সেই স্থানে জল আনিতে যাইলেন ও কলস রাখিয়া নীল-মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন: তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা আমরা কিরূপে অনুভব করিব?

মেঘ গর্জ্জন করিল। সহসা পুষ্পকুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল কেন?—কে বলিবে, কি জন্য?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বজ্রাঘাত

হন্দী হন্দী অঙ্গুলীঅঅমুস্যা মেঅংক্যান্তী।
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

সহসা সুদূর হইতে পুষ্প একটী সঙ্গীতধ্বনি শুনিলেন। সে সঙ্গীতে পুষ্পের হৃদয় আলোড়িত করিল, পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিল! আশায় পুষ্পকুমারীর হৃদয় বিকশিত হইল, আনন্দময় স্বপ্নে পুনরায় সে হৃদয় ভাসিল, শুষ্কপ্রায় লতিকা যেন আর একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল!

গীত।

“বর্ষাকালে আকাশে সুন্দর ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহার কি কমনীয় কান্তি, কি অনির্ব্বচনীয় রূপ! সে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনুর স্থায়িত্বে বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বলনয়না নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না!

“বক্রগতি কালসর্প কি সুন্দর উজ্জ্বল চূড়া ধারণ করে। সে খল সর্পের সরলতায় বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা সুবেশধারিণী নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না!

“জগতের অস্থায়ী দ্রব্যের স্থায়িত্বে প্রত্যয় কর; চপলা বিদ্যুল্লতার কিরণে প্রত্যয় কর; জলে অঙ্কিত রেখার স্থায়িত্বে বিশ্বাস কর; উল্কার স্থিরত্বে বিশ্বাস কর; কিন্তু নারীর সত্যে প্রত্যয় করিও না!

“জগতের মধ্যে চপল, চঞ্চল, মায়াবী, অপ্রকৃত, সমস্ত দ্রব্য একীভূত কর, তাহার উপর নাম লিখ, ‘নারীর সত্যপালন’।

চারণের উগ্র স্বর শুনিয়া পুষ্প স্তম্ভিত হইলেন! ধীরে ধীরে চারণদেব নিকটে আসিয়া পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গীত দেবীর মনোনীত হইয়াছে?

পুষ্প চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন! অনেকক্ষণ পর বলিলেন,—চারণদেব, এ গীতের অর্থ বুঝিলাম না, পূর্ব্বদিনে আপনি এরূপ গীত গান নাই।

সে কোমলস্বরে প্রস্তর দ্রবীভূত হইত, চারণের হৃদয় হইল না। তিনি কহিলেন,—গীত আমার নহে, আমি যেরূপ শিক্ষিত হই, সেইরূপ গাই।

পুষ্প। যিনি আপনাকে গীত শিখাইয়াছেন, তিনি কুশলে আছেন?

চারণ। কুশলে নাই, তিনি কুস্বপ্নে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়াছেন। আপনাকে যে নিদর্শনটী দিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখিতে চাহিয়াছেন।

পুষ্প এবার যথার্থ ভীতা হইলেন। তিনি চারণদত্ত অঙ্গুরীয়টী হৃদয়ে রাখিতেন, সর্ব্বদা দেখিতেন, সর্ব্বদা পরিতেন, পুনরায় হৃদয়ে রাখিতেন। কিন্তু যেদিন তিনি ভীমচাঁদ ভীলের গহ্বরে নীতা হইয়াছিলেন, সেদিন হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

চারণ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

পুষ্প স্তব্ধ ও নিরুত্তর।

অধিকতর ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

অস্ফুটস্বরে পুষ্প কহিলেন,—চারণদেব, অনবধানতা মার্জ্জনা করুন, বীরপুরুষকে জানাইবেন—

চারণ গর্জ্জন করিয়া তৃতীয়বার এই প্রশ্নটী করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

পুষ্প। আমি অভাগিনী, সে অঙ্গুরীয়টী হারাইয়াছি।

চারণ। অভাগিনী! তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেজসিংহের প্রণয় এ জীবনের মত হারাইয়াছ!

বিদ্যুৎ-গতিতে ছদ্মবেশী তেজসিংহ নয়নের অদৃশ্য হইলেন!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ

ততো ভেরী মৃদঙ্গানাং পণবানঞ্চ নিঃস্বনঃ।
শঙ্খনেমিস্বনোন্মিশ্রঃ সম্বভুবাঙ্গুতোপমঃ॥

—রামায়ণম্।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় তেজসিংহ ভীমগড় দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে কহিলেন,— —চপলা নারীর জন্য বহুদিন ব্যর্থ কাটাইয়াছি, অদ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিপ্রহর রজনীতে চারিদিকে সৈন্য রাশীকৃত হইতেছিল, তেজসিংহ তাহার মধ্যে যাইয়া কহিলেন,—বন্ধুগণ, বৈরনির্য্যাতনের সময় উপস্থিত, আমার সহিত অগ্রসর হও।

যাহারা তেজসিংহের সে গর্জ্জন শুনিল, সে নিশীথে তাঁহার ললাটে ভ্রুকুটী দেখিল, তাহাদিগের তিলকসিংহের কথা স্মরণ হইল। নিঃশব্দে সকলে সূর্য্যমহলদুর্গের দিকে চলিল।

পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্য দিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে নিঃশব্দে সৈন্যগণ চলিতে লাগিল। কখন জঙ্গলের ভিতর দিয়া, কখন হ্রদের পার্শ্ব দিয়া, কখন অন্ধকারময় উপত্যকার নীচ দিয়া, কখন পর্ব্বতের উপর দিয়া তেজসিংহের সৈন্য চলিল। যতক্ষণ সৈন্য চলিতেছিল, তেজসিংহের মুখে কেহ একটী কথা শ্রবণ করে নাই। সকলে বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয়ে রোষানল জাগরিত হইয়াছে, অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের রক্ষা নাই।

অনেক পর্ব্বত ও উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া সেনা অবশেষে সূর্য্যমহলের সম্মুখে আসিল। উন্নত শেখর যেন কিরীটের ন্যায় দুর্গকে ধারণ করিয়াছে, সেই পর্ব্বত ও দুর্গ নৈশ আকাশপটে চিত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে! চারিদিকে কেবল পর্ব্বতমালা ও অনন্ত পাদপশ্রেণী দেখা যাইতেছে, নৈশ অন্ধকারে সূর্য্যমহলদুর্গ নিস্তব্ধ, জগৎ নিস্তব্ধ। ক্ষণেক তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে সেই পৈতৃক দুর্গ দেখিলেন, মনে মনে বলিলেন,—পিতা অনুমতি দিন, অষ্টাদশ বর্ষ নির্ব্বাসনের পর আপনার পুত্র অদ্য দুর্গে প্রবেশ করিবে।

নিঃশব্দে সৈন্যগণ সূর্য্যমহলতলে উপস্থিত হইল। এ নিস্তব্ধ নিশীথে অসতর্ক শত্রুকে

আক্রমণ করিবার জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন। তেজসিংহ ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন,—পিতার দুর্গে পুত্র তস্করবৎ প্রবেশ করে না। তেজসিংহ রাজপুত, রাজপুত সুপ্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে না।

পরে উচ্চৈঃস্বরে ভেরী বাজাইলেন; ভেরীর শব্দ সে পর্ব্বত ও উপত্যকায় বার বার ধ্বনিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিল। পরে তেজসিংহ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—অদ্য তিলকসিংহের পুত্র পিতার দুর্গে প্রবেশ করিবেন, যাহার সাধ্য পথ রোধ কর।

যাহারা সে ভেরীশব্দ, সে গর্ব্বিত কথা শুনিল, তাহারা বুঝিল, অদ্য তেজসিংহের গতিরোধ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। দুর্গপ্রহরিগণ নীচের শব্দ শুনিতে পাইল, লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পিপীলিকাসারের ন্যায় সৈন্যশ্রেণী দুর্গে আরোহণ করিতেছে!

তৎক্ষণাৎ তাহারা দুর্জ্জয়সিংহকে সংবাদ দিল। দুর্জ্জয়সিংহ জাগরিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিলেন, রাঠোর অল্পদিন পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই পালন করিতে আসিয়াছেন। রোষে মনে মনে বলিলেন,—তিলকসিংহের পুত্র! বহুকাল হইতে এইদিন আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আজি হৃদয় শান্ত হইবে, তুমি কি আমি অদ্য জীবনত্যাগ করিব। এ জগতে উভয়ের স্থান নাই।

দুর্জ্জয়সিংহের আদেশে দ্বিশত যোদ্ধা প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইল, অবশিষ্ট প্রাচীরের ভিতর রহিল। প্রাচীরের উপরে চারিদিকে মশাল জ্বলিল, দুর্গশিরের এই আলোক বহুদূর পর্য্যন্ত চারিদিকের দেশ প্রদীপ্ত করিল, গগন উদ্দীপ্ত করিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, বিনা যুদ্ধে আর আরোহণ সম্ভব নহে। তখন বজ্রনাদে যুদ্ধের আদেশ দিলেন, স্বয়ং সমস্ত সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া বর্শা ও অসি হস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন।

সেস্থানে উপরের অল্প সৈন্য নীচস্থ বহু সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিত, কিন্তু তেজসিংহের গতিরোধ হইল না। তাঁহার রাঠোর সেনাগণ যেরূপ দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত-তেজে দুর্জ্জয়সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল, তাহা দেখিয়া উপরিস্থ দুর্গবাসিগণ বিস্মিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রচণ্ডনাদ গগনে উত্থিত হইল, অল্পক্ষণ মধ্যে দ্বিশত চন্দাওয়ৎ সৈন্য বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে হত হইল, অনেকে পর্ব্বত হইতে উপলখণ্ডের ন্যায় নীচে নিক্ষিপ্ত হইল, অবশিষ্ট দুর্গপ্রাচীরাভিমুখে পলায়ন করিল। শবরাশির উপর দিয়া তেজসিংহের দুর্দ্দমনীয় রাঠোর সেনা হুঙ্কার শব্দে অগ্রসর হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিলেন, নীরবে সসৈন্যে দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার দন্তপাতি ওষ্ঠের উপর স্থাপিত, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। তিনি কহিলেন,—তিলকসিংহের পুত্র পিতার ন্যায় যুদ্ধ শিখিয়াছে, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। আইস, বীরপুত্র, আজি তোমার যুদ্ধসাধ মিটাইব।

মুহূর্ত্তের মধ্যে তেজসিংহের সেনা প্রাচীরের নিকট আসিল, তখন প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাঠোরগণ লম্ফ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইল, চন্দাওয়ৎগণ বর্শাচালন দ্বারা তাহাদিগের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। তেজসিংহের কতক সৈন্য প্রাচীরের উপর উঠিল, দুর্জ্জয়সিংহের কতক সৈন্য উৎসাহে প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া নীচে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অচিরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই নৈশ অন্ধকারে বা মশালের আলোকে শত্রুমিত্র বিমিশ্রিত হইয়া গেল, রুধিরের স্রোত বহিতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেনাগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল, প্রচণ্ড যুদ্ধনাদে আহতদিগের আর্ত্তনাদ মগ্ন হইল। যেন শত বৎসরের বৈরভাব সেই রাঠোর ও চন্দাওয়ৎদিগের হৃদয়ে জাগরিত হইল, যেন সেই বৈরভাবে ও জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর রণস্থল ও সমস্ত পর্ব্বতদুর্গ কম্পিত করিল। সালুম্ব্রা ও দুর্জ্জয়সিংহের নাম বারবার ভীষণ হুঙ্কারে উচ্চারিত হইতে লাগিল, সে হুঙ্কার ডুবাইয়া রাঠোরগণ জয়মল্ল ও তিলকসিংহের নাম করিয়া পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। নিশাকালে সে যুদ্ধরবে চারিদিকের পর্ব্বত ও উপত্যকাবাসিগণ চমকিত হইল, বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্র অদ্য পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন।

প্রাচীরপার্শ্বে এইরূপে সমরতরঙ্গ উথলিতে লাগিল, যুদ্ধের নাদ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। তেজসিংহ সে যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া একাগ্রচিত্তে অসুরবলে প্রাচীরের দ্বার ভগ্ন করিবার

চেষ্টা করিতেছিলেন। দ্বার বৃহৎ কাষ্ঠে নির্ম্মিত, কিন্তু অদ্য রক্ষা নাই, তেজসিংহের ঘন ঘন কুঠার আঘাতে সে দ্বার কম্পিত হইতেছিল। অচিরে প্রচণ্ডশব্দে সে দ্বার ভগ্ন হইল, মহা কোলাহলে রাঠোর সৈন্যগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দুর্জ্জয়সিংহ জানিলেন, এই দ্বার রক্ষা না হইলে দুর্গ রক্ষা হইবে না, সুতরাং স্বয়ং সে ভগ্নদ্বারের নিকট আসিয়া শত্রুর পথ রোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রভুর চতুর্দ্দিকে দুর্গের সমস্ত সাহসী ও বলবান চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা জড় হইল। তেজসিংহও ভগ্নদ্বারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পথ পরিষ্কারের চেষ্টা পাইলেন, তাঁহার সহযোদ্ধা রাঠোরগণও সে চেষ্টায় ক্ষান্ত ছিল না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বোধ হইল যেন দুই দিক হইতে সমুদ্রের দুইটী উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া পরস্পরকে সজোরে আঘাত করিল, সে আঘাতের শব্দ গগন পর্য্যন্ত উত্থিত হইল! ক্ষণেক উভয় পক্ষ পরস্পরের বেগে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেহ অগ্রসর হইতে পারে না, কেহ পশ্চাতে যাইবে না। অসংখ্য শব সেই দ্বারের নিকট রাশীকৃত হইতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া রাঠোর ও চন্দাওয়ৎগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ সেইদিন যথার্থ যোদ্ধা নাম রাখিলেন। তাঁহার শরীর রক্তাপ্লুত, নয়নদ্বয় জ্বলন্ত! তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সে দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন, রাক্ষসবলে শত্রুদিগকে প্রতিহত করিতেছিলেন, বজ্রগর্জ্জনে আপন সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। কিন্তু তেজসিংহ অদ্য যেন দৈববলে বলিষ্ঠ, তাঁহার গতি অদ্য রোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য! অমানুষিক বলে সেই শত্রুরাশি প্রতিহত করিয়া প্রচণ্ড নাদে সেই দ্বারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার ঢালের সম্মুখে যেন কোন মন্ত্রবলে মনুষ্যবল হটিয়া গেল! বীরের নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে, উষ্ণীষ ও শরীর রুধিরাক্ত, দক্ষিণহস্তে শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘবর্শা কাঁপাইয়া তিলকসিংহের পুত্র পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিলেন!

মহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইল, রাঠোরসৈন্য অষ্টাদশ বর্ষ পরে সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিল!

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পুত্রশোক বিমোচন

গদানাং মুসলানাঞ্চ পরিধানাঞ্চ নিঃসনৈঃ।
শরাণাং শঙ্খবাতৈশ্চ ক্ষুভিতাঃ সপ্তসাগরাঃ ॥

—রামায়ণম্।

যখন দুর্গদ্বার ভগ্ন হইল, যখন রাঠোরগণ মহাকোলাহলে দুর্গে প্রবেশ করিল, তখন দুর্জ্জয়সিংহ এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ ও রক্ত অপনয়ন করিলেন, রাঠোর ও চন্দাওয়ৎদিগের যুদ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য নিরীক্ষণ করিলেন।

ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া স্থির স্বরে তেজসিংহকে কহিলেন,—রাঠোরবীর! তোমার যুদ্ধে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার পিতার ন্যায় ঐ বাহুতে অসাধারণ শক্তি ধারণ কর। কিন্তু এবার সাবধান! চন্দাওয়ৎগণ! আমাদিগের দুর্গ গিয়াছে, কিন্তু মান যায় নাই; রাজপুতমান রক্ষা কর, চন্দাওয়ৎকুলের মান তোমাদের হস্তে।

এই কথা শুনিয়া সকল চন্দাওয়ৎগণ ভীষণ গর্জ্জনে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত করিল। সকলে বুঝিল, এখনও রাঠোরদিগের বিজয় সংশয়, চন্দাওয়ৎ প্রাণ দিবে, কিন্তু অদ্য যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিবে না।

নৈরাশ-বলে বলিষ্ঠ হইয়া যেন ভগ্নসেতু জলতরঙ্গের ন্যায় এবার চন্দাওয়ৎগণ রাঠোরের উপর পড়িল। এবার রাঠোরগণ অগ্রসর হইতে পারিল না, সমুদ্রতরঙ্গসম চন্দাওয়ৎ তরঙ্গের সম্মুখে ক্রমে হটিতে লাগিল।

অসুরবীর্য্য তেজসিংহ রোষে গর্জ্জন করিয়া আপন দীর্ঘ বর্শা চালনা করিতে লাগিলেন। সে গর্জ্জনে বারবার পর্ব্বতদুর্গ কম্পিত হইল, কিন্তু মরণে কৃতসঙ্কল্প চন্দাওয়ৎ বীরগণ কম্পিত হইল না। ক্রমে রাঠোরগণ হটিতে লাগিল।

রাঠোরগণ প্রভুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় যুঝিতে লাগিল, বারবার চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলীকে বেগে আক্রমণ করিল, বারবার চন্দাওয়ৎ-বেগ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। সে বৃথা চেষ্টা; সেই অল্পসংখ্যক কৃতসংকল্প চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলী যেন সহসা দৈববলে বলিষ্ঠ হইয়াছে, তাহাদিগের গতিরোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য। সে গতিরোধ হইল না, রাঠোর-সৈন্য হটিতে লাগিল।

“তিলকসিংহের প্রাসাদে তিলকসিংহের পুত্র প্রবেশ করিবে, সৈন্যগণ! পশ্চাদ্দিকে কোথায় যাইতেছে?”—এই বলিয়া অবশেষে প্রাচীন রাঠোর দেবীসিংহ খড়্গহস্তে লম্ফ দিয়া চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলীর মধ্যে পড়িলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এবার সমস্ত রাঠোর অগ্রসর হইল। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক চন্দাওয়ৎ তখন ছারখার হইয়া প্রায় সকলে নিহত হইল, রণ সাঙ্গ হইল।

শোণিতাক্তকলেবরে প্রাচীন দেবীসিংহ তখন তেজসিংহের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—তেজসিংহ! আমার সংকল্প সাধন হইল, আমাকে বিদায় দাও। তোমার পিতার ন্যায় যশস্বী হও, বৃদ্ধের অন্য আশীর্ব্বাদ নাই।

দেবীসিংহের জীবনশূন্য কলেবর ভূমিতে পতিত হইল; দুর্জ্জয়সিংহের অব্যর্থ বর্ষায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়াছিল।

যুদ্ধ শেষ হইল। চন্দাওয়ৎ প্রায় সকলে হত হইয়াছে, কেবল দুর্জ্জয়সিংহ ও তাঁহার কতিপয় যোদ্ধা জীবিত আছেন। দুর্জ্জয়সিংহের খড়্গ ভগ্ন, ললাট রুধিরাক্ত, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। চন্দাওয়ৎবীর তখনও যুঝিতে প্রস্তুত, যুদ্ধপিপাসা তখনও নিবারিত হয় নাই, জীবিত থাকিতে হইবে না।

পরাজিত দুর্জ্জয়সিংহকে কেহ প্রাণে বধ না করে, তেজসিংহের পূর্ব্বেই আদেশ ছিল। এক্ষণে রাঠোরগণকে জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় দেখিয়া তেজসিংহ পুনরায় উচ্চনাদে কহিলেন,—দুর্জ্জয়সিংহের শরীরে যিনি অস্ত্রবর্ষণ করিবেন, তেজসিংহ তাঁহার শত্রু।

রাঠোরগণ ক্ষান্ত হইল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল একটী স্বর শুনা গেল;—“প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় পুত্রশোক এখনও হৃদয়ে জ্বলিতেছে,—ঐ আমার পুত্রহন্তা!”

নিমেষমধ্যে জিঘাংসাতাড়িত বৃদ্ধ গোকুলদাস লম্ফ দিয়া দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়ের উপর ছুরিকা বসাইল, আহত দুর্জ্জয়সিংহও ভগ্ন খড়্গ দ্বারা গোকুলদাসের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, দুইটী মৃতদেহ জড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল! এতদিনে গোকুলদাসের পুত্রশোক বিমোচন হইল!

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : অঙ্গুরীয় ও রত্ন

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ।

—কুমারসম্ভবম্।

পাঠক! চল, এ যুদ্ধের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে আমরা মহারাণার কুটীরে যাই, তথায় অভাগিনী পুষ্পের সহিত দেখা হইবে।

সন্ধ্যাকালে সেই নদীতীরে পুষ্পকুমারী একাকী জল আনিতে আসিয়াছেন। সে সর্ব্বসহ নারীর ললাট এখনও পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার, নয়নদ্বয় পূর্ব্ববৎ স্থির। বিষম যাতনায় কেহ পুষ্পকে একবিন্দু অশ্রুপাত করিতে দেখেন নাই, কাহারও নিকট স্নেহ যাচ্ঞা করিতে দেখেন নাই। একাকিনী বাল্য-বৈধব্য সহ্য করিয়াছিলেন, একাকিনী যৌবনে একদিন সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এখন সে স্বপ্ন লীন হইয়াছে, জীবনের আশা লুপ্ত হইয়াছে, জগতের সমস্ত সুখ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এখনও একাকিনী হৃদয়ের নৈরাশ বহন করিতেছেন, কাহারও স্নেহ চাহেন না, কাহারও সহানুভূতির প্রতীক্ষা করেন না।

বালিকার মুখমণ্ডল সেইরূপ পরিষ্কার—পরিষ্কার কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। নয়ন সেইরূপ স্থির, কিন্তু ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত, স্নেহের চক্ষুর্দ্বারা কেহ সে মুখখানি দেখিলে বুঝিতে পারিত,

কোন গভীর অব্যক্ত চিন্তা রমণীর পরিষ্কার মুখমণ্ডলের উপর আপন ছায়া ন্যস্ত করিয়াছে। কিন্তু বাল্যকাল অবধি স্নেহদৃষ্টিতে সে মুখখানি কেহ দেখে নাই!

পুষ্প সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে নদীকূলে আসিতেছেন, ক্ষণেক গমন করিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে ভীলকন্যা। পুষ্প কহিলেন,—বালিকা, তোমার পিতা মহারাজ্ঞীর বিপদের সময় আমাদিগকে স্থান দিয়াছিল, তাহা মহারাণা কখনও ভুলিবেন না। তুমি কি রাজ্ঞীকে দেখিতে আসিয়াছ?

বালিকা। না দেবী, এই নদীকূলে একটী চাঁপাফুল লইতে আসিয়াছি, আমাকে একটী ফুল দিবে?

পুষ্প। হাঁ, লইয়া যাও।

বালিকা। দেবি! তোমার মুখখানি শাদা কেন?

পুষ্প। কৈ, না।

বালিকা। আমি জানি।

পুষ্প। কি জান?

বালিকা। তোমার মুখখানি শাদা কেন জানি।

পুষ্প। কেন?

বালিকা। কোনও দ্রব্য হারাইয়াছে।

পুষ্প। কি দ্রব্য?

বালিকা। এই সোনার কোন গহনা, হার কি বালা, কি আংটী।

পুষ্প শিহরিয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—হাঁ বালিকা, একটী আংটী হারাইয়াছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী রত্নও হারাইয়াছি।

বালিকা। তাহার জন্য দুঃখ কেন? একটী আংটী গিয়াছে, অন্য একটী হইবে।

পুষ্প। অঙ্গুরীয় গেলে অঙ্গুরীয় হয়, কিন্তু যে রত্নটী হারাইয়াছি, তাহা এ জীবনে আর পাইব না!

বালিকা। কি রত্ন, পুষ্প? মুক্তাহার? বুকে পরিবার জিনিস?

পুষ্প। হাঁ, বালিকা, সে বুকে পরিবার জিনিস, কিন্তু মুক্তা অপেক্ষা উজ্জ্বল, মুক্তা অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য।

বালিকা। তবে কি হবে?

পুষ্প। এ জীবনে পুষ্পকুমারী অনেক সহ্য করিতে শিখিয়াছে, এ ক্ষতিও সহ্য করিবে।

বালিকা তীক্ষ্ণনয়নে পুষ্পের মুখের দিকে চাহিতেছিল, পুষ্পের চক্ষু দিয়া ধীরে ধীরে একবিন্দু জল বহিয়া পড়িল। বালিকা ঊর্দ্ধদিকে চাহিল, যেন একটী চাঁপাফুলের দিকে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সেও চক্ষু মুছিল।

অনেকক্ষণ সেই ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বালিকা কহিল,—দেবি! আমাকে ঐ চাঁপাফুলটী পাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমার রত্নটী খুঁজিয়া দেখিব। আমি বনজঙ্গলে বেড়াই, পাইলেও পাইতে পারি।

ভীলকন্যার সরলতা দেখিয়া পুষ্প কোন উত্তর করিলেন না, ধীরে ধীরে সেই চাঁপাফুলটী পাড়িয়া ভীলের হস্তে দিলেন। বাল্যচপলতা ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে ভীলকন্যা বলিল,—কল্য পুষ্পকুমারী আপন রত্ন ফিরিয়া পাইবেন।

পরদিন ঊষার রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়াছে, এরূপ সময়ে পুষ্পকুমারী রত্নটী ফিরিয়া পাইলেন! সূর্য্যমহলের অধিপতি তেজসিংহ পুষ্পকুমারীর নিকট সজলনয়নে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছেন! পুষ্পের ক্ষীণ হস্ত দুইটী নয়নজলে সিক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

সবিস্ময়ে পুষ্পকুমারী দেখিলেন, সূর্য্যমহল-দুর্গেশ্বর সেই দেবকান্তি দীর্ঘকায় চারণদেব! উল্লাস ও উদ্বেগে পুষ্প সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, তেজসিংহ পুষ্পের নিশ্চেষ্ট কম্পিত কলেবর আপন বিশাল হৃদয়ে ধারণ করিলেন!

তেজসিংহের সহিত মহাসমারোহে পুষ্পকুমারীর বিবাহ হইল, স্বয়ং মহারাণা সে বিবাহ-

সভায় উপস্থিত হইলেন, স্বয়ং মহারাজ্ঞী পুষ্পকুমারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গলদেশে আপনার মুক্তাহার দোলাইয়া দিলেন।

সে সুখের রজনী কে বর্ণনা করিতে পারে? সে তৃষিত হৃদয়ের প্রথম সুখের উচ্ছ্বাস কে বর্ণিতে পারে? তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিন্দিত দেহ নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সেই সুক্ষ্ম ওষ্ঠ ঘন ঘন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—পুষ্প! পুষ্প! একদিন তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়া ক্লেশ দিয়াছিলাম, তেজসিংহের সে দোষ তুমি ক্ষমা করিয়াছ?

পুষ্পকুমারী সজলনয়নে কহিলেন,—দেব! তোমার দোষ যেদিন গ্রহণ করিব, সে দিন যেন পুষ্প জীবিত না থাকে। সে যাতনা আমার নিজের দোষের উপযুক্ত শাস্তি, তোমার দত্ত প্রিয় অঙ্গুরীয় আমি কিরূপে হারাইলাম?

তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিন্দিত ওষ্ঠে পুনরায় চুম্বন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—পুষ্প, ক্ষোভ করিও না, তোমার দোষ নাই, সে অঙ্গুরীয় তুমি হারাও নাই।

পুষ্প। আমি হারাই নাই, তবে কে হারাইল? আহা! এবার যদি পাই, চিরকাল এই হৃদয়ে ধারণ করি, আমার জীবনে আর ক্ষোভ থাকে না।

তেজসিংহ। ঈশানী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।

এই বলিয়া ধীরে ধীরে আপন হৃদয় হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী বাহির করিয়া পুষ্পকে দিলেন। পুষ্প চকিত হইলেন, বাষ্পোৎফুল্ললোচনে বারবার সেই অঙ্গুরীয়টী চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পরে বাষ্পোৎফুল্ললোচনে স্বামীর দিকে চাহিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না।

তেজসিংহ পুনরায় সেই সিক্ত ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া আপনার হস্তদ্বারা পুষ্পের অশ্রুমোচন করিয়া দিলেন। ধীরে ধীরে একখানি পত্র বাহির করিয়া পুষ্পের হস্তে দিলেন, পুষ্পকুমারী পড়িয়া দেখিলেন, সে ভীলকন্যার প্রেরিত। সেই পত্র এই—

"তেজসিংহ! তোমার অঙ্গুরীয় একদিন হারাইয়াছিলে, মনে পড়ে? সেদিন তুমি বালিকাকে বলিয়াছিলে, সে যদি খুঁজিয়া পায়, অঙ্গুরীয় তাহার। পুষ্পকে ও মহারাজ্ঞীকে তুমি একদিন আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলে, মনে পড়ে? সেই দিন বালিকা পুষ্পের বক্ষঃস্থল হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী লইয়াছিল। পুষ্প তখন নিদ্রিত ছিল!

"বালিকা মনে করিল, পুষ্পের হাতে পাঁচটী অঙ্গুলী, বালিকার হাতে পাঁচটী অঙ্গুলী; পুষ্প যদি অঙ্গুরীয় পরিতে পারে, বালিকা তাহার অধিকারিণী নহে কেন? যে ভীল ও রাজপুতকে গড়িয়াছে, সে ত এক প্রকারই গড়িয়াছে; তবে পুষ্প যাহার অধিকারিণী, ভীলবালা তাহার অধিকারিণী নহে কেন?

"কিন্তু আমি বালিকা, আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। তেজসিংহ বাগানের ফুল ভালবাসেন, বনফুল ভালবাসেন না। সে দিন রাত্রে বাগানের ফুলগুলি লইয়া বুঝি তুমি পুষ্পকে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলে? আমার বনের ফুল, এই জন্য বুঝি আমাকে কিছু দাও নাই? আমি বালিকা, সকল কথা বুঝিতে পারি না।

"আজ সন্ধ্যার সময় পুষ্পকে দেখিতে গিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তার কাছে দুটী বাগানের ফুল চাহিয়া লইব। সে বলিল,—তুমি তাহাকে অঙ্গুরীয়টী দিয়াছিলে, তাহার সঙ্গে একটী রত্ন দিয়াছিলে। আমি অঙ্গুরীয়টী পাইয়াছি, কৈ রত্নটী ত পাই নাই।

"পুষ্প বলিল,—অঙ্গুরীয় অপেক্ষা রত্নটী উজ্জ্বল। তবে আমার এই অঙ্গুরীয় রাখিয়া কি হইবে? এই পত্র যাহার দ্বারা পাঠাইতেছি, তাহার দ্বারা অঙ্গুরীয়টীও পাঠাইতেছি, পুষ্পের দ্রব্য পুষ্পকে ফিরাইয়া দিও।

"পুষ্পকে রত্নটী ফিরাইয়া দিব বলিয়াছিলাম, কিন্তু সেটী অনেক খুঁজিয়াও পাই নাই, আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। যদি তুমি পুষ্পের নিকট হইতে সেটী কাড়িয়া লইয়া থাক, পুষ্পকে ফিরাইয়া দিও।"

একবার, দুইবার, তিনবার, পুষ্প এই চিঠি পাঠ করিলেন। শেষে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—নির্ব্বোধ বালিকা, অঙ্গুরীয়টী সুন্দর দেখিয়াছিল, সেইজন্য চুরি করিয়াছিল।

বালিকা পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু গৃহের কার্য্য করিতে শিখিল না। সর্ব্বদা পর্ব্বত ও উপত্যকায় বেড়াইত, আর একাকী সেই হ্রদতটে বসিয়া গান করিত। পালের অন্যান্য ভীল-নারীগণ তাহাকে গালি দিত, তাহার স্বভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিল না।

সেই চম্পনপ্রদেশে অনেকদিন অবধি নির্জ্জন কন্দরে ও উন্নত শিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটী রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যূষে, পথিকগণ কখন কখন সেই পর্ব্বতহ্রদের তীরে একটী রমণীয় পাণ্ডু মুখ ও উজ্জ্বল নয়ন দেখিতে পাইত। লোকে বলিত, কোন বিশ্রামশূন্যা, উদ্বিগ্না প্রেতকন্যা হইবে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

প্রতিকূলতামুপগতেহি বিধৌ বিফলত্বমেতি
বহুসাধনতা।
অবলম্বনায় দিনভর্ত্তুরভূৎ ন পতিষ্যাতঃ
করসহস্রমপি॥
—শিশুপালবধম্।

১৫৯৭ খৃঃ অব্দে প্রতাপের মৃত্যু হয়*। তাহার পর সম্রাট আকবর প্রায় আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; তিনি জীবিত থাকিতে মেওয়ার বিজয়ের আর কোন উদ্যম হয় নাই।

---

* যে ইতিহাস অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচিত হইল, সেই ইতিহাস হইতে প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে দুই একটী মন্তব্য এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

"Pertap succeeded to the titles and renown of an illustrious house, but without a capital, without resources his kindred and clans dispirited by reverses; yet possessed of the noble spirit of his race, he meditated the recovery of Cheetore, the vindication of the honour of his house, and the restoration of its power. Elevated with his design, he hurried into conflict with his powerful antagonist, nor stooped to calculate the means which were opposed to him. Accustomed to read in his country's annals the splendid deeds of his forefathers, and that Cheetore had more than once been the prison of their foes, he trusted that the revolution of fortune might co-operate with his own efforts to overturn the unstable throne of Delhi. The reasoning was as just as it was noble; but whilst he gave a loose to those lofty aspirations which meditated liberty to Mewar, his crafty opponent was counteracting his views by a scheme of policy which, when disclosed, filled his heart with anguish. The wily Mogul arrayed against Pertap his kindred in faith as well as blood. The princes of Marwar, Amber, Bikaneer and even Boondi late his firm ally, took part with Akbar and upheld despotism. Nay, even his own brother, Sagarji, deserted him, and received, as the price of his treachery the ancient capital of his race, and the little which that possession conferred.

"But the magnitude of the peril confirmed the fortitude of Pertap, who vowed, in the words of the bard 'to make his mother's milk resplendent'; and he amply redeemed his pledge. Single-handed, for a quarter of a century did he withstand the combined efforts of the empire; at one time carrying destruction into the plains, at another flying from rock to rock, feeding his family from the fruits of his native hills, and rearing the nursing hero Umra, amidst savage beasts and scarce less savage men a fit heir to his prowess and revenge. The bare idea that 'the son of Bappa Rawul should bow the head to mortal man', was unsupportable; and he spurned every overture which had submission for its basis, or the degradation of uniting his family by marriage with the Tatar, though lord of countless multitudes.

The brilliant acts he achieved during that period live in every valley: they are enshrined in the heart of every true Rajpoot, and many are recorded

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মেওয়ার বিজয়ের উদ্যম করিতে লাগিলেন। প্রতাপের সপ্তদশ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অমরসিংহ প্রতাপের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপ মৃত্যুকালে অমরসিংহকে চিরকাল দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া যান, অমরসিংহও মুমূর্ষু পিতার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের যতদূর সাধ্য, পিতার এই আদেশ পালন করিলেন, জাহাঙ্গীরের অনন্ত সৈন্যের সহিত অমরসিংহ ষোড়শ বৎসর যুদ্ধে যুঝিলেন, মোগল-সৈন্য পরাস্ত করিয়া দেশ রক্ষা করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের ভ্রাতা সাগরজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া চিতোরে প্রেরণ করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহ দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, আর তিনি স্বয়ং মোগলের অধীন হইয়া চিতোরদুর্গ রক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তা সাগরজী সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্রকে চিতোরদুর্গ দিয়া স্বয়ং জাহাঙ্গীরের নিকট যাইয়া রোষে, অভিমানে আত্মহত্যা করিলেন।

এতদিনে চিতোর উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু মোগলদিগের সহিত আর যুদ্ধ করা অসম্ভব। প্রতি যুদ্ধে অমরসিংহের সৈন্য ও অর্থনাশ হইতে লাগিল, তিনি বিজয়লাভ করিয়াও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন, তাহা পূরণ করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যের যতদূর সাধ্য, অমরসিংহ ততদূর চেষ্টা করিলেন, অবশেষে ১৬১৩ খৃঃ অব্দে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সম্রাটের পুত্র সুলতান কুর্ম্মের নিকট তিনি অধীনতা স্বীকার করিলেন, পরে নিজপুত্র করুণকে সুলতানের সহিত আজমীরে জাহাঙ্গীরের শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

সুলতান কুর্ম্ম (যিনি পরে শাহজিহান নামে ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করেন) যুবরাজ করুণকে লইয়া আজমীরে যাইলেন। এতদিন পর মেওয়ার বিজয় হওয়াতে জাহাঙ্গীর অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, ও যুবরাজ করুণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যুবরাজকে আপন আসনের দক্ষিণদিকে আসন দিলেন, অনেক খিল্লৎ ও বহুমূল্য উপহার দান করিলেন, এবং সঙ্গে করিয়া রাজ্ঞী নুর্জ্জহানের নিকট লইয়া গেলেন। নুর্জ্জহান নাম জগদ্বিখ্যাত, তিনি যেরূপ সুন্দরী ছিলেন, সেইরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্বামীকে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্য ও চতুরতায় বিমোহিত করিয়া রাখিতেন, অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

---

in the annals of the conquerors. To recount them all or relate the hardships he sustained, would be to pain what they would pronounce a romance who had not traversed the country where tradition is yet eloquent with his exploits, or conversed with the descendants of his chiefs, who cherish a recollection of the deeds of their forefathers, and melt as they recite them, into manly tears.

"It is worthy the attention of those who influence the destinies of states in more favoured climes, to estimate the intensity of feeling which could arm this prince to oppose the resources of a small principality against the then most powerful empire of the world, whose armies were more numerous and far more efficient than any ever led by the Persian against the liberties of Greece. Had Mewar possessed her Thucydides or her Xenophon, neither the wars of the Peloponnesus nor the retreat of the 'Ten Thousand' would have yielded more diversified incidents for the historic muse, than the deeds of this brilliant reign amid the many vicissitudes of Merwar. Undaunted heroism, inflexible fortitude that which 'keeps honour bright', perseverance,—with fidelity such as no nation can boast, were the materials opposed to a soaring ambition, commanding talents, unlimited means, and the fervour of religious zeal; all however, insufficient to contend with one unconquerable mind. There is not a pass in the alpine Aravali that is not sanctified by some deed of Pertap,—some brilliant victory or oftener, more made glorious of defeat, Huldighat is the Thermopylae of Mewar; the field of Deweir her Marathon." —"Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan."

নুর্জ্জিহান যুবরাজ করুণকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং খিল্লৎ, হস্তী, ঘোটক, অসি প্রভৃতি নানাদ্রব্য দান করিয়া যুবরাজের মনস্তুষ্টি করিলেন। সম্রাট ও রাজ্ঞী উভয়ে যতদূর সাধ্য যুবরাজের সম্মান করিলেন, কিন্তু প্রতাপসিংহের পৌত্রের ললাট পরিষ্কার হইল না। প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ স্বদেশের রাজা ছিলেন; অমরসিংহ ও করুণ এক্ষণে স্বদেশের জায়গীরদার! আজমীরের মহা ধুমধামের মধ্যে, ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর সমাদর ও সম্মানের মধ্যে, করুণের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, করুণের ললাট মেঘাচ্ছন্ন!

এইরূপ বহু সম্মান ও উপহার দিয়া সম্রাট করুণকে বিদায় দিলেন। সম্রাট স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি করুণকে এই সাক্ষাতে সর্ব্বসুদ্ধ দ্বাদশ লক্ষ টাকার উপহার ও একশত দশটী অশ্ব ও পাঁচটী হস্তী দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সুলতান কুর্ম্ম অন্য উপহার দিয়াছিলেন।

করুণ বিদায় পাইয়া স্বদেশাভিমুখে চলিয়া গেলেন, দিনের ধুমধাম শেষ হইল। রজনীতে জাহাঙ্গীর নুর্জ্জিহানের নিকট যাইয়া হাস্য করিয়া কহিলেন,—করুণ কখনও সম্রাটের সভা দেখে নাই, সেই জন্য লজ্জাশীল ও সর্ব্বদা নতশির।

লাবণ্যময়ী নুর্জ্জিহান তাহার একটী সুধার হাসি হাসিয়া পতির দিকে আয়তনয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—সম্রাট, তাহা নহে, আমাদের সৈন্যবলে মেওয়ার অধীন হইয়াছে, কিন্তু চিরস্বাধীন শিশোদীয়দিগের এখনও অধীনতা অভ্যাস হয় নাই।

নুর্জ্জিহানের কথা যথার্থ। অমরসিংহ প্রতাপসিংহের পুত্র, অধীনতা সহ্য করিতে পারিলেন না। সুলতান কুর্ম্ম যখন দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মান দিতে আসিলেন, অমরসিংহ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুলতান কুর্ম্ম মানসিংহের ভাগিনেয়, রাজপুত মাতার পুত্র, তিনি রাজপুতের উচিত সম্মান জানিতেন। তিনি অমরসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন—আমি কেবল মহারাণার বন্ধুত্ব চাহি, আর কিছু চাহি না।

মহারাণা আপন রাজধানী হইতে বাহিরে আসিয়া কেবল দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মান গ্রহণ করুন, আমি মেওয়ার প্রদেশ হইতে মুসলমান-সৈন্যসামন্ত বাহিরে লইয়া যাইব।

বিজিত রাজাকে কেহ এরূপ সম্মান করে না। তথাপি মহারাণা বিজিত, এক্ষণে দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মানবলে দেশ শাসন করিতে হইবে, একথা অমরসিংহ মনে স্থান দিতে পারিলেন না। তিনি পিতার নিকট যে সত্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেন, ফর্ম্মান গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অমরসিংহ আপনার যোদ্ধাদিগকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। চোহান ও রাঠোর, ঝালা, প্রমর ও শিশোদীয়, সকলে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তেজসিংহ উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চাশৎ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু শরীর পূর্ব্ববৎ দীর্ঘ, ঋজু ও বলিষ্ঠ। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার বালক গজপতিসিংহ* পিতার বীর্য্য অনুকরণ করিতে শিখিতেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহের নাম রাখিতে শিখিতেছিলেন।

দূত আসিয়া নিবেদন করিল, রাজধানীর দ্বারদেশে সুলতান কুর্ম্ম উপস্থিত আছেন, মহারাণা যাইলে ফর্ম্মান দান করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সভাস্থ সকলে নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক। অনেকক্ষণ পর সমস্ত যোদ্ধার সম্মুখে অমরসিংহ পুত্র করুণের ললাটে রাজটীকা দিলেন। কহিলেন,—প্রতাপসিংহের পুত্র পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইবেন না, অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য করিবেন না। যুবরাজ অদ্য হইতে রাজা হইলেন, আমি বৃদ্ধ, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলাম।

সেইদিন (খৃঃ ১৬১৬) অমরসিংহ রাজধানী উদয়পুর ত্যাগ করিয়া নচৌকী নামক স্থানে যাইয়া বাস করিলেন। তাহার পর তিনি পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আর রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই, রাজদণ্ড গ্রহণ করেন নাই।

---

* যাঁহারা গজপতিসিংহের কথা জানিতে চাহেন, তাঁহারা "মাধবীকঙ্কন" আখ্যায়িকা পাঠ করিবেন।

সংসার

প্রথম পরিচ্ছেদ : গরীবের ঘরের দুটি মেয়ে

বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে সুন্দর পথ গিয়াছে, সেই পথের অনতিদূরে একটি বড় পুষ্করিণী আছে। অনুমান শত বৎসর পূর্ব্বে কোন ধনবান জমীদার প্রজাদিগের হিতার্থ এবং আপনার কীর্ত্তিস্থাপনের জন্য সেই সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন; সেকালে অনেক ধনবান লোকই এরূপ হিতকর কার্য্য করিতেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাবধি বঙ্গদেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর চারিদিকে উচ্চ পাড় ঘন তাল গাছে বেষ্টিত, এত ঘন যে দিবাভাগেও পুষ্করিণীতে ছায়া পড়ে, সন্ধ্যার সময় পুষ্করিণী প্রায় অন্ধকারপূর্ণ হয়। নিকটে কোনও বড় নগর নাই, কেবল একটী সামান্য পল্লী আছে, তাহাতে কয়েক ঘর কায়স্থ, দুই চারিঘর ব্রাহ্মণ ও দুই চারিঘর কুমার, এক ঘর কামার, ও কতকগুলি সদ্গোপ ও কৈবর্ত্ত বাস করে। একখানি মুদির দোকান আছে, তাহাতে গ্রামের লোকের সামান্য খাদ্যদ্রব্যাদি যোগায়, এবং তথা হইতে এক ক্রোশ দূরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া একটী হাট বসে, বস্ত্রাদি আবশ্যক হইলে গ্রামের লোক সেই হাটে যায়! পুষ্করিণীর নাম "তালপুকুর" এবং সেই নাম হইতে গ্রামটীকেও লোকে তালপুকুর গ্রাম বলে।

বৈশাখ মাসে একদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের একজন নারী কলস লইয়া সেই পুকুরে গিয়াছিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুইটী কন্যাও গিয়াছিল।

রমণীর বয়স ৩৫ বৎসর হইবে, বড় কন্যাটির বয়স ৯ বৎসর, ছোটটীর বয়স ৪ বৎসর হইবে।

সন্ধ্যার সময় সে পুকুর বড় অন্ধকার হইয়াছে এবং সেই অন্ধকারে সেই ভীম বৃক্ষশ্রেণী আকাশে কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে ও সেই অন্ধকারময় তালবৃক্ষগুলি সাঁই সাঁই করিয়া শব্দ করিতেছে, নির্জ্জনে সে শব্দ শুনিলে সহসা মন স্তম্ভিত হয়।. পুকুরে আর কেহ নাই, রমণী ঘাটে নামিয়া কলসী নামাইলেন, মেয়ে দুটীও মার নিকটে দাঁড়াইল।

কলস নামাইয়া নারী একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দিনের পরিশ্রমের পর একবার বিশ্রামসূচক দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করিলেন। আকাশের অল্প আলোক সেই শ্রান্ত নয়নদ্বয়ে পতিত হইল, সন্ধ্যার বায়ু সেই পরিশ্রমে ক্লান্ত ঈষৎ স্বেদযুক্ত ললাট শীতল করিল এবং সেই চিন্তান্বিত মুখ হইতে দুই একটী চুলের গুচ্ছ উড়াইয়া দিল। নারী দিনের পরিশ্রমের পর একবার আকাশের দিকে চাহিয়া, সেই শীতল বায়ুস্পৃষ্ট হইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বলিলেন,

"মা বিন্দু, একবার সুধাকে ধর ত, আমি একটা ডুব দিয়ে নি।"

বিন্দুবাসিনী। "মা আমি ডুব দেব।"

মাতা। "না মা, এত সন্ধ্যার সময় কি ডুব দেয়, অসুখ করবে যে।"

বিন্দু। "না মা, অসুখ করবে না, আমি ডুব দেব।"

মাতা। "ছি মা, তুমি সেয়ানা হয়েছ, অমন করে কি বায়না করে? তুমি জলে নামলে আবার সুধা ডুব দিতে চাইবে, ওর আবার অসুখ করবে। সুধাকে একবার ধর, আমি এই এলুম বলে!"

মাতার কথা অনুসারে নবম বৎসরের বালিকা ছোট বোনটীকে কোলে করিয়া ঘাটে বসিল। সন্ধ্যাকালের অন্ধকার সেই ভগিনী দুটীকে বেষ্টন করিল, সন্ধ্যার সমীরণ সেই অনাথা দরিদ্র বালিকা দুটীকে সযত্নে সেবা করিতে লাগিল। জগতে তাহাদের যত্ন করিবার বড় কেহ ছিল না, মুখ তুলিয়া তাহাদের পানে চাহে, একটু মিষ্ট কথা বলিয়া একটু সান্ত্বনা করে, এরূপ লোক বড় কেহ ছিল না।

বিন্দুবাসিনীর মাতা কায়েতের মেয়ে, হরিদাস মল্লিক নামক একটী সামান্য অবস্থার লোকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার ২০।২৫ বিঘা জমি ছিল, কিন্তু কায়স্থ বলিয়া আপনি চাষ করিতে পারিতেন না, লোক দিয়া চাষ করাইতেন, লোকের মাহিনা দিয়া জমীদারের খাজনা দিয়া বড় কিছু থাকিত না; যাহা থাকিত, তাহাতে ঘরের খরচের ভাতটা হইত মাত্র। অনেক

কষ্ট করিয়া অন্য কিছু আয় করিয়া কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। তারিণীচরণ মল্লিক নামক তাঁহার একটী খুড়তুত ভাই বৰ্দ্ধমানে চাকরী করিতেন, কিন্তু এক্ষণে খুড়তুত ভায়ের নিকট সহায়তা প্রত্যাশা করা বৃথা, আপনার ভায়ের নিকট কদাচ সহায়তা পাওয়া যায়। তবে বিপদ-আপদের সময় তাঁহাকে অনেক ধরিয়া পড়িলে ৫।১০ টাকা কৰ্জ্জ পাইতেন, শোধ করিতে পারিলে তিনি ভাই বলিয়া সুদটা ছাড়িয়া দিতেন। বিবাহের প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পরে তাঁহার একটী কন্যা হয়, এতদিনের পরের সন্তান বলিয়া বিন্দুবাসিনী পিতামাতার বড় আদরের মেয়ে হইল। কিন্তু আদরে পেট ভরে না, বিন্দু গরীবের ঘরের মেয়ে, আদর ও পিতামাতার ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু পাইল না। বিন্দুর বড় জ্যেঠা তারিণী বাবু যখন পূজার সময় বাটীতে আসিতেন, তখন মেয়ের জন্য কেমন ঢাকাই কাপড়, কেমন হাতের নূতন রকমের সোণার চুড়ি, কেমন কাণের কাণবালা আনিতেন, বিন্দুর বাপমা অনেক কষ্টে মেয়ের জন্য দুগাছি অতি সরু সোণার বালা ও দুই পায়ে দুই গাছি রূপার মল গড়াইয়া দিলেন। বিন্দুর বাপের সেজন্য কিছু ধার হইল, অনেক কষ্টে সে ধার শোধ করিতে পারিলেন না, একটী গরু বিক্রয় করিয়া তাহা পরিশোধ করিলেন। বিন্দু জ্যেঠাইমার মেয়ের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিতে যাইত। বিন্দু ভাল মানুষ, কখনও সে কাহাকে রাগ করিয়া কথা বলিত না, সুতরাং সেও বিন্দুকে ভালবাসিত, কখন কখন সন্দেশ খাইতে খাইতে একটু ভাঙ্গিয়া দিত, কখন মেলায় অনেক পুতুল কিনিলে একটী শোলার পুতুল দিত। বিন্দুর আনন্দের সীমা থাকিত না, বাড়ীতে আসিয়া কত হর্ষের সহিত মাকে দেখাইত; বিন্দুর মা বিন্দুকে চুম্বন করিতেন, আর নিজের চক্ষের একবিন্দু জল মোচন করিতেন।

বিন্দুর জন্মের পাঁচ বৎসর পরে তাহার একটী ভগিনী হইল। বড় মেয়েটী একটু কাল হইয়াছিল, ছোট মেয়ের রং পরীর মত, চক্ষু দুটী কাল কাল ভ্রমরের ন্যায় সুন্দর ও চঞ্চল, মাথায় সুন্দর কাল চুল, লাল ঠোঁট দুটীতে সদাই সুধার হাসি। গরীবের এ অমূল্য ধনকে গরীব বাপ মা চুম্বন করিয়া তাহার সুধাহাসিনী নাম দিলেন। কিন্তু ভালবাসা ভিন্ন সুধার আর কিছু জুটিল না, বরং দুইটী মেয়ে হওয়াতে বাপমার আরও কষ্ট বাড়িল। ছোট মেয়ের জন্য একটু দুধ চাই; এমন সুন্দর মেয়ের হাত দুখানি খালি রাখা যায় না, দুই একখানা গহনা হইলে ভাল হয়, পাড়াপড়শীর বাড়ী লইয়া যাইবার সময় একখানি ঢাকাই কাপড় পরাইয়া লইয়া গেলে ভাল হয়। কিন্তু এ সব ইচ্ছা পূরণ হয় কোথা থেকে? বাপমার মনে কত সাধ হয়, কিন্তু উপায় কৈ? গরীব দুঃখীর আবার কিসের সাধ?

এইরূপে বিন্দুর পিতা অনেক কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, বিন্দুর মাতা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া স্বামীর সেবা ও কন্যা দুটিকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া বাসন ধুইতেন, ঘর ঝাট দিতেন, উঠান পরিষ্কার করিতেন, কন্যা দুটীকে খাওয়াইতেন, স্বামীর জন্য রন্ধন করিতেন। স্বামীর ভোজনান্তে পুকুরে যাইয়া স্নান করিতেন ও জল আনিতেন। দ্বিপ্রহরে আহার করিয়া কন্যা দুটীকে লইয়া সেই সুন্দর বৃক্ষের ছায়ায় ভূমিতে কাপড় পাতিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেন। আবার বৈকালবেলা পুনরায় রন্ধনাদি সংসারকার্য্য করিতেন। তথাপি এ সংসারে বিন্দুর মাতা অপেক্ষা কয়জন সুখী? লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গৃহস্থের মধ্যে বিন্দুর মাতা একজন, তাঁহার কষ্ট থাকিলেও তিনি সদাশিবের ন্যায় স্বামী পাইয়াছিলেন, হৃদয়ের মণির ন্যায় দুইটী কন্যা পাইয়াছিলেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইলেও তিনি সেই শান্ত সংসারে কতকটা শান্তি ভোগ করিতেন, দরিদ্রা রমণী ইহা অপেক্ষা সুখ আশা করেন না।

কিন্তু তাঁহার এ সুখ ও শান্তি অধিক দিন রহিল না। দারুণ বিধির বিড়ম্বনা! সুধার জন্মের তিন বৎসর পরে হরিদাসের কাল হইল। হতভাগিনী সুধার মাতা তখন ললাটে করাঘাত করিয়া হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনিতে সে ক্ষুদ্র পল্লী কাঁপাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ভগবান কেন এ দরিদ্রের একটী ধন কাড়িয়া লইলেন—কেন এ হতভাগিনীর একটী সুখ হরণ করিলেন—এ আঁধারের একটী দীপ নির্ব্বাণ করিলেন? বিধবার আর্ত্তনাদ শুনিয়া গ্রামের লোক জড় হইল, চাষা মজুরগণ সেই পথ দিয়া যাইবার সময় একটু একটু অশ্রুবর্ষণ করিয়া গেল।

তাহার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। হরিদাসের যে জমি ছিল তাহা তারিণীবাবু এখন চাষ করান, বৎসরের শেষে হাত তুলিয়া যাহা দেন, বিন্দুর মাতা তাহাই পান। তাহাতে

উদরপূর্ত্তি হয় না, মেয়ে দুটীকে মানুষ করা হয় না, ঘরের বেড়া দেওয়া হয় না, বৎসর বৎসর চাল ছাওয়া হয় না। বিন্দুর মাতা তখন সেই জীর্ণ কুটীর বিক্রয় করিয়া ভাসুরের ঘরে আশ্রয় লইলেন। সে বাড়ীর রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইত, তিনি বিন্দু ও সুধাকে ফেলিয়া বাড়ীর ছেলেদের কোলে করিয়া থাকিতেন, তাহাদের জল আনিতেন, বাসন মাজিতেন, ঘর ঝাট দিতেন। তাহা ভিন্ন আশ্রিত লোকের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বিন্দুর মাতা কটু কথার উত্তর দিতেন না, তিরস্কারে ক্ষুণ্ণ হইতেন না, কখন কখন তাঁহার মৃত স্বামীর নিন্দা করিলে বা পিতাকে নাম ধরিয়া গালি দিলে তিনি নীরবে পাকঘরে আসিয়া চক্ষুর জল মুছিতেন। ভাবিতেন, "আহা! আমার বিন্দু ও সুধা মানুষ হউক, হে বিধাতা, তুমি ওদের কপালে সুখ লিখিও, আমার শরীরে সব সয়, আমি নিজের দুঃখ নিজের অপমান গ্রাহ্য করি না। আহা! যেন বিন্দু ও সুধাকে বিবাহ দিয়া উহাদের সুখী দেখিয়া মরি, তাহা হইলেই আমার সুখ।"

রমণী ডুব দিয়া উঠিয়া, এক কলস জল কাঁকে লইয়া বলিলেন, "আয় মা বিন্দু, ঘরে আয়, সুধাকে কোলে নে, আহা বাছার ননীর শরীর এইটুকু এসে ক্লান্ত হইয়াছে। আহা, বাছা যে ছেলেমানুষ, হাঁটতে পারবে কেন? ও কি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?"

বিন্দু। "হ্যাঁ মা, ঘুমিয়ে পড়েছে, এই আসি, কোলে করে নিয়ে যাই।"

মাতা। "না না, ঘুমিয়ে ভারি হয়েছে, আমার কোলে দে, তুই মা আমার আঁচল ধরে পথ দেখে দেখে আয়, বড় অন্ধকার হয়েছে, একটু একটু মেঘ হয়েছে, রাত্রিতে বোধ হয় জল হইবে।"

বিন্দু। "না মা, আমিই কোলে নি, সে দিন ঘোষেদের বাড়ী থেকে রাত্রিতে সুধাকে কোলে করে এনেছিলাম, আর আজ এই ঘাট থেকে ঘরে নে যেতে পারবো না? ঐ ত রান্না ঘরের আলো দেখা যায়।"

মাতা। "তবে নে বাছা, কিন্তু দেখিস মা, সাবধানে আনিস, বড় অন্ধকার, যেন পড়ে যাসনি। ঐ সেদিন তোর জ্যেঠাইমার মেয়ে উমাতারা রাত্রিবেলা মেলা থেকে আস্‌ছিল, পথে পড়ে গিয়েছিল, আহা বাছার কপালটা এতখানি কেটে গিয়েছে।"

বিন্দু। "মা, উমাতারা কোন্ মেলায় গিয়েছিল? কেমন সুন্দর সুন্দর পুতুল এনেছিল, একটী কাঠের ঘোড়া এনেছিল, আর একটা মাটীর সিংহ এনেছিল, আর একটা কেমন কল এনেছিল, সেটা ঘোরে। সে সব কোথা থেকে এনেছিল মা?"

মাতা। "তা জানিস্‌নি? ঐ ওরা যে অগ্রদ্বীপের মেলায় গিয়েছিল, সেখানে বছর বছর ভারি মেলা হয়, কত হাজার হাজার লোক যায়, কত বৈষ্ণব খাওয়ান হয়, কত গানবাজনা হয়, কত দেশের লোক সেখানে যায়।"

বিন্দু। "মা, তুমি কখনও সেখানে গিয়াছিলে?"

মাতা। "গিয়েছিলাম বাছা, যখন আমি ছোট ছিলাম, একবার আমার বাপমা গিয়েছিলেন, আমরা বাড়ীসুদ্ধ গিয়েছিলাম, সেখানে তিন চারিদিন ছিলাম, একটা গাছতলায় বাসা করে ছিলাম।"

বিন্দু। "কেন ঘর ছিল না? গাছতলায় বাসা করেছিলে কেন মা?"

মাতা। "সেখানে কত হাজার হাজার লোক যায়, ঘর কোথায়? সকলেই গাছতলায় বাসা করে। একটা ভারি আঁব বাগান আছে, তাহার নীচে মেলা হয়, কত রাজ্যের দোকানিপসারি আসে, কত দেশের জিনিস বিক্রী হয়।"

বিন্দু। "মা, আমি একবার যাব, আমার বড় দেখতে ইচ্ছা হয়।"

মাতা। "আমার কি তেমন কপাল আছে মা যে, তোকে নিয়ে যাব? কত টাকা খরচ হয়।"

বিন্দু। "না মা, আমি আর বৎসর যাব। উমাতারারা দেখেছে, আমি কেন যাব না?"

মাতা। "ছি মা, তুমি সেয়ানা মেয়ে, অমন করে কি বায়না করে? তোর জ্যেঠাইমারা বড় মানুষ, তাঁহার মেয়ে যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে যায়। তোরা মা গরীবের ঘরের মেয়ে, তোদের কি বাছা বায়না করলে সাজে? আহা, ভগবান যদি তোদের কপালে সুখ লিখিত, তাহা হইলে কি আর অন্নবস্ত্রের জন্য তোদের এমন লালায়িত হইতে হয়? তাহা হইলে কি আমার সোণার পুতুলেরা যেন পথের কাঙ্গালীর মত দ্বারে দ্বারে ফেরে? হা ভগবান! তোমারই ইচ্ছা!"

চারি দিকে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছে, পশ্চিম দিকে কাল মেঘ উঠিয়াছে, আকাশ হইতে এক

একবার বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে, অন্ধকারময় বৃক্ষের পত্রের মধ্য দিয়া শব্দ করিয়া নিশার বায়ু বহিয়া যাইতেছে। গ্রাম প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে, কেবল এক একবার বৃক্ষের উপর হইতে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; অথবা দূর হইতে শৃগালের রব শুনা যাইতেছে। সমস্ত জগৎ অন্ধকার, কেবল মেঘের ভিতর দিয়া দুই একটী হীনতেজ তারা এখনও দৃষ্ট হইতেছে, গ্রাম হইতে দুই একটী প্রদীপ বা চুলার আগুন দেখা যাইতেছে, আর এক এক বার অল্প অল্প বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে। সেই অন্ধকারে সেই বৃক্ষের নীচে গ্রাম্য পথ দিয়া বিন্দু মার আঁচল ধরিয়া নিঃশব্দে যাইতেছিল, যদি সে অন্ধকারে বিন্দু কিছু দেখিতে পাইত, তবে সে দেখিত মাতার চক্ষু হইতে ধীরে ধীরে দুই একটী অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দুই ভগিনী

তালপুকুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারিদিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারিদিকের ক্ষেত্র চাষ দিয়াছে, গরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই এক জন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহিণী বা কন্যা বা ভগিনী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ী হইতে ভাত লইয়া যাইতেছে। চারিদিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুকুর গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারিদিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং তাহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ হইয়া ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলী বৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার মনসা প্রভৃতি কাঁটা গাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্য পথ পূরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বত্থ বা বট গাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের বাগান ২০।৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগে সেই স্থান অন্ধকারপূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষিগণ কুলায়ে নীরব হইয়া রহিয়াছে, কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর সেই আম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

সেই তালপুকুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাঁশঝাড় ও আম কাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটী ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটী ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫।৬টী নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের একপার্শ্বে একটী মাচানের উপর লাউ গাছে লাউ হইয়াছে, অপর দিকে কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর আছে, তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লেপা। পার্শ্বে একটী রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটী গোয়ালঘরে একটী মাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ীর লোকদের খাওয়াদাওয়া হইয়া গিয়াছে, উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই একখানি কাপড় শুকাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটী তক্তাপোষ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে। পশ্চাতে একটী ডোবায় কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকখানি পিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও মাজা হয় নাই। ডোবার পার্শ্বে দুই একটী কুল গাছ, কয়েকটী কলা গাছ, ও একটী আঁব গাছ, আর অনেক কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষ ও জঙ্গল। এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটী ছায়াপূর্ণ ও শীতল।

শুইবার ঘরের বেড়া বন্ধ, ভিতরে অন্ধকার; সেই অন্ধকারে বাড়ীর গৃহিণী নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহার একটী তিন বৎসরের কন্যা ভূমিতে মাদুরের উপর ঘুমাইয়া আছে, আর একটী ছয় মাসের পুত্রসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া রমণী ধীরে ধীরে সেই ঘরে বেড়াইতেছেন। এক এক বার ছেলেকে চাপড়াইতেছেন, এক এক বার গুণ্ গুণ্ শব্দে ঘুম পাড়াইবার ছড়া গাহিতেছেন, আবার নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছেন।

নারীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর, শরীর ক্ষীণ, মুখখানি প্রশান্ত, কিন্তু একটু শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটী বিশাল ও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ধীর ও চিন্তাশীল। অষ্টাদশ বৎসরের রমণীর যেরূপ বর্ণনা আমরা উপন্যাসে পাঠ করি, তাহার কিছু ইঁহার নাই, সে প্রফুল্লতা, সে উদ্বেগ, সে উজ্জ্বল

সৌন্দর্য্য নাই। উপন্যাস-বর্ণিত সুখ সকলের কপালে ঘটে না, উপন্যাস-বর্ণিত সৌন্দর্য্য সকলের থাকে না। এই বিশাল সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, দুই একজন ঐশ্বর্য্যের সন্তানকে ছাড়িয়া দিয়া সহস্র সহস্র দরিদ্র গৃহস্থ ভদ্রলোকের সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, আমাদিগের দরিদ্র ভগিনী বা কন্যা বা আত্মীয়গণ কিরূপে সুখে, দুঃখে, কষ্টে, সহিষ্ণুতায়, সংসারযাত্রা করেন, চাহিয়া দেখ, দেখিয়া বল, ছার উপন্যাসের কাল্পনিক অলীক সুখ কয়জনের কপালে ঘটিয়াছে, রূপার ঝিনুক ও গরম দুধ মুখে করিয়া কয়জন এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্ষণেক বেড়াইতে বেড়াইতে শিশু নিদ্রিত হইল, মাতা নিদ্রিত শিশুকে সযত্নে মেজেতে মাদুরের উপর শোয়াইয়া আপনি নিকটে বসিয়া ক্ষণেক পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। সেই ঘরের স্তিমিত আলোক সেই প্রশান্ত ঈষৎ চিন্তাশীল ললাটের উপর পড়িয়াছে। স্থির প্রশান্ত, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুইটী সেই শিশুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, নয়নে মাতার স্নেহ, মাতার যত্ন বিরাজ করিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতার চিন্তা ও মাতার অসীম সহিষ্ণুতা লক্ষিত হইতেছে। শরীরখানি ক্ষীণ কিন্তু সুগঠিত। ক্ষীণ সুগঠিত বাহু দ্বারা নারী ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিলেন, আর সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরে বসিয়া তাঁহার কত চিন্তা উদয় হইতেছিল। সংসারের চিন্তা, এই সুখদুঃখপূর্ণ জগতের চিন্তা, আর কখন কখন পূর্ব্বকালের চিন্তা ও স্মৃতি ধীরে ধীরে সেই রমণীর হৃদয়ে উদয় হইতেছিল।

ছেলে বেশ ঘুমাইয়াছে। তখন মাতা পাখাখানি রাখিয়া আপন বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া ছেলের পার্শ্বে মাটীতে শুইলেন, নয়ন দুইটী ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, তিনি অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সে ঘরটীও নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতায় সন্তান দুইটীর পার্শ্বে স্নেহময়ী মাতা নিদ্রিত হইলেন। সংসারের অশেষ ভাবনা ক্ষণেক তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল, সেই শান্ত, সহিষ্ণু, চিন্তাশীল মুখমণ্ডল ও ললাট হইতে চিন্তার দুইটী রেখা অপনীত হইল।

রমণী দুই তিন দণ্ড এইরূপ নিদ্রিত রহিলেন। পরে একটু শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্বে একটী প্রফুল্ল-নয়না, হাস্যবদনা, সৌন্দর্য্য-বিভূষিতা বালিকা বসিয়া একটী বিড়াল-শিশুর সঙ্গে খেলা করিতেছে, তাহারই শব্দ। বিড়াল-শিশু লাফাইয়া লাফাইয়া বালিকার হস্তের খেলিবার দ্রব্য ধরিতে চেষ্টা করিতেছে, বালিকা হস্ত টানিয়া লইতেছে। সে সুন্দর গৌরবর্ণ চিন্তাশূন্য ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ চুল পড়িতেছে, সরিয়া যাইতেছে, আবার পড়িতেছে; সেই প্রফুল্ল, অতি উজ্জ্বল, কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুটী যেন উল্লাসে হাসিতেছে, সে বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠ দুইটী হইতে যেন সুধা ক্ষরিয়া পড়িতেছে, সেই সুগঠিত সুন্দর ললিত বাহুলতা বায়ু-সঞ্চালিত লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু তাহার প্রফুল্ল মুখখানি ও হাস্যবিস্ফারিত নয়নদ্বয়, তাহার চিন্তাশূন্য মন ও উদ্বেগশূন্য হৃদয় বালিকারই বটে, নারীর নহে।

রমণী অনেকক্ষণ সেই প্রেমের পুত্তলির দিকে চাহিয়া রহিলেন, সেই বালিকা ও বিড়াল-শিশুর খেলা ক্ষণেক দেখিতে লাগিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"সুধা, তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

সুধা। "দিদি, আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তুমি ঘুমচ্ছিলে, তাই জাগাইনি। আর দেখ দিদি এই বেড়াল ছানাটা আমি যেখানে যাব, সেইখানেই যাবে, আমি রান্নাঘরে বন্ধ করে বাসন মাজতে গেলুম, ও আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল।"

বিন্দু। "বাসন মাজা হয়েছে? বাসনগুলি সব ঘরে বন্ধ করে রেখে এসেছ ত?"

সুধা। "হাঁ, সব মেজে রেখে এসেছি। তারপর বেড়ালকে গোয়াল ঘরে বন্ধ করে এলুম, সে আবার সেখান থেকে বেড়া গ'লে এখানে এসেছে। ও আমার এই পুতুলটা নিতে চায়, তা আমি দিচ্চি এই যে।"

বিন্দু। "তা বোন এতক্ষণ এসেছ, একবার শোও না, গেল রাত্রিতে তোমার ভাল ঘুম হয়নি, একটু ঘুমোও না।"

সুধা। "না দিদি, আমার দিনে ঘুম হয় না, আমি রাত্রিতে বেশ ঘুমিয়েছিলুম। কেবল একবার খোকা যখন কেঁদেছিল, তখন আমার ঘুম ভেঙ্গেছিল। আজ খোকা কেমন আছে দিদি?"

বিন্দু। "এখন ত আছে ভাল, রাত্রি হলেই গা তপ্ত হয়। তা আজ তিনি কাটোয়া থেকে একটা ঔষধ আনবেন বলেছেন, তাতে একটু ঘুমও হবে, জ্বরও আসবে না।"

সুধা। "হেমচন্দ্র কখন আসবেন দিদি?"

বিন্দু। "বলেছেন ত সন্ধ্যার সময় আসবেন, কেন?"

সুধা। "তিনি এলে একটা মজা করব, তা দিদি তোমাকে বলব না, তিনি এলে দেখতে পাবে। যেমন আমার গায়ে সে দিন ফাগ দিয়েছিলেন।"

বিন্দু একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করবি, বল না।"

সুধা। "না দিদি, তুমি বলে দেবে।"

বিন্দু। "না, বলব না।"

সুধা। "সত্যি বলবে না?"

বিন্দু। "সত্যি বলব না।"

তখন সুধা আপন আঁচলে বাঁধা একটা জিনিস বাহির করিল। জিনিসটা প্রায় এক হস্ত দীর্ঘ!

বিন্দু। "ও কি লো? ওটা কি?"

সুধা। "দেখতে পাচ্চো না?"

বিন্দু। "দেখছি ত, এ কি পাট?"

সুধা। "হাঁ পাট, কিন্তু কেমন কুসুম ফুল দিয়ে রং করেছি।"

বিন্দু। "কেন, ওতে কি হবে?"

সুধা। "বল দিকি কি হবে?"

বিন্দু। "কি জানি?"

সুধা। "এইটে ঠাওরাতে পারলে না! যখন আজ রাত্রিতে হেমচন্দ্র একটু ঘুমুবেন, আমি এইটে তাঁর দাড়িতে বেঁধে দেব, তার পর উঠলে তাঁকে জটাধারী সন্ন্যাসী বলে ঠাট্টা করব। খুব মজা হবে।" এই বলিয়া বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

বিন্দু একটু হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সস্নেহে ভগিনীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "সুধা, তোর সুধার হাসিতে এ জগৎ মিষ্ট হয়। আহা! বালিকা এখন তাহার ভাঙ্গা কপালে কি হইয়াছে জেনেও জানে না! নিদারুণ বিধি! কেমন করে এই কচি ছেলের কপালে এ ভীষণ যাতনা লিখলে—কেমন করে এ প্রফুল্ল সুধাপাত্রে গরল মিশাইলে?"

বলা অনাবশ্যক যে আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে সময়ের কথা বলিতেছিলাম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহার নয় বৎসরের পরের কথা বলিতেছি। আমাদের গল্প এই সময় হইতে আরম্ভ। এই নয় বৎসরের ঘটনাগুলি কতক কতক উপরেই প্রকাশ হইয়াছে, আর দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

বিন্দুর মাতা আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া কষ্টে ও শোকে দুইটী অনাথা কন্যাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর এ সংসারে তিনি আর কোনও সুখের আশা রাখেন নাই, কিন্তু তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, মরিবার পূর্ব্বে দুইটী মেয়ের বিবাহ দিয়া যান। সে দিন তিনি দুইটী কন্যাকে লইয়া তালপুকুরে গিয়াছিলেন, তখন বিন্দুর বয়সও নয় বৎসর হইয়াছিল, সুতরাং তাহার মাতা বিবাহের পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গরিবের ঘরের মেয়ের শীঘ্র বিবাহ হয় না। কলিকাতায় বরের পিতা যেরূপ রাশি রাশি অর্থ চাহেন, পল্লীগ্রামে এখনও সেরূপ হয় নাই, কিন্তু তথাপি বড় ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করা সকলেরই সাধ, আত্মীয়ের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিয়া যিনি কন্যাকে লালনপালন করিতেছেন, তাঁহার মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে সকলের সাধ যায় না। আত্মীয়েরাও এবিষয়ে বড় মনোযোগ করিলেন না। কন্যাও গৌরবর্ণা ছিল না, তবে মুখে শ্রী ছিল, চক্ষু দুটী সুন্দর ছিল, শরীর সুগঠিত ছিল, কিন্তু ক্ষীণ। সম্বন্ধ আসিতে লাগিল ও একে একে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। মেয়ের জ্যেঠাইমা রকের উপর দুই পা মেলাইয়া বসিয়া বৈকালবেলা কেশবিন্যাস করিতে করিতে সহাস্যে বিন্দুর মাকে বলিলেন, (বিন্দুর মা চুলের দড়ি ধরিয়াছিলেন) "তা ভাবনা কি বোন, আমাদের বাড়ীর মেয়ের বের জন্য ভাবতে হয় না, আমাদের কুল, মান, বর্দ্ধমানে ভারি চাকরী, এ কে না জানে বল, কত তপিস্যে করলে তবে লোকে এমন বাড়ীর মেয়ে

পায়, তোমার আবার বিন্দুর বের ভাবনা? এই রস না, তিনি পূজার সময় বাড়ী আসুন, আমি বিন্দুর এমন সম্বন্ধ করে দেব যে কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয়নি, এর মধ্যে কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধাসাধি করছে, বে দিলেই এখনি মাথায় করে নিয়ে যায়, তা আমি গা করিনি। আমার উমাতারার এমন সম্বন্ধ কর্‌ব যে কুটুমের মত কুটুম হবে। তবে আমার উমাতারার বর্ণের জেল্লা আছে, তোমার মেয়ে একটু কালো, আর তোমাদের বোন তেমন টাকাকড়ি নেই। আমার দেওর তেমন সেয়ানা ছিল না, কিছু রেখে যায়নি, তাই যা বল। তা ভেব না বোন, আমি যখন এবিষয়ে হাত দিয়েছি, তখন আর কোন ভাবনা নেই।"

আশ্বাসবচন শুনিয়া ও সেই সুন্দর তাবিজ বিভূষিত বাহুর ঘন ঘন সঞ্চালন দেখিয়া বিন্দুর মা আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু জ্যেঠাইমার বাহু নাড়াতে বিন্দুর বিশেষ উপকার হইল না, বিন্দুর বিবাহ হইল না।

তার পর পূজার সময় তারিণীবাবু বাড়ী আসিলেন। তাঁহার গৃহিণীর জন্য পূজার কাপড়, পূজার গহনা, পূজার সামগ্রী কতই আসিল, গৃহিণীও আহ্লাদে আটখানা! বাড়ীর ছেলেদের জন্য কত পোষাক, কাপড়, জুতা, উমাতারার জন্য ঢাকাই কাপড়, মাথার ফুল ইত্যাদি। নাজির মহাশয় বাড়ী আসিয়াছেন, গ্রামে ধুম পড়িয়া গেল, কত লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিল, কত খোসামোদ, কত সুখ্যাতি, কত আরাধনা। কাহারও পূজার সময় দুই পাঁচ টাকা কর্জ্জ চাই, কাহারও বিপদে সৎপরামর্শ চাই, কাহারও ছেলের একটী চাকরী চাই, আর কাহারও বিশেষ কিছু আপাততঃ চাই না, কেবল বড় লোকের খোসামোদটা অভ্যাস মাত্র, সেই অভ্যাসেই সুখ হয়। এত ধুমধামের মধ্যে, বিন্দুর কথা কেই বা বলে, কেই বা শোনে। ১৫ দিনের ছুটী ফুরাইয়া গেল, নাজির মহাশয় আবার বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন, বিন্দুর সম্বন্ধের কিছুই স্থির হইল না।

পড়শীর মেয়েদের সঙ্গে যখন বিন্দুর মা দেখা করিতে যাইতেন, বৃদ্ধাদিগকে কত স্তুতি করিয়া কন্যার একটী সম্বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেন। তাঁহারাও আগ্রহচিত্তে বলিতেন, "তা দেব বৈ কি, তোমার দেব না তা কার দেব। তবে কি জান বাছা, আজকাল মেয়ের বে সহজ কথা নয়। আর তুমি ত কিছু দিতেথুতে পার্‌বে না, বিন্দুর বাপ ত কিছু রেখে যায়নি, তেমন গোছান লোক হত, ঐ তোমার ভাসুরের মত টাকা করতে পার্‌ত, তবে আর কি ভাবনা থাকত? সেই সময় আমি বলেছিলুম, তা তখন সে গা করত না, তোমরাও গা করতে না, এখন টের পাচ্ছ; গরিবের কথাটা বাসি হলেই ভাল লাগে! তা দেব বৈ কি বাছা, তোমার মেয়ের সম্বন্ধ করে দেব, এ বড় কথা?" অথবা অন্য একজন বৃদ্ধা বলিলেন, "তার ভাবনা কি? বিন্দুর বের আবার ভাবনা কি? তবে একটা কথা কি জান, বিন্দু দেখ্‌তে শুন্‌তে একটু ভাল হত, তবে এ কাজটা শীঘ্র শীঘ্র হত। তা মেয়ের মুখের ছিরি আছে, ছিরি আছে, তবে রংটা বড় কালো, তার চোখ দুটো বড় ডেবডেবে, আর মাথায় বড় চুল নাই। না, তা মেয়ের ছিরি আছে, তবে একটু কাহিল, হাড়গুলো যেন জির জির করছে, হাতপাগুলো কেমন লম্বা লম্বা, আর এর মধ্যে ঢেঙ্গা হয়ে উঠেছে। তা হোক তুমি ভেব না, কালো মেয়ে কি আর বিকোয় না, তবে কি আট্‌কে থাকে, তা থাকবে না, যখন আমরা আছি, তখন কিছু আট্‌কাবে না।" এইরূপ বৃদ্ধাদিগের যথেষ্ট আশ্বাসবাক্য ও তাহার সঙ্গে বিন্দুর বাপের নিন্দা, বিন্দুর মার নিন্দা ও বিন্দুর নিন্দা সম্বন্ধে প্রচুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আশ্বস্ত ও আপ্যায়িত হইয়া বিন্দুর মা বাড়ী আসিতেন।

গ্রামের মধ্যে দুই এক জন প্রাচীন লোক ছিলেন। তাঁহারা অনেক লোক দেখিয়াছেন, অনেক গ্রামে যাতায়াত করেন, অনেক ঘর জানেন, অনেক মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিন্দুর মা কয়েকদিন তাঁহাদের বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিলেন। কোন দিন ছেলেদের জন্য দুই চারি পয়সার চিনির বাতাসা লইয়া গেলেন, কখন বা কিছু মিশ্রী বা মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া গৃহিণীদিগের মনস্তুষ্টি করিলেন, গৃহিণীদিগকে অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, তাঁহারাও আশ্বাসবাক্য দিলেন, সন্ধান করিবেন, কর্ত্তাকে বলিবেন, এইরূপ অনেক মধুর বচন বলিলেন। অবশেষে বিন্দুর মা ঘোমটা দিয়া সেই কর্ত্তাদিগেরই মিনতি আরম্ভ করিতে লাগিলেন, পথেঘাটে দেখা হইলে গরিবের কথাটি মনে রাখিবার জন্য মিনতি করিলেন, তাঁহারাও বলিলেন, "তা এ কথা আমাদের এত দিন বলনি? এ সব কাজ কি আমাদের না বলিলে হয়, ঐ ও পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীর কালীতারার

বের জন্য কত হাঁটাহাঁটি করেছিল, শেষে বড় বৌ একদিন আমাকে ডেকে বললেন, অমনি কাজটা হয়ে গেল। কেমন বে দিয়ে দিয়েছি, রায়েদের বনিয়াদি ঘর, খাবার অভাব নেই, টাকার অভাব নেই, যেন কুবেরের ঘর, সেই ঘরের ছেলের সঙ্গে ঘোষেদের মেয়ের বের সম্বন্ধ করে দিলেম। ছেলেটী দোজবরে বটে, আর একটু কাহিল ও একটু বয়স নাকি হয়েছে, তা এখনও চাল্লিশের বড় বেশী হয়নি, আর কালীতারা আট বৎসরের হলেও দেখতে বাড়ন্ত, গ্রামসুদ্ধ এ সম্বন্ধের সুখ্যাতি করছে। ছেলেটী বর্দ্ধমানে থাকে, লেখাপড়া না জানুক তার মান কত, যশ কত, সাহেবদের খানা দেয়, মজলিশ লোকে ভরা, গাড়ীঘোড়া, লোকজন, বাবুয়ানা দেখলে লোকে বলে, হাঁ, জমীদারের ঘরের ছেলে বটে। তা আমরা হাত না দিলে কি এমন সম্বন্ধ হয়? তুমি মা এত দিন কোথা হাঁটাহাঁটি কর্‌ছিলে, আমাদের একবার জিজ্ঞাসাও কর না, এখন যে যার আপন আপন প্রভু হয়েছে, তাতে কি কাজ চলে? তা আজ আমাকে মনে পড়েছে, তবু ভাল।" সজল নয়নে বিন্দুর মা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন, এবং এমন লোকের নিকট পূর্ব্বে না আসা বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে ভাবিলেন। অশ্রুজল ও মিনতিতে তুষ্ট হইয়া গ্রামের মণ্ডল বলিলেন, "তা ভেব না মা, এখন আমাকে যখন বললে, তখন আর ভাবনা নেই, দুই চারি দিনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করে দিচ্ছি।" বিন্দুর মা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, অনেক আশা করিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই চারি দিন অতীত হইল, দুই চারি মাস অতীত হইল, বিন্দুর সম্বন্ধ হইল না, গরিবের মেয়ে তরিল না।

বিন্দুর মা দেখিলেন, তালপুকুরের লোক অনেক সদ্‌গুণবিশিষ্ট বটে। নিঃস্বার্থ হইয়া পরের বাড়ী কি রান্না হইতেছে, প্রত্যহ তাহার খবর রাখেন; পরের বৌঝি কি করিতেছে, তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান রাখেন; ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে সে বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচার করিবার জন্য নিঃস্বার্থ যত্ন করেন; কেহ বিপদে পড়িলে বা দায়ে ঠেকিলে তাহাকে পূর্ব্ব দোষের জন্য বিশেষরূপে নীতিগর্ভ তিরস্কার দেন, নৈতিক উপদেশ দেন, এবং নিঃস্বার্থরূপে তাহাকে আশ্বাস দিতে, পরামর্শ দিতে যত্ন বা বাক্যব্যয়ে ত্রুটী করেন না; তবে কাজের সময় সহায়তা করা—সে স্বতন্ত্র কথা! বিন্দুর মাতাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কেহ হস্ত প্রসারণ করিলেন না, তাঁহার যাচ্‌ঞায় কেহ একটী কপর্দ্দক দিলেন না, তাঁহার উপকারার্থে কেহ বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী নাড়িলেন না। বিন্দুর মা যদি কখনও তালপুকুর হইতে বাহিরে যাইতেন, তবে দেখিতেন, এ সদ্‌গুণগুলি জগতের অন্যান্য স্থানেও লক্ষিত হয়। তবে বিন্দুর মাতা নির্ব্বোধ, এক একবার তাঁহার মনে এরূপ উদয় হইত না যে এ প্রচুর আশ্বাসবাক্য ও সৎপরামর্শের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এই সামান্য দায় হইতে কেহ উদ্ধার করিয়া দিলে তাঁহার নৈতিক উন্নতি না হউক, সাংসারিক সুখ কতক পরিমাণে হইত।

তালপুকুর গ্রামে হরিদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার হেমচন্দ্র নামক একটী পুত্র ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। পিতা দরিদ্র হইলেও পুত্রকে অনেক যত্নে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং হেমচন্দ্রও যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া বর্দ্ধমানে প্রথম পরীক্ষা দিয়া কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কয়েক মাসের পরই পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি পড়াশুনা বন্ধ করিয়া তালপুকুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সামান্য পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র বসু বিন্দুর মা ও বিন্দুকে বাল্যকাল অবধি জানিতেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি কিছু অল্প থাকা বশতঃই হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ময়কর বিদ্যা কয়েক মাসাবধি শিখিয়াই হউক, অথবা কলিকাতার বাতাস পাইয়াই হউক, তিনি পিতার পরম বন্ধু হরিদাসের দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত গ্রাম এ মূঢ়ের ন্যায় কার্য্যে চমকিত হইল, হেমচন্দ্রের বংশের পুরাতন বন্ধুগণ তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিয়া পিতার নাম ডুবাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ছেলেটী কিছু গোঁয়ার, তিনি বিন্দুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, (আমাদের লিখিতে লজ্জা করে) বিন্দুর শুষ্ক ম্লান মুখখানিও দুই একবার গোপনে দেখিলেন, এবং তৎপরে বিন্দুর মাতাকে ও জ্যেঠাইমাকে সম্মত করাইয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। বিন্দুর জ্যেঠাইমা মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটী সরল, কলহ বা তিরস্কার করা তাঁহার বড় অভ্যাস ছিল না, তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহিতেন না। তবে বড় মানুষের মেয়ে, স্বামী অনেক রোজগার করেন, তাহাতে যদি একটু বড়মানুষী রকম দর্প থাকে, একটু বড় কুটুম

করিবার ইচ্ছা থাকে, দরিদ্রের সহিত যদি সহানুভূতি একটু কম থাকে, তাহা মার্জ্জনীয়। দুই একটী দোষ অনুসন্ধান করিয়া আমরা যেন নিন্দাপরায়ণ না হই; আমাদের মধ্যে কাহার সেরূপ দুই একটী দোষ নাই?

বিন্দুর সরলস্বভাব জ্যেঠাইমা বিন্দুর বিবাহের জন্য বিশেষ যত্ন করেন নাই, কাহারও জন্য বিশেষ যত্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু বিন্দুর একটী সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি প্রকৃতই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি শুভ দিন দেখিয়া হেমচন্দ্রের সহিত বিন্দুর বিবাহ দিলেন, এবং পাড়াপড়শী মেয়েরা যখন বাটীতে আসিল, তখন সেই তাবিজ-বিভূষিত বাহু সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, “আহা, আমার উমাতারাও যে, বিন্দুও সে, আমি বিন্দুর বিবাহ না দিলে কে দেয় বল, বিন্দুর মার ত ঐ দশা, বাপও সিকি পয়সা রেখে যায়নি, আমি না করলে কে করে বল!” ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়শীগণও, “তুমি বলে কর্‌লে, নৈলে কি অন্যে অতটা করে?” এইরূপ অনেক যশোগান ও নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করিয়া ঘরে গেল।

তখন সুধার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, কিন্তু সুধার মার বড় ইচ্ছা সুধারও বিবাহ দিয়া যান। হেমচন্দ্র অনেক আপত্তি করিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, সুধাকে আপন ঘরে রাখিয়া একটু বাঙ্গালা শিখাইয়া পরে ১০।১২ বৎসরের সময় নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু সুধার মা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, “বাছা, সুধার বিয়ে না দিয়ে যদি মরি, তবে আমার জীবনের সাধ মিটবে না।” হেমচন্দ্র কি করেন, অগত্যা সম্মত হইয়া সুধাকে একটী সামান্য অবস্থার শিক্ষিত যুবার সহিত বিবাহ দিলেন।

বিন্দুর মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর তখন প্রথমে আপনাকে একটু সুখী মনে করিলেন। দুই বিবাহিতা কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া আপনাকে জগতের মধ্যে ভাগ্যবতী মনে করিলেন। তিনি তখনও তারিণীবাবুর বাটীতে রহিলেন। সুধার বিবাহের কয়েক মাস পরেই তিনি জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন।

আর একটী কথা আমাদিগের বলিবার আছে। পঞ্চম বৎসরের সুধা বিবাহিতা স্ত্রী হইল, সপ্তম বৎসরে বিধবা হইল! সুধা স্ত্রী কাহাকে বলে জানে না, বিধবা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাটীতে আসিয়া সাত বৎসরের প্রফুল্লা বালিকা ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া আনন্দে পুতুল খেলা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সংসারের কথা

প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি হইয়াছে। চন্দ্রের নির্ম্মল শীতল কিরণে সুন্দর তালপুকুর গ্রাম সুপ্ত রহিয়াছে। বড় বড় তালবৃক্ষসার আকাশপটে অন্ধকারময় ও বিস্ময়কর ছবির ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। গ্রামের চারিদিকে প্রচুর ও সুন্দর বাঁশঝাড়ের সুচিক্কণ পত্রের উপর সুপ্ত চন্দ্রকিরণ রহিয়াছে, পুষ্করিণীর ঈষৎ কম্পমান জলের উপর চন্দ্রালোকে সুন্দর খেলা করিতেছে, গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, প্রাচীরে ও তৃণাচ্ছাদিত ঘরের চালের উপর সেই সুন্দর আলোক যেন রূপার চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। সমস্ত সুপ্ত গ্রামের উপর চাঁদের আলোক যেন যুঁই ফুলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থগণ অনেকেই খাওয়াদাওয়া করিয়া কবাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, কেবল কোথাও কোথাও কোন নিদ্রাহীন বৃদ্ধ বাহিরের প্রাঙ্গণে বসিয়া এখনও ধূম পান করিতেছেন, আর কোথাও বা অল্পবয়স্কা গৃহস্থবধূ এখনও বাটীর পার্শ্বের পুকুরে বাসন মাজিতেছেন, সংসারের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। নৈশবায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, আর দূর হইতে কোন প্রফুল্লমনা কৃষকের গান সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে শুনা যাইতেছে।

বিন্দু সংসারকার্য্য শেষ করিয়া, এখনও স্বামী আসেন নাই বলিয়া উদ্বিগ্ন মনে সেই শুইবার ঘরের রকে বসিয়া রহিয়াছেন, নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ তাঁহার শুভ্রবসন ও শান্ত নয়নের উপর পড়িয়াছে। সুধা আজ শুইতে যাইবে না, হেমচন্দ্রকে সন্ন্যাসী সাজাইবে স্থির করিয়াছে, কিন্তু বালিকা ভগিনীর পার্শ্বে সেই রকে একটু শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার কুসুমরঞ্জিত পাট তাহার আঁচলেই রহিল। নিদ্রাতেও সে সুন্দর পরিপক্ক বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ দুটী হাস্যবিস্ফারিত, বোধ হয় বালিকা এই সুন্দর সুশীতল রজনীতে কোনও সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ক্ষণেক পরে বাহিরের কবাটে শব্দ হইল, বিন্দু তাহাই প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ গিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন, হেমচন্দ্র বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

হেমচন্দ্রের বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর হইয়াছে, তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, মুখমণ্ডল শ্যামবর্ণ কিন্তু সুন্দর, নয়ন দুটী অতিশয় তেজোব্যঞ্জক। অনেক পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শরীরে ধুলি লাগিয়াছে, পা দুটী ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে। বিন্দু সযত্নে তাঁহাকে একখানি চৌকি আনিয়া দিলেন এবং পা ধুইবার জল ও গামছা আনিয়া দিলেন; হেম হাতমুখ ধুইলেন।

বিন্দু। তোমার আসতে এত রাত্রি হল? এখনও খাওয়াদাওয়া হয়নি?

হেম। আমি সন্ধ্যার সময় আস্‌তেম, তবে কাটোয়ার এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হল, তিনি বৈকালে আমাকে তাঁহার বাসায় নিয়ে গেলেন, উপরোধ করে কিছু জলখাবার খাওয়ালেন, সেই জন্য এত দেরী হল। তা তোমরা খেয়েছ ত?

বিন্দু। সুধা খেয়ে ঘুমিয়েছে, আমি খাব এখন। তুমি ত বৈকালে জল খেয়েছ, আর কিছু খাওনি, তবে ভাত এনে দি।

হেম। আমার বিশেষ ক্ষুধা পায়নি, তবে ভাত নিয়ে এস, আর রাত্রি করার আবশ্যক নেই।

বিন্দু সেই রকে একটু জল ছিটাইয়া আসন পাতিলেন, পরে রান্নাঘর হইতে থালে করিয়া ভাত আনিয়া দিলেন। খাবার সামান্য—ভাত, ডাল, মাছের ঝোল ও বাড়ীতে উচ্ছে ও লাউ হইয়াছে তাহাই ভাজা ও তরকারি। আর গাছে লেবু হইয়াছিল, বিন্দু তাহা কাটিয়া রাখিয়াছিলেন, গাছ হইতে দুইটী ডাব পাড়াইয়া তাহা শীতল করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বাড়ীতে গাভী ছিল, তাহার দুগ্ধ ঘন করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আহারে বসিলেন, বিন্দু পার্শ্বে বসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন।

হেম। খোকার জন্য একটা ঔষধ এনেছি; সেটা এখন খাওয়াইও না, রাত্রিতে যদি ঘুম ভাঙ্গে, যদি কাঁদে তবে খাওয়াইও। আর যে চেষ্টায় গিয়েছিলাম, তার বড় কিছু হল না।

বিন্দু। কি হল?

হেম। কাটোয়াতে আমার পরিচিত একটী উকীল আছেন, আমি তাঁর কাছে তোমার বাপের জমির কথা বল্লেম, এবং সমস্ত অবস্থা বুঝিয়ে বল্লেম।

বিন্দু। তার পর?

হেম। তিনি বল্লেন, মকদ্দমা ভিন্ন উপায় নেই।

বিন্দু। ছি! জ্যেঠা মশায়ের সঙ্গে কি মকদ্দমা করে? তিনি ছেলেবেলা আমাকে মানুষ করেছিলেন, আমার বে দিয়েছেন, জ্যেঠাইমা এখনও আমাদের জিনিসটিনিস পাঠিয়ে দেন, তাঁদের সঙ্গে কি মকদ্দমা করা ভাল?

হেম। আমাদের বিবাহের জন্য আমরা তোমার জ্যেঠা মশাইয়ের নিকট বড় ঋণী নই; কিন্তু তুমি যখন ছেলেমানুষ ছিলে, সে সব কথা বড় জান না, জানবার আবশ্যকও নেই। তথাপি তিনি তোমার জ্যেঠা, এই জন্যই তাঁর সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছা নেই, কেবল অগত্যা কর্‌তে হয়।

বিন্দু। ছি! সে কাজটা কি ভাল হয়? আর দেখ আমরা গরিব লোক, আমাদের কি মকদ্দমা পোষায়? আমরা গরিবের মত যদি থাক্‌তে পারি, দুবেলা দুপেট যদি খেতে পাই, ভগবানের ইচ্ছায় যদি ছেলে দুটীকে মানুষ করতে পারি, তা হলেই ঢের হল। তোমার যে জমি-জমা আছে, তাতেই আমাদের গরিবের সোণা ফলে, তোমার পৈতৃক বাড়ীই আমার সাত রাজার ধন।

হেম। আমি যখন তোমাকে বিবাহ করেছিলেম, এরূপ কষ্টে চিরকাল জীবন যাপন করব তা মনে করিনি। তুমি সহিষ্ণু, সাধ্বী, পতিব্রতা, এত কষ্ট সহ্য করেও মুখ ফুটে একটী কথাও কও না, সে তোমারই গুণ, কিন্তু আমি তা চক্ষে দেখতে পারি না।

বিন্দুর চক্ষে জল আসিল। মনে মনে ভাবিলেন, "পথের কাঙ্গালীকে কোলে করিয়া লইয়া স্বর্গে স্থান দিয়াছ, সেটা কি ভুলে গেলে?" প্রকাশ্যে একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, এমন ঘর-বাড়ী, এখানে রাজার উপাদেয় দ্রব্য পাওয়া যায়, এখানে আমাদের অভাব কিসের? একটী রাজার উপাদেয় জিনিষ দেখবে?"

হেম একটু হাসিয়া বলিলেন, "কৈ দেখি!"

বিন্দু উঠিয়া রান্নাঘরে গেলেন। সেই দিন গাছের কাঁচ কাঁচ আঁব পাড়িয়া তাহার অম্বল করিয়াছিলেন, স্বামীর সম্মুখে পাথর বাটীটী রাখিয়া বলিলেন, "একবার খেয়ে দেখ দেখি।"

হেম হাসিয়া অম্বল ভাতে মাখিলেন, খাইয়া সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ, এ রাজার উপাদেয় দ্রব্য বটে, কিন্তু সে আমাদের এ রাজ্যের গুণ নয়, রাজরাণীর হাতের গুণ।"

ক্ষণেক পরে হেসে আবার বলিলেন, "আমি সত্য বলছি, জ্যেঠা মশাইয়ের সঙ্গে মকন্দমা করবার আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু তিনি তোমার পৈতৃক ধন কেড়ে নেবেন, আমাদের দরিদ্র বলে তুচ্ছ কর্‌বেন, তা আমি কখনই সহ্য কর্‌ব না! আমি দরিদ্র, কিন্তু আমি অন্যায় সহ্য কর্‌তে পারি না।"

বিন্দু। তবে এক কাজ কর দেখি। ঐ ভাত কটী এই ঘন দুধ দিয়ে খেয়ে নাও দেখি, তা হলে গায়ে জোর হবে, তার পর কোমর বেঁধে লড়াই করো।

হেমচন্দ্র যুদ্ধের সেই উদ্যোগ করিলেন, আবার গাভীদুগ্ধের অথবা রাজ্ঞীর রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিলেন। তখন বিন্দু বলিলেন,

"আচ্ছা, জ্যেঠা মশাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়টা মিটিয়ে ফেল্লে ভাল হয় না? গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোক আছেন।

হেম। সে চেষ্টাও করেছিলাম। তোমার জ্যেঠা মশাই বলেন, সে জমিতে তাঁরই স্বত্ব আছে, তিনি এখন দশ বৎসর অবধি জমিদারকে খাজনা দিচ্চেন, তিনি অর্থ ব্যয় করে জমির উন্নতি করেছেন, এবং জমিদারের সেরেস্তায় আপনার নাম লিখিয়েছেন, এখন তিনি এ জমি হাতছাড়া করবেন না। তবে তোমাকে ও সুধাকে কিছু নগদ অর্থ দিতে সম্মত আছেন, তা জমির প্রকৃত মূল্য নয়, অর্দ্ধেক মূল্য অপেক্ষাও অল্প। কেবল আমরা দরিদ্র, এই জন্য তিনি এরূপ অন্যায় কর্‌ছেন।

বিন্দু। আমি মেয়ে মানুষ, তুমি যতদূর এ সব বিষয় বুঝ, আমি ততদূর পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, তিনি যা দিতে চান, তাতেই স্বীকার হওয়া ভাল। তিনি আমাদের গুরু, এক সময়ে আমাকে পালন করেছেন, যদি কিছু অল্পমূল্যেই তাঁকে একটা জিনিস দিলেম, তাতেই বা ক্ষতি কি? আর দেখ, মকন্দমা করলে আমাদের বিস্তর খরচ, কর্জ্জ করতে হবে, তা কেমন করে পরিশোধ করব? যদি মকন্দমায় জমি পাই, তা হলে ঋণ পরিশোধ করতে সে জমি বিক্রী হয়ে যাবে, আর জ্যেঠা মশাই চিরকাল আমাদের শত্রু থাকবেন। আর যদি মকন্দমায় হারি, তবে একুল ওকুল দুকুল গেল। তিনি যদি কিছু অল্প মূল্যই দেন, না হয় আমরা কিছু অল্পই পেলেম, গোলমালটা এইখানেই শেষ হয়। আমি মেয়ে মানুষ, ও সব গোলমাল বুঝি না, মকন্দমা বড় ভয় করি, সেই জন্যই এরূপ বল্লেম; কিন্তু তুমি রাগ না করে বেশ করে বিবেচনা করে দেখ, শেষে যেটা ভাল বোধ হয় সেইটে কর্‌।

হেমচন্দ্র আহার সমাপন করিলেন, এক ঘটি জল খাইলেন, অনেকক্ষণ বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

"তোমার মত মেয়ে মানুষ যার বন্ধু, সে এ জগতে ভাগ্যবান। আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে যে উকীলের নিকট গিয়েছিলেম, সে আমার মূর্খতা। তোমার পরামর্শটী উৎকৃষ্ট। আমি এই পরামর্শই গ্রহণ করলেম, জ্যেঠা মশাই বাড়ী এসেছেন; কল্যই আমি এ বিষয় নিষ্পত্তি করব। আর পুনরায় যখন কোন পরামর্শের আবশ্যক হবে, এই ঘরের বৃহস্পতির সঙ্গে অগ্রে পরামর্শ কর্‌ব।"

বিন্দু সহাস্যে বলিলেন, "তবে বৃহস্পতির আর একটী পরামর্শ গ্রহণ কর।"

হেম। কি বল, আমি কিছুই অস্বীকার কর্‌ব না।

বিন্দু। ঐ বাটীতে যে দুধটুকু পড়ে আছে সেটুকু চুমুক দিয়ে খাও দেখি।

হেমচন্দ্র অগত্যা বৃহস্পতির এই দ্বিতীয় পরামর্শটীও গ্রহণ করিলেন, পরে আসন ত্যাগ করিয়া আচমন করিলেন।

বিন্দু তখন হেমচন্দ্রের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, হাতে একটী পান দিলেন, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই শয্যায় স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র সেই স্নেহময়ীকে আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া সস্নেহে চুম্বন

করিয়া বলিলেন, "যাও, অনেক রাত্রি হয়েছে, তুমি খাওয়াদাওয়া কর গিয়ে।" জগতের মধ্যে সৌভাগ্যবতী বিন্দুবাসিনী তখন উঠিয়া পাকগৃহে আহারাদি করিতে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : চাষবাসের কথা

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। ঊষা তরুণী গৃহিণীর ন্যায় সংসারকার্য্যের জন্য জগতে সকলকে উঠাইলেন, সকলকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। মাতা যেরূপ কন্যাকে সুন্দর রূপে সাজাইয়া দেন, সেই রূপ সুন্দর সাজ পরিধান করিয়া ঊষা আকাশে দর্শন দিলেন। হাস্যমুখী তরুণীর প্রণয়াভিলাষে প্রণয়ী সূর্য্য অচিরেই উদিত হইলেন, ঊষার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন! তাঁহার উজ্জ্বল কিরণরূপ সপ্ত অশ্ব রথে সংযোজিত করিয়া সেই জ্বলন্তকেশী সবিতা আকাশ-মার্গে ধাবমান হইলেন, আকাশ আলোকে পূর্ণ করিলেন, জগতে সংজ্ঞাশূন্যকে সংজ্ঞা দান করিলেন, রূপশূন্যকে রূপ দান করিলেন। ঊষা ও সূর্য্যোদয়ের শোভায় বিস্মিত হইয়া চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের প্রাচীন ঋগ্বেদের ঋষিগণ এইরূপ সুন্দর কল্পনা দ্বারা সে শোভাটী বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; সেরূপ সরল, সুন্দর এবং প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ কবিতা তাহার পর আর রচিত হয় নাই।

হেমচন্দ্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বাটী হইতে বাহির হইলেন। গ্রামের বৃক্ষপত্র ও কুটীরগুলি সূর্য্যের লোহিত আলোকে শোভা পাইতেছিল, গ্রাম্য পুষ্পগুলি বৃক্ষে, ঝোপে বা জঙ্গলে ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং প্রাতঃকালের পাখীগুলি নানাদিক হইতে রব করিতেছে। গৃহস্থের মেয়েরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঘরদ্বার ও প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিয়া পুকুর হইতে কলস করিয়া জল আনিতেছে অথবা রন্ধনাদি আরম্ভ করিতেছে। বালকগণ পাঠশালায় বা খেলায় যাইতেছে, কৃষকগণ লাঙ্গল ও গরু লইয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। হেমচন্দ্রও আজি নিজের জমিখানি দেখিতে যাইবেন মানস করিয়াছিলেন।

ছায়াপূর্ণ গ্রাম্য পথ দিয়া কতকদূর আসিয়া হেমচন্দ্র একজন কৃষকের বাড়ীর সম্মুখে পঁহুছিলেন; কৃষকের নাম সনাতন কৈবর্ত্ত।

সনাতন কৈবর্ত্তের একখানি উচ্চ ভিত্তি-ওয়ালা ঘর ছিল, তাহার পার্শ্বে একখানি ঢেঁকির ঘর ও একখানি গোয়ালঘর, তথায় ৪।৫টী গরু ছিল। উঠানেই উনুন, পার্শ্বে একখানি চালা আছে, বৃষ্টিবাদলের দিন সেই চালার ভিতর রান্না হয়, নচেৎ খোলা উঠানে। সম্মুখে কতকগুলো কাঁটা গাছ ও জঙ্গল, এক স্থানে একটা বড় খানা আছে, তাহাতে বৎসরের গোবর সঞ্চিত হয়, চাষের সময় উপকারে লাগে। গোয়ালঘরের পাশে গাড়ীর দুখানা চাকা ও খান দুই লাঙ্গল পড়িয়া আছে, এবং বাড়ীর পশ্চাতে একটা ডোবার ন্যায় ময়লা পুকুর আছে। আমাদের বলিতে লজ্জা করে যে এক্ষণকার নূতন মিউনিসিপাল আইন ও নিম্ন শিক্ষা সত্ত্বেও সনাতনের প্রণয়িনী এই ডোবাতেই যে কেবল বাসন ধুইতেন এমন নহে, তাঁহার স্নান ও কাপড়কাচাও এইখানে হইত, এবং তাঁহার হৃদয়েশ্বরের পানের জল ও সংসারের রান্নার জলও এই পুকুরের।

হেমচন্দ্র আসিয়া সনাতনকে ডাকিলেন। সনাতনের তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তবে গাত্রোত্থান রূপ মহৎ কার্য্যের উদ্যোগপর্ব্বে রত ছিল, দুই একবার এ পাশ ও পাশ করিতেছিল, দুই একবার হস্ত বিস্তার করিয়া হাই তুলিতেছিল, আর এক একবার পার্শ্বে শয়ানা সহধর্ম্মিণীর সহিত, "পোড়ারমুখী এখনও উঠলিনি, এখনও মাগীর ঘুম ভাঙ্গল না বুঝি" ইত্যাদি মিষ্টালাপ করিতেছিল, এই নৈতিক বক্তৃতার মধ্যে সনাতন হেমচন্দ্রের ডাক শুনিল।

গলাটা মহাজনের গলার ন্যায়, অতএব বুদ্ধিমান সনাতন সহসা উঠিল না। আবার ডাক, তৃতীয়বার ডাক, সুতরাং সনাতন কি করে, একটা উপায় করিতে হইল। বিপদআপদে সনাতনের একমাত্র উপায় তাহার গরীয়সী সহধর্ম্মিণী, অতএব তাহাকেই একটু অনুনয় করিয়া বলিল, "এই দরজাটা খুলে উঁকি মেরে দেখ ত কে এসেছে? যদি হারাণ সিকদার মহাজন হয়, তবে বলিস, বাড়ী নেই।" সনাতনের প্রণয়িনী প্রিয় স্বামীর "পোড়ারমুখী" প্রভৃতি মিষ্টালাপ শুনিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এখন সময় পাইলেন। স্বামীর কথাটী শুনিয়া আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। একটী হাই তুলিয়া সনাতনের দিকে পিছন করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে আর একবার নিদ্রা গেলেন।

সনাতন দেখিল বড় বিপদ, অথচ আপনি সহসা বাহির হইতে পারে না, কি করে? দুই একবার প্রণয়িনীকে ডাকিল, কোন উত্তর নাই, একবার টানিল, সাড়া নাই, একবার ঠেলা দিল, তথাপি চৈতন্য হইল না। সকল যত্ন ব্যর্থ হইল, সকল বাণ কাটা গেল, তখন বীর পুরুষ রোষে দণ্ডায়মান হইয়া রিক্ত হস্তে যুঝিবার উদ্যম করিল। বলিল, "এত বেলা হল, এখনও মাগীর উঠা হল না, এত ডাকাডাকি কল্লেম, তবুও হারামজাদীর সাড়া নেই, এইবার সাড়া করাচ্চি, দুটো গুতো দিলেই ঠিক হবে।"

সনাতনপত্নী দেখিলেন আর মৌন অস্ত্র খাটে না, এখন অন্য অস্ত্র না ধারণ করিলে বড় বিপদ। অতএব তিনিও একেবারে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "কি, হয়েছে কি? সকাল থেকে উঠে বাপমা তুলে গাল দিচ্ছ কেন, মাতাল হয়েছ নাকি? দেখ না, মিনষের মরণ আর কি!" বিধুমুখী এইরূপে স্বামীর দীর্ঘায়ু বাঞ্ছা করিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সে তীব্র স্বর শ্রবণে ও আরক্ত নয়ন দর্শনে সনাতনের বীর হৃদয় বসিয়া গেল, তথাপি সহসা কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করিল না।

সনাতন। বলি আবার শুলি যে!

স্ত্রী। শোব না?

সনাতন। ঘরের কাজকর্ম্ম কর্‌তে হবে না?

স্ত্রী। হবে না!

সনাতন। জল আনবিনি?

স্ত্রী। আনবো না!

সনাতন। রান্না চড়াবিনি?

স্ত্রী। চড়াব না!

সনাতন। তবে আবার শুলি যে?

স্ত্রী। শোব না?

সনাতন। তবে ঘরকন্না করবে কে?

স্ত্রী। তা আমি কি জানি? আমি পোড়ারমুখী, আমি হারামজাদী, আমার বাপ হারামজাদা, আমার ঠাকুরদাদা হারামজাদা, আমার আর ঘরকন্না করে কি হবে? আর একটী ভাল দেখে ডেকে আন্ গে।

সনাতন। না, বলি রাগ কল্লি নাকি?

"রাগ আবার কিসের?" বলিয়া গৃহিণী আর একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন আর একটী হাই তুলিয়া দীর্ঘ নিদ্রার সূচনা করিতে লাগিলেন।

সনাতন পরাস্ত হইল; তখন বিধুমুখীর হাতেপায়ে ধরিয়া ঘাট মানিয়া অনেক মিনতি করিয়া উঠাইল। সেই অব্যর্থ সাধনে বিধুমুখীর কোপের কিঞ্চিৎ উপশম হইল এবং তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। মনে মনে হাসিতে হাসিতে মুখে রাগ দেখাইয়া বলিলেন,

"এখন কি করতে হবে বল। এমন লোকেরও ঘর করতে মানুষে আসে। গালাগাল না দিলে রাত্রি প্রভাত হয় না।"

সনাতন। না, গাল দিলেম কৈ, একটীবার আদর করে পোড়ারমুখী বলেছি বই ত নয়, তা আর বল্‌ব না।

স্ত্রী। না, কিছু বলনি, আমার আদর সোহাগে কাজ নেই, কি কর্‌তে হবে বল।

সনাতন। বলি, ঐ দরজায় কে ডাকাডাকি করছে একবার গিয়ে দেখ্ না; যদি হারাণ সিকদার হয়, তবে বলিস আমি ঘরে নেই।

তখন বিধুমুখী গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার বিশাল শরীর তুলিলেন। মুখখানি একখানি মধ্যমাকৃতি কাল পাথরের থালার ন্যায়, সেইরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ উজ্জ্বল বর্ণ। শরীরখানি বেশ নাদশনোদশ, স্থূলাকার, গোলাকার—পৃথিবীর ন্যায়! পা দুখানি মাটিতে পড়িলে পৃথিবী তাহার সুন্দর চিহ্ন অনেকক্ষণ ধারণ করিতে ভালবাসিতেন! বাহু দুইখানি দেখিয়া সনাতনের মনে ভয় সঞ্চার হইত, ভাবিত কোন দিন এই রমণীরত্নের প্রিয় আলিঙ্গনে বা তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া অপঘাত মৃত্যু হয়! দীর্ঘে বর বড়, না কনে বড়, দর্শকের কিছু সন্দেহ হইত, পার্শ্বে কনে তিনটী সনাতন!

গরীয়সী বামা দরজা একটু খুলিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "কে গা?"

হেম। আমি এসেছি গো। সনাতন বাড়ী আছে?

মনিবকে দেখিয়া সনাতনের স্ত্রী তখন ব্যগ্র ও লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া, মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া একখানা কাঠের চৌকি লইয়া বাবুকে বসিতে দিল ও সনাতনকে ডাকিয়া দিল।

সনাতন তখন নির্ভয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমরা ঘুমিয়েছিলুম, তা আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।"

হেম। তা হোক, এখন চল, মাঠে যেতে হবে, ক্ষেতখানা দেখতে হবে। কৈ তোমার লোক কৈ?

সনাতন। আজ্ঞে, জন ঠিক করেছি, এই যাই। আপনি অনেকটা পথ চলে এসেছেন, একটু দুধ খাবেন কি?

হেম। আবশ্যক নেই।

সনাতন। না, একটু খান, আমাদের বাড়ীর গরুর দুধ একটু খান। এই বলিয়া সনাতন দুধ দুইতে গেল, তাহার স্ত্রী পাথর বাটী আনিল।

দোয়া হইলে সনাতনের স্ত্রী একটু ঘোমটা দিয়া একটী ছেলে কোলে করিয়া এক বাটী দুধ বাবুর কাছে আনিয়া ধরিল। হেম আনন্দচিত্তে সেই কৃষকের ভক্তিদত্ত দুগ্ধ পান করিলেন।

সনাতনও লোককে ডাকাডাকি করিয়া হাজির করিয়া দুইখানি হাল ও চারিটী বলদ লইয়া প্রস্তুত হইল। সকলে ক্ষেতের দিকে চলিল। পথে অন্যান্য কথা হইতে হইতে সনাতন বলিল, "তা বাবু এত কষ্ট করে যাবেন কেন, আমি আপনার জমি দুটো চাষ দিয়েছি, আর একটা চাষ হলেই হয়, আজ সব হয়ে যাবে, তার পর কাল ধান বুনে দেব। আপনি আর কষ্ট করেন কেন?"

হেম। না, আমি অনেক দিন অবধি আমার জমিটা দেখিনি, তোরা কি কচ্ছিস না কচ্ছিস একবার দেখা ভাল, তাই আজ সকালে মনে কর্‌লেম, একবার দেখে আসি।

সনাতন। তা দেখুন না, আপনার জিনিস দেখবেন না? জমিটা ভাল, ধান বেশ হয়, তবে আপনারা ভদ্রলোক, জন খাটিয়ে চাষ করাতে হয়, তাই বোধ হয় আপনাদের তত লাভ হয় না।

হেম। সামান্যই লাভ হয়। তোমাদের জন মজুরদের দিয়ে বেশী থাকে না। গেল বার বুঝি ২০০।২৫০ মণ ধান হয়েছিল, কিন্তু তোদের দিয়ে, বীজ খরচ দিয়ে, জমিদারের খাজনা দিয়ে ১০০ টাকার বড় বেশী ঘরে উঠেনি।

সনাতন। তা বাবু, সেই যে একবার বলেছিলেন, জমিটা ভাগে দেবেন, তা কি এখন ইচ্ছে আছে? যদি দেন, তবে আমাকেই দেবেন, আমি আপনার বাড়ীর চাকর, আপনার বাপের আমল থেকে ঐ জমি করছি। আপনাকেও কোন কষ্ট পেতে হবে না, কিছু দেখ্‌তে হবে না, আমি নিজের খরচে চাষবাস কর্‌ব, আমার হাল গরু সবই আছে, বছরের শেষে অর্দ্ধেক ধান মেপে গাড়ী করে আপনার বাড়ীতে পঁহুছিয়ে দেব।

হেম। কেন বল্‌ দেখি, তোর ভাগ নেবার এত ইচ্ছে কেন?

সনাতন। আজ্ঞে, আপনি ত জানেন, আমার একখানি নিজের ছোট জমি আপনার জমির পাশে আছে, কিন্তু ৮।১০ কুড়ো, তাতে পেট ভরে না, আপনাদের কাছে মজুরি করে যা পাই তাতেই আমার চলে। তবে যদি আপনার জমিটা ভাগে পাই, তবু লোকের কাছে বলতে পার্‌ব, এতটা জমি ভাগে করি। আর আপনাদের যত খরচ হয়, আমরা ছোটলোক, আমাদের চাষে তত খরচ হবে না, দু পয়সা পাব, ছেলেগুলো খেয়ে বাঁচবে।

হেম। তা আচ্ছা, দেখা যাক কি হয়। তুই এখন ত আমার জমিটা বুনে দে, তারপর যা হয় কর্‌ব এখন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা করিতে করিতে হেমচন্দ্র, সনাতন ও সনাতনের লোকজন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে গিয়া পড়িলেন।

বৈশাখ মাসের দুই একটী বৃষ্টির পর সকল জমিই চাষ হইতেছে। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে কৃষকগণ আনন্দে গান করিতে করিতে অথবা গরুকে নানারূপ নিকট সম্বন্ধবাচক কথায় উত্তেজিত করিতে করিতে চাষ দিতেছে। ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র, বঙ্গদেশের উর্ব্বরা ভূমির

অন্ত নাই, তাহাই বাঙ্গালীদিগের প্রাণসর্ব্বস্ব। জমির পার্শ্বস্থ আইলের উপর দিয়া অনেক জমি পার হইয়া অনেক কৃষকের কৃষি-কার্য্য দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র নিজ জমির দিকে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্যও তাঁহার জমি দেখা হইল না, পরে তিনি সহসা তাঁহার শ্বশুর মহাশয় তারিণীবাবুকে দেখিতে পাইলেন। তারিণীবাবু পূর্ব্বদিন কার্য্যবশতঃ অন্য গ্রামে গিয়াছিলেন, অদ্য প্রত্যূষে বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এ কি বাবা, এখানে মজুরের সঙ্গে কোথা যাচ্ছ? এস, ঘরে এস। তবে ভাল আছ? আমি প্রত্যহই মনে করি তোমাকে একবার ডেকে খাওয়াই, তবে কি জান, বর্দ্ধমান থেকে ছুটী নিয়ে এসে অবধি নানা বিষয়কার্য্যে বিব্রত, আর শরীরও ভাল নেই, আর ছেলেগুলোকে টিক্ টিক্ করে বলি, তোমাকে একবার নিমন্ত্রণ করে আস্‌বে, তা যদি তারা ঘর থেকে একবার বেরয়। তা তুমি একদিন এস, খাওয়াদাওয়া করো।"

হেমচন্দ্র শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে ফিরিলেন। বলিলেন, আজ্ঞে তা যাব বৈ কি, আমিও মনে করেছিলেম আজকালের মধ্যে একবার দেখা কর্‌ব, কিছু আবশ্যক আছে। মহাশয়ের যদি অবকাশ থাকে, তবে আজই সন্ধ্যার সময় আসি।

তারিণী। তা তুমি ঘরের ছেলে, আবার অবকাশ অনবকাশ কি, যখন আসবে, তখনই দেখা হবে। বাছা উমাতারা শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে, সেও কতবার বলেছে, বাবা একবার হেমবাবুকে নিমন্ত্রণ কর না, আর গিন্নীও তোমার কথা কত বলেন। তা আস্‌বে বৈ কি, এস, আজ সন্ধ্যার সময় এস, কিছু জলযোগ করো।

এইরূপ কথাবার্ত্তা করিতে করিতে উভয়ে একত্রে গ্রামে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বড় মানুষের কথা

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র তারিণীবাবুর বাড়ীতে যাইলেন। বাড়ীর বাহিরে গোয়ালঘর আছে, দু তিনটী ধানের গোলা আছে, একটী পূজার চণ্ডীমণ্ডপ আছে ও তাহার সম্মুখে যাত্রার একখানি বড় আটচালা আছে। নাজিরবাবুর বাড়ীতে বড় ধুমধামে দুর্গাপূজা হয়, নাচ গাওনা বাজনা হয়, প্রসিদ্ধ যাত্রার দল বৎসর বৎসর আইসে, এবং গ্রামের লোকে সে বাটী সমাকীর্ণ হয়। প্রতিবারই নাজির মহাশয় পূজার সময় বাড়ী আসেন, এবার কোনও আবশ্যকের জন্য বৈশাখ মাসে এক মাসের ছুটী লইয়া আসিয়াছেন।

আজ দুই বৎসর হইল, তারিণীবাবু আপনার বসিবার জন্য বাহিরে একটী পাকা ঘর করিয়াছেন, এবং বাড়ীর পার্শ্বে কতকগুলি ইঁটের পাঁজা পোড়ান হইয়াছে, গৃহিণীর বড় ইচ্ছা যে শুইবার ঘরটীও পাকা হয়। সেই পাকা বৈঠকখানা ঘরে একটী তেলের বাতি জ্বলিতেছে, একটী বড় তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চ ও চাদর বিছান আছে, তাহার উপর তারিণীবাবু বসিয়া ধুম সেবন করিতেছেন, পাড়ার ৪।৫ জন লোক সম্মুখে বসিয়া নানারূপ আলাপ ও গল্প রহস্য করিতেছে।

হেমচন্দ্র আসিবামাত্র তারিণীবাবু তাহাকে বসিতে দিলেন এবং দুই চারিটী মিষ্টালাপ করিয়া একটী ছেলেকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বলিলেন।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে বেড়া দেওয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সম্মুখে শুইবার ঘর, উচ্চ ভিটার উপর সুন্দর বড় আটচালা, তাহার এ পাশে ও পাশে উচ্চ ভিটার উপর সুন্দর সুন্দর তিন চারিখানি চৌচালা বা পাঁচচালা ঘর। ঘরের ভিটিগুলি সুন্দররূপে লেপা, উঠান ঝাঁট দেওয়া ও পরিষ্কার, এবং তাহার এক পার্শ্বে রান্নাঘর। বাটীর পশ্চাতে একটী বড় রকম পুকুর; তাহার চারিদিকে বাগান, নারিকেল আম কাঁঠাল প্রভৃতি নানারূপ ফলের গাছ আছে।

হেমচন্দ্র বাড়ীর ভিতর আসিয়াই শাশুড়ীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর পার হইয়াছে, শরীরখানি গৌরবর্ণ, স্থূল এবং কিছু খর্ব্ব হইলেও জম্‌কাল। স্থূল বাহুর উপর মোটা মোটা তাবিজ ও বাজু বাহুর সৌন্দর্য্য ও সংসারের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। হাতে মোটা মোটা দুই গাছি বালা, পায়ে মোটা মোটা মল। তাঁহার সেই বহুমূল্য গহনা ও গৌরবের শরীরখানি দেখিলে, তাঁহার আস্তে আস্তে চলন ও ভারি ভারি পদবিক্ষেপ দেখিলে, তাঁহার অল্প অল্প

হাসিমাখা, একটু একটু গৌরব ও দর্পমাখা কথাগুলি শুনিলে তাঁহাকে বড় মানুষের গৃহিণী বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি তারিণীবাবুর গৃহিণী মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটী সাদা, তাঁহার কথাগুলিতে একটু একটু দর্প থাকিলেও হাস্যপূর্ণ ও মিষ্ট, তিনি আপনার সুখ্যাতি, ধন বা গৌরবের কথা শুনিতে ভালবাসিলেও পরের নিন্দা, পরের অনিষ্ট বা পরকে ক্লেশ দেওয়া ইচ্ছা করিতেন না।

শাশুড়ী। বলি, বাড়ীর পাশে বাড়ী, তবু কি এক দিনও আস্‌তে নেই? বুড়ী আছে কি মরেছে বলে আর খবর নাও না?

হেম। না, তা নয়, প্রত্যহই আপনাদের খবর পাই, তবে আমাদের অবস্থা সামান্য, সর্ব্বদাই কাজকর্ম্মে রত থাক্‌তে হয়।

শাশুড়ী। হাঁ, এখন তাই বল্‌বে বই কি? এই এত করে বিন্দুকে হাতে করে মানুষ করলুম, এত করে তার বিয়ে থা দিলুম, তা সেও কি একবার জিজ্ঞেস করে না যে জ্যেঠাইমা কেমন আছে?

হেম। সে সর্ব্বদাই আপনার তত্ত্ব নেয়, আর এই উমাতারা এসে অবধি একবার আস্‌বে মনে কর্‌ছে, কিন্তু সংসারের সকল কাজ তাকেই করতে হয়, আর ছেলেটীরও ব্যারাম, সেই জন্য আসতে পারে না। তা উমাতারা যদি একদিন আমাদের বাড়ী যায়, তবে তার বোনের সঙ্গেও দেখা হয়, ছেলে দুটীকেও দেখে আসতে পারে।

শাশুড়ী। না বাপু, উমার যে ঘরে বিয়ে হয়েছে, তাদের এমন মত নয় যে, উমা কারও বাড়ীতে যাওয়া আসা করে। তারা ভারি বড় মানুষ, ধনপুরের বনিয়াদি বড় মানুষ, ঐ যে আগে ধনেশ্বর বলে নবাবদের দেওয়ান ছিল না, তাদেরই ঝাড়, ভারি বড়লোক, এ অঞ্চলে তেমন ঘর নাই।

হেম। হাঁ, তা আমি জানি।

শাশুড়ী। হাঁ, জানবে বৈ কি, তাদের ঘর কে না জানে? ক্রিয়া, কর্ম্ম, দান, ধর্ম্ম, সকল রকমে, বুঝলে কি না, তাদের যেমন টাকা, তেমনি যশ। এই এবার তাদের একটী মেয়ের বিয়ে হল বর্দ্ধমানে, ঐ ইনি যেখানে কর্ম্ম করেন, সেই খানে, তা বিয়েতে দশ হাজার টাকা খরচ কর্‌লে। তাদের কি আর টাকার গুণাগুন্তি আছে? বছর বছর পূজা হয়, তা দেশের যত বামুন আছে, বুঝলে কি না, এ ধনপুরের দক্ষিণা পায় না এমন বামুনই নেই।

হেম। তা আমি জানি।

শাশুড়ী। তা, উমাকে কি শিগ্‌গির পাঠায়; সেই পূজার সময় একবার করে পাঠায়, আর পাঠায় না। এবার ইনি ছুটী নিয়ে এসেছেন, তাই কত লোক পাঠিয়ে হাঁটাহাঁটি করে তবে উমাকে পাঠিয়েছে, তাও বলে দিয়েছে ১৪ দিনের বাড়া যেন এক দিনও না থাকে, তা এই ১৪ দিন হলেই পাঠাব। এই বর্দ্ধমানে আমাদের লোক গিয়েছে, কাপড়, সন্দেশ, আঁব, লিচু, এই সব আনতে দিয়েছি, মেয়ের সঙ্গে পাঠাতে হবে। বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে কিছু খরচ করতেই হয়।

হেম। তা হয়ই ত, তা এর মধ্যেই আমার স্ত্রীকে ছেলেদের নিয়ে পাঠিয়ে দেব এখন। সে উমার সঙ্গে দেখা করে যাবে।

শাশুড়ী। হাঁ, তা আসবে বৈ কি; বিন্দু আমার পেটের ছেলের মত, সে আসবে না? সে আসবে, আর তুমিও বাছা মধ্যে মধ্যে এসো, আমাদের খোঁজখবর নিও।

হেম। হাঁ, তা আস্‌বো বৈ কি। এখন উমা আর আছে ক দিন?

শাশুড়ী। আর আছে কি? এই বর্দ্ধমান থেকে আঁব সন্দেশ এলেই উমাকে পাঠিয়ে দেব; মেয়ের সঙ্গে কিছু না দিলে ত ভাল দেখায় না, বড় মানুষ কুটুম করেছি, কিছু না দিলে থুলে কি ভাল দেখায়? আবার দেখ, এই আসছে মাসে ষষ্ঠীবাটা, আবার তত্ত্ব করতে হবে। তাতেও বিস্তর খরচ আছে।

হেম। তা বটেই ত।

শাশুড়ী। কাজেই, যেমন কুটুম করেছি, তেমনি তত্ত্ব করতে হয়, লোকের কাছেও আমাদের একটু মানসম্ভ্রম আছে, কুটুমেরাও জানে আমরা বিষয়ী লোক, কাজেই কিছু দিয়ে থুয়ে তত্ত্ব না করলে ভাল দেখায় না। তবে তোমার ছেলে দুটী ভাল আছে?

হেম। না, খোকার ৫।৭ দিন থেকে রাত্রে একটু গা গরম হয়, তা আমি কাল কাটোয়া থেকে ঔষধ এনে খাওয়াচ্ছি, আজ একটু ভাল আছে।

শ্বাশুড়ী। বেশ করেছ, বাছা বিন্দুও ঐ রকম ছিল, কাহিল ছিল, মধ্যে মধ্যে জ্বর হত। আহা সে দিনকার ছেলে, বাছা এমন ধীর শান্ত ছিল যে, মুখটী খুলে কখনও কিছু চায়নি, আমি যতক্ষণ না ডেকে তাকে ভাত খাওয়াতেম, ততক্ষণ সে মুখটী তুলে একবার বল্‌ত না যে, জ্যেঠাইমা, ক্ষিদে পেয়েছে। জ্যেঠাইমা তার প্রাণ; আর বাপ মরে অবধি তার মার আর মন স্থির ছিল না, সুতরাং বিন্দুকে আর সুধাকে আমি যতক্ষণে খাওয়াতেম, ততক্ষণে খেত, যতক্ষণে পরাতেম, ততক্ষণে পর্‌ত। আমার উমাতারা যে, বিন্দুও সে, আহা বেঁচে থাকুক, একবার আসতে বলো।

হেম। হাঁ, আস্‌বে বৈ কি।

শ্বাশুড়ী। এই পূজার সময় বিন্দু এল, আবার সেই দিনই চলে গেল; এবার পূজার সময় ত তা হবে না। ঘরের মেয়ে, পূজার সময় ঘরে ৫।৭ দিন থেকে কাজকর্ম্ম কর্‌বে। আর কাজ কর্ম্ম ত এমন নয়, এই আমাদের ঠাকুর দর্শন করতে, বুঝলে কিনা, এই ৩।৪ ক্রোশের মধ্যে যত গ্রাম আছে, সব গ্রামের কি ইতর, কি ভদ্র সবাই আসে। তোমরা বাছা বাইরে থেকে এসে, বাইরে থেকে চলে যাও, ঘরের কাজ ত জান না। রাত তিনটের সময় হাঁড়ি চড়ে, বেলা তিনটে পর্য্যন্ত উনুনের জ্বাল নেবে না, তবু ত কুলিয়ে উঠতে পারিনি! লোকই কত, খাওয়াদাওয়াই কত, তার কি সীমা পরিসীমা আছে?

হেম। তা আর আমি দেখিনি, প্রতি বছরই দেখছি। আপনার বাড়ীর পূজার ধুমধাম, এ সকলেই জানে।

শ্বাশুড়ী।। তা কি জান বাপু, বংশানুগত ক্রিয়াকর্ম্মটা উঁনি না করলে নয়। তবে যদি টাকা না থাক্‌ত, সে আলাদা কথা। এই গ্রামে কি সকলেই পূজা করে, এই তোমরা কি পূজা কর, তা ত নয়, তার জন্য লোকে ত কিছু বলে না। তবে আমাদের পুরুষানুক্রম থেকে এটা আছে, মল্লিকদের বাড়ীর একটা নাম আছে, এঁর চাকরিও আছে, কাজেই আমাদের না করলে নয়, এই জন্য করা।

হেম। তা বটেই ত।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত হেমচন্দ্র এই মল্লিক বাড়ীর ইতিহাস, ধনের ইতিহাস, পূজার ইতিহাস, ধনপুরের ধনেশ্বরের বংশের গৌরব, মেয়ের গৌরব, তত্ত্বের গৌরব এই সমুদয় হৃদয়গ্রাহী বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সেইদিন সায়ংকালে শুনিয়াছিলেন, তাহা আমরা ঠিক জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে ক্ষণেক পর হেমচন্দ্রের (দৈনিক পরিশ্রমের জন্যই বোধ হয়) চক্ষু দুটী একটু একটু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে তিনি কথার স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ না করিয়াই, "তা বটেই ত", "তা বৈ কি" ইত্যাদি শ্বাশুড়ীর সন্তোষজনক শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন। রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে, এমন সময় ঝম ঝম করিয়া শব্দ হইল; ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের পুত্রবধূ, ষোড়শবর্ষীয়া, হীরক-মুক্তা-বিভূষিতা রূপাভিমানিনী উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

উমাতারা অতিশয় গৌরবর্ণা, মুখখানি কাঁচা সোণার মত, এবং তাহার উপর সুবর্ণ ও হীরকের জ্যোতি বড় শোভা পাইতেছে। মাথায় সুন্দর চিক্কণ কালো চুলের কি সুন্দর চিক্কণ খোঁপা, তার উপর কপালে জড়োয়া সিঁতির কি বাহার হইয়াছে! খোঁপায় সোণার ফুল, সোণার প্রজাপতি আর একটী হীরার প্রজাপতি! হাতে পৈঁচা, যবদানা, মরদানা, আর জড়োয়া বালা, বাহুতে জড়োয়া তাবিজ ও বাজুর কি শোভা! পিঠে পিঠঝাঁপা দুলিতেছে, কটিদেশে চন্দ্র-বিনিন্দিত চন্দ্রহার! গলায় চিক, বুকে সখের সাতনর মুক্তাহার! হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,

"ইস্‌, আজ কি ভাগ্‌গি, না জানি কার মুখ দেখে উঠেছি!"

হেমচন্দ্র। আমার ভাগ্‌গি বল; ভাগ্‌গি না হলে কি তোমাদের মত লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়!

উমা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তা নৈলে আর এই দশদিন এখানে এসেছি, একবারও দেখা করতে আস না? তা যা হোক, ভাল আছ ত? বিন্দুদিদি ভাল আছেন?

হেম। সে ভাল আছে। তুমি ভাল আছ?

উমা। আছি, যেমন রেখেছ, তবু জিজ্ঞেস করলে এই ঢের। তা আজ এখানে আমাদের দর্শন দিলে কি মনে করে? বিন্দুদিদি যে বড় ছেড়ে দিলে, এতক্ষণ এখানে আছ, রাগ করবেন না ত?

হেম। তোমার বিন্দুদিদি আপনি আসতে পারলে বাঁচে, সে আর ছেড়ে দেবে না? সে এই কত দিন থেকে তোমাকে দেখ্‌বার জন্য আস্‌বে আস্‌বে করছে। তা কাল-পরশুর মধ্যে একদিন আস্‌বে।

উমা। তবে কালই পাঠিয়ে দিও। দেবে ত?

হেম। আচ্ছা কালই আস্‌বে। সেও তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে অতিশয় উৎসুক, তুমি শ্বশুরবাড়ী থাক্‌লে সর্ব্বদাই তোমার মার কাছে তোমার খবর জেনে পাঠায়।

উমা। তা আমি জানি। বিন্দুদিদি আমাকে ছেলেবেলা থেকে বড় ভালবাসেন, ছেলেবেলা আমরা দুজনে এক সঙ্গে খেলা কর্‌তাম, সে আমাকে একদণ্ড না দেখে থাক্‌তে পারত না। ছেলেবেলা মনে কর্‌তুম, বিন্দুদিদির সঙ্গে চিরকাল এক সঙ্গে থাকব, প্রত্যহ দেখা হবে, কিন্তু ছেলেবেলার ইচ্ছাগুলি কি কখনও সম্পন্ন হয়? মনের ইচ্ছা মনেই থাকে। তা কাল তোমার ছেলেটিকেও পাঠিয়ে দেবে?

হেম। দেব বৈ কি, অবশ্য দেব।

উমাতারা অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উমার পিতার ধনলিপ্সায়, মাতার ধন গৌরবে, শ্বশুরবাড়ীর বড়মানুষী চালে, উমার বাল্যহৃদয়, বাল্য ভালবাসা একেবারে বিলুপ্ত করে নাই, সে এখনও বাল্যকালের সৌহৃদ্য কখন কখন মনে করিত, বাল্যকালের সুহৃদকে একটু স্নেহ করিত। ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের পুত্রবধূর অপূর্ব্ব রূপগরিমা ও বহুমূল্য হীরকমুক্তাদি দেখিয়া আমরা প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিলাম—এগুলি দেখিলেই আমাদিগের একটু ভয় সঞ্চার হয়—এক্ষণে, যাহা হউক, তাহার হৃদয়ের সদ্‌গুণ দেখিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম; আর এই সামান্য সদ্‌গুণটী জগৎ-সংসারে সচরাচর দেখিতে পাইলে সুখী হইব। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর উমা বলিলেন,

“তবে এখন একবার উঠ. অনুগ্রহ করে যখন এসেছ, একটু জলটল খেয়ে যাও, জল খাবার তৈয়ের হয়েছে।”

উমা ঝম ঝম করিয়া আগে আগে গেলেন, হেমচন্দ্র বিনীতভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। খাবার ঘরে ঢুকিলেন, খাবার সম্মুখে দুটী সামাদান জ্বলিতেছে, রূপার থালে খানকত লুচি আর নানারূপ মিষ্টান্ন, চারিদিকে রূপার বাটীতে নানারকম ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ ক্ষীর, যেন পূর্ণচন্দ্রের চারিদিকে কত নক্ষত্র বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে! হেমচন্দ্রের কপালে এরূপ আয়োজন, এরূপ খাবারদাবার সহসা ঘটে না, এই রৌপ্য সামগ্রীর মূল্যে তাঁহার এক বৎসরের সাংসারিক খরচ চলিয়া যায়।

উমাতারা আবার বলিলেন, “তবে খেতে বসো, গরিবদের যথাসাধ্য কিছু করেছি, ত্রুটী হয়ে থাকলে কিছু মনে করো না।”

শ্যালীর সহিত অনেক মিষ্টালাপ করিতে করিতে হেমচন্দ্র আহার করিতে লাগিলেন। যে বৎসর বিন্দুর বিবাহ হইয়াছিল, তাহারই পর বৎসর উমার বিবাহ হয়। উমা অতিশয় গৌরবর্ণা ও সুন্দরী, হেমচন্দ্রের মতে উমার চেয়ে বিন্দুর নয়ন দুটী সুন্দর ও মুখের শ্রী অধিক, কিন্তু এ বিষয়ে হেমচন্দ্র নিরপেক্ষ সাক্ষী নহেন, সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্য আমরা গ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। গ্রামে সকলে বলিত, বিন্দু কালো মেয়ে, উমা সুন্দরী, এবং সেই সৌন্দর্য্যগুণেই উমার বড় ঘরে বিবাহ হইল। ধনপুরের জমিদারের ছেলে সুন্দরী না হইলে বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, উমা সুন্দরী মেয়ে বলিয়া তাহার সেই স্থানে বিবাহ হইল।

তারিণীবাবু এত ধনবান সম্বন্ধ করিয়া অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিলেন, তারিণীবাবুর মহিষীও ধনপুরের দাসীর নিকট গঞ্জনা সহিতেন; কিন্তু বড়মানুষের কাছে লাথী ঝাঁটাও সয়, গরিবের একটী কথা সয় না।

তারিণীবাবু ধনী কুটুম্ব করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার মানসম্ভ্রম বাড়িল; তিনি ক্রমে দেশের মধ্যে একজন বড়লোক হইতে চলিলেন। এরূপ লাভ হইলে গোপনে দুই একটী

গঞ্জনা ও তিরস্কার ও কুটুম্বের ঘৃণা কোন্ বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকে হেলায় না বহন করেন?

উমাতারার টাকার সুখ হইল, অন্য সুখ তত হইয়াছিল কি না, জানি না, যদি এই উপন্যাসের মধ্যে ধনপুরের জমিদার পুত্রের সহিত কখনও দেখা হয়, তবে সে কথার বিচার করিব। তবে শুনিয়াছি, বয়সের সহিত সেই জমিদারপুত্রের রূপলালসা বাড়িতে লাগিল এবং নানা দিকে প্রবাহিত হইল। কিন্তু বড়মানুষের কথায় আমাদের এখন কাজ নাই, আমরা গরিব গৃহস্থের ইতিহাস লিখিতেছি।

উমার শ্বশুরবাড়ীতে অন্য কষ্টেরও অভাব ছিল না। গরিবের মেয়ে বলিয়া কখন কখন কথা সহিতে হইত, ননদদিগের লাঞ্ছনা, সময়ে সময়ে দাসীদিগেরও গঞ্জনা! কিন্তু গা-ময় গহনা পরিলে বোধ হয় অনেক কষ্ট সয়, মুক্তাহার ও জড়োয়া দেখিলে বোধ হয় হৃদয়জাত অনেক দুঃখের হ্রাস হয়। এ শাস্ত্রে আমরা বড় বিজ্ঞ নহি, সুবর্ণ রৌপ্যের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই, জড়োয়া চক্ষুতে বড় দেখি নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও জানি না। হীরকের জ্যোতিতে মনের মালিন্য ও অন্ধকার কতদূর দূর হয়, বিজ্ঞবর পণ্ডিত ও পণ্ডিতাগণ নির্দ্ধারণ করুন। আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অবধি উমাতারার সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে এবং অনেকবার উমাতারার সেই সুবর্ণমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে একটু সন্দিগ্ধমনা হইলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন, সেই হীরকমণ্ডিত সুন্দর ললাটে এই বয়সেই এক একবার চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে, যেন সেই হাস্যবিস্ফারিত নয়নের প্রান্তে সময়ে সময়ে চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে। এটী কি প্রকৃতই চিন্তার ছায়া, না সেই সামাদানের আলোক এক একবার বায়ুতে স্তিমিত হইতেছে, তাহার ছায়া? না ভবিষ্যৎ জীবন যৌবনের ললাটে আপন ছায়া অঙ্কিত করিতেছে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিষয় কর্ম্মের কথা

আহারাদি সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্র বাহির বাটীতে আসিলেন, দেখিলেন, তারিণীবাবু তখন একাকী বসিয়া আছেন। প্রদীপের স্তিমিত আলোকে একখানি কাগজ পড়িতেছেন, সেখানি দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র নহে, সে একটী পুরাতন তমসুক। তারিণীবাবুর কপালে বয়সের দুই একটী রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, শরীর স্থূল, বর্ণ শ্যাম, চক্ষু দুটী ছোট ছোট কিন্তু উজ্জ্বল, মস্তকে টাক পড়িতেছে, সম্মুখের কয়েক গাছি চুল পাকিয়াছে। তারিণীবাবুর আকারে বা আচরণে কিছু মাত্র বাহ্যাড়ম্বর বা অর্থের দর্প ছিল না, যাঁহারা বিষয় সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের সেগুলি বড় থাকে না, যাঁহারা ভোগ করেন বা উড়াইয়া দেন, তাঁহাদেরই সেগুলি ঘটিয়া থাকে। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া তারিণীবাবু কাগজখানি রাখিলেন, ধীরে ধীরে চশ্‌মাটী খুলিয়া রাখিলেন, পরে নম্র ও ধীর বচনে বলিলেন, “এস বাবা, বসো।” হেমচন্দ্র উপবেশন করিলেন।

মিষ্টালাপ ও অন্যান্য কথার পর হেমচন্দ্র বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলেন, তারিণীবাবু কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া তাহা শুনিলেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগিলেন।

হেম। অনেক দিন পরে আপনি বাড়ী এসেছেন, আপনাকে দেখে ও কথাবার্ত্তা শুনে বড় সুখী হলেম, যদি অনুমতি করেন তবে একটু বিষয় কর্ম্মের কথা বলতে ইচ্ছে করি।

তারিণী। হাঁ, তা বল না, তার আবার অনুমতি কি বাবা, যা বল্‌তে হয় বল, আমি শুনছি।

হেম। আমার শ্বশুর মহাশয় যে সামান্য একটু জমি চাষ করাতেন, তারই কথা বল্‌ছি।

তারিণী। বল।

হেম। সে জমিটুকু আমার শ্বশুর মহাশয় আজীবন দখল কর্‌তেন ও চাষ করাতেন, তাঁর পূর্ব্বে তাঁর পিতা আজীবন চাষ করাতেন, তা অবশ্যই আপনি জানেন।

তারিণী। জানি বৈ কি। হরিদাসের পিতার পূর্ব্বে তাঁর পিতা সেই জমি চাষ করাতেন, তিনি আমারও পিতামহ, হরিদাসেরও পিতামহ। তখন আমরা বালক ছিলেম, কিন্তু সে কথা বেশ মনে আছে। পিতামহের কাল হলে আমার পিতাই সমস্ত জমি চাষ করাতেন, হরিদাসের

পিতা জ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিষয়-বুদ্ধি বড় ছিল না, এই জন্য আমার পিতাই সমস্ত সম্পত্তি এজমালিতে তত্ত্বাবধান কর্‌তেন। পরে আমার জ্যেঠা, হরিদাসের পিতা, পৃথক হয়ে গেলে তাঁর জীবন যাপনের জন্য আমার পিতা তাঁকে কএক বিঘা জমি চাষ কর্‌তে দিয়াছিলেন মাত্র। হরিদাসও আজীবন সেই জমিটুকু চাষ করে এসেছে মাত্র, কিন্তু আমাদিগের সম্পত্তি এজমালি। এ সকল কথা বোধ হয় তুমি জান না, কেমন করেই বা জানবে, তুমি সে দিনের ছেলে আর ছেলেবেলা ত গ্রামে বড় থাকতে না, বর্দ্ধমানে ও কল্‌কেতায় লেখাপড়া কর্‌তে।

হেমচন্দ্র এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, সম্পত্তি এজমালি তাহা এই নূতন শুনিলেন! তারিণীবাবুর এই নূতন সুন্দর তর্কটী শুনিয়া তাঁহার একটু হাসি পাইল, কিন্তু অদ্য তিনি তর্ক খন্ডন করিতে আইসেন নাই, আপোস করিতে আসিয়াছেন; সুতরাং হাসি সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “পূর্ব্বের কথা আপনি আমাপেক্ষা অনেক অধিক জানেন তাহার সন্দেহ নাই। আমি এই মাত্র বল্‌ছিলেম যে শ্বশুর মহাশয় যে জমি আজীবন কাল পৃথক রূপে চাষ করে এসেছেন, তা হতে তাঁর অনাথা কন্যা কিছু প্রত্যাশা করতে পারে কি?

তারিণী। আহা! বাছা বিন্দু এই বয়সেই পিতামাতা হারা হয়ে অনাথা হয়েছে তাহা ভাব্‌লে বুক ফেটে যায়! আহা! আজ যদি হরিদাস থাক্‌ত, এমন সোণার চাঁদ মেয়েকে নিয়ে, এমন সচ্চরিত্র সোণার জামাইকে নিয়ে ঘর কর্‌তে পার্‌ত, তাহলে কি এত গন্ডগোল হত, এত খরচ করে আমাকে তার কর্ষিত জমিটুকু রক্ষা কর্‌তে হত? তবে ভগবানের ইচ্ছা। হরিদাস গেছে, আমাকে একলাই সমস্ত ভার বহন কর্‌তে হল; এজমালি জমির যে অংশটুকু সে চাষ করতো, তা পুনরায় অন্যান্য জমির সঙ্গে আমাকেই তত্ত্বাবধান করতে হচ্ছে। তাতে আমার লাভ বিশেষ নেই, সেই জমিটুকুর রক্ষার জন্য তার মূল্যে অপেক্ষা অধিক ব্যয় কর্‌তে হয়েছে। কিন্তু কি করি, পৈতৃক সম্পত্তি পরের হাতে যায়, জমিদার অন্যকে দেয়, তা ত আর চক্ষে দেখা যায় না।

হেম। তবে শ্বশুর মহাশয়ের জমি হতে কি তাঁর কন্যা কিছুই প্রত্যাশা কর্‌তে পার্‌বে না?

তারিণী। প্রত্যাশা আবার কি বল; আমরা বুড়োসুড়ো লোক, তোমরা কালেজের ছেলে, তোমাদের সব কথা একটু ভেঙ্গে না বল্‌লে কি বুঝে উঠতে পারি? বিন্দু আমাদের ঘরের ছেলে, আমার উমা যে, বিন্দুও সে, যত দিন আমার ঘরে এক কুন্‌কে চাল আছে, তত দিন বিন্দু ও উমা তার সমান ভাগ করে খাবে। তাতে আবার জমির অংশই কি, প্রত্যাশাই কি?

হেমচন্দ্র দেখিলেন, তারিণীবাবুর সহিত পেরে উঠা ভার, তারিণীবাবুর সুন্দর তর্ক তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বৃথা চেষ্টা করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা করিয়া অবশেষে কহিলেন, “মহাশয় যদি অনুমতি দেন, যদি রাগ না করেন, তবে আর একটী কথা বলি।”

তারিণী। বল বাবা, এতে রাগের কথা কি আছে? তুমি আমার ছেলের মত, তোমার কথায় আবার রাগ?

হেম। আপনি বোধ হয় জানেন যে শ্বশুর মহাশয় যে জমি আজীবনকাল পৃথকরূপে চাষ করে আসছিলেন, তা যে এজমালি সম্পত্তি তা আমরা স্বীকার করি না।

তারিণী। তোমরা স্বীকার কর্‌বে কেন? তোমরা কালেজের ছেলে, ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছ, তোমরা কি আর এজমালি স্বীকার করবে? এখন কালেজের ছেলেরা ভায়ে ভায়ে একত্র থাকতে পারে না, শুনেছি মায়ে পোয়ে এজমালিতে থাক্‌তে পারে না, তোমাদের কথা কি বল? আমরা বুড়োসুড়ো লোক, আমরা সে সব বুঝি না, আমরা এজমালিতে থাক্‌তে ভালবাসি, বাপ পিতামহ যা করে গেছেন তাই করতে ভালবাসি। আহা, থাক্‌তো আমার হরিদাস, সে জান্‌ত এ জমি মল্লিকবংশের এজমালি সম্পত্তি কি না, তোমরা সে দিনকার ছেলে, তোমরা কি জানবে বল?

হেম। তা যাই হউক, আমরা এজমালি বলে স্বীকার করি না তা আপনি জানেন। আর এজমালিই হক আর নাই হক, সে সম্পত্তির একটু অংশ বোধ হয় আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। আমার শ্বশুর মহাশয় যে জমিটুকু চাষ করতেন, এক্ষণে আমার স্ত্রীর পক্ষে আমি যদি সেই জমিটুকু পৃথকরূপে চাষ করতে চাই, তাতে কি আপনি সম্মত আছেন?

তারিণীবাবু কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, “ছি বাবা, তুমি স্বভাবত

বুদ্ধিমান ছেলে, লেখাপড়া শিখেছ, এমন নির্বুদ্ধির কথা কেন? মল্লিকবংশের বংশানুগত এজমালি জমি কি পৃথক করা যায়? তাই যদি পারতেম, তবে সেই জমিটুকুর মূল্যের দশগুণ খরচ করে আমার হাতেই রাখতেম কেন? সঙ্গত কথা বল, তবে শুন্‌তে পারি; অসঙ্গত কথা শুন্‌ব কেমন করে?" ওরে হরে! আর এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা, রাত হয়েছে, আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে শুতে যাই, কাল রাত্রিতে গ্রীষ্মে বড় ঘুম হয়নি, গাটা বড় ঘুম্‌ ঘুম্‌ করচে।

উগ্রস্বভাব হেমচন্দ্রের মনে একটু রাগের সঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তিনি বাস্তবিকই অসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। যে জমি তারিণীবাবুর ন্যায় বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক দশ বৎসর দখল করিয়া আসিয়াছেন সেটী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলা অসঙ্গত নহে ত কি? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন,

"আপনার যদি শোবার সময় হয়ে থাকে, তবে আমি আর আপনাকে বসিয়ে রাখব না, তবে আর একটী কথা আছে, যদি আজ্ঞা করেন নিবেদন করি।"

তারিণী। না না, তাড়াতাড়ি উঠো না; অনেক দিনের পর তোমাকে দেখলেম, চক্ষু জুড়াল, তোমাকে কি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে? তবে বড় গ্রীষ্ম পড়েছে, তাই গাটা মাটি মাটি করে। তা আমি শুতে যাব না, বিলম্ব আছে, কি বলছিলে বল।

হেম। আপনি সে জমিটুকু ছেড়ে দিতে অস্বীকার করবেন, তা আমি পূর্ব্বেই শুনেছিলাম, তবে সেই জমির জন্য আমরা কিছু কি প্রত্যাশা করতে পারি? এ বিষয় মকদ্দমা করতে আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা, কোনও মতে আপোসে এ বিষয়টা মীমাংসা হয় তাই আমাদের ইচ্ছা। যদি আদালতে যেতে হয়, তবে জমি এজমালি বলিয়া সাব্যস্ত হবে কি না, আর তা হলেও আমরা এক অংশ পাব কি না, বিবেচনা করে দেখুন, কিন্তু আপোসে নিষ্পত্তি হলে আদালতে যেতে আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা।

হেমচন্দ্র উগ্রস্বভাব লোক, সহসা আদালতে যাইতে পারেন, তিনি সেই জন্য সম্প্রতি উকীলদিগের পরামর্শ লইতেছেন, এ কথাগুলি তারিণীবাবু জানিতেন। আদালতে যদি হেমচন্দ্র মকদ্দমার ব্যয় বহন করিতে পারেন, তবে শেষে কি ফল হইবে তাহাও তারিণীবাবু কতক কতক অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আপোসের কথায় বড় অসম্মত ছিলেন না। যৎকিঞ্চিৎ টাকা দিয়া হরিদাসের স্বত্ব একেবারে ক্রয় করিয়া লইবেন, এরূপ মত পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে টাকা দিতে চাহিতেছিলেন, তাহা বড় অল্প। তারিণীবাবু বলিলেন,

"দেখ বাপু, যদি আদালত কর্‌তে ইচ্ছা কর, তবে অগত্যা আমাকেও সেই পথ অবলম্বন কর্‌তে হবে, আদালতে বিস্তর খরচ, কিন্তু সম্পত্তি রক্ষার্থ আমি বোধ হয় সে খরচ বহন কর্‌তে পার্‌ব, তুমি পার্‌বে কি না, তুমিই ভাল জান। আর যদি সে কথা ছেড়ে দিয়ে সত্যিই আপোসের কথা বল, তবে বিন্দুকে হাত তুলে কিছু দেব, তাতে আমার কি আপত্তি হতে পারে? আমরা মূর্খ মানুষ, তোমাদের মত আইনকানুন দেখিনি, কিন্তু বর্দ্ধমানে চাকরি করে আমার চুল পেকে গেছে, মকদ্দমাও বিস্তর দেখেছি। মকদ্দমা করে যে মল্লিকবংশের এজমালি সম্পত্তির এক অংশ ছাড়িয়ে নিতে পারবে এমন বোধ হয় না, ইচ্ছা হয় চেষ্টা করে দেখ। কিন্তু যদি সত্য সত্যই সে বুদ্ধি ছেড়ে দাও, যদি তোমাদের কালেজের ইংরেজী শিক্ষায় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বিবাদ করতে না শিখিয়ে থাকে, যদি বুড়োসুড়ো লোককে একটু শ্রদ্ধা করে তাঁদের একটু বশ হয়ে চলতে শিখিয়ে থাকে, তবে সঙ্গত কথা বল, তাতে আমার কখনই অমত হবে না। দেখ বাপু, আমি এক কথার মানুষ, ঘোরফের বড় বুঝিওনি, ভালও বাসিনি, এক কথাই ভালবাসি। যদি ৩০০খানি টাকা নিয়ে এই জমিটুকুর স্বত্ব একেবারে ছেড়ে দাও, তবে আমি সম্মত আছি। আমরা সামান্য বেতনের চাকরি করি, ৩০০ টাকা কর্‌তে অনেক মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, টাকা বড় যত্নের ধন। তবে বিন্দু আমার ঘরের মেয়ে, তাকে হাতে করে মানুষ করেছি, তার বিয়ে দিয়েছি, তাকে টাকা দেব তাতে আর কথা কি। আমিই ত বিন্দুর বিয়ে দিয়েছি, না হয় আর একখানি ভাল গহনা দিলেম; তাতেও ত দুই তিন শত টাকা লাগে। তা দেখ বাপু, বুড়োর এ কথায় যদি মত হয়, ত দেখ, আর যদি মত না হয়, তোমরা ভাল লেখাপড়া শিখেছ, যেটা ভাল মনে হয় কর।

হেম। মশাই ৩০০ টাকা বড়ই অল্প বোধ হয়। সে জমিতে বৎসরে প্রায় ২০০ টাকার ধান হয়।

তারিণী। তার মধ্যে বীজ খরচ, জন খরচ, জমিদারের খাজনা, পথকর, বাজে খরচ, ইত্যাদি দিয়ে সালিয়ানা কত থাকে তা কি হিসেব করা হয়েছে?

হেম। অল্পই থাকে বটে।

তারিণী। সে জমিটুকু রক্ষার জন্য আমাকে কত খরচ করতে হয়েছে তা কি জানা আছে?

হেম। আজ্ঞে না, তা জানিনি।

তারিণী। তবে আর অল্পমূল্যে হল কি অধিক হল, তা কিরূপে বুঝলে? দেখ বাপু, এ বিষয়ে আর তর্ক অনাবশ্যক, আমি এক কথার মানুষ, এর ঊর্দ্ধ্ব দিতে পারব না। যদি ৩০১ টাকা চাও, তাও দিতে পারব না। আমি যা বললেম, তাতে যদি মত না হয় অন্য পথ অবলম্বন কর।

হেমচন্দ্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। এরূপ মূল্য পাইয়া জমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন মনে করিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভ হইল; কিন্তু বিন্দুর সৎপরামর্শ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,

"মহাশয় যা দিলেন তাই অনুগ্রহ, আমি তাতেই সম্মত হলেম।"

তারিণীবাবুর স্বাভাবিক প্রসন্ন মুখখানি সম্প্রতি কিছু রুক্ষ হইয়া আসিতেছিল, তাঁহার কথা হইতেই আমরা তাহা কিছু কিছু বুঝিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে সে মুখকান্তি সহসা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসন্নতা লাভ করিল। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিলেন,

"তা বাবা, তুমি যে সম্মত হবে তা ত জানাই আছে, তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে কি আজকাল আর দেখা যায়? কত দেখে শুনে তোমার সঙ্গে আমার বিন্দুর বিবাহ দিয়াছি, আমি কি না জেনে শুনেই কাজ করেছি? আর তুমি কালেজে লেখাপড়া শিখেছ, কালেজের ছেলে ভাল হবে না ত কি আমাদের পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ভাল হবে। আজ তোমাকে দেখে যে কত আহ্লাদিত হলেম তা আর তোমার সাক্ষাতে কি বলব? আর দুটা পান খাও না। ওরে হরে! বাড়ীর ভিতর থেকে দুটো পান এনে দে ত।

হেম। আজ্ঞে না, আপনার ঘুমের সময় হয়েছে, আর বসব না।

তারিণী। কোথায় ঘুমের সময়? আমি দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে ঘুমাতে যাই না। আবার কাল রাত্রিতে খুব ঘুম হয়েছিল, আজ একেবারেই ঘুম পাচ্ছে না!

হেমচন্দ্র একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

তারিণী। আর তুমি এত দিনের পর এলে, তোমাকে ফেলে ঘুম! দুটো কথাই কই। আর দেখ বাপু, এই টাকাটা নিয়ে একটা দলিল লিখে দিলেই ভাল হয়। তোমরা কালেজের ছেলে, তোমাদের কথাই দলিল, তবে কি জান, একটা প্রথা আছে, সেটা অবলম্বন করলেই ভাল হয়।

হেম। অবশ্য; যখন কোন কাজ করা যায়, নিয়ম অনুসারে করাই ভাল।

তারিণী। তাত বটেই, তোমরা ইংরেজী শিখেছ, তোমাদের কি আর এ সব কথা বলতে হয়। আর তোমরা যখন দলিল দিচ্ছ, বিন্দু যখন সই করবে, আর তুমি যখন তাতে সাক্ষী হবে, তখন রেজিষ্টারী করা বাহুল্য মাত্র। তবে একটা রীতি আছে।

হেম। অবশ্য আমি সাক্ষী হব, দলিলও রেজিষ্টারি হবে; এরূপ কাজ সমাধা করতে যা যা আবশ্যক, তা সমস্তই হবে।

তারিণী। তা বৈ কি, তা কি তোমার মত ছেলেকে আর বুঝাতে হয়? আর একটা কি জান, দলিলের ষ্ট্যাম্প খরচা আছে, রেজিষ্টারী আপিসে যেতে গাড়ীভাড়া আছে, সেনাক্ত করার খরচা আছে, রেজিষ্টারী ফি আছে, এ কাজটা যে ৮।১০ টাকার কমে সম্পন্ন হয় বোধ হয় না। তা বিন্দু আমার ঘরের ছেলে, সে টাকা আর বিন্দুর কাছে নিতেম না, তবে কি জান, এই ৩০০, টাকা দিতেই আমার বড় কষ্ট হবে, আর যে একটী পয়সা দিতে পারি আমার বোধ হয় না।

হেমচন্দ্র একটু হাসিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, "তারিণীবাবু যাত্রায় এক রাত্রিতে একশত টাকা খরচ করেন, আমার দশ টাকা হইলে মাসের খরচা চলিয়া যায়!" প্রকাশ্যে বলিলেন,

"আচ্ছা আচ্ছা, তাও দিতে আমি সম্মত হলেম।"

তারিণী। তা হবে বৈ কি, তোমার মত সুবোধ ছেলেকে কি আর এ সব কথা বলতে হয়?

আরও অনেকক্ষণ কথা হইল। বিষয়ী তারিণীবাবু একটী একটী করিয়া সমস্ত নিয়মগুলি আপনার সাপক্ষে স্থির করিয়া লইলেন, বিষয়বুদ্ধি-হীন হেমচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

রাত্রি দেড় প্রহরের পর তারিণীবাবু হেমচন্দ্রের অনেক প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহাকে সত্বর বর্দ্ধমানে একটী চাকরী করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং তিনি কালে একজন ধনী, জ্ঞানী, মানী, দেশের বড় লোক হইবেন আশ্বাস দিয়া হেমচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। হেমচন্দ্রও শ্বশুর মহাশয়ের ভদ্রাচরণের অনেক স্তুতিবাদ করিয়া বাড়ী আসিলেন।

আমাদিগের লিখিতে লজ্জা হয়, তারিণীবাবু ও হেমচন্দ্রের এই প্রচুর মিষ্টালাপ ও স্তুতিবাদ তাঁহাদের পরস্পরের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করে নাই। হেমচন্দ্র বাড়ী আসিবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "শাইলককে পণের অল্প অংশ পরিত্যাগ করান যায়, কিন্তু ধনী, মানী, বিষয়ী, বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী তারিণীবাবুর পণ বিচলিত হয় না।" তারিণীবাবুও তাঁহার গৃহিণীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া গৃহিণীকে বলিতেছিলেন, "আজকাল কালেজের ছেলেগুলো কি হারামজাদা; আর হেমই বা কি গোঁয়ার; বলে কি না জ্যাঠাশ্বশুরের সঙ্গে মকদ্দমা করবো! বলতেও লজ্জা বোধ হয় না। শীঘ্র অধঃপাতে যাবে।" গৃহিণী এ কথাগুলি বড় শুনিলেন না, তিনি ধনবান কুটুম্বের কথা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বাল্যকালের বন্ধু

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিয়া দেখিলেন, বিন্দু তাঁহার জন্য উৎসুক হইয়া পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হেমকে দেখিবা মাত্র সে শান্ত মুখখানি স্ফূর্ত্তিপূর্ণ হইল, নয়ন দুটীতে একটু হাসি দেখা দিল, হেমের মুখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া বিন্দু বলিলেন,

"কি ভাগ্‌গি তুমি এতক্ষণে এলে; আমি মনে করলেম বুঝি বাড়ীর পথ ভুলে গেছ বা উমাতারার কথা ঠেলতে পারলে না, আজ জ্যেঠা মশাইয়ের বাড়ী থেকে বুঝি আসতে পার্‌লে না।

হেম। কেন বল দেখি, এত ঠাট্টা কেন! অধিক রাত্রি হয়েছে নাকি?

বিন্দু আবার হাসিয়া বলিলেন, "না, এই কেবল দুপুর রাত্রি! সন্ধ্যা থেকে তোমার একজন বন্ধু অপেক্ষা করছেন।"

হেম। কে? কে? কে?

"এই দেখ্‌বে এস না", এই বলিয়া বিন্দু আগে আগে গেলেন, হেম পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

বাড়ীর ভিতর যাইবা মাত্র একজন গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ উঠিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন; হেমচন্দ্র ক্ষণেক তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, বিন্দু তাহা দেখিয়া মুচকে মুচকে হাসিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর হেম বলিলেন, "এ কি শরৎ! তুমি কল্‌কেতা হতে কবে এলে? উঃ, তুমি কি বদলে গেছ; আমি তোমাকে তোমার দিদি কালীতারার বিবাহের সময় দেখেছিলেম, তখন তুমি বর্দ্ধমানে পড়তে, একবার বাড়ী এসেছিলে; তখন তুমি সাত আট বৎসরের বালক ছিলে মাত্র। এখন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় যুবক হয়েছ, তোমার দাড়ী গোঁপ হয়েছে; তোমাকে কি সহসা চেনা যায়?"

শরৎ। নয় বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়, তার সন্দেহ কি? দিদির বিবাহের পরেই বাবার মৃত্যু হল, তার পর মাও গ্রাম হতে বর্দ্ধমানে গিয়ে রইলেন, সেই জন্য আর বাড়ী আসা হয়নি। আমি এণ্ট্রেন্স পাস করলে পর বর্দ্ধমান হতে কল্‌কেতায় গেলেম, মাও বর্দ্ধমানের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পুনরায় গ্রামে এসে রয়েছেন, তাই আমাদের গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী এলেম। নয় বৎসর পর আপনি আমাতে পরিবর্ত্তন দেখ্‌বেন, তাতে বিস্ময় কি? আমিই তখন কি দেখেছি, আর এখন কি দেখ্‌ছি! বিন্দুদিদি আমার চেয়ে দুই বৎসরের বড়, আমরা ছেলেবেলায় সর্ব্বদা একত্রে খেলা করতেম, আমি মল্লিকদের বাড়ী যেতেম, অথবা বিন্দুদিদি সুধাকে কোলে করে আমাদের বাড়ী দেখ্‌তে আসতেন, পেয়ারা তলায় সুধাকে রেখে আঁকসি দিয়ে পেয়ারা পেড়ে খেতেন; আজ কিনা বিন্দুদিদি সংসারে গৃহিণী, দুই ছেলের মা!

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি আর বলো না, তোমার দৌরাত্ম্যে তালপুকুরের আঁব বাগানে আঁব থাকত না। এখন কল্‌কেতায় গিয়ে লেখাপড়া শিখে তুমি কালেজের ছেলেদের মধ্যে নাকি একজন প্রধান ছাত্র হয়েছ। তখন গেছোদের মধ্যে একজন প্রধান গেছো ছিলে!

শরৎ। বিন্দুদিদি, সেও তোমাদের জন্য! তোমার জ্যেঠাইমা কাঁচা আঁবগুলো খেতে বারণ কর্‌তেন, আমি সন্ধ্যার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়া গলিয়ে রান্নাঘরে আঁব দিয়ে আস্‌তেম কি না, বল না?”

হেম উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, “আর পরস্পরের গুণ ব্যাখ্যার আবশ্যক কি, অনেক গুণ বেরিয়ে পড়েছে! আমিও তোমাদের বাড়ী যেতেম, সুধাকে তথায় কখন কখন দেখতে পেতেম, তখন সুধা ৪।৫ বৎসরের ছোট মেয়েটী। সুধা! ঘোষেদের বাড়ী যেতে মনে পড়ে? সেখানে তোমার দিদি তোমাকে কোলে করে নিয়ে যেতেন, মনে পড়ে, শরৎকে মনে পড়ে?”

সুধা। শরৎবাবুকে একটু একটু মনে পড়ে, দিদি আপনি পেয়ারা পেড়ে খেত, আমি পাড়তে পার্‌তেম না, শরৎবাবু আমাকে কোলে করে পেয়ারা পেড়ে খাওয়াতেন।

হেমচন্দ্র তখন বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের সকলের খাওয়াদাওয়া হয়েছে? শরৎ খেয়েছে?”

শরৎ। হাঁ, বিন্দুদিদি আমাকে যেরূপ কাঁচ আঁবের অম্বল খাইয়েছেন, সেরূপ কাঁচ আঁব কখনও খাইনি!

বিন্দু। কেন, নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন গাছে বেড়াতে, তখন?

শরৎ। হাঁ, তখন খেয়েছি বটে, কিন্তু তখন ত এমন রেঁধে দেবার কেউ ছিল না।

বিন্দু। থাকবে না কেন? রেঁধে দেবার তর্ সইত না, তাই বল।

হেম। সুধার খাওয়া হয়েছে? তোমার খাওয়া হয়েছে?

বিন্দু। সুধা খেয়েছে, আমি এই যাই, খাই গে। তুমি আর কিছু খাবে না?

হেম। না; তোমার জ্যেঠা মশাইয়ের বাড়ীতে যে খেয়ে এসেছি, আর কি খেতে পারি? যাও, তুমি যাও, খাওয়াদাওয়া কর গে, অনেক রাত্রি হয়েছে।

বিন্দু রান্না ঘরে গেলেন। সুধা হেমচন্দ্রের জন্য এতক্ষণ জাগিয়াছিল, এখন রকের উপর একটা মাদুর পাতিয়া শুইল, চিন্তাশূন্য বালিকা শুইবামাত্র সেই শীতল নৈশ বায়ুতে ও শুভ্র বর্ণ চন্দ্রালোকে তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সমস্ত তালপুকুর গ্রাম এখন নিস্তব্ধ এবং সেই সুন্দর চন্দ্রকরে নিদ্রিত।

হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র সেই রকে উপবেশন করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। তালপুকুরের ঘোষ বংশ ও বসু বংশের মধ্যে বিবাহসূত্রে সম্বন্ধ ছিল; হেম ও শরৎ বাল্যকালে পরস্পরকে জানিতেন ও প্রীতি করিতেন। এক্ষণে ক্ষণেক কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র, উন্নতহৃদয়, বুদ্ধিমান, ধীরপ্রকৃতি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরচ্চন্দ্রের অন্তঃকরণ বুঝিতে পারিলেন; শরচ্চন্দ্রও হেমচন্দ্রের উন্নত, তেজঃপূর্ণ অন্তঃকরণ জানিতে পারিলেন। এ জগতে আমাদিগের অনেক পরিচিত লোক আছে, মনের ঐক্য অতি অল্প লোকেরই সহিত ঘটে, সুতরাং হৃদয়ের অনুরূপ লোক দেখিলেই হৃদয় সহসা সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র যতই কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদিগের হৃদয় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, হেম শরৎকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, শরৎ হেমকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন হইতে হইতে বিন্দু আহারাদি সমাপন করিয়া তথায় আসিয়া বসিলেন: সুধার মাথায় বালিশ ছিল না, সুপ্ত ভগিনীর মস্তকটী আপন ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাহার গুচ্ছ গুচ্ছ কেশগুলি লইয়া সস্নেহে খেলা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন।

“শরৎ, তুমি এবার ‘এল, এর’ জন্য পড়ছ। ছয় সাত মাস পরই তোমাদের পরীক্ষা, পরীক্ষায় তুমি যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে এবং জলপানি পাবে তার সন্দেহ নেই! তার পর কি করবে স্থির করেছ?”

শরৎ। কিছুই স্থির নেই। আমার ‘বি, এ’, পর্য্যন্ত পড়তে ইচ্ছে। কিন্তু মা গ্রামে থাকেন। এই পরীক্ষার পর গ্রামে থেকে তিনি আমাকে বিষয়টী দেখতে বলেন। তা দেখা যাক কি হয়, আমাদের বিষয়ও অতি সামান্য, বৎসরে সাত আট শত টাকার অধিক লাভ নেই, কোনও উপযুক্ত চাকরী পেলে কর্‌তে ইচ্ছে আছে। মাও চাকরী স্থানে আমার সঙ্গে থাক্‌বেন, এখানে লোকজন বিষয় দেখবে।

হেম। তা যা হয় তোমার পরীক্ষার পর হবে। এই কয়েকমাস কল্‌কেতায় থেকে মনোযোগ

করে পড়াশুনা কর, ‘এণ্ট্রেন্স’ পরীক্ষা যে রকম সম্মানের সহিত দিয়াছ, এই পরীক্ষাটা সেইরূপ দাও।

শরৎ। সেইরূপ ইচ্ছা আছে। শীঘ্র কল্‌কেতায় গিয়ে পড়তে আরম্ভ কর্‌ব। আমি মনে মনে এক একবার ভাবি, আপনারাও কেন একবার কল্‌কেতায় আসুন না; আপনারা কি চিরকালই এই গ্রামে বাস করিবেন? আপনি নয় বৎসর পূর্ব্বে একবার কল্‌কেতায় কএকমাস ছিলেন, বিন্দুদিদি কখনও কল্‌কেতা দেখেননি; একবার উভয়েই চলুন না কেন? এই চাষ দেওয়া, ধান বুনা হয়ে গেলে আসুন, আমাদের বাড়ীতে থাকবেন, আবার ইচ্ছে হলে পুনরায় ভাদ্র মাসে ধান কাট্‌বার সময় আসবেন।

হেম। শরৎ, তুমি আমাদের স্নেহ কর, তাই একথা বল্‌ছ। কিন্তু আমি কল্‌কেতায় গিয়ে কি কর্‌ব বল? তুমি লেখাপড়া কর্‌বে, পরীক্ষা দেবে, সম্ভবতঃ চাকরী পাবে; আমি গিয়ে কি করব্ বল?

শরৎ। কেন, আপনি কি কোনও প্রকার চেষ্টা দেখ্‌তে পারেন না? আপনি এরূপ লেখাপড়া শিখে কি চিরজীবন এইখানে কাটাবেন? শুনেছি আপনি কালেজ ছেড়ে বিস্তর বই পড়েছেন, যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে, ‘বি,এ’দের মধ্যে অল্প লোকেরই আপনার মত সেটী আছে? আপনার শিক্ষায়, আপনার অধ্যবসায়ে, আপনার উন্নত সততায় কি কোনও এক প্রকার উপায় হবে না?

হেম। শরৎ, আমার শিক্ষা অধিক নয়, সামান্য; পুস্তক পড়তে ইচ্ছা হয়, অন্য কাজ নেই, সেই জন্যে দুই একখানা করে দেখি। আর কল্‌কেতার মত মহৎ স্থানে আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে উপযুক্ত লোক কর্ম্মের জন্য লালায়িত হচ্ছে, কিছু হয় না, আমি যখন কালেজে ছিলেম, তা দেখেছি। গুণ থাকলেও এত লোকের মধ্যে গুণের পরিচয় দেওয়া কঠিন, আমার মত নির্গুণ লোক তিন চার মাসে কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না, ব্যর্থযত্ন হয়ে ফিরে আসতে হবে।

শরৎ। যদি তাই হয়, তাতে ক্ষতি কি? আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ীতে থাক্‌লে আপনাদের কিছুমাত্র ব্যয় হবে না, একবার সকলের কল্‌কেতা দেখা হবে, একবার উন্নতির চেষ্টা করে দেখা যাবে; আমার স্থির বিশ্বাস যে বিশাল মনুষ্য-সমুদ্রেও আপনার মত শিক্ষা, গুণ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও অসাধারণ সততা অচিরেই পরিচিত ও পুরস্কৃত হবে। আর যদি তা না হয়, পুনরায় গ্রামে ফিরে আসবেন, তাতেই বা ক্ষতি কি?

হেমচন্দ্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, “শরৎ, তুমি আমাদের নিজ গৃহে স্থান দিতে চাইলে এটী তোমার অতিশয় দয়া। কিন্তু আমরা যদি সত্যই কল্‌কেতায় যাই, তাহলে নিজেরাই একটী বাসা করে থাক্‌ব, তোমার পড়ার অসুবিধা কর্‌ব না। সে যা হক, এ কথা অদ্য রাত্রে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়, তারিণীবাবু বর্দ্ধমানে যেতে বল্‌ছেন, তুমি কল্‌কেতায় যেতে বল্‌ছ, আমারও ইচ্ছে কোথাও গিয়ে একবার উন্নতির চেষ্টা করে দেখি। বিবেচনা করে, তোমার পরামর্শ নিয়ে একটু ভেবে চিন্তে নিষ্পত্তি কর্‌ব।

শরৎ। বিন্দুদিদি! তোমার কি ইচ্ছে? একবার কল্‌কেতা দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় না?

বিন্দু। ইচ্ছে ত হয়, কিন্তু হয়ে উঠে কৈ? আর শুনেছি সেখানে অতিশয় খরচ হয়, আমরা গরীব লোক, এত টাকাই বা কোথা হতে পাব?

শরৎ। আপনারা ইচ্ছা করে টাকা খরচ কর্‌লেই খরচ হয়, নচেৎ খরচ নেই। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, আপনারা যদি আমাদের বাড়ীতে থাকেন, তাহলে আমার লেখাপড়ার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না; অনেক সময় যখন পড়্‌তে পড়্‌তে মনটা অস্থির হয়, তখন আপনাদের লোকের সঙ্গে কথা কইলে মন স্থির হয়।

বিন্দু। আবার অনেক সময় যখন পড়াশুনা করা উচিত, তখন বাড়ীর ভিতর এসে ছেলেবেলার পেয়ারা পাড়ার গল্প করা হবে! তাতে খুব লেখাপড়া হবে!

শরৎ। আর অনেক সময় যখন ভাত খেতে অরুচি হবে, তখন কাঁচ কাঁচ আঁবের অম্বল খাওয়া হবে; আমি দেখতে পাচ্ছি লাভের ভাগটাই বেশী।

বিন্দু। হাঁ, তোমার এখন লাভেরই কপাল! ঐ যে শুনেছিলেম, অম্বল-রাঁধুনী একটী শীঘ্র আসবে।

শরৎ। কে?

বিন্দু। কেন, কিছু জান না নাকি? ঐ তোমার মা তোমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির কর্‌ছেন না?

শরৎ একটু লজ্জিত হইলেন, বলিলেন—সে কোন কাজের কথা নয়।

হেম। তোমার মা তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির কর্‌ছেন না কি?

শরৎ। মা তত জেদ্ করেন না, কিন্তু দিদির বড় ইচ্ছে যে আমার এখনই বিবাহ হয়, দিদিই নাকি বর্দ্ধমানে সম্বন্ধ স্থির কর্‌ছেন। পরশু গ্রামে এসে অবধি তিনি মাকে লওয়াচ্ছেন! কিন্তু আমি মাকেও বলেছি, দিদিকেও বলেছি, এই পরীক্ষা না দিয়ে এবং কোনও প্রকার চাকরী বা অন্য অবলম্বন না পেয়ে আমি বিবাহ কর্‌ব না।

বিন্দু। আহা, কালীতারার সঙ্গে আমার অনেক দিন দেখা হয়নি। ছেলেবেলা আমি, কালীতারা আর উমাতারা একত্রে খেলা কর্‌তেম, কালী আমার চেয়ে ছ' মাসের ছোট, আর উমা আবার কালীর চেয়ে ছ' মাসের ছোট, আমরা তিনজন সর্ব্বদাই একত্রে থাক্‌তেম। কিন্তু এখন ছ' মাসে ন' মাসে একবারও দেখা হয় না! কাল একবার তোমাদের বাড়ী যাব, আবার উমাতারার সঙ্গেও দেখা করতে যাব।

শরৎ। দিদি কাল উমার বাড়ী যাবে, বিন্দুদিদি তুমিও সেখানে গেলেই সকলের সঙ্গে দেখা হবে।

বিন্দু। তবে সেই ভাল। আহা, কালীকে দেখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছে করে। আমার বিয়ে হবার আগে কালীর বিয়ে হয়েছে, আহা! সেই অবধি সে যে কত কষ্ট পেয়েছে কে বল্‌তে পারে। আচ্ছা শরৎবাবু, তোমার মা দেখেশুনে এমন ঘরে বিয়ে দিলেন কেন? বের সময় বরকে দেখেছিলেম, লোকে বলে তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর ছিল!

শরৎ। বিন্দুদিদি, সে কথা আর জিজ্ঞেস কর না। মার ও সম্বন্ধে অধিক মত ছিল না, বরেদের কুল বড় ভাল, লোকে বললে বর্দ্ধমান জেলায় এরূপ কুল পাওয়া দুষ্কর, পাড়ার ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলেই জেদ কর্‌তে লাগলেন, বাবা তাতে মত দিলেন, সুতরাং মা কি করবেন? বিবাহ দিয়ে অবধি মা সেই বিষয়ে দুঃখ করেন, বলেন, মেয়েটীকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। আমার ভগিনীপতির বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, তিনি রোগাক্রান্ত ও জীর্ণ, তাঁর সংসারের অনেক দাসদাসীর মধ্যে দিদি একজন দাসী মাত্র। প্রাতঃকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম করেন, দুবেলা দুপেট খেতে পান, দিদি তাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর সরল চিত্তে অন্য কোনও আশা নেই। আমাদের সংসারে ঘরে ঘরে যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণা তাপসী আছে, পূর্ব্বকালে মুনিঋষিদের মধ্যেও সেরূপ ছিল কি না জানি না।

কালীতারার অবস্থা চিন্তা করিয়া বিন্দু ধীরে ধীরে একবিন্দু অশ্রুমোচন করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে শরৎ বলিলেন,—বিন্দুদিদি, তবে আজ আমি আসি, অনেক রাত্রি হইয়াছে। আবার কাল দেখা হবে। যত দিন আমি গ্রামে আছি তোমার কাঁচ আঁবের অম্বল এক একবার চাক্‌তে আসব। আর যদি অনুগ্রহ করে তোমরা কল্‌কেতায় যাও, তবে ত আর আমার সুখের সীমা থাক্‌বে না।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন,—তা আচ্ছা এস। কল্‌কেতায় যাওয়া না যাওয়া কাল স্থির কর্‌ব, কিন্তু যাওয়া হক আর নাই হক, কাঁচ আঁবের অম্বল রাঁধতে পারে এমন একজন রাঁধুনীর বিষয় কাল তোমার দিদির সঙ্গে বিশেষ করে পরামর্শ ঠিক কর্‌ব, সে বিষয় আর ভাব্‌তে হবে না।

হাসিতে হাসিতে শরচ্চন্দ্র, হেম ও বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুধা তখনও নিদ্রিত ছিল, দ্বিপ্রহর রাত্রির নির্ম্মল চন্দ্রালোক সুধার সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় ওষ্ঠদ্বয়ে, সুচিক্কণ কেশপাশে ও সুগোল বাহুতে বিরাজ করিতেছিল। বালিকা খেলার কথা বা বিড়াল-বৎসের কথা বা বাল্যকালের পেয়ারা খাইবার কথা স্বপ্ন দেখিতেছিল।

বাটী হইতে নির্গত হইয়া শরচ্চন্দ্র সেই নির্ম্মল আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমি বর্দ্ধমানে ও কলিকাতায় অনেক গৃহস্থ ও ধনাঢ্যের পরিবার দেখিয়াছি, কিন্তু অদ্য এই পল্লীগ্রামের সামান্য গৃহে যেরূপ অমায়িকতা অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রকৃত ধর্ম্ম দেখিলাম, সেরূপ কুত্রাপি দেখি নাই। জগদীশ্বর! হেমচন্দ্রের পরিবার যেন সর্ব্বদা নিরাপদে থাকে, সর্ব্বদা সুখে ও ভালবাসায় পূর্ণ থাকে। বাল্যকাল হইতে একাকী থাকিয়া ও কেবল পাঠে রত থাকিয়া আমার এ জীবন শুষ্কপ্রায় হইয়াছে, আমার হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্রের প্রণয় ও বিন্দুদিদির স্নেহে অদ্য আমার হৃদয় যেন পুনরায় প্লাবিত হইল; জগদীশ্বর করুন, যেন এই পবিত্র স্নেহপূর্ণ পরিবারের নিকট থাকিয়া

আমি পুনরায় মনুষ্যোচিত স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিতে পারি। এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে শরৎ বাড়ী যাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : বিন্দুর বন্ধুগণ

পরদিন প্রত্যূষে বিন্দু গাত্রোত্থান করিয়া ঘরদ্বার প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিলেন এবং গৃহের পশ্চাতের পুকুরে বাসন মাজিতেছিলেন, এমন সময়ে বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল। হেমচন্দ্র ও সুধা তখনও উঠেন নাই, অতএব বিন্দু বাসন রাখিয়া শীঘ্র আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন সনাতনের স্ত্রী। বিন্দু বাল্যাবস্থায় তাহাকে কৈবর্ত্ত দিদি বলিয়া ডাকিতেন, এখনও সেই নাম ভুলেন নাই। বলিলেন,

“কি কৈবর্ত্ত দিদি, এত সকালে কি মনে করে? তোর হাতে ও কি ও?”

সনাতনের পত্নী। না, কিছু নয় দিদি, মনে করনু আজ সকালে তোমাদের দেখে যাই, আর সুধাদিদি চিনিপাতা দৈ বড় ভালবাসে, তাই কাল রেতে দৈ পেতে রেখেছিনু, সুধাদিদির জন্যে এনেছি। সুধাদিদি উঠেছে?

বিন্দু। না, এখনও উঠেনি। তোরা বোন্ গরীব লোক, রোজ রোজ দুধ দৈ দিস্ কেন বল দেখি? তোরা এত পাবি কোথা থেকে বোন্?

স-প। না, এ আর কি দিদি, বাড়ীর গরুর দুধ বৈ ত নয়, তা দু' এক দিন আন্‌নুই বা। গরুও তোমাদের, আমাদের ঘরদোরও তোমাদের, তোমাদের দুটো খেয়েই আমরা আছি, তা তোমাদের জিনিস তোমরা খাবে না ত কে খাবে?

বিন্দু। তা দে বোন্, এখন শিকেয় তুলে রেখে দি, ভাত খাবার সময় এক সঙ্গে খাব এখন। কৈবর্ত্ত দিদি, তুই বেশ দৈ পাতিস, সুধা তোর দৈ বড় ভালবাসে, ও কি লো? তোর চোখে জল কেন? তুই কাঁদিছস্ নাকি?

সত্য সত্যই সনাতনের পত্নী ঝর ঝর করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া উঁহুঁহুঁ করিয়া কাঁদিতে বসিয়াছিল। সনাতন অনেক কষ্ট করিয়া আপন প্রেয়সী গৃহিণীর শরীরের অনুরূপ কাপড় যোগাইতেন, কিন্তু সেই কাপড়ে অতন্বঙ্গী রূপসীর বিশাল অবয়ব আচ্ছাদন করিয়া তাহার আঁচলে আবার চক্ষুর জল মুছিতে কুলায় না! যাহা হউক, কষ্টে চক্ষের জল অপনীত হইল, কিন্তু সে ফোয়ারা একবার ছুটিলে থামে না, কৈবর্ত্ত-রমণী আবার উচ্চস্বরে উঁহুঁহুঁ করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

বিন্দু। বলি ও কি লো? কাঁদছিস্ কেন্ লো? সনাতন ভাল আছে ত?

স-প। আছে বৈ কি, সে মিন্‌ষের আবার কবে কি হয়? উঁহুঁহুঁ।

বিন্দু। তোর ছেলেটী ভাল আছে ত?

স-প। তা তোমাদের আশীর্ব্বাদে বাছা ভাল আছে।

বিন্দু। তবে সুধু সুধু সকাল বেলা চখের জল ফেলছিস্ কেন? কি, হয়েছে কি?

স-প। এই সকালে ঘোষেদের বাড়ী গিয়েছিনু গো, সেখানে —উঁহুঁহুঁ।

বিন্দু। সেখানে কি হয়েছে, কেউ কিছু বলেছে, কেউ গাল দিয়েছে?

স-প। না, গাল দেবে কি গো দিদি? কারই কিছু খাই, না কারই কিছু ধারি, যে গাল দেবে। তেমন ঘর করিনি গো যে দিদি যে কেউ গাল দেবে। মিন্‌ষে পোড়ারমুখো হোক্, হতভাগা হোক্, গতর খেটে খায়, আমাকে খেতে পরতে দিতে পারে, আমরা গরীবগুরবো নোক, কিন্তু আপনাদের মানে আছি। গাল আবার কে দেবে গা দিদি?

বিন্দু কৃষকপত্নীর এই স্বামিভক্তিমূলক এবং দর্পপূর্ণ কথা শুনিয়া একটু মুচকে হাসিলেন, বলিলেন—

তা, তাই ত বোন্, জিজ্ঞেসা করছি, তবে তুই কাঁদছিস কেন? সনাতন কিছু বলেছে নাকি?

রমণীর বিশাল কৃষ্ণ কলেবর একবার কম্পিত হইল, নয়ন দুইটী ঘূর্ণিত হইল, ক্রোধ-কম্পিত স্বরে যে কথাগুলি উচ্চারিত হইল, তাহার মধ্যে এই মাত্র বোধগম্য হইল—

ডেকরা, পোড়ারমুখো, হতভাগা, সে আবার বল্‌বে। তার প্রাণের ভয় নেই? কোন্ মুখে

বল্‌বে? তার ঘর কর্‌ছে কে? সংসার চালিয়ে নিচ্ছে কে? আমি না থাক্‌লে সে কোন্‌ চুলোয় যেত? বল্‌বে! প্রাণে ভয় নেই ইত্যাদি।

বিন্দু আর একবার হাস্য সম্বরণ করিয়া একটু তীব্র স্বরে বলিলেন—

তবে তুই শুধু শুধু সকাল বেলা চখের জল ফেল্‌ছিস্‌ কেন বল্‌ ত? তোর হয়েছে কি?

স-প। দিদি কিছু হয়নি, তবে ঘোষেদের বাড়ী আজ সকালে শুননু, উঁহুঁহুঁ।

বিন্দু। নে, তোর নেকাম কর্‌তে হয় কর বোন্‌, আমি আর দাঁড়াতে পারিনি, আমার বাসন সব মাজতে পড়ে রয়েছে, উনুন ধরাতে হবে, এখনই ছেলে দুটী উঠলেই দুধ চাইবে।

এইরূপে কথা হইতে হইতে সুধা প্রাতঃকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় ঈষৎ রঞ্জিত বদনে, চক্ষু দুটী মুছিতে মুছিতে শয়নঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু বলিলেন—

এই যে সুধা উঠেছে, এত সকালে যে?

সুধা। দিদি, আজ খুব সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা বড় মজার স্বপ্ন দেখ্‌লেম, সে জন্য ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিন্দু। কি স্বপ্ন?

সুধা। বোধ হল যেন আমরা ছেলেবেলার মত আবার শরৎবাবুর বাড়ী পেয়ারা খেতে গেছি। যেন তুমি পেড়ে পেড়ে খাচ্ছ, আর শরৎবাবু আমাকে কোলে করে পেয়ারা পেড়ে দিচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ পা ফস্‌কে পড়ে গেলেন, আমিও পড়ে গেলেম। উঃ! এমনি লেগেছে।

বিন্দু। সে কি লো? স্বপ্নে পড়ে গেলে কি লাগে?

সুধা। হ্যাঁ দিদি, বোধ হল যেন বড় লেগেছে, শরৎবাবু যেন গাছতলায় সেই গর্ত্তটাতে পড়ে গেলেন।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন,—আহা! এমন দুরবস্থা। আজ শরৎবাবু এলে তাঁর পায়ে ব্যথা হয়েছে কি না জিজ্ঞেসা কর্‌ব এখন! পাটা ভেঙ্গে যায়নি ত?

সুধা। না দিদি, ভেঙ্গে যায়নি।

বিন্দু। তুমি কেমন করে জান্‌লে?

সুধা। আবার যে তখনই উঠে আমাকে নিয়ে পেয়ারা পাড়তে লাগলেন।

বিন্দু উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন, সাবাস ছেলে বাবু! আজ তাঁকে তাঁর গুণের কথা বল্‌ব এখন।

হাস্য সম্বরণ করিয়া পরে বলিলেন,—সুধা, কৈবর্ত্ত দিদি তোর জন্য আজ চিনিপাতা দৈ এনেছে, ভাতের সঙ্গে খাবে এখন। দৈখানা শিকেয় ঝুলিয়ে রেখে এস ত বোন্‌। আমি উনুন ধরাই গে, এখনই ছেলেরা উঠ্‌বে।

বালিকা মাথার কেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে দৈ লইয়া গেল, দৈ শিকের উপর তুলিয়া রাখিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে হাস্য বদনে ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। বিন্দুও রান্নাঘরের দিকে যাবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় কৈবর্ত্তপত্নী আর একবার চক্ষুর জল অপনয়ন করিয়া, একবার গলা সাড়া দিয়া, গলাটা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বলি দিদিঠাক্‌রুণ, কথাটা কি সত্যি?

বিন্দু। কি কথা লো?

স-প। ঐ যা শুন্‌নু।

বিন্দু। কি শুন্‌লি রে?

স-প। তবে বুঝি সত্যি? আহা, এতদিন পরে এই কি কপালে ছিল! আহা, সুধাদিদির কচি মুখখানি একদিন না দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়!

এবার অবারিত ক্রন্দনের রোল উঠিল, কৈবর্ত্ত-সুন্দরী সেই বিশাল কৃষ্ণ শরীরখানি যাহা সনাতন সভয়ে দৃষ্টি করিতেন ও সশঙ্কচিত্তে পূজা করিতেন—সেই শরীরখানি ক্রন্দনের বেগে কম্পিত হইতে লাগিল। গৃহে হেমচন্দ্র নিদ্রিত ছিলেন, তিনি ঈষৎ ভূমিকম্প বোধ করিয়াছিলেন কি না, জানি না, কিন্তু কৈবর্ত্ত-সুন্দরীর তারস্বর যখন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন নিদ্রা অসম্ভব। তিনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "বাড়ীতে কাঁদ্‌ছে কে গা?"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বিন্দুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকাল বেলায় বাড়ীতে কাঁদ্‌ছে কে গা?"

বিন্দু। ও কেউ নয়, কৈবর্ত্ত দিদি কি অমঙ্গলের কথা শুনে এসেছে, তাই মনের দুঃখে কাঁদছে।

হেমচন্দ্র বলিলেন, "কে ও, সনাতনের স্ত্রী, কেন কি হয়েছে গা, বাড়ীতে কোন অমঙ্গল হয়নি ত, কোন ব্যারামস্যারাম হয়নি ত?"

সনাতনের গৃহিণী বাবুকে দেখিয়া কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া, অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া, কাপড়-খানি টানিয়া, কষ্টেসৃষ্টে কোন রকমে মাথায় একটু ঘোমটা দিয়া ঢিপ্‌ করিয়া প্রণাম করিয়া, আবার গায়ে কাপড়টা ভাল করিয়া দিল, আবার ঘোমটা একটু টানিয়া গলার সাড়া দিয়া, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া, আবার চক্ষুর জল মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিল,

"না গো, কিছু অমঙ্গল নয়, তবে একটা কথা শুননু, তাই দিদি ঠাকরুণকে জিজ্ঞেসা করতে এসেছি।"

বিন্দু। সেই কথাটা কি, আমি তখন থেকে বার কর্‌তে পার্‌লুম না! তুমি পার ত কর।

হেম। মেয়ে মানুষের কথা মেয়ে মানুষেই বুঝে, আমরা তত বুঝি না। আমি শরতের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে হেম বাড়ীর বাহিরে গেলেন।

স-প। ঐ গো ঐ! তবে ত আমি যা শুনেছি তাই ঠিক!

বিন্দু। বলি তোকে আজ কিছুতে পেয়েছে নাকি, অমন করছিস্‌ কেন? কি শুনেছিস বল না?

স-প। ঐ যে শরৎবাবুদের বাড়ীতে আমি সকালে যা শুন্‌নু।

বিন্দু। কি শুন্‌লি?

স-প। তবে বলি দিদিঠাকরুণ, গরিবের কথায় রাগ করো না। সত্যিমিথ্যে জানি না, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর চাকর মিন্‌ষে আমায় বল্লে, মিন্‌ষের মুখে আগুন, সেই অবধি আমার বুকটা যেন ধড়াস ধড়াস কর্‌ছে, দিদিঠাকরুণ, একবার হাত দিয়ে দেখ।

বিন্দু। আমার দেখবার সময় নেই, আমি কাজে যাই।

এই বলিয়া বিন্দু রান্নাঘরের দিকে ফিরিলেন।

তখন কৈবর্ত্ত-বধূ বিন্দুর আঁচল ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল, "না দিদি, রাগ করো না, তোমাদের জন্যে মনটা কেমন করে তাই এনু, না হলে কি অন্যের জন্যে আস্‌তেম, তা নয়, আহা সুধাদিদিকে একদিন না দেখ্‌লে আমার মনটা কেমন (বিন্দুর পুনরায় রান্না-ঘরের দিকে পদক্ষেপ)—না না, বল্‌ছিনু কি, বলি ঐ ঘোষেদের বাড়ীর হতভাগা চাকর মিন্‌ষে বল্লে কি, তার মুখে আগুন, তার বেটার মুখে আগুন, তার বৌয়ের মুখে আগুন, তার বাড়ীতে ঘুঘু চরুক (বিন্দুর রান্নাঘরের দিকে এক পদ অগ্রসর হওন)—না না, বল্‌ছিনু কি, সেই মিন্‌ষে বল্লে কি, উঃ এমন কথা কি মুখে আনে গা, এও কি হয় গা, তোমাদের শরীরে মায়া-দয়াও ত আছে (বিন্দুর রান্নাঘরের ভিতর গমন, সনাতনপত্নীর পশ্চাদ্গমন ও দ্বারদেশে উপবেশন)—না না, বল্‌ছিনু কি, সেই হতভাগা চাকর মিন্‌ষে বল্লে কি না, দিদিঠাক্‌রুণ, তোমরা নাকি সকলে আমাদের ছেড়ে কল্‌কেতায় চলে যাচ্ছ? আহা দিদিঠাক্‌রুণ, তোমাকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছি, তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব না? সুধাদিদি আমাকে এত ভালবাসে, সে সুধাদিদিকে কোথায় নিয়ে যাবে গো? (রোদন)

বিন্দু একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "হ্যাঁলো কৈবর্ত্ত দিদি, এই কথা বল্‌তে এই এতক্ষণ থেকে এমন কর্‌ছিলি? তা কাঁদিস কেন বোন, আমাদের যাওয়া কিছুই ঠিক হয়নি, কেবল শরৎবাবু কথায় কথায় কাল বলেছিলেন মাত্র, তা আমাদের কি যাওয়া হবে? সেখানে বিস্তর খরচ।

স-প। ছি দিদি, সেখানেও যায়! শুনেছি কল্‌কেতায় গেলে জাত থাকে না, কিছু জাত-বিচার নেই, হিঁদু মুছুনমানে বিচার নেই, সে দেশেও যায়! তোমাদের সোণার সংসারে এখানে বসে রাজ্জি কর। শরৎবাবুর, কি বল না, ও'র মাগ নেই, ছেলে নেই, উনি কালেজে পড়েন। দিদিঠাক্‌রুণ! কালেজের ছেলে সব কর্‌তে পারে। শুনেছি নাকি কালেজের ছেলে সাগর পার হয়ে বিলেত যায়। ও মা! তারা ত জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দিতে পারে! হেঁ দিদি,

বিলেত কোথায়, সেই যে গঙ্গাসাগরের গল্প শুনি, তারও নাকি পার যেতে হয়? শুনেছি নাকি নৌকায় যেতে হয়।

বিন্দু। হ্যাঁলো, কত সাগর পার হয়ে তবে বিলেত যায়। শুনেছি লঙ্কা পেরিয়েও অনেকদূর যায়।

স-প। ও বাবা, সে গঙ্গাসাগরের যে ঢেউ শুনেছি, তাতে কি আর মানুষ বাঁচে? তা নৌকা থেকে কি আর মানুষ ফিরে আসে, তারা রাক্কস হয়ে আসে শুনেছি, শুনেছি তারা জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দেয়। না বাবু, তোমাদের বিলেত গিয়েও কাজ নেই, কল্‌কেতা গিয়েও কাজ নেই, তোমরা ঘরের নক্ষী ঘরে থাক। তবে এখন আমি আসি দিদি।

বিন্দু দুধ জ্বাল দিতে দিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এস বোন।"

স-প। আর দৈখানি কেমন হয়েছে খেয়ে বলো। আর সুধাদিদি কি বলে, বলো।

বিন্দু। বল্‌ব দিদি, বল্‌ব।

সনাতন-গৃহিণী কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আর দেখ দিদি, গরিবের কথাটা যেন মনে থাকে। কোথায় কল্‌কেতায় যাবে? ঘরের নক্ষী ঘর আলো করে থাক।'

বিন্দু। তা দেখা যাবে। আমাদের যাবার এখন কিছুই ঠিক নেই; যদি যাওয়া হয়, তবে অল্প দিনের জন্যে, আবার ধান কাটার সময় আস্‌ব। গ্রাম ছেড়ে আমরা কোথায় থাক্‌ব?

কৈবর্ত্ত-বধূ কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়া তখন ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গেলেন। সনাতন অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া বিস্তীর্ণ শয্যায় পার্শ্বশায়িনী নাই দেখিয়া, কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল কি অদ্য প্রাতঃকালেই মুখনাড়া খাইতে হয় নাই বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিতেছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু সেই দুঃখ বা সুখ জগতের অধিকাংশ সুখদুঃখের ন্যায় ক্ষণকাল স্থায়ী মাত্র। প্রথম সূর্য্যালোকে গৃহিণীর বিশাল ছায়া প্রাঙ্গণে পতিত হইল, গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে সনাতন শিহরিয়া উঠিল।

সেই দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিন্দুর প্রতিবেশিনী হরিমতি নামে একটী বৃদ্ধা গোয়ালিনী ও তাহার বিধবা পুত্রবধূ বিন্দুকে দেখিতে আসিল। হরিমতির পুত্র জীবিত থাকিতে তাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, কিছু জমাজমি ছিল, বাড়ীতে অনেকগুলি গাভী ছিল, তাহার দুগ্ধ বেচিয়া স্বচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ হইত। পুত্রের মৃত্যুর পর হরিমতি শিশু পুত্রবধূকে লইয়া সে জমাজমি দেখিতে পারিল না, অন্য কাহাকে কোরফা জমা দিল, যাহা খাজনা পাইল, সে অতি সামান্য। গরুগুলি একে একে বিক্রয় হইল; এক্ষণে দুই একটী আছে মাত্র, তাহার দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া উদরপূর্ত্তি হয় না। শাশুড়ী ও পুত্রবধূ সর্ব্বদাই বিন্দুর বাড়ীতে আসিত ও বিন্দুর ছেলেদের ব্যারামের সময় যথাসাধ্য সংসারের কাজ করিয়া দিত। বিন্দুর এরূপ অবস্থা নহে যে, তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন, তথাপি বৎসরের ফসল পাইলে প্রতিবেশিনীকে কিছু ধান্য পাঠাইয়া দিতেন, শীতের সময় দুই একখানি কাপড় কিনিয়া দিতেন, বৃদ্ধার অসুখ করিলে কখন সারু, কখন মিছরী, কখন দুই একটী সামান্য ঔষধি পাঠাইয়া দিতেন এবং সর্ব্বদা বৃদ্ধার তত্ত্ব লইতেন। দরিদ্রা এই সামান্য উপকারে এবং সকল বিপদআপদেই বিন্দুর স্নেহের আশ্বাসবাক্যে অতিশয় আপ্যায়িত হইত এবং বিন্দুকে বড়ই ভালবাসিত। বিন্দু গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইবে শুনিয়া আজ আসিয়া অনেক কান্নাকাটি করিল। বিন্দু তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া এবং তাহার পুত্রবধূকে একখানি পুরাতন শাড়ী দিয়া ঘরে পাঠাইলেন।

হরিমতি প্রস্থান করিলে তাঁতিদের একটী বৌ বিন্দুর সহিত দেখা করিতে আসিল। তাঁতি-বৌ দেখিতে কালো, এবং অতিশয় কাহিল, সে কাজকর্ম্ম করিতে পারিত না, সেজন্য শ্বাশুড়ীর নিকট সর্ব্বদাই গালি খাইত। তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসিত না। গত শীতকালে তাহার পিঠে বেদনা হইয়াছিল, ঘাট থেকে জল আনিতে পারিত না, তজ্জন্য তাহার শ্বাশুড়ী তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তাঁতি-বৌ কাহার কাছে যাবে? কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দুর কাছে আসিয়াছিল। বিন্দুর এমন অর্থ নাই যে, তাঁতি-বৌকে ঔষধি কিনিয়া দেন, তবে বাড়ীতে কেরোসিন তৈল ছিল, প্রত্যহ তাঁতি-বৌকে রৌদ্রে বসাইয়া নিজে মালিস করিয়া দিতেন। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বেদনা আরাম হইয়া গেল, সেই অবধি তাঁতি-বৌ গৃহকার্য্যে অবসর পাইলেই বিন্দু-মাকে দেখিতে আসিতে বড় ভালবাসিত।

আমাদের লিখিতে লজ্জা করিতেছে, তাঁতি-বৌ যাইতে না যাইতে বাউরী পাড়া হইতে হীরা বাউরিণী বিন্দুর নিকট আসিল। হীরার স্বামী পাল্কী বয়, বেশ রোজকার করে, কিন্তু যথাসর্ব্বস্ব মদ খাইয়া উড়াইয়া দেয়, বাড়ী আসিয়া প্রত্যহ স্ত্রীকে প্রহার করে। বিন্দু একদিন হেমচন্দ্রকে বলিয়া হীরার স্বামীকে ডাকাইয়া বিশেষ তিরস্কার করিয়া দিলেন। সেই অবধি হেমবাবুর ভয়ে এবং বিন্দুর জ্যেঠা মহাশয়ের ভয়ে বাউরীর অত্যাচার কিছু কমিল, হীরাও প্রাণে বাঁচিল। আজ হীরা আপন শিশুটীকে নূতন একখানি কাপড় পরাইয়া কোলে করিয়া বিন্দুর কাছে আনিয়া বলিল, “মাঠাক্‌রুণ, এবার তোমার আশীর্ব্বাদে হাতে ২।৫ টাকা জমেছে, অনেক কাল ঘরের চালে খড় পড়েনি, এবার চাল নূতন করে ছাইয়েছি, আর বাছার জন্যে কাটোয়া থেকে এই নূতন কাপড় কিনেছি।” বিন্দু শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন।

তাহার পর গ্রামের শশীঠাক্‌রুণ, বামা সদ্‌গোপিনী, শ্যামা আগুরিণী, মহামায়া ধোপানী প্রভৃতি অনেকেই বিন্দুর কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া কান্নাকাটি করিতে আসিল। আমরা তাহাদিগকে বিন্দুর নিকট রাখিয়া এক্ষণে বিদায় লই। আমাদের অনেকেরই বিন্দু অপেক্ষা দুপয়সা অধিক আয় আছে, ভরসা করি, আমরা যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিব, আমাদের জন্যও কেহ কেহ হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটু শোক অনুভব করিবে। ভরসা করি, যখন আমরা এ সংসার হইতে প্রস্থান করিব, তখন যেন দুই একটী পরোপকারের পরিচয় দিয়া যাইতে পারি, কেবল ঈর্ষা, পরনিন্দা এবং পরের সর্ব্বনাশ দ্বারা “বড়লোক হইয়াছি”, এই আখ্যানটী রাখিয়া না যাই।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ বাল্যসহচরীগণ

সন্ধ্যার সময় বিন্দু জ্যেঠাইমার বাড়ীতে গেলেন, এবং অনেক দিনের পর বাল্যসহচরী ও উমাতারাকে দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তিন জন বাল্য সহচরী এখন তিন সংসারের গৃহিণী হইয়াছেন, কিন্তু এখনও বাল্যকালের সৌহৃদ্য একেবারে ভুলেন নাই. অনেক দিনের পর তাঁহাদিগের পরস্পরে দেখা হওয়ায় তাঁহারা বাল্যকালের কথা, শ্বশুরবাড়ীর কথা, সংসারের কথা, নিজ নিজ সুখদুঃখের অনন্ত কথা কহিয়া সন্ধ্যাকাল যাপন করিলেন।

কালীতারা বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, বিন্দু অপেক্ষাও কাল ছিলেন, কিন্তু তথাপি এককালে তাঁহার মুখে লাবণ্য ছিল, এখনও সেই শান্ত শুষ্ক বদনে ও নয়নদ্বয়ে একটু কমনীয়তা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে মুখখানি বড় শুষ্ক, চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, কণ্ঠার হাড় দেখা যাইতেছে, শীর্ণ হস্তে দুইগাছি ফাঁপা বালা আছে, কণ্ঠে একটী মাদুলি। তাঁহার বস্ত্রখানি সামান্য, সম্মুখের চুল অনেক উঠিয়া গিয়াছে, মাথায় ছোট একটী খোঁপা। কালীতারা বাল্যকালে একটু হাবা মেয়ে ছিল, এখনও অতিশয় সরলা, শ্বশুরবাড়ীর কাজকর্ম্ম করেন, দুইবেলা দুইপেট খান, কেহ কিছু বলিলে চুপ করিয়া থাকেন।

বিন্দু বলিলেন, “কালী, আজ কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হল, তোমাকে কি আর হঠাৎ চেনা যায়?

কালী। বিন্দুদিদি, আমাদের দেখা হবে কোথা থেকে, বিয়ে হয়ে অবধি প্রায় আমি বর্দ্ধমানে থাকি, বাপের বাড়ী কি আর আসতে পাই?

উমা। কেন কালীদিদি, তুমি মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী আস না কেন? আমি ত প্রতিবার পূজার সময় আসি।

কালী। তা তোমাদের কি বল বোন, তোমাদের ঢের লোকজন আছে, কাজকর্ম্মের ঝন্‌ঝাট নেই, পাল্কী করে চলে এলেই হল। আমাদের ত তা নয়, বৃহৎ সংসার, অনেক কাজকর্ম্ম আছে, আর আমাদের যে ঘর তাতে চাকরদাসী রাখার প্রথা নেই। কাজেই আমরা কেউ এলে কাজ চল্‌বে কেমন করে বল? এই এবার এসেছি, আমার এক বড় ননদ আছে, তাকে কত মিনতি করে আমার কাজগুলি কর্‌তে বলে এসেছি। তা দু পাঁচ দিন সে কর্‌বে বরাবর কি আর করে?

বিন্দু। তোমাদের জমিদারীর শুনেছি অনেক আয়, তোমার স্বামীর অনেক গাড়ীঘোড়া আছে, তা বাড়ীতে চাকরদাসী রাখেন না কেন?

কালী। না দিদি, আয় জেয়াদা নেই, খরচ শুনেছি বিস্তর হয়, ধারও কিছু হয়েছে শুনেছি, তা আমি বাড়ীর ভিতর থাকি, ওসব কথা ঠিক জানি না। অমাদের একখানা বাগান-বাড়ী আছে, বাবু সেইখানে থাকেন, তাঁর শরীরও অসুস্থ, বাড়ীতে প্রায় আসেন না, তা কাজ-কর্ম্মের কি জানবেন? আমার শ্বাশুড়ীরাই কাজকর্ম্ম দেখেন শুনেন। ঝি রাখ্‌বেন কেমন করে বল, আমাদের বাড়ীর ত সে রীতি নয়, বাইরের লোকেদের কি ছুঁতে আছে? কাজেই বৌদের সব কর্‌তে হয়।

বিন্দু। তা তোমাদের ধারটার হয়েছে বোন, তা খরচ একটু কমাও না কেন? শুনেছি তোমার স্বামী অনেক খরচ করে সাহেবদের খানাটানা দেন, অনেক ঘোড়া রাখেন,—তা এসব-গুলো কেন? তোমার স্বামীকে যেমন আয়, তেমনি ব্যয় কর্‌তে বল্‌তে পার না?

কালী। ও মা! তাঁকে কি আমি সে কথা বল্‌তে পারি? তিনি বিষয়কর্ম্ম বুঝেন, আমি বৌ মানুষ হয়ে কোন্ লজ্জায় তাঁকে একথা বল্‌বো? তবে কখন কখন যখন আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসেন, আমার খুড়শ্বাশুড়ীরা তাঁকে ঐরকম কথা দুই একবার বলেছিলেন শুনেছি।

বিন্দু। তা তিনি কি বলেন?

কালী। বলেন, আমাদের ভারি বংশ, দেশে কুলের যেমন মর্য্যাদা, সাহেবদের কাছে বনিয়াদি বড়মানুষ-বংশ বলে তেমনি মর্য্যাদা, তা সাহেবদের খানাটানা না দিলে কি হয়? শুনেছি সাহেবরাও তাঁকে ভালবাসেন, এই যে কত "কমিটী" বলে না কি বলে, বর্দ্ধমানে যত আছে, বাবু সবেতেই আছেন। আর রোগা শরীর, তবু গাড়ী করে প্রত্যহ সাহেবদের বাড়ী দুবেলা যাওয়া-আসা আছে, সাহেব মহলে নাকি তাঁর ভারি মান।

সরলস্বভাব কালীতারার এই স্বামি-গৌরব বর্ণনা শুনিয়া বিন্দু একটু হাসিলেন, অভিমানিনী উমা একটু ঈর্ষায় ভ্রূকুটী করিলেন।

বিন্দু। আচ্ছা কালী, তোমাদের বাড়ীর মধ্যে এখন গিন্নী কে?

কালী। আমার শ্বাশুড়ী ত নেই, কাজেই আমার তিনজন খুড়শ্বাশুড়ীই গিন্নী। বড় যে সে ভাল মানুষ, প্রায় কোনও কথায় থাকে না, মেজোই কিছু রাগী, সকলেই তাকে ভয় করে, বৌরা ত দেখ্‌লে কাঁপে। আহা, সে দিন আমার খুড়তুতো ছোট জা রান্নাঘর থেকে কড়া করে দুধ আন্‌তে পড়ে গিয়েছিল, গরম দুধে তার পায়ের ছালচামড়া পুড়ে গিয়েছে। তাতে তার যত কষ্ট না হয়েছিল, শ্বাশুড়ীর ভয়ে প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। আমার মেজো খুড়-শ্বাশুড়ী ঘাট থেকে নেয়ে এসে যেই শুনলে যে দুধ অপুচ হয়েছে, অমনি মুড়ো খেঙরা নিয়ে তেড়ে এসেছিল, আহা অমনি বকুনি বক্‌লে, বাপমা তুলে এমনি গাল দিলে, আমার ছোট জা চোকের জলে নাকের জলে হল। আহা কাঁচ মেয়ে, দশ বছর মাত্র বয়স, ভয়ে তিন দিন ভাল করে ভাত খেতে পারেনি।

উমা। তা তোমাকেও কি অমনি করে বকে?

কালী। তা বক্‌বে না, দোষ করলেই বকবে, তা না হলে কি সংসার চলে?

উমা। তোমাকে যখন বকে, তুমি কি কর?

কালী। চুপ করে কাঁদি, আর কি কর্‌ব বল?

অভিমানিনী উমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত তা পারিনি বাবু, কথা আমার গায়ে সহ্য হয় না।"

কালী। তা, হ্যাঁ বিন্দুদিদি, শ্বশুরবাড়ীতে কেউ গাল দিলে আর কি কর্‌ব বল? একটী কথার জবাব দিলে, আর পাঁচটা কথা শুন্‌তে হয়। তা কাজ কি বাবু, শ্বাশুড়ীই হক আর ননদই হক, কেউ দুই কথা বল্‌লে চুপ করে থাকি, আবার তখনই ভুলে যাই। কথা ত আর গায়ে ফোটে না, কি বল বিন্দুদিদি।

বিন্দু। তা বেশ কর বোন্, কথা বরদাস্ত কর্‌তে পারলেই ভাল, তবে সকলের কি আর বরদাস্ত হয়, তা নয়। আচ্ছা, তোমার ছোট খুড়শ্বাশুড়ীও শুনেছি নাকি রাগী।

কালী। হাঁ, রাগী বটে, তা মেজোর সঙ্গে ত আর পারে না, রাগ করে দু' একটা কথা বলে আপনার ঘরের ভিতর খিল দিয়ে থাকে, মেজো এক কথায় পঁচিশ কথা শুনিয়ে দেয়। মেজোর

কিছু টাকা আছে কি না, সে ছেলেদের ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়, আবার ছোটর ঘরে বোসে ছেলেদের খেতে শিখিয়ে দেয়। তারা ছোটর ঘরে বসে খায়, ছোটর ছেলেরা খেতে পায় না, ফেল ফেল করে চেয়ে থাকে। আবার ছোটর খাবারঘরের পাশেই এবার একটা নর্দ্দমা তয়ের করেছে। ছোট কত ঝগড়া কর্‌লে, আমার ছোট দেওর আপনি বাবুর কাছে নালিশ কর্‌তে গেলেন, বাবুও নিজে একদিন বাড়ী এসে তাঁর মেজো খুড়ীকে বুঝাতে গেলেন, তা সে কথা কি সে শুনে? মেজোর বকুনি শুনে বাবু ফের গাড়ী করে বাগানে পালিয়ে গেলেন, মেজো আপনি দাঁড়িয়ে মজুরদের দিয়ে সেই নর্দ্দমাটী করালেন, তবে সে দিন রাত্রে জল গ্রহণ কর্‌লেন।

উমা। সাবাস মেয়ে যা হক!

কালী। বল্‌ব কি উমা, বাড়ীতে যে ঝগড়া কোঁদল হয়, তাতে ভূত ছেড়ে পালায়। তবে আমাদের সয়ে গেছে, গায়ে লাগে না। আর আমি কারো কথায় নেই, যে যা বলে চুপ করে থাকি, আবার ভুলে যাই, আমার কি বল?

বিন্দু। কালী, তোমার খুড়শ্বাশুড়ীরা ত সব বিধবা, তাদের বয়স কত হয়েছে?

কালী। বয়েস বড় জেয়াদা নয়, বাবুর বয়স আর আমার বড় খুড় শ্বাশুড়ীর বয়েস এক, আর মেজো ছোট বাবুর চেয়ে ৫।৭ বছরের ছোট। আমার শ্বশুর বাপের বড় ছেলে ছিলেন, তিনি আজ যদি থাক্‌তেন, তাঁর ৭০ বছর বয়েস হত। তা তিনি হবার পর প্রায় ১৫।১৬ বছর আর কেউ হয়নি, তার পর তাঁর তিনটী ভাই হয়। তাই যখন আমার শ্বাশুড়ীর বয়েস প্রায় ৩০ বছর, তখন আমার খুড়শ্বাশুড়ীরা ছোট ছোট বৌ, নতুন বিয়ে হয়েছে। তারই দুই এক বছর পর বাবুর প্রথম বিয়ে হয়।

উমা। আর কালীদিদি, তোমার পিশ্‌শ্বাশুড়ীও ঐ বাড়ীতে থাকে না?

কালী। হাঁ, থাকে বৈ কি, দুই পিশ্‌শ্বাশুড়ী আর একজন মাশ্‌শ্বাশুড়ী আছেন; তাঁরা তিনজনই বিধবা, তাঁদের ছেলে, মেয়ে, বৌ, নাতি, সকলেই ঐ বাড়ীতে থাকে। আর একজন মামীশ্বাশুড়ীও আছেন, তিনি সধবা, তাঁর স্বামী পূর্ব্বদেশে পদ্মাপারে চাকরী কর্‌তে গিয়েছিল, সেখানে নাকি আর একটা বিয়ে করেছে না কি করেছে, তের বছর বাড়ী আসেনি, বাড়ীতে টাকাও পাঠায় নাই, কাজেই মামী দুই ছেলেকে নিয়ে ঐখানেই আছেন, এই বাড়ীতেই সে ছেলেদের বিয়ে হয়, আজ তিন চার বছর হল।

উমা। সে ছেলে দুটী কেমন, লেখাপড়া শিখেছে?

কালী। ছোট ছেলেটী ভাল, ইস্কুলে লেখাপড়া করে, বড়টা লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। বাবু সাহেবদের বোলে তাকে কি কাজ করে দিয়েছিলেন, তা সে আবার কতকগুলো টাকা নিয়ে পালায়। সবাই বল্‌লে, সাহেবরা ছেলেটাকে জেলে দেবে, কিন্তু বাবু সাহেবদের অনেক বলে-কয়ে ঘর থেকে লোকসান পূরণ করে ছেলেটাকে রক্ষা করেন। ছেলেটা বাড়ী থাকে না, রোজ মদ খায়, যখন বাড়ী আসে, পয়সার জন্যে বৌকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেয়, বৌয়ের কান্না শুনে আমাদেরও কান্না পায়। তা বৌ পয়সা কোথা থেকে পাবে, দুই একখানা গয়নাটয়না বাঁধা রেখে দেয়, তা না হলে কি তার প্রাণ থাকত?

উমা। উঃ, তবে তোমাদের মস্ত সংসার।

কালী। তাই ত বল্‌ছিলেম উমা, তোমরা বড় মানুষের ঘরের বৌ, তিনটী জা তিনটী ঘরে থাক, শ্বাশুড়ী রান্নাবান্না দেখেন, তোমরা কাজের ঝন্‌ঝাট কি বুঝবে বল? তোমার দেওর দুজন ত গ্রামেই আছেন, তোমার স্বামী না কলকেতায় গিয়াছেন?

উমা। হ্যাঁ, এক বৎসর হল তিনি কলকেতায় আছেন, আমাকেও কলকেতায় নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর মার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, তিনিও বলেছেন, এই জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে পাঠিয়ে দেবেন।

কালী। হ্যাঁ, শরৎ বল্‌ছিল, তোমার স্বামী নাকি কোন্‌ বড় রাস্তার উপর মস্ত বাড়ী নিয়েছেন, অনেক টাকা খরচ করে সাজিয়েছেন; তাঁর নাকি সুন্দর সাদা ঘোড়ার এক জুড়ি আর কালো ঘোড়ার এক জুড়ি আছে, তেমন গাড়ীঘোড়া রাজারাজড়াদেরও নেই। আবার নাকি কল্‌কেতার বাইরে বড় বাগান কেন্‌বার কথা চল্‌ছে, সেই বাগানও নাকি ইন্দ্রপুরী, তেমন ফল, তেমন ফুল, তেমন পুকুর, তেমন মার্ব্বেলের মেজেওয়ালা ঘর কল্‌কেতায়ও কম আছে। উমা তুমি বড় সুখে থাক্‌বে।

উমার বিম্বাবিনিন্দিত সুন্দর সূক্ষ্ম ওষ্ঠে একটু হাস্যকণা দেখা গেল, উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে যেন একটু ম্লান ছায়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "কালীদিদি, যদি সাদা জুড়ি, কালো জুড়ি আর মার্ব্বেলের ঘর হলে সুখ হয়, তা হলে আমি সুখী হব, কিন্তু কপালের কথা কে বল্‌তে পারে?" সূক্ষ্মদর্শী বিন্দু দেখিলেন, উমা ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ক্ষণেক সকলে মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পর উমা আবার বলিলেন, বিন্দুদিদি! আমাদের ছেলেবেলায় এই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী এসেছিল মনে পড়ে, সে আমাদের হাত দেখেছিল মনে পড়ে?

বিন্দু। কৈ, মনে পড়ে না।

উমা। সে কি দিদি, তুমি আমার চেয়ে বড়, তোমার মনে পড়ে না? কালীদিদির বোধ হয় মনে পড়ে!

কালী। কৈ না, আমারও মনে নেই।

উমা। তবে বুঝি সে কথাটী আমার মনে লেগেছিল, তাই আমার মনে আছে। ঠিক বার বছর হল, এই বৈশাখ মাসে একদিন এমনি সন্ধ্যার সময় এইখানে খেলা কর্‌ছিলেম, একটু একটু অন্ধকার হয়েছে, আর একটু একটু চাঁদের আলো দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন জটাধারী সন্ন্যাসী ঐ জঙ্গলটার ভিতর হতে বেরিয়ে এল। আমরা ভয়ে কাঁপতে লাগলেম, কিন্তু সন্ন্যাসীটী কাছে এসে বল্‌লে, ভয় নেই, তোমরা পয়সা নিয়ে এস, আমি তোমাদের হাত দেখ্‌ব। আমি মার কাছে সেই দিন ৪টা পয়সা পেয়েছিলেম, ভয়ে তা সন্ন্যাসীকে দিলেম। তখন সন্ন্যাসী খুসী হয়ে হাত দেখে বল্‌লে, "মা, তুমি বড় ধনবানের পত্নী হবে গো, তুমি কিছু ভেবো না।" তখন কালীও হাত দেখাবার জন্যে বাড়ী থেকে একটা পয়সা এনে দিলে, সন্ন্যাসী সেটী নিয়ে বল্‌লে, "তোমার ধনটন হবে না, তুমি ভাল বংশের বউ হবে।"

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "আর জটাধারী মশায় আমার কি ব্যবস্থা করলেন?"

উমা। তাই বলছি, তোমার মা ঘাটে গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে পয়সাটয়সা বড় থাক্‌ত না, তুমি শুধু হাতে হাত দেখাতে এলে। সন্ন্যাসী বল্‌লে, "মা, তোমার ধনও নেই, বংশও নেই, গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়ে গরিবের ভাত খাবে।" এই বলে সব পয়সাগুলি তোমার হাতে দিয়ে সন্ন্যাসী চলে গেল।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ ব্যবস্থা করেছিল ত। এখন আমার মনে পড়েছে, গ্রামের লোকে সন্ন্যাসীটীকে রামপ্রসাদ সরস্বতী বল্‌ত।

উমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই সরস্বতী ঠাকুর। তোমার মা পুকুর হতে জল এনে জিজ্ঞেসা করায় আমি সবকথা বল্‌লেম। তখন তিনি আঁচল দিয়ে তোমার চক্ষের জল মুছিয়ে বল্‌লেন, "তা হক, বাছা বেঁচে থাক্, বে থা হক, চির এইস্ত্রী হয়ে থাকিস্, যেন গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়েই সুখে থাকিস্। বাছাধন, কুলে সুখ হয় না, ধন কুলে তোর কাজ নেই।" বিন্দুদিদি, এই কথাটী আমার কেবল মনে পড়ে, ধন বা কুল হলেই যদি সুখ হত, তবে পৃথিবীতে আর অভাব থাকত না।

বিন্দু। ও কি ও উমা, তুমি ছেলেবেলাকার একটা কথা মনে করে চখের জল ফেল্‌ছ কেন? তোমার আবার সুখের অভাব কিসে উমা? তুমি যদি ভাব্‌বে, তবে আমরা কি কর্‌ব?

উমা। না দিদি, আমার কষ্ট কিছুই নেই, আমার কষ্ট আছে বলে আমি দুঃখ কর্‌ছি না। কিন্তু জানি না, কেন এই কল্‌কেতায় যাব বলে কয়েক দিন হতে মনে অনেক সময়, অনেক রকম ভাবনা উদয় হয়। ভবিষ্যতের কথা ভগবানই জানেন! তা বিন্দুদিদি, তুমি কল্‌কেতায় যাচ্ছ, আর কালীদিদিও বর্দ্ধমানে আছেন, শুনেছি সেও কল্‌কেতা হতে ৩।৪ ঘণ্টার পথ; আমরা ছেলেবেলা যেমন তিন বোনের মত ছিলেম, যেন চিরকাল সেই রকম থাকি, আপদ্বিপদের সময় যেন পরস্পরকে ভগিনীর মত জ্ঞান করে সেই রকম ব্যবহার করি।

সহসা উমার মনের বিকার দেখিয়া বিন্দু ও কালীর মনও একটু বিচলিত হইল, তাঁহারা আঁচল দিয়া উমার চক্ষের জল মোচন করিলেন, এবং অনেক সান্ত্বনা করিয়া রাত্রি এক প্রহরের সময় বিদায় লইয়া আপন আপন গৃহে গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ : কলিকাতায় আগমন

ইহার কয়েকদিন পর হেমচন্দ্র সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্ব দিন বিন্দু আপন পরিচিত গ্রামের সকল আত্মীয়া কুটুম্বিনী ও বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়া আসিলেন। তালপুকুরে সেদিন অনেক অশ্রুজল বহিল।

যাইবার দিন অতি প্রত্যূষে বিন্দু আর একবার জ্যেঠাইমার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। বিন্দুর জ্যেঠাইমা বিন্দুকে সত্যই স্নেহ করিতেন, বিন্দুর গমনে প্রকৃত দুঃখিত হইয়াছিলেন। অনেক কান্নাকাটি করিলেন, বলিলেন,

“বাছা, তোরা আমার পেটের ছেলের মত, আমার উমাও যে, বিন্দু সুধাও সে, আহা তোদের হাতে করে মানুষ করেছি, তোদের ছেড়ে দিতে আমার প্রাণটা কেঁদে উঠে। তা যা বাছা, যা, ভগবান করুন, হেমের কল্‌কেতায় একটা চাকরী হক, তোরা বেঁচে বর্ত্তে সুখে থাক, শুনেও প্রাণটা জুড়বে। বাছা উমা শ্বশুরবাড়ী গেছে, তাকেও নাকি কলকেতায় নিয়ে যাবে, এই জ্যৈষ্ঠ মাসে নিয়ে যাবে বলে আমার জামাই পীড়াপীড়ি করছে! শুন্‌লেম সে নাকি কল্‌কেতায় নূতন বাড়ী কিনেছে, বাগান কিনেছে, গাড়ীঘোড়া কিনেছে, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর শরৎ সেদিন বল্‌ছিল, তেমন গাড়ীঘোড়া সহরে নেই। তা ধনপুরের জমিদারের ঝাড়, হবে না কেন বল? অমন টাকা, অমন বড়মানুষী চালচোল ত আর কোথাও নেই। ঐ ওমাসে আমি একবার বেনের বাড়ী গিয়েছিলেম, বুঝলে কিনা, তা এই নীচে থেকে আর তেতলা পর্য্যন্ত সব বেল্‌ওয়ারীর ঝাড় টাঙ্গিয়েছে। আর লোকজন, জিনিসপত্র, সে আর কি বল্‌ব। সেদিন প্রায় পঞ্চাশ জন মেয়ে খাইয়েছিল, বুঝলে কিনা, তা সবাইকে রূপোর থাল, রূপোর রেকাবী, রূপোর গেলাস, রূপোর বাটী দিয়েছিল! আর আমার বেনের কথাবার্ত্তাই বা কেমন। তারা ভারি বড় মানুষ, তাদের রীতিই আলাদা। এই আমার জামাইও শুনেছি নতুন বাড়ী করে খুব সাজিয়েছে, ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, গাল্‌চে, মক্‌মলের চাদর, বুঝলে কিনা, আর কত সোণা, রূপো, সাদা পাথরের সামগ্রী, তার গোনাগুন্তি করা যায় না। তা তোমরা চোখে দেখ্‌বে বাছা, আমি চোখে দেখিনি, তবে কল্‌কেতা থেকে একজন লোক এসেছিল, সেই বল্লে যে * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

“তা বেঁচে থাক বাছা, সুখে থাক, আমার উমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে, দুটী বোনের মত থেকো। আহা বাছা! তোদের নিয়েই আমার ঘরকন্না, তোদের না দেখে কেমন করে থাকব? (রোদন) তা যা বাছা, বাছা উমাও শিগ্‌গির যাবে, তার সঙ্গে দেখা করিস, না হয় তাদের বাড়ীতে গিয়েই দিন কত রইলি। তাদের ত এমন বাড়ী নয়, শুনেছি যে মস্ত বাড়ী, অনেক ঘরদরজা, বুঝলে কিনা * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া জ্যেঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া বিন্দু একবার শরতের মাতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। শরৎ কলিকাতায় যাইয়া অবধি তাঁহার মাতা প্রায় একাকী বাড়ীতে থাকিতেন, শরৎ অনেক বলিয়া কহিয়া একটী ঝি রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটী বাম্‌নী রাখিবার কথায় শরতের মাতা কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না। বাড়ীটী প্রশস্ত, বাহির বাটীতে একটী পাকা ঘর ছিল, শরৎ কলিকাতা হইতে আসিলে সেইখানেই আপনার পুস্তকাদি রাখিতেন ও পড়াশুনা করিতেন। বাড়ীর ভিতরেও দুই তিনটী পাকা ঘর ছিল, আর একটী খোড়ো রান্নাঘর ছিল। তাহার পশ্চাতে একটী মধ্যমাকৃতি পুকুর ছিল, শরৎ তাহা প্রতিবৎসর পরিষ্কার করাইতেন।

শরতের মাতা গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও ক্ষীণ ছিলেন, বিশেষ স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আর শরীরের যত্ন লইতেন না, সুতরাং আরও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিলেন। কি শীতে, কি গ্রীষ্মে তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিতেন, এবং একখানি নামাবলী ভিন্ন অন্য উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন না। স্নান সমাপনান্তর প্রত্যহ প্রায় এক প্রহর ধরিয়া আহ্নিক করিতেন, তাহার পর স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন।

স্বামীর মৃত্যুতে ও কালীতারার কষ্টের চিন্তায় বিধবার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসিতেছিল, মাথার চুল অনেকগুলি শুক্ল হইয়াছিল, অকালে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সমস্ত দিন দেব-আরাধনায় ও পারমার্থিক চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন।

কালে বাছা শরৎ একজন বিদ্বান্ ও মাননীয় লোক হইবেন, কেবল সেই আশায় তাঁহার জীবনের গ্রন্থি এখনও শিথিল হয় নাই।

হেমচন্দ্র, বিন্দু ও সুধাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "যাও বাছা, ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন, তোমরা মানুষ হও, বাছা শরৎ মানুষ হক, এইটী চক্ষে দেখে যাই, আমার এ বয়সে আর কোনও বাঞ্ছা নেই। দেখিস্ বাছা শরৎ, এদের খাওয়াদাওয়ার কোনও কষ্ট না হয়, বিন্দুর দুটী ছেলের যেন কষ্ট না হয়, বাছা সুধা কাঁচ মেয়ে, ওর যেন কোন কষ্ট না হয়।"

সুধার কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধার নয়ন হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, বৃদ্ধা বৈধব্যযন্ত্রণা জানিতেন, এই জ্ঞানশূন্য অল্পবয়স্কা বালিকাকে ভগবান কেন সে যন্ত্রণা দিলেন?

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর শরতের মাতা বিন্দু ও সুধাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন, হেমকে কলিকাতায় যাইয়া সাবধানে থাকিতে বলিলেন, শরৎকে মনোযোগ পূর্ব্বক লেখাপড়া করিতে বলিলেন। অবশেষে বৃদ্ধা সকলকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিলেন, সকলে বৃদ্ধার পদধূলি মাথায় লইয়া বিদায় লইলেন। শরৎও মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কথাগুলি আমি মনে রাখ্‌ব, যত্নে পালন কর্‌ব, যে দিন তোমার কথার অবাধ্য হব, সেদিন যেন আমার জীবন শেষ হয়।"

সকলে চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা সজলনয়নে অনেকক্ষণ অবধি সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, শেষে শূন্যহৃদয়ে সে পথ পানে চাহিয়া শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেম বাটী আসিয়া দেখিলেন, সনাতন কৈবর্ত্ত আসিয়াছে। বিন্দু গ্রাম হইতে যাইবার পূর্ব্বে আপন জমিখানি তাহাকে ভাগে দিয়াছিলেন, কৃতজ্ঞ সনাতন সজলনয়নে বাবুকে আর একবার দেখিতে আসিয়াছিল। সনাতনের সঙ্গে সনাতনের পত্নীও আসিয়াছিল, সে আর একখানি চিনিপাতা দৈ আনিয়াছিল! বিন্দু অনেক বারণ করিল, কিন্তু কৈবর্ত্ত-পত্নী তাহা শুনিল না, বলিল, "গাড়ীতে যদি জায়গা না হয়, আমি হাতে বর্দ্ধমান ষ্টেশন পর্য্যন্ত দিয়ে আস্‌ব।" সুতরাং সুধা গাড়ীতে চাপিয়া সেই দৈ কোলে করিয়া লইল। গাড়ীর ভিতর বিন্দু ও সুধা দুই ছেলেকে নিয়া উঠিলেন, শরৎ ও হেম হাঁটিয়া যাইতেই পছন্দ করিলেন। গরুর গাড়ী বড় আস্তে আস্তে যায় প্রাতঃকালে গ্রাম ত্যাগ করিয়াও বেলা দুই প্রহরের সময় বর্দ্ধমানে পঁহুছিল।

ষ্টেশনের নিকট একটী দোকানে গিয়া সকলে উঠিলেন, এবং তথায় রাঁধাবাড়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র খাওয়াদাওয়া করিয়া লইলেন। বর্দ্ধমানের ষ্টেশনের কাছে বড় সুন্দর থাজা ও সীতাভোগ পাওয়া যায়, শরৎবাবু তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিলেন, এবং তাহা দিয়া সুধা শেষবার তালপুকুরের চিনিপাতা দৈ খাইয়া লইলেন।

বেলা দুইটার পর গাড়ী ছাড়ে, দুইটা না বাজিতে বাজিতে ষ্টেশন লোকে পূর্ণ হইল। হেম অনেকদিন রেলওয়ে ষ্টেশনে আসেন নাই; অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত সেই লোকের সমাগম দেখিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে নানা উদ্দেশ্যে নানা প্রকার লোক ষ্টেশনে জড় হইতেছে, দেখিয়া হেমের মনে একটী অচিন্তনীয় ভাব উদয় হইল। দূর মাড়ওয়ার ও বিকানীর প্রদেশ হইতে বড় বড় গাঁঠ্‌রী লইয়া বণিকগণ কলিকাতায় বাণিজ্যার্থে আসিতেছে; ইহারাই ভারতবর্ষের প্রকৃত বণিক সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এই অল্পব্যয়ী, বহুকষ্টসহ, বহুপথগামী, কঠোরজীবী জাতির সমাগম ও বাণিজ্য আছে। আরা প্রভৃতি জেলা হইতে সবলশরীর বহুশ্রমী কিন্তু দরিদ্র বিহারিগণ চাকরীর জন্য কলিকাতাভিমুখে গমন করিতেছে। কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ হইতে বাঙ্গালী নারী পুত্র বন্ধুদিগের সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন; বাঙ্গালী নারী সহজে দুর্ব্বলা ও গৃহপ্রিয়, তীর্থ করাই তাঁহাদিগের দেশভ্রমণের একমাত্র উপায়, তীর্থ করিবার জন্য তাঁহারা কষ্ট তুচ্ছ করিয়া মথুরা, বৃন্দাবন ও পুষ্কর তীর্থ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আইসেন। বালকগণ ছুটির পর পুনরায় কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেছে, যুবকগণ নানা স্বপ্নসম আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য বা উচ্চাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া সেই মহানগরীর দিকে আসিতেছেন। আশা তাহাদিগের সম্মুখে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, যুবকগণ সেই কুহকে ভুলিয়া উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। কলিকাতাবাসী কেহ কেহ বিদেশ হইতে চাকরী করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, অনেক দিন পর পুত্রকলত্রের মুখ দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন। কেহ বা প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কেহ বা মুমূর্ষু আত্মীয় বন্ধুকে একবার দেখিবার জন্য, কেহ ধন, মান, পদ বা যশোলিপ্সায়, কেহ বা

জীবনের সায়াহ্নে কেবল গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য, সকলেই নানা উদ্দেশ্যে এই বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইতেছে। এই রাজধানী কর্ম্মদেবীর একটী প্রধান মন্দির, হেমচন্দ্র সেই মন্দির-আগমন-পথে অসংখ্য যাত্রী দেখিতে লাগিলেন।

দুইটার পর গাড়ী ছাড়িল, পাঁচটার পর গাড়ী কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিল। শরৎ একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন, এবং সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া ভবানীপুর শরতের বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

হুগলীর পোলের উপর হইতে বিন্দু বিশাল গঙ্গাবক্ষে গৃহতুল্য অসংখ্য অর্ণবপোত ও তাহার মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং অপর পার্শ্বে কলিকাতার ঘাট ও হর্ম্ম্যাদি দেখিয়া পুলকিত হইলেন। গাড়ী বড়বাজার ও চিনাবাজারের ভিতর দিয়া চলিল, তথায় শরতের কিছু কাপড়চোপড় কিনিতে ছিল, তাহাতে কিছু বিলম্ব হইল। বিন্দু ও সুধা কখনও তালপুকুর হইতে বাহিরে যান নাই, ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রধান জনাকীর্ণ স্থান দেখিয়া তাঁহারা অধিকতর বিস্মিত হইলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান, কোন কোন স্থানে সরু সরু গলীর উভয় পার্শ্বে দ্বিতল বা ত্রিতল দোকানে পথ প্রায় অন্ধকার করিয়াছে। কত দেশের কত প্রকার বস্ত্রাদি রাশি রাশি হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে, বিলাতী থান, দেশী কাপড়, বারাণসী সাটী, বম্বের কাপড়, মসলীপত্তনের ছিট, ফ্রান্সের সাটীন বস্ত্রাদি, ইউরোপের নানা স্থানের গালিচা, চাদর, ছিট, পরদা ও সহস্র প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাপড়। মণিমুক্তার দোকানে মণিমুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে. খেলানার দোকানে রাশি রাশি খেলানা, সারি সারি খাবারের দোকানে এখনও মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছে, পুস্তকের দোকানে পুস্তকশ্রেণী। শিল, যাহা একখানি কিনিলে গৃহস্থের তিন পুরুষ যায়, তাহাই বিন্দু রাশি রাশি দেখিলেন, লোহার কড়া, বেড়ী, ঝাঁঝরি প্রভৃতি দ্রব্যতে দোকান পরিপূর্ণ, পিত্তল ও কাঁসার দ্রব্যে কোথাও চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইতেছে। কাঁচের দোকানে ঝাড়, লণ্ঠন, পাত্র, গেলাস, খেলানা, লেম্প প্রভৃতি সুন্দররূপে সজ্জিত রহিয়াছে, কাষ্ঠদ্রব্যের দোকানে ছুতারগণ দ্রব্যাদি পালিস করিতেছে. ছবির দোকানে কাড়িকাষ্ঠ ও দেয়াল ছবিপূর্ণ, বাক্‌সের দোকানে কাঠের বাক্‌স, টিনের বাক্‌স, চামড়ার বাক্‌স. লোহার বাক্‌স, কত প্রকার দোকানে বিন্দু ও সুধা কত প্রকার দ্রব্য দেখিলেন, তাহা সংখ্যা করিতে পারিলেন না। পথ জনাকীর্ণ, গাড়ীর ভিড়ে গাড়ী চলিতে পারে না. মনুষ্যের ভিড়ে মনুষ্য অগ্রপশ্চাৎ দেখিতে পায় না, চারিদিকে লোকের শব্দ, গাড়ীর শব্দ. খরিদ্দারদিগের কথা. বিক্রেতাদিগের চীৎকার-ধ্বনি! বিন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন. এ কি বিশাল মনুষ্যসমুদ্র! এত লোক কি করে. কোথা হইতে আইসে. এত দ্রব্য কে ক্রয় করে. কোথায় চলিয়া যায়! অদ্য তালপুকুর হইতে দরিদ্র বিন্দু এই মনুষ্যসমুদ্রে বিলীন হইতে আসিয়াছেন, এ মহানগরীর কোনও নিভৃত স্থানে কি বিন্দু স্থান পাইবেন?

সন্ধ্যার সময় বিন্দুর গাড়ী চিনাবাজার হইতে বাহির হইয়া লালদীঘির নিকট গিয়া পড়িল, তথায় যাইবার সময় তিনি প্রাসাদতুল্য ইংরাজী দোকান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই সকল কাপড়ওয়ালার দোকান বা জুতাওয়ালার দোকান শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। জুতাওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা এক্ষণে ভারত-সমাজের নিম্নস্তর. জুতাওয়ালা ও কাপড়ওয়ালাই ইংলণ্ডের গৌরব-স্বরূপ. ইংলণ্ডের রাজ্যবিস্তারের প্রধান হেতু!

বিস্মিত নয়নে সুধা ও বিন্দু লাট সাহেবের বাড়ী দেখিতে দেখিতে গড়ের মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, ইন্দ্রপুরী তুল্য চৌরঙ্গিতে দীপালোক প্রজ্বলিত হইয়াছে. এখন মর্ত্ত্যে যাঁহারা দেবত্ব করিতেছেন. তাঁহারা বেরুশ. ফিটন বা লেণ্ডলেট করিয়া ইডেন গার্ডেনে সমাগত হইতেছে। ঐ প্রসিদ্ধ উদ্যান হইতে অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে. এবং আকাশের বিদ্যুৎ মনুষ্যের বিজ্ঞানক্ষমতার অধীন হইয়া নরনারীর মন রঞ্জনার্থ আলোক বিতরণ করিতেছে! ভারতবর্ষের আধুনিক অধীশ্বরদিগের গৌরব ও ক্ষমতা. প্রভুত্ব ও বিলাস দেখিয়া তালপুকুরনিবাসিনী দরিদ্রা বিন্দু বিস্মিত হইলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। দিনের পরিভ্রমণ বশতঃ সুধা হেমের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিন্দুও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, ছোট সুপ্ত শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া তিনিও চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন। শরৎ বড় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সুধার মস্তকটী ধারণ করিয়া নিস্তব্ধে পথ ও হর্ম্ম্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে

সঙ্গে হেমের অন্তঃকরণে চিন্তা আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার উদ্দেশ্য কি সফল হইবে? ভবিষ্যতে কি আছে? শান্ত নিস্তব্ধ তালপুকুর ত্যাগ করিয়া তিনি অদ্য এই মহানগরীতে আসিলেন, এই সদাচঞ্চল মনুষ্যসমুদ্রের কোনও নিভৃত কন্দরে কি তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান আছে?

একাদশ পরিচ্ছেদ : কলিকাতার বড়বাজার

বিন্দু। ও সুধা, একবার এদিকে এস ত বোন।

সুধা। কি দিদি, আমাকে ডাক্‌ছ?

বিন্দু। হ্যাঁ বোন, ঐ কাপড় কখানা কেচে রেখেছি, ছাতের উপর শুখুতে দাও ত। আমি কুয়ো থেকে দু'কলসী জল তুলে শীঘ্র নেয়ে নি; রোদ উঠেছে, এখনি গয়লানী দুধ আন্‌বে, উনুন ধরাতে হবে। কল্‌কেতায় কুয়োর জলে নাইতে সুখ হয় না, এর চেয়ে আমাদের পাড়া-গেঁয়ে পুকুর ভাল, বেশ নেবে স্নান করা যায়! আর কুয়োর জলে কেমন একটা গন্ধ।

সুধা হাসিয়া বলিল, "তোমার বুঝি কল্‌কেতার সবই খারাপ লাগে? কেন, কল্‌কেতার কলের জল কেমন সুন্দর। ঝি খাবার জন্যে এক কলসী করে আনে, সে যেন কাকের চক্ষু, আর কেমন মিষ্টি।"

বিন্দু। নে বোন, তোর কল্‌কেতার সুখ্যাতি আর শুনতে পারি না।

সুধা। কেন দিদি, তুমি মন্দ কি দেখ্‌লে বল। কত বড় সহর, কত বাজার, দোকান, ঘর, গাড়ী, ঘোড়া, লোকজন, এমন কি আমাদের তালপুকুরে আছে? এমন দোতালা বাড়ী কি আমাদের তালপুকুরে আছে?

বিন্দু। তা না থাকুক বোন, আমাদের তালপুকুরের সোণার বাড়ী, চারিদিকে নড়বার জায়গা আছে, একটু বাতাস আসে, একটু রোদ আসে, দুটো নাউ গাছ আছে, দুটো আম গাছ আছে, এখানে কি আছে বল ত? গাড়ীঘোড়া যাদের আছে, তাদের আছে, আর দোতালা পাকা বাড়ী নিয়ে ধুয়ে খাব? ঘরে বাতাস আসে না, ছোট অন্ধকার উঠনে রোদ আসে না, পাড়ায় লোকের বাড়ী দেখা কর্‌তে যাবার যো নেই, পাল্কী না হলে বাড়ীর বাইরে যাবার যো নেই, ও মা, এ কি গো? যেন পিঁজরের ভিতর পাখী রেখেছে!

সুধা। কেন দিদি, সেদিন আমরা গাড়ী করে কত বেড়িয়ে এলেম, চিড়িয়াখানায় বাঘ-সিংহ দেখে এলেম, গাড়ী করে বেরুলেই কত কি দেখতে পাই।

বিন্দু। না বাবু, আমার গাড়ী করে বেড়াতে ভাল লাগে না। আমাদের তালপুকুর সোণার তালপুকুর, সকালবেলা পুকুরের ঘাটে আসতেম, সেই ভাল। আর সব লোককে চিন্‌তেম, সবার বাড়ী যেতেম, সবাই কত আমাদের ভালবাস্‌ত। এখানে কে কাকে চেনে বল?

সুধা। তা দিদি, একদিনেই কি চিনবে, থাক্‌তে থাক্‌তে সকলকে চিন্‌বে। ঐ সেদিন দেবীপ্রসন্নবাবুদের বাড়ী থেকে ঝি এসেছিল, আমাদের যেতে বলেছে। আর চন্দ্রনাথবাবু আমাদের কাল কত খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বিন্দু। তা আলাপ হবে বৈ কি বোন; যতদিন থাক্‌ব, লোকের সঙ্গে চেনাশুনা হবে। তবে কি জান সুধা, তাঁরা হলেন বড়লোক, আমরা গরিব মানুষ, তাঁদের সঙ্গে কি ততটা মেশা যায়, তা নয়; তাঁরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা কন, এই তাঁদের অনুগ্রহ। তা কল্‌কেতায় যখন এসেছি, তখন দুজন চারজনের সঙ্গে কি চেনাশুনা হবে না, তা হবে বৈ কি।

সুধা। আর শরৎবাবু রোজ সন্ধ্যার সময় ত আমাদের বাড়ী আসেন, কত গল্প করেন, কত লোকের কত কথা কন, কত বইয়ের কথা বলেন, দিদি সে গল্প শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।

বিন্দু। আহা, শরতের মত কি ছেলে আজকাল আর দেখা যায়? তার একজামিনের জন্য সমস্ত দিন পড়াশুনা করতে হয়, তবু প্রত্যহ আমরা কেমন আছি জিজ্ঞেসা কর্‌তে আসেন, পাছে কল্‌কেতায় এসে আমাদের মন কেমন করে, তাই রোজ সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন। যত দিন তাঁর বাড়ীতে ছিলেম, তত দিন ত তাঁর পড়াশুনা ঘুরে গিয়েছিল, কিসে আমরা ভাল থাকি, সেই চেষ্টায় ফির্‌তেন। তাঁর টাকার জাঁক নেই, লেখাপড়ার জাঁক নেই, আর শরীরে কত মায়াদয়া। তাঁর মত ছেলে কি আর আছে?

সুধা। দিদি, ঐ বুঝি গয়লানী আসছে!

বিন্দু। কি লো, আজ একটু ভাল দুধ এনেছিস, না কাল্‌কের মত জল দেওয়া দুধ এনেছিস্? তোদের কল্‌কেতায় বাছা কলের জলের ত অভাব নেই, তোদের দুধেরও অভাব নেই, রংটা রাখতে পার্‌লেই হল!

গোয়ালিনী। না মা, তোমাদের বাড়ীতে কি সে রকম দুধ দিলে চলে, এই দেখ না কেন? খেলেই ত তোমরা ভালমন্দ বুঝতে পার্‌বে।

বিন্দু। দেখিছি বাছা, দেখিছি, আহা তালপুকুরে আমরা তিন পো একসের করে দুধ পেতেম, তাই ছেলেরা খেয়ে উঠ্‌তে পার্‌ত না। তুই বাছা পাঁচ পো করে দুধ দিস্, তা খেয়ে ছেলেদের পেট ভরে না। আর কড়ায় যখন দুধ ঢালি, সে দুধ ত নয়, যেন জল ঢাল্‌ছি।

গো। তা পাড়াগাঁয়ে যেমন দুধ পেতে মা, এখানে কি তেমন পাবে? সেখানে গরু চরে খায়, থাকে ভাল, দুধ দেয় ভাল। আমাদের বাঁধা গরু কি তেমন দুধ দেয়?

বিন্দু। আর কাল যে একটু দৈ আনতে বলেছিলেম, তা এনেছিস?

গো। হাঁ, এই যে এনেছি।

বিন্দু। ও মা! ঐ চার পয়সার দৈ?

গো। তা, হাঁ গা, চার পয়সার দৈ আর কত হবে! ঐ তোমার ঝিকে বল না, বাজার থেকে একখানা কিনে আনতে, যদি এর চেয়ে বড় আনে তবে দাম দিও না। হাঁ মা, তোমাদের পিত্তেশে আমরা আছি, তোমাদের কি আমি ঠকাব গা?

বিন্দু। ওলো সুধা, এই দেখ লো, তোর সোণার কল্‌কেতার চার পয়সার দৈ দেখ! একটু জল মেখে খাস বোন, তা না হলে ভাতে মাখ্‌তে কুলোবে না। কে ও, ঝি এসেছিস?

ঝি। কেন গা?

বিন্দু। বাছা, আজ একটু সকাল সকাল বাজার যাস্। আজ বাবু দশটার সময় বেরবেন বলেছেন, সকাল সকাল বাজার করে আসিস্। তুই কি মাছ নিয়ে আসিস্, তার ঠিক নেই। হাঁ লা, বড় বড় কৈ মাছ বাজারে পাওয়া যায় না?

ঝি। তা পাওয়া যাবে না কেন মা; তবে যে দর, সে কি ছোঁয়া যায়? বড় বড় কৈ এক একটা দু পয়সা, তিন পয়সা, চার পয়সা চায়।

বিন্দু। বলিস্ কি রে? কল্‌কেতায় লোকে কি খায়দায় না, কেবল গাড়ীঘোড়া চড়ে বেড়ায়?

ঝি। তা খাবে না কেন মা, যে যেমন খরচ করে, সে তেমনি খায়। আমাদের দিন চার পয়সার মাছ আসে, তাতে দুবেলা হয়, তাতে কি ভাল মাছ পাওয়া যায়?

বিন্দু। আচ্ছা, মাগুর মাছ?

ঝি। ও মা, মাগুর মাছের কথাটী কইও না, একটা বড় মাগুর মাছের দাম চার পয়সা, আট পয়সা। বল্‌ব কি মা, কল্‌কেতার বাজার যেন আগুন। আমরাও মা পাড়াগেঁয়ে ঘর করেছি, হাটে মাছ কিনে খেয়েছি, তা কল্‌কেতায় কি তেমন পাই? কল্‌কেতায় কি আমাদের মত গরিব লোকের থাক্‌বার জো আছে মা, এই তোমরা দুবেলা দুপেট খেতে দিচ্ছ, তাই তোমাদের হিল্লেতে আছি, নৈলে কল্‌কেতায় কি আমরা থাকতে পারি?

বিন্দু। তা নে বাছা, যা ভাল পাস নিয়ে আসিস, টেংরা মাছ হয়, পার্শে মাছ হয়, দেখে-শুনে ভাল দেখে আনিস। আর এক পয়সার ছোট ছোট মৌরলা মাছ আনিস, একটু অম্বল রেঁধে দেব। বাবুকে যে কি দিয়ে ভাত দি তা ভেবে ঠিক পাইনি। আর দেখ্, শাক যদি ভাল পাওয়া যায়, এক পয়সার আনিস ত, নটে শাগ হয়, কি পালম শাগ হয়, না হয় নাউ শাগ হয়ত আরও ভাল। আহা, তালপুকুরে আমাদের নাউ শাগের ভাবনা ছিল না, বাড়ীতে যে নাউ শাগ হত তা খেয়ে উঠ্‌তে পারতেম না। আলুগুলো বড় মাগ্‌গি, আলু জেয়াদা আনিস নি, বেগুন হয়, উচ্ছে কি ঝিঙ্গে হয়, কি আর কিছু ভাল তরকারি যা দেখ্‌বি নিয়ে আসিস্। আর থোড় পাস ত নিয়ে আসিস্, একটু ছেঁচকি করে দেব, না হয় মোচা নিয়ে আসিস্, একটু ঘণ্ট রেঁধে দিব। হা কপাল! থোড়, মোচা আবার পয়সা দিয়ে কিন্‌তে হয়।

স্নান সমাপন করিয়া গয়লানীকে বিদায় করিয়া ঝিকে পয়সা দিয়া বিন্দু রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং উনান জ্বালাইয়া দুধ জ্বাল দিয়া উপরে লইয়া গেলেন। ছেলে দুটী উঠিয়াছে।

তাহাদের দুধ খাওয়াইয়া বিছানা মাদুর তুলিলেন এবং ঘর পরিষ্কার করিলেন। একটু বেলা হইলে দাসী বাজার হইতে মাছ তরকারি আনিল, তখন বিন্দু ঝির নিকট ছেলে দুটীকে রাখিয়া পুনরায় রন্ধনঘরে প্রবেশ করিলেন। বাটীতে একটী দাসী ভিন্ন আর লোক ছিল না, রন্ধনকার্য্য দুই ভগিনীই নির্ব্বাহ করিতেন। সুধা নূতন বাড়ীতে আসিয়া ভাঁড়ারী হইয়াছেন, বড় আহ্লাদের সহিত ভাঁড়ার হইতে নুন, তেল, মস্‌লা বাহির করিলেন, চাল ধুয়ে দিলেন, তরকারি কুটিলেন, মাছ কুটিলেন, এবং আবশ্যকীয় বাটনা বাটিয়া দিলেন। বিন্দু শীঘ্র রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাঠক বুঝিয়াছেন যে হেমচন্দ্র কয়েক দিন শরতের বাটীতে থাকিয়া ভবানীপুরে একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন। শরৎ এ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক করিলেন, আপন বাটীতে হেমকে রাখিবার জন্য অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহাতে শরতের পড়ার হানি হইবে বলিয়া হেমচন্দ্র তথায় কোনও প্রকারে রহিলেন না। শরৎ অগত্যা অনুসন্ধান করিয়া মাসে ১১ টাকা ভাড়ার একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন।

ভবানীপুরে শরৎবাবু অনেক দিন ছিলেন, তাঁহার সহিত অনেকের আলাপ ছিল, হেমচন্দ্রও তাঁহাদিগের পরিচিত হইলেন। কেহ হাইকোর্টে ওকালতি করেন, কেহ বড় হৌসের বড় বাবু, কাহারও বনিয়াদি বিষয় আছে, কাহারও বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ, কিন্তু গাড়ীঘোড়ার আড়ম্বর আছে। কেহ নবাগত শিষ্টাচারী সদ্বংশজাত হেমচন্দ্রের সহিত প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিলেন, কেহ বা ঝাড় লণ্ঠন পরিশোভিত জনাকীর্ণ বৈঠক্‌খানায় দরিদ্রকে আসিতে দিয়া এবং দুই একটী সগর্ব্ব কথা কহিয়া ভদ্রাচরণ বজায় রাখিলেন, এবং নিজ বড়মানুষী প্রকটিত করিলেন। কেহ হেমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা ও সদাচারে তুষ্ট হইয়া শরতের সহিত হেমকে দুই একদিন আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেহ বা নব্য সভ্যতার সুন্দর নিয়মানুসারে হেমচন্দ্রের “একোয়েণ্টান্‌স্‌ ফর্‌ম্‌” করিতে “ভেরি হ্যাপি” হইলেন। কোন বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত বড়লোকের কার্পেটমণ্ডিত ঘরে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সাক্ষাদমৃত লাভ করিতে পারিলেন না, অন্য কোন বড়লোক, তিনিও বিষয়কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত, জুড়ি করিয়া বাহির হইবার সময় ব্রুহমের জানালার ভিতর হইতে সহাস্য মুখচন্দ্র বাহির করিয়া সানুগ্রহ-বচনে জানাইলেন যে হেমবাবু কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে আছেন শুনিয়া, তিনি (উপরি-উক্ত বড়লোক) বড় সুখী হইয়াছেন, অদ্য তিনি (উপরি-উক্ত বড়লোক) বড় “বিজি”, কিন্তু তিনি “হোপ” করেন, শীঘ্র একদিন বিশেষ আলাপসালাপ হইবে। আর যদি হেমবাবু তাঁহার (উপরি-উক্ত বড়লোকের) বাগান দেখিতে মানস করেন, তবে শনিবার অপরাহ্নে আসিতে পারেন, সেখানে বড় “পার্টি” হইবে, তিনি (উপরি-উক্ত বড়লোক) হেমবাবুকে “রিসিভ” করিতে বড় “হ্যাপি” হইবেন! ঘর ঘর শব্দে ব্রুহম বাহির হইয়া গেল, অশ্বক্ষুরোদ্গত কর্দ্দম হেমচন্দ্রের বস্ত্রে দুই এক ফোঁটা লাগিল, হেমবাবু সেই অমৃত-হাস্য ও অমৃত-বচনে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী গেলেন।

ভবানীপুরের ভবের বাজার দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলিকাতার বিস্তীর্ণতর ভবের বাজারও কিছু কিছু দেখিতে পাইলেন। বাল্যকালে তিনি মনে করিতেন, কলিকাতার বড়বাজারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ, কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইলেন, কলিকাতায় বড়বাজার হইতেও বড় একটী বাজার আছে, তাহাতে রাশি রাশি মাল গুদামজাত আছে, সেই অপূর্ব্ব মাল ক্রয় করিবার জন্য আলোকের দিকে পতঙ্গের ন্যায় বিশ্বসংসার সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। বাল্যকালে তিনি শিশুশিক্ষায় পড়িয়াছিলেন যে গুণ থাকিলে বা বিদ্যা থাকিলেই সম্মান হয়, সে বাল্যোচিত ভ্রম তাঁহার শীঘ্রই তিরোহিত হইল, তিনি এখন দেখিলেন, সম্মানামৃত সের করা, মণ করা, বাজারে বিক্রয় হইতেছে, কেহ ভারি খানা দিয়া, কেহ সখের গার্ডেন পার্টি দিয়া, কেহ ধন দিয়া, কেহ বা পরের ধনে হস্তপ্রসারণ করিয়া, সেই অমৃত ক্রয় করিতেছেন, ও বড় সুখে, নিমীলিতাক্ষে সেই সুধা সেবন করিতেছেন। সুন্দর সুশোভিত বৈঠক্‌খানার ঝাড় লণ্ঠন হইতে সে অমৃতের স্বচ্ছ বিন্দু ক্ষরিয়া পড়িতেছে, দর্পণ ও ছবি হইতে সে নির্ম্মল অমৃত প্রতিফলিত হইতেছে, সুবর্ণ বর্ণ সুধার সহিত সে অমৃত মিশ্রিত হইতেছে, নর্ত্তকীর সুললিত কণ্ঠস্বরে সে অমৃত-প্রস্রবণের ঝঙ্কার শব্দিত হইতেছে! মনুষ্য মক্ষিকাগণ ঝাঁকে ঝাঁকে সে অমৃতের দিকে ধাইতেছে! কখন কুকের বাড়ী হইতে ঘর্ঘর শব্দে সেই অমৃত নিঃসৃত

হইতেছে; কখন অসলারের দোকান হইতে সে সুধা প্রতিফলিত হইতেছে, জগৎ তাহার কিরণে আলোকপূর্ণ হইতেছে! আর কখনও বা অবারিত বেগে কর্ত্তৃপক্ষদিগের মহল হইতে সে অমৃতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যাবতীয় বড়লোকগণ, সমাজের সমাজপতিগণ, ভারি ভারি দেশের মহামান্যগণ, পরম সুখে তাহাতে অবগাহন করিতেছেন, হাবুডুবু খাইতেছেন, আপনাদিগের জীবন সার্থক মনে করিতেছেন! আবার কখনও বা বিলাত হইতে "পেক" করা "হর্ম্মোটিকলীসীল" করা বাক্সে বাক্সে সে মাল আমদানি করা হইতেছে, দুই একখানি ফাঁপা বা গিল্‌টি করা দ্রব্যের সহিত রাশি রাশি চাটুকারিতা বিমিশ্রতা করিয়া বিলাতী মহাজনের মন ভুলাইয়া দেশীয় বিজ্ঞগণ সে মাল আমদানি করিতেছেন! এ বাজারে সে মালের দর কত! "আদত বিলাতী সম্মানসূচক পত্র!" "আদত বিলাতী সম্মানসূচক পদবী!"—এই গৌরবধ্বনিতে বাজার গুলজার হইতেছে!

বিস্তীর্ণ বাজারের অন্য কোথাও "দেশহিতৈষিতা", "সমাজ সংস্কার" প্রভৃতি বিলাতী মাল বিলাতী দরে বিক্রয় হইতেছে, সে হাটে বড়ই গোলমাল, বড়ই লোকের ঠেলাঠেলি, বড়ই লোকের কোলাহল, তাহাতে কলিকাতার টাউনহল, কৌন্সিল-হল, মিউনিসিপাল-হল প্রভৃতি বড় বড় অট্টালিকা বিদীর্ণ হইতেছে। হেমচন্দ্র দেখিলেন, রাজমিস্ত্রী অনবরত মেরামত করিয়াও সেসব বাড়ী রাখিতে পারিতেছে না, দেয়াল ও ছাদ ফাটিয়া গিয়া সে কোলাহল গগনে উত্থিত হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার সে হাটের ঠিক সম্মুখে অন্যরূপ মাল বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেতৃগণ বড় বড় জয়ঢাক বাজাইয়া চীৎকার করিতেছে—আমাদের এ খাঁটী দেশী মাল, ইহার নাম "সমাজ-সংরক্ষণ", ইহাতে বিলাতী মালের ভেজাল নাই, সকলে একবার চাকিয়া দেখ। হেমচন্দ্র একটু চাকিয়া দেখিলেন, দেখিলেন, মালটা ষোল আনা বিলাতী, বিলাতী পাত্রে বিক্রীত, বিলাতী মালমসলায় প্রস্তুত, কেবল একটু দেশী ঘিয়ে ভাজিয়া লওয়া মাত্র। হেমচন্দ্র দরিদ্র হইলেও লোকটা একটু সৌখিন, তাঁহার বোধ হইল, ঘিটাও দুর্গন্ধ! ভাল খাঁটি দেশী ঘি নহে। ঈষৎ পচা, ও সেই ঘিয়ে ভাজা গরম গরম এই "প্রকৃত দেশী মাল" বিক্রয় হইতেছে। রাশি রাশি খরিদ্দার সেই হাটের দিকে ধাইতেছে। সের দরে, মণ দরে, হাঁড়ি করিয়া, জালায় করিয়া, সেই মাল বিক্রয় হইতেছে। মুটেরা রাশি রাশি মাল বহিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার সৌরভে সহর আমোদিত হইতেছে!

তাহার পর সাধুত্বের বাজার, বিজ্ঞতার বাজার, পাণ্ডিত্যের বাজার, হেমচন্দ্র কত দেখিবেন? সে সামান্য পাণ্ডিত্য নহে, অসাধারণ পাণ্ডিত্য; এক শাস্ত্রে নহে, সর্ব্ব শাস্ত্রে; এক ভাষায় নহে, সকল ভাষায়; এক বিষয়ে নহে, সকল বিষয়ে; কম বেশী নহে, সকল বিষয়েই সমান সমান; অল্প পরিমাণে নহে, সের দরে, মণ দরে, জালায় জালায় পাণ্ডিত্য বিকাশিত রহিয়াছে। সে গাঢ় পাণ্ডিত্যের ভারে দুই একটী জালা ফাঁসিয়া গেল, পথঘাট পাণ্ডিত্যের লহরীতে কর্দ্দমময় হইল, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিল, হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই পাণ্ডিত্যের উৎস হইতে নাকে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পলাইলেন।

তাহার পর ধর্ম্মের বাজার, যশের বাজার, পরোপকারিতাব বাজার, হেমচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কলিকাতার কি মাহাত্ম্য! এমন জিনিসই নাই, যাহা খরিদ-বিক্রয় হয় না। যাহাতে দুই পয়সা লাভ আছে, তাহারই একখানা দোকান খোলা হইয়াছে, মাল গুদামজাত হইয়াছে, মালের গুণাগুণ যাহাই হউক, একখানি জমকাল "সাইন বোর্ড" সম্মুখে দর্শকদিগের নয়ন ঝলসিত করিতেছে! বাল্যকালে তিনি বড়বাজারের বণিকদিগকে চতুর মনে করিতেন, কিন্তু অদ্য এ বাজারের চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, চতুরতায় জিনিসের কাট্‌তি, চতুরতায় বিশেষ মুনাফা, চতুরতায় জগৎসংসার ধাঁধা লাগিয়া রহিয়াছে!

কলিকাতায় অনেক দিন থাকিতে থাকিতে হেমচন্দ্র সময়ে সময়ে অল্প পরিমাণে খাঁটি মালও দেখিতে পাইলেন। কখন কোন ক্ষুদ্র দোকানে বা অন্ধকার কুটীরে একটু খাঁটি দেশহিতৈষিতা, একটু খাঁটি পরোপকারিতা, একটু খাঁটি পাণ্ডিত্য পাইলেন, কিন্তু সে মাল কে চায়, কে জিজ্ঞাসা করে? কলিকাতার গৌরবান্বিত বড়বাজারে সে মালের আমদানি রপ্তানি বড় অল্প, সুসভ্য মহাসম্ভ্রান্ত ক্রেতাদিগের মধ্যে সে মালের আদর অতি অল্প।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ ছেলে-মুখে বুড়ো কথা

আষাঢ় মাসে বর্ষাকাল আরম্ভ হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তিনি কলিকাতায় কোনও কার্য্যের জন্য বিশেষ লালায়িত নহেন, কিছু না হয়, ছয় মাস পরে গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন, পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন; তথাপি যখন কলিকাতায় কর্ম্মের চেষ্টায় আসিয়াছেন, তখন কর্ম্ম পাইবার জন্য যত্নের ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি কোন উপায় করিতে পারেন নাই। তাঁহার চারিদিকে কলিকাতার অনন্ত লোক-স্রোত অনবরত প্রবাহিত হইতেছে, এই অনন্ত জনসমুদ্রের মধ্যে হেমচন্দ্র একাকী!

সন্ধ্যার সময় তিনি শ্রান্ত হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। শান্ত, সহিষ্ণু বিন্দু স্বামীর জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, দুখানি আক্, দুটি পানফল, চারটী মুগের ডাল, এক গেলাস মিছরীপানা সযত্নে আনিয়া দিতেন, প্রফুল্লচিত্তে মিষ্ট বাক্য দ্বারা হেমচন্দ্রের শ্রান্তি দূর করিতেন। পল্লীগ্রামেও যেরূপ, ভবানীপুরেও সেইরূপ, স্বামিসেবাই বিন্দুর একমাত্র কর্ম্ম, ছেলে দুইটী মানুষ করাই তাঁহার একমাত্র আনন্দ। সেই কার্য্যে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় শিশু দুইটীকে লইয়া ছাদে গিয়া বসিতেন, কখন কখন দেশের চিন্তা করিতেন, কখন কখন ছাদের প্রাচীরের গবাক্ষের ভিতর দিয়া পথের জনস্রোত দেখিতেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ক্ষীণ, তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক ম্লান!

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শরৎ হেমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিন্দু শয়নঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া একটী মাদুর পাতিয়া দিতেন, সকলে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিতেন। হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন, তাহাই বলিতেন; শরৎ কলেজের কথা, পুস্তকের কথা, শিক্ষক বা ছাত্রদিগের কথা, কলিকাতার নানা গল্প, নানা কথা, সংসারের সুখদুঃখের কথা, জগতে ধন ও দারিদ্র্যের কথা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কহিতেন। তাহার নবীন বয়সের উৎসাহ, ধর্ম্মপরায়ণতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেই কথায় দেদীপ্যমান হইত, জগতের প্রকৃত মহৎ লোকের উৎসাহ, মহত্ত্ব ও অবিচলিত প্রতিজ্ঞার গল্প করিতে করিতে শরচ্চন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইত, জগতের প্রতারণা মিথ্যাচরণ অত্যাচারের কথা কহিতে কহিতে সেই যুবকের নয়নদ্বয় প্রজ্বলিত হইত।

হেমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহের সহিত সেই উন্নতহৃদয় যুবকের কথা শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট ও প্রীত হইতেন, বিন্দু বাল্যসুহৃদের হৃদয়ের এই সমস্ত উৎকৃষ্ট চিন্তা ও ভাব দেখিয়া পুলকিত হইতেন এবং মনে মনে শরতের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন; বালিকা সুধা নিদ্রা ভুলিয়া যাইত, একাগ্রচিত্তে সেই যুবকের দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকিত ও তাহার অমৃত ভাষা শ্রবণ করিত। শরতের তেজঃপূর্ণ গল্পগুলি শুনিয়া বালিকার হৃদয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইত, শরতের দুঃখকাহিনী শুনিয়া বালিকার চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করিত।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন, সে কথা সর্ব্বদাই সন্ধ্যার সময় গল্প করিতেন। একদিন কলিকাতার “বড়বাজারের” মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “শরৎ! দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি মনুষ্য-হৃদয়ের প্রধান গুণ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সদ্‌গুণগুলির নামে তোমাদের কলিকাতায় যে রাশি রাশি প্রতারণাকার্য্য হয়, তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের পল্লীগ্রামে প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা বিরল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতার আড়ম্বরও বিরল!”

শরৎ। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, বড় বড় সহরেই বড় বড় প্রতারণা, কিন্তু আপনি কি প্রকৃত সদ্‌গুণ কলিকাতায় পান নাই; প্রকৃত দেশহিতৈষিতা, সত্যাচরণ, বিদ্যানুরাগ, যশোলিপ্সা প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্‌গুণ মনুষ্য-হৃদয়কে উন্নত করে, সেগুলি কি আপনি দেখেন নাই?

হেম। শরৎ, তাহা আমি বলি নাই, বরং কলিকাতায় সেরূপ অনেক সদ্‌গুণ দেখিয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছি। কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশানুরাগ দেখিয়াছি, স্বদেশীয়দিগের হিতসাধন জন্য যেরূপ অনন্ত চেষ্টা, উদ্যম, জীবনব্যাপী উৎসাহ দেখিলাম, এরূপ পল্লীগ্রামে কখনও দেখি

নাই; পুস্তকে ভিন্ন অন্য স্থানে লক্ষ্য করি নাই। বিদ্যানুরাগও সেইরূপ। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে আমি প্রকৃত বিদ্যানুরাগ কাহাকে বলে জানিতাম না, কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য, স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ জন্য, যৌবন হইতে মধ্য বয়স পর্য্যন্ত, মধ্য বয়স হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অনন্ত অবারিত পরিশ্রম, তাহা কলিকাতায় দেখিলাম। আর প্রকৃত যশে অভিরুচি, জীবন পণ করিয়া সৎকার্য্যের দ্বারা মহত্ত্বলাভ করিতে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায়, ইহা পল্লীগ্রামে কোথায় দেখিব? ইহাও কলিকাতায় দেখিলাম। শরৎ, আমি কলিকাতার শত শত সদ্‌গুণ দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে একটী সদ্‌গুণ আছে, সেইখানে তাহার দশ প্রকার মিথ্যা অনুকরণ আছে, যদি দশজন প্রকৃত দেশহিতৈষী থাকেন, একশতজন দেশহিতৈষীর নাম লইয়া চীৎকার ও ভণ্ডামি করিতেছেন, দশজন প্রকৃত সমাজ-সংরক্ষণে যত্নশীল, শতজন সেই সদ্‌গুণের নামে শত প্রকার প্রতারণার দ্বারা পয়সা রোজগার করিতেছে। এইটী প্রকৃত দোষের কথা।

শরৎ। সে দোষ তাহাদের, না আমাদের? বিন্দুদিদি, তোমার এ মাদুরে ছারপোকা আছে।

বিন্দু। সে কি শরৎবাবু, কামড়াচ্ছে নাকি?

শরৎ। না কামড়ায়নি, জিজ্ঞেসা করছি আছে কি না?

বিন্দু। না শরৎবাবু, আমার বাড়ীতে অমন জিনিসটী নেই। আমি নিজের হাতে প্রত্যহ বিছানা মাদুর রোদে দি, জিনিসপত্র ঝাড়ঝোড় করি। নোংরা আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না।

শরৎ। সে দিন হেমবাবু আর আমি দেবীপ্রসন্নবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, বাড়ীর ভিতর আমাদের খেতে নিয়ে গিয়েছিল; তা তাঁদের মাদুরে এমন ছারপোকা যে বসা যায় না। তার কারণ কি বিন্দুদিদি?

বিন্দু। কারণ আর কি, নোংরা, অপরিষ্কার। জিনিসপত্র নোংরা রাখলেই ঐগুলো জন্মায়।

শরৎ। বিন্দুদিদি, আমরাও সেইরূপ সমাজ অপরিষ্কার রাখ্‌লেই তাতে প্রতারণার কীট-গুলা জন্মায়। আমরা যদি পরনিন্দা ইচ্ছা করি, পরনিন্দা বাজারে বিক্রয় হইবে। আমরা যদি পাণ্ডিত্যাভিমানীর মূর্খতায় মুগ্ধ হইয়া হাঁ করিয়া থাকি, সেই মূর্খতাই বিদ্যারূপে বিক্রয় হইবে। ওষ্ঠে বিদ্যমান দেশহিতৈষিতায় যদি আমরা পুলকিত হই, সেইরূপ দেশহিতৈষিতার ছড়াছড়ি হইবে। চিনাবাজারে যখন যেরূপ কাপড় লোকের পছন্দ হয়, সেই সময়ে সেইরূপ কাপড়ের মূল্য অধিক হয়, আমদানি অধিক হয়। আমাদেরও যেরূপ সদ্‌গুণে পছন্দ ও রুচি, সেইরূপ ভূরি ভূরি উৎপন্ন হইতেছে। এটী তাহাদের দোষ, না আমাদের দোষ?

বিন্দু। আচ্ছা, সে কথা বুঝলেম। কিন্তু মাদুরে ছারপোকা হলে মাদুর রোদে দিতে পারি, মশারি বা বিছানায় কীট থাক্‌লে তা ধোপার বাড়ী দিতে পারি। সমাজে এরূপ কীট উৎপন্ন হলে তার কি উপায়? সমাজ কি ধোপার বাড়ী পাঠান যায়, না রোদে দেওয়া যায়?

শরৎ। বিন্দুদিদি, সমাজ পরিষ্কার করিবারও উপায় আছে। সূর্য্যের আলোকে যেরূপ মাদুরের ছারপোকাগুলি সুড় সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়, প্রকৃত শিক্ষার আলোকে সমাজের অনিষ্টকর সামগ্রীগুলিও একে একে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে বিলীন হয়। যদি শিক্ষায় সে ফল না ফলে, তাহা হইলে সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। ওষ্ঠস্থ দেশহিতৈষিতায় যদি আমরা মুগ্ধ না হই, তবে সেরূপ দ্রব্য কত দিন উৎপন্ন হয়? পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খতা দেখিলে যদি আমরা সহাস্যে তথা হইতে প্রস্থান করি, তবে সে সামগ্রী কত দিন বিরাজ করে? এ সমস্ত মেকি সামগ্রী যে এখন এত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে আমাদের শিক্ষার দোষে, তাহাদের দোষে নহে।

হেম। শরৎ, তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তথাপি শিক্ষাগুণে সমাজ হইতে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা একেবারে লোপ হইবে এরূপ আমার আশা নাই। শিক্ষিত দেশে যতদূর প্রতারণা আছে, আমাদের দেশে তত নাই, মনুষ্য-হৃদয়ে যতদিন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি উভয়ই থাকিবে, জগতে তত দিন ধর্ম্মাচরণ ও প্রতারণা উভয়ই থাকিবে, তথাপি প্রকৃত শিক্ষাগুণে সমাজে কর্ত্তব্য-সাধন-বাসনা ক্রমে বিস্তৃত হয়, তাহা আমাদেরও বোধ হয়।

বিন্দু। তা আজকাল তোমাদের কালেজে যে লেখাপড়া হয় তাতে কি এ শিক্ষা দেয় না?

শরৎ। বিন্দুদিদি, কালেজের শিক্ষাকে অনেকে অতিশয় নিন্দা করে, আমি তাহা করি না। যে শিক্ষায় আমরা মহৎ জাতিদিগের, মহৎ লোকদিগের জীবনচরিত ও কার্য্যকলাপ অবগত হইতেছি, ও প্রকৃতির বিস্ময়কর নিয়মাবলী শিখিতেছি, তাহা কি মন্দ শিক্ষা? যাঁহারা ইহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারেন না, সে তাঁহাদের হৃদয়ের দোষ, শিক্ষার দোষ নহে। হেমবাবু কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা, প্রকৃত উন্নতি-ইচ্ছার কথা বলিলেন, তাহা পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, অদ্য তাহা হইতে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা কেবল এই কালেজের শিক্ষাগুণে। আবার এই শিক্ষাগুণে এই সদ্‌গুণগুলি পঞ্চাশৎ বৎসর পর আরও অধিক লক্ষিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু শতাব্দীতেও আমরা ইউরোপীয় জাতিদিগের ঠিক সমকক্ষ হইতে পারিব কি না সন্দেহ; কিন্তু তথাপি আমার ভরসা যে জগদীশ্বরের কৃপায় দিন দিন আমরা অগ্রসর হইতেছি। আত্মবিসর্জ্জন ও কর্ত্তব্যসাধনে অনন্ত উৎসাহ ও অনন্ত চেষ্টা, এই উন্নতির একমাত্র পথ, সেই আত্মবিসর্জ্জন, সেই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন আমরা এখনও কতটুকু শিখিয়াছি, চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়!

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল, শরৎ যাইবার জন্য উঠিলেন। হেম তাঁহার সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাইলেন, দেখিলেন পথে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে এবং গ্রীষ্মকালের শীতল নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে। সুতরাং তিনি এক পা দুই পা করিয়া শরতের সঙ্গে অনেক দূর গেলেন। পথেও এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেবীপ্রসন্নবাবুও আজ সন্ধ্যার সময় হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন, তিনি শরৎ ও হেমকে দেখিয়া শরতের বাটী পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত গেলেন। হেমচন্দ্র দেবীবাবুর সহিত ফিরিয়া আসিবার সময় বলিলেন,—আমি কালেজের অনেক ছেলে দেখিয়াছি, অনেকের সহিত কথা কহিয়াছি, কিন্তু শরতের ন্যায় প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছে, শরতের ন্যায় উন্নত হৃদয়, উন্নত চিত্ত, অনিন্দনীয় উদ্যম ও উৎসাহ আছে, এরূপ অল্পই দেখিয়াছি।

দেবীবাবু বলিলেন,—হ্যাঁ, ছেলেটী ভাল, গুণবান বটে, বেঁচে থাকুক, বাপের নাম রাখ্‌বে। আর লেখাপড়াও শিখবে বটে, কিন্তু ছেলেমানুষ হয়ে বুড়োর মত কথা কয় কেন? ছোঁড়াটা শেষে ফাজিল না হয়ে যায়, তাই ভাবি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : দেবীপ্রসন্নবাবু

ভবানীপুরের কায়স্থদিগের মধ্যে দেবীপ্রসন্নবাবুর ভারি নাম। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, তাঁহার শরীরখানি এখনও বলিষ্ঠ, স্থূল ও গৌরবর্ণ। তাঁহার প্রসন্ন মুখে হাস্য সর্ব্বদাই বিরাজমান এবং তাঁহার মিষ্ট কথায় সকলেই আপ্যায়িত হইত। তাঁহাদের অবস্থা এককালে বড় মন্দ ছিল, দেবীপ্রসন্নবাবু বাল্যকালে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, এবং অল্প বয়সেই লেখাপড়া ছাড়িয়া সামান্য বেতনে একটী "হৌসে" কর্ম্ম লইয়াছিলেন। তথায় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই, অবশেষে হৌসের সাহেবকে অনেক ধরিয়া পড়ায় সাহেব বিলাত যাইবার সময় হৌসের পুরাতন ভৃত্যের পদ বৃদ্ধি করিয়া দেন। সৌভাগ্য যখন একবার উদয় হয়, তখন ক্রমেই তাহার জ্যোতি বিস্তার হয়। সেই সময় তিন চারি বৎসর হৌসের অনেক লাভ হওয়ায় সাহেবগণ বড় তুষ্ট হইয়া শেষে দেবীবাবুকে হৌসের বড়বাবু করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য তখন দেবীবাবুর বিলক্ষণ দু'পয়সা আয় হইল, এবং তিনি ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীর অনেক উন্নতি করিয়া সম্মুখে একটী সুন্দর বৈঠকখানা প্রস্তুত করাইলেন, এবং সুন্দররূপে সাজাইলেন। দেবীবাবু প্রত্যহ ৮টার সময় বৈঠকখানায় বসিতেন, প্রত্যহ অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

ক্রমেই দেবীবাবুর নাম বিস্তার হইতে লাগিল। দুর্গোৎসবের সময় তাঁহার বাটীতে বহু সমারোহে পূজা হইত, এবং যাত্রা ও নাচ দেখিতে ভবানীপুরের যাবতীয় লোক আসিত। তদ্ভিন্ন বাড়ীতে একটী বিগ্রহ ছিল; প্রত্যহ তাহার সেবা হইত, এবং বাড়ীর মেয়েরা নানারূপ ব্রত উপলক্ষে অনেক দানধর্ম্ম করিত। দুই একজন করিয়া দেবীবাবুর দরিদ্রা জ্ঞাতি-কুটুম্বিনীগণ সেই বিস্তীর্ণ বাটীতে আশ্রয় পাইল, পাড়ার মেয়েরাও সর্ব্বদা তথায় আসিত, সুতরাং বাহির বাটী ও ভিতর বাটী সমান লোকসমাকীর্ণ।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় আসিবার পর অল্প দিনের মধ্যেই দেবীপ্রসন্নবাবুর সহিত আলাপ করিলেন, এবং দেবীবাবুও সেই নবাগত ভদ্রলোককে যথোচিত সম্মান করিয়া আপন বৈঠকখানায় লইয়া যাইতেন। বৈঠকখানায় সুন্দর পরিষ্কার বিছানা পাতা আছে, দুই তিনটী মোটা মোটা গিন্দে এবং একটী কুলুঙ্গিতে দুইটী সামাদান। ঘরের দেওয়াল হইতে জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি বস্ত্রে ঢাকা রহিয়াছে এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ছবি ঝুলিতেছে। কোথাও হিন্দু দেবদেবীদিগের ছবি রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে আবার জর্ম্মানি দেশস্থ অতি অল্প মূল্যের অপকৃষ্ট ছবিগুলি বিরাজ করিতেছে। সে ছবিতে কোন রমণী চুল বাঁধিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ শুইয়া রহিয়াছে; কাহারও শরীর আবৃত, কাহারও অর্দ্ধাবৃত, কাহারও অনাবৃত। আবার তাহাদের মধ্যে করেজীওর একখানা "মেগ্‌ডেলীন", টিসীয়নের "ভিনস্‌", লেন্ডসিয়রের এক জোড়া হরিণও বিকাশ পাইতেছে, কিন্তু সে ছাপা এত নিকৃষ্ট যে ছবিগুলি চেনা ভার। বহুবাজারে বা নিলামে যাহা শস্তা পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহা দেবীবাবু বা দেবীবাবুর সরকারের রুচিসম্মত হইয়াছে, তাহাই ছাপা হউক, ওলিওগ্রাফ হউক, সংগ্রহ পূর্ব্বক বৈঠকখানার দেয়াল সাজান হইয়াছে।

হেমচন্দ্র সর্ব্বদাই দেবীবাবুর সহিত আলাপ করিতে যাইতেন এবং কখন কখন সময় পাইলে আপনার কলিকাতা আসার উদ্দেশ্যটীও প্রকাশ করিয়া বলিতেন। দেবীবাবু অনেক আশ্বাস দিতেন, বলিতেন, "হেমবাবুর মত লোকের অবশ্যই একটী চাকরী হইবে, তিনি স্বয়ং সাহেবদের নিকট হেমবাবুকে লইয়া যাইবেন. হেমবাবুর ন্যায় লোকের জন্য তিনি এইটুকু করিবেন না তবে কাহার জন্য করিবেন?" ইত্যাদি। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া হেমচন্দ্র একটুকু আশ্বস্ত হইতেন; দেবীপ্রসন্নবাবুর প্রধান গুণ এইটী যে তাঁহার নিকট শত শত প্রার্থী আসিত, তিনি কাহাকেও আশ্বাসবাক্য দিতে ত্রুটী করিতেন না।

কিন্তু কার্য্য সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, ভদ্রাচরণে দেবীবাবু ত্রুটি করিলেন না। তিনি দুই তিন দিন হেম ও শরৎকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন. এবং তাঁহার গৃহিণী হেমবাবুর স্ত্রীকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন বলিয়া পাঠাইলেন। বিন্দু কাজকর্ম্ম করিয়া প্রায় অবসর পাইতেন না, কিন্তু দেবীবাবুর স্ত্রীর আজ্ঞা ঠেলিতে পারিলেন না, সুতরাং একদিন সকাল সকাল ভাত খাইয়া সুধাকে ও দুইটী ছেলেকে লইয়া পাল্কী করিয়া দেবীবাবুর বাড়ী গেলেন। দেবীবাবু তখন আপিসে গিয়াছেন, সুতরাং বহির্বাটী নিস্তব্ধ; কিন্তু বিন্দু বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখিলেন যে অন্দর মহল লোকাকীর্ণ। উঠানে দাসীরা কেহ ঝাঁট দিতেছে, কেহ ঘর নিকাইতেছে, কেহ কাপড় শুখাইতে দিতেছে, কেহ এখন মাছ কুটিতেছে, কেহ সকল কার্য্যের বড় কার্য্য—কলহ করিতেছে। কলিকাতার দাসীগণের বড় পায়া, মাঠাকুরুণের কথাই গায়ে সয় না,—কোন আশ্রিতা আত্মীয়া কিছু বলিয়াছে তাহা সহিবে কেন—দশগুণ শুনাইয়া দিতেছে, ভদ্র-রমণী সে বাক্যলহরী রোধ করার উপায়ান্তর না দেখিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া স্থানান্তর হইতেছেন! পাতকোতলায় ঝি বৌয়ের হাট, সকলে একেবারে নাইতে গিয়াছে, সুতরাং রূপের ছটা, হাস্যের ছটার শেষ নাই। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দরীগণ তথায় অবর্ত্তমানা প্রিয়বন্ধুদিগের চরিত্রের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। কেহ গুল দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিলেন, "হ্যাঁলা, ও বাড়ীর ন বৌয়ের জাঁক দেখেছিস্‌? সে দিন যগ্‌গিতে এসেছিল, তা গয়নার জাঁকে আর ভূঁয়ে পা পড়ে না, হ্যাঁ গা, তা তার স্বামীর বড় চাকরী হয়েছে হই-ইচে, তা এত জাঁক কিসের লা?" কেহ চুল খুলিতে খুলিতে কহিলেন, "তা হোক বোন, তার জাঁক আছে জাঁকই আছে, তার শাশুড়ী কি হারামজাদী। মা গো মা, অমন বৌ কাঁট্‌কি শাশুড়ী ত দেখিনি, বৌকে স্বামী ভালবাসেন বলে সে বুড়ী যেন দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। ঢের ঢের দেখেছি, অমনটী আর দেখিনি।" অন্য সুন্দরী গায়ে জল ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "ও সব সোমান গো, সব সোমান—শাশুড়ী আবার কোন্‌ কালে মায়ের মত হয়, দুবেলা বকুনি খেতে খেতে আমাদের প্রাণ যায়।" "ওলো চুপ কর লো চুপ কর, এখনি নাইতে আস্‌বে, তোর কথা শুন্‌তে পেলে গায়ের চামড়া রাখ্‌বে না। তবু বোন আমাদের বাড়ী হাজার গুণে ভাল, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর শাশুড়ী-মাগীর কথা শুনেছিস্‌, সে দিন বউকে কাঠের চেলার বাড়ি ঠেঙ্গিয়েছিল!" "তা সে শাশুড়ীও যেমন, বৌও তেমন, সে নাকি শাশুড়ীর উপর রাগ করে হাতের নো খুলে ফেলেছিল, তাতেই ত শাশুড়ী মেরেছিল।" "তা রাগ করবে না, গায়ের জ্বালায় করে, স্বামীটাও

হয়েছে লক্ষ্মীছাড়া, মদ খায়, ঘরে থাকে না, আর তার মাও তেমনি, তা বৌয়ের দোষ কি?" ইত্যাদি।

রান্নাঘরে কোন কোন বৃদ্ধা আত্মীয়াগণ বসিয়াছিলেন, কেহ বা গিন্নীর জন্য ভাত নামাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কেহ দুটো কথা কহিতে আসিয়াছিলেন, কেহ ছেলে কোলে করে কেবল একটু ঝিমাইতেছিলেন। বামীর মা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ লা, ও পাল্কী করে কারা আজ এলো? ঐ যে হন্ হন্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিন্নীর কাছে গেল!" শ্যামীর মা, "তা জানিস্‌নি, ওরা যে এক ঘর কায়েত কোন্ পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, এই ভবানীপুরে আছে, তা ঐ বড় যেটা দেখলি, তার স্বামী বুঝি বাবুর আপিসে চাকরী করবে, ওর ছোট বোনটা বিধবা হয়েছে। গিন্নী ওদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন।" "না জানি কেমনতর কায়েত, গায়ে দুখানা গয়না নেই, লোকের বাড়ী আসবে তা পায়ে মল নেই; খালি পায়ে ভদ্রলোকের বাড়ী আস্‌তে লজ্জা করে না?" "তা বোন, ওরা পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, আমাদের কল্‌কেতার চালচোল এখনও শেখেনি?" "তা শিখবে কবে? দু ছেলের মা হয়েও শিখ্‌লে না ত শিখ্‌বে কবে?" "তা গরিবের ঘরে সকলেরই কি গয়না থাকে?" "তবে এমন গরিবকে ডাকা কেন? আমাদের গিন্নীরও যেমন আক্কেল, তিনি যদি ভদ্র ইতর চিন্‌বেন, তবে আমাদেরই এমন কষ্ট কেন বল? এই ছিলেম আমার মাস্‌তুত বোনের বাড়ী, তা সে আমায় কত যত্ন কর্‌ত, দুবেলা দুধ বরাদ্দ ছিল। তারা লোক চিন্‌ত। গিন্নী যদি লোক চিন্‌বে, তবে আমার এমন দুর্দ্দশা? গিন্নীরই দোষ কি বল? যেমন বাপমায়ের মেয়ে, তেমনি স্বভাবচরিত্র, টাকা হলে জাত ত আর ঘোচে না।" এইরূপে বৃদ্ধা আপন গৌরব-নাশের আক্ষেপ ও আশ্রয়দাত্রী ও তাঁহার পিতামাতার সুখ্যাতি প্রকটিত করিতে লাগিলেন।

বিন্দু ও সুধা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া রেল দেওয়া বারাণ্ডা দিয়া গিন্নীর শোবার ঘরে গেলেন। গিন্নী তেল মাখিতেছিলেন; একজন আশ্রিতা আত্মীয়া তাঁহার চুল খুলিয়া দিতেছিলেন, আর একজন বুকে বেশ করিয়া তেল মালিস্ করিয়া দিতেছিলেন। তাঁহার বুকে কেমন এক রকম ব্যথা আছে (বড় মানুষ গিন্নীদের একটা কিছু থাকেই), তা কবিরাজ বলিয়াছে রোজ স্নানের আগে এক ঘণ্টা করিয়া বেশ করে তেল মালিস্ করিতে। গিন্নী দেবীবাবুর ন্যায় বলিষ্ঠ নহেন, তাঁহার শরীর শীর্ণ. চেহারাখানা একটু রুক্ষ, মেজাজটা একটু খিট্‌খিটে; সেই বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়া, দাসী, বৌ, ঝি, সকলেই সে মেজাজের গুণ প্রত্যহই সকালসন্ধ্যা অনুভব করিত। শুনিয়াছি দেবীবাবু স্বয়ং রজনীকালে তাহার কিছু কিছু আস্বাদন পাইতেন। দেবীবাবু স্বয়ং বিষয় করিয়াছেন, তাঁহার আচরণটী পূর্ব্ববৎ নম্র ছিল, কিন্তু নূতন বড় মানুষের মহিষীর ততটা নম্রতা অসম্ভব, নবাগত ধনদর্প দেবীবাবুর গৃহিণীতেই একমাত্র আধার পাইয়া দ্বিগুণ ভাবে উথলিয়া উঠিয়াছিল।

গিন্নী। কে গা তোমরা?

বিন্দু। আমরা তালপুকুরের বোসেদের বাড়ীর গো, এই কল্‌কেতায় এসেছি। আপনি আস্‌তে বলেছিলেন, কাজের গতিকে এতদিন আস্‌তে পারিনি, তা আজ মনে কর্‌লেম একবার দেখা করে আসি।

গিন্নী। হাঁ হাঁ বুঝেছি, তা বসো বসো। তখনকার কালে নূতন লোক এলেই পাড়ার লোকদের সঙ্গে দেখা করার রীতি ছিল, তা এখন সে রীতি উঠে গেছে, এখন লোকের কোথাও যাবার বার হয় না। তা তবু ভাল, তোমরা এসেছ। তালপুকুর কোথায় গা? সেখানে ভদ্রলোকের বাস আছে?

বিন্দু। আছে বৈ কি, সেখানে তিরিশ চল্লিশ ঘর ভদ্রলোক আছে, আর অনেক ইতর লোকের ঘর আছে। ঐ বর্দ্ধমান জেলার নাম শুনেছেন, সেই জেলায় কাটোয়া থেকে ৮।১০ ক্রোশ পশ্চিমে তালপুকুর গ্রাম।

গিন্নী। হাঁ হাঁ, কাটোয়া শুনেছি বৈ কি—ঐ আমাদের ঝিয়েরা সব সেইখান থেকে আসে। অল্প হাস্য সেই ধনাঢ্যের গৃহিণীর ওষ্ঠে দেখা দিল। বিন্দু চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে গৃহিণী বলিলেন,—ঐটী বুঝি তোমার বোন? আহা এই কাঁচ বয়সে বিধবা হয়েছে! তা ভগবানের ইচ্ছে, সকলের কপালে কি সুখ থাকে, তা নয়, সকলের টাকা হয়, তা নয়, বিধাতা কাউকে বড় করেন, কাউকে ছোট করেন।

প্রথম সংখ্যক আশ্রিতা, যিনি চুল খুলিয়া দিতেছিলেন, তিনি সময় বুঝিয়া বলিলেন,—তা নয় ত কি, এই ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের বাবুর যেমন টাকাকড়ি, ঘরসংসার, তেমন কি সকলের কপালে ঘটে? তা নয়, ও যার যেমন কপালের লেখন।

দ্বিতীয় সংখ্যক আশ্রিতা অনেকক্ষণ ক্রমাগত তেল মালিস্ করিতে করিতে হাঁপাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহারও একটী কথা এই সময়ে বলিলে আশু মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। বলিলেন,—কেবল টাকাকড়ি কেন বল বোন, যেমন মান, তেমনি যশ, তেমনি লেখাপড়া, সাহেব মহলে কত সম্মান। লক্ষ্মী যেন ঐ খাটের খুরায় বাঁধা আছে।

ঈষৎ হাস্যের আলোক গিন্নীর রুক্ষ বদনে লক্ষিত হইল, কথাটী তাঁহার মনের মত হইয়াছিল। একটু সদয় হইয়া সেই আশ্রিতাকে বলিলেন,—আহা! তুমি কতক্ষণ মালিস্ করবে গা? তুমি হাঁপাচ্ছ যে। আর সব গেল কোথা, কাজের সময় যদি একজন লোক দেখতে পাওয়া যায়, সব রান্নাঘরের দিকে মন পড়ে আছে, তা কাজ কর্‌বে কেমন করে?

তীব্রস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল, দাসীতে দাসীতে এই কথা কাণাকাণি হইতে হইতে তারের খবরের ন্যায় সেই খবর রান্নাঘরে গিয়া পঁহুছিল। সহসা তথায় যুবতীদিগের হাস্যধ্বনি থামিয়া গেল, বৌয়ে বৌয়ে ঝিয়ে ঝিয়ে কাণাকাণি হইতে হইতে সেই খবর রান্নাঘরে গিয়া পঁহুছিল। তথায় যে উনানে কাটি দিতেছিল, সে স্তম্ভিত হইল, যে ঝিমাইতেছিল, সে সহসা জাগরিত হইল, ও শ্যামীর মা ও বামীর মা গিন্নীর সুখ্যাতি প্রকটিত করিতে করিতে সহসা হৃদ্‌কম্প বোধ করিল। তাহারা ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে রান্নাঘর হইতে উপরে আসিয়া সভয়ে গৃহিণীর ঘরে প্রবেশ করিল।

বামীর মা। হ্যাঁ গা, আজ বুকটা কেমন আছে গা? আমি এই রান্নাঘরে উনুনে কাট দিচ্ছিলেম, তাই আস্‌তে পারিনি, তা একবার দি না বুকটা মালিস্ করে?

গৃহিণী। এই যে এসেছ, তবু ভাল। তোমাদের আর বার হয় না, লোকটা মরে গেল কি বেঁচে আছে একবার খোঁজখবরও নিতে নেই? উঃ, যে ব্যথা, এ কি আর কমে, পোড়ারমুখো কব্‌রেজ এই একমাস ধরে দেখ্‌ছে, তা ও ত কিছু কর্‌তে পারলে না। তা কব্‌রেজেরই বা দোষ কি, বাড়ীর লোক একটু সেবাটেবা করে, একটু দেখে শুনে, তবে ত ভাল হয়। তা কি কেউ করবে? বলে কার দায়ে কে ঠেকে।

বামীর মা ও শ্যামীর মা আর প্রত্যুত্তর না করিয়া দুই জনে দুই পাশে বসিয়া মালিস আরম্ভ করিল, গৃহিণী পা দুটী ছড়াইয়া মুখে তেল মাখিতে মাখিতে আবার বিন্দুর সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

গৃহিণী। তোমার ছেলে দুটী ভাল আছে, অমন কাহিল কেন গা?

বিন্দু। ওরা হয়ে অবধি কাহিল, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, আর ছোটটীর আবার একটু পেটের অসুখ করেছিল, এখন সেরেছে।

গৃহিণী। তাই ত হাড়গুলো যেন জির্‌ জির্‌ কর্‌ছে! তা বাছা, একটু জেয়াদা করে দুধ খাওয়াতে পার না, তা হলে ছেলে দুটী একটু মোটা হয়। এই আমার ছেলেদের দিন একসের করে দুধ বরাদ্দ, সকালে আধ সের, বিকালে আধ সের। তা না হলে কি ছেলে মানুষ হয়?

বিন্দু। দুধ খায়, গয়লানীর যে দুধ, অর্দ্ধেক জল, তাতে আর কি হবে বল?

গৃহিণী। ও মা ছি! তোমরা গয়লানীর দুধ খাওয়াও, আমাদের বাড়ীতে গয়লানীর পা দেবার যো নেই। আমাদের বাড়ীতে গরু আছে, ঐ সে দিন ৮০ টাকা দিয়ে বাবু আপিসের কোন্ সাহেবের গরু কিনে এনেছেন, ৫ সের করে দুধ দেয়। তা ছাড়া দুটো দিশি গরু আছে, তারও ৩।৪ সের দুধ হয়। বাড়ীর গরুর দুধ না খেয়ে কি ছেলে মানুষ হয়, গয়লানীর আবার দুধ, সে পচা পুকুরের জল বৈ ত নয়।

বিন্দু একটু ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—তা সকলের ত সমান অবস্থা নয়, ভগবান আপনার মত ঐশ্বর্য্য কয় জনকে দিয়াছেন? আমরা গরু কোথা পাব বলুন? যা পাই তাইতে ছেলে মানুষ কর্‌তে হয়।

একটু হৃষ্ট হইয়া গৃহিণী বলিলেন,—তা ত বটেই। তা কি কর্‌বে বাছা, যেমন করে পার ছেলে দুটীকে মানুষ কর। তা যখন যা দরকার হবে, আমার কাছে এস, আমার বাড়ীতে দুধের অভাব নেই, যখন চাইবে, তখনই পাবে।

বামীর মা। তা বই কি, এ সংসারে কি কিছুর অভাব আছে? দুধ দৈয়ের ছড়াছড়ি, আমরা খেয়ে উঠতে পারিনি, দাসীচাকর খেয়ে উঠতে পারে না। তোমার যখন যা দরকার হবে বাছা, গিন্নীর কাছে এসে বলো, গিন্নীর দয়ার শরীর।

শ্যামীর মা। হ্যাঁ, তা ভগবানের ইচ্ছেয় যেমন ঐশ্বর্য্য, তেমনি দয়াধর্ম্ম। গিন্নীর হিল্লেতে পাড়ার পাঁচজন খেয়ে বর্ত্তাচ্ছে।

গৃহিণী। তোমার স্বামীর একটী চাকরীটাকরী হল? বাবুর কাছে এসেছিল না?

বিন্দু। হ্যাঁ, এসেছিলেন, তা এখনও কিছু হয়নি, বাবু বলেছেন একটা কিছু করে দেবেন। তা আপনারা মনোযোগ করলে চাকরী পেতে কতক্ষণ?

গৃহিণী। হ্যাঁ, তা সাহেব মহলে বাবুর ভারি মান, তাঁর কথা কি সাহেবেরা কাট্‌তে পারে? ঐ সে দিন বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ীর ছোঁড়াটাকে একটা সরকারী করে দিয়েছেন, বামুনের ছেলেটা হেঁটে হেঁটে মর্‌ত, খেতে পেত না, তাই বল্লেম, ছেলেটার কিছু একটা করে দাও। বাবু তখনই সাহেবদের বলে একটা চাকরী করে দিলেন। আর ঐ মিত্তিরদের বাড়ীর ছোকরাটা সেইখানে থাকে, বাজারটাজার করে; তার মা তিন মাস ধরে আমার দোরে হাঁটাহাঁটি কর্‌লে; তার বৌ একদিন আমার কাছে কেঁদে পড়ল যে সংসারে চালডাল নেই, খেতে পায় না। তা কি করি, তারও একটা চাকরী করে দিলেম। তবে কি জান বাছা, এখন সব ঐ রকম হয়েছে, পয়সা ত কারও নেই, সবাই কাঙ্গাল, সবাই খাবার জন্যে লালায়িত, সবাই আমাকে এসে ধরে, আমি ব্যারাম শরীর নিয়ে আর পেরে উঠিনি। যেন সব কালীঘাটের কাঙ্গাল, হাড় জ্বালিয়ে তুলেছে। তা বলো তোমার স্বামীকে বাবুর কাছে আস্‌তে, দেখা যাবে কি হয়।

দেড় ঘণ্টার পর গৃহিণীর তৈলমার্জ্জন কার্য্য সমাপ্ত হইল, তিনি স্নানের জন্য উঠিলেন।

বিন্দু সর্ব্বদাই ধীরস্বভাব; সংসারের অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বড় মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে এখনও শিখেন নাই, এই প্রথম শিক্ষাটা তাঁহার একটু তিক্ত বোধ হইল। ধীরে ধীরে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া ভগিনী ও সন্তান দুটীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : নবীনবাবু

কলিকাতায় আসিবার পর কয়েক সপ্তাহ সুধা বড় আহ্লাদে ছিল। যাহা দেখিত সমস্তই নূতন, যেখানে যাইত নূতন নূতন দৃশ্য দেখিত, বাড়ীতে যে কাজ করিতে হইত তাহাও অনেকটা নূতন প্রণালীতে, সুতরাং সুধার সকলই বড় ভাল লাগিত। কলিকাতার প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল পল্লীগ্রামের গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক, বিন্দুদের ক্ষুদ্র বাটীতে বড় বাতাস আসিত না, কোঠা ঘরগুলি অতিশয় উত্তপ্ত হইত। সে কষ্টেও সুধা কষ্ট বোধ করিত না, কিন্তু তাহার শরীর একটু অবসন্ন ও ক্ষীণ হইল, প্রফুল্ল চক্ষু দুটী একটু ম্লান হইল, বালিকার সুগোল বাহু দুটী একটু দুর্ব্বল হইল। তথাপি বালিকা সমস্ত দিন গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত অথবা বাল্যোচিত চাপল্যের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত, সুতরাং হেম ও বিন্দু সুধার শরীরের পরিবর্ত্তন বড় লক্ষ্য করিলেন না।

বর্ষার প্রারম্ভে, কলিকাতার বর্ষার বায়ুতে সুধার জ্বর হইল। একদিন শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হইল, বৈকালে বালিকা কোন কাজকর্ম্ম করিতে পারিল না, শয়নঘরে একটী মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সময় বিন্দু সে ঘরে আসিয়া দেখিলেন, বালিকা তখনও শুইয়া রহিয়াছে। বলিলেন,—

এ কি সুধা, এ অবেলায় শুয়ে কেন? অবেলায় ঘুমুলে অসুখ কর্‌বে, এস ছাতে যাই।

সুধা। না দিদি, আমি আজ ছাতে যাব না।

বিন্দু। কেন, আজ অসুখ কর্‌ছে না কি? তোমার মুখখানি একেবারে শুখিয়ে গেছে যে।

সুধা। দিদি, আমার গা কেমন কর্‌ছে, আর একটু মাথা ধরেছে।

বিন্দু সুধার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, গা অতিশয় উত্তপ্ত, কপাল গরম হইয়াছে। বলিলেন,—সুধা তোমার জ্বরের মত হয়েছে যে। তা মেজেয় শুয়ে কেন, উঠে বিছানায় শোও, আমি বিছানা করে দিচ্ছি।

সুধা। না দিদি, এ অসুখ কিছু নয়, এখনই ভাল হয়ে যাবে, আমি এখানে বেশ আছি, আর উঠতে ইচ্ছে কর্‌ছে না।

বিন্দু। না বোন্‌, উঠে শোও, তোমার জ্বরের মতন করেছে, মাথা ধরেছে, মাটীতে কি শোয়?

বিন্দু বিছানা করিয়া দিলেন, ভগিনীকে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইলেন, এবং আপনি পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

রাত্রিতে হেম ও শরৎ আসিলেন, অনেকক্ষণ উভয়ে বিছানার কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা হইয়া গেল, তখন বিন্দু হেমের জন্য ভাত বাড়িতে গেলেন। শরৎকেও ভাত খাইতে বলিলেন, শরৎ বলিলেন, তিনি বাড়ীতে গিয়া খাইবেন।

ভাত বাড়া হইল, হেম ভাত খাইতে গেলেন, শরৎ একাকী সেই ক্লান্ত বালিকার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বালিকার শরীর তখন অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ হইয়াছে, বালিকা যাতনায় এপাশ ওপাশ করিতেছে, কেবল জল চাহিতেছে, আর অতিশয় শিরোবেদনার জন্য এক একবার কাঁদিতেছে। শরৎ সযত্নে চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন, মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে এক এক বিন্দু জল দিয়া আপন বস্ত্র দিয়া ওষ্ঠ দুটী মুছাইয়া দিলেন।

হেম শীঘ্র খাইয়া আসিলেন, অনেক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া শরৎকে বাটী যাইতে বলিলেন। শরৎ দেখিলেন, সুধার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি সে দিন রাত্রি তথায় থাকিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিলেন।

বিন্দু খাইয়া আসিলে, শরৎ বলিলেন,—বিন্দুদিদি, আজ আমি এখানে থাক্‌ব, তোমাদের হাঁড়িতে যদি চারটী ভাত থাকে, আমার জন্যে রেখে দাও।

বিন্দু। ভাত আছে, আজ সুধার জন্যে চাল দিলেম, তা সুধা ত খেলে না, ভাত আছে। কিন্তু তুমি কেন রাত জাগবে, আমরা দুজনে আছি, সুধাকে দেখব এখন, তুমি বাড়ী যাও, রাত দুপুর হয়েছে।

শরৎ। না বিন্দুদিদি, তোমার ছোট ছেলেটীর অসুখ করেছে, তাকেও তোমাকে দেখ্‌তে হবে, আর হেমবাবু আজ অনেক হেঁটেছেন, রাত্রে একটু না ঘুমুলে অসুখ কর্‌বে। আমরা দুজনে থাক্‌লে পালা করে জাগতে পার্‌ব।

বিন্দু। তবে তুমি ভাত খাবে এস, তোমার জন্যে ভাত বেড়ে দি।

শরৎ। ভাত বেড়ে এই ঘরের কোণে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও, আমি একটু পরে খাব।

বিন্দু। সে কি? ভাত কড়কড়ে হয়ে যাবে যে। অনেক রাত হয়েছে, কখন খাবে?

শরৎ। খাব এখন বিন্দুদিদি, আমি ঠাণ্ডা ভাতই ভালবাসি, তুমি ভাত রেখে দাও।

বিন্দু রান্নাঘরে গেলেন, ভাত ব্যঞ্জনাদি থালা করিয়া সাজাইয়া আনিয়া সেই ঘরের কোণে রাখিয়া ঢাকা দিলেন। তাঁহার ছেলে দুইটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের শোয়াইলেন। অন্যদিন সুধা বিন্দুর সঙ্গে ও শিশু দুটীর সঙ্গে এক খাটে শুইতেন, আজ তাহা হইল না, আজ হেমবাবুর নিকট শিশু দুটীকে শোয়াইয়া বিন্দু ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন, সুধার মাথার কাছে তখনও শরৎ বসিয়া নিঃশব্দে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

শরৎ। হেমবাবু, আপনি এখন একটু ঘুমান, আবার ও রাত্রিতে আপনাকে উঠাইয়া দিয়া আমি একটু শুইব। সুধার গা অতিশয় তপ্ত হইয়াছে, সে বড় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে, আমাদের একজনের বসিয়া থাকা ভাল। বিন্দুদিদি একা পারিবেন না।

হেমচন্দ্র শয়ন করিলেন। বিন্দু ও শরৎ রোগীর শয্যায় একবার বসিয়া, একবার বালিসে একটু ঠেসান দিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। রোগীর আজ নিদ্রা নাই, অতিশয় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে, শিরোবেদনায় অধীর হইয়া দিদির গলায় হাত জড়াইয়া এক একবার কাঁদিতেছে, তৃষ্ণায় অধীর হইয়া বারবার জল চাহিতেছে। শরৎ অনিদ্র হইয়া সেই শুষ্ক ওষ্ঠে জল দিতে লাগিলেন।

রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় বিন্দু অতিশয় জেদ করাতে শরৎ উঠিয়া গিয়া ভাত খাইলেন তখন সুধার রোগের একটু উপশম হইয়াছে, শরীরের উত্তাপ ঈষৎ কমিয়াছে, যাতনার একটু লাঘব হওয়ায় বালিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

*

বিন্দু বলিলেন,—শরৎবাবু, তুমি এখন বাড়ী যাও, সুধা একটু ঘুমিয়েছে, তুমি শোও গে, সমস্ত রাত্রি জেগো না, অসুখ করবে।

শরৎ। বিন্দুদিদি, তোমার কি সমস্ত রাত্রি জাগা ভাল, তুমি সমস্ত দিন সংসারের কাজ করেছ, আবার কাল সমস্ত দিন কাজ করতে হবে। আমার কি, আমি না হয় কাল কালেজে নাই গেলাম।

বিন্দু। না শরৎবাবু, আমাদের রাত্রি জাগা অভ্যাস আছে, ছেলের ব্যারাম হয়, কিছু হয়, সর্ব্বদাই আমরা রাত্রি জাগতে পারি, আমাদের কিছু হয় না। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সমস্ত রাত্রি জাগা সয় না, আমার কথা রাখ, বাড়ী যাও। আবার কাল সকালে না হয় এসে দেখে যেও।

সুধা তখন নিদ্রা যাইতেছে, নিদ্রার নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসে বালিকার হৃদয় স্ফীত হইতেছে। শরৎ একটু নিরুদ্বেগ হইলেন; বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন, নিঃশব্দ নৈশ পথ দিয়া আপন বাটীতে যাইয়া প্রাতে ৪ ঘটিকার সময় শয্যায় শয়ন করিলেন।

ছয়টার সময় উঠিয়া শরচ্চন্দ্র তাঁহার পরিচিত নবীনচন্দ্র নামক একজন ডাক্তারের নিকট গেলেন। তিনি মেডিকেল কলেজ হইতে সম্প্রতি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভবানীপুরেই তাঁহার বাটী, তিনি ভবানীপুর অঞ্চলে একটু পসার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রমী, মনোযোগী, বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য; কিন্তু ডাক্তারির পসার এক দিনে হয় না, কেবল গুণেও হয় না, সুতরাং নবীনবাবুর এখনও কিছু পসার হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রনাথবাবু ভবানীপুরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ উকিল, এবং চন্দ্রবাবুর সহায়তায় নবীন একটী ঔষধালয় খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও লাভ অল্প, লোকসানের সম্ভাবনাই অধিক। এ জগতে সকলেই আপন আপন চেষ্টা করিতেছে, তাহার মধ্যে একজন যুবকের অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য, চারি দিকেই পথ অবরুদ্ধ, সকল পথই জনাকীর্ণ। নবীনবাবু পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন, পরিশ্রম, যত্ন ও গুণ দ্বারা ক্রমে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবেন স্থির সংকল্প করিয়া তিনি ধীরচিত্তে কার্য্য করিতেছিলেন। দুই একটী বাড়ীতে তাঁহার বড় যশ হইয়াছিল, যাহাদিগের বাড়ীতে তাঁহাকে দুই চারিবার ডাকা হইয়াছিল, তাহারা অন্য চিকিৎসক আনাইত না।

সাতটার সময় শরৎ নবীনবাবুকে লইয়া হেমবাবুর বাড়ী পঁহুছিলেন। নবীনবাবু অনেকক্ষণ যত্ন করিয়া সুধাকে দেখিলেন। জ্বর তখন কমিয়াছে, কিন্তু তাপযন্ত্রে তখনও ১০১ দাগ দেখা গেল; নাড়ী তখন ১২০। অনেকক্ষণ দেখিয়া বাহিরে আসিলেন, তাহার মুখ গম্ভীর।

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিলেন? রাত্রি অপেক্ষা অনেক জ্বর কমিয়াছে, আজ উপবাস করিলে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে বোধ হয়?

নবীন। বোধ হয় না। আমি রিমিটাণ্ট জ্বরের সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি। এখন একটু কমিয়াছে, কিন্তু এখনও বেশ জ্বর আছে, দিনের বেলা আবার বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব।

হেম একটু ভীত হইলেন। সেই সময়ে ভবানীপুরে অনেক রিমিটাণ্ট জ্বর হইতেছিল, সেই জ্বরে অনেকের মৃত্যু হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "তবে কি কয়েক দিন ভুগিবে?"

নবীন। এখনও ঠিক বলিতে পারি না, আর একবার আসিয়া দেখিলে বলিব। বোধ হইতেছে, রিমিটাণ্ট জ্বর, তাহা হইলে ভুগিতে হইবে বৈ কি। কিন্তু আপনারা কোন আশংকা করিবেন না, আশংকার কোনও কারণ নাই। এই বলিয়া তিনি একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং বলিলেন, "এই ঔষধটী দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন, বৈকাল পর্য্যন্ত খাওয়াইবেন, বৈকালে আমি আবার আসিব। রোগীর মাথা গরম হইয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, সমস্ত দিন মাথায় বরফ দিবেন, তৃষ্ণা পাইলে বরফ খাইতে দিবেন, কিংবা দুই একখানি আকের কুচি দিবেন। আর এরারুট কিংবা নেস্‌লের দুগ্ধ খুব খাওয়াইবেন, দিনে তিন চারি বার খাওয়াইবেন। এ পীড়ায় খাদ্যই ঔষধ।"

শরতের সহিত বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া নবীন বলিলেন,—শরৎ তোমাকে একটী কাজ করিতে হইবে।

শরৎ। বলুন।

নবীন। হেমবাবুকে অবকাশ অনুসারে জানাইবে, চিকিৎসার জন্য আমি অর্থ গ্রহণ করিব না।

শরৎ। কেন?

নবীন। তোমার সহিত আমার অনেক দিন হইতে বন্ধুত্ব, তোমাদের গ্রামের লোকের নিকট আমি অর্থ গ্রহণ করিব না। হেমবাবুর অধিক টাকাকড়ি নাই, তাঁহার নিকট আমি অর্থ লইব না।

শরৎ। হেমবাবু দরিদ্র বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানি, বিনা বেতনে চিকিৎসা করা অপেক্ষা আপনি অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি সত্য সত্যই তুষ্ট হইবেন।

নবীন। না শরৎ, আমার কথাটী রাখ, আমি যাহা বলিলাম তাহা করিও। এ ব্যারাম সহসা ভাল হইবে আমি প্রত্যাশা করি না, আমাকে অনেক দিন আসিতে হইবে, সর্ব্বদা আসিতে হইবে। আমি যদি বিনা অর্থে আসিতে পারি, তবে যখন আবশ্যক বোধ হইবে, তখনই নিঃসংকোচে আসিতে পারিব।

শরৎ। নবীন বাবু, আপনি যাহা বলিলেন তাহা করিব। কিন্তু আপনার সময়ের মূল্য আছে, অর্থেরও আবশ্যক আছে, বিনা পারিতোষিকে সকল রোগীকে দেখিলে আপনার ব্যবসা চলিবে কিরূপে?

নবীন। না শরৎ, আমার সময়ের বড় মূল্য নাই, তুমি জান, আমার এখনও অধিক পসার হয় নাই, আমি বাড়ীতে বসিয়া থাকি। আর আমার পসার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কি হয় তাহা আমি জানি না, এই একটী রোগের অর্থ গ্রহণ না করিলে তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। বন্ধুর জন্য একটী বন্ধুর কাজ কর, আমার এই কথাটী রাখিও।

শরৎ সম্মত হইলেন, নবীন চলিয়া গেলেন। শরৎ তখন ঔষধ, পথ্য, বরফ, আক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া আনিলেন। সে দিন রোগীর শয্যার নিকট থাকিবার জন্য অনেক জেদ করিলেন, কিন্তু হেম সে কথা শুনিলেন না, শরৎকে জোর করিয়া কালেজে পাঠাইলেন।

অপরাহ্নে শরৎ নবীনবাবুর সহিত আবার আসিলেন। নবীনবাবু রোগীকে দেখিয়াই বুঝিলেন, তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে, এ স্পষ্ট রিমিটাণ্ট জ্বর। রোগীর চক্ষু দুটী আরও রক্তবর্ণ হইয়াছে, রোগীর মাথায় সমস্ত দিন বরফ দেওয়াতেও উত্তাপ কমে নাই, সুধার স্বাভাবিক গৌরবর্ণ মুখখানি জ্বরের আভায় রঞ্জিত, এবং সুধা সমস্ত দিন ছট্ ফট্ করিয়াছে, এপাশ ওপাশ করিয়াছে, কখনও শুইয়াছে, কখনও বায়না করিয়া দিদির গলা ধরিয়া বসিয়াছে, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আবার শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। নবীনবাবু সভয়ে দেখিলেন, নাড়ী প্রায় ১৫০, তাপযন্ত্র দেখিলেন, তাপ ১০৫ ডিগ্রি!

ঔষধ ঘন ঘন খাওয়াইতে বারণ করিলেন, আর একটী ঔষধ লিখিয়া দিয়া বলিলেন যে সেটী দিনের মধ্যে তিন বার এবং রাত্রিতে যখন আপনা-আপনি ঘুম ভাঙ্গিবে তখন একবার খাওয়াইলেই হইবে। খাদ্যের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, শরৎকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "এ রোগে খাদ্যই ঔষধ, সর্ব্বদা খাদ্য দিবে, যথেষ্ট খাওয়াইতে ত্রুটী হইলে রোগী বাঁচিবে না।"

কয়েক দিন পর্য্যন্ত সুধা সেই ভয়ঙ্কর জ্বরে যাতনা পাইতে লাগিল। শরৎ তখন হেমের কথা আর মানিলেন না, পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিবারাত্রি হেমের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন, ঔষধ আনিয়া দিতেন, নিজ হস্তে সাবু বা দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। বিন্দু সংসারের কার্য্যবশতঃ কখন কখন রোগীর শয্যা পরিত্যাগ করিলে শরৎ তথায় নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতেন, হেমচন্দ্র শ্রান্তি ও চিন্তাবশতঃ নিদ্রিত হইলে শরৎ অনিদ্র হইয়া সেই রোগীর সেবা করিতেন। জ্বরের প্রচণ্ড উত্তাপে বালিকা ছট্ ফট্ করিলে শরৎ আপনার শ্রান্তি, নিদ্রা ও আহার ভুলিয়া গিয়া নানারূপ কথা কহিয়া, নানারূপ গল্প করিয়া, নানা প্রবোধবাক্য ও আশ্বাস দিয়া সুধাকে শান্ত করিতেন, জ্বরের অসহ্য যাতনাযুক্ত সুধা সেই কথা শুনিয়া একটু শান্তি লাভ করিত। কখনও বালিকার ললাটে হাত বুলাইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে নিদ্রিত করিতেন, কখন তাহার অতি ক্ষীণ দুর্ব্বল রক্তশূন্য গৌরবর্ণ বাহুলতা বা অঙ্গুলীগুলি হস্তে ধারণ করিয়া রোগীকে তুষ্ট করিতেন; মাথা উষ্ণ হইলে শরৎ সমস্ত দিন বরফ ধরিয়া থাকিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রোগীর অর্দ্ধস্ফুটিত শব্দগুলি শরতের কর্ণে অগ্রে প্রবেশ করিত, বালিকা শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয়ে সেই শরতের হস্ত হইতে

এক বিন্দু জল বা দুইখানি আকের কুচি পাইত, নিদ্রা না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সেই শরতের হস্ত হইতে পথ্য পাইত।

১০।১২ দিবসে সুধা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া গেল, আর উঠিয়া বসিতে পারিত না, চক্ষুতে ভাল দেখিতে পাইত না, মুখখানি অতিশয় শীর্ণ, কিন্তু তখনও জ্বরের হ্রাস নাই। প্রাতঃকালে ১০২ দাগের বড় কম হয় না, প্রত্যহ বৈকালে ১০৫ দাগ পর্য্যন্ত উঠে। নবীনবাবু একটু চিন্তিত হইলেন, বলিলেন, শরৎ, চতুর্দ্দশ দিবসে এ রোগের আরোগ্য হওয়া সম্ভব, যদি না হয়, তবে সুধার জীবনের একটু সংশয় আছে। সুধা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে, আর অধিক দিন এ পীড়া সহ্য করিতে পারিবে এরূপ হয় না।

ত্রয়োদশ দিবসে নবীনবাবু সমস্ত দিন সেই বাটীতে থাকিয়া রোগীর রোগ লক্ষ্য করিলেন। বৈকালে জ্বর একটু কম হইল, কিন্তু সে অতি সামান্য উন্নতি, তাহা হইতে কিছু ভরসা করা যায় না। শরৎকে বলিলেন, আজ রাত্রিতে তুমি রোগীকে ভাল করিয়া দেখিও, কল্য ভোরের সময় তাপমান যন্ত্রে শরীরের কত উত্তাপ লক্ষ্য করিও। যদি ৯৮ হয়, যদি ৯৯ হয়, যদি ১০০ দাগের কম হয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ গ্রেণ কুইনাইন দিও, ৮টার মধ্যেই আমি আসিব। যদি কাল বা পরশ্ব এ জ্বরের উপশম না হয়, সুধার জীবনের সংশয় আছে।

শরৎ এ কথা বিন্দুকে বলিলেন না, হেমকেও বলিলেন না। সন্ধ্যার সময় বাটী হইতে খাইয়া আসিলেন এবং সুধার শয্যার পার্শ্বে বসিলেন; সেদিন সমস্ত রাত্রি তিনি সেই স্থান হইতে উঠিলেন না; এক মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রায় চক্ষু মুদিত করিলেন না।

উষার প্রথম আলোকচ্ছটা জানালার ভিতর দিয়া অল্প অল্প দেখা গেল। তখন সে ঘর নিঃশব্দ। হেমচন্দ্র ঘুমাইয়াছেন, বিন্দু সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর ছেলে দুইটীর পাশে শুইয়া পড়িয়াছেন, ছেলে দুইটী নিদ্রিত। সুধা প্রথম রাত্রিতে ছট্ ফট্ করিয়া শেষ রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছে। ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, নির্ব্বাণপ্রায় প্রদীপের স্তিমিত আলোক রোগীর শীর্ণ শুষ্ক মুখের উপর পড়িয়াছে।

শরৎ ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে সেই অতি শীর্ণ বাহুটী আপন হস্তে ধারণ করিলেন, নাড়ী এত চঞ্চল, তিনি গণনা করিতে পারিলেন না। তখন তাপযন্ত্র লইলেন, ধীরে ধীরে তাপযন্ত্র বসাইলেন, নিঃশব্দে ঘড়ির দিকে চাহিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় জোরে আঘাত করিতেছিল।

টিক্ টিক্ টিক্ করিয়া ঘড়ির শব্দ হইতে লাগিল, এক মিনিট, দুই মিনিট, চারি মিনিট, পাঁচ মিনিট হইল; শরৎ তাপযন্ত্র তুলিয়া লইলেন। প্রদীপের নিকটে গেলেন, তাঁহার হৃদয় আরও বেগে আঘাত করিতেছে, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে।

প্রদীপের স্তিমিত আলোকে প্রথমে কিছু দেখিতে পাইলেন না। হস্ত দ্বারা ললাট হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ সরাইলেন; ললাটের স্বেদ অপনয়ন করিলেন; নিদ্রাশূন্য চক্ষুর্দ্বয় একবার, দুইবার মুছিলেন, পুনরায় তাপযন্ত্রের দিকে দেখিলেন।

দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রদীপের আলোকে ঠিক বিশ্বাস হয় না, বোধ হয় তাঁহার দেখিতে ভ্রম হইয়াছে। ভরসায় ভর করিয়া গবাক্ষের নিকটে যাইলেন, দিবালোকে তাপযন্ত্র আবার দেখিলেন। জ্বর কল্য প্রাতঃকাল অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, তাপযন্ত্র ১০৩ ডিগ্রী দেখাইতেছে! ললাটে করাঘাত করিয়া শরৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

শব্দে বিন্দু উঠিলেন। ভগিনীর নিকট গিয়া দেখিলেন, সুধা নিদ্রা যাইতেছে; গবাক্ষের কাছে আসিয়া দেখিলেন, শরৎবাবু ভূমিতে শুইয়া আছেন! ভাবিলেন, আহা শরৎবাবু রাত্রি জাগিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, মাটীতে শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; আহা আমাদের জন্য কত কষ্টই সহ্য করিতেছেন। শরৎ কথা কহিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে যে ভীষণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, কেন বিন্দুকে সে ব্যথা দিবেন?

আর এক সপ্তাহ জ্বর রহিল। তখন সুধা এত দুর্ব্বল হইয়া গেল যে এক পাশ হইতে অন্য পাশ ফিরিতে পারিত না, মাথা তুলিয়া জল খাইতে পারিত না, কষ্টে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কখন এক আধটী কথা কহিত, খেংরা কাঠির ন্যায় অঙ্গুলীগুলি একটু একটু নাড়িত। সুধার মুখের দিকে চাওয়া যাইত না, অথবা নৈরাশ্যে জ্ঞান হারাইয়া নিশ্চেষ্ট পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া শরৎ সেই মুখের দিকে সমস্ত রাত্রি চাইয়া থাকিত। গরিবের ঘরের মেয়েটী শৈশবে অন্নবস্ত্রের কষ্টেও

মাতৃস্নেহে জীবন ধারণ করিয়াছিল, অকালে বিধবা হইয়াও ভগিনীর স্নেহে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পটী কয়েক দিন পল্লীগ্রামে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, অদ্য সে পুষ্প বুঝি আবার মুদিত হইয়া নম্রশির নত করিল। দরিদ্রা বালিকার ক্ষুদ্র জীবন-ইতিহাস বুঝি সাঙ্গ হইল।

বিংশ দিবস হইতে নবীনও দিবারাত্রি হেমের বাটীতে রহিলেন। শরৎকে গোপনে বলিলেন, "শরৎ, তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না, আর দুই এক দিনের মধ্যে যদি এই জ্বর না ছাড়ে, তবে ঐ দুর্ব্বল মৃতপ্রায় শরীরকে জীবিত রাখা মনুষ্য-সাধ্য নহে। আর দুই তিন দিন আমি দেখিব, তাহার পর আমাকে বিদায় দিও। আমার যাহা সাধ্য করিলাম, জীবন দেওয়া না দেওয়া জগদীশ্বরের ইচ্ছা।"

দ্বাবিংশ দিবসের সন্ধ্যার সময় জ্বর একটু হ্রাস হইল, কিন্তু তাহাতেও কিছু ভরসা করা যায় না। রাত্রিতে দুই জনই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন, সে দিন সমস্ত রাত্রি সুধা নিদ্রিতা। এ কি আরোগ্যের লক্ষণ, না দুর্ব্বলতায় মৃত্যুর পূর্ব্ব চিহ্ন?

অতি প্রত্যূষে শরৎ আবার তাপযন্ত্র বসাইলেন। তাপযন্ত্র উঠাইয়া গবাক্ষের নিকট যাইলেন। কি দেখিলেন জানি না, ললাটে করাঘাত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া তিনি ভূমিতে পড়িয়া গেলেন!

নবীনচন্দ্র ধীরে ধীরে সেই যন্ত্র শরতের হস্ত হইতে লইলেন, বিপদকালে ধীরতাই চিকিৎসকের বীরত্ব। তাপযন্ত্র দেখিলেন, আস্তে আস্তে শরৎকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন।

শরৎ হতাশের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে বালিকার পরমায়ু শেষ হইয়াছে?

নবীন। পরমেশ্বর বালিকাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন, এ-যাত্রা সে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

তাপযন্ত্র দেখিতে শরৎ ভুল করিয়াছিলেন, নবীন দেখাইলেন, তাপযন্ত্রে ৯৮ ডিগ্রি লক্ষিত হইতেছে। সুধার শরীরে হাত দিয়া দেখাইলেন, জ্বর নাই, জ্বর উপশম হওয়ায় ক্ষীণ বালিকা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে।

ললাট হইতে কেশগুচ্ছ সরাইয়া প্রাতঃকালে শরৎ বাড়ী আসিলেন। তিনি প্রায় এক সপ্তাহ রাত্রিতে নিদ্রা যান নাই, তাঁহার মুখখানি শুষ্ক, নয়ন দুটী কালিমাবেষ্টিত, কিন্তু তাঁহার হৃদয় আজি নিরুদ্বেগ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ চন্দ্রনাথবাবু

পীড়া আরোগ্য হইলেও সুধা কয়েকদিন শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না। শয্যা হইতে উঠিয়া কয়েক দিন ঘর হইতে বাহির হইতে পারিল না। তাহার পর অল্প অল্প করিয়া ঘরে বারান্ডায় বেড়াইত, অথবা শরতের সাহায্যে ছাদে গিয়া একটু বসিত। পক্ষীর ন্যায় সেই লঘু ক্ষীণ শরীরটি শরৎ অনায়াসে আপনার দুই হস্তে উঠাইয়া ছাদে লইয়া যাইতেন, আবার ছাদ হইতে নামাইয়া আনিতেন।

এক্ষণে শরৎ পুনরায় কালেজে যাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রতিদিন বৈকালে হেমের বাড়ীতে আসিতেন, সুধাকে অনেক কথা, অনেক গল্প বলিয়া প্রফুল্ল রাখিতেন, রাত্রি নয়টার সময় সুধা শয়ন করিলে বাটী আসিতেন। সুধাও প্রতিদিন শরৎকে প্রতীক্ষা করিত, শরতের আগমনের পদধ্বনি প্রথমে সুধার কর্ণে উঠিত, শরৎ সিঁড়ি হইতে উঠিতে না উঠিতে প্রথমেই সেই ক্ষীণ শান্ত, কমনীয়, হাস্যরঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিতেন।

ছাদে গিয়া শরৎ অনেকক্ষণ অবধি সুধাকে অনেক গল্প শুনাইতেন। তালপুকুর গ্রামের গল্প, বাল্যকালের গল্প, সুধার দরিদ্রা মাতার গল্প, শরতের মাতার গল্প, শরতের ভগিনীর গল্প, অনেক বিষয়ের অনেক গল্প করিতেন। সুধাও একাগ্রচিত্তে সেই মধুর কথাগুলি শুনিত, শরতের প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত! রোগে বা শোকে যখন আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ ক্ষীণ হয়, তখনই আমরা প্রকৃত বন্ধুর দয়া ও স্নেহের সম্পূর্ণ মহিমা অনুভব করিতে পারি। অন্য সময়ে গর্ব্ব করিয়া যে পরামর্শ শুনি না, সে সময়ে সেই পরামর্শ হৃদয়ে স্থান পায়, অন্য সময়ে যে স্নেহ আমরা তুচ্ছ করি, সে সময়ে সেই স্নেহে আমাদিগের হৃদয় সিক্ত হয়, কেননা হৃদয় তখন দুর্ব্বল, স্নেহের বারি প্রত্যাশা করে। লতা যেরূপ সবল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে, সুধা শরতের অমৃত বচনে সেইরূপ শান্তিলাভ করিত। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুধা সেই অমৃতমাখা কথাগুলি শ্রবণ করিত, সেই স্নেহময় মধুর প্রসন্ন

মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, অথবা ক্লান্ত হইয়া সেই মধুর হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিত। যত্নের সহিত শরতেরও স্নেহ বাড়িতে লাগিল, তিনি বালিকার ক্ষীণ বাহুলতা স্বহস্তে ধারণ করিয়া বালিকার মস্তক আপন বক্ষে স্থাপন করিয়া শান্তিলাভ করিতেন।

একদিন উভয়ে এইরূপে ছাদে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হেমচন্দ্র ছাদে আসিলেন ও শরৎকে বলিলেন,—শরৎ, আজ চন্দ্রনাথবাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, যাবে না?

শরৎ। হাঁ, সে কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার কোথাও যাইতে রুচি নাই, না গেলে হয় না?

হেম। না, সুধার পীড়ার সময় চন্দ্রবাবু ও নবীনবাবু আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন, তাঁহাদের বাড়ী না গেলেই নয়। আইস, এইক্ষণই যাইতে হইবে।

শরৎ ও সুধা উঠিলেন। হেম সুধাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি নামাইলেন, তাহাকে ঘরে শয়ন করাইয়া উভয়ে বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে হেম বলিলেন,—শরৎ, এই পীড়ায় তুমি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছ, সে ঋণ জীবনে আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। কিন্তু এই কারণে তোমার পড়াশুনার অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় মাসাবধি কালেজে যাও নাই, এক্ষণও তোমার ভাল পড়া হইতেছে না। একটু মন দিয়া পড়, তোমার পরীক্ষার বড় বিলম্ব নাই।

শরৎ ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—হাঁ, আর অল্পই সময় আছে, এখন একটু মন দিয়া লেখাপড়া আবশ্যক। সুধা এখন ভাল হইয়াছে, কিন্তু বিন্দুদিদিকে বলিবেন, যখন অবকাশ হইবে, ছাদে লইয়া গিয়া প্রত্যহ গল্প করিয়া যেন তিনি সুধার মনটী প্রফুল্ল রাখেন। নবীনবাবু বলিয়াছেন, সুধার মন প্রফুল্ল থাকিলে শীঘ্র শরীরও পুষ্ট হইবে। এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে চন্দ্রনাথবাবুর বাসায় পঁহুছিলেন।

নবীনবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রনাথবাবু ভবানীপুরের মধ্যে একজন সুযোগ্য সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। তাঁহার বয়স ত্রিংশৎ বৎসরের বড় অধিক হয় নাই; তিনি কৃতবিদ্য, সৎকার্য্যে উৎসাহী, এবং এই বয়সেই একজন হাইকোর্টের গণ্য উকীল হইয়াছিলেন। তিনি সুবর্ব্বন মিউনিসিপালিটীর একজন মাননীয় সভ্য ছিলেন, এবং সুবর্ব্বের উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেন।

তাঁহার বাড়ী বৃহৎ নহে, কিন্তু পরিষ্কার এবং সুন্দররূপে নির্ম্মিত ও রক্ষিত। বাহিরে দুইটী একতালা বৈঠকখানা ছিল, বড়টীতে চন্দ্রবাবুর বৈঠকখানা—টেবিল, চৌকি, পুস্তক পরিপূর্ণ দুইটী বুকশেল্প, কয়েকখানি সুরুচিসম্মত ছবি। সেজে "মেটিং" করা এবং সমস্ত ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেখিলেই বোধ হয়, কোন কৃতবিদ্য কার্য্যদক্ষ কার্য্যপ্রিয় যুবকের কার্য্যস্থান, পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল।

টেবিলের উপর দুইটী সামাদানে বাতি জ্বলিতেছে; চন্দ্রবাবু, নবীন, হেম ও শরৎ অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ গম্ভীর ও অল্পভাষী, কিন্তু অতিশয় ভদ্র, সুধার পীড়ার সময় তিনি যথাসাধ্য হেমের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই ভদ্রোচিত কথা দ্বারা হেমকে তুষ্ট রাখিতেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র বলিলেন, কলিকাতায় আসিয়া আপনাদিগের ন্যায় কৃতবিদ্য লোকদিগের সহিত আলাপ করিয়া বড় প্রীত হইলাম। আমার চিরকালই পল্লীগ্রামে বাস, পল্লীগ্রামে কৃতবিদ্য লোক বড় অল্প, আপনাদিগের কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ, তাহাও অল্প দেখিতে পাই, আপনাদিগের ন্যায় দেশহিতৈষিতাও অল্প দেখিতে পাই।

চন্দ্র। হেমবাবু, দেশহিতৈষিতা কেবল মুখে। অথবা হৃদয়েও যদি সেরূপ বাঞ্ছা থাকে, তাহাও কার্য্যে পরিণত হয় না। আমরা ক্ষুদ্র লোক, দেশের জন্য কি করিব। সে ক্ষমতা কৈ? তাহার উপযুক্ত স্থান, কালই বা কৈ?

হেম। যাহার যেটুকু ক্ষমতা, সে সেইটুকু করিলেই অনেক হয়। শুনিয়াছি, আপনি সুবর্ব্বন কমিটির সভ্য হইয়া অনেক কাজকর্ম্ম করিতেছেন, তাহার জন্য অনেক প্রশংসা পাইয়াছেন।

চন্দ্র। কাজ কি? কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহা বলেন, তাহাই হয়, আমরাও তাহাই নির্ব্বাহ করি। কলিকাতার অধিবাসিগণ সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে, লর্ড রিপন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান নগরীতে সেই ক্ষমতা দিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন; আমরাও সেই ক্ষমতা পাইবার চেষ্টা করিতেছি, পাই কিনা সন্দেহ।

হেম। আমার বিশ্বাস, এ ক্ষমতা আমরা অবশ্যই পাইব, এবং পাইলে আমাদের বিস্তর লাভ।

চন্দ্রনাথ। পাইলে আমাদের যথেষ্ট লাভ তাহার সন্দেহ কি? আমরা দেশশাসনকার্য্য বহু শতাব্দী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি, গ্রামশাসন প্রথাও ভুলিয়াছি, এক্ষণে দলাদলি করা ও পরস্পরকে গালি দেওয়া ভিন্ন আমাদের জাতীয়ত্বের নিদর্শন নাই! ক্রমে আমরা উন্নত শিক্ষা পাইব, ক্রমে ক্ষমতা পাইব, আমার এরূপ স্থির বিশ্বাস। নিশার পর প্রভাত যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, শিক্ষার পর আমাদিগের ক্ষমতা বিস্তারও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী।

শরৎ। আপনার কথাগুলি শুনিয়া আমি তৃপ্ত হইলাম, আমারও হৃদয়ে এইরূপ আশা উদয় হয়। কিন্তু আমাদিগের এই কঠোর চেষ্টাতে কে একটু সহানুভূতি করে? আমাদিগের উচ্চাভিলাষ অন্যের বিদ্রূপের বিষয়, আমাদিগের চেষ্টার বিফলতা তাঁহাদিগের আনন্দের বিষয়, আমাদিগের জাতীয় চেষ্টা, জাতীয় অভিলাষ, জাতীয় জীবন তাঁহাদিগের উপহাসের অনন্ত ভাণ্ডার। মৃতবৎ জাতি যখন পুনরায় জীবনলাভের জন্য একটু আশা করে, একটু চেষ্টা করে, তখন সেই জাতি কি অন্যের সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারে না?

চন্দ্রনাথ। শরৎ, তোমার বয়সে আমিও ঐরূপ চিন্তা করিতাম, ইংরাজী সংবাদপত্রে একটী বিদ্রূপ দেখিলে ব্যথিত হইতাম। কিন্তু দেখ, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি ফাঁপা মাল, দেখিতে বড় সুন্দর, তত মূল্যবান নহে। যদি সেগুলি দিতে অন্যের বড়ই কষ্ট হয়, তাঁহারা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখুন, আমাদের আবশ্যক নাই। যদি উপহাস করিতেই তাঁহাদিগের ভাল লাগে, তাঁহাদিগের উপহাসই আমাদিগের জাতীয় জীবনের বন্ধনীস্বরূপ হউক। শরৎ, আমাদিগের ক্ষমতা নিজের যোগ্যতা ও সভ্যতার উপর নির্ভর করে, অন্য লোকের হস্ত নহে। আইস, আমরা কার্য্যদক্ষতা শিক্ষা করি, তাহা হইলে সহানুভূতি প্রতীক্ষা না করিয়া, উপহাস গ্রাহ্য না করিয়া দিন দিন অগ্রসর হইব। আমাদিগের উন্নতির পথ অবারিত।

নবীন। আমারও বিশ্বাস, আমরা ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছি, কিন্তু সে উন্নতি কত আস্তে আস্তে হইতেছে। রাজনীতির কথা ছাড়িয়া দিন, সমাজের কথা ধরুন। আমরা মুখে বা পুস্তকে কত বাদানুবাদ করি, কার্য্যে একটী সামাজিক উন্নতি লাভ করিতে কত বিলম্ব হয়, পঞ্চাশৎ বৎসর আলোচনা ও বাগাড়ম্বরের পর একটী কুরীতি উঠে না, একটী সামাজিক সুরীতি স্থাপন হয় না।

চন্দ্র। নবীন, আমি এটী গুণ বলিয়া মনে করি, দোষ বলিয়া মনে করি না। যে সমাজ শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি পরিবর্ত্তন করিতে তৎপর হয়, সে সমাজ শীঘ্র বিপ্লবগ্রস্ত হয়। তুমি ফরাসীদের ইতিহাস বেশ জান, একশত বৎসর হইল ফরাসীরা একেবারে সমস্ত কুরীতি ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল; তাহার ফল ভয়ঙ্কর রাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব! শীঘ্র শীঘ্র সমাজের রীতি পরিবর্ত্তন করায় সমাজের লাভ নাই, বিশেষ ক্ষতি আছে।

নবীন। কিন্তু যে প্রথাগুলি এক্ষণে বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে, সেগুলি কি ত্যাগ করা বিধেয় নহে?

চন্দ্র। অনেক আলোচনা করিয়া, বুঝিয়াসুঝিয়াই সেগুলির সংস্কার করা কর্ত্তব্য। আলোচনায়ও বিশেষ উপকার হয় বোধ হয় না; সমাজে জীবন থাকিলে লোকে আপনা আপনিই সুবিধা বুঝিয়া অনিষ্টকর নিয়মগুলি ত্যাগ করে। জীবিত সমাজের এই নিয়ম; তাহার সংস্কার ক্রমশঃ আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

নবীন। আমিও সেই কথা বলিতেছিলাম, আমাদের সমাজেও সংস্কার হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের জীবন অতিশয় ক্ষীণ, সেই জন্য গতি অতিশয় অল্প। দেখুন, বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের কত অল্প উন্নতি হইতেছে। এ বিষয়ে উন্নতিতে নূতন আইনের আবশ্যক নাই, রাজার অনুজ্ঞার আবশ্যক নাই, সমাজের রীতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই, একটু চেষ্টা হইলেই হয়। কিন্তু সে চেষ্টা কত বিরল। আপনাদিগের দেশের তূলা লইয়া আপনারা কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিতেছি না, ইউরোপ হইতে আমাদের পরিধেয় বস্ত্র আসিতেছে, দিন দিন তাঁতীদের দুরবস্থা হইতেছে।

হেম। কলে প্রস্তুত কাপড়ের সহিত তাঁতীরা হাতে কাজ করিয়া কখনও যে পারিয়া উঠিবে

এরূপ আমার বোধ হয় না। আমি পল্লীগ্রামে অনেক হাটে গিয়াছি, অনেক গরিব লোকের বাড়ী গিয়াছি। আমার মনে আছে, পূর্ব্বে সকল ঘরেই চরকা চলিত, এক্ষণে গ্রামে একখানা চরকা দেখা যায় না। তাহার কারণ, উৎকৃষ্ট বিলাতী সূতা অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। হাটে যে দেশী কাপড় ১৷৷০ টাকায় বিক্রয় হয়, সেইরূপ বিলাতী কাপড় ৸৵০ আনায় বিক্রয় হয়। তাহাতে সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহারা অল্পমূল্যে ভাল কাপড় পরিতে পারে, কিন্তু তাঁতীরা হাতে কাজ করিয়া কখনও কলের কাজের সঙ্গে পারিবে তাহা বোধ হয় না।

নবীন। আমিও তাহাই বলিতেছি, সুসভ্য জগতে হাতের কাজ উঠিয়া যাইতেছে, এক্ষণে কলে কাজ করা ভিন্ন উপায় নাই। তবে আমরা বঙ্গদেশ এরূপ কলে আচ্ছন্ন করি না কেন? আমাদের কি সেটুকু উৎসাহ নাই, সেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি নাই?

চন্দ্র। নবীন, সে বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নহে, সে অর্থের অভাব। বহু অর্থ না হইলে একটী কল চলে না। আর আমাদের একটী শিক্ষার অভাব আছে, আমরা পাঁচজনে মিলিয়া এখনও কাজ করিতে শিখি নাই, এই শিক্ষাই সভ্যতার প্রধান সহায়। দেখ, বিদ্যায় আমাদের দেশে অনেকে উন্নত হইয়াছেন, ধনে অনেকে উন্নত, ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে অনেকে উন্নত, রাজনীতিতে অনেকে উন্নত। বুদ্ধির অভাব নাই, কিন্তু পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করা একটী স্বতন্ত্র শিক্ষা, সেটী আমরা এখনও শিখি নাই। পাঁচজন বিদ্বান একত্রে মিলিয়া একটী মহৎ চেষ্টা করিতেছেন এরূপ দেখা যায় না, পাঁচজন রাজনীতিজ্ঞ ঐক্য সাধন করিতে পারেন না, পাঁচজন ধনী মিলিয়া বাণিজ্য করেন এরূপ বিরল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কিন্তু আমি ভরসা করি, অন্য শিক্ষার সঙ্গে এ শিক্ষাও আমরা লাভ করিব, এ শিক্ষা লাভ না করিলে সভ্যতার আশা নাই।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে ভৃত্য আসিয়া বলিল, আহার প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সকলেই বাড়ীর ভিতর আহার করিতে গেলেন।

আহারাদি সমাপন হইলে পুনরায় সকলে বাহিরে আসিলেন। আর ক্ষণেক কথাবার্ত্তা কহিয়া হেম ও শরৎ বিদায় হইলেন।

শরৎ আপনার বাটীতে প্রবেশ করিলেন, হেম চন্দ্রনাথবাবুর কথাগুলি অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে অনেক দূর যাইয়া পড়িলেন। পথে সুন্দর চন্দ্রালোক পড়িয়াছে, নিশার বায়ু শীতল মনোহর, হেমচন্দ্র বেড়াইতে বেড়াইতে বালীগঞ্জের দিকে গিয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তিনি ফিরিয়া আসিতেছিলেন ; পশ্চাৎ হইতে একটি শকটের শব্দ পাইলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, দুইটী উজ্জ্বল আলোকযুক্ত একখানা বড় গাড়ী তীব্র বেগে আসিতেছে, বলবান শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয় যেন পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া উড়িয়া আসিতেছে, ফেটিন ঘর্ঘর শব্দে দরিদ্র হেমের পাশ দিয়া যাইয়া একটী বাগানের ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পর আবার একটী জুড়ি আসিল, দুইটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব এক বৃহৎ লেন্ড লইয়া বিদ্যুৎ-বেগে সেই ফটকে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার সময় নারীকণ্ঠ-সম্ভূত খল্ খল্ হাস্যধ্বনি হেমের শ্রুতিপথে পঁহুছিল।

হেম একটু উৎসুক হইলেন, এবং সবিশেষ দেখিবার জন্য বাগানের ফটকের কাছে আসিলেন। দেখিলেন, ফটকে রামসিংহ, ফতেসিংহ, বলবন্তসিংহ প্রভৃতি শ্মশ্রুধারী দ্বারবানগণ সগর্ব্বে পদচারণ করিতেছে। বাগানের ভিতর অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি, দুই একটী সুন্দর জলাশয়। তাহার পর একটী উন্নত অট্টালিকা। অট্টালিকা ইন্দ্রপুরীতুল্য, তাহার প্রতি গবাক্ষ হইতে উজ্জ্বল আলোকরাশি বহির্ভূত হইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে বাদ্যধ্বনি ও নারী-কণ্ঠ-সম্ভূত গীতধ্বনি গগনপথে উত্থিত হইতেছে।

হেম ধীরে ধীরে একজন দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বাগান কার বাপু?”

দ্বারবান দাড়ীতে একবার মোচড় দিয়া গোঁপে একবার তা দিয়া বলিল, “এ বাগান তুমি জানে না, মুলুক কা সব বড় বড় লোক জানে, তুমি জানে না? তুমি কি নয়া আদ্মী আছে?”

হেম। হাঁ বাপু, আমি নূতন মানুষ, এদিকে কখনও আসি নাই, তাই জিজ্ঞেসা করিতেছি।

দ্বারবান। সোই হোবে। এখানে সব কোই এ বাগান জানে। কল্‌কাত্তাকা যেত্তা বড়া বড়া বাঙ্গালী আছে, জমিদার, উকীল, কৌঁসিলি, সব এ বাগানে আসে, সব কোই এ বাগান জানে।

হেম। তা হবে বাপু, আমি গরিব লোক, আমি সে সব কথা কেমন করে জানব?

দ্বারবান। হাঁ সো ঠিক, তোমরা লায়েক আদমী এ বাগান জানে না। আজ বড়া নাচ হোবে, বহুত বাবু লোক আসেছে, বড়া তামাসা।

হেম। তা নাচ দিচ্চে কে? বাগানটা কার?

দ্বারবান। ধনপুরকা জমিদার ধনঞ্জয়বাবু।

হেমের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল।

হা হতভাগিনী উমাতারা! ধনে যদি সুখ থাকিত, মর্ম্মর-শোভিত ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদে যদি সুখ থাকিত, সাদা জুড়ি ও কালো জুড়িতে যদি সুখ থাকিত, তবে তুমি আজ হতভাগিনী কেন?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : ধনঞ্জয়বাবু

যেদিন রাত্রিতে হেমবাবু ধনঞ্জয়বাবুর বাগান দেখিয়া আসিলেন, সেই দিন অবধি তিনি বড়ই চিন্তিত ও বিষণ্ণ রহিলেন। সহসা সে কথা বিন্দুকে খুলিয়া বলিতে পারিলেন না, পাছে বিন্দু উমাতারার জন্য মনে ব্যথা পান; এবং বিন্দুর নিকট হইতে কথাটি গোপন রাখিতেও তাঁহার বড় কষ্ট বোধ হইল। কি করিবেন? কি উপায় অবলম্বন করিবেন? হতভাগিনী উমাতারার সংবাদ কিরূপে লইবেন? উমাতারার কোনরূপ সহায়তা করা কি তাঁহার সাধ্য?

অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়া একবার ধনঞ্জয়বাবুর বাড়ী যাইবেন ঠিক করিলেন। ধনঞ্জয়বাবু বাল্যকালে যখন তালপুকুরে আসিতেন, তখন হেমকে বড় মান্য করিতেন, সম্ভবতঃ এখনও হেমের দুই একটী পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। আর যদি তাহাও না হয়, তথাপি একবার উমাতারার অবস্থা দেখিয়া আসা হবে, তাহার পর যথোচিত উপায় বিধান করা যাইবে।

এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয়বাবুর সহিত সহসা দেখা হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কলিকাতা মহানগরীতে ধনঞ্জয়বাবুর বড় মান, অনেক বন্ধু, অনেক কাজের ঝন্ঝাট, তাঁহার সহিত হেমের ন্যায় সামান্য লোকের দেখা হওয়া শীঘ্র ঘটিয়া উঠে না। হেমের গাড়ী নাই, তিনি একদিন সকালে হাঁটিয়া ধনঞ্জয়বাবুর কলিকাতার প্রাসাদতুল্য বাটীতে গেলেন। দ্বারে দ্বারবানগণ একজন সামান্য পথশ্রান্ত বাবুর কথায় বড় গা করে না, কেহ কোনও উত্তর দেয় না, খাটিয়ারূপ সিংহাসন থেকে কেহ শীঘ্র উঠে না। কেহ গা ভাঙ্গিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ ডাল বাছিতেছে, কেহ বা বাড়ীর দাসীর সহিত দুই একটী মধুর মিষ্টালাপ করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে একজন অনুগ্রহ করিয়া হেমের দিকে কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়া কহিল,—কেয়া হায় বাবু? তুমি সকাল থেকে বসে আছে, কি চাই কি?

হেম। বলি একবার ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে কি দেখা হতে পারে? অনেক দূর থেকে এসেছি, একবার খবর দাও না, বল তালপুকুর গ্রাম থেকে হেমবাবু দেখা করতে এসেছেন।

দ্বারবান। গ্রামের লোক ঢের আসে, বাবু সকলের সঙ্গে দেখা করতে পারে না, বাবুর অনেক কাজ।

হেম। তবু একবার খবর দাও না, বড় প্রয়োজনে এসেছি, একবার দেখা হলে ভাল হয়।

দ্বারবান। প্রয়োজনে সকলে আসে, বাবুর কাছে এখন সকল গ্রামের লোকের প্রয়োজন আছে, সকলেই কিছু আশা করে। তোমার কি গ্রাম শালপুকুর, সে মুলুকে বড় শালবন আছে?

হেম। না হে দ্বারবান্‌জী, শালপুকুর নয়, তালপুকুর, তোমাদের বাবুর শ্বশুরবাড়ী সেই গ্রামে।

তখন একটী খাটিয়ায় অর্দ্ধশয়ান দ্বিতীয় এক মহাপুরুষ একবার হাই তুলিয়া অর্দ্ধেক গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—হাঁ হাঁ, আমি জানে, সে তালপুকুর গ্রামে বাবু সাদী করেছেন। তুমি বাবুর শ্বশুরবাড়ীর লোক আছে?

হেম। সেই গ্রামের লোক বটে, বাবুর সঙ্গে সম্পর্কও আছে।

তখন দুই তিনজন বিজ্ঞ শমশ্রুধারী ক্ষণেক পরামর্শ করিল। একজন কহিল, গ্রাম থেকে অনেক কাঙ্গালী আসে, তাড়াইয়া দাও। আর একজন কহিল, না শ্বশুরবাড়ীর লোক, সহসা

তাড়াইয়া দেওয়া যায় না, মা শুনিলে রাগ কর্‌বেন। তৃতীয় একজন নিষ্পত্তি করিল, আচ্ছা একটু বস্‌তে বল। হেমবাবু আবার ক্ষণেক বসিলেন। তিনি একটু চিন্তাশীল সমালোচনাপ্রিয় লোক ছিলেন, বড় মানুষের দ্বারবানদিগের সামাজিক আচারব্যবহার ও সভ্যতা বিশেষরূপে সমালোচনা করিবার অবকাশ পাইলেন, এবং তাহা হইতে পরম প্রীতি ও উপদেশ লাভ করিলেন।

দ্বারবানগণ দেখিল, এ কাঙ্গালী যায় না। তখন একজন অগত্যা বহু সুখের আধার খাটিয়া অনেক কষ্টে ত্যাগ করিয়া একবার হাই তুলিয়া, একবার অসুরতুল্য বাহুদ্বয় আকাশের দিকে বিস্তার করিয়া আর একবার শ্মশ্রু কণ্ডূয়ন করিয়া ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে বাড়ীর ভিতর গেলেন।

হেম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় একদণ্ড পর দ্বারবান ফিরিয়া আসিয়া সুখবর দিলেন, যাও বাবু, এখন দেখা না হোবে।

হেম। আমার নাম বলেছিলে?

দ্বারবান্‌। নাম কি বল্‌বে? এত সকালে কি বাবুর সঙ্গে দেখা হোয়? বাবু এখনও উঠেন নাই. দশটার সময় উঠেন, তাহার পর আসিও। হেম অগত্যা ফিরিয়া গেলেন।

এক দিন দশটার পর গেলেন, তখন বাবু বাড়ী নাই। একদিন অপরাহ্নে গেলেন, বাবু বাগানে বাহির হইয়াছেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় গেলেন, সে দিন বাবু কোথা নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। চার পাঁচ দিন বৃথা হাঁটাহাঁটি করিয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আবার গেলেন, ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয়বাবু বাড়ী আছেন।

দ্বারবান বলিল, কি নাম তোমার? গোবর্দ্ধন না গৌরচন্দ্র?

হেম। নাম হেমচন্দ্র, তালপুকুর গ্রাম হতে এসেছি।

দ্বারবান উপরে যাইয়া খবর দিল। আসিয়া বলিল, উপরে যান। হেমচন্দ্র উপরে গেলেন।

ধনপুরে ধনেশ্বর বংশের ধনবান উত্তরাধিকারী, গৌরবর্ণ, সুন্দর, যৌবনোপেত ধনঞ্জয়বাবু কয়েকজন পাত্রমিত্রের মধ্যে সেই সভাগৃহে বিরাজ করিতেছেন। তিনি শিষ্টাচার করিয়া আপন শ্যালীপতি ভ্রাতাকে মক্‌মলমণ্ডিত সোফায় বসিতে আজ্ঞা দিলেন। হেমচন্দ্র যাহারপরনাই আপ্যায়িত হইলেন।

হেমবাবু সহসা কোনও কথা উত্থাপন করিতে পারিলেন না, সে সভাগৃহের শোভা দেখিয়া ক্ষণেক বিমোহিত হইয়া রহিলেন। তিনি চৌরঙ্গিতে প্রাসাদতুল্য বাটীসমূহের বারাণ্ডায় টানা-পাখা চলিতেছে, পথ হইতে দেখিয়াছেন; লাট সাহেবের বাড়ীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন; উঁকিঝুঁকি মারিয়া দুই একটী ইংরাজী দোকানের অভ্যন্তরে একটু একটু দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন সুশোভিত সুন্দর সভাগৃহের ভিতর পদবিক্ষেপ করা তাঁহার কপালে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। সভার মেজে সুন্দর কার্পেটমণ্ডিত, তাহাতে গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে, লতায় লতায় ফুল ফুটিয়াছে, ডালে ডালে পাখী বসিয়াছে, সে কার্পেটের উপর হেমচন্দ্র ধূলিপূর্ণ তালি দেওয়া জুতা স্থাপন করিতে একটু সঙ্কুচিত হইলেন। তাহার উপর আবলুশ কাষ্ঠের সোফা, অটোমান, চৌকি, ইজি চেয়ার, সাইডবোর্ড, টেবিল; আবলুশ কাষ্ঠের উপর সুবর্ণের সূক্ষ্ম রেখাগুলি বড় শোভা পাইতেছে। সোফা ও চৌকি হরিদ্বর্ণ মক্‌মলে মণ্ডিত, হেমের ছেলে দুইটী সেরূপ মক্‌মলের জামা কখন পরিধান করে নাই। মার্ব্বেলের টেবিল, মার্ব্বেলের সাইড-বোর্ড, মার্ব্বেলের প্রতিমূর্ত্তি, উপর হইতে বেলওয়ারীর ঝাড়ের ভিতর গ্যাসের আলোক দীপ্ত রহিয়াছে, সে আলোকে ঘর দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়াছে, গবাক্ষ দিয়া সে আলোক বাহির হইয়া সে পাড়াসুদ্ধ আলোকিত করিয়াছে। এক দিকে কোন স্থানে সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে, সাইডবোর্ডে দুইটী ডিকেণ্টর ও কয়েকটী গেলাস ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে। দেয়ালে অসংখ্য বড় বড় দর্পণে আলোক প্রতিফলিত হইতেছে. হেমের দরিদ্র চেহারাখানি চারিদিকের দর্পণে অঙ্কিত দেখিয়া সে দরিদ্র আরও লজ্জিত হইলেন। কয়েকখানি সুন্দর বহুমূল্য অয়েল পেণ্টিং; ইন্দ্রপুরী হইতে বিবস্ত্রা মেনকা, রম্ভা যেন সেই অয়েল পেণ্টিং হইতে হাস্য করিতেছে।

সভাগৃহের বর্ণনা এক প্রকার হইল, সভ্যদিগের বর্ণনা করি কিরূপে? আজ অধিক লোক নাই, তথাপি ধনঞ্জয়বাবুর অতি প্রিয়, অতি গুণবান কয়েকজন বন্ধু সে সভাকে নবরত্ন সভা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যথেষ্ট বর্ণনা করা অসম্ভব, দুই একটী কথায় পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ধনঞ্জয়ের দক্ষিণ হস্তে সুমতিবাবু বসিয়াছিলেন, তিনি রূপবান যুবা পুরুষ, বয়স ঠিক জানি না, কিন্তু যৌবনের শোভা সে সুন্দর মুখে, সে কালাপেড়ে কাপড়ে ও ফিন্‌ফিনে একলাইয়ে

লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার ব্যবসায় জানি না, কিন্তু প্রায় বড় মানুষদিগের দক্ষিণ হস্তে তাঁহার স্থান। তিনি গীতে অদ্বিতীয়, হাস্য-রহস্যে অদ্বিতীয়, ধনীদিগের মনোরঞ্জনে অদ্বিতীয়, প্রবাদ আছে যে, বিষয়বুদ্ধিতেও অদ্বিতীয়! তিনি মধুমক্ষিকার ন্যায় মধু আহরণ করিতে জানিতেন, অনেক মধুচক্র হইতে মধু আহরণে তাঁহার ধনাগার পূর্ণ হইয়াছিল, সুন্দর গাড়ী ও জুড়িতে ছাপিয়া পড়িতেছিল। প্রবাদ আছে যে, বণ্ড, হেণ্ডনোট প্রভৃতি গূঢ় মন্ত্রে তিনি বিশেষরূপে দীক্ষিত, নাবালক বা তরুণ ধনীদিগের প্রতি সেই সুন্দর মন্ত্র চালনায় তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু এ সকল জনপ্রবাদ গ্রাহ্য নহে, সুমতিবাবুর মিষ্ট হাস্য ও আলাপ-ক্ষমতা সন্দেহ-বিবর্জ্জিত।

সুমতিবাবুর পার্শ্বে যদুনাথ বসিয়াছিলেন—গুণ বল, লেখাপড়া বল, কার্য্যদক্ষতা বল, হাস্য-রহস্য ক্ষমতা বল—যদুনাথের ন্যায় কলিকাতায় কে আছে? ব্যবসা ওকালতি, মুখে ইংরাজী বুলি যেন খই ফোটে, ইংরাজী চালচোল, ইংরাজী খানায়, ইংরাজী ধরণে তাঁহার ন্যায় কে উপযুক্ত? সেম্পেন বা সোটরণ্‌ বা সার্বলিস্‌ সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় কে বিচারক? আবার তাঁহার বক্তৃতা ক্ষমতাও অসাধারণ—“ন্যাশনালিটী” রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া কলিকাতার কোন্‌ শিক্ষিত লোকের মন না দ্রবীভূত হইয়াছে? যদুনাথবাবুর সমকক্ষ হওয়া বালকদিগের উচ্চাভিলাষ, যদুনাথবাবুর সহিত বন্ধুতা করা বিষয়ীদিগের উদ্দেশ্য, যদুনাথবাবুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কন্যাকর্ত্তাদিগের সুখস্বপ্ন!

তাঁহার পশ্চাতে হাতকাটা বেনিয়ান পরিয়া সুবর্ণের চেন ঝুলাইয়া হরিশঙ্কর বাবু একটু একটু হাসিতেছেন। তিনি সেকেলে লোক, ইংরাজী বড় জানেন না, কিন্তু বাহাদুরি কেমন? কোন্‌ ইংরাজীওয়ালা তাঁহার ন্যায় চাকরী পাইয়াছে? তিনি মাথায় সাদা ফেট্টা বাঁধিয়া আপিসে যান, পুরাণ ধাঁচে ইংরাজী কহেন, বড় বড় সাহেবের বড় প্রিয়পাত্র। প্রাচীন হিন্দু সমাজের স্তম্ভস্বরূপ এই হরিশঙ্করবাবুকে সাহেবেরা বড় স্নেহ করেন, হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে হরিশঙ্করবাবুকে মূর্ত্তিমান বেদ মনে করেন, হিঁদুয়ানি ও সাবেক রকম নীতি বজায় রাখিবার একটী প্রধান কারণ মনে করেন, নব্য উদ্ধত যুবকদিগের হরিশঙ্করবাবুকে উদাহরণ দেখান। হরিশঙ্করবাবু লোকটী বিচক্ষণ; দেখিলেন, এই চালে চলিলেই লাভ, সুতরাং সেই চালই আরও অনুবর্ত্তন করিলেন। তাহার সুফল শীঘ্র ফলিল, ধর্ম্মপতি রাজপুরুষেরা এই প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীকে অনেক শিক্ষিত কর্ম্মচারীর উপরে একটী বড় চাকরী দিলেন। সাবেক রীতিনীতির স্তম্ভ মনে মনে একটু হাসিলেন, সন্ধ্যার সময় ইয়ারদিগের নিকট এই কথা গল্প করিয়া, আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যথোচিত প্রশংসা লাভ করিলেন। সেই রাত্রি সুধার উৎস বহিল।

হরিশঙ্করবাবুর এক পার্শ্বে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অবতার ‘মিষ্টর’ কর্ম্মকার বসিয়াছেন, তাঁহার কোট পেণ্টলুন অনিন্দনীয়, চক্ষের চশমা অনিন্দনীয়, কলার নেকটাই অনিন্দনীয়, হস্তে শেরীর গেলাস অনিন্দনীয়। তাঁহার ইংরাজী বুলি বিস্ময়কর, ইংরাজী ধরণ বিস্ময়কর, ইংরাজী মেজাজ বিস্ময়কর। ইউরোপ হইতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চরম ফল আহরণ করিয়া তিনি ধনঞ্জয়বাবুর সভা শোভিত করিতেছেন। সুমতিবাবু কখন কখন তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনিন্দনীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া ইয়ারদিগের নিকট বলিতেন, “এখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অর্থ বুঝিলাম, মিষ্টার কর্ম্মকারের মুখের কান্তি অপেক্ষা পশ্চাতের শোভাটিই কিছু অধিক।”

হরিশঙ্করবাবুর অপর পার্শ্বে বিশ্বম্ভরবাবু বসিয়াছেন, তিনি তাঁহার পাড়ার মধ্যে বড় মানুষ, দলের মধ্যে দলপতি, বড় হাউসের বড় বেনিয়ান! তাঁহার অর্থের ন্যায় কাহার অর্থ, তাঁহার নূতন বাড়ীর ন্যায় কাহার বাড়ী, তাঁহার গাড়ীঘোড়ার ন্যায় কাহার গাড়ীঘোড়া? গিন্দেশ্বরবাবু, তাঁহার পার্শ্বে সিদ্ধেশ্বরবাবু প্রভৃতি বনিয়াদী বড় মানুষগণ বসিয়া গিয়াছেন তাঁহার পার্শ্বে সিদ্ধেশ্বর বাবু, গিন্দেশ্বর বাবু প্রভৃতি বনিয়াদী বড় মানুষগণ বসিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরব বর্ণনায় আমরা অক্ষম।

ধনস্বরূপ পদ্মবনের চারিদিকে মধুমক্ষিকাগণ গুণ গুণ করিতেছে; ধনস্বরূপ ময়ূর সিংহাসন রত্নরাজি ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে; হেমবাবু কয়েকমাস কলিকাতায় বাস করিয়াই দেখিলেন, কেবল ধনঞ্জয়বাবুর বাড়ী নহে, চারি দিকেই সমাজ এ রত্নরাজিতে মণ্ডিত রহিয়াছে? এ মহানগরী এই রত্নপ্রভায় ঝল্লসিত হইতেছে!

এ সভায় হেমচন্দ্র কি বলিবেন? ‘হংস মধ্যে বকো যথা’ হইয়া তিনি ক্ষণেক সেইখানে সঙ্কুচিত হইয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। একবার কষ্ট করিয়া ধনঞ্জয়বাবুর বাগানের কথা

উত্থাপন করিলেন, তখনই সভাসদ্‌গণ সহস্রমুখে সেই বাগানের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয়বাবু হেমবাবুকে একদিন বাগানে লইয়া যাইবেন বলিয়া অনুগৃহীত করিলেন, হেম অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন, পরে একবার তালপুকুরের কথা উচ্চারণ করিলেন, ধনঞ্জয় বর্দ্ধমানের নাজীরের কথা উত্থাপনে একটু মুখ হেঁট করিলেন, সে কথায় কেহ বড় গা করিলেন না। সভাসদ্‌গণ একটু অধীর হইতে লাগিলেন, কেহ সেতার লইয়া কাণ মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন, কেহ সাইডবোর্ডে ডিকেণ্টরের দিকে চাহিলেন, কেহ ঘড়ীর দিকে চাহিলেন। হেমচন্দ্র ভাবগতিক বুঝিয়া বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ীর ভিতর একবার যাবেন কি? ধনঞ্জয় ত তাঁহাকে একবার বাড়ীর ভিতর যাইবার কথা বলিলেন না। তথাপি হতভাগিনী উমাতারাকে না দেখিয়া যাইবেন?

প্রাঙ্গণে আসিয়া হেমচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিলেন। এমন সময়ে বাহিরে ঘর্ঘর শব্দে আর দুই একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল! গাড়ী হইতে হাস্যরবে বাটী ধ্বনিত করিয়া কাহারা বাবুর বৈঠকখানায় গেল। সভা জমিল, সেতারের বাদ্য শ্রুত হইল, আবার মধুর হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল, অচিরে কলকণ্ঠজাত গীতধ্বনি গগনমার্গে উত্থিত হইতে লাগিল।

হেম এক পা দুই পা করিয়া একটী প্রাচীর পার হইয়া বাড়ীর ভিতরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছেন! তথায় শব্দ নাই, আলোক নাই, মনুষ্য-চিহ্ন নাই, মনুষ্য-রব নাই। অন্ধকারে ক্ষণেক প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। কাহাকেও ডাকিবেন কি?

একটী উন্নত প্রকোষ্ঠের গবাক্ষের ভিতর দিয়া একটী দীপ দেখা যাইতেছে, হেম অনেকক্ষণ সেই দীপের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সাড়া দিবার সাহস হইয়া উঠিল না।

ক্ষণেক পর একটী ক্ষীণ বাহু সেই গবাক্ষে লক্ষিত হইল। ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষ বন্ধ হইল, আলোক আর দৃষ্ট হইল না, সমস্ত অন্ধকার। হৃদয়ে দুই হস্ত স্থাপন করিয়া হেমচন্দ্র নিঃশব্দে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : হতভাগিনী

হেমচন্দ্র বাটী আসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমি নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি, নারীর যাতনার সময় নারীই সান্ত্বনা দিতে পারে। আমি সমস্ত কথা স্ত্রীর নিকট কহিব, তিনি যাহা পারেন করিবেন।

গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বিন্দু দেখিলেন, হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডল অতিশয় গম্ভীর, অতিশয় ম্লান। ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজ কি হয়েছে গা? তোমার মুখখানি অমন হয়ে গেছে কেন?

হেম। বল্‌ছি, বসো। সুধা শুয়েছে?

বিন্দু। সুধা খাওয়াদাওয়া করে শুয়েছে। কোন মন্দ খবর পাও নাই?

হেম। শুন, বলছি। এই বলিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে হেমচন্দ্র আদ্যোপান্ত যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, বিন্দুর নিকট বলিলেন।

বিন্দু আঁচল দিয়া অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন, "এটী হবে তা আমি জানতেম, অভাগিনী উমা তা জান্‌ত।

হেম। কেমন করে?

বিন্দু। তা জানি না, বোধ হয় কল্‌কেতা হতে পূর্ব্বেই কিছু কিছু সংবাদ পেয়েছিল, সে চাপা মেয়ে, কোন কথা শীঘ্র বলে না, কিন্তু তালপুকুর থেকে আসবার সময় সে অভাগিনীর কান্না কেঁদেছিল।

হেম। এখন উপায়? যেরূপ শুন্‌ছি, তাতে ধনেশ্বরের কুলের ধন দু'বৎসরে লোপ হবে, ধনঞ্জয় রোগগ্রস্ত হবে, উমা দু'বৎসরে পথের কাঙ্গালিনী হবে।

বিন্দু। সে ত দু'বৎসরের পরের কথা, এখন উমা কেমন আছে? সে স্বভাবতঃ অভিমানিনী, স্বামীর আচরণ কেমন করে সহ্য করছে? তালপুকুর হতে এসে সেই বড় বাড়ীতে ছেলেমানুষ একা কেমন করে আছে? তার ছেলেপুলে নেই, বন্ধুবান্ধব যে কেউ নেই, যার কাছে মনের কথা বলে। তুমি কেন একবার গিয়ে দুটো কথা কয়ে এলে না?

হেম। আমার ভরসা হল না, তুমি একবার যাও, তোমার যা কর্ত্তব্য তা কর, তার পর ভগবান আছেন।

তাহার পর দিন খাওয়াদাওয়ার পর ছেলে দুটীকে সুধার কাছে রাখিয়া বিন্দু একটী পাল্কী করিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন। সুধাও উমাদিদির সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া উৎসুক হইল, কিন্তু বিন্দু বলিলেন, "আজ নয় বোন, আর একদিন যদি পারি তোমাকে নিয়ে যাব।"

প্রশস্ত শয়নকক্ষে গিয়া বিন্দু দেখিলেন, উমা একা বসিয়া একটী চুলের দড়ী বিনাইতেছে, দাস দাসী সকলে নীচে আছে। উমাকে দেখিয়া বিন্দু শিহরিয়া উঠিলেন। এই কি সেই তালপুকুরের উমা, যাহার সৌন্দর্য্যের কথা দিক্‌বিদিক্‌ প্রচার হইয়াছিল? মুখের রং কালো হইয়া গিয়াছে, চক্ষে কালী পড়িয়াছে, কণ্ঠার হাড় দুটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বাহু অতিশয় শীর্ণ, শরীরখানি দড়ীর মত হইয়া গিয়াছে। চারিমাস পূর্ব্বে বিন্দু যাহাকে প্রথম যৌবনের লাবণ্যে বিভূষিতা দেখিয়াছিলেন, আজ তাহাকে ত্রিংশৎ বৎসরের রোগক্লিষ্টা নারীর ন্যায় বোধ হইতেছে। কণ্ঠার হাড়ের উপর দিয়া তারাহার লম্বমান রহিয়াছে, বহুমূল্য বালা দুগাছী সে শীর্ণ হস্তে ঢল্‌ ঢল্‌ করিতেছে।

উমা পদশব্দ শুনিয়া সেই ম্লান চক্ষুর সহিত পিছনে ফিরিয়া দেখিলেন। বিন্দুকে দেখিয়াই চুলের দড়ী রাখিয়া উঠিলেন। ম্লান বদনে ধীরে ধীরে কহিলেন, "আর বিন্দুদিদি, তুমি এসেছ, আমি কতদিন তোমার কথা মনে করেছি। তুমি ভাল আছ? ছেলেরা ভাল আছে?"

সে ধীর কথাগুলি শুনিয়াই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিন্দু উমার হৃদয়ের অবস্থা ও তাহার চারি মাসের ইতিহাস অনুভব করিলেন। যত্নে হৃদয়ের উদ্বেগ সঙ্গোপন করিয়া উমার হাত দুটী ধরিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—হাঁ বোন, আমরা সকলে ভাল আছি, সুধার বড় জ্বর হয়েছিল, তা সেও ভাল হয়েছে। তুমি কেমন আছ উমা? তোমাকে একটু কাহিল দেখছি কেন বোন্‌?

উমা। ও কিছু নয় বিন্দুদিদি, আমারও কল্‌কেতায় এসে আমাশা হয়েছিল, তা ভাল হয়েছি, এখন একটু কাশি আছে, বোধ হয় কল্‌কেতার জল আমাদের সয় না, আমরা তালপুকুরেই ভাল থাকি।

সেই নীরস ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ হাস্য লক্ষিত হইল।

বিন্দু। তালপুকুরে আবার যেতে ইচ্ছে করে? আমরা এই পূজার পর যাব, তুমি যাবে কি?

উমা। তা সে ত আমার ইচ্ছে নয় বিন্দুদিদি, বাবু কি তাতে মত কর্‌বেন? বোধ হয় না।

বিন্দু। তবে তোমাকে এখানে দেখবে শুনবে কে? আমরা রইলাম অনেক দূরে, আর ছেলেদের ফেলেও ত সর্ব্বদা আস্‌তে পারি না। তোমারও কাশি করেছে, রোগা হয়ে গেছ, তোমাকে দেখে কে?

উমা। কেন বিন্দুদিদি, রোজ ডাক্তার আসে, বাবু একজন ভাল ডাক্তার রাখিয়ে দিয়েছেন, সে ওষুধ দিচ্ছে, আমি এখন ওষুধ খাই।

বিন্দু। তা যেন হোল, কিন্তু তবু আপনার লোক না হলে কি কেউ দেখ্‌তে শুন্‌তে পারে? আর তোমার অসুখ হলে সংসারই দেখে কে? তা জ্যেঠাইমাকে কেন লেখ না, তিনি এসে দিন কতক থাকুন। আবার তুমি একটু সার্‌লে তিনি চলে যাবেন, তুমিও না হয় দিন কতক গিয়ে তালপুকুরে থাক্‌বে।

উমা। না, মাকে আর কেন আনান? আমার ব্যারামের বেশ চিকিৎসা হচ্ছে, আর সংসারে অনেক চাকর দাসী আছে, কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ত, মাকে কেন ডাকান?

বিন্দু। না, তবু বোধ হয় তেমন যত্ন হয় না, মায়ে যেমন যত্ন করে, তেমন কি আর কেউ পারে, হাজার হোক মার প্রাণ। তা ধনঞ্জয়বাবু তোমাকে যত্নটত্ন করেন ত?

অতি ক্ষীণ স্বরে উমা উত্তর করিলেন—হাঁ, তা আমার যখন যা আবশ্যক, তখনই পাই, কিছুরই অভাব নেই। যত্ন করেন বৈ কি।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিন্দু দেখিলেন, অভিমানিনী উমা আপনার প্রকৃত যাতনার কথা কহিতে চাহে না; উমার ইহজগতে সুখ ও সুখের আশা ভস্মসাৎ হইয়াছে। বিন্দুই বা সে কথা কিরূপে জিজ্ঞাসা করেন? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন,—না উমা, আমার বোধ হয় জ্যেঠাইমা এখানে

এসে কয়েকদিন থাকলে ভাল হয়। দেখ সুখদুঃখ, ব্যারামস্যারাম আমাদের সকলেরই আছে, ব্যারামের সময় আপনার লোক যতটা করে, পরে কি ততটা করে? এই সুধার ব্যারাম হল, বাবু ছিলেন, শরৎ ছিল, কত যত্ন, কত শুশ্রূষা করলে, তবে আরাম হল। তুমিও বোন বড় কাহিল হয়ে গেছ, সর্ব্বদা কাশছ, এখন থেকে একটু যত্ন নেওয়া ভাল! তা আমার কথা রাখ বোন, জ্যেঠাইমাকে আজই চিঠি লেখ, না হয় আমায় বল, আমিই লিখছি। আহা উমা, তুমি কি ছিলে বোন, আর কি হয়ে গেছ! এই বলিয়া বিন্দু সস্নেহে উমার কপালে হাত বুলাইয়া কপাল থেকে চুলগুলি সরাইয়া দিলেন।

এইটুকু স্নেহ উমা অনেক দিন পান নাই, এইটুকুতে তাঁহার হৃদয় উথলিল, চক্ষু দুইটী ছল্ ছল্ করিল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উমা ধীরে ধীরে বলিলেন, "বিন্দুদিদি তুমি আমাকে ছেলেবেলা থেকে বড় ভালবাস" আর কথা বাহির হইল না, উমা চক্ষুর জল অঞ্চল দিয়া মুছিলেন।

বিন্দু অতিশয় স্নেহের ভাষায় বলিলেন, "উমা, তুমি কি আমাকে ভালবাস না?"

উমা। আমি, যতদিন বাঁচব, তোমাকে ভালবাসব।

বিন্দু। তবে বোন, আজ আমার কাছে এত গোপন চেষ্টা কেন? তোমার মনের দুঃখ কি আমি বুঝিনি? জগতে তোমার সুখের আশা শেষ হয়েছে তা কি আমি বুঝিনি? বিবাহের পর যে প্রণয়ে তুমি ভাসতে, আমার সঙ্গে দেখা হলেই যে কথা আমাকে বলতে, সে প্রণয়-সুখ শেষ হয়েছে, তা কি আমি বুঝিনি? উমা, তুমি এসব কথা আমার নিকট কেন লুকাচ্ছ? আমি কি পর? প্রাণের উমা, তুমি আমি যদি পর হই, তবে জগতে আপনার লোক কে আছে?

এ স্নেহবাক্য উমা সহ্য করিতে পারিল না, নয়ন দিয়া ঝর ঝর করিয়া বারি বহিতে লাগিল, প্রাণের বিন্দুদিদির হৃদয়ে মুখখানি লুকাইয়া অভাগিনী একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

অশ্রুসিক্ত মুখখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া উমা ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—বিন্দুদিদি, তোমার কাছে আমি কখনও কিছু গোপন করিনি, কখনও কর্‌ব না। কিন্তু আজ ক্ষমা কর, এ সব কথা আর একদিন বল্‌ব।

বিন্দু। উমা, আমি আজই শুনব। মনের দুঃখ মনে রাখলে অধিক ক্লেশ হয়, আপনার লোকের কাছে বল্‌লে একটু শান্তি বোধ হয়।

উমা। কি বল্‌ব বল?

বিন্দু। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম, ধনঞ্জয়বাবু কি এখন তেমন যত্নটত্ন করেন?

উমা। বিন্দুদিদি, আমার যখন যা দরকার হয় সবই পাই, আমার রোগের চিকিৎসা করাচ্চেন, যত্ন নেই কেমন করে বল্‌ব?

বিন্দু। উমা, তুমি কি আমাকে পুরুষ মানুষ পেয়েছ যে, ঐ কথায় ভুলাচ্ছ? ভাতকাপড় ও ওষুধে কি স্বামীর যত্ন? আমি সে যত্নের কথা বলিনি। ধনঞ্জয়বাবু কি পূর্ব্বের মত তোমাকে স্নেহ করেন, পূর্ব্বের মত কি মন খুলে তোমাকে ভালবাসেন, পূর্ব্বের মত কি তোমার ভালবাসায় সুখী হন? উমা, মেয়েমানুষের কাছে মেয়েমানুষের কি এই কথাগুলি খুলে জিজ্ঞাসা করতে হয়? স্বামীর যে স্নেহ ধনবতী স্ত্রীর ধন, দরিদ্র নারীর সুখ, সকল মেয়েমানুষের জীবন, সে স্নেহটী কি তোমার আছে?

হতভাগিনী উমা "না" কথাটী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কেবল মাথা নাড়িয়া সেই কথার উত্তর করিয়া মাথাটী আবার বিন্দুর বুকে লুকাইলেন।

বিন্দুর মুখ গম্ভীর হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "উমা, সে ধনটী হারালে ত চল্‌বে না, সে ধনটী রাখবার জন্যে কি তুমি বিশেষ চেষ্টা করেছিলে?"

উমা। ভগবান জানেন, আমার ভালবাসা কমেনি, তাঁকে এখনও চক্ষে দেখলে আমার শরীর জুড়ায়।

বিন্দু। উমা, তোমার ভালবাসা আমি জানি, তুমি পতিব্রতা, এ জীবনে তোমার ভালবাসা হ্রাস হবে ন। কিন্তু দেখ বোন, কেবল ভালবাসায় স্বামীর স্নেহ থাকে না, সংসারও চলে না। মেয়েমানুষের আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে, আমাদের আর কিছু শিখতে হয়।

উমা। বিন্দুদিদি, যিনি আমাদের খেতে পর্‌তে দেন, যিনি আমাদের প্রথম গুরু, তাঁকে ভালবাসা ছাড়া আর কি দিতে পারি? ভালবাসা ভিন্ন নারীর আর কি দেয় আছে?

বিন্দু। উমা, ভালবাসাই আমাদের প্রথম ধর্ম্ম, কিন্তু তা ভিন্ন আমাদের আরও কিছু শিখতে হয়। তা না হলে সংসার চলে না। যিনি আমাদের জন্য এত করেন, তাঁর মনটী সর্ব্বদা তুষ্ট রাখবার জন্যে, তাঁর গৃহটী সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখবার জন্যে আমরা যেন একটু যত্ন করতে শিখি। অনেক সময় একটী মিষ্ট কথায় ক্ষোভ নিবারণ হয়, একটী মিষ্ট কথায় ক্রোধ শান্তি হয়, আমাদের একটু যত্ন ও প্রফুল্লতায় সংসারটী প্রফুল্ল থাকে। সংসারের জ্বালা যদি একটু সহ্য কর্‌তে শিখি, ক্রোধ একটু সম্বরণ কর্‌তে শিখি, অভিমান একটু ত্যাগ করে ক্ষমাগুণ শিখি, তা হলে সংসারটী বজায় থাকে, না হলে জীবন তিক্ত হয়। উমা, আমি অনেক নির্দ্দোষ চরিত্র পুরুষ ও নির্দ্দোষ চরিত্রা নারী দেখেছি, তাদের ভালবাসারও অভাব নেই, তথাপি তাদের সংসার শ্মশানভূমি, জীবন তিক্ত। একটু ধৈর্য্য, একটু ক্ষমা সংসারের পথকে মসৃণ করে, সে গুণগুলির অভাবে উৎকৃষ্ট সংসারও কণ্টকময় হয়, তখন তাঁরা মনে করেন, পূর্ব্বে হতে একটু যত্ন কর্‌লে এ জীবনে কত সুখ হতে পারত। কিন্তু তখন অবসর চলে গেছে। প্রণয় একবার ধ্বংস হলে আর আসে না, জীবনের খেলা একবার সাঙ্গ হলে আর সে খেলা আরম্ভ কর্‌তে আমাদের অধিকার নেই।

উমা। বিন্দুদিদি, তোমারই কাছে বাল্যকালে এ কথাটী আমি শুনেছিলাম, তালপুকুরে তোমাদের দরিদ্র সংসার দেখে এ শিক্ষাটী আমি শিখেছি, ভগবান জানেন এতে আমার কোন ত্রুটি হয়নি। লোকে আমাকে ধনাভিমানিনী বল্‌ত, কিন্তু যিনি আমার গুরু, তিনিই আমাকে সর্ব্বদা মুক্তাহার ও হীরকাভরণ পর্‌তে দেখতে ভালবাসতেন, সেই জন্য আমি পর্‌তেম, এইমাত্র আমার অভিমান। লোকে আমাকে রূপাভিমানিনী বল্‌ত, কিন্তু দিদি, তুমি জান, সে রূপে স্বামী একদিন তুষ্ট ছিলেন, সেই জন্য আমার অভিমান, তাঁকে তুষ্ট রাখা ভিন্ন আমার জীবনের অন্য ইচ্ছে ছিল না। যখন কল্‌কেতায় এলেম, তখন আমি এই যত্ন দ্বিগুণ করলেম, কেননা আমি ভিন্ন এ বাড়ীতে আর মেয়েমানুষ ছিল না, আমি যদি একটু যত্ন না করি কে কর্‌বে বল?

বিন্দু। উমা, তুমি যে একটু করবে তা আমি জান্‌তেম, তোমাকে ছেলেবেলা থেকে আমি জান্‌তেম, অন্যে তোমাকে দোষ দিয়েছে, আমি দোষ দিইনি। ধৈর্য্য, ক্ষমা, একটু যত্ন-স্নেহ ও প্রফুল্লতাই আমাদের কর্ত্তব্য, এগুলি তুমি শিখেছ, সকলে শিখে না। পূর্ব্বকালে আমরা বড় বড় সংসারে বৌমানুষ হয়ে থাকতেম, শাশুড়ীর ভয়ে, ননদের ভয়ে, জায়ের ভয়ে, আমাদের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য অনেক চাপা পড়ত, আমরা মুখ বন্ধ করে থাক্‌তেম, শাশুড়ীর আদেশে সংসার চল্‌ত। এখন সবাই পৃথক্ পৃথক্ থাক্‌তে শিখেছে, ছেলেরাও যা ইচ্ছে করে, বৌয়েরাও আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলে যায়, সংসারসুখ অনায়াসে বিনষ্ট হয়।

উমা। বিন্দুদিদি, আমারও অনেক সময় মনে হয়, সকলে একত্রে থাক্‌বার প্রথাই ভাল ছিল, ছেলেরা শীঘ্র কুপথে যেতে পারত না, মেয়েরাও নম্রতা শিখত।

বিন্দু। উমা, সুখদুঃখ সকল প্রথাতেই আছে। কালীতারা বৃহৎ পরিবারে আছে, আহা! কালী কি সুখে আছে? একত্র বাস করবার কি এই সুখ?

উমা। কালীদিদির দুঃখের অন্য কারণ। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, সে চিরজীবন প্রণয়সুখে বঞ্চিত।

বিন্দু। আমি প্রণয়সুখের কথা বল্‌ছি না। প্রত্যহ সকাল থেকে দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত পথের মুটের চেয়েও খেটে খেটে যে সে রোগগ্রস্ত হয়েছে; সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে নির্দ্দোষে পথের কাঙ্গালী অপেক্ষাও গঞ্জনা ও গালি খায়, তার কারণ কি?

উমা। বিন্দুদিদি, কালীদিদির খুড়-শাশুড়ীরা মন্দ লোক, সেই জন্যে।

বিন্দু। তা বড় সংসারে সকলেই যে ভাল লোক হবে, তারই সম্ভাবনা কি? একজন মন্দ হলেই সংসার তিক্ত হয়, সমস্ত দিন খিটিমিটি ও কোন্দল; যে কালীতারার মত ভালমানুষ, তারই অধিক যাতনা। এই সব দেখেই, যাদের একটু টাকা হয়, তারা ভিন্ন থাকতে চায়, না হলে আপনার লোক কে ইচ্ছে করে ত্যাগ করে বসে। তা ভিন্ন থেকেও যদি আমাদের যার যেটুকু করা আবশ্যক তাই করি, শাশুড়ীর ভয়ে যেটুকু শিখতেম, সেইটুকু যদি নিজ বুদ্ধিতে শিখি, তাহলেও সংসারে অনেকটা সুখ থাকে। এখনকার মেয়েরা এটী বড় শিখে না, কালে বোধ হয় শিখবে।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে রাস্তায় জুড়ির শব্দ হইল, একখানি গাড়ী আসিয়া ফটকে দাঁড়াইল। উমা তাহার অর্থ বুঝিলেন, সুতরাং দেখিতে উঠিলেন না, বিন্দু গবাক্ষের নিকট যাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ধনঞ্জয়বাবু বাগান হইতে আসিলেন। তাঁহার বেশভূষা বিশৃঙ্খল, তিনি নিজে অচেতন, দুইজন ভৃত্য তাঁহাকে গাড়ী হইতে উপরে উঠাইয়া লইয়া গেল।

ঝর ঝর করিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে বিন্দু উমাকে দুই হস্তে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,—উমা, ভগবান জানেন নারীর যতদূর কষ্ট হয়, তুমি তা সহ্য ক'রছ, সেই কষ্টে উমা আর উমা নেই, বোধ হয় রাত জেগে, না খেয়ে, কেঁদে কেঁদে তোমার এই দশা হয়েছে, রোগও হয়েছে। কি কর্‌বে বোন, যেটী সইতে হয়, সয়ে থাক, যত্নের ত্রুটি করো না, অভিমানও দেখিও না, একটী উচ্চ কথা কহো না, তাহলে আরও মন্দ হবে, এ রোগের সে ঔষধ নয়। নীরবে এ যাতনা সহ্য কর, যখন অবকাশ পাবে, মিষ্ট কথায় ধনঞ্জয়বাবুকে তুষ্ট করো, কথায় বা ইঙ্গিতে তিরস্কার করো না, কাঁদতে হয় গোপনে কাঁদবে। যাদের নিয়ে ধনঞ্জয়বাবু এখন এত সুখ অনুভব করেন, হয়ত কাল তাদের উপর বিরক্ত হবেন। পরম অসদাচারীও অসদাচার পরিত্যাগ করে আবার পবিত্র স্নিগ্ধ সংসারসুখ খুঁজেছে, এমনও আমি দেখেছি। তোমার মাকে আমি অদ্যই চিঠি লিখব, ধৈর্য্য ধারণ করে আশায় ভর করে থাক, প্রাণের উমা, ভগবান এখনও তোমার কষ্ট মোচন করতে পারেন, তোমাকে সুখ দিতে পারেন।

দুই ভগিনীতে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। উমা বিন্দুর কথায় কোনও উত্তর দিলেন না, মনে মনে ভাবিলেন—ভগবান একটী সুখ আমাকে দিতে পারেন—মৃত্যু।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : আর একজন হতভাগিনী

বিন্দু বাটী আসিয়া পাল্কী হইতে না নামিতে নামিতে সুধা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল,—দিদি, দিদি, কে এসেছে দেখ্‌বে এস।

বিন্দু। কে লো?

সুধা। এই দেখ্‌বে এস না, এই শোবার ঘরে বসে আছে।

বিন্দু। কে, শরৎবাবু?

সুধা। না, শরৎবাবু নয়। দিদি, শরৎবাবু এখন আর আসেন না কেন?

বিন্দু। শরৎবাবুর কি পড়াশুনা নেই? তার পরীক্ষা আছে, সে কি রোজ আস্‌তে পারে?

সুধা। পরীক্ষা কবে দিদি?

বিন্দু। এই শীতকালে।

সুধা। তার পর আসবেন?

বিন্দু। আস্‌বে বৈ কি বোন, এখনও আস্‌বে। তবে রোজ রোজ কি আস্‌তে পারে, যে দিন অবকাশ পাবে, আস্‌বে। উপরে—কে বসে আছে?

সুধা। কে বল না?

বিন্দু। চন্দ্রনাথবাবুর স্ত্রী এসেছেন নাকি? তিনি ত মধ্যে মধ্যে আসেন, আর কে আসবে?

সুধা। না, তিনি নন।

বিন্দু। তবে বুঝি দেবীবাবুর স্ত্রী? এতদিন পর বুঝি তিনি একবার অনুগ্রহ করে পদধূলি দিলেন?

সুধা। না, তিনিও নন, কালীদিদি এসেছে।

বিন্দু। কালীতারা! তারা কল্‌কেতায় এসেছে? কৈ, কিছুই ত জানি না।

এই বলিতে বলিতে উপরে আসিয়া বিন্দু কালীতারাকে দেখিলেন; অনেক দিন পর তাহাকে দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন। বলিলেন,—এ কি, কালীতারা! কল্‌কেতায় কবে এলে? তোমরা সকলে ভাল আছ?

কালী। এই পাঁচ সাত দিন হল এসেছি, এতদিন কাজের ঝনঝটে আসতে পারিনি, আজ একবার মেজো খুড়ীকে অনেক করে বলে কয়ে এলেম। ভাল নেই।

বিন্দু। কেন, কারও ব্যারাম হয়েছে নাকি?

কালী। বাবুর বড় ব্যারাম, তারই চিকিৎসার জন্যে আমরা কল্‌কেতায় এসেছি। বর্দ্ধমানে এত চিকিৎসা করালেন, কিছুই হল না, এখন কল্‌কেতায় ইংরাজ ডাক্তার দেখ্‌ছেন, ভগবানের যা ইচ্ছে। এই বলিয়া কালীতারা রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু। সে কি? কি ব্যারাম?

কালী। জ্বর আর আমাশা। সে জ্বরও ছাড়ে না, সে আমাশাও বন্ধ হয় না, আহা! তাঁর শরীরখানি যে কাঠিপানা হয়ে গেছে! আবার চক্ষুতে বস্ত্র দিয়া কালীতারা ফোঁপাইতে লাগিলেন।

বিন্দু। তা কাঁদ কেন বোন, কাঁদ্‌লে আর কি হবে বল! এখন ভাল করে চিকিৎসা করাও। ব্যারাম হয়েছে, ভাল হয়ে যাবে। তা কবিরাজ দেখাচ্ছ না কেন? পুরাণ জ্বর আর আমাশায় কবিরাজ যেমন চিকিৎসা করে, ইংরেজ ডাক্তার তেমন কি পারে?

কালী। কবিরাজ দেখাতে কি বাকি রেখেছে বিন্দুদিদি, কবিরাজ হার মেনেছে, তবে ইংরেজ ডাক্তার ডেকেছে। বর্দ্ধমানে তিন মাস থেকে ভাল ভাল কবিরাজ দেখান হয়েছে, কল্‌কেতা থেকে ভাল ভাল কবিরাজ গিয়েছিল, কিছু কর্‌তে পার্‌লে না।

বিন্দু। তবে দেখ বোন, ইংরেজী চিকিৎসায় কি হয়। তোমরা আছ কোথায়?

কালী। কালীঘাটে একটী বাড়ী নিয়েছি, ঠিক আদিগঙ্গার কিনারায়।

বিন্দু। কালীঘাটে কেন? এই বর্ষাকালে কালীঘাটে শুনেছি অনেক ব্যারাম হচ্চে, সেখানে না থেকে একটু ফাঁকা জায়গায় রইলে না কেন?

কালী। তাও কি হয় দিদি? ও'রা কল্‌কেতায় আসতে চান না, বলেন এখানে বাছবিচার নেই, এখানে জাত থাকে না। শেষে কত করে কালীঘাটের একজন পাণ্ডাকে দিয়ে একটী বাড়ী ঠিক করে তবে আমরা এলেম। রোজ আদিগঙ্গায় আমাদের স্নান হয়, রোজ পূজো দেওয়া হয়। কত ক্রিয়াকর্ম্ম, ঠাকুরকে কত মানত করা হয়েছে, আমার শাশুড়ীরা জোড়া মহিষ মেনেছেন, আমার কি আছে বিন্দুদিদি, আমার রূপার গোট ছড়াটী বেচে জোড়া পাঁঠা দেব মেনেছি। আহা ঠাকুর যদি রক্ষা করেন, বাবুকে যদি এ যাত্রা বাঁচান, তবেই আমরা বাঁচলেম, নৈলে আমাদের এত বড় সংসার ছারখার হয়ে যাবে। আমাদের মান বল, ধন বল, বিষয় বল, খ্যাতি বল, কুলের গৌরব বল, বাবুর হাতেই সব; তিনিই সকলের মাথা, তিনি একাই সব কর্‌ছেন কর্ম্মাচ্ছেন, তিনিই সব চালিয়ে নিচ্ছেন। তিনি না থাক্‌লে কে আছে বল? ভগবান! এ কাঙ্গালিনীকে চির হতভাগিনী করো না।

আজীবন যে স্বামীর প্রণয়সুখ কখনও ভোগ করে নাই, প্রণয়সুখ কাহাকে বলে জানিত না, আজি সে স্বামী-বিয়োগ-চিন্তার যাতনায় ধূলায় লুণ্ঠিত হইল!

বিন্দু কালীকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন, "ভয় কি বোন, চিকিৎসা হচ্ছে তবে আর ভয় কি? আমাদের বাবু আছেন, তোমার ভাই শরৎবাবু আছেন, সকলে দেখবে শুন্‌বে, পীড়া শীঘ্র আরাম হবে। এই সুধার এমন ব্যারাম হয়েছিল, শরৎবাবু কত যত্ন কর্‌লেন, দিনরাত্রি খাওয়া ঘুম ছেড়ে সেবা কর্‌লেন, তাই রক্ষা, না হলে কি সুধা বাঁচত?

কালী। বিন্দুদিদি, শরৎ রোজ এখানে আসে?

বিন্দু। আগে আস্‌ত বোন, এখন তার পরীক্ষা কাছে, তাই আসতে পারে না; বাবুই বুঝি তাকে একটু ভাল করে লেখাপড়া কর্‌তে বলেছেন; প্রায় একমাস অবধি আসেনি।

কালী। বিন্দুদিদি, মধ্যে মধ্যে তাকে আস্‌তে বলো, এখানে মধ্যে মধ্যে এসে গল্পসল্প কর্‌লে থাক্‌বে ভাল, আহা দিনরাত পড়ে শরতের চেহারা কালী হয়ে গেছে, চক্ষু বসে গেছে। কাল সে এসেছিল. হঠাৎ চেনা যায় না।

বিন্দু। সে কি কালী, তা ত আমরা কিছু জানি না। এখানে যখন আস্‌ত, তখন বেশ চেহারা ছিল, এর মধ্যে এমন হয়ে গেছে? এমন করেও পড়ে? না হয় পরীক্ষা নাই হল, তা বলে কি পড়ে ব্যারাম কর্‌বে?" আমি বাবুকে বলব এখন, শরৎবাবুকে একদিন ডেকে আন্‌বেন, মধ্যে মধ্যে শনিবার কি রবিবার এখানেই না হয় থাক্‌লো।

তাহার পর উমাতারার কথা হইল; বিন্দু যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, অনেক আক্ষেপ করিয়া কালীকে তাহা শুনাইলেন, কালীও খানিক কাঁদিলেন। বিন্দু শেষে বলিলেন,—আমি আজই জ্যেঠাইমাকে চিঠি লিখব, জ্যেঠাইমা আসুন, যা করবার করুন, আমি আর এ কষ্ট দেখতে পারি না। কল্‌কেতা ছাড়তে পারলে বাঁচি, আবার তালপুকুরে যেতে পারলে বাঁচি।

কালী। তোমাদের এই ভাদ্র মাসে যাবার কথা ছিল না? ভাদ্র মাস ত প্রায় শেষ হল।

বিন্দু। কথা ত ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল কৈ? আবার উমাতারার এই রোগ, তোমাদের বাড়ীতে রোগ, এ সব রেখে ত যেতে পারিনি? পূজার পর না হলে আমাদের যাওয়া হচ্ছে না, পূজারও বড় দেরী নেই, মাস খানেকও নেই।

কালী। তবে তোমাদের ধানটান দেখবে কে?

বিন্দু। বাবু সনাতনকে জমী ভাগে দিয়ে এসেছেন। সনাতনই আমাদের পুরাতন লোক, আমাদের অংশ গোলায় বন্ধ করে রাখবে, তার কোনও ভাবনা নেই।

আর কতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কালীতারা চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিলেন। বিন্দু কিছু জলখাবার আনিয়া দিলেন, এবং উভয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

হেম। এদিকে উমাতারার রোগ ও দুর্দ্দশা, ওদিকে কালীতারার স্বামীর উৎকট পীড়া, আবার তুমি বলছ শরৎও নাকি ছেলেমানুষের মত শরীরের যত্ন না নিয়ে পড়াশুনা কর্‌ছে। এখন কোন্ দিক সামলাই? উপায় কি? বিপদে তুমিই মন্ত্রী, এর উপায় কি ঠিক করেছ?

বিন্দু। ললাটের লিখন রাজার সৈন্যেও ফিরায় না, মন্ত্রীর মন্ত্রণায়ও ফিরায় না। তবে আমাদের যা সাধ্য তা কর্‌ব।

হেম। তবু কি ঠিক কর্‌লে? উমাকে কি বলে এলে?

বিন্দু। কি আর বল্‌ব? আমার ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে, তাই দিয়ে এলেম, এখনকার চঞ্চলমতি স্বামীকে বশ কর্‌বার যে মন্ত্রটী জানি, তাই শিখিয়ে এলেম।

হেম। সে ভীষণ মন্ত্রটী কি, জানতে পারি কি?

বিন্দু। জান্‌বে না কেন? উমার বাড়ীতে বড় একটী কাঁঠালগাছ আছে; তারই ডাল নিয়ে প্রকাণ্ড একটী মুগুর প্রস্তুত করে বিপথগামী স্বামীকে তদ্দ্বারা বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া। এই মহামন্ত্র!

হেম। না, বৃহস্পতির এরূপ মন্ত্র নয়।

বিন্দু। তবে কিরূপ?

হেম। কাঁচা আঁবের অম্বল রেঁধে দেওয়া, পাকা আঁবের সুমিষ্ট রস করে দেওয়া, বৃহস্পতির মন্ত্রের এইরূপ কয়েকটী সাধন দেখেছি, আর বেশী বড় জানি না।

বিন্দু। তবে তাই শিখিয়ে এসেছি। আর জ্যেঠাইমাকে পত্র লিখব, তিনি এলে বোধ হয় উমার মনও একটু ভাল হবে, ধনঞ্জয়বাবুও লজ্জার খাতিরে কয়েক মাস একটু সাবধানে থাক্‌বেন।

হেম। জ্যেঠাইমা জামাইয়ের বাড়ীতে আস্‌বেন কেন?

বিন্দু। আমি সব কথা লিখলে আস্‌বেন। হাজার হোক মার মন।

হেম। আর কালীতারার কি উপায় কর্‌লে?

বিন্দু। সেটী তোমাকে দেখতে হবে। তোমার চাকরীটাকরী ত বিলক্ষণ হল, এখন প্রত্যহ একবার করে কালীঘাটে গিয়ে রোগীর যত্ন কর্‌তে হবে। সে বাড়ীতে মানুষের মত মানুষ একজনও নেই, হয়ত ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদগুলো খাইয়ে রোগীর রোগ আরও উৎকট কর্‌বে। চিকিৎসাটী যাতে ভাল করে হয়, তুমি দেখো।

হেম। তা আমার যা সাধ্য করব। কাল প্রত্যুষেই সেখানে যাব। আর শরতের কি বন্দোবস্ত কর্‌লে? তুমি রইলে একদিকে, আমি রইলেম আর একদিকে, শরৎবাবুকে একটু দেখেশুনে কে?

বিন্দু। তাই ত, সে পাগলা ছেলেটার কথা কৈ আমি ভাবিনি। ওলো সুধা, তুই একটু শরৎবাবুর যত্নটত্ন কর্‌তে পার্‌বি? নৈলে ত সে পড়ে পড়ে সারা হল।

সুধা দূরে খেলা করিতেছিল, দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "দিদি ডাকছিলে?"

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হাঁ বোন, ডাকছিলেম। বলি তুমি শরৎবাবুর একটু যত্ন কর্‌তে পার্‌বে?

বালিকার কণ্ঠ হইতে ললাট প্রদেশ পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইল। সে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : শারদীয়া পূজা

আশ্বিনে অম্বিকাপূজার সময় আগত হইতে লাগিল। ছেলেপুলের বড় আমোদ। নূতন কাপড় হইবে, নূতন জুতা হইবে, নূতন পোষাক বা টুপি হইবে, ইস্কুলের ছুটি হইবে, পূজার সময় যাত্রা হইবে, ভাসানের দিন গাড়ী করিয়া ভাসান দেখিতে যাইবে। বালকবৃন্দ আহ্লাদে আটখানা।

গৃহস্থগৃহিণীদিগের ত আনন্দের সীমা নাই। কেহ বড় তত্ত্বের আয়োজন করিতেছেন, নূতন জামাইকে ভাল রকম তত্ত্ব করিয়া বেয়ানের মন রাখিবেন। কেহ বড় তত্ত্ব প্রত্যাশা করিতেছেন, পাসকরা ছেলের বিবাহ দিয়া অনেক অর্থ লাভ করিয়াছেন, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন খারাপ হইয়াছিল বলিয়া তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বেয়ানের গোট বেচাইয়া ভাল ঘড়ী আদায় করিয়াছেন, আবার অপরাহ্নে ছাদে পা মেলাইয়া বসিয়া বুদ্ধিমতী পড়শী-গৃহিণীদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, "এবার দেখব বেয়ান কেমন তত্ত্ব করে, তত্ত্বের মত তত্ত্ব না করে, লাথি মেরে ফেলে দেব। বিয়ের সময় বড় ফাঁকি দিয়েছে, এবার দেখব কে ফাঁকি দেয়। আমার ছেলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে, এমন ছেলে কল্‌কেতায় কটা আছে? মিনষের যেমন বাহাত্তুরে ধরেছে, এমন ছেলেরও এমন ঘরে বিয়ে দেয়। তা দেখব, দেখব, তত্ত্বের সময় কড়াগণ্ডা বুঝে নেব, নৈলে আমি কায়েতের মেয়ে নই।" রোরুদ্যমানা বালবধূ বাপের বাড়ী যাইবার জন্য তিন মাস হইতে বৃথা ক্রন্দন করিতেছে, গৃহিণী তত্ত্বটী না দেখিয়া বৌ পাঠাইবেন না।

সামান্য ঘরের যুবতীগণও দিন গণিতেছে, স্বামী বিদেশে চাকরী করেন, পূজার সময় অনেক কষ্টে ছুটি পাইয়া একবার ভার্য্যার মুখ দর্শন করেন। এবার কি তিনি আসিবেন? সাহেব কি এবার ছুটি দিবেন? হ্যাঁ গা, সাহেবদের কি একটু দয়া মমতা নাই? তাঁদেরও কি স্ত্রী পরিবারের জন্য একটু মন কেমন করে না?

বাবু মহলেও আনন্দের সীমা নাই। কাহারও বজরা ভাড়া হইতেছে, নাচ গানের ভাল রকম আয়োজন হইতেছে, আর কত কি আয়োজন হইতেছে, আমরা তাহা কিরূপে জানিব? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?

পল্লীগ্রামেও আনন্দের সীমা নাই। মাতা বসুমতীর অনুগ্রহ অপার, কৃষকগণ ভাদ্র মাসে শস্য কাটিয়া জমীদারের খাজনা দিতেছে, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেছে, বৎসরের মধ্যে এক মাস বা দুই মাসের জন্য গৃহে একটু ধান জমাইতেছে। কৃষকবধূগণ গোপনে চোরের মত সেই ধান একটু সরাইয়া হাতের দুগাছী শাঁকা করিতেছে, বা হাটে একখানি নূতন কাপড় কিনিতেছে। বর্ষার পর সুন্দর বঙ্গদেশ যেন স্নাত হইয়া সুন্দর হরিদ্বর্ণ বেশ ধারণ করিল; আকাশ মেঘরূপ কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া শরতের আহ্লাদকর জ্যোৎস্না বর্ষণ করিতে লাগিল, বায়ু নির্ম্মল হইল, বড় গরম নহে, বড় শীতল নহে, মনুষ্যশরীরের সুখ বর্দ্ধন করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। গৃহস্থের ঘরও ধনধান্যে পূর্ণ হইল, গৃহস্থের মন একটু আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চালে নূতন খড় দিয়া ছাউনি বাঁধা হইল। বঙ্গদেশে শারদীয়া পূজার যে এত ধুমধাম, তাহার এই কারণ, অন্য কারণ আমরা জানি না।

কিন্তু আনন্দময় শরৎকাল সকলের পক্ষে সুখের সময় নহে। দরিদ্রের দুঃখ অপনীত হয়, কিন্তু শোকার্ত্তের শোক অপনীত হয় না। উমাতারার মাতা কলিকাতায় আসিলেন। বিন্দু বার বার উমাকে দেখিতে যাইতেন, কিন্তু উমার রোগের শান্তি হইল না। ধনঞ্জয়বাবু দিন কতক একটু অপ্রতিভের ন্যায় বোধ করিলেন, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস তাঁহার চরিত্রে গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অপনীত হইল না, তিনি বাড়ীর ভিতর আসা বন্ধ করিলেন, বাহিরেই আহারাদি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। উমার মাতা পুনরায় পল্লীগ্রামে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিন দিন কন্যার অবস্থা দেখিয়া সহসা কলিকাতা ত্যাগ করিতেও

পারিলেন না; হতভাগিনী উমা আরও ক্ষীণ হইতে লাগিল; বর্ষাশেষে তাহার কাশি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; মুখখানি অতিশয় শুষ্ক, চক্ষু দুটী কোটরপ্রবিষ্ট। কাহাকেও তিরস্কার না করিয়া, আপনার মন্দ ভাগ্যের কথা না কহিয়া, সে দিনে দিনে ধীরে ধীরে আপনার গৃহকার্য্য করিত, বিন্দুর সঙ্গে আলাপ করিত, মাতার সেবা-শুশ্রূষা করিত, স্বামীর জন্য নানারূপ ব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিত।

হেমের যত্নে কালীতারার স্বামীর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু আরোগ্য হইল না। সে বয়সে পুরাতন রোগ শীঘ্র যায় না, তাহার উপর বৃহৎ সংসারের নানারূপ উপদ্রব, কালীঘাটের পান্ডাদিগের নানারূপ উপদ্রব। অনেক যত্নে যেটুকু ভাল হয়, একদিন অনিয়মে সেটুকু আবার মন্দ হয়, হেমচন্দ্র পীড়ার আরোগ্যের বড় আশা করিতে পারিলেন না।

বিন্দু মধ্যে মধ্যে শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, শরৎ আসিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার পড়াশুনার বড় ধুম, এখন ভাল করিয়া না পড়িলে পরীক্ষা দিবে কিরূপে? বিন্দুও বড় জেদ করিতেন না, কেবল প্রত্যহ কোনও নূতন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া কি ফল ছাড়াইয়া পাঠাইয়া দিতেন। সুধা যত্ন সহকারে মিছরীর পানা প্রস্তুত করিত, আক পেঁপে ছাড়াইয়া দিত, মুগের ডাল ভিজাইয়া দিত, প্রত্যহ অপরাহ্নে নিজ হস্তে রেকাবি সাজাইয়া ঝিয়ের দ্বারা শরতের বাটীতে পাঠাইয়া দিত। শরৎ অনেক বারণ করিয়া পাঠাইত, কিন্তু ছেলেটী কিছু পেটুক, সেই মুগের ডালগুলির নিদর্শন রেকাবিতে অধিকক্ষণ থাকিত না, একবার চুমুক দিতে আরম্ভ করিলে সে মিছরীর পানা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইত। ঝিকে বলিত, “ঝি, কাল থেকে আর এনো না, তাঁরা কেন রোজ রোজ কষ্ট করে প্রস্তুত করেন, আমি সত্য বল্‌ছি, আমার এ সব দরকার নেই।” ঝি খালি পাত্রগুলি হাতে লইয়া “তা দেখতেই পাচ্ছি” বলিয়া প্রস্থান করিত। বলা বাহুল্য যে, পেটুক বালকের কথায় মানা করা না শুনিয়া সুধা প্রত্যহ মিছরীর পানা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইত।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শেষে পূজা আসিয়া পড়িল। দেবীবাবুর বাড়ীতে বড় ধুমধাম, দেবীর বৃহৎ মূর্ত্তি, অনেক গাওনা বাজনা, তিন রাত্রি যাত্রা। দেবীবাবুর গৃহিণীর বুকের বেদনাটা সেই সময় বোধ হয় একটু কমিয়াছিল, কেননা তিনি তিন রাত্রি ধরিয়া সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত বারান্ডায় চিক ফেলিয়া ঠায় বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। কবিরাজ গৃহিণীর মতলব বুঝিয়া একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—হাঁ, তাতে হানি কি? যে তেলটা দিয়েছি সেটা যেন ভাল করে মালিস করা হয়।

দেবীবাবুর গৃহিণীর উপরোধে চন্দ্রনাথবাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য ভদ্র-গৃহিণীগণ আসিয়া যাত্রা শুনিল। নিতান্ত অনভিলাষও নাই। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা, রাধিকার মানভঞ্জন, গানগুলি বাছা বাছা, ভাবই কত, অর্থই কত! গৃহিণীগণ রোরুদ্যমান গন্ডা গন্ডা ছেলেগুলাকে থাবড়া মারিয়া ঘুম পাড়াইয়া একাগ্রচিত্তে সেই গীতরস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিদেশিনীর প্রতি রাধিকার স্তুতি শুনিয়া বৃদ্ধাগণ ভাবে গদগদ চিত্তে সুর তুলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বিন্দুও কি করেন, একদিন ছেলে দুটীকে সুধার কাছে রাখিয়া গিয়া যাত্রা শুনিয়া আসিলেন। সকালে আসিয়া বলিলেন,—মানভঞ্জন বড় মন্দ হয়নি, তুমি একদিন গিয়ে শুনে এস না।

হেম। না, মানভঞ্জন প্রথা তোমার কাছেই ছেলেবেলা অনেক শিখেছি, যাত্রায় আর কি শিখব?

বিন্দু স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—মিথ্যা কথাগুলো আর বলো না, পাপ হবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ : বিজয়া দশমী

আজি মহা কোলাহলে ভাসান হইয়া গিয়াছে; মহানগরীর পথেঘাটে বাটীতে বাটীতে আনন্দধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে, বাদ্য ও গীতধ্বনি শব্দিত হইয়াছে। রাজপথে আবালবৃদ্ধবনিতা, কি ইতর, কি ভদ্র, কি শিশু, কি যুবা, সকলেই নদীর স্রোতের ন্যায় গমনাগমন করিয়াছে; নিতান্ত দরিদ্রও একখানি নূতন বস্ত্র পরিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছে। দেবীর উৎসবধ্বনি অদ্য এই মহানগরীকে পুলকিত ও কম্পিত করিয়া ক্রমে নিস্তব্ধ হইল।

তাহার পর ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, বন্ধু বন্ধুর সহিত, পুত্র মাতার নিকট, সকলে প্রণাম বা নমস্কার, আশীর্ব্বাদ বা আলিঙ্গন দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করিল। বোধ হইল যেন, জগতে আজি বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, যেন শত্রু শত্রুকে ক্ষমা করিল, অপরাধগ্রস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করিল। মনুষ্য-হৃদয়ের সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাইল, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও বাৎসল্য অদ্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে উথলিতে লাগিল। শরতের সুন্দর জ্যোৎস্নাতে রাজপথে আনন্দের লহরী, সৌজন্যের লহরী, ভালবাসার লহরী বহিতে লাগিল। সংসারের লীলাখেলা দেখিতে দেখিতে আমরা অনেক শোকের বিষয়, অনেক দুঃখের বিষয়, অনেক পাপ ও প্রবঞ্চনার বিষয় দেখিয়াছি—নিষ্ঠুর লেখনীতে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অদ্য এই পুণ্য রজনীতে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া এই সুখলহরী দেখিলাম, হৃদয় তুষ্ট হইল, শরীর পুলকিত হইল। রজনীতে যদি কোন অপবিত্রতা থাকে, কোনও পাপাচরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার উপর যবনিকা পাতিত কর, সেগুলি আজ দেখিতে চাহি না।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিন্দু রান্নাঘরে ভাত খাইয়া উঠিলেন। ছেলে দুইটী ঘুমাইয়াছে, সুধা ঘুমাইয়াছে, হেমবাবুও শুইয়াছেন, ঝিও বাড়ী গিয়াছে, বিন্দু সদর দরজায় খিল দিয়া নীচে একাকী ভাত খাইলেন ও উঠিয়া আচমন করিলেন। এমন সময়ে কপাটে একটা শব্দ শুনিলেন, কে যেন আস্তে আস্তে ঘা মারিল।

এত রাত্রিতে কে আসিয়াছে? বিন্দু একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আবার শব্দ হইল।

কে গা? দরজায় কে দাঁড়িয়ে গা? কোনও উত্তর আসিল না, আবার শব্দ হইল।

বিন্দু কি উপরে গিয়া হেমকে উঠাইবেন? হেম আজ অনেক হাঁটিয়াছেন, অতিশয় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। বিন্দু সাহসে ভর করিয়া আপনি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। লোকটীকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, পরমুহূর্ত্তেই চিনিলেন, শরচ্চন্দ্র!

কিন্তু এই কি শরচ্চন্দ্রের রূপ? বড় বড় লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল আসিয়া কপালে ও চক্ষুতে পড়িয়াছে, চক্ষু দুটী কোটরপ্রবিষ্ট, কিন্তু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, মুখ অতিশয় শুষ্ক ও অতিশয় গম্ভীর, শরীরখানি শীর্ণ হইয়াছে, একখানি ময়লা একলাই মাত্র উত্তরীয়। উভয়ে ভিতরে আসিলেন, শরৎ বলিলেন,—বিন্দুদিদি, অনেকদিন আস্‌তে পারিনি, কিছু মনে করো না, আজ বিজয়ার দিন প্রণাম করতে এলেম।

বিন্দু। শরৎবাবু, বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও, তোমার বে থা হক, সুখে সংসার কর, এইটী যেন চক্ষে দেখে যাই, ভাইকে আর কি আশীর্ব্বাদ কর্‌ব?

বিন্দুর স্নেহ-গর্ভ বচনে শরতের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, শরৎ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, বিন্দুর পা দুটী ধরিয়া প্রণাম করিলেন। বিন্দু অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, পরে বলিলেন,—শরৎবাবু, তুমি অনেকদিন এখানে এসনি, তাতে এসে যায় না, প্রত্যহ তোমার খবর পেতেম, জান্‌তেম আমাদের কোনও বিপদ্ আপদ হলেই তুমি আসবে। কিন্তু অমন করে কি লেখাপড়া করে? লেখাপড়া আগে না শরীর আগে? আহা তোমার চক্ষু দুটী বসে গেছে, মুখখানি শুকিয়ে গেছে, শরীর জীর্ণ হয়েছে, এমন করে কি দিনরাত জেগে পড়ে? শরৎবাবু, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমাকে কি বুঝাতে হয়? তোমার বিন্দুদিদির কথাটী রেখো, রাত্রিতে ভাল করে ঘুমিও, দিনে সময়ে আহার করিও, তোমার মত ছেলে পরীক্ষায় অবশ্য উত্তীর্ণ হবে।

শরতের শুষ্ক ওষ্ঠে একটু হাসি দেখা গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—বিন্দুদিদি, পরীক্ষা দিতে পার্‌লে কি জীবনের সুখবৃদ্ধি হয়? হেমবাবু পরীক্ষা বড় দেন নাই, হেমবাবুর মত সুখী লোক জগতে কয়জন আছে?

বিন্দু। তবে পরীক্ষার জন্যে এত চিন্তা কেন? শরীর মাটি করছ্ কেন?

শরৎ। পরীক্ষার জন্যে এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করি না।

বিন্দু। তবে কিসের চিন্তা?

শরৎ উত্তর দিল না, বিন্দুকে রকের উপরে বসাইল, আপনি নিকটে বসিল, বিন্দুর দুই হাত আপন হস্তে ধারণ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল, ধীরে ধীরে বড় বড় অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া বিন্দুর হাতে পড়িতে লাগিল।

বিন্দু। এ কি শরৎবাবু! কাঁদছ কেন? ছি, তোমার কোনও কষ্ট হয়েছে? মনে কোন যাতনা হয়েছে? তা আমাকে বল্‌ছ না কেন? শরৎবাবু, ছেলেবেলা থেকে তোমার মনের কোন্ কথাটী বলনি, আমি কোন্ কথাটী তোমার কাছে লুকিয়েছি? এত দিনের স্নেহ কি আজ ভুল্‌লে, তোমার বিন্দুদিদিকে কি পর মনে করলে?

শরৎ। বিন্দুদিদি, যেদিন তোমাকে পর মনে কর্‌ব সেদিন এ জগতে আমার আপনার কেউ থাকবে না। আমার মনের যাতনা তোমার নিকট লুকাব না, আমি হতভাগা, আমি পাপিষ্ঠ।

বিন্দু দেখিলেন, শরতের দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে, বিন্দু একটু উদ্বিগ্ন হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—শরৎবাবু, তোমার মনের কথা আমাকে বল, সঙ্কোচ করো না।

শরৎ। আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করো না। বিন্দুদিদি, আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, আমার মন পাপচিন্তায় কৃষ্ণবর্ণ। বন্ধুর গৃহে এসে আমি অসদাচরণ করেছি, ভগিনীর প্রণয়ের বিষময় প্রতিদান করেছি। বিন্দুদিদি, আমার হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করো না, আমার হৃদয় ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত!

শরৎ বিন্দুর হাত দুটী ছাড়িয়া দিয়া দুই হস্তে বিন্দুর দুই বাহুদেশ ধরিলেন, এত বলের সহিত ধরিলেন যে বিন্দুর সেই দুর্ব্বল কোমল বাহু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। শরতের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছে।

বিন্দু শরৎকে এরূপ কখনও দেখেন নাই, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, ভয় হইল। সেই আদর্শচরিত্র ভ্রাতৃসম শরৎ কি মনে কোনও পাপচিন্তা ধারণ করে? তাহা বিন্দুর স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু অদ্য এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে সেই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবককে দেখিয়া সেই নিরাশ্রয় রমণীর একটু ভয় হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি বিন্দু সে ভয় গোপন করিয়া স্পষ্টস্বরে বলিলেন,—শরৎবাবু, তোমাকে বাল্যকাল হতে আমি ভাই বলে জানি, তুমি আমাকে দিদি বলে ডাকতে; দিদির কাছে ভ্রাতা যা বল্‌তে পারে, নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তা বল।

শরৎ। আমি যে অসদাচরণ করেছি, যে পাপচিন্তা মনে ধারণ করেছি, তা ভগিনীর কাছে বলা যায় না, আমি মহাপাপী।

বিন্দু সরোষে বলিলেন,—তবে আমার কাছে সে কথা বল্‌বার আবশ্যক নেই, আমাকে ছেড়ে দাও, ভগিনীকে সম্মান করো।

শরৎ বিন্দুর বাহুদ্বয় ছাড়িয়া দিলেন, আপনার মুখখানি বিন্দুর কোলে লুকাইলেন, বালকের ন্যায় অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শিশুর ন্যায় যাহার নির্ম্মল আচরণ, শিশুর ন্যায় যে পদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছে, সে কি পাপচিন্তা করিতে পারে? ধীরে ধীরে শরতের মুখখানি তুলিলেন, ধীরে ধীরে আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়নবারি মুছাইয়া দিলেন, পরে আস্তে আস্তে বলিলেন,—শরৎ, তোমার হৃদয়ে এমন চিন্তা উঠ্‌তে পারে না, যা আমার শুনবার অযোগ্য। তোমার যা বলবার বল, আমি শুনছি।

শরৎ। জগদীশ্বর তোমার এই দয়ার জন্যে তোমাকে সুখী করুন। বিন্দুদিদি, আর একটী অভয়দান কর, যদি আমার প্রার্থনা বিফল হয়, প্রতিজ্ঞা কর, তুমি এ কথাটী কাকেও বল্‌বে না? আমার পাপচিন্তা আমার জীবনের সহিত শীঘ্র লীন হবে, জগতে যেন সে কথা প্রকাশ না হয়।

বিন্দু। তাই অঙ্গীকার করলেম।

শরৎ তখন মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিলেন, দুই হস্ত দ্বারা হৃদয়ের উদ্বেগ যেন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর আবার বিন্দুর হাত দুটী ধরিয়া, তাঁহার চরণ পর্য্যন্ত মাথা নামাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "পুণ্যহৃদয়া, সরলা বিধবা সুধার সহিত আমার বিবাহ দাও।" বিন্দু তখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ছয় মাসের সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

শরৎ তখন ক্লিষ্টস্বরে বলিতে লাগিল,—বিন্দুদিদি, আমি মহাপাপী। ছমাস হল, যেদিন সুধাকে তালপুকুরে দেখলেম, সেইদিন আমার মন বিচলিত হল। পুস্তক পাঠ ভিন্ন অন্য ব্যবসা আমি জানতেন না, পুস্তকে ভিন্ন প্রণয় আমি জানতেম না, সেদিন সেই সরলহৃদয়া, স্বর্গের লাবণ্যে বিভূষিতা, ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকাকে দেখে আমি হৃদয়ে অননুভূত ভাব অনুভব

কর্লেম। কালে সেটী তিরোহিত হবে আশা করেছিলেম, কিন্তু দিন দিন কল্কেতায় বিষ পান কর্তে লাগলেম, আমার শরীর, মন, আত্মা জর্জ্জরিত হল। বিন্দুদিদি, তুমি সরল হৃদয়ে আমাকে প্রত্যহ তোমার বাটীতে আস্তে দিতে, হেমবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করে আমাকে আসতে দিতেন, আমি হৃদয়ে কালকূট ধারণ করে, পাপচিন্তা ধারণ করে, দিনে দিনে এই পবিত্র সংসারে আস্তেম। জগদীশ্বর এ মহাপাপ, এ মহা প্রতারণা কি ক্ষমা করবেন? বিন্দুদিদি, তুমি কি ক্ষমা কর্বে? সুধার পীড়ার পর যখন প্রত্যহ তাকে সান্ত্বনা কর্তে আসতেম, অনেকক্ষণ বসে দুইজনে গল্প কর্তেম, অথবা আকাশের তারা গণতেম, তখন আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে যে কি পাপচিন্তা কর্তেম, বিন্দুদিদি, তোমাকে কি বলব! আমার বিবাহ হবে, একটী সংসার হবে, লাবণ্যময়ী সুধা সে সংসারে রাজ্ঞী হবে, আমার জীবন সুধাময় কর্বে, এই চিন্তা আমাকে পূর্ণ করত, এই চিন্তা আকাশের নক্ষত্রে পাঠ কর্তেম, এই চিন্তা বায়ুর শব্দে শ্রবণ কর্তেম। প্রত্যহ আস্তে আস্তে আমি প্রায় জ্ঞানশূন্য হতেম, তখন হেমবাবু আমার পাঠের ব্যাঘাত হচ্ছে বলে একদিন কয়েকটী উপদেশ দিলেন। তখন আমার জ্ঞান হইল, পাঠ্য পুস্তক ও পরীক্ষা চিতার আগুনে দগ্ধ হক, কিন্তু যে উৎকট বিপদে আমি পড়েছি, পাছে সরলচিত্তা সুধা সেই বিপদে পড়ে, এই ভয় সহসা আমার হৃদয়ে জাগরিত হল, আমি সেই অবধি এ পুণ্য-সংসার ত্যাগ কর্লেম। সুধাকে না দেখে আমিও তার চিন্তা ভুলব মনে করেছিলেম, কিন্তু সে বৃথা আশা! বিন্দুদিদি, সে পাপ চিন্তা ভুলবার জন্যে আমি দুই মাস অবধি প্রাণপণে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা নদীর স্রোত হস্ত দ্বারা রোধ কর্বার চেষ্টার ন্যায়! আমি পাঠে মন রত কর্তে চেষ্টা করেছি, নাট্যশালায় গিয়ে সে চিন্তা ভুল্তে চেষ্টা করেছি, আমার সহপাঠীদিগের সহিত মিশেছি, গীতবাদ্য শুন্তে গিয়েছি, কিন্তু সে কালচিন্তা ভুল্তে পারিনি। ঘরের দেয়ালে, নৈশ আকাশে, আমার পুস্তকের পংক্তিতে পংক্তিতে, নাট্যশালার নাট্যাভিনয়ে, সেই অনিন্দনীয় মুখমণ্ডল দেখতেম, রাত্রিতে সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখতেম। বিন্দুদিদি, এ দুই মাসের কথা আর বল্ব না, পথের কাঙ্গালীও আমা অপেক্ষা সুখী।

বিন্দুদিদি, আমার মনের কথা তোমাকে বল্লেম, আমাকে ঘৃণা করো না, আমাকে মহাপাপী বলে দূর করে দিও না। আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু তুমি ঘৃণা কর্লে এ জগতে কে আমাকে একটু স্নেহ কর্বে, কে আমাকে স্থান দেবে? আবার শরতের শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া নয়নবারি বহিতে লাগিল।

বিন্দু স্থির হইয়া কথাগুলি শুনিলেন, কি উত্তর দিবেন? শরতের প্রস্তাব পাগলের প্রস্তাব, কিন্তু সে কথা বলিলে হয়ত এই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবক আজই আত্মঘাতী হইবে। বিন্দু ধীরে ধীরে শরতের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—ছি শরৎবাবু, আপনাকে এমন করে ক্লেশ দিও না, আপনাকে ধিক্কার করো না। তোমাকে ছেলেবেলা থেকে আমি ভাইয়ের মত মনে করি, তোমাকে কি আমি ঘৃণা করতে পারি? এতে ঘৃণার কথা ত কিছুই নেই, কেন আপনাকে মহাপাপী বলে ধিক্কার করছ? তবে বিধবা বিবাহ আমাদের সমাজে চলন নেই, তা এরূপ বিবাহ হয় কি না বাবুকে জিজ্ঞাসা করব, যা হয় তিনি ব্যবস্থা করবেন। তা তুমি আপনাকে এরূপ ক্লেশ দিও না, তোমার এ কথায় বাবুর যাই মত হক না কেন, তোমার প্রতি আমাদের স্নেহ এ জীবনে তিরোহিত হবে না।

শরৎ। বিন্দুদিদি, তোমার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, তুমি আমাকে যে এই দয়া কর্লে, আমাকে যে আজ ঘৃণা করে তাড়িয়ে দিলে না, এ দয়া আমি জীবন থাক্তে বিস্মৃত হব না।

বিন্দু। শরৎবাবু, তোমার বোধ হয় আজ রাত্রিতে এখনও খাওয়াদাওয়া হয়নি, কিছু খাবে? একটু মুখটুক ধোও না? বাবুর জন্যে আজ লুচি করেছিলেম, তার খান কত আছে। একটী সন্দেশ দিয়ে খাবে?

শরৎ। না দিদি, আজ কিছু খাব না, খাদ্যে আমার রুচি নেই।

বিন্দু। তবে কাল সকালে একবার এস, বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করো।

শরৎ। ক্ষমা কর, এ বিষয়ে হেমবাবু যা বলেন, আমাকে বলো, তার পূর্ব্বে আমি হেমবাবুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

বিন্দু। তা কাল না এলে নেই নেই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এস, এমন করে আপনাকে কষ্ট দিলে অসুখ কর্‌বে যে।

শরৎ। দিদি ক্ষমা কর, এ বিষয় নিষ্পত্তি না হলে আমি সুধার কাছে মুখ দেখাব না। দেখো বিন্দুদিদি, এ কথা যেন সুধার কাণে না উঠে, তার মন যেন বিচলিত না হয়। আমার আশা যদি পূর্ণ না হয়, জগতে একজন হতভাগা থাক্‌বে. আর একজনকে হতভাগিনী করবার আবশ্যক নেই।

বিন্দু। তা তবে এ বিষয়ে বাবুর যা মত হয় তা তোমাকে লিখে পাঠাব।

শরৎ। না দিদি, পত্রে এ কথা লিখো না, আমি আপনি এসে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যাব। কবে আস্‌ব বল, আমার জীবনে বিধাতা সুখ লিখেছেন কি দুঃখ লিখেছেন, কবে জান্‌ব বল।

বিন্দু। শরৎবাবু, এ কথা ত দুই একদিনে নিষ্পত্তি হয় না, অনেক দিক দেখতে হবে, অনেক পরামর্শ কর্‌তে হবে! তা তুমি দিন ১৫। ১৬ পরে এস।

শরৎ। তাই হক। আমি কালীপূজার রাত্রিতে আবার আস্‌ব, এ কয়েক দিন জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌ব।

একবিংশ পরিচ্ছেদ : মেয়েমহলের মতামত

শরৎবাবু যেই বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, অমনি দেবীবাবুর বাড়ীর একটী ঝি ঠাকুরের প্রসাদ এক থালা ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। ঝি থালা নামাইয়া বলিল,—মাঠাকরুণ, তোমাদের জন্যে এই প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন গো! অনেক বাড়ীতে যেতে হয়েছিল, তাই আস্‌তে একটু রাত হল।

বিন্দু। থাল রাখ বাছা, ঐ রকে রাখ, কাল আমাদের ঝিকে দিয়ে থালা পাঠিয়ে দেব।

ঝি রকের উপর থাল রাখিল। গার কাপড়খানা একটু টানিয়া গায়ে দিয়া একটু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া, গালে একটী আঙ্গুল দিয়া মুচকে মুচকে হাসিতে লাগিল!

বিন্দু। কি লো. কি হয়েছে? তোদের বাড়ীতে পূজার কোন তামাসাটামাসা হয়েছে নাকি. তাই বলতে এসেছিস?

ঝি। হ্যাঁ তামাসাই বটে, ভদ্দর নোকের ঘরে হলেই তামাসা, আমাদের ঘরে হলেই নোকে পাঁচ কথা কয়!

বিন্দু। কি লো. কি তামাসা, কোথায় হয়েছে?

ঝি। না বাপু, আমরা গরিবগুরবো নোক. আমাদের সে কথায় কাজ কি বাপু। তবে কি জান, নোকে এ সব দেখলেই পাঁচ কথা কয়।

বিন্দু। কি দেখলি রে. ভেঙ্গেই বল্ না।

ঝি আর একবার কাপড়টা সোর করে নিয়ে আর একটু মুচকে হেসে বল্লে,—বলি ঐ ছোঁড়াটা এত রাত্তিরে বেরিয়ে গেল. ও কে গা?

বিন্দু একটু ভীত হইলেন। সদর দরজাটা এতক্ষণ খোলা ছিল, ঝি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরতের কথাগুলি শুনিয়াছে? একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—তুই কি চখের মাথা খেয়েছিস? শরৎবাবু এসেছিলেন চিনতে পারিসনি? তুই কি আজ নেকরা কর্‌তে এসেছিস্?

ঝি। না, চখের মাথা খাইনি গো, শরৎবাবু তা চিনেছি। তা ভদ্দরনোকের ছেলে কি ভদ্দরনোকের মেয়ের সঙ্গে অমনি করে হাত কাড়াকাড়ি করে? জানিনি বাবু তোমাদের পাড়াগাঁয়ে কি নিয়ম. আমি এই ঊনত্রিশ বছর কল্‌কেতায় চাকরী কর্‌ছি, কৈ এমন ধারাটী দেখিনি। তা ভদ্দরনোকের কথায় আমাদের কাজ কি বাবু? আমরা দুবেলা দুপেট খেতে পাই তাই ভাল, আমাদের ও সব কথায় কাজ কি?

দেবীবাবুর বাড়ীর ঝিগুলা বড় বেয়াড়া, তাহা বিন্দু পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য এই ঝির এই বিদ্রূপপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী ও কথা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ক্রোধে আরও অনিষ্ট হইবে জানিয়া তাহা সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—ও কি জানিস ঝি, শরৎবাবুর মা

ত বিয়ে দেয় না, তাই বাসায় একলা থেকে বই পড়ে পড়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে, কি বলে, কি কয়, তার ঠিক নেই।

ঝি। হ্যাঁ গা, তা শরৎবাবু পাগলই হক আর ছাগলই হক, পরের বাড়ী এসে উৎপাত করে কেন? বিয়ে-পাগলা হয়ে থাকে, একটা বিয়ে করুক গিয়ে, তোমাকে এসে টানাটানি করে কেন? তোমাকে বিয়ে করতে চায় নাকি?

বিন্দু। দূর পোড়ারমুখী! তোর মুখে কি কথা আটকায় না লা? যা মুখে আসে তাই বলিস? শরৎবাবু একটী মেয়েকে দেখেছে, তার সঙ্গে বিয়ে করতে চায়। তা শরৎবাবু সে কথা বাড়ীর কাউকে বল্‌তে পারে না, লজ্জা করে, তাই আমার কাছে বল্‌তে এসেছিল।

ঝি। সে কে গা? কোন্‌ মেয়েটী?

বিন্দু। তা জান্‌বি এখন, সম্বন্ধ যদি ঠিক হয়, তোরা সব্বাই জান্‌বি।

ঝি। হ্যাঁ গা, আর লুকোলে চল্‌বে কেন? আমরা কি আর কিছু জানিনি গা? আমরা ত আর বুড়ো হাবড়া হইনি, চখের মাথাও খাইনি, কাণের মাথাও খাইনি। ঐ যে সুধা সুধা করে চেঁচিয়ে শরৎবাবু কাঁদছিলেন, যেন সুধার জন্যে বুক ফেটে যাচ্ছিল, তা কি আর শুনিনি গা? এ কথা তোমরা বল্‌বে কেন? এ কথা কি ভদ্দরনোকে বলে, না কেউ কখনও শুনেছে। বিধবার আবার বিয়ে? ও মা ছি! ছি! ছি! ভদ্দরনোককে দণ্ডবৎ, আমাদের ঘরে এমন কথাটী হলে তাকে একঘরে করে! ও মা ছি! ছি! ছি! এমন কলঙ্কের কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে; এ ভদ্দরের ঘর? মুচি মুচুনমানের ঘরে ত এমন কথা কেউ শুনেনি। ও মা ছি! ছি! ছি! ও মা অবাক কল্লে মা, ও মা কোথা যাব মা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিন্দু এবার যথার্থই ভীত হইলেন। বড় মানুষের ঘরের গর্ব্বিণী মন্দভাষিণী ঝি যতক্ষণ তাঁহার উপর ব্যঙ্গ করিতেছিল, ততক্ষণ বিন্দু সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সুধার নামে এ কলঙ্ক রটাইবে ভাবিয়া বিন্দু হতজ্ঞান হইলেন। শরতের পাগলামি প্রস্তাবে তিনি কখনই সম্মত হইবেন না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধবার নামে সামান্য মিথ্যা কলঙ্কও বড় ভয়ানক, মিথ্যা সত্য কেহ ভাবে না, কলঙ্ক চারি দিকে বিস্তৃত হয়, অপনীত হয় না।

বুদ্ধিমতী বিন্দু তখন একটু চিন্তা করিয়া বাক্স হইতে একটী টাকা বাহির করিলেন। অন্য দিন দেবীবাবুর বাটী হইতে খাবার আসিলে ঝিদের দুই আনা পয়সা দিতেন, অদ্য সেই টাকাটী ঝিয়ের হাতে দিয়া বলিলেন,—ঝি, তুই দেবীবাবুর বাড়ীতে অনেক দিন আছিস, পূজর সময় তোকে আর কি দিব, এই একটী টাকা নিয়ে যা, একখানা নূতন কাপড় কিনিস। আর শরৎ যে পাগলের মত কথাগুলো বলেছে, সে কথা আর কাউকে বলিসনি। আজ দশমীর দিন, বোধ হয় কোথাও সিদ্ধি খেয়ে এসেছিল, তাই পাগলের মত বকেছিল। তা পাগলের কথা কি ধরতে আছে, ভদ্রঘরে এমনও কি হয়, আমাদের একটু মান-সম্ভ্রমও আছে, শরৎবাবুরও মা আছেন, বোন আছেন, এমন কাজও কি হয়ে থাকে? তা পাগলের কথা যা শুনেছিস্‌ শুনেছিস্‌, কাউকে বলিসনি বাছা, এ পাগলামি কথা যেন কেউ টের পায় না।

চকচকে টাকাটী দেখিয়া ঝির মত একটু ফিরিল (অনেকেরই ফেরে), সে বলিল,—তা বৈ কি মা, পাগলের কথা কি ধরতে আছে, না বল্‌তে আছে? শরৎবাবু একটু সিদ্ধি খেয়েছিলেন বই ত নয়, এই আমাদের বাড়ীর ছেলেরা যে বোতল বোতল কি আনাচ্ছে আর খাচ্ছে। আর কি বা আচরণ! রাত্রিতে বাড়ী থাকে না, বাপ মাকে একটু ভয় করে না, লজ্জা করে না। এখনকার সব এমনি হয়েছে গো, তা এখনকার ছেলেদের কথা কি ধরতে আছে? শরৎবাবু যা বলেছে বলেছে, তা সে কথা কি আমি মুখে আনতে পারি, না কাউকে বলতে পারি? কাউকে বল্‌ব না মা, তুমি কিছু ভেব না।

ঝি তুষ্ট হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে মুহূর্ত্তের মধ্যে তারের সংবাদ যেমন জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, বিন্দুর বাড়ীর কথা সেই রাত্রিতেই সেইরূপ ভবানীপুর, কালীঘাট, কলিকাতা অতিক্রম করিল। পরদিন প্রাতে ঢি ঢি পড়িয়া গেল।

দেবীবাবুর মহিষী পরদিন পা ছড়াইয়া তেল মাখিতে মাখিতে এই কলঙ্ককথা শুনিয়া একেবারে ভেক দর্শনে সর্পের ন্যায় ফোঁস করিয়া উঠিলেন।

হ্যাঁ গা, তা হবে না কেন গা, তা হবে না কেন? এখন ত আর ভদ্র ইতরে বাছবিচার নেই,

যত ছোটলোক পাড়াগাঁ থেকে এসে কায়েত বলে পরিচয় দেয়, অমনি কায়েত হয়ে যায়। ওদের চোদ্দ পুরুষে কেউ কায়েতের সঙ্গে ক্রিয়াকর্ম্ম করেছে, না কায়েতের মান রাখতে জানে? ওদের সঙ্গে আবার খাওয়াদাওয়া! মিন্‌ষের ঘটে ত বুদ্ধি নেই, তাই ওদের সঙ্গে চলাফেরা করে। দেব এখন আজ মিন্‌ষেকে দু'কথা শুনিয়ে, আপনার মানমর্য্যাদা জানে না, ভারি হোসে কর্ম্ম হয়েছে, যার তার সঙ্গে চলাফেরা করে। ওগো, আমি তখনই বুঝেছি গো, তখনই বুঝেছি, যখন ভবানীপুরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বার হয় না, ডেকে পাঠাতে হয়, তখনই বুঝেছি কেমন কায়েত। আর সেই অবধি আর আসা হয়নি, জাঁক কত, ঐ বিধবা ছুঁড়ীটাকে আবার পাড়ওলা কাপড় পরান হয়, কত আদর করা হয়। তা হবে না? এ সব হবে না? যেমন জাত, তেমনি আচরণ, হাড়ী মুচীদের ঘরে আর কি হবে? ঐ যে মুচুনমানদের বিধবার নিকে হয় না? এ তাই লো তাই।

শ্যামীর মা। (গৃহিণীর ব্যথার জন্য বুকে ও হাতে ঘন ঘন তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে) তা না ত কি বোন, ওরা আবার কায়েত! কায়েত হলে বিধবাটাকে অমনি করে রাখে! ও মা, ঐ ছুঁড়ীটা আবার একাদশীর দিন জলটল খায়, গায়ে তেল মাখে, মাছ না হলে ভাত খাওয়া হয় না, ছি! ছি! ছি! এই আজ একাদশী, কেউ বলুক দেখি যে সকাল থেকে একটু জল গ্রহণ করেছি।

বামীর মা। (গৃহিণীর চুলে তেল মাখাইতে মাখাইতে) আবার সুদু তাই? আবার গাড়ী করে ঐ ছুঁড়ীটাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, শরৎবাবু আবার ওটাকে নাকি রোজ রোজ দেখতে আসে! ছি! ছি! লজ্জার কথা।

গৃহিণী। অমন মেয়েকেও ধিক্! মেয়ের মাকেও ধিক্! অমন মেয়ে কি গর্ব্ভে ধারণ করে? অমন মেয়ে জন্মালে মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলতে হয়। বিধবা হয়েছে তবু লজ্জা নেই, মাথার কাপড় খুলে শরতের সঙ্গে ছাদে বেড়ান হয়, শরতের জন্যে মিছরীর পানা করে পাঠান হয়। তা শরৎবাবুর কি দোষ বল? পুরুষের মন বৈ ত নয়, তাতে আবার বিয়ে থা হয়নি, দুটো বোনে অমন করে ছেলেমানুষকে ভোলালে সে আর ভুলবে না? অমন মেয়ের মুখ দেখতে আছে? ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার!

এইরূপে গৃহিণী ও তাঁহার সঙ্গিনীদিগের সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি ক্রমে সপ্তমে চড়িতে লাগিল, বিন্দুর মা, বিন্দুর বাপ, বিন্দুর চতুর্দ্দশ পুরুষ অবধি যাবতীয় পুরুষস্ত্রীর বিশেষ স্তুতিবাদ করা হইল, রোষে গৃহিণীর বুকের ব্যথাটা বড়ই বাড়িল, ঘন ঘন কবিরাজ আসিতে লাগিল, সন্ধ্যার সময় বাবু আপিস হইতে আসিয়া গৃহিণীর পীড়া দেখিতে আসিয়া যেরূপ মধুর আলাপ শ্রবণ করিলেন, মনুষ্য-ভাগ্যে সেরূপ কদাচ ঘটে।

গৃহিণীর গলার শব্দ শুনিয়া ঝি বৌরা পাতকোতলায় জড়সড় হইয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল।

প্রথমা। কি লো, কি হয়েছে, অত চেঁচামেচি কেন?

দ্বিতীয়া। ও লো, তা শুনিসনি, তবে শুনেছিস কি?

প্রথমা। ও লো, কি লো কি?

দ্বিতীয়া। ও লো, ঐ যে হেম বলে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, সেই তার স্ত্রী আর শ্যালী আমাদের বাড়ী একদিন এসেছিল, তাই সেই শ্যালী নাকি বিধবা, তার আবার শরৎবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে।

তৃতীয়া। দূর পোড়াকপালী! তাও কি হয় লো, বিধবার আবার বিয়ে হয়?

দ্বিতীয়া। তা হবে না কেন, ঐ যে বিদ্যাসাগর বলে বড় পণ্ডিত আছে, ঐ যার সীতার বনবাস তুই সেদিন পড়্‌ছিলি, ঐ সেই নাকি বলেছে বিধবার বিয়ে হয়। সে নাকি কয়েকজন বিধবার বিয়ে দিয়েছে।

চতুর্থী। সে ত বড় রসের সাগর লো, বিধবার আবার বিয়ে দেয়? তা বিধবা যদি বুড়ী হয় তবুও বিয়ে হয়?

দ্বিতীয়া। তা হবে না কেন, ইচ্ছে করলেই হয়।

চতুর্থী। তবে শ্যামীর মা আর বামীর মা কি দোষ করেছেন, চুরি করে দুধটুকু খান, মাছটুকু খান; তা বিদ্যাসাগরকে বলে বিয়ে করলেই হয়, আর কিছু লুকোতেচুরোতে হয় না।

প্রথমা। চুপ কর লো চুপ কর, এখনই শুনতে পেলে বকে' ফাটিয়ে দেবে। তা শরৎবাবু শুনেছি ভাল ছেলে, তিনি এমন করেন কেন?

দ্বিতীয়া। আর ভাল ছেলে, বলে, "যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম!" ভাল ছেলে হলে কি হয়, ফুটফুটে মেয়েটী দেখেছে, মন ভুলে গেছে।

তৃতীয়া। হ্যাঁ দিদি, সে হেমবাবুর শ্যালীর বয়স কত গা?

দ্বিতীয়া। বয়স ১৩।১৪ বছর হয়েছে, দেখতেও সুন্দর, হেসে হেসে শরৎবাবুর সঙ্গে কথা হয়, মিছরীর পানা খাওয়ায়, তার সঙ্গে না জানি কি খাওয়ায়, তাতে আর শরৎবাবু ভুলবে না? হাজার হোক পুরুষের মন ত।

চতুর্থী। তবে শরৎবাবুর সঙ্গে সে মেয়েটীর অনেক দিনের আলাপ?

দ্বিতীয়া। তবে আর শুনছিস কি, এ রসের কথা বুঝলি কি? আলাপ সেই পাড়াগাঁ থেকে। কি জানি বাবু সেখানে কি হয়েছে, না জেনে শুনে পরের নিন্দা করা ভাল নয়, কিন্তু কল্‌কেতা এসে যে ঢলনটা ঢলিয়েছে তা আর ভবানীপুরে কে না জানে? ওলো, শরৎবাবু সেই মেয়েটীকে নিয়ে আপনার বাড়ীতে কতদিন রাখে, তার বোন আর হেমবাবুও সেই বাড়ীতে ছিলেন। হেমবাবু নাকি গতিক মন্দ বুঝে আলাদা বাড়ী করলেন, তা সেখানে অমনি রাধিকা বিরহবেদনায় অচেতন হয়ে পড়লেন, নতা করলেন যে ভারি জ্বর হয়েছে, আবার আমাদের কৃষ্ণঠাকুর উপস্থিত! ওলো এ ঢের কথা লো! বলি বিদ্যাসুন্দর পাড়ছিস? এ তাই লো তাই। এখনকার ছেলেরা সব সুড়ঙ্গ কাটতে শিখেছে, দেখিস লো সাবধান।

চতুর্থী। দূর পোড়ারমুখী!

দাসী মহলেও বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বুড়ী ঝির কাছে শুনে নবীনা ঝিরা সকাল থেকে বারাণ্ডায়, উঠানে, রান্নাঘরে কাণাকাণি করিতেছে আর ফিস ফিস করিতেছে। একজন তন্বঙ্গী নবীনা বলিল,—হ্যাঁলা, এ কি সত্তি লা, সত্তি বিধবার বিয়ে হবে নাকি?

স্থূলাঙ্গী নবীনা উত্তর করিল, "তবে শুন্‌ছিস কি, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, পত্তর হয়ে গেছে, হেমবাবু সেকরাকে গয়না গড়াতে দিয়েছে, আর তুই এখনও হবে কিনা, জিজ্ঞেস করচিস?"

তন্বঙ্গী। তবে ত এটা চলন হয়ে যাবে! ভদ্দর ঘরে হলে ত ছোট লোকের ঘরেও হবে?

স্থূ। কেন লো, তোর আবার সক্‌ গেছে নাকি? ঐ, ঐ কৈবর্ত্ত ছোঁড়াটাকে বে কর্‌বি নাকি? ঐ তোদের কেউ হয় না? ঐ যে ফিস ফিস করে তোর সঙ্গে সদাই কথা কয়?

ত। দূর পোড়ারমুখী! অমন কথা আমাকে বলিস্‌নি। তোর আপনার মনের কথা বলছিস বুঝি? ঐ যে তোদের জেতের সদানন্দ বেণে আছে না, তার সে দিনে বৌ মরে গেছে, তার এখন ভাত রেঁধে দেয় এমন নোকটী নেই। তা ধনে মশলা কেনবার নতা করে যে ঘন ঘন তার দোকানে যাওয়া হয়, বলি তার ঘর করতে ইচ্ছে হয় নাকি?

স্থূ। তোর মুখে আগুন।

এইরূপে দুইজন নবীনা পরস্পরের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে, এমন সময় একজন বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল,——কি লো, তোরা গালাগালি করছিস কেন লো?

স্থূ। না গো, কিছু নয়, এই শরৎবাবুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তাই বল্‌ছিনু। ভদ্দর যাই করে তাই সাজে গো, আর আমাদের সময় যত কলঙ্ক!

বৃদ্ধা। তা এটা কি ভদ্দরের কাজ? এ ত মুচুনমানের কাজ।

স্থূ। তবে হেমবাবু এমন কাজ করেন কেন?

বৃদ্ধা। করেন তার কারণ আছে, তোরা কি জান্‌বি বল? তোরা কাণে তুলো দিয়ে থাকিস, এ কথার কি জান্‌বি বল?

উভয় নবীনা। কি, কি, বল্‌ না দিদি, এর কথাটা কি?

বৃদ্ধা। বলি শুনিসনি বুঝি? হেমবাবু যে এখন আর না বিয়ে দিয়ে পারে না, সে কথা শুনিসনি বুঝি?

উভয়ে। না, না, কি কি?

বৃদ্ধা। এই শুনবি আয়, কাণেকাণে বলি।

উভয় নবীনা কাজকর্ম্ম ফেলিয়া বৃদ্ধার কাছে দৌড়াইয়া আসিল। বৃদ্ধা তাহাদের কাণে-

কাণে বলিল,—সে শব্দটী তেতলা পর্য্যন্ত ও বার বাড়ী পর্য্যন্ত শুনা গেল—"বলি শুনিসনি? হেমবাবুর শ্যালী যে পোয়াতী!"

সত্যের আবিষ্কার হইতে লাগিল, সত্য প্রচারিত হইতে লাগিল!

ভবানীপুর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত খবর গেল। কালীতারার তিন খুড়শাশুড়ী সেদিন একাদশী করিয়া রুক্ষস্বভাব হইয়া আছেন, তাঁহারা এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। বড়টী একটু ভাল মানুষ, তিনি বলিলেন,—এখনকার কালে আর ধর্ম্ম-নেই, বাছবিচার নেই, যার যা ইচ্ছে সে তাই করে। করুক গিয়ে বাবু, যে পাপ করবে নরক ভুগবে, আমাদের সে কথায় কাজ কি?

ছোটটী বলিলেন,—কি হয়েছে, কি হয়েছে? আমাদের বৌয়ের ভাই বিধবা বিয়ে করবে? ও মা কি ঘেন্নার কথা গো, ছি! ছি! ছি! নোকের কি এখন মানসম্ভ্রম নেই, একটু লজ্জা নেই, যা ইচ্ছে তাই করে? এ যে হাড়ী ডোমেও এমন কাজ করে না, এ যে আমাদের কুলে কালী পড়ল, এ যে ছোটলোকের মেয়ে বিয়ে করে আপনার কুলটা মজালেন। ও মা ছি! ছি! ছি!

মেজোটী একেবারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কালীতারাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ও পোড়ারমুখী, ও হারামজাদী, বলি হে'লা, এই তোদের মনে ছিল লা? ওলো গলায় দড়ী দেবার জন্যে কি একটা পয়সা মেলেনি লা? বলি কলসী গলায় বেঁধে আদিগঙ্গায় ডুবে মরিসনি কেন? মর, মর, মর। আমাদের কুলে এই লাঞ্ছনা! ওলো বাগ্‌দীর মেয়ে! বলি শ্বশুর কুলটা একেবারে ডোবালি রে? তা রোস না, বিয়ে হোক না, তোরই একদিন কি আমারই একদিন। নোড়া দিয়ে তোর মুখ ভোতা করে দেব না? তোর পিঠে মুড়ো খেংরা ভাঙ্গবো না? মাথায় ঘোল ঢেলে তোকে ঝেঁটা মেরে যদি বের করে না দি, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।

কালীতারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল, সন্ধ্যার সময় বিন্দুকে চিঠি লিখিল—"বিন্দুদিদি, এ কি কথা, এ ত আমি শুনি নাই, এ অপযশ, এ নিন্দা, এ কলঙ্ক কি আমাদের কুলে? বিন্দুদিদি, এ কাজটী করিও না। শরৎ যদি পাগল হইয়া থাকে তাহাকে তোমাদের বাড়ী ঢুকিতে দিও না। এ কাজ হইলে আমি শ্বশুরবাড়ী মুখ দেখাইতে পারিব না, শাশুড়ীরা আমাকে আস্ত রাখিবে না, তোমার কালীতারাকে আর দেখিতে পাইবে না।"

কলিকাতায় সে সংবাদ রটিল। বিন্দুর জ্যেঠাইমা লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "বিন্দু তোকে আর সুধাকে আমি পেটের ছেলের মত মনে করি, পেটের ছেলের মত মানুষ করেছি। বুড়ী জ্যেঠাইমাকে এই বয়সে খুন করিসনি, মল্লিকবংশ একেবারে কলঙ্কে ডুবাসনি। বাছা বিন্দু, তোর জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, বাপমার কুল নরকে ডুবাসনি। বাপমা থাকলে কি এমন কাজটী করতিস বাছা?"

বিন্দুর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। বিন্দু দেখিলেন, ঝিকে যে একটী টাকা দিয়াছিলেন তাহাতে কোনও ফল হয় নাই; কলঙ্ক জগৎসুদ্ধ রটিয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : পুরুষ মহলের মতামত

হেমচন্দ্র বিন্দুর নিকট সমস্ত কথা অবগত হইয়া অন্তঃকরণে বড়ই ব্যথিত হইলেন। শরতের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তাহার কিছুমাত্র লাঘব হইল না, শরতের প্রস্তাবটী তিনি পাপ প্রস্তাব মনে করিলেন না। তিনি শান্ত স্থিতিপ্রিয় লোক ছিলেন, সমাজের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া সকল বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশীয়দিগের মনে ক্লেশ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বিবেচনা করিলেন না। যাহা হউক, তিনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া, অনেক পরামর্শ লইয়া যাহা হউক নিষ্পত্তি করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

ভাগ্যক্রমে তাঁহার পরামর্শের অভাব রহিল না। পরামর্শদাতৃগণ দলে দলে আসিতে লাগিলেন, হিতৈষী বন্ধুগণ হিত কথা বলিতে আসিতে লাগিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় কথা বলিতে আসিলেন, সমাজ-সংস্কারকগণ প্রকৃত সংস্কার কাহাকে বলে বুঝাইতে আসিলেন, সমাজ-সংরক্ষকগণ সংরক্ষা বুঝাইতে আসিলেন। ভবানীপুরে তাঁহার এত বন্ধু ছিল হেমচন্দ্র পূর্ব্বে তাহা অনুভব করেন নাই!

প্রথমে জনার্দ্দনবাবু, গোবর্দ্ধনবাবু, হরিহরবাবু প্রভৃতি বৃদ্ধ সমাজপতিগণ আসিয়া হেমবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ এদিক্ ওদিক্ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হেমবাবু অতি ভদ্র কায়স্থ সন্তান, তাঁহার শিষ্টাচারে সকলেই তুষ্ট আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই হেমবাবুর তত্ত্ব লইয়া থাকেন ও হিত কামনা করেন, হেমবাবুর চাকরীর কি হইল, তিনি সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিয়া ভাল করিয়া চেষ্টা করেন না কেন, তাঁহারা হেমবাবুকে কোন কোন সাহেবের কাছে লইয়া যাইবেন, ইত্যাদি অনেক স্নেহগর্ভ কথায় আপনাদিগের অকৃত্রিম স্নেহ (যাহার পরিচয় হেমবাবু ইতিপূর্ব্বে পান নাই) প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর শরৎবাবুর কথা উঠিল, হেমবাবুর ঘরের কথাটী উঠিল। জনার্দ্দনবাবু বলিলেন,—এখনকার কালেজের ছেলেরা সকলেই ঐরূপ, তাহারা রীতিনীতি বুঝে না, পৈতৃক আচার অনুসারে চলে না, সুতরাং দোষ ঘটে। তা তুমি বাবু বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি কি আর নির্ব্বোধের মত কাজ কর্‌বে, তা আমরা স্বপ্নেও মনে করি না। তোমাকে সৎপরামর্শ দেওয়াই বাহুল্য।

গোবর্দ্ধনবাবু। তবে কি জান বাবা, আমরা কয়েকজন বুড়া আছি, যতদিন না মরি, তোমাদেরই হিত কামনা করি, দুটা কথা না বললেই নয়। শরৎটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, আমাদের কথা শুনে না, যা ইচ্ছে করে, তা ওটাকে আর বড় বাড়ীতে আস্‌তে দিও না। তা হলেই এ কথাটা আর কেউ বড় শুন্‌তে পাবে না, কে আর কার কথা মনে করে রাখে বল?

হরিহরবাবু। হাঁ, তা বৈ কি? ঐ যে মিত্তিরজার বাড়ীতে সে দিন একটা কলঙ্ক উঠিল, তোমরা সে কথা অবশ্যই জান, (এই বলিয়া কলঙ্কটী আর একবার প্রকাশ করা হইল) তা মিত্তিরজা বুদ্ধিমান লোক, চাপিয়া গেলেন, এখন আর সে কথা কে তোলে বল?

জনার্দ্দনবাবু। হাঁ, তা বৈ কি? কে বা কার কথা মনে রাখে? আজকাল সকলেই আপনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সে কালে এক রীতি ছিল, গ্রামের বুড়াদের কথাটী না নিয়ে পাড়ার কোন কাজ হত না। কেমন বল না গোবর্দ্ধনবাবু, ঐ সেকালে আমাদের মতামত না নিয়ে কি কেউ কোনও কাজ কর্‌তে পারত?

গোবর্দ্ধনবাবু। সাধ্য কি? আর এখনই যাঁরা একটু শিষ্ট-শান্ত, তাঁরা আমাদের না জিজ্ঞাসা করে কিছু করেন না। ঐ ঘোষজা মশাইয়ের বিধবা ভাদ্রবধূকে নিয়ে সে বৎসর এইরূপ একটা কলঙ্ক হল, (সে কলঙ্কটী সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হইল) তা ঘোষজা মশাই তখনই আমার কাছে এসে বললেন, “হরিহরবাবু করি কি? যাই যে?” তা আমি বল্‌লেম, “যখন আমার কাছে এসেছ তখন কিছু ভয় নেই, আমি এর একটা কিনারা করে দিবই।” কি বল জনার্দ্দনবাবু, আমরা অনেক দেখেছি, শুনেছি, বিপদ আপদের সময় আমাদের জানালে আমরা কোন্ না একটা উপায় করে দিতে পারি।

জনার্দ্দনবাবু। তা বৈ কি।

হরিহরবাবু। তা আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘোষজাকে বলিলাম, “তোমার ভাদ্রবৌকে কাশীধামে পাঠাইয়া দাও।” তিনি সেই অনুসারে কার্য্য করিলেন, এখন কাহার সাধ্য সে কথা উত্থাপন করে? তা বাবা, এখনকার কি ছেলেরা, কি মেয়েরা, সকলেই স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, যার যা ইচ্ছা করে, তাতে তোমার দোষ কি বল? তা একটী কাজ কর, তোমার শ্যালীটীকেও কাশীধামে পাঠিয়ে দাও, সেখানে যা ইচ্ছা করবে, কে দেখতে যাচ্চে বল? তোমার কোন অপযশ হবে না।

হেম আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কম্পিতস্বরে বলিলেন,—মহাশয়, আপনাদিগের কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। শরৎ যে সমাজরীতি বিরুদ্ধ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমার মত নাই; সে বিষয় পরে বিচার্য্য। কিন্তু আপনারা যদি শরৎবাবুর অথবা আমার শ্যালীর চরিত্রে কোনও দোষ ঘটিয়াছে এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে একেবারে ভ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নির্ম্মল চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, তাঁহাদিগের অপেক্ষা নির্দ্দোষচরিত্র লোক আমি জানি না।

জনার্দ্দনবাবু, গোবর্দ্ধনবাবু ও হরিহরবাবু একস্বরে বলিলেন,—না, না, আমরা দোষের কথা বলি নাই। এমন কথাও কি লোকে বলে!

হরিহরবাবু। এমন কথাও কি লোকে বলে, ঘরে কিছু হলেও কি লোকে বলে? তা নয়, তা নয়। ঘোষজা মশাই কি সে কথা বলেছিলেন, তা নয়, অন্য একটু কারণ দেখিয়ে পাপ দূর

করলেন। তা আমরাও তাই বল্‌ছি, তোমার শ্যালীর চরিত্রে কোন দোষ থাক্‌লেও কি সে কথা মুখে আনতে আছে? রাম! আমরা কি কারও কলঙ্কের কথা মুখে আনতে পারি? তা নয়, তা নয়। তবে গোলমালটা এইরূপে চুকিয়ে ফেল্‌লেই ভাল। সকল বিষয়েই সরল পথ অবলম্বন করাই ভাল, সরলপথেই ধর্ম্ম।

জনার্দ্দনবাবু। তা বৈ কি, তা বৈ কি, "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"—শাস্ত্রেই এই কথা আছে। হরিহরবাবু যে কথাটা বললেন তাই সৎপথ, তার কি আর সন্দেহ আছে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, এবারটা যেন চেপে গেলে। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ। ঘরে অল্পবয়স্কা বিধবা কি রাখতে আছে? কখন কি হয় তার কি ঠিক আছে?

গোবর্দ্ধনবাবু। তা বৈ কি, শাস্ত্রে বলে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রও নারীর গুপ্ত আচরণ দেখতে পান না, পঞ্চমুখ ব্রহ্মাও নারীর গুপ্ত কথা জান্‌তে পারেন না। তুমি ত বাবা ছেলেমানুষ।

হরিহরবাবু। তা বৈ কি। এবার যেন চাপিয়া গেলে, কিন্তু দৈবক্রমে—দৈবের কথা বলা যায় না—যদি যথাকালে তরুণবয়স্কা বিধবা একটী সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে কি আর চাপিবার যো থাকিবে? লোকে ত একেই কলঙ্কপ্রিয়, তখন কি আর রক্ষা থাকিবে? এখনই লোকে সেই কথা বলিতেছে। তা কাশীধামে পাঠানই শ্রেয়ঃ, ইত্যাদি নানা সারগর্ভ পরামর্শ দিয়া বৃদ্ধগণ বিদায় হইলেন। হেমচন্দ্র রোষে ও অভিমানে উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার জ্বলন্ত নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু বিমোচন করিলেন।

তাহার পর রামলাল, শ্যামলাল, যদুলাল প্রভৃতি নব্যের দল হেমচন্দ্রকে পরামর্শামৃত দান করিতে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শিক্ষিত; কেহ এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পরে বাড়ীতেই (রেনল্‌ড্‌স্‌ প্রভৃতি) সাহিত্য আলোচনা করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন। কেহ সচ্চরিত্র; কেহ বা সভ্যতা-সম্মত আমোদগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখেন। কিন্তু পরামর্শদানে সমান সক্ষম, সকলেই হেমচন্দ্রের "হিতৈষী" বন্ধু।

তাঁহারা অদ্য প্রাতে একটী কথা শুনিয়া হেমবাবুর নিকট আসিলেন, হেমবাবুর অযথা নিন্দার প্রতিবাদ করাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা, পাড়ার একজন বিদ্যোৎসাহী যুবক ও একজন ধর্ম্মপরায়ণা বিধবার অযথা অপবাদ তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, সেই জন্যই হেমবাবুর নিকট প্রকৃত অবস্থা জানিতে আসিলেন। কিন্তু হেমবাবুর যদি কোন কথা বলিতে কোনও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন না। কেননা, কাহারও গুপ্ত কথা অনুসন্ধান করা সুরুচি-সম্মত কার্য্য নহে। কিন্তু যদি হেমবাবুর বলিতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে—ইত্যাদি ইত্যাদি নব্য ভাষায় গৌরচন্দ্রিকা অনেকক্ষণ চলিল।

হেমবাবুর এখন আর লুকাইবার কিছুই নাই, যেরূপ অপবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে, তাহাতে সত্য কথা প্রকাশ হওয়াই ভাল। এই অনাহূত বন্ধুদিগের আগমনে ও প্রশ্নে তিনি অতিশয় তিক্ত হইলেও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যাহা ঘটনা তাহা জানাইলেন।

রামলাল। তা যাহাই হউক, অদ্য যে ঘোর অপবাদ শুনিলাম তাহার অধিকাংশ মিথ্যা জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু দেখুন, সকলে সহজে এ অপবাদটী অবিশ্বাস করিবে না, আপনি সকল সময়ে বাটী থাকেন না, শরৎ কালেজেই কিছু অবাধ্য ও গর্ব্বী, এবং স্বীয় মতগুলি লইয়া বড় স্পর্দ্ধা করে, এবং নারীর চরিত্র দুর্ব্বিজ্ঞেয়। অতএব অপবাদ সম্বন্ধে সমাজের মনে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ, এবং মনুষ্যচরিত্র পর্য্যালোচনার ফল মাত্র। তা যাহা হউক, আপনি এই বিবাহে আপাততঃ মত করেন নাই, এটী সুখের বিষয়।

শ্যামলাল। সে কথা যথার্থ। আরও দেখুন, এ কার্য্য প্রকৃত সমাজসংস্কার নহে। যে কার্য্যে আমাদের দিন দিন ঐক্য সাধন হইবে, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হইবে, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। পুরাতন লোকদিগের ন্যায় আমাদের কোনও "প্রেজুডিস" নাই, কিন্তু এ কার্য্যটী আমাদিগের সমাজে বিপ্লব ও বিচ্ছেদ ঘটাইবে মাত্র, ইহা দ্বারা আমাদের ঐক্যসাধন হইবে না, অতএব এ কার্য্য গর্হিত।

যদুলাল। আরও দেখুন, মেলথস বলেন, লোকসংখ্যা যত শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, খাদ্য তত শীঘ্র বৃদ্ধি পায় না। এই জন্যই সুসভ্য দেশে অনেক পুরুষ ও নারী অবিবাহিত থাকে। আমাদিগের দেশে সেটী হয় না, অতএব নিবেদন বিধবাগুলিকে অবিবাহিতা রাখা কর্ত্তব্য।

শ্যামলাল। আর আপনার মত বুদ্ধিমান লোক এটীও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে,

স্বদেশের উন্নতি, ভারতের উন্নতি, আমাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য; তাহাও বিধবাবিবাহ দ্বারা বিশেষরূপে সংঘটিত হইবে না। আমার সামান্য ক্ষমতা দ্বারা যতদূর দেশের উন্নতি হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিতেছি। একটী লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছি, দেশস্থ যাবতীয় গ্রন্থকারদিগকে পুস্তকের জন্য পত্র লিখিয়াছি, এবং প্রতি শনিবার সেই লাইব্রেরীতে কয়েকজন বন্ধু সমবেত হয়েন, রাজনৈতিক তর্কও করিয়া থাকেন। আপনার যদি অবকাশ থাকে, তবে এই আগামী শনিবার আসিলে আমরা বড়ই তুষ্ট হইব।

যদুলাল। আরও দেখুন, আমাদের সংসারে যে কবিত্ব, যে মধুরত্বটুকু আছে, আমাদিগের গৃহে গৃহে যে অমৃতটুকু লুক্কায়িত আছে, কি কাঙ্গাল কি ধনী সকল গৃহে যে অনির্ব্বচনীয় মিষ্টত্বটুকু আছে, ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সেটুকু কোথায়? বৈদেশিক আচরণ অনুকরণ করিবেন না, তাহাতে আমাদিগের গৃহকর্ম্ম লুপ্ত হইবে, ভারতবাসীর শেষ সুখটুকু বিলুপ্ত হইবে, আর্য্য-ধর্ম্মের নিস্তেজ দীপটী একেবারে নির্ব্বাণ হইবে। ইউরোপীয়দিগের সদ্‌গুণগুলি অনুকরণ করুন, আমাদিগের গৃহ-সংসারের কবিত্ব, মিষ্টত্ব ও হিন্দুত্বটুকু ধ্বংস করিবেন না।

রামলাল। সে কথা সত্য। যদুবাবুর কথাগুলি শুনিবেন, তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ স্বদেশ-হিতৈষী লোক আজকাল দেখা যায় না। তাঁহার কথাগুলি সারগর্ভ, তাহা আর আমার বলা বাহুল্য। আর যে অপবাদ শুনিলাম, তাহা যদি সত্য হয়—যাহা অনেকে বিশ্বাস করিবে, যদিও সে বিষয়ে আমার নিজের মত সমস্ত প্রমাণাদি না দেখিয়া ব্যক্ত করিতে চাহি না—যদি সে অপবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ যুবক ও এইরূপ রমণীকে উৎসাহিত করিলে ভারতের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক অধোগতি হইবে।

হেমচন্দ্র এরূপ তর্কের উত্তর করিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন; নব্য পরামর্শদাতৃগণ ক্ষণেক পর উঠিয়া গেলেন।

তাহার পর সমাজ-সংরক্ষণের দুই এক জন চাঁই, দিগ্‌গজ ঠাকুরকে লইয়া, হেমবাবুর বাটী আসিলেন। দিগ্‌গজ ঠাকুর ভবানীপুরের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের একটী অক্‌টর্লনী মনুমেণ্ট, ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী পেসিফিক সমুদ্র, বিদ্যায় একটী শুণ্ডধারী দিগ্‌গজ, তর্কে বন্য বরাহ অবতার। বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান, সকলই তাঁহার কণ্ঠস্থ, সকল বিষয়েই তাঁহার সমান অধিকার। তিনি আপন পরিমাণ-রহিত বিদ্যা-পয়োধি হইতে অজস্র তর্কস্রোত বর্ষণ করিয়া হেমচন্দ্রকে একেবারে প্লাবিত করিলেন, হেমচন্দ্র একেবারে নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন দিগ্‌গজ ঠাকুরের গলা ভাঙ্গিয়া গেল, বাক্য-ক্ষমতা শেষ হইল (তর্ক-ক্ষমতা শেষ হইবার নহে), তখন তিনি কাশিতে কাশিতে আরক্ত নয়নে নিরস্ত হইলেন।

হেম তখন ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—মহাশয়, এ কার্য্য করিতে এখনও আমার মত নাই, সুতরাং আপনার এক্ষণে এইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করার বিশেষ আবশ্যক নাই। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও পড়াশুনায় যতদূর উপলব্ধি হয়, তাহাতে বোধ হয়, বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমা-দিগের শাস্ত্রেও দুটী মত আছে, ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রথা ছিল। বৈদিক কালে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; মনু প্রভৃতি শাস্ত্র প্রণেতাদিগের কালে এ প্রথাটী একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ক্রমে উঠিয়া যাইতেছিল। পরে পৌরাণিক কালে এ প্রথাটী একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। আমার শাস্ত্রে অধিকার নাই, আলোচনারও ক্ষমতা নাই, অন্য পণ্ডিতদিগের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। শুনিয়াছি, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বলেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রের অসম্মত নহে।

যাহারা দ্বিপ্রহর রজনীতে সহসা একটি গ্রামে আগুন লাগিতে দেখিয়াছেন, আকাশের রক্তবর্ণ দেখিয়াছেন, অগ্নির প্রজ্বলিত অভ্রলেহী জিহ্বা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তৎকালে দিগ্‌গজ ঠাকুরের মুখের ভঙ্গী কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন। অগ্নি-গর্জ্জন-বিনিন্দিত স্বরে তিনি কহিলেন,—সেই (কাশি) সেই বিধবাবিবাহ প্রচারক বিদ্যাসাগর পণ্ডিত? সে আবার পণ্ডিত? সে বর্ণপরিচয়ের পণ্ডিত, বর্ণপরিচয় লিখিয়া পণ্ডিত হইয়াছে, (অধিক কাশি) একটা নূতন প্রথা লইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ধর্ম্মে কুঠারাঘাত করিয়াছে, মনুষ্য-হৃদয়ের স্তরে স্তরে শেল নিক্ষেপ করিয়াছে, হিন্দুচরিত্র অনপনেয় কলঙ্করাশিতে আবৃত করিয়াছে, আর্য্যনাম, আর্য্যগৌরব, আর্য্যরীতিনীতি একেবারে সমুদ্রবক্ষে মগ্ন করিয়াছে,

(ভয়ানক কাশি) উঃ (কাশি) সে পণ্ডিত? সেই স্বধর্ম্মবিদ্বেষী, ম্লেচ্ছদিগের অনুকরণকারী, বিদেশীয় রীতির পক্ষপাতী, আর্য্যধর্ম্মশূন্য, আর্য্য অভিমানশূন্য, আর্য্যবংশের কুসন্তান (অনবরত কাশিতে বাক্যস্রোত সহসা রুদ্ধ হইল তখন আসন পরিত্যাগ করিয়া) চল হে সংরক্ষক মহাশয়, এ বাড়ীতে আর থাকা নহে, এখানে পদাবিক্ষেপ করিলেও পাপ আছে। যাহা শুনিয়াছিলাম, সমস্তই সত্য বটে, সে গর্ভবতী যদি গর্ভ নষ্ট করে তোমরা পুলিসে সংবাদ দিও।

হেমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন না, দিগ্‌গজ ঠাকুরের ক্রোধ ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার একটু হাসি আসিল।

সেদিন সমস্ত দিন হেমচন্দ্রের পরামর্শের অভাব রহিল না। তাঁহার এত বন্ধু আছে, এত হিতৈষী আছে, এত পরামর্শদাতা আছে, তাহা পীড়ার সময়, কষ্টের সময়, দারিদ্র্যের সময়, হেমচন্দ্র অনুভব করেন নাই।

কলিকাতা হইতে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত এ কথা রাষ্ট্র হইল। ধনঞ্জয়বাবুর বাগানে সুসভ্য সভা হইয়াছে, গীত, নৃত্য, সুধা ও দিবার ন্যায় ঝাড়ের আলোক সেই সভাকে রঞ্জিত করিতেছে। তথায় দরিদ্রের এই কথাটী উঠিল।

ধনঞ্জয়বাবু শ্যালীর কলঙ্ক সম্বন্ধে আর কোন উপহাস করিলেন না, একটু হাসিলেন; কিন্তু অন্যান্য ধার্ম্মিকগণ এ ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্যের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। হিন্দুধর্ম্মের স্থূল স্তম্ভস্বরূপ হরিশঙ্করবাবু একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, তাঁহার হস্ত হইতে সুধাপাত্র পড়িয়া শতখণ্ড হইয়া গেল, বলিলেন, "হা ধর্ম্ম! তোমাকে কি সকলেই বিস্মৃত হইল? ভদ্রলোকের ঘরে এ কি অধর্ম্ম আচরণ? হিঁদুয়ানি আর বুঝি থাকে না।" শিক্ষিত যদুনাথের হস্ত হইতে কাঁটা ছুরি পড়িয়া গেল, সম্মুখের গো-জিহ্বা অনাস্বাদিত রহিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর বুঝি ন্যাশনালিটি থাকে না!" বিশ্বম্ভরবাবু, সিদ্ধেশ্বরবাবু, গিন্দেশ্বরবাবু প্রভৃতি বনিয়াদী ধনাঢ্যগণ নিজ নিজ আসনে কম্পিত হইলেন, এই ঘোর অধর্ম্মের নাম শুনিয়া তাঁহারা বাক্‌শক্তিরহিত হইলেন, এবং তাঁহাদের কালের লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা শতমুখে প্রশংসা করিয়া এখনকার কালেজের ছেলেদের স্বেচ্ছাচারিতার ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অবতার "মিষ্টার কর্ম্মকার"ও তাঁহার সারগর্ভ মত প্রকাশ করিলেন যে, "এরূপ বিধবাবিবাহ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুমোদিত নহে, এ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিড়ম্বনা মাত্র। বিধবা বাহির হইয়া আসুক, জগৎ পরিদর্শন করুক, সুসভ্য, সুরূপ যুবকদিগের সহিত আলাপ করুক, (দর্পণে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন) তৎপর দীর্ঘ কোর্টশিপের পর, একজনকে নির্ব্বাচন করুক, এইরূপ কার্য্য পাশ্চাত্ত্য সুসভ্য প্রথা; পিঞ্জরাবদ্ধ বিধবাকে বিবাহ দেওয়াই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অবমাননা মাত্র!

এই সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া সভার সভ্যাগণ বলিয়া উঠিলেন, "তাঁহারা ত জগৎ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং সুরুচিসম্পন্ন যুবকদিগের সহিতও আলাপ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের একটী করিয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা (অর্থাৎ সুন্দর বর) মিলে না কেন? তাঁহাদের একটি করিয়া বিবাহ ঘটে না কেন?" সভ্য ও সভ্যাদিগের মধ্যে এ রসের কথাটা সুধার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গড়াইল, কিন্তু পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, আমরা সে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম।

বিশ্বজগতের পরামর্শ, মতামত, বিদ্রূপ ও দোষারোপ হেমচন্দ্রের কাণে উঠিল। সন্ধ্যার সময় হেমবাবু বিন্দুর নিকট গিয়া বলিলেন,—সমাজ একমত হইয়া এই বিধবাবিবাহ নিবারণ করিতেছে, এ কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই। যাঁহাদের বিদ্যা আছে, যাহাদের বিদ্যা নাই, যাঁহারা সৎলোক, যাহারা সৎলোক নহে, যাঁহাদের শ্রদ্ধা করি, এবং যাহাদের শ্রদ্ধা করি না, সকলে একমত হইয়া এ কার্য্য নিষেধ করিতেছেন।

বিন্দু। আর তা ছাড়া এ কাজে কলঙ্ক কত, নিন্দা কত! এ কাজ করলে সমাজে আমাদের অতিশয় নিন্দা হবে।

হেম। না, তাহার বড় ভয় নাই। সমাজ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক বিশ্বাস করিতেছেন ও রটাইতেছেন, তাহা অপেক্ষা অধিক কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধবাবিবাহে

প্রকৃত অধর্ম্ম নাই, আমাদিগের হিতৈষিগণ বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া শরতের চরিত্র ও সরলা বালিকার চরিত্র সম্বন্ধে যারপরনাই অধর্ম্মসূচক প্রবাদ প্রকটিত করিতেছেন, এক্ষণে সেই অধর্ম্মাচরণ গোপন করিয়া রাখিলেই সমাজের মতে ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : যার বে তার মনে আছে

সুধার বিবাহের কথা লইয়া পাড়াপড়শীর ঘুম নাই, চল একবার সেই সুধাকে দেখিয়া আসি। ক্ষুদ্র গৃহের অভ্যন্তরে সেই সরলা বালিকা কি করিতেছিল, চল, একবার তাহা দেখিয়া আসি।

সুধার নিকট এ কথা গোপন রাখিবার সমস্ত যত্ন বৃথা হইল। যে কথা লইয়া পাড়ায় এত আন্দোলন, মেয়েমহলে এত আন্দোলন, সে কথা গোপন থাকে না। যে বাড়ীতে ঝি আছে, সে বাড়ীতে সংবাদপত্রেরও অনাবশ্যক!

তবে ঝি বিন্দুর নিষেধবাক্যের এইটুকু মান রাখিল যে সুধাকে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না, সুধার চরিত্র সম্বন্ধে যে কলঙ্ক উঠিয়াছিল, সেটুকু বলিল না। তবে শরৎবাবু যে সুধাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছেন, মাতা ঠাকুরাণীর নিকট সেই বিবাহের জন্য জেদ করিতেছেন, পাড়ায় পাড়ায় এই কথা রাষ্ট্র হইয়াছে, তাহা সুধাকে গোপনে অবগত করাইল।

বালিকা একবারে শিহরিয়া লজ্জায় অভিভূত হইল, যাতনায় অস্থির হইল। উঃ, এ কি সর্ব্বনাশের কথা, কি অধর্ম্মের কথা, এ কথা কেন উঠিল, সুধা লোকের কাছে কেমন করিয়া আর এ মুখ দেখাইবে? কালীদিদির কাছে, শরতের মাতার কাছে, দেবীবাবুর বাড়ীতে, চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে, কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে, হতভাগিনী আবার তালপুকুরে কোন্ মুখে ফিরিয়া যাইবে? ছি! ছি! শরৎবাবু এমন কাজ কেন করিলেন, বিধবার নাম কেন লজ্জায় ডুবাইলেন, এ কলঙ্ক কি আর কখনও যাবে? ঐ পথে মেয়েমানুষেরা কি বলিতে বলিতে যাইতেছে? তাহারা বুঝি সুধার কলঙ্কের কথা কহিতেছে! ঐ হেমবাবু দিদির সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন? লজ্জায়, বিষাদে, মনের যাতনায়, বালিকা অধীর হইল, মুখ ফুটিয়া সে কথা কাহাকেও কহিতে পারে না, বালিশে মুখ লুকাইয়া সমস্ত দুই প্রহর বেলা একাকিনী কাঁদিল, সন্ধ্যার সময় না খাইয়া শুইতে গেল। উঃ, শরৎবাবু কেন এমন কাজ করিলেন, দরিদ্র বিধবার কেন কলঙ্ক রটাইলেন?

কিন্তু অন্ধকারে স্থাপিত লতা যেরূপ সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া একটী সূর্য্যরশ্মির দিকে ধায়, অভাগিনী সুধার শুষ্ক অন্তঃকরণ সেইরূপ এই যাতনায় ও লজ্জায় জীবনের একটী আশা-রশ্মির দিকে ধাবিত হইল। বিষাদে অন্ধকারের মধ্যে যেন একটী কিরণচ্ছটা দেখিতে পাইল, অকূল সমুদ্রের মধ্যে যেন ধ্রুব নক্ষত্রের হীন জ্যোতি তাহার নয়নে পতিত হইল।

শরৎবাবু কেন এমন কাজ করিলেন? বোধ হয় শরৎবাবু না আসিলে সুধা যেমন পথ চাহিয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় একাকিনী বসিয়া শরৎবাবুর কথা ভাবে, শরৎবাবুও সেইরূপ সুধার কথা একবার মনে করেন। বোধ হয় দিনরাত্রি শরৎবাবু এই লজ্জার কথা ভাবেন, বোধ হয় সেই জন্যই অস্থির হইয়া শরৎবাবু এই লজ্জার কথা প্রস্তাব করিয়াছেন। বোধ হয় শরৎবাবু অনেক যাতনা পাইয়াছেন, না হইলে কি দিদির কাছে মুখ ফুটিয়া এমন কথাও বলিতে পারেন? ঝি বলে, শরৎবাবু বড় কাহিল হইয়া গিয়াছেন, অভাগিনী সুধার জন্য শরৎবাবু এত কষ্ট পাইয়াছেন? সুধার ইচ্ছা করে একবার শরৎবাবুর পা দুখানি হৃদয়ে ধারণ করে। তা কি হবে? বিধাতা কি দরিদ্র সুধার কপালে এত সুখ লিখিয়াছেন? শরৎবাবু যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কি হইতে পারে? উঃ, লজ্জার কথা, পাপের কথা, সুধা এ কথা মনে স্থান দিও না।

ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। ছোট ছোট দুটী হস্ত দিয়া সেই চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া সুধা আবার ভাবিতে লাগিল—আচ্ছা শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন সত্য সত্যই যদি তাহা হয়? দরিদ্র সুধা যদি সত্য সত্যই শরৎবাবুর গৃহিণী হয়? তাহা হইলে প্রাতঃকালে উঠিয়া সেই তালপুকুরে শরৎবাবুর বাড়ীটী পরিষ্কার করিবে, উঠান ঝাঁট দিবে, বাসন মাজিবে, কায়মনে শরৎবাবুর মাতাকে সেবা করিবে, আর স্বহস্তে শরৎবাবুর ভাত রাঁধিয়া খাইবার সময় তাঁহার কাছে বসিবে। অপরাহ্নে আক ছাড়াইয়া দিবে, বেলের পানা প্রস্তুত করিয়া

দিবে, আর স্বহস্তে মিছরীর পানার বাটী শরৎবাবুর মুখের কাছে ধরিবে। সহসা একটী পদশব্দ হইল, সুধা শিহরিয়া উঠিল, লজ্জায় মুখ লুকাইল, পাছে তাহার হৃদয়ের চিন্তা কেহ টের পায়, পাপীয়সীর পাপচিন্তা পাছে কেহ জানিতে পারে।

আর যদি শরৎবাবুর বিদেশে কোথাও চাকরী হয়? সুধা দাসীর ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, হৃদয়ের সহিত তাঁহার যত্ন করিবে। একটী ক্ষুদ্র কুটীরে তাহারা বাস করিবে, সুধা সেই কুটীরে দুটী লাউ গাছ দিবে, দুটী কুমড়া গাছ দিবে, দুই চারিটি ফুলের গাছ স্বহস্তে রোপণ করিবে। কলিকাতায় ঠাকুরদের সুন্দর সুন্দর ছবি চার পয়সা করিয়া পাওয়া যায়, সুধা তাই কিনিয়া শুইবার ঘরটী সাজাইবে! উমা সিংহে চড়িয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছে, উমার মাতা দুই হাত প্রসারণ করিয়া আলুথালু বেশে মেয়েকে একবার কোলে করিতে আসিয়াছে, দাসীগণ কেহ পাখা হাতে, কেহ খাদ্য হাতে, কেহ ফুলের মালা হাতে করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছে। অথবা অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে পতিপ্রাণা দময়ন্তী নিদ্রিত রহিয়াছে, নলরাজা উঠিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতেছে। অথবা কুঞ্জবনে রাধিকা গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে, বিদেশিনী তাহার নিকট বসিয়া কৃষ্ণের কথা বলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধিকার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। এইরূপ ঠাকুরের ছবিগুলি দিয়া সুধা ঘরটী সাজাইবে, ভাল করিয়া ঝাঁট দিয়া ঘরটী পরিষ্কার করিবে, আপন হস্তে শয্যা প্রস্তুত করিবে, সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালাইয়া শরৎবাবু আসিতেছেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিবে। শরৎবাবু বাড়ী আসিলে সুধা জল আনিয়া আপন হস্তে শরতের পা ধুইয়া দিবে, সেই পা দুখানি ধারণ করিয়া সাশ্রুনয়নে একবার বলিবে, "তোমার দয়া, তোমার যত্ন, কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? আমার জীবনসর্ব্বস্ব তোমারই, দরিদ্র বলিয়া একটু স্নেহ করিও।"

চিন্তা একবার আরম্ভ হইলে আর শেষ হয় না। প্রাতঃকালে সুধা গৃহকার্য্য করিতে করিতে এই চিন্তা করিত, দ্বিপ্রহরের সময় সমস্ত দিন জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া ভাবিত; সন্ধ্যার সময় বিন্দু ও হেমবাবু একত্র বসিয়া যখন কথাবার্ত্তা করিতেন, সুধাও তাঁহাদের কাছে বসিত, কিন্তু তাহার মন কোথায় বিচরণ করিত! তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিন্দু দেখিলেন, সুধা সমস্ত জানিতে পারিয়াছে, সুধা দিবারাত্রি চিন্তাশীল! সুধা আর প্রফুল্ল বালিকা নহে, যৌবনপ্রারম্ভে যৌবনের স্বপ্ন তাহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়াছে! সুধা সমস্তদিন অন্যমনস্কা; কখন, কদাচ, শরতের নামটী হইলেই সুধার মুখখানি লজ্জায় রঞ্জিত হইত, বালিকা অন্য কার্য্যচ্ছলে উঠিয়া যাইত।

এক দিন অপরাহ্নে বিন্দু ঘরে আসিয়া দেখিলেন, সুধা জানালার কাছে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছে, দিদি আসিতেই সুধা সে বইখানি মুড়িল!

বিন্দু। ও কি বই পড়ছিলে বোন?

একটু লজ্জিত হইয়া সুধা বলিল,—ও বঙ্কিমবাবুর একখানা বই।

বিন্দু। কি বই?

সুধা। বিষবৃক্ষ।

বিন্দুর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—ও বই আমাকে দাও, উহা পড়িও না।

সুধা দিদির হাতে বইখানি দিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন পড়িব না দিদি, ও কি খারাপ বই?

বিন্দু। না বোন, বইখানি ভাল, কিন্তু ছেলেমানুষে কি ও বই পড়ে?

সুধা। তবে দিদি তুমি আমাকে গল্পটী বলিও।

বিন্দু। গল্প আর কি, নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ হইল, কিন্তু তাহাতে সুখ হইল না, কুন্দ শেষে বিষ খাইয়া মরিল।

শুষ্ক হৃদয়ে সুধা স্থানান্তরে গেল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ : দেওয়ালী

ভারতবর্ষের দেওয়ালী একটী বড় সুন্দর প্রথা। এই কালীপূজার অন্ধকার নিশীথে ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত, যেখানে হিন্দু বাস করে সেইখানেই, গ্রাম ও নগর ও সংসারীর

গৃহ দীপাবলীতে উদ্দীপ্ত হয়! সে দিন অমাবস্যায় অন্ধকার রাত্রি আলোকে পরিপূর্ণ হয়, আকাশের নির্ম্মল নক্ষত্রসমূহ নিস্তব্ধে জগতের নক্ষত্র দেখিয়া হাস্য করে। ধনীর গৃহে উজ্জ্বল আলোক-শ্রেণীতে পরিপূর্ণ হয়, দরিদ্র গৃহিণী একটী পয়সার তেল কিনিয়া কোন প্রকারে পাঁচটী প্রদীপ সাজাইয়া সন্ধ্যার সময়ে কুটীরদ্বারে জ্বালাইয়া দেয়।

কলিকাতায় আজ বড় ধূম। গৃহে গৃহে তুবড়ী উজ্জ্বল অগ্নিকণা উদ্গিরণ করিতেছে, যেন আমাদের টাউন-হলের সদ্বক্তাদিগকে অনুকরণ করিতেছে, সেইরূপ গলার আওয়াজের সহিত তাহাদের কার্য্য শেষ হয়। যুবা যশোলিপ্সুদিগের ন্যায় হাউই বাজি আকাশের দিকে মহাতেজে উঠিতেছে, আবার তেজটুকু বাহির হইয়া গেলেই হেঁটমুখ হইয়া মাটিতে পড়িতেছে; যাহার মাথায় পড়ে তাহারই সর্ব্বনাশ। বঙ্গদেশের অসংখ্য নব্য কবির ন্যায় আজি রাত্রিতে অসংখ্য পটকা শব্দ করিতেছে—একই আওয়াজে তাহাদের উদ্যম শেষ—কেননা, প্রথম প্রকাশিত পদ্য-কুসুম বা গীতি কাব্যটী বিক্রয় হইল না। বিষয়ীর ন্যায় চরকি বাজি বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, ঘুরিতে ঘুরিতেও সকলকে জ্বালাইতেছে, মেজাজ বড় গরম, কেহ কাছে যাইতে পারে না। আর ছুঁচা বাজির ক্ষুদ্র ঘৃণিত জীবন ছুঁচামি করিয়াই শেষ হইল; কুটীলতা ভিন্ন সরল গতি তাহারা জানে না, পরকে বিরক্ত করা, পরনিন্দা, পরহিংসা, পরগ্লানি তাহাদের জীবিকার উপায়।

রাত্রি দশটার পর শরচ্চন্দ্র হেমের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিন্দুর সহিত দেখা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন, স্বয়ং হেমচন্দ্র দ্বারদেশে তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। হেমচন্দ্র নিস্তব্ধে শরতের হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে লইয়া গেলেন, শরৎ লজ্জায় ও উদ্বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমের সহিত সেই ঘরে গিয়া বসিলেন, মুখ নত করিয়া রহিলেন, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

হেম প্রদীপের সল্‌তে উসকাইয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—শরৎ, আমার স্ত্রীকে তুমি যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা শুনিয়াছি।

শরৎ অনেক কষ্ট করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—যদি আমি দোষ করিয়া থাকি, আপনার বাল্য-সুহৃদের এই একটী দোষ ক্ষমা করুন।

হেম। শরৎ, তুমি দোষ কর নাই, তোমার উন্নত চরিত্রের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছ। সমস্ত জগৎ যদি তোমাকে নিন্দা করে, জানিও তোমার প্রতি আমার মত তিলার্দ্ধও বিচলিত হয় নাই।

শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষুর জল হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। হেমচন্দ্র তাহা বুঝিলেন।

হেম। আমার স্ত্রী বাল্যকাল অবধি তোমাকে বড় ভালবাসেন, ভ্রাতার মত স্নেহ করেন, তিনি তোমার কথায় দোষ গ্রহণ করেন নাই। তোমার প্রতি আমাদিগের ভক্তি, আমাদিগের স্নেহ চিরকাল একরূপ থাকিবে।

শরৎ। আপনাদের এই দয়া আমি এ জীবনে ভুলিব না।

ক্ষণেক উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন, পরে অনেক কষ্টের সহিত শরৎ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

"আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করিয়াছেন?" শ্বাসরুদ্ধ করিয়া শরৎ উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, তাহার জীবনের সুখ বা দুঃখ এই উত্তরে নির্ভর করে।

হেম। সেই কথাই বলিতেছি। তুমি সকল দিক দেখিয়া, সকল বিষয় আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবটী করিয়াছ?

শরৎ। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি, ইহাতে কোনও পক্ষে কোনও ক্ষতি দেখিতে পাই না। যতদূর আমার সাধ্য, আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াই এ প্রস্তাবটী করিয়াছি।

হেম। শরৎ, তুমি শিক্ষিত, কিন্তু তোমার বয়স অল্প, এই জন্যই আমি দুই একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এ বিবাহে অতিশয় লোকনিন্দা।

শরৎ। অনেক নিন্দা সহ্য করিয়াছি, জীবনে অনেক নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কাজটী যদি অন্যায় না হয়, তবে নিন্দাভয়ে আমি জীবনের সুখ বিসর্জ্জন করিব?

হেম। তোমাদের একঘরে করিবে।

শরৎ। সমাজের যদি তাহাতেই রুচি হয়, তাহাই করুন। আমি সমাজের অনুগ্রহের প্রার্থী নহি।

হেম। তোমাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইবে।

শরৎ। কলঙ্ক কি? আমি বিধবা বিবাহ করিয়াছি এই কথা? এটী যদি পাপকার্য্য না হয় তবে সে কলঙ্ক আমার গায়ে লাগিবে না; যাহারা নিন্দা করিবেন, তাঁহাদের মতামতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আর যদি আপনি এ কাজ নিন্দনীয় মনে করেন, আজ্ঞা করুন, আমি ইহাতে নিরস্ত হই।

হেম। বিধবাবিবাহ বোধ হয় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, কিন্তু আধুনিক রীতি-বিরুদ্ধ।

শরৎ। ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রগমনও রীতিবিরুদ্ধ ছিল, অদ্য জাহাজে করিয়া সহস্র সহস্র যাত্রী জগন্নাথ যাইতেছে। চন্দ্রনাথবাবু সেদিন বলিলেন, অস্বাস্থ্যকর নিয়মগুলির ক্রমশঃ সংস্কার হওয়াই জীবিত সমাজের লক্ষণ। ক্রমশঃ উন্নতিই জীবনের চিহ্ন, গতিহীনতা মৃত্যুর চিহ্ন।

হেম। শরৎ, তুমি চিন্তাশীল, তুমি উদারচরিত্র, একটী কথা আমি স্পষ্ট করিয়া বলিব, বিশেষ চিন্তা করিয়া তোমার প্রকৃত মতটী আমাকে বলিও। দেখ, হৃদয়ের উদ্বেগ চিরকাল সমান থাকে না, অদ্য যে প্রণয় আমাদিগকে উন্মত্তপ্রায় করে, দুই বৎসর পর সেটী হ্রাস পায় অথবা আমরা সেটী একেবারে ভুলিয়া যাই। সুধার প্রতি তোমার এরূপ প্রণয় চিরকাল না থাকিতে পারে, তখন তোমার মনে কি একটু আক্ষেপ উদয় হইবে না? উত্তর করিও না, আমি যাহা বলিতেছি আগে মন দিয়া শুন। তখনও তোমরা একঘরে হইয়া থাকিবে, বন্ধুগণ তোমাদের গৃহে আহার করিবে না, তোমার কন্যাকে কেহ বিবাহ করিবে না, তোমার পুত্রকে কেহ গৃহে ডাকিবে না, সমাজের মধ্যে তোমরা একক! তখন হয়ত মনে উদয় হইবে, কেন বাল্যকালে না বুঝিয়া একটী কাজ করিয়া এত বিপদ্ জড়াইলাম, আমার স্নেহের পাত্র, ভালবাসার পাত্র পুত্রকন্যাকে জগতে অসুখী করিলাম। শরৎ, যে কাজে এই ফল সম্ভব, সে কাজে কি সহসা হস্তক্ষেপ করা বিধেয়? যৌবনের সময় একটু বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়া বার্দ্ধক্যের অনুশোচনা দূর করা উচিত নহে? সুধার ন্যায় অনিন্দনীয়া রূপবতী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া সরল-হৃদয়া অনেক বালিকা কায়স্থগৃহে আছে, তোমার ন্যায় জামাতা পাইলে তাহাদের পিতামাতা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিবেন, সেরূপ বিবাহ করিলে, এখন না হউক কালে তুমিও সুখী হইবে। শরৎ তুমি বুদ্ধিমান; বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর, এখনকার লালসার বশবর্ত্তী না হইয়া যাহাতে জীবনে সুখী হইবে তাহাই কর।

শরৎ। হেমবাবু, আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি কেবল হৃদয়ের উদ্বেগের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রস্তাব করি নাই, জীবনে সুখী হইব সেই আশায় প্রস্তাব করিয়াছি। আপনি যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা শতবার আমার মনে উদয় হইয়াছে, আলোচনা করিতে ত্রুটী করি নাই। আক্ষেপের বিষয় যাহা বলিতেছেন, যদি বিধবাবিবাহ নিন্দনীয় কার্য্য হয়, তবে আক্ষেপ হইবে বটে, যদি তাহা না হয়, তবে তজ্জন্য কখনই আমার হৃদয়ে আক্ষেপ উদয় হইবে না। বলুন, এই বিস্তীর্ণ সমাজে কোন্ বিজ্ঞ লোক সৎকার্য্য করিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন? ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অনেকে জাতি হারাইয়াছেন, বিদেশ গমন করিয়া অনেকের জাতি গিয়াছে, ইঁহাদিগের মধ্যে কোন্ তেজস্বী লোক সেইরূপ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন? সমাজের সংস্কার-পথে তাঁহারা অগ্রগামী হইয়াছেন, এই চিন্তা তাঁহাদিগের জীবনের সুখের হেতু হয়, এই চিন্তা তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যে শান্তি দান করে। হেমবাবু, তাঁহারা সমাজের বহির্ভূত নহেন, সমাজ অদ্য তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, সমাদর করে, স্নেহ করে, কল্য তাঁহাদিগকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিবে। এইরূপে সমাজসংস্কার সিদ্ধ হয়, এইরূপে জীবিত সমাজ হইতে অনিষ্টকর নিষেধগুলি একে একে স্খলিত হয়।

হেমবাবু, পরে আক্ষেপ হইবে এরূপ কাজ করিতেছি না, চিরকাল সুখে থাকিব, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় চিরকাল অভাগিনী সুধাকে সুখী করিব, এই জন্য এই কাজ করিতেছি।

সুধার মন, সুধার হৃদয়, সুধার স্নেহ, সরলতা ও আত্মবিসর্জ্জন আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি, সুধা আমার সহধর্ম্মিণী হইলে এ জীবন অমৃতময় হইবে। হেমবাবু, আমার হৃদয়ের

উদ্বেগের কথা বলিয়া আপনাকে ত্যক্ত করিব না, কিন্তু যদি এ বিবাহে আপনাদিগের মত না হয়, আমার জীবনের উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও চেষ্টা অদ্য সাঙ্গ হইল, হৃদয়ে একটী শেল লইয়া শ্রমজীবীরা পরিশ্রম করে না।

হেমচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন,—একটী বালিকার জন্য উৎসাহী পুরুষের জীবনের উৎসাহ লোপ হয় না, একটী নৈরাশ্যে তোমার ন্যায় উন্নতহৃদয় যুবকের জীবনের চেষ্টা ও উদ্যম ক্ষান্ত হইবে না।

হতাশ হইয়া শরৎ বলিলেন,—একটী অবলম্বন না থাকিলে মনুষ্য-হৃদয়ে উৎসাহ, চেষ্টা, ধর্ম্ম কিছুই থাকে না, অদ্য আমার জীবন অবলম্বনশূন্য হইল। কিন্তু এ কথা আপনাকে বুঝাইতে পারি এরূপ আমার ক্ষমতা নাই। তবে আপনারা স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আপনাদিগের মত নাই?

হেমচন্দ্র শরতের দুইটী হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন,—শরৎ, তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া এই কার্য্যটী করিতেছ কি না, তাহাই দেখিতেছিলাম। উপরে যাও, আমার স্ত্রী তোমাকে বলিবেন, এ বিবাহে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। হতভাগিনী সুধার জীবন জগদীশ্বর সুখপূর্ণ করিবেন, তাহাতে কি আমাদের অমত হইবে? জগদীশ্বর তোমাদের উভয়কে সুখী করুন।

শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ধারা বহিয়া তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল! তিনি নীরবে হেমের হাত দুটী আপনার মাথায় স্থাপন করিলেন, পরে উপরে গেলেন।

শয়নঘরে বিন্দু একটী প্রদীপ জ্বালিয়া একটী মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিলেন, শরৎ সহসা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বিন্দুর পা দুটী ধরিয়া নয়নজলে সিক্ত করিয়া গদ্‌গদ্‌ স্বরে বলিলেন, —বিন্দুদিদি, তুমি আমাকে জীবন দান করিলে, এ দয়া, এ স্নেহের কি পরিশোধ করিতে পারি?

বিন্দু। ও কি শরৎবাবু, ছাড়, ছাড়, ছি! ছি! যার পা ধর্‌তে হবে, সে ধর্‌বেই এখন, আমাকে কেন, ছি! ছেড়ে দাও।

শরৎ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—বিন্দুদিদি, তুমি হেমবাবুকে এ কথা বুঝাইয়াছ, তুমি এ কার্য্যে সম্মত হইয়াছ, তাহার জন্য আমি চিরকাল তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

বিন্দু। আর সম্মতি না দিয়া কি করি? যখন বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা সম্মত হয়েছেন, তখন আর আমরা বারণ করে কি করি?

শরৎ। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা কে?

বিন্দু। দেখ্‌তে পাচ্ছি বরই বরকর্ত্তা, কন্যাই কন্যাকর্ত্তা! বর এসে কনে দেখে গেলেন, বেশ পছন্দ হল, আর কনেও লুকিয়ে লুকিয়ে বর দেখ্‌লেন, বেশ পছন্দ হল, সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল!

শরৎ। বিন্দুদিদি, একবার উপহাস ত্যাগ কর, তুমি নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তোমার সম্মতি প্রকাশ করিয়া আমার মনকে শান্ত কর! সুধা ছেলেমানুষ, তার আবার সম্মতি কি? সে এ গুরু কার্য্যের কি বুঝিবে বল?

বিন্দু। না গো, সে এখন বেশ বুঝতে সুঝতে শিখেছে। তা বুঝি জান না? সে যে এখন সেয়ানা মেয়ে হয়েছে, লুকিয়ে লুকিয়ে বিষবৃক্ষ পড়ে!

শরৎ। তোমার পায়ে ধরি বিন্দুদিদি, ঠাট্টা ছাড়, একবার তোমার মনের কথাটী বলিয়া আমাকে তৃপ্ত কর।

বিন্দু। না বাবু, পায়েটায়ে ধরো না, এখনই সুধা দেখ্‌তে পাবে, আবার রাগ করবে? তুমি চলে গেলে কি আমরা দুটী বোনে কোঁদল কর্‌ব? পরের দায়ে কেন ঠেকা বাবু?

শরৎ। তোমার সঙ্গে আর পারিলাম না বিন্দুদিদি! মনে করিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিব, সব ঠিকঠাক করিব, তা দেখিতেছি আজ কিছুই হইল না।

বিন্দু। তা ঠিকঠাক আর কি? কেবল বামুন পুরুত ডাকা বাকি আছে বৈ ত নয়, তা না হয় ডেকে দি বল? না, কি আজকাল কলেজের ছেলে নিজে নিজেই বামুন পুরুতের কাজ সেরে নেয় তাও ত জানি না। স্ত্রী-আচারটা কি আমাদের কর্‌তে হবে, না তাও সুধা নিজেই সেরে নেবে? তা না হয় সুধাকে ডেকে দি? ও সুধা! একবার এদিকে আয় ত বোন, শরৎ-বাবু তোমাকে ডাকচেন, বড় দরকার, একটু শীঘ্র করে আয়।

শরৎ হতাশ হইয়া উঠিলেন, বিন্দুও হাসিতে হাসিতে উঠিলেন। তখন শরৎ বিন্দুর দুটী হাত ধরিয়া বলিলেন,—বিন্দুদিদি, তুমি ছেলেবেলা থেকে আমাকে বড় স্নেহ কর, একটী কথা শুন। তুমি এ কার্য্যে সম্মত হইয়াছ, হেমবাবু তাহা আমাকে বলিয়াছেন, একবার সেই কথাটী মুখে বলিয়া আমাকে তৃপ্ত কর, একবার আমাদের আশীর্ব্বাদ কর।

বিন্দু তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, শরৎবাবু, ভগবান আমার অভাগিনী ভগিনীর জীবনের সুখের উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে কি আমাদের অমত? ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন, তোমার চেষ্টাগুলি সফল করুন, তোমাকে মান ও যশ দান করুন। অভাগিনী সুধাকে ভগবান সুখে রাখুন, যেন চির-পতিব্রতা হইয়া সংসারে সুখলাভ করে।

সাশ্রুনয়নে শরৎ উত্তর করিলেন,—বিন্দুদিদি, জগদীশ্বর তোমার এ দয়ার পুরস্কার দিবেন। তোমাদের দয়া, তোমাদের সৎকার্য্যে সাহস, তোমাদের অনিন্দনীয় স্নেহ জগতে দুর্লভ। লোকনিন্দা ভয় করিও না; বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিতগণ বলেন, বিধবাবিবাহ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে।

বিন্দু। শরৎবাবু, আমি মেয়েমানুষ, আমি শাস্ত্র বুঝি না। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, কচি মেয়েকে আমরা চিরকাল যাতনা দিব এরূপ আমাদের শাস্ত্রের মত নয়, দয়াবান পরমেশ্বরেরও ইচ্ছা নয়।

জগতের মধ্যে সুখী শরচ্চন্দ্র বিন্দুর নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় লইলেন। নীচে উঠানে আসিলেন। দেখিলেন, সুধা ভাঁড়ার ঘরের দরজায় চাবি দিয়া একটী প্রদীপ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। শরৎ সুধাকে প্রায় দুই মাস অবধি দেখেন নাই, তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল, শরীর কণ্টকিত হইল। ঐ লাবণ্যময়ী পবিত্রহৃদয়া স্বর্গীয়া কন্যা কি শরতের হইবে? ঐ স্নেহপ্লাবিত নির্ম্মল নয়ন দুটী কি শরৎ চুম্বন করিবেন? ঐ লতা-বিনিন্দিত কমনীয় পেলব বাহু দুটী কি শরৎ নিজ বাহুতে ধারণ করিবেন? ঐ কুসুম-বিনিন্দিত লাবণ্য-বিভূষিত দেহলতা কি শরৎ নিজ বক্ষে ধারণ করিবেন? শরতের দরিদ্র কুটীরে কি ঐ সুন্দর কুসুমটী দিবারাত্রি প্রস্ফুটিত থাকিবে? প্রাতঃকালে ঊষার আলোকের ন্যায় ঐ প্রণয়-আলোক কি শরতের জীবন আলোকিত করিবে? সায়ংকালে ঐ স্নেহ-প্রদীপ কি শরতের ক্ষুদ্র কুটীর উজ্জ্বল করিবে? অসংখ্য উদ্যমে, অসংখ্য চেষ্টায়, ক্লেশে ও পরিশ্রমে, ঐ স্নেহময়ী ভার্য্যা কি শরতের জীবনে শান্তিদান করিবে, জীবন সুখময় করিবে? এইরূপ চিন্তা-লহরীতে শরতের পূর্ণ হৃদয় উথলিতে লাগিল, শরৎ একটী কথা কহিতে পারিলেন না।

সুধা কবাটের শিকলি দিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দেখিল, শরৎবাবু দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা তাহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, সুধা হেঁটমুখী হইল, মাথার কাপড়টী টানিয়া দিল। আবার শরৎবাবুর কাছে মাথায় কাপড় দিল মনে করিয়া অধিক লজ্জিত হইল, চক্ষু দুটী মুদিত করিল, চক্ষুর উপরের চর্ম্ম পর্য্যন্ত লজ্জায় রঞ্জিত হইয়াছে। সুধা আর দাঁড়াইতে পারিল না, দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

সুধার সেই রঞ্জিত অবনত মুখখানি অনেক দিন শরতের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। ক্লেশে, নৈরাশ্যে, পীড়ায়, সে মূর্ত্তি অনেক দিন তাঁহার স্মরণপথে আরোহণ করিয়াছিল।

আনন্দ ও উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে শরৎ বাটী আসিলেন। শরতের ভাগ্যে কি এই স্বর্গীয় সুখ যথার্থই আছে? না অদ্য রজনীর দীপাবলীর ন্যায় এই সুখের আশা সহসা নিবিয়া যাইবে, ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার শরতের হৃদয় পূর্ণ করিবে? অপরিমিত সুখ মনুষ্যভাগ্যে প্রায় ঘটে না, অপরিমিত সুখের সময় মনুষ্যহৃদয়ে এইরূপ ভয়ের উদয় হয়।

বাটী আসিবামাত্র শরতের হস্তে একখানি পত্র দিল। শরতের হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল, কেন হইল শরৎ তাহা জানেন না।

উপরে গিয়া বাতির আলোকে শরৎ দেখিলেন, তাঁহার মাতার চিঠি। মাতা গুরুকে দিয়া পত্র লিখাইয়াছেন। পত্র এইরূপ—

“বাছা শরৎ! তুমি সুস্থ শরীরে কুশলে থাক, তোমার চেষ্টা সফল হয়, তোমার জীবন সুখময় হয়, তাহাই ভগবানের নিকট দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতেছি।

“বাছা, আজ একটী নিন্দার কথা শুনিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। বাছা শরৎ, তুমি ভাল

ছেলে, তুমি মাকে ভালবাস, আমি এ নিন্দার কথা বিশ্বাস করি না; তুমি তোমার অভাগিনী মাতাকে কষ্ট দিবে না।

"লোকে বলে, তুমি সুধাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। বাছা, এটী অধর্ম্মের কথা, এ কাজটী করিয়া তোমার বাপের নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক দিও না, তোমার মা যত দিন বেঁচে আছে, তাহাকে তুমি কষ্ট দিও না। বাছা, তুমি ত কথার অবাধ্য ছেলে নও।

"বাছা শরৎ, আমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। তোমার বাপ আমাকে কাঁদিয়ে রেখে গিয়েছেন, বাছা কালীর যে অবস্থা, তা তুমি জান। তুমি আমার হৃদয়ের ধন, তোমার আশায় বেঁচে আছি, এ বয়সে তুমি আমাকে কাঁদাইও না, আমার অধিক দিন বাঁচ্‌বার নেই।

"আমার মাথার চুলের মত তোমার পরমায়ু হোক। ভগবান তোমাকে সংসারে সুখ দান করুন, পুণ্যকর্ম্মে তোমার মতি হোক। এ অভাগিনী আর কি আশীর্ব্বাদ করবে?"

শরৎ একবার, দুইবার, তিনবার এই পত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, দুর্ব্বল হস্ত হইতে পত্রখানি পড়িয়া গেল; শরৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : মাতা ও সন্তান

সে দিন রাত্রিতে শরৎ যে যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। নৈরাশ্যের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া তাঁহার হৃদয়কে আবৃত করিল, ঘৃণা ও লজ্জা তাঁহাকে ব্যথিত করিল, বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, এই চিন্তা শত বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল।

যে স্বপ্নবৎ সুখের আশা ছয় মাস ধরিয়া শরৎ হৃদয়ের হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করিয়াছেন, তাহা অদ্য জলাঞ্জলি দিবেন? মাতৃআজ্ঞা পালনার্থ শরৎ তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন। সমস্ত জীবন সুখশূন্য, উদ্দেশ্যশূন্য, আশাশূন্য হইবে, মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক ও রসশূন্য হইবে, দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতে পারিবেন? মাতৃআজ্ঞার জন্য শরৎ তাহাতেও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু জীবনের প্রিয়তম বন্ধু হেমচন্দ্র ও বিন্দুর নামে আজি যে কলঙ্ক রটিল, সমাজে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে, তিরস্কার করিবে, অঙ্গুলী দিয়া তাহাদিগের দিকে দেখাইয়া দিবে, শরৎ সেটী কি সহ্য করিতে পারিবেন? লোকে এখন বলিবে, ঐ দুইজনে একটা নষ্টা বিধবাকে শরতের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিল, শরৎ বুঝিয়া সুঝিয়া সে বিবাহ করিলেন না, ব্যভিচারিণীটা হেমবাবুর ঘরেই আছে, এ হৃদয়-বিদারক কথা কি শরৎ সহ্য করিতে পারিবেন? যে বিন্দু বাল্যকালাবধি শরতের স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায়, তাঁহার প্রতি শরৎ এইরূপ আচরণ করিবেন? যে হেমবাবু স্বীয় ঔদার্য্যগুণে শরৎকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন, লোকনিন্দা তুচ্ছ করিয়া আজি কেবল শরৎ ও সুধার মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া শরতের বিষম প্রস্তাবেও সম্মত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কি শরৎ জগতের তিরস্কার ও ঘৃণার পদার্থ করিবেন? যে স্নেহপূর্ণ নিষ্কলঙ্ক পরিবারে প্রবেশ করিয়া শরৎ এতদিন শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আজি কি কুটিলগতি বিষধর সর্পের ন্যায় তাহাদিগকে দংশন করিয়া চলিয়া আসিবেন? কালবিষে সে পরিবার জর্জ্জরিত হউক, ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, অনপনেয় কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন হউক, শরৎ নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিবেন? এ চিন্তা শরতের অসহ্য হইল, অসহ্য বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মাতা, ক্ষমা কর, আমি এ কাজটী পারিব না।"

আর সেই ধর্ম্ম-পরায়ণা, পবিত্র-হৃদয়া হতভাগিনী সুধা? ছয় মাস পূর্ব্বে সে বালিকা ছিল, প্রণয়ের কথা জানিত না, বিবাহের কথা মনে উদিত হয় নাই। এই ছয় মাসের মধ্যে শরৎই তাহাকে প্রণয় শিখাইয়াছে, বালিকার হৃদয়ে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন আশা জাগরিত হইয়াছে। আহা! ঊষার আলোক যেরূপ নিস্তব্ধে ধীরে ধীরে সুপ্ত জগতে ও গভীর আকাশে প্রসারিত হয়, এই নূতন আশা অনাথিনী বিধবার হৃদয়ে সেইরূপ ব্যাপ্ত হইয়াছে, আজি লজ্জাবতী নম্রমুখী বিধবা তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় প্রণয়-বারির জন্য চাহিয়া রহিয়াছে। এখন শরৎ তাহাকে বঞ্চিতা করিবেন? চিরকাল হতভাগিনী করিবেন; কলঙ্কে কলঙ্কিতা করিয়া তাহাকে এই নিষ্ঠুর সংসার-মধ্যে ত্যাগ করিবেন? হয়ত অসহ্য অবমাননা ও কলঙ্কে দগ্ধহৃদয়া হইয়া অকালে সে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা চিরজীবন হৃদয়ে এই নিষ্ঠুর শেল বহন করিয়া জীবন্মৃত হইয়া

থাকিবে! শরৎ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, গর্ব্বিত যুবক আজি ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

ঘর বড় গরম হইল। শরৎ উঠিয়া গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইলেন, শরৎকালের নৈশবায়ু তাঁহার ললাটে লাগিল, তাঁহার জ্বলন্ত মুখমণ্ডল ঈষৎ শীতল হইল। সমস্ত জগৎ সুপ্ত ও নিস্তব্ধ। অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ ও মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, আকাশ হইতে অসংখ্য তারা এই পাপপূর্ণ, শোকপূর্ণ জগতের দিকে নিস্তব্ধে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে।

মাতা পত্রে লিখিয়াছেন, তিনি দুই একদিনের মধ্যে কলিকাতায় আসিবেন। মাতাকে এ সকল কথা বুঝাইলে তিনি বুঝিবেন; এ কার্যে তিনি সম্মতি দিবেন? সে বৃথা আশা! শরৎ মাতাকে জানিতেন, বার্দ্ধক্যে, বৈধব্যে, তিনি কখনই এ কার্য্যে সম্মত হইবেন না, কিংবা যদি মুখে সম্মতি প্রকাশ করেন, হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইবেন, পুত্রের আচরণে অচিরে শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। করযোড় করিয়া সেই নীল আকাশের দিকে চাহিয়া শরৎ সাশ্রুনয়নে কহিলেন, “পুণ্যা জননি! আমি যেন সন্তানের আচরণ না ভুলি, তোমার হৃদয়ে যেন সন্তাপ না দিই, তোমার শেষ কাল যেন তিক্ত না করি!”

সমস্ত রাত্রি চিন্তার দংশনে শরচ্চন্দ্র ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার শরীর একটু শীতল হইল, মন একটু শান্তি লাভ করিল, তিনি কর্ত্তব্য নিরূপণ করিলেন। শোকসন্তপ্ত কিন্তু শান্ত হৃদয়ে তিনি দিবালোক প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল। কতক্ষণ নিদ্রা গেলেন তাহা তিনি জানেন না, কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন, কেহ কোমল হস্তে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছে। তখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, দেখিলেন, তাঁহার স্নেহময়ী মাতা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া বাৎসল্য ও স্নেহের সহিত তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। শরৎ উঠিবামাত্র তাঁহার মাতা বলিলেন,—বাছা শরৎ, তুমি এত কাহিল হইয়া গিয়াছ; আহা তোমার মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে। আহা বিছানায় না শুইয়া ভূমিতে শুইয়া আছ কেন? এস বাছা, বিছানায় এস।

শরৎ। না মা, আমি বেশ ঘুমাইয়াছি, আর ঘুমাব না। মা, তুমি কখন এলে? কবে আসিবে তাহা ঠিক করিয়া আমাকে লিখ নাই কেন? ষ্টেশন হইতে আসিতে তোমার কোন কষ্ট হয়নি ত?

মাতা। না বাছা, আমার সঙ্গে গুরু এসেছেন, তিনি গাড়ী ঠিক করে দিয়েছেন, আমার কোনও কষ্ট হয় নাই।

শরৎ। মা, আমি না বুঝিয়া সুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি, তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, সেটী ক্ষমা কর। তোমার চিঠি পাইয়া আমার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছি। মা, আমি তোমার অবাধ্য হইব না, যদি কিছু কষ্ট দিয়া থাকি, সন্তানকে সেটুকু ক্ষমা কর। মা, তুমি আমার সকল দোষই ত ক্ষমা কর।

বৃদ্ধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি স্নেহগদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন, —বাছা শরৎ, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তুই আমার কথাটী রেখে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌লি। বাছা, তুমি আমার কথা রাখিবে তাহা জানিতাম, তুমি ত আমার অবাধ্য ছেলে নও। আহা, ভগবান তোমাকে সুখী করুন।

মাতার হস্ত দুটী মস্তকে স্থাপন করিয়া শরচ্চন্দ্র অবারিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মাতা অঞ্চল দিয়া পুত্রের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন, মাতৃস্নেহে পুত্রের হৃদয় শান্ত হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ কুলগৌরবের পরিণাম

সুধার সহিত শরতের বিবাহের কথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি মেয়েমহলে সে কলঙ্কের কথা লইয়া অনেক দিন অবধি নাড়াচাড়া হইতে লাগিল, এমন সরস কথা কি আর রোজ রোজ মিলে? কালীতারার শাশুড়ীরা ত হাটের নেড়া হুজুক চায়, যখন একটু কাজকর্ম্ম করিয়া অবসর হয়, অথবা কালীতারাকে গঞ্জনা দিতে ইচ্ছা হয়, অমনি কথায় কথায় ঐ কথা উঠে।

ছোট। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, মুখেই ভেঙ্গেছে, কাজে কি আর ভাঙ্গে? আমার বোন

কলকেতায় এসেছেন, ছেলে আর কি করে, দিন কত চুপ করে আছে। বেনও গঙ্গাযাত্রা করবেন, আর ছেলেটা ঐ হতভাগী ছুঁড়ীটাকে আবার বিয়ে করবে।

মেজ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বেন বড় গুণবতী। ঐ পোড়ারমুখী ত সব করেছে, ও না করলে কি আর সম্বন্ধ হত? তারপর আমাদের ভয়ে সে কাজটা থেমে গেল, আমাদের ঘরে মেয়ে দিয়েছে, পোড়ারমুখীর প্রাণে ভয় নেই, ঐ বিয়ে হলে কি আজ কালীকে আস্তো রাখতুম? আহা, যেমন নচ্ছার মা, তেমনি নচ্ছার মেয়েও হয়েছে, এমন ছোটনোকের ঘরের মেয়েও বিয়ে করে আনে? আমাদের এমন কুলেও কালি দিয়েছে।

ছোট। আর সেই মাগীই কি নচ্ছার বাবু—ঐ হেমবাবুর স্ত্রীর কি নজ্জা সরম নেই? সে কিনা বিধবা বোনটাকে বিয়ে দিতে রাজী হল? ও মা ছি! ছি! চৌদ্দ পুরুষকে একেবারে কলঙ্কে ডোবালে? অমন মেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। বাপমা নুন খাইয়ে মেরে ফেলেনি কেন?

মেজ। আর সেই এক রত্তি মেয়েটাই কি নচ্ছার গা? অমন বিধবাটাকে কি আর ঘরে রাখতে হয়? অন্য নোক হলে কাশী বৃন্দাবন পাঠিয়ে দিত, কি হরিনামের মালা হাতে দিয়ে বৈষ্ণবদের আখড়ায় পাঠিয়ে দিত। ছি! ছি! ভদ্রনোকের ঘরে এমন নজ্জার কথা?

ছোট। তা দিক্ না সেটাকে বের করে, আর এত ঢলাঢলি কেন, সেটাকে বাজারে বের করে দিক্ না?

মেজ। ওলো ঢলাঢলির কি হয়েছে? আরও হবে। তোরা ত বোন সব কথা জানিসনি, আমি ওদের সব শুনেছি। এই দেখ না কি হয়? বড় দেরী নেই। তখন কেমন করে নুকোয় দেখ্‌ব। পুলিসে খবর দেব না? অমন কুটুম থাকার চেয়ে না থাকা ভাল, কুটুমের মুখে আগুন।

ছোট। আবার বেন কল্‌কেতায় এসে কালীকে নিতে নোক পাঠিয়েছিল। একটু নজ্জা সরম নেই গা?

মেজ। ওলো, লজ্জা সরম থাক্‌লে আর পোড়ারমুখী ছেলের অমন সম্বন্ধ করে? তা হতভাগ্য বংশে আর কি হবে বল না? বৌমাকে নিতে আসবে? কাঠের চেলা দিয়ে পিঠ ভেঙ্গে দেব না? কালী একবার যাবার নাম করুক দিকি? ওর পিঠের চামড়া যদি না তুলি ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। ছি! ছি! অমন ঘরে বৌ পাঠায়, ওদের ছুঁলে আমাদের সাত পুরুষের জাত যায়, কি ঝকমারি হয়েছে যে এমন হাড়ী ডোমের ঘরে গিয় বাবু বিয়ে করেছেন। ছি! ছি! ছি!

এইরূপ বংশের সুখ্যাতি, মাতার সুখ্যাতি, শরতের সুখ্যাতি, বিন্দু ও সুধার সুখ্যাতি কালীতারাকে কতদিন শুনিতে হইত তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু অমৃতভাষিণীদিগের সে অমৃত বচন এক্ষণে কিছুদিনের জন্য মুলতুবি রহিল। বাবুর পীড়া সহসা এত বৃদ্ধি পাইল যে তাঁহার প্রাণের সংশয়; তখন সকলে তাঁহার চিন্তায় ব্যাকুল হইল।

তখন কালীতারার খুড়-শাশুড়ীরা বড়ই ভয় পাইল, সে বিপুল বংশ গোছাইয়া রাখিতে পারে এমন আর একজন লোক সে বংশে ছিল না। কালীতারা ভয়ে ও চিন্তায় শীর্ণ হইয়া গেল, খাইবার সময় খাওয়া হইত না, রাত্রিতে চিন্তায় ঘুম হইত না, কেবল বাবু কেমন আছেন জানিবার জন্য ছট্‌ ফট্‌ করিতেন। ভগিনীপতির সংকটাপন্ন পীড়ার সংবাদ পাইয়া শরচ্চন্দ্র সে বাটীতে আসিলেন, কয়েকদিন তথায় রহিলেন। হেমচন্দ্রও প্রত্যহ প্রাতঃকালে আসিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তথায় থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে কাণাকাণি করিত, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। হেমকে দেখিয়া শরৎও একটু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু উদারচরিত্র হেম শরৎকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "শরৎ, তুমি আর আমাদের বাড়ী যাও না কেন? তুমি মন্দ কার্য্য কর নাই, লজ্জা কিসের? বিবাহে তোমার মাতার মত নাই, মাতার কথা অনুসারে কার্য্য করিয়াছ, তাহা কি নিন্দনীয়? তোমার মাতার অমতে তুমি যদি বিবাহ করিতে স্বীকার করিতে, আমরা স্বীকার করিতাম না। শরৎ, তোমার কার্য্যে দোষ নাই, দোষের কার্য্য না করিলে নিন্দার কারণ নাই। লোকের কথা আমরা গ্রাহ্য করি না, তুমিও গ্রাহ্য করিও না।" শরৎ হেমের এই কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যে বাল্যবন্ধুকে তিনি জগতের ঘৃণাস্পদ করিয়াছেন, যাঁহার পবিত্র সংসার তিনি কলঙ্কিত করিয়াছেন, সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি আপনি আসিয়া শরতের হাত ধরিয়া

তাঁহাকে সকল মার্জ্জনা করিলেন। শরৎ হেমের কথায় উত্তর দিতে পারিলেন না, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল, মনে মনে কহিলেন, “এতদিন আপনাকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া স্নেহ করিতাম, অদ্য হইতে দেব বলিয়া পূজা করিব।”

হেমচন্দ্র ও শরৎ রোগীর যথেষ্ট শুশ্রূষা করিলেন। ঠাকুরের প্রসাদ বন্ধ করিয়া দিলেন। অর্থব্যয়ে সংকুচিত না হইয়া কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসকগণকে প্রত্যহ ডাকাইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন হয় দেখিবার জন্য শরৎ দিবারাত্রি রোগীর ঘরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এক সপ্তাহ উৎকট পীড়া সহ্য করিয়া কালীতারার স্বামী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কালীর শরীরখানি চিন্তায় আধখানি হইয়া গিয়াছিল; এ সংবাদ পাইবামাত্র সে চীৎকার শব্দে রোদন করিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিত হইল।

শরৎ অনেক জল দিয়া, বাতাস করিয়া দিদিকে সংজ্ঞা দান করিলেন, তখন কালীতারা একবার স্বামীকে দেখিবেন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। শরচ্চন্দ্র সেটী নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না, আলুথালু বেশে মুক্ত কেশে শোকবিহ্বলা কালীতারা স্বামীর ঘরে দৌড়াইয়া গেলেন, মৃত স্বামীর চরণ দুটী মস্তকে স্থাপন করিয়া ক্রন্দনধ্বনিতে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। কালীতারা স্বামীর প্রণয় কখনও জানেন নাই, অদ্য সে প্রণয়টী জানিলেন, শূন্য-হৃদয় বিধবা অসহ্য যাতনায় স্বামিপদে বার বার লুণ্ঠিত হইয়া অভাগিনীর কান্না কাঁদিতে লাগিলেন। একবার করিয়া মৃতস্বামীর মুখমণ্ডল দেখেন, আর একবার করিয়া হৃদয় উথলিয়া উঠে, রোদনেও তাহার শান্তি হয়। ক্ষণেক পর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কালীর চৈতন্য-শূন্য শীর্ণ দেহ হস্তে উঠাইয়া শরৎ অন্য ঘরে লইয়া আসিলেন।

কয়েকদিন পরে কালীতারার শ্বশুরবাড়ীর সকলে বর্দ্ধমানে প্রস্থান করিলেন। শোকবিহ্বলা বিধবা ভবানীপুরে শরতের বাড়ী আসিয়া মাতার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে শান্তিলাভ করিলেন। কালীর বয়ঃক্রম ২০ বৎসর হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সম্মুখের সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, শরীরখানি অতি শীর্ণ, শোকে ও কষ্টে নানারূপ রোগের সঞ্চার হইয়াছে। দেখিলে তাঁহাকে চত্বারিংশৎ বৎসরের চিররোগিণী বলিয়া বোধ হয়। চিরদুঃখিনী মাতৃস্নেহে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন।

কুলমর্য্যাদা দেখিয়া কালীর বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু উৎকৃষ্ট কুল হইলেই সর্ব্বদা সুখ হয় না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : ধনগৌরবের পরিণাম

আমরা একজন হতভাগিনীর কথা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে লিখিলাম, আর একজন হতভাগিনীর কথা এই পরিচ্ছেদে লিখিব। শোকের কথা আর লিখিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু যখন সংসারের কথা লিখিতে বসিয়াছি, তখন শোকের কাহিনীই লিখিতে বসিয়াছি। শোকদুঃখের কথা না লিখিলে সংসারের চিত্রটী প্রকৃত হয় না। সংক্ষেপে সে কথাটী লিখিব।

কালীতারার স্বামীর পীড়ার সময় হেমচন্দ্র সর্ব্বদাই সেই বাড়ীতে থাকিতেন, সুতরাং বিন্দু বাড়ী হইতে বড় বাহির হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের পাড়ার লোকে অনুগ্রহ করিয়া যেরূপ প্রবাদ রটাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার বাড়ীর বাহিরে যাইতে বড় ইচ্ছাও ছিল না। তবে উমাতারা কেমন আছে, জানিতে বড় উৎসুক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইতেন, লোকে যে খবর আনিত, তাহাতে বিন্দুর বড় ভয় হইতে লাগিল। কয়েকদিন পরে তিনি পাল্কী করিয়া উমার বাড়ী গেলেন।

বিন্দু পথে মনে করিতেছিলেন, তাঁহার জ্যেঠাইমা তাঁহাকে কত তিরস্কার করিবেন, কিন্তু বাড়ী পঁহুছিয়া তাঁহার জ্যেঠাইমাকে যে অবস্থায় দেখিলেন, তাহাতে বিন্দুর চক্ষুতে জল আসিল। জ্যেঠাইমার চিরপ্রফুল্ল মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে, ভাসা ভাসা নয়ন দুটী বসিয়া গিয়াছে, কাক পক্ষীর ন্যায় কৃষ্ণ কেশগুলি স্থানে স্থানে শুক্ল হইয়াছে, সে স্থূল শরীরখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কন্যার সেবায় দিবারাত্রি জাগরণ করিয়া, কন্যার মানসিক কষ্টের জন্য দিবারাত্রি রোদনে ও চিন্তায় উমার মাতা অকালে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিন্দু আসিবামাত্রই তাঁহার জ্যেঠাইমা চক্ষুর জল ফেলিয়া বলিলেন, “আয় মা, তোরা একে একে আয়, বাছা উমাকে একবার দেখ, যা করতে হয় কর, আমি আর পারি না।”

উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বিন্দু জ্যেঠাইমার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন, উমাতারাকে দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। মৃত্যুর ছায়া সেই রক্তশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য মুখমণ্ডলে পতিত হইয়াছে।

বিন্দুদিদিকে দেখিয়া রোগীর মুখখানি একবার একটু উজ্জ্বল হইল, বিন্দুর দিকে উমা হাত বাড়াইলেন, বিন্দু সেই হাতটী ধরিয়া বাল্য-সহচরী উমাতারার নিকট বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। মনে মনে ছেলেবেলার কথা উদয় হইতে লাগিল। অতি শৈশবে বিন্দু জ্যেঠাইমার বাড়ী খেলা করিতে আসিত, উমার সঙ্গে কত খেলা করিত, উমা আপনার সন্দেশটী ভাঙ্গিয়া বিন্দুকে দিত, আপনার খেলানা হইতে বিন্দুকে একটী দিত। তাহার পর বিন্দুর পিতার মৃত্যু হইলে বিন্দু জ্যেঠাইমার বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিল, তখনও উমার সঙ্গেই খেলা করিতে ভালবাসিত, উমাও গরিবের মেয়ে বলিয়া বিন্দুকে তুচ্ছ করিত না।

তাহার পর উভয়ের বিবাহ হইল, উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গেলেন, কিন্তু বাল্যকালের প্রণয়টী ভুলিলেন না, যখন জ্যেঠাইমার বাড়ীতে উমার সঙ্গে দেখা হইত, তখনই কত আনন্দ! ছয় মাস পূর্ব্বে জ্যেঠাইমার বাড়ীতে দুইজন কত আহ্লাদে দেখা করিয়াছিলেন, আজ সে আনন্দ কোথায়! জগতে উমার সেই অতুল সৌন্দর্য্য কোথায়? সেই সুন্দর ললাটে হীরকের সিঁতি কোথায়? সে সুগোল বাহুতে হীরক-খচিত বলয় কোথায়? সরলচিত্তা জ্যেঠাইমার সেই মিষ্ট হাসি কোথায়? সেই একটু ধনগর্ব্ব, একটু সাংসারিক গর্ব্ব কোথায়? সে সংসার-সুখ অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে, সে সুখ উমাতারার অদৃষ্টাকাশে আর কখনই হইবে না। সে সুখ সাঙ্গ হইয়াছে, উমাতারার লীলাখেলাও সাঙ্গপ্রায়, ধন, যৌবন, অতুল সৌন্দর্য্য, অকালে লীন হইল।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণস্বরে উমা কহিলেন,—বিন্দুদিদি, অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিলাম, তোমাকে একবার দেখিয়া প্রাণটা জুড়াইল।

বিন্দু। কালীতারার স্বামীর বড় পীড়া হইয়াছিল, তাই আমরা বড় ব্যস্ত ছিলাম, সেই জন্য, উমা, তোমাকে দেখিতে আসিতে পারি নাই।

উমা। ব্যারাম আরাম হইয়াছে?

বিন্দু ধীরে ধীরে বলিলেন,—কালী বিধবা।

উমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; একবিন্দু অশ্রুজল সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল। ক্ষণেক পরে বলিলেন,—কালী এখন কোথায়?

বিন্দু। শরতের বাড়ীতে আছে। কালীর মাও সেইখানে আছেন, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন।

উমা। কালীকে বলিও, তাহার মন সুস্থ হইলে একবার আসিয়া দেখা করে। মরিবার আগে তাকে একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা করে।

বিন্দু। ছি, উমা, অমন কথা মুখে আন কেন? তোমার উৎকট রোগ হইয়াছে, তা ডাক্তার দেখিতেছে, ব্যারাম ভাল হবে এখন; ছি, অমন ভাবনা মনে আনিও না।

উমা। ভাল হয়ে কি হবে?

বিন্দু। ভাল হইয়া আবার সংসার করিবে। মনুষ্যের কষ্ট কি আর চিরকাল থাকে? আজ যে কষ্ট আছে, কাল তাহা থাকিবে না, সুখ দুঃখ সকলেরই কপালে ঘটে। ব্যারাম ভাল হইলে তুমি সুখী হইবে, পতিপুত্রবতী হইয়া সোণার সংসারে বিরাজ করিবে।

উমা কোনও উত্তর করিলেন না, একটী ক্ষীণ হাসি সেই শীর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা গেল। ক্ষণেক যেন কি শব্দ শুনিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন,—ঐ জানালা থেকে দেখ।

বিন্দু ও বিন্দুর জ্যেঠাইমা জানালার নিকট গিয়া দেখিতে লাগিলেন। জুড়ি আসিয়া ফটকের নিকট দাঁড়াইল, ধনঞ্জয় ও একটী বাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। দ্বারদেশে একটী বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সঙ্গে দুইজনে কি কথা কহিতে লাগিলেন। তিনজনে পরামর্শ করিতে করিতে উপরে গেলেন।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন,—জ্যেঠাইমা, ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে ও বাবুটী কে?

জ্যেঠাইমা। ও গো, ঐ ত আমার জামাইয়ের শনি। ওঁর নাম সুমতিবাবু, কলিকাতার যত

বড় মানুষের কাছে গিয়ে পোড়ামুখো অমনি করে হেসে হেসে কথা কয় গো, আর যত মন্দ রীত চরিত শিখায় আর টাকা ফাঁকি দেয়। জামাইয়ের কত টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে ভগবানই জানেন। যম কি পোড়ামুখোকে ভুলে আছে?

বিন্দু। আর ঐ বুড়ীটা কে, ঐ যে হাত নেড়ে নেড়ে হেসে হেসে বাবুদের সঙ্গে কথা-কইতে কইতে উপরে গেল?

জ্যেঠাইমা। কে জানে ও হতভাগী মাগীটা কে, এই কয়েকদিন অবধি জোঁকের মত আমার জামাইয়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে। কি কুচক্রে ঘুরচে, কে জানে?

ক্ষীণস্বরে উমা কহিলেন, “মা, আমি জানি, তোমরাও শীঘ্র জানিবে।” রোগী পাশ ফিরিয়া শুইলেন ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। উমা একটু ঘুমাইয়াছে বিবেচনা করিয়া বিন্দু সে দিন বিদায় হইলেন।

সেইদিন অবধি বিন্দু প্রায় প্রত্যহ উমাকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু বিন্দুর স্নেহ, উমার মাতার যত্ন, সমস্তই বৃথা হইল। রোগীর মনে সুখ নাই, জীবনে আর রুচি নাই; তাহার কাশি অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাশাও বাড়িল; দুর্ব্বল ক্ষীণ উমা সমস্ত দিন প্রায় আর কথা কহিতে পারিত না। তখন চিকিৎসকগণও আরোগ্যের আশা ত্যাগ করিল, আজ যায়, কাল যায়, সকলে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিল।

শেষে বিন্দু কালীর বাড়ীতে খবর পাঠাইলেন ও কালীকে সঙ্গে করিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন।

হতভাগিনী বিধবা কালীদিদিকে দেখিয়া রোগীর চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া জল পড়িতে লাগিল; রোগী কথা কহিতে পারিলেন না। কালীও উমার একটী হাত ধরিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পীড়া বড় বাড়িল। সন্ধ্যার সময় নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ, প্রায় পাওয়া যায় না। চিকিৎসক আসিয়া মুখভারি করিল, একটী নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, বলিলেন,—সমস্ত রাত্রি দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে, প্রাতঃকালে আবার আসিব।

উমার মাতা এ কয়েকদিন ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন। বিন্দু বলিলেন,—জ্যেঠাইমা, আজ তুমি ঘুমাও, আজ আমি রাত্রিতে থাকিব, উমার কাছে আমিই বসিয়া আছি।

কালীতারাও থাকিতে ইচ্ছা করিল।

রাত্রি ৯টা হইয়াছে, তখন বিন্দু একবার ঔষধ খাওয়াইলেন। উমা অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—আর কেন ঔষধ? আমি চলিলাম। যাইবার সময় তোমাদের মুখ দেখিয়া মরিলাম, এই আমার পরম সুখ। বিন্দুদিদি, কালীদিদি, আমাকে মনে রাখিও।

বিন্দু ও কালী রোগীর দুই হস্ত আপনাদিগের বক্ষে ধারণ করিলেন, নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পর উমা ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—মা, মা। উমার মাতা পাশেই শুইয়াছিলেন, তাঁহার ঘুম হয় নাই। তিনি কন্যার আরও নিকটে আসিলেন। উমা দুই হাত তুলিয়া মার গলা ধরিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টে বহিতে লাগিল, হস্তপদ হিম হইল, নখগুলি নীলবর্ণ হইল, চক্ষু স্থির হইল, মাতৃবক্ষে স্নেহময়ী উমার মৃতদেহ শান্তি প্রাপ্ত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উমার মাতা, বিন্দু ও কালীতারা পাল্কী করিয়া সে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। ফটকের নিকট তাঁহারা দেখিলেন, সেই সুমতিবাবু ও সেই বৃদ্ধা বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া নামিয়া আসিতেছেন। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন,—জ্যেঠাইমা, ও বুড়ী কে, তুমি এখন জেনেছ?

জ্যেঠাইমা কোনও উত্তর করিলেন না। দুই তিনবার বিন্দু জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—ঐ বুড়ী মাগীর বোনঝি না কে একটা আছে, সে এই থিয়েটারে সীতা সাজে, সাবিত্রী সাজে, রাধিকা সাজে, তার মুখে আগুন। সুমতিবাবু সেইটাকে ধনঞ্জয়বাবুর কাছে আনিয়াছিলেন, তার নাম করে ১০।১৫ হাজার টাকা ধার করে নিয়েছেন, ভগবানই জানেন। বাছা উমা বেঁচে থাকিতে সেটাকে বাড়ী আনেননি, এখন নাকি বাড়ীতে এনে রাখবেন, তার জন্য অনেক টাকা দিয়ে ঘর সাজান হয়েছে।

ধনবান্, গুণবান্, রূপবান্, ধনঞ্জয়বাবু কলিকাতা সমাজের একটী শিরোরত্ন। সকল সভায় তাঁহার সমান আদর, সকল স্থানে তাঁহার গৌরব, সকল গৃহে তাঁহার খ্যাতি। তাঁহার অমাত্যেরা তাঁহার বদান্যতার সুখ্যাতি করেন, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার রুচির প্রশংসা করেন, ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা তাঁহার হিন্দুয়ানির প্রশংসা করেন, কন্যাকর্ত্তাগণ (উমার মৃত্যুর পর) তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনার্থ ঘন ঘন ঘটকী পাঠাইতেছেন। রাজপুরুষেরা ধনাঢ্য বদান্য জমীদারপুত্রকে রাজা খেতাব দিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

সুবিজ্ঞ সুশিক্ষিত সুমতিবাবু শীঘ্র কলিকাতার একজন অনরারি মেজিষ্ট্রেট হইবেন এইরূপ শুনা যায়। তিনি সাহেবদিগের সহিত সর্ব্বদাই দেখাসাক্ষাৎ করেন, এবার লেভিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার ভদ্রাচরণ ও সুমার্জ্জিত কথাবার্ত্তা শ্রবণে সকলে তুষ্ট হইয়াছেন। সুমতিবাবুর গাড়ীঘোড়া আছে, সুমার্জ্জিত বুদ্ধি আছে ও মিষ্ট কথায় অসাধারণ ক্ষমতা আছে; তিনি সাহেবসুবোকে তুষ্ট রাখেন, বড়মানুষদের সর্ব্বদাই মন যোগান, তিনি ক্রমশঃই উন্নতির পথে উঠিতেছেন। তিনিও সমাজের একটী শিরোরত্ন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : পরীক্ষা

শরৎবাবুর পরীক্ষা অতি নিকট, তিনি সমস্ত দিনই পড়েন; বাড়ীর ভিতর বড় যান না। শরৎ পড়িয়া বড় কাহিল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাতা ও ভগিনী তাঁহার অনেক যত্ন শুশ্রূষা করেন, শরতের খাওয়াদাওয়া দেখেন, যাতে শরৎ একটু ভাল থাকেন, একটু গায়ে সারেন সে বিষয়ে দিবারাত্রি যত্ন করেন। কিন্তু শরতের চেহারা ফিরিল না, শরৎ বড় পরিশ্রম করেন, রাত্রি জাগিয়া একাকী পড়িবার ঘরে গিয়া বসিয়া থাকেন, তিনি দিন দিন আরও বিবর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন।

শরতের মাতা বলিলেন,—বাছা, এত পড়ে পড়ে কি ব্যারাম করিবে? তোমার পরীক্ষা দিয়ে কাজ নাই, চল আমরা তালপুকুরে ফিরে যাই, তোমার বাপের বিষয় দেখিও, স্বচ্ছন্দে থাকিবে। কলিকাতার জল-হাওয়া তোমার সহ্য হয় না।

শরৎ বলিলেন,—না মা, এই বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় না। পরীক্ষা নিকট, একবার চেষ্টা করে দেখি।

কালীতারা পূর্ব্বেই বর্দ্ধমানে শরতের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। মনে করিলেন, বৌ ঘরে এলে শরতের মনে স্ফূর্ত্তি হইবে, শরৎ একটু গায়ে সারিবে। সেই বিবাহের কথা একদিন শরতের নিকট উত্থাপন করিলেন। শরৎ বলিলেন,—দিদি, পড়িবার সময় ব্যস্ত কর কেন?

বিন্দুর জ্যেঠাইমা এখন বিন্দুদের বাসায় থাকেন, এখনও তালপুকুরে ফিরিয়া যান নাই। তিনি সর্ব্বদাই শরতের মাতার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, এবং সমস্ত দিন ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। তাঁহারা দুইজনে উমার কথা কহিতেন, কালীর কথা কহিতেন, আর মনের দুঃখে রোদন করিতেন। উমার মা বলিতেন,—দিদি, তখন যদি লোকের কথা না শুনে আমরা একটু বুঝেসুঝে কাজ করতেম, তাহলে আর আজ এমনটী হত না। তুমি তখন বড় কুল দেখে বামুন পুরুতের কথা শুনে কালীর বিবাহ দিলে, আমিও পড়শীর কথা শুনে বাছা উমায় বড়মানুষের সঙ্গে বিবাহ দিলেম, তাই আজ এমন হল। তা ভগবানের ইচ্ছা, এতে কি মানুষের হাত আছে, আমরা যা মনে করি, সেইটী কি হয়? তা দিদি, আমার যা হয়েছে তা হয়েছে, তুমি শরৎকে একটু দেখো, বাছা পড়ে পড়ে কাহিল হয়ে গিয়েছে। শরৎকে মানুষ কর, সুখে সংসার কর্‌তে পারে, এইরূপ বিয়ে থা দাও, বৌ ঘরে নিয়ে এস, বৌয়ের মুখ দেখে শোক একটু ভুল্‌বে।

শরতের মাতা বলিতেন,—আমার তাই ইচ্ছে, বাছা যে কাহিল হয়ে গিয়েছে, আমার বড়ই ভাবনা হয়েছে। আমারও বোধ হয়, বিয়ে থা দিলে বাছা একটু গায়ে সার্‌বে। তা শরৎ যে এখন বিয়ে করতে চায় না। তার উপর লোকে যে একটা নিন্দা রটিয়েছে, মনে হলে কষ্ট হয়।

উমার মাতা। ছি, ছি, সে কথা আর মুখে এন না। আমি তখন মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত, কিছু দেখতে শুনতে পাইনি, তা না হলে কি আমার এমন হয়। বাছা বিন্দু ছেলেমানুষ, হেম আর

শরৎও ছেলেমানুষ, ওরা সব সে দিনকার ছেলে, সে দিন ওদের হাতে করে মানুষ করেছি, ওদের কি এখনও তেমন বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে? তা নয়। বুদ্ধি থাক্‌লে কি আর এমন কাজ করে? তা যা হয়েছে হয়েছে, বিন্দু আর সে কথাটী মুখে আনে না; তা তাতে তোমার ছেলের বিয়ে আটকাবে না, নিন্দে মেয়েদেরই। ভুগতে হবে, নিন্দে সইতে হবে, বিন্দুকে আর বাছা সুধাকে। আহা সে কাঁচ মেয়ে, কিছু জানে না, সে দিন অবধি বেড়াল নিয়ে খেলা কর্‌ত, আর আঁকুসি দিয়ে পেয়ারা পেঁড়ে খেত, তাকেও এমন কলঙ্কে ডোবায়। আহা, বাছার শরীরখানি যেন খেংরা কাঠি হয়ে গিয়েছে, মুখখানি সাদা হয়ে গিয়েছে, চোক দুটী বসে গিয়েছে। দুধের ছেলে,—এমন কলঙ্ক কি সে সইতে পারে? তা কপালে নিন্দে আছে, কে খণ্ডাবে বল?

শরতের মা। আহা, বাছা সুধার কথা মনে হলে আমার বুক ফেটে যায়। কাঁচ মেয়ে, ছেলেবেলায় বিধবা হয়েচে, আহা বাছার কপালে যে কি কষ্ট তা আমরাই বুঝি, সে দুধের ছেলে, সে কি বুঝবে? তার উপর আবার এই নিন্দে? যারা নিন্দে করে, তাদের কি একটু মায়াদয়া নেই গা, একটু বিচার নেই? সুধা কি করেছিল? তার এতে কি দোষ বল? আর কাকেই বা দোষ দি? বাছা বিন্দুও ত মন্দ ভেবে এ কাজ করেনি; শরৎ সুধাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিল, কলিকাতায় নাকি এমন বিয়ে কটা হয়ে গিয়েছে; বিন্দু ছেলেমানুষ, সে মনে ভাবলে, এ বিয়ে হলেই বা, না হয় লোকে দুটা মন্দ বলবে, শরৎ আর সুধা ত সুখে থাকবে। এই ভেবেই বিন্দু কাজটা কর্‌তে চেয়েছিল, সেও মন্দ ভেবে করেনি। আহা, বিন্দুকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি; তার মত মেয়ে আমাদের গ্রামে নেই। তা বিন্দু আমাদের বাড়ী আসে না কেন? তাকে আস্‌তে বলো, তাকে দেখলেও প্রাণটা জুড়ায়।

উমার মা। আমি বলি গো বলি; তা সে সমস্ত দিনই কাজ করছে, তাই আস্‌তে পারে না। বাছা সুধা ত আর এখন কিছু কাজ কর্‌তে পারে না, তার যে শরীর হয়েছে, তাকে বড় কাজ কর্‌তে দি না। আমিও এই শোকে আর পেরে উঠিনি. কুটনো কুটতে উমাকে মনে পড়ে, ভাত বাড়তে উমাকে মনে পড়ে, উঠতে দাঁড়াতে উমাকে মনে পড়ে। আহা বাছারে, এই বয়সে মাকে ফেলে কেমন করে গেলি?—উভয়ে অনেকক্ষণ রোদন করিতে লাগিলেন।

কালীতারা সেই সময়ে ঘরে আসিলেন। উমার মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁ কালী, তোর ভাই অমন হয়ে যাচ্ছে কেন? তুই একটু দেখিস্ বাছা, একটু খাবারদাবার যত্ন করিস্, পড়ে পড়ে কি ব্যারাম কর্‌বে?

কালী। আমি যত্ন করি গো, কিন্তু সদাই পড়াশুনা করে; খাওয়াদাওয়ায় তেমন মন নেই, তাই কাহিল হয়ে যাচ্ছে।

উমার মা। বিয়ের কথা বলেছিলি?

কালী। একবার কেন, অনেকবার বলেছিলেম।

উমার মা। কি বলে?

কালী। সে কথায় কাণ দেয় না. বলে বিবাহে তার রুচি নেই। অনেক জেদ করে, মার নাম করে বল্‌লে বলে, মাকে বলো, মা যদি নিতান্ত ইচ্ছা করে থাকেন, তবে আমি বিবাহ কর্‌ব, কিন্তু আমি সুখী হব না!

উমার মা। ও সব ছেলে অমনই করে বলে গো, তার পর বৌকে পছন্দ হলেই মন ফিরে যায়। আমার বোধ হয় বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

শরতের মা। না দিদি, বাছা শরৎ আমার কাছে কখনও মনের কথা ঢেকে রাখে না। আমায় ভয় করে, আমি জোর করে বিয়ে দিলে পাছে শরৎ অসুখী হয়! আমার কপাল ত অনেক দিনই ভেঙ্গেছে, বাছা কালীর উপরও ভগবান নির্দ্দয় হলেন (রোদন), কেবল শরৎই আমার ভরসা. শরৎ যদি অসুখী হয়, এ চক্ষে দেখতে পার্‌ব না।

উমার মা। বালাই, কেন গা বাছা শরৎ অসুখী হবে? তা এখন বিয়ে না করে নেই, পরে করবে। এখন পড়াশুনায় মন দিয়েছে, না হয় পড়ুক না, সে ভালই ত।

শরতের মা। দিদি, পড়াশুনাও যে তেমন হচ্ছে, আমার বোধ হয় না। শরতের চিরকাল পড়াশুনায় মন আছে, সে জন্য সে এমন কাহিল হয়ে যায় না।

উমার মা সে দিন বিদায় হইলেন। কালীতারা বলিলেন,—মা, তবে শরতের জন্য কি কর্‌ব? ডাক্তার দেখাব?

মাতা। বাছা, মনের ভাবনায় ডাক্তার কি কর্‌বে? চিকিৎসক সে রোগ চিকিৎসা কর্‌তে জানে না।

কালী। তবে কি হবে? বিন্দুদিদির সঙ্গে এক দিন পরামর্শ করে দেখব? আমাদের যখন যা কষ্ট হত, বিন্দুদিদিই আমাদের পরামর্শ দিতেন।

মাতা। এ বিষয়ে পরামর্শ দেবে না?

কালী। দেবে বৈ কি মা, আমি একদিন বিন্দুদিদির বাড়ী যাব এখন।

শীতকালে শরতের পরীক্ষা আসিল। শরতের সহাধ্যায়ীরা সকলেই বলিল,—পরীক্ষায় হয় শরচ্চন্দ্র না হয় তাহার একজন সহাধ্যায়ী কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। এক মাস পর পরীক্ষার ফল জানা গেল, কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে শরতের নাম নাই!

তখন শরতের মাতা শরৎকে ডাকাইয়া বলিলেন,—বাছা এত করে পড়ে শুনে হাড় কালি করেও ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে না। এখন কি কর্‌বে?

শরৎ কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিলেন,—মা, একবার পারি নাই, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি না। পরীক্ষা বড় কঠিন, অনেকেই প্রথম বার উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

কালীতারাও কয়েক দিন বিন্দুদিদির বাড়ী গেলেন, কিন্তু বিন্দু কোনও পরামর্শ দিতে পারিলেন না, বলিলেন,—তোমার মাকে বলিও, জ্যেঠাইমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শরৎবাবুর জন্য যাহা ভাল হয়, তাহা করিবেন। আমরা বোন ছেলেমানুষ, আমরা কি এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারি!

কালী এই কথাগুলি মাতাকে বলিলেন।

মাতা। বাছা, সুধাকে কেমন দেখিলে?

কালী। সুধা ভাল আছে। কিন্তু কল্‌কেতায় এসে কি বদলে গেছে, এখন আর তাকে চেনা যায় না। সে এখন ঢেঙ্গা হয়েছে, একটু কাহিল হয়ে গেছে, কিন্তু বেশ কাজকর্ম্ম কর্‌ছে। রংটাও সে ছেলেবেলার মত কাচা সোণার রং নেই, এখন কাল হয়ে গেছে, এখন আর সে তালপুকুরের সেই কচি মেয়েটীর মত নেই।

বুদ্ধিমতী শরতের মাতা কোনও উত্তর করিলেন না। সমস্ত দিন আপনা আপনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কয়েকদিন অবধি প্রায়ই একাকী বসিয়া ভাবিতেন। পরে একদিন রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার সময় মনে মনে বলিলেন,—বাছা শরৎ, মাতার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি করিয়াছ। ভগবান সহায় হউন, সন্তানের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি করিব।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : গুরুদেবের আদেশ

পরদিন প্রাতঃকালে শরতের মাতা একখানি শিবিকা আরোহণ করিয়া ভবানীপুর হইতে উত্তর দিকে বঁড়শে বেহালা নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। একটী ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে পাল্কী নামান হইল, শরতের মাতা পাল্কীর ভিতর রহিলেন, সঙ্গে ঝি ছিল, সে কুটীরের ভিতরে গেল।

ক্ষণেক পরে সেই ঝির সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার বয়স কত, ঠিক অনুভব করা যায় না। মস্তকে অল্পই কেশ আছে, তাহা সমস্ত শুক্ল, শরীর গৌরবর্ণ ও বলিপূর্ণ, মুখখানি বার্দ্ধক্যের রেখায় অঙ্কিত। ইনি তালপুকুরের ঘোষবংশের কুলগুরু। গুরুদেবের সঙ্গে একজন তেজস্বী ব্রহ্মচারীও বাহিরে আসিলেন, তিনি সম্প্রতি কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

গুরুদেব। মা, আজ কি মনে করিয়া আমাকে সাক্ষাৎ দিতে আসিয়াছ? আইস, ঘরে আইস।

শরতের মাতা বৃদ্ধের সঙ্গে ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতা কুশলে আছেন?

গুরুদেব। হাঁ বাছা, ভগবানের ইচ্ছায় আমার শরীর সুস্থ আছে। বাছা, তোমার সমস্ত মঙ্গল?

শরতের মাতা। ভগবান জীবিত রাখিয়াছেন; কিন্তু মনের সুখলাভ করিতে পারি নাই। আমার কন্যা কালীতারা আজি কয়েক মাস বিধবা হইয়াছে।

গুরুদেব নীরবে একটী অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিলেন, বলিলেন,—মা, রোদন করিও না, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই সাধিত হইবে, কে নিবারণ করিতে পারে?

শরতের মাতা। সে কথা সত্য। কিন্তু কালীর বিবাহের সময় আমি গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম। আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন, আপনার কথা শুনিলে এ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না, বাছা কালীকে এই বয়সে জলে ভাসাইতাম না। সেই সন্তাপ আমার মনে দিবানিশি জ্বলিতেছে।

গুরুদেব। আপনাকে দোষ দিবে না। এ সমস্ত মনুষ্যের হাত নহে, এ সকল বিষয়ে আমাদের পরামর্শ অতি অকিঞ্চিৎকর। আমরা অনেক পরামর্শ করিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া, ভাল বুঝিয়াই কাজ করি, মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদিগের কল্পনা ও চিন্তা বিফল হইয়া যায়, ভগবান আপনার অভীষ্ট অনুসারে কার্য্য করেন।

শরতের মাতা। তথাপি সৎপরামর্শ লইয়া করিলে পরে আক্ষেপ থাকে না। পিতা, সেই জন্য অদ্য আপনার কাছে আর একটী বিষয়ে সৎপরামর্শ লইতে আসিয়াছি। একটী ক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার মত লইতে আসিয়াছি।

গুরুদেব। মা, তুমি জানই ত আমি ক্রিয়াকর্ম্মে যাওয়া অনেক বৎসর অবধি বন্ধ করিয়াছি, কোন শাস্ত্রীয় মতামতও দিতে এখন সমর্থ নহি। আমা অপেক্ষা বিজ্ঞ অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কলিকাতায় ও নবদ্বীপে আছেন, শাস্ত্র-আলোচনা করাই তাঁহাদের ব্যবসা, ক্রিয়া অনুষ্ঠানে তাঁহারা সুদক্ষ, মতামত দিতেও তাঁহারা সুপারগ। আমি সে ব্যবসা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি, কেবল পরকালের সুখের জন্য প্রত্যহ দেব-অর্চ্চনা করি, মনের তুষ্টির জন্য একটু ইচ্ছানুসারে শাস্ত্রাদি পাঠ করি। সে অতি সামান্য।

শরতের মাতা। পিতা, যদি কেবল একটী ক্রিয়া সম্বন্ধে মত লইবার আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না, কিন্তু আপনারা আমার স্বামিদেবের বংশানুগত গুরুদেব; আপনি আমার শ্বশুর মহাশয়ের সুহৃদ ছিলেন। স্বামী মহাশয়ের গুরু ছিলেন, আমাদের বংশে একটু বিপদ আপদ হইলে আপনার নিকট পরামর্শ লইব না ত কাহার নিকট লইব? আপনি আমাদের সংসারের জন্য যেটুকু স্নেহ ও মমতা করিবেন, কে সেরূপ করিবে? আমাদের আর কে সহায় আছে?

গুরুদেব। মা, রোদন করিও না, আমার যথাসাধ্য আমি তোমাদের জন্য করিব। কিন্তু বৃদ্ধের ক্ষমতা অল্প, বিদ্যাও অল্প।

শরতের মাতা। যাঁহারা অধিক বিদ্যার অভিমান করেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইতে আমার রুচি হয় না। আপনার কতটুকু বিদ্যা তাহা আমাদের বঙ্গদেশে অবিদিত নাই, তাহা না হইলে ক্ষুদ্র পল্লীতে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে কাশী প্রভৃতি দূরদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিতেন না। পিতা, আপনার কথাই আমার পক্ষে বেদবাক্য।

গুরুদেব। মা, তোমার ভ্রম হইয়াছে, আমার শাস্ত্রজ্ঞান সামান্য। আমাদের শাস্ত্র সমুদ্র-তুল্য, আমি গণ্ডূষ মাত্র জল গ্রহণ করিয়াছি। অধ্যায়ীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আমার বড় ভাল লাগে, তাঁহাদের জন্য আমার মনে একটু স্নেহ উদয় হয়, সেই জন্যই দুই একজন আমার নিকট আসেন, সম্প্রতি কাশী হইতে এই ব্রহ্মচারী ঠাকুর আসিয়াছেন।

শরতের মাতা। পিতা, সেই স্নেহটুকু পাইবার জন্য আমিও আসিয়াছি, কন্যাকে স্নেহ করিয়া একটু পরামর্শ দিন।

গুরুদেব। মা, বল তোমার কি বলিবার আছে, আমি তোমার স্বামীর বংশ বহুকাল অবধি জানি, আমার সামান্য ক্ষমতায় যদি তোমাদের কোনও উপকার সাধন করিতে পারি, সাধ্যানুসারে তাহা করিব।

শরতের মাতা ধীরে ধীরে কহিলেন,—পিতা, আমার পুত্র শরতের সহিত একটী বালবিধবার বিবাহের কথা হইতেছে, সেই বিষয়ে আপনার মত, আপনার পরামর্শ, আপনার আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছি।

গুরুদেব শরতের মাতাকে বাল্যকাল হইতে জানিতেন, তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম অনুষ্ঠানে প্রগাঢ়-

মতি জানিতেন, তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—মা, বিধবাবিবাহ আমাদিগের রীতিবিরুদ্ধ, প্রচলিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, প্রচলিত ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা কি তুমি জান না? এ ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বসম্মত মত, সকলেই তোমাকে এ কথা বলিতে পারিতেন, এটী জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছ কি জন্য?

শরতের মাতা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বসম্মত মত জানিতে চাহি না, সে জন্য আপনার কাছে আসি নাই। আপনার মত, আপনার পরামর্শ, জানিতে ইচ্ছা করি, এই জন্য আসিয়াছি। শ্রবণ করুন, আমি নিবেদন করিতেছি।

তখন শরতের মাতা আপন দুঃখের ইতিহাস আদ্যোপান্ত গুরুদেবের নিকট বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। বিন্দুর মাতার কথা, বিন্দু ও হেমের কথা, হতভাগিনী সুধার কথা, তাহাদিগের কলিকাতায় আসিবার কথা, শরৎ ও সুধার পবিত্র প্রণয়ের কথা, লোকের লজ্জাবহ অপযশের কথা, নিরাশ্রয় নির্দ্দোষ সুধার অখ্যাতি, অবমাননা, অসহ্য যাতনা ও শরীরের দুরবস্থার কথা, চিরদুঃখিনী কালীতারার কথা, হতভাগিনী উমার কথা সমস্ত সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। সে কথা শুনিতে শুনিতে গুরুদেবের চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল, কাশীর ব্রহ্মচারীর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। শেষে শরতের মাতা বলিলেন,—গুরুদেব, আমাদিগের চারিদিকেই দুর্দ্দশা উপস্থিত, এ ঘোর বিপদে পিতার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিলাম। লোকের কথায় মত্ত হইয়া উমার মা উমাকে বড়মানুষের ঘরে বিবাহ দিলেন, বাল্যকালেই সেই উমা যাতনায় প্রাণত্যাগ করিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া, আপনার সৎপরামর্শ তখন তুচ্ছ করিয়া, আমি বড় কুলে কালীর বিবাহ দিলাম, ভগবান সে পাপের শাস্তি আমাকে দিয়াছেন। বাছা কালীর মুখের দিকে চাহিলে আমার বুক ফেটে যায়। সংসারে আমার আর কেহ নাই, জগতে আমার আর সুখ নাই; বাছা শরৎ ভিন্ন আমার অবলম্বন নাই; আর বাছা বিন্দু ও সুধা আছে। তারাও আমার পেটের ছেলের মত, তাদের অভাগিনী মা মরিবার সময় তাদের আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। গুরুদেব! আপনিই এখন ইহাদের বন্ধু, আপনিই ইহাদের অভিভাবক, আপনি এগুলির ভার লউন, যাহা ভাল বিবেচনা করেন করুন; এ অনাথা বিধবা আর এ ভার বহনে অক্ষম।

এই কথাগুলি বলিয়া শরতের মাতা ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, পিতৃতুল্য গুরুর নিকট দুঃখের কথা বলায় যেন সে ব্যথিত হৃদয় একটু শান্ত হইল।

শরতের মাতার কথা শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধের চক্ষু অনেকবার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়াছিল, এখন নিরাশ্রয় বিধবাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহারও নয়ন হইতে দুই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ ক্ষণেক আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

ক্ষণেক পর বলিলেন,— মা, তোমার কথাগুলি শুনিয়া আমার মন বড় বিচলিত হইয়াছে। এখন কি জিজ্ঞাস্য আছে বল।

শরতের মাতা। পিতা, বিধবাবিবাহ মহাপাপ কি না আমার এইমাত্র জিজ্ঞাস্য।

গুরুদেব। বাছা, জগদীশ্বরই পাপ পুণ্য ঠিক নিরূপণ করিতে পারেন; আমরা শাস্ত্রের কথা কিছু কিছু বলিতে পারি।

শরতের মাতা। তাহাই বলুন। আমাদের সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে কি এ কাজ রহিত? লোকনিন্দার কথা আমাকে বলিবেন না; আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই, লোকনিন্দায় আমার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

গুরুদেব। মা, শাস্ত্র একখানি নয়, সকলগুলি এক সময়ের নয়, সকলগুলিতে এক কথা লিখা নাই। যে সময়ে এই হিন্দুজাতির যেরূপ আচার ব্যবহার ছিল, তাহারই সার ভাগ, উৎকৃষ্ট ভাগটুকুই আমাদের শাস্ত্র।

শরতের মাতা। পিতা, আমি স্ত্রীলোক, আমি ও সমস্ত কথা ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সনাতন শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ কি না, এই কথাটুকু বলুন।

গুরুদেব। এখন ও প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এখনকার শাস্ত্রে ও কার্য্যটী নিষিদ্ধ বৈ কি।

শরতের মাতা। পিতা, এখনকার শাস্ত্র আর পুরাতন শাস্ত্র আমি জানি না, আমি মূর্খ

অবলা। আপনার পড়িতে কিছু বাকি নাই, যেগুলি আমাদের ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র, তাহার মর্ম্ম কি, এ দরিদ্র অনাথাকে বুঝাইয়া বলুন, আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। শুনিয়াছি কলিকাতার কোন কোন প্রধান পণ্ডিত বলেন যে, শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে: কিন্তু আপনার মুখে সে কথা না শুনিলে আমি তাহা বিশ্বাস করিব না। আপনার মতই আমার বেদবাক্য।

গুরুদেব অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন,—মা, তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি কিছুই লুকাইব না, আমার মনের কথা তোমাকে বলিব। তুমি যে পণ্ডিতের কথা বলিতেছ, তিনি আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্রবিদ্যা আমি জানি, তাঁহার প্রগাঢ় সত্যপ্রিয়তা আমি জানি। মা, একদিন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবাবিবাহ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম, অনেক কলহ করিয়াছিলাম, তখন আমি শাস্ত্রবিদ্যাভিমানী ছিলাম। কিন্তু মা, বাল্যকাল হইতে সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে আমি জানি, তিনি ভ্রান্ত নহেন, প্রবঞ্চকও নহেন, তাঁহার কথাটী প্রকৃত। বিধবাবিবাহ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। আমার পরম সুহৃদ রমাপ্রসাদ সরস্বতীরও এই মত, তিনিও তাঁহার মত প্রকাশ করিয়া তোমাকে আশ্বস্ত করিবেন।

শরতের মাতা। পিতা, আপনার অনাথা কন্যাকে যে শান্তিদান করিলেন, জগদীশ্বর তজ্জন্য আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি শাস্ত্রের কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না, সামাজিক রীতির কথাও জিজ্ঞাসা করিব না। তবে ভগবানের নয়নে কাজটী ভাল কি মন্দ, এই একটী কথা জানিতে বাসনা করি। আপনারা দুইজন পণ্ডিত আছেন, একটী উত্তর দিয়া বিধবাকে শান্তি দান করুন।

রমাপ্রসাদ সরস্বতী। মা, যিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তিনিও এ কথার উত্তর দিতে অক্ষম, এ হীনবুদ্ধি কিরূপে ইহার উত্তর দিবে? জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অণুমাত্রও জানিতে পারে, মনুষ্যের এরূপ ক্ষমতা নাই। তবে যিনি করুণাময়, তিনি বালবিধবাকে চিরবৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুভব হয় না।

সরস্বতী ঠাকুরের স্থির, গম্ভীর, পুণ্যময় কথাগুলি সেই ক্ষুদ্র কুটীরে শব্দিত হইতে লাগিল। সরস্বতী ঠাকুর কে?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পরিশিষ্ট

বৈশাখ মাসে তালপুকুর গ্রামে আমরা প্রথমে হেমচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাদের এক বৎসর মাত্র পরিচিত হইলেও বড় স্নেহের পাত্র। পুনরায় বৈশাখ মাস আসিয়াছে, চল তাঁহাদের সেই তালপুকুর গ্রামের বাটীতে যাইয়া বিদায় লই।

হেমের কিছু হইল না, তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। তিনি বৎসর যাবৎ কলিকাতায় থাকিয়া পুনরায় চাষবাস দেখিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। চন্দ্রনাথবাবু তাঁহাকে হাইকোর্টে কোনও একটী কার্য্য দিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মার্জ্জিতবুদ্ধি যুবক মাত্রই এমন সুবিধা পাইলে আপনার বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু হেমের বুদ্ধিটা তত তীক্ষ্ণ নহে, বুদ্ধিটা কিছু পাড়াগেঁয়ে, সুতরাং তিনি সে কার্য্য না লইয়া পাড়াগাঁয়ে ফিরিয়া আসিলেন। শরৎ তাঁহাকে কলিকাতায় আর কয়েক মাস থাকিতে অনেক জেদ করিয়াছিলেন; হেম বলিলেন, না শরৎ, কলিকাতা নগরী যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর দেখিতে বড় রুচি নাই।

বিন্দু পূর্ব্ববৎ কাঁচ আঁবের অম্বল রাঁধিতে তৎপর, এবং এক্ষণে সে রন্ধনকার্য্যের একটী সুবিধাও হইয়াছিল। বিন্দুর জ্যেঠাইমার উমা ভিন্ন আর সন্তানাদি ছিল না; উমার মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনে বিশেষ সুখ ছিল না; তিনি প্রায়ই দুই প্রহরের সময় বিন্দুর বাটীতে আসিতেন। বিন্দুর বাড়ীর রকে তিনি পা মেলাইয়া বসিতেন, বিন্দুর ছেলেগুলিকে লইয়া খেলা করিতেন, অথবা সনাতনের গৃহিণীর সহিত বসিয়া গল্প করিতেন, সেও বিন্দুর জ্যেঠাইমার চুলের সেবা করিত। আর বিন্দু, (আমাদের লিখিতে লজ্জা হইতেছে) সমস্ত দুই প্রহর বেলা লাউশাক কাটিত, সজনে খাড়া পাড়িত, অথবা আঁক্‌সি দিয়া কাঁচ আঁব পাড়িত। জ্যেঠাইমা বলিতেন বিন্দু মেয়েটী ভাল বটে, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি কখনও পাকিল না।

তারিণীবাবুর একমাত্র কন্যা মরিয়াছে, তাহাতে তিনি একটু শোক পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক, শীঘ্রই সে শোক ভুলিলেন। তাঁহার কার্য্যেও বিশেষ উৎসাহ ছিল,

বিশেষ বর্দ্ধমান কালেক্টরির সেরেস্তাদারি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং উৎসাহী তারিণীবাবুর জীবন উদ্দেশ্যশূন্য নহে।

শরতের মাতা সাশ্রুনয়নে বধূ সুধাকে ঘরে আনিয়া বৃদ্ধ বয়সে শান্তিলাভ করিলেন। বিবাহটা কলিকাতায়ই হইয়াছিল, কেহ বিবাহে আসিলেন, কেহ বা আসিলেন না, কিন্তু কাজটা তজ্জন্য বন্ধ রহিল না। যাঁহারা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন না। শান্তপ্রকৃতি দেবীপ্রসন্নবাবু একবার আসিবেন আসিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু একবার বাড়ীর ভিতরে সে কথাটা উত্থাপন করায় বিশেষ হিতকর উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার পর আর আসিবার কথাও কহিলেন না। পাড়ার দলপতি, সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ একটা খুব হুলস্থূল করিলেন, খুব গণ্ডগোল করিলেন, কাজটা বাধা দিবারও বিশেষ চেষ্টা করিলেন. কিন্তু সে কাল গিয়াছে, সেরূপ বাধা দেওয়ায় এক্ষণে লোকের গুণাগুণ প্রকাশ পায়, কাজ বন্ধ থাকে না। চন্দ্রনাথ সমস্ত ভবানীপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সেই বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন. কলিকাতার অনেক ভদ্রলোক তথায় আসিলেন; আনন্দের সহিত সে শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। পাড়ার সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিবাহ-সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দলের কোন কোন পণ্ডিত আসিবেন বলিয়া সে দিকে বড় ঘেঁষিলেন না। পাড়ার দেশহিতৈষী আর্য্যসন্তানগণ, যাঁহারা এই অনার্য্য কার্য্যে বাধা দিবার জন্য ঢিল ছুড়িতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একজন অনার্য্য পুলিশের সার্জ্জনের বিকৃত মুখ দেখিয়া অচিরে (ঢিল পকেটে রাখিয়া) তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন!

শরৎ ও হেম পল্লীগ্রামে আসিলে গ্রামস্থ লোকে প্রথমে তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিলেন না। কিন্তু তারিণীবাবুর স্ত্রীর অনেক অনুরোধে তারিণীবাবু শেষে সকলকে ডাকাইয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন। মীমাংসা হইল যে. শরৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু শরৎ কলেজের ছেলে, বলিলেন,—আমি যে কার্য্যটী করিয়াছি তাহা পাপ বলিয়া মনে করি না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব না। শেষে শরতের মাতা একদিন ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া দিলেন। তারিণীবাবু কিছু রসিক লোক ছিলেন, হাসিয়া শরৎবাবুকে বলিলেন,—ওহে বাবু, তোমরা বুঝ না, বৃষ্টির জল যে দিক দিয়াই যাক, শেষকালে গিয়া নদীতে পড়িবেই পড়িবে। তোমরা বিধবাই বিয়ে কর আর ঘরের বৌকেই বার করে নিয়ে যাও, বামুনের পেটে কিছু পড়িলেই সব চুকিয়া যায়। এই আমাদের সমাজ হইয়াছে, তা তোমরা আপত্তি করিলেই কি হইবে? শরৎ উত্তর করিলেন, এই রূপ সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সংস্কার অবশ্যম্ভাবী. ন্যায় অন্যায়ের বিচার না থাকিলে সে সমাজও থাকে না।

সনাতনের স্ত্রী অনেকদিন বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ফুঁফিয়া ফুঁফিয়া কাঁদিত। বলিত,—আমি তখনই বলেছিনু গো. কল্‌কেতায় যেও না. কল্‌কেতায় গেলে জাত ধর্ম্ম থাকে না। ওমা সোণার সংসার কি হলো গা? আহা, আমার সুধাদিদি, আমার চিনিপাতা দৈ খেতে বড় ভালবাস্‌তে গো, ওমা তার মনে এত ছিল. কে জানে বল? ও মা তখনই বলেছিনু গো, কালেজের ছেলে জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দেয়; ও মা তাই কল্লে গা? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সনাতনের গৃহিণী মনে মনে সুধাকে অনেক তিরস্কার করিত, কিন্তু মায়া কাটাতে পারিল না, আবার লুকাইয়া লুকাইয়া চিনিপাতা দৈ শরৎবাবুর বাড়ী লইয়া যাইত। ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

শরতের মাতা পূর্ব্ববৎ ধর্ম্ম কর্ম্মে সমস্ত দিন মন দিতেন, সংসারের কিছু দেখিতেন না। কালীতারা সংসারের গৃহিণী. এত দিন পর জীবনের শান্তি কাহাকে বলে তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি ভাঁড়ার রাখিতেন, রন্ধনাদি করিতেন. সমস্ত গৃহটী পরিপাটী রাখিতেন. সংসার চালাইতেন। সুধা শরতের মাতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিত. কালীদিদিকে স্নেহ করিত, কালীদিদি যাহা বলিত, তাহা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। ঘর ঝাঁট দিত, উঠান ঝাঁট দিত, পুকুর হইতে জল আনিত. বাটনা বাটিত. কুটনো কুটিত. দুধ জ্বাল দিত, আর পুকুরে যাইয়া বাসন মাজিতে বড় ভালবাসিত। পুকুরধারে আঁব গাছ ছিল, কাঁঠাল গাছ ছিল, অন্যান্য ফলের গাছ ছিল, সুধা সেইখানেও ঘুরিত. যে ফলটী পাকিত, কালীদিদির কাছে আনিয়া দিত।

একদিন সন্ধ্যার সময় সুধা সেই গাছগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কি একটা মনে ভাবিতেছে, এমন সময়ে শরৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিল,—কি ভাবিতেছ?

সুধা একটু লজ্জিত হইয়া মুখ ঢাকিয়া বলিল,—বলিব না।

শরৎ। হ্যাঁ, বলিবে বৈ কি, বল না।

শরৎ ধীরে ধীরে সেই কুসুম-স্তবকতুল্য দেহখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই লজ্জাবনতমুখীর প্রস্ফুটিত ওষ্ঠদ্বয়ে গাঢ় চুম্বন করিলেন। সে স্পর্শে সুধার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইল। লজ্জায় অভিভূত হইয়া সুধা বলিল,—ছি! ছেড়ে দাও।

শরৎ ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন,—তবে বল।

সুধা একটু হাসিয়া বলিল,—ছেলেবেলায় তোমাদের বাড়ীতে আসিতাম, তখন এই পেয়ারা গাছের পেয়ারা তুমি আমাকে পাড়িয়া দিতে, তাই মনে করিতেছিলাম!

শরৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—সেই আমাদের প্রথম প্রণয় এখনও ভুলিতে পার নাই? আমাদের লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে, শরৎ গাছে চড়িলেন, সুধা নীচে পেয়ারা কুড়াইতে লাগিল। এমন সময় ঘাটের নিকট একটা শব্দ হইল, কালীদিদি ঘাটে আসিতেছেন। সুধা লজ্জিতা ও ভীতা হইল, এবার শরৎবাবু কোন্ পথ দিয়া পলাইবেন? কিন্তু সুধা স্বামীর সমস্ত ক্ষমতা ও গুণ জানিতেন না, শরৎ সেই গাছ হইতে এক লাফে বেড়া ডিঙ্গাইয়া পড়িলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

শরৎ সে বৎসর সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি লেখাপড়াও বিলক্ষণ শিখিলেন; কিন্তু বিন্দুদিদি আক্ষেপ করিতেন, গাছে চড়া অভ্যাসটী গেল না।

সমাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ চুল বাঁধা

মাতা। তাই তাই তাই!
শিশু। তাই তাই তাই!
মাতা। মামার বাড়ী যাই।
শিশু। মামা বালি দাই।
মাতা। তাই তাই তাই।
শিশু। তাই তাই তাই।
মাতা। মাসীর বাড়ী যাই।
শিশু। মাতি বালি দাই।
মাতা। মাসী নেবে কোলে।
শিশু। মাতি নেবে তোলে।
মাতা। সন্দেশ দেবে গালে।
শিশু। তন্দে দেবে দালে।
মাতা। ক্ষীর দেবে পাতে।
শিশু। থি দেবে পাতে।
মাতা। চিনি দেবে হাতে।
শিশু। তিনি দেবে আতে।
মাতা। বাবা আস্‌বেন ঘরে।
শিশু। বাবা আবে দলে।
মাতা। খোকা নেবে কোলে।
শিশু। গাগা নেবে তোলে।
মাতা। হার দেবে গলে।
শিশু। হা দেবে দলে।
মাতা। চুমো দেবে গালে,—

"কাকে চুমো দেবে লো?"—শিশু ও মাতায় মিষ্টালাপ হইতেছিল, এমন সময়ে বয়স্কা একজন নারী সহসা ঘরের ভিতর আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—কাকে চুমো দেবে লো? ছেলেকে, না ছেলের মাকে? ইস! আজ যে বড় ঘটা! বড় আয়োজন হইতেছে!

লজ্জায় আরক্তমুখী হইয়া শিশুর যুবতী মাতা মাথা হেঁট করিলেন, চক্ষু মুদিত করিলেন। লজ্জায় ললাট, গণ্ডস্থল, চক্ষুর চর্ম্ম পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইল, প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায় ওষ্ঠ দুটী কাঁপিতে লাগিল।

সত্যই আজ বড় ঘটা! শিশুর মাতা ঘরের শানে বসিয়া সম্মুখে একটী দর্পণ রাখিয়া চিরুণি লইয়া কেশবিন্যাস করিতেছিলেন। এক দিকে পানের ডিবে, আর এক দিকে (আমাদের লিখিতে লজ্জা হয়) মেকেসর অয়েল প্রভৃতি নানারূপ সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের উপকরণ রহিয়াছে! কি কি দ্রব্য আছে, আমরা ঠিক জানি না, যৌবনোদ্ধতা সৌন্দর্য্যবিভূষিতা রসিকাগণই সে উপকরণের বিশেষত্ব অবগত আছেন!

কাকপক্ষের ন্যায় কৃষ্ণ কেশপাশের উপর চিরুণি ঘন ঘন চলিতেছে, সুন্দর, সুগোল, সুললিত বাহুলতায় বলয় দম্ দম্ ঝম্ ঝম্ বাজিতেছে, অনাবৃত অনিন্দনীয় প্রিয়কণ্ঠে সুবর্ণহার দুলিতেছে, অলক্তক-বিনিন্দিত ওষ্ঠদ্বয়ে মৃদু হাসি অনবরতই ফুটিতেছে! সে অপ্সরো-বিনিন্দিত প্রতিমূর্ত্তি সুন্দর দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে। সম্মুখে ঘরের দেয়ালে একখানি ছবিতে শ্রীরাম ও সীতা এক সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, পার্শ্বের দেওয়ালে সাবিত্রী ও সত্যবান, নলরাজা ও দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় দম্পতিগণ বিরাজ করিতেছেন। সম্মুখে একটী ছোট মাদুরের উপর শিশু বসিয়া খেলা করিতেছে, মাতা শিশুকে কথা কহিতে শিখাইতেছেন, অথবা অন্যমনস্কা হইয়া এক একটী সঙ্গীত মৃদু মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়াই

কে না জানে? তবে বংশরক্ষা ধর্ম্মসঙ্গত কাজ, সেই জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করুন। তা আপনি বলিয়া এ কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, সকলে কি এরূপ করে?

(ঘরের কোণে একটা পাড়ার দুষ্ট ছেলে বসিয়াছিল, তারিণীবাবুর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহরূপ কষ্টস্বীকারের কথাটা শুনিয়া হাসি সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল। ছোঁড়াটা নিতান্তই দুষ্ট!)

তারিণীবাবু। আর কি জান ভায়া, এই দুইটা ভাইঝিকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি, তাদেরও কিছু দিয়ে যাব মনে করিয়াছিলাম। তবে আজকালের ছেলেমেয়েরা সবই বেয়াড়া, ধর্ম্মপথে ত কেহ চলে না।

বন্ধুগণ। সে কথা আর বলেন কেন? আপনি ঐ বিন্দুবাসিনীর জন্য আর সুধার জন্য যা করিয়াছেন, আমরা কি আর তাহা দেখি নাই? সে ত সেদিনকার কথা। আপনি না থাকিলে দুটো অনাথা মেয়েকে খাওয়াত কে? পরাত কে? মানুষ করিত কে? আপনার দয়ার হৃদয়, সেই জন্য এত করিলেন, সকলে কি এত করে? তা সেই মেয়ে দুইটা কি নারী না পিশাচী? এমন দয়াবান গুরুর কথা না শুনিয়া, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, কি না বিধবাবিবাহ! ছি! ছি! ছি! তারিণীবাবু, তাদের আর নাম করিবেন না, পাপিষ্ঠাগুলোর নাম করিলেও পাপ হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক, তাই তাহাকে এ গ্রামে থাকিতে দিয়াছেন, অন্যে হইলে তাহাদের মাথা মুড়াইয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিত।

তারিণীবাবু। আর কি জান ভায়া,—মনের কথা তোমাদের খুলিয়া বলি, তোমাদের না বলিলে কাহাকে বলিব? দিন দিন গৃহিণীর শরীরটা বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাঁহাকেও একজন দেখিবার শুনিবার লোক চাই। তা আমি ত সর্ব্বদা বর্দ্ধমানে থাকি, সর্ব্বদা দেখিতে পারি না, অল্পবয়স্কা আপনার লোক একজন ঘরে থাকিলে আমার গৃহিণীরও পরিচর্য্যা করিতে পারে, গৃহিণীর উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা হয়, এই জন্যই আমি এ কার্য্যে মত দিতেছি,—নচেৎ আমার এ বয়সে দারপরিগ্রহে একেবারেই মন নাই। এখন বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, এখন পরমাত্মিক বিষয়েই মন দেওয়া শ্রেয়ঃ।

বন্ধুগণ। তা সে কথা কি আর বলিতে হয়? আপনার নিস্পৃহ সদয় স্বভাব কি আমরা জানি না? আপনি যেরূপ গৃহিণীর প্রতি যত্ন করেন, আজকাল কয়জন সেরূপ করে? শাস্ত্র বলে, নারী পুত্রসন্তান প্রসব না করিলে পরিত্যাজ্যা—অর্থাৎ তাহার মাথা মুড়াইয়া, ঝাঁটা মারিয়া বাজারে বাহির করিয়া দিবে। তবে যে আপনি এতদিন তাঁহাকে সযত্নে গৃহে রাখিয়াছেন, খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন, এ আপনার দয়া। এক্ষণে যে তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার বিধান করিতেছেন, সেও আপনার দয়া।

পরামর্শ অনেকক্ষণ চলিতে লাগিল। পরামর্শে কি ঠিক হইল, তাহা বলা বাহুল্য। কর্ম্মকর্ত্তা যখন মত স্থির করিয়াই গ্রামে আসিলেন, তখন পরামর্শটা বিড়ম্বনা মাত্র।

তারিণীবাবুর বাড়ীতে জ্ঞাতি-রমণী যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা সর্ব্বদা উমার মার শুশ্রূষা করিতেন। বাহিরে বৈঠকখানায় যে কথা হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অগোচরে রহিল না এবং তাঁহারাও অবিলম্বে নানা অলঙ্কার সহ সে কথাটি উমার মার কানে তুলিলেন।

রোগক্লিষ্টা উমার মা এক বিন্দু চক্ষুর জল মোচন করিলেন। বলিলেন,—যখন উমাকে হারাইয়াছি, তখন এসংসারে সমস্তই হারাইয়াছি, সংসারে আমার আর সুখ নাই। বাবুর যদি রুচি হয়, দ্বিতীয় সংসার করুন, ভরসা করি তিনি দ্বিতীয় সংসারে সুখী হইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিবাহের পাত্রী

তালপুকুরের মিত্রদের আগে ভাল অবস্থা ছিল, এখন অবনতি। তালুক যাহা ছিল, তাহা অনেক দিনই গিয়াছে; দুই একটা জমাজমী ছিল, তাহার দ্বারা মিত্রমহাশয় কোনও প্রকারে সংসার চালাইতেন। যে বৎসর উমাতারার মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই অনাথা বিধবা ও দুইটী সন্তান রাখিয়া মিত্রমহাশয় পরলোক গমন করেন। একটী পুত্রসন্তান, নাম গোকুলচন্দ্র, অপরটী কন্যা-সন্তান, নাম গোপবালা।

মিত্রমহাশয়ের মৃত্যুতে অনাথা বিধবা ও সন্তান দুটী বড়ই কষ্টে পড়িল, এবং তাহাদিগের

সংসার চালান ভার হইয়া উঠিল। গ্রামস্থ দয়ার্দ্র লোকে কিছু কিছু সহায়তা করিলেন, এবং বিন্দু যখন কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আইসেন, তখন মিত্রপরিবারের যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। মিত্রদিগের জমাজমী যাহা ছিল, তাহা ভাগে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, পরিবারের খাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে চাউল ডাল, তরিতরকারি পাঠাইতেন, বর্ষাকালে তাহাদের বাড়ীর উঠানে কতকগুলি বেগুন গাছ ও নানা প্রকার শবজি রোপণ করিয়া দিতেন, এবং শীতকালে ছেলেদের জন্য গরম জামা স্বহস্তে সেলাই করিয়া দিতেন। সর্ব্বদা দেখিতে যাইতেন, এবং শিশু গোপবালা সর্ব্বদা বিন্দুর বাড়ী খেলা করিতে আসিত।

গোকুলচন্দ্র গ্রামের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, কিন্তু পিতৃবিয়োগবশতঃ এখন অধ্যয়ন ত্যাগ করিল, কার্য্যের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। ১৬ বৎসরের অশিক্ষিত বালকের কি কাজ মিলিবে? কিন্তু ছেলেটী বড় বুদ্ধিমান, ৮৲ টাকা ১০৲ টাকার বকশীগিরি বা সরকারি করিয়া কিছু টাকা করিল, এবং এখন রাস্তা পথের কণ্ট্রাক্ট লইয়া বিশেষ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। মাকে ও ভগিনীকে বড় কিছু পাঠাইত না; গোকুল বুদ্ধিমান, টাকা জমাইতে জানে।

তালপুকুরে গোকুলের মা ও ভগিনী জমী হইতে সামান্য আয় পাইয়া, এবং বিন্দুর সাহায্যে কোনও প্রকারে সংসার চালাইত। বিন্দুর কন্যা সুশীলার বয়স যখন সাত বৎসর, গোপবালার বয়স তখন নয় বৎসর, সুতরাং দুই জনে সর্ব্বদাই একত্র বিন্দুর উঠানে খেলা করিত। সুশীলা শ্যামবর্ণা ও বড় ভাল মানুষ, চক্ষু দুটী মার মত সুন্দর ও বিশাল, কিন্তু মেয়েটী বিশেষ সুন্দরী নহে। গোপবালা বড় ধারাল মেয়ে, বড় সেয়ানা, বড় সুন্দরী। মুখখানি সৌন্দর্য্যে ও বুদ্ধির লক্ষণে বিভূষিত, রং যেন কাঁচা সোণা, ভ্রূলতা যেন তুলি দিয়া আঁকা, চক্ষু দুইটী কি উজ্জ্বল, কি তীক্ষ্ণ! তালপুকুর গ্রামের মধ্যে এরূপ ফুটফুটে মেয়ে আর ছিল না, গ্রামের বিস্তীর্ণ বাগানে বা বৃক্ষচ্ছায়ায় মেয়েটি যখন ছুটোছুটি করিয়া খেলা করিত, বোধ হয় যেন কোন দেবকন্যা নন্দনকাননে বিচরণ করিতেছে। কৃষকগণ মাঠে যাইবার সময় মেয়েটিকে দেখিলে ফিরে চাহিত, ঘাট থেকে মেয়েরা জল আনিবার সময় কলস নামাইয়া একবার মেয়েটিকে কোলে লইত।

গোপবালা যেমন সুন্দরী, তেমনি সেয়ানা। নয় বৎসরের মেয়ের যে পেটে পেটে বুদ্ধি, তাহা দেখিয়া গ্রামের বয়স্কাগণ বিস্মিত হইতেন। একলা ভাবিত, একলা মতলব স্থির করিত, একলা গোপনে সম্পাদন করিত। সুশীলার সহিত খেলা করিত, কিন্তু সুশীলা হাবা মেয়ে, গোপবালার মন কি বুঝিবে? সুশীলাকে তুষ্ট করিয়া তাহার খেলার সামগ্রীগুলি একে একে সংগ্রহ করিত, বিন্দু ও সুধাকে মা বলিত, ও কখন একটী খেলনা, কখন মিষ্টান্ন, কখন একখানি ঢাকাই কাপড় সংগ্রহ করিত। বিন্দু বলিতেন, "আহা মেয়েটী কি শান্ত, কি নম্র, কি সুধীর। দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।"

মল্লিকবাড়ী হইতে গোপবালার মার নিকট ঘটকী আসিল। গোপীর মা গালি দিয়া বলিলেন, —বলিস কি পোড়ারমুখী, আমার মেয়েকে জলে ভাসাইয়া দিব? ৫০ বৎসরের বুড়োর সঙ্গে আমার কচিমেয়ের বিয়ে দিব? টাকা নিয়ে কি মেয়ে ধুয়ে খাবে, গয়না নিয়ে কি মেয়ে পেতে শোবে? হইলাম বা আমরা গরিব, আমরা গরিবই থাকিব, টাকা নিয়ে মেয়েকে বিক্রয় করিব না। ও মা, ছি! ছি! ছি! বলি বুড়ো যে আমার গোপীর ঠাকুন্দার বয়সী,—বাছা উমার যদি ছেলে থাকিত, সে যে আজ প্রায় গোপীর বয়সী হইত, বিন্দুর মেয়ে যে প্রায় আমার গোপীর বয়সী,—আর সেই বিন্দুর জ্যেঠা, উমার বাপ, সে কি না আমার গোপীকে বিয়ে করিতে চায়? বলি যম কি বুড়োদের ভুলে থাকে লো? আর বুড়োগুলোই বা কি গা? নাতিনী বয়সী ফুটফুটে মেয়ে দেখেও মুখ দিয়ে নাল পড়ে? ছি! ছি! অমন বুড়োর মুখে আগুন। না গো না, অমন কথাটি মুখে এনো না,—ঐ কালীর মা এক বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, কি হইল দেখিলে ত? আবার সেই রকম কাজ করে? না গো না, আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, যাঁর ধন, যাঁর সংসার, তিনি আমাকে কাঁদিয়ে চলে গিয়েছেন,—আমিও গেলেই বাঁচি আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না,—বিধবা স্বামীকে স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ঘটকী ফিরিয়া গেল, বালিকা গোপবালা বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া সকল কথাগুলি শুনিল। মনে মনে বলিল, "আমি বড় ঘরের বৌ হব, তাতে মা আপত্তি করিতেছেন। মার আপত্তি খাটিবে না।"

তারিণীবাবু মতলব স্থির করিলে সহজে হটিবার লোক নহেন। পরদিন ঘটকী বিন্দুর

নিকট আসিল, একখানা চিঠি বিন্দুর হস্তে দিল। চিঠিখানি বিন্দুর জ্যেঠাইমা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই লিখা আছে,—

"মা বিন্দু, তোমার জ্যেঠামহাশয়ের সন্তানাদি না থাকায় আবার বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আমারও মত আছে। মিত্র গোষ্ঠীর গোপবালা নামে একটী মেয়ে আছে, তাহাকেই তোমার জ্যেঠামহাশয় পছন্দ করিয়াছেন, মেয়েটী শুনিয়াছি বড় নম্র। মেয়ের মা তোমারই আশ্রিত লোক, এবং তোমার কথা শুনেন। তাঁহার সম্মতি যাহাতে হয়, সে বিষয়ে যত্ন করিয়া তোমার জ্যেঠাইমার কথা রক্ষা কর।

"পুনশ্চ বাছা উমা গিয়ে অবধি তুমি আমার মেয়ে—আবশ্যক হইলে তোমার ঘরে মাকে স্থান দিও।"

বুদ্ধিমতী বিন্দু পত্রের প্রথম ভাগ পড়িয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, শেষ ছত্রটী পড়িয়া একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাঁহার জ্যেঠাইমার এ বিবাহে কিরূপ মত আছে শেষ ছত্রে বুঝিতে পারিলেন। পত্রের উত্তর লিখিলেন,—

"জ্যেঠাইমা—জ্যেঠামহাশয় জ্ঞান হারাইয়াছেন, তুমিও কি জ্ঞান হারাইলে? কালীতারার অবস্থা চক্ষে দেখিয়াও গ্রামের আর একটী মেয়েকে জলে ভাসাইবে? জ্যেঠাইমা, আমি ছেলে-মানুষ, তোমাকে কি পরামর্শ দিব? তুমি বুঝিয়া দেখ, জ্যেঠামহাশয় কি এ বিবাহে সুখী হবেন? তুমি যেরূপ শরীর মাটি করিয়া জ্যেঠামহাশয়ের শুশ্রূষা করিতেছ, অল্পবয়স্কা স্ত্রী কি জ্যেঠামহাশয়ের সেইরূপ পরিচর্য্যা করিবে? যদি সে স্ত্রী ক্লেশদায়িনী হয়, জ্যেঠামহাশয়ের এই শেষাবস্থার ক্লেশ তোমাকে চক্ষে দেখিতে হইবে। জ্যেঠাইমা এ কাজটি হইতে দিও না, এ কাজে আমি সাহায্য করিতে পারিব না।"

বিন্দু চিঠিখানি একবার দুইবার চেঁচিয়ে পড়িলেন। চিঠিখানি মনোমত হইয়াছে। ঘটকীর হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ঘটকী বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। তাহার অল্পক্ষণ পরে আর একজন বেড়ার পাশ হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। গোপবালা দাঁড়াইয়া দুইখানি চিঠি আদ্যোপান্ত শুনিয়াছে, মনে মনে বলিল, "আমি বড়ঘরের বৌ হব, তাহাতে সুশীলার মা বাধা দিতেছে। বাধা খাটিবে না।"

সন্ধ্যার সময় সুধা বিন্দুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সুধাকে দেখিয়াই বিন্দু হাসিয়া বলিলেন,—বলি ওলো সুধা, আমাদের নূতন জ্যেঠাইমাকে দেখেছিস্?

সুধা। না দিদি, নূতন জ্যেঠাইমা আবার কে?

বিন্দু। ওলো তা জানিস্নি, তবে জানিস কি? ঐ দেখ বাগানে সুশীলার সঙ্গে খেলা করিতেছে।

সুধা। সে কি দিদি? ও যে গোপী। ওর সঙ্গে জ্যেঠাইমা সম্পর্ক পাতালে নাকি?

বিন্দু। ওলো আমি পাতাব কেন? সম্পর্ক পাতাবে, পাতাবে,—যার পাতাবার সে পাতাবে!

সুধা। এ তোমার কি ঠাট্টা দিদি, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। তুমি যে হেসে গড়িয়ে গেলে দিদি। সত্য সত্য বল না দিদি, হয়েছে কি?

বিন্দু। না, কিছু হয়নি বোন, বোধ হয়, মাসখানেকের মধ্যেই হবে।

সুধা। কি হবে, কি হবে?

বিন্দু। ঐ যে বলিলাম, ঐ গোপী আমাদের নূতন জ্যেঠাইমা হবে, জ্যেঠামশাই যে ওকে বিয়ে করবার জন্য ঘটকী পাঠিয়েছেন! ও গোপী, গোপী, বলি জ্যেঠামশাইকে বিয়ে করবি লো?

গোপী। বড়মা, ডাক্‌ছ?

বিন্দু। হাঁ ডাকছি, একবার কোলে আয়।

বিন্দু বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া, সেই নম্রমুখী সৌন্দর্য্যপূর্ণা ফুটফুটে মেয়েটির ঠোঁটে চুমো খেয়ে, তাহার উজ্জ্বল কৃষ্ণ চক্ষু দুটীতে চুমো খেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি জ্যেঠামশাইকে দেখেছিস্?"

গোপী। হাঁ বড়মা, দেখেছি বৈ কি।

বিন্দু। কবে দেখ্‌লি লো?

গোপী। ঐ যে কাল বিকালে আমি পুকুরধারে খেলা করিতে গিয়াছিলাম; তারিণীবাবুও গিয়াছিলেন।

সুধা। ও হরি! তবে বর কনের চখোচখি হইয়া গিয়াছে। হে'লা, জ্যেঠামহাশয় তোকে আদর করেছিল?

গোপী। হাঁ ছোটমা, তারিণীবাবু একবার চারিদিকে চেয়ে দেখিলেন। দেখিলেন, কোথাও কেউ নেই, তখন আমাকে কোলে তুলে নিয়ে কত আদর করিলেন!

বিন্দু হাসিতে হাসিতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন। উঠিয়া সুধাকে বলিলেন,—বলি শুনলি সুধা, এই কালই বর কনের মিষ্টালাপ হইয়া গিয়াছে! বলে, সে কালের বুড়োরা নাতনীদের সঙ্গে ঠাট্টা করিত, আজকাল কি সত্য সত্যই নাতনীদের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে? ছি! ছি! ছি! এ লজ্জার কথা যখন জগতে রাষ্ট্র হবে, তখন আমাদের কালমুখ লুকাব কোথায়? জ্যেঠামহাশয় কি সত্যই এ বয়সে লোক হাসাইবেন? বলি গোপী, তোর মনে ধরে?

"ধরে।" এই কথাটি বলিয়া বালিকা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বিন্দু বলিলেন,—বালিকা কি সরলা, বিয়ের কথা কিছু জানেও না, বুঝেও না, জ্যেঠামশাই উহাকে কোলে করিয়া আদর করিয়াছেন, সরলা মেয়েটী তাহাতেই আনন্দিত হইয়াছে। ছি! ছি! জ্যেঠামহাশয়, তুমি বিজ্ঞ, তুমি বহুদর্শী, তুমি বুদ্ধিমান্, এই সরলা বালিকাকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া যাইও না।

বিন্দু একটু ভুল করিয়াছিলেন, বালিকা নিতান্ত সরলা নহে। বিয়ের কথা কিছু কিছু জানে, ধনগৌরবের একটু লালসা রাখে, সুবর্ণ ও মণিমুক্তার দিকে দৃষ্টি রাখে, এবং দারিদ্র্য হইতে উত্থান করিয়া একবার বড় ঘরের বৌ হইবার দুর্দ্দমনীয়া আকাঙ্ক্ষা বাল্যহৃদয়ে ধারণ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির

তারিণীবাবু একবার মতলব স্থির করিলে শীঘ্র হটিবার লোক নহেন। বর্দ্ধমানে গোকুলচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইলেন। গোকুল লোকমুখে বিশেষ কোনও কথা জানিতে পারিল না, তবে কোনও কারণে তারিণীবাবু ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া কিছু ভীত হইল। নাজির মহাশয়ের বর্দ্ধমানে প্রভুত্ব ও সাহেবদের নিকট খাতির, এ সকল বিষয় গোকুল বিশেষ জানিত, নাজির মহাশয় একবার সাহেবদের নিকট তাহার বদ্‌নাম করিলে তাহার কণ্ট্রাক্টও ঘুচিবে, অন্নও ঘুচিবে। সভয়ে পরদিনই গাড়ী করিয়া তালপুকুর গ্রামে আসিয়া, ঘরে না গিয়া একেবারেই তারিণীবাবুর গৃহে উঠিয়া, নাজির মহাশয়ের শ্রীচরণে প্রণাম করিল।

নাজির মহাশয় বড়ই রুষ্ট, মুখ ফিরাইয়া কথা কহেন না। সভয়ে ও সসম্মানে গোকুল অনেক মিষ্ট কথা দ্বারা তারিণীবাবুর মন ভিজাইয়া বলিল,—আমি চিরকালই আপনার আজ্ঞাধীন, আপনারই অন্নে পালিত, আপনার অনুগ্রহে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। এ অধীনের প্রতি কি জন্য বিরক্ত একবার বলুন, কি আদেশ পালন করিতে হইবে বলুন, অধীন কি কখন আপনার অবাধ্য হইতে পারে?

তারিণীবাবু। না হে ভায়া (এতদিন বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এখন নূতন সম্বন্ধ), এখন আর তোমরা অধীন কৈ? এখন ঢের কণ্ট্রাক্ট পাও, ঢের টাকা রোজকার কর, এখন আমাদের কি আর মানিবে, না আমাদের কথা শুনিবে? আচ্ছা দেখা যাবে, দেখা যাবে, কে সাহেবদের বলিয়া তোমাকে এত কণ্ট্রাক্ট দেওয়াইয়াছে, তাহা দেখিব, আর ভবিষ্যতে কিরূপে কণ্ট্রাক্ট পাও, তাহাও দেখিব।

গোকুল। সে কি? বলেন কি? আপনারই অনুগ্রহে, আপনারই খাতিরে আমার যথাসর্ব্বস্ব উপায়, তাহা কি আমি জানি না? বর্দ্ধমানে এ কথা কে না জানে? আপনাকে অবহেলা করিব? আপনার পাদুকা বহন করিতে পারিলে কৃতার্থ হই, আপনার কথা শুনিব না ত কাহার কথা শুনিব?

তারিণীবাবু। না, আর আমাদের কথা কৈ খাটে? যাও ভায়া, বাড়ী যাও, তোমার মা আমার কিরূপ অপমান করিয়াছেন গিয়া শুনুন। ঝাঁটা মারিয়া আমার লোক বিদায় করিয়াছেন। মিত্রজা আমার সম্মান জানিতেন, এখন কি না তাঁহার বিধবা যাহাকে কষ্টের সময় অন্নবস্ত্র দিয়া পালন করিলাম, সে আমার এমন অপমান করে? আচ্ছা দেখিব, দেখিব, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়?

গোকুল। বলেন কি? মা আমার পথের কাঙ্গালী, সে তালপুকুরের ধনাঢ্য মল্লিকবংশের অপমান করিবে? কথাটা কি, ভেঙ্গেই বলুন না।

তারিণীবাবু। আর ভেঙ্গে বলিয়া কি তোমার কাছেও অপমানিত হইব? নাহে ভায়া, তাহাতে কাজ নাই। এখন তোমরা বড়মানুষ, তোমরা বড় ঘর, আমরা ছোটলোক, এখন কি আর আমাদের দিকে ফিরে চাহিবে, না আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিবে?

গোকুল। কি বলিলেন? কি বলিলেন? আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা? এ যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। এ দরিদ্র আপনাদের হাতের এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলে সম্মানিত হয়; আমরা আপনাদের সহিত কুটুম্বিতা করিব, এমন দিনও কি হবে?

মিষ্ট কথায় দেবতারাও তুষ্ট হয়েন, তাণীবাবুর মন একটু ভিজিল। আজ্ঞা করিলেন,—অরে হরে! তামাক দে ত। বস ভায়া, বস, অনেক দূর থেকে আসিয়াছ, দেখছি এখনও বাড়ী যাওয়া হয় নাই, একেবারে এইখানেই উঠেছ। তা, বস ভায়া বস, তোমার মত বিনীত ছেলে এ কালে দেখিলেও আনন্দ হয়।

গোকুল। আজ্ঞা না, আমি দাঁড়িয়েই রহিলাম, যতক্ষণ আপনার আদেশ না পাইব, যতক্ষণ আপনার আদেশ তামিল না করিব, ততক্ষণ আসন গ্রহণ করিব না, জলগ্রহণও করিব না।

তারিণীবাবুর মুখে এখন হাসি দেখা দিল, হৃদয়ে উল্লাসের সঞ্চার হইল। গোকুলের হাত ধরিয়া বসাইয়া, একবার কল্‌কেতে ফুঁ দিয়া আগুনটা ধরাইয়া ভাল করিয়া তামাক টানিয়া গলাটা সাড়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন,—না, বলছিলাম কি, তোমার পিতা মিত্রজার সহিত আমার কিরূপ প্রণয় ছিল, তাহা তুমি জানই।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, তাহা জানি বৈ কি।

তারিণীবাবু। তাঁহার বিপদ আপদের সময় সাহায্য দিতে গ্রামের মধ্যে বড় কেহ ছিল না, তিনি আমার কাছেই আসিতেন, তাহাও ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, জানি বৈ কি।

তারিণীবাবু। তাঁহার মৃত্যুর পর, মা ঠাকরুণকে সাহায্য দেওয়া, তোমাকে বর্দ্ধমানে সাহেবদের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া, তোমার ছোট বোনটিকে কাপড়চোপড় দেওয়া,—এ সব কথা ত তুমি জানই। নিজের গুণ নিজমুখে বলা সাজে না, কিন্তু মিত্রবংশের জন্য কি করিয়াছি না করিয়াছি, তাহা ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, জানি বৈ কি।

তারিণীবাবু। তা করিব না কেন বল? তোমাদের কুল ভাল, বংশ ভাল, আচরণ ভাল, তোমাদের জন্য করিব না ত কি আমার নাস্তিক ভাইঝি-জামাইদের জন্য করিব? না আমার নিজের মাতাল জামাইয়ের জন্য করিব? না হে ভায়া, এ ঘোর কলিতেও ধর্ম্ম আছে, এখনও সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হয়, এখনও তোমাদের ন্যায় সদ্বংশের উন্নতি অবশ্য হইবে।

গোকুল। সে আপনার অনুগ্রহ।

তারিণীবাবু। তাই মনে করিতেছিলাম, বিষয়-সম্পত্তি যৎকিঞ্চিৎ করিয়াছি, তালুক, জমা, মহাজনি, তেজারতি, লগ্নি, কারবার, বাড়ী, ঘর, গহনাপত্র সমস্তই আছে। এ আর কাহাকে দিয়া যাইব? কন্যা উমা ত আমাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে, গৃহিণীও সেই শোকে যায়-যায় হইয়াছেন। তা ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, তালপুকুর গ্রামের মধ্যে কুলে, মানে, সদাচরণে, মিত্রবংশই শ্রেষ্ঠ, তা যদি মিত্রবংশের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়া যাই, তাহা হইলে যাহা রাখিয়া যাইব, এ সমস্তই তোমাদের,—তোমার ভগিনীরও যা, তোমারও তাই।

গোকুল বুদ্ধিমান ছেলে, কথার আভাসে তারিণীবাবুর মতলবটা বুঝিল, মনে মনে বুদ্ধিমানের ন্যায়ই নিষ্পত্তি করিল। মেয়েছেলের আবার পছন্দ অপছন্দ কি? মেয়েগুলো হয়েছে পুরুষের সুখের জন্য, এবং বংশের উন্নতির জন্য, তাহাদের আবার সুখই কি, উন্নতিই কি? যদি ভগিনীটাকে মল্লিকবংশে ভাসিয়ে দিয়ে মিত্রবংশের (অর্থাৎ নিজের) কোনও উন্নতি সাধন হয়, তবে ত সে পরম মঙ্গল। প্রকাশ্যে বলিল,—মহাশয় যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, এ ত আপনার অনুগ্রহ মাত্র। ইহার বাড়া কি সম্মান আর আমাদের আছে? আমরা পথের কাঙ্গালী, আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ত আমাদের সশরীরে স্বর্গলাভ।

তারিণীবাবু। আহা তোমার মত বিনীত মিষ্টভাষী ছেলে কি আজকাল দেখা যায়?

আর দেখছ কি ভায়া, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাদেরই। তোমার বংশের উন্নতি হউক, তোমার ভগিনী আমার গৃহের গৃহলক্ষ্মী হউক, তোমার মাতা ঠাকুরাণী দীর্ঘজীবী হউন, এবং তোমারও ত উপার্জ্জন হইতেছে, তুমিও একটী বিবাহ করিয়া তোমাদের পুরাতন ঘর বজায় রাখ।

গোকুল তখন অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া শেষে মুখ ফুটিয়া বলিল,—আমরা ত আপনাদেরই দাস, যখন আজ্ঞা করিবেন, আমার ভগিনী আপনার পরিচারিকা হইবে। তবে আমরা আপনার সহিত কুটুম্বিতা করি, এরূপ আমাদের অবস্থা কৈ? পৈতৃক ভাঙ্গা ঘরে আমরা বাস করি, তাহার ইটকাঠ নাই। তা আমাদের ঘর বজায় থাকা যে বল্‌ছেন সে আপনারই অনুগ্রহের উপর নির্ভর। যখন এ দীনদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুটুম্বিতায় স্বীকার হইয়াছেন, তখন যাহাতে আমাদের ঘর বজায় থাকে, পুরাতন গৃহটীর সংস্কার হয়, আপনার কুটুম্ব বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে পারি, এরূপ উপায় অবশ্যই আপনি করিয়া দিবেন।

বুদ্ধিমান তারিণীবাবু দেখিলেন, বালক গোকুলচন্দ্র এতদিন বৃথা বর্দ্ধমান নগরীতে কাজ করে নাই, সেও বিষয়বুদ্ধিতে নিপুণ হইয়াছে,—ভগিনীকে বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা আদায় করিবার উপায় করিতেছে! টাকার কথা উত্থাপন হওয়ায় নাজির মহাশয়ের বুকটা একবার দমিয়া গেল, কিন্তু আবার সেই ফুটফুটে মেয়েটীর প্রফুল্ল ওষ্ঠ (দুই দিন পূর্ব্বে যাহার মধু আস্বাদন করিয়াছিলেন) তাঁহার মনে পড়িল, বৃদ্ধের ঠোঁট দিয়া নাল পড়িতে লাগিল। হাস্যগদ্‌গদ স্বরে বলিলেন; বল বল ভায়া, তোমার কি মতলব, তাহাই বল। আমার সমস্ত সম্পত্তি ত তোমাদেরই দিতে বসিয়াছি, তা এখনই দি, আর পরেই দি।

গোকুল। যদি আজ্ঞা করেন ত বলি, কিন্তু আপনার নিকট বলাই বাহুল্য, আপনি সমস্তই জানেন। আমাদের বাহিরের ও ভিতরের ইষ্টকাবশিষ্ট ঘর,—যাহা আপনার পদধূলিতে পবিত্র হইবে,—সেই ঘর পুনঃসংস্কার করিতে হইবে। খিড়কীর পুকুরটী,—যাহাতে আপনি পুণ্য শরীরে অবগাহন করিবেন,—তাহাও সংস্কার করিতে হইবে। গৃহে কোনও উপকরণাদি নাই, আপনি গেলে একটী আসন দিব, তাহারও উপায় নাই, চৌকি, তক্তপোষ, খাট, বিছানা, এ সমস্তই আবশ্যক। তদ্ভিন্ন আপনার ন্যায় জামাতা পাইলে মাতা ঠাকুরাণী রূপার বাসন না করিয়া কিরূপে খাওয়াইবেন, আর মল্লিকবংশের সহিত কুটুম্বিতা হইলে আমাদের একটু মান রাখিয়া চলিতে হইবে, ভাল করিয়া তত্ত্ব করিতে হইবে, লোকজন, জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলকে তুষ্ট করিতে হইবে—এ সমস্ত কথা কি আপনার ন্যায় বহুদর্শী লোকের নিকট আমার ন্যায় বালকের বলা সাজে? তা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি আর কি বলিব? (পরে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞা, পাঁচ হাজার টাকার কমে যে এ কার্য্য সম্পাদন হয়, এমন ত বোধ হয় না।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, পৃথিবীর উদরস্থ দ্রব পদার্থ সর্ব্বদাই কল্‌ কল্‌ করিতেছে, যখন অতিশয় বাষ্পের তেজ হয়, তখনই আগ্নেয়গিরি দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। টাকার কথা উত্থাপন হওয়াতেই তারিণীবাবুর উদরস্থ রাগটা একটু কল্‌ কল্‌ করিতেছিল, কিন্তু স্থির করিয়াছিলেন, গরিবদের হাজার টাকা কি জোর পনর শত টাকা দিয়া কন্যারত্নটী ক্রয় করিবেন। কিন্তু যখন গোকুল পাঁচ হাজার টাকার উল্লেখ করিল, তখন আগ্নেয়গিরি কোথায় লাগে!

উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—কি বলিলে মিত্রের পো? পাঁচ হাজার টাকা? বলি যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? বলি আমি কি তোমাদের বংশ চিনি না? তোমার ঠাকুর্দ্দাদা গ্রামের হাড় জ্বালিয়ে গিয়েছে, তোমার বাবা হাড় জ্বালিয়ে গিয়েছে, আবার তুমি হাড় জ্বালাতে এসেছ? পাঁচ হাজার টাকা জলে ভেসে আসে, না পাঁচ হাজার টাকা কখন মিত্রবংশে দেখেছ? বলি এক রত্তি ছেলে, সে দিন হাতে করে মানুষ করেছি, আমাদের সম্মুখে এমন কথা বলিতে ভয় হয় না? এমন বিধর্ম্মীর সঙ্গে কুটুম্বিতা করিলে নরক ভোগ করিতে হয়! এমন কুলাঙ্গারদের মুখ দেখলেও পাপ হয়! ইত্যাদি, ইত্যাদি। গোকুল কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা ক্রুদ্ধ না হইয়া, নাজির মশাইয়ের মেজাজ একটু গরম হইয়াছে দেখিয়া, একটী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে, নাজির মশাইয়ের গরম হওয়া বৃথা, বুড়ো বয়সে বালিকা বিবাহ লালসা মনে উদয় হইলে, সে রোগ আর ছাড়ে না। আবার তাহার উপর সেই বালিকাটীকেও মধ্যে মধ্যে পুকুরধারে দেখিতে পাইতেন, উঃ কি চোখ! কি ভুরু! কি ঠোঁট! বিধাতা কি তুলি দিয়া লিখিয়াছেন? টক্‌টকে রং কি আল্‌তা দিয়া আঁকিয়াছেন? কি ললিত বাহুলতা? কি

ফুট্‌ফুটে পরীর ন্যায় শরীর! একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃদ্ধ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, মনে মনে স্থির করিলেন,—টাকা আমার শরীরের রক্ত, কিন্তু শরীরের রক্তপাত করিয়াও এ রত্নটী লাভ করিব। বংশটা বড় হারামজাদা, কিন্তু মেয়েটাকে একবার ঘরে আন্‌তে পারিলে হয়, টাকা সুদসুদ্ধ আদায় করব, মিত্রদের ঘর ভিটে যদি বিক্রয় করিয়া না লই, তবে আমার নাম তারিণী মল্লিক নয়!

আবার কয়েকদিন ঘটকী হাঁটাহাঁটি করিল, দুই হাজার টাকা,—আড়াই হাজার টাকা,—তিন হাজার টাকা,—উঁহু! গোকুল প্রকাশ্যে বলিল,—আমরা নিতান্ত গরিব, তারিণীবাবু অনুগ্রহ না করিলে কে করিবে? মনে মনে বলিল,—বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ ধরিয়াছে, টাকা দেবে না? নাকে দড়ী দিয়া টাকা আদায় করিব।

অবশেষে নাজিরবাবু ঘটকীকে চারি হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া বলিলেন, ইহাতে যদি না হয়, তবে ঐ সনাতনবাটী গ্রামে বসুদের বাড়ীতে যে মেয়েটী আছে, দেখতে শুনতে ভাল, বয়সও শুনেছি দশ বার বৎসর হইয়াছে, তাহাদের বাড়ী যাইও। এই মাসেই ক্রিয়া সমাপন হইবে, ঠিক করিয়া আসিও।

গোকুল দেখিল, নাজির মশাইয়ের নিদেন মানরক্ষার জন্যও তাঁহার কথাটা কতক রাখা চাই। অতএব সেই চারি হাজার টাকাতেই সম্মত হইল, আর ভিক্ষা বলিয়া দেড় শত টাকা, আর চেলির কাপড় বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর খাওয়ানদাওয়ান বলিয়া একশত টাকা, আর তত্ত্ব বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর সভাখরচ পঞ্চাশ টাকা, আর বিবাহের অন্য খরচ বলিয়া একশত টাকা আদায় করিয়া লইল। বলা বাহুল্য যে এই ভিক্ষা ইত্যাদি খরচেই গৃহে চুনকাম করা, পুকুর সংস্কার করা ও বিবাহের সমস্ত ব্যয়ের আয়োজন হইল, চারি হাজার টাকার গোকুলবাবুর কোম্পানির কাগজ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিবাহের আয়োজন

তালপুকুরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ধনশালী বিষয়ী বিজ্ঞ মহামান্য নাজির মহাশয় আবার দারপরিগ্রহ করিবেন, গ্রামের মধ্যে সুন্দরী মেয়ে বাছিয়া তাহাকে হৃদয়েশ্বরী করিবেন, মিত্রবংশ সম্মানিত করিবেন, মল্লিকবংশ উজ্জ্বল করিবেন, বিবাহে বড় ঘটা হইবে, দেশের সমস্ত ভদ্রলোক সমবেত হইবে, মুলুকের কাঙ্গালী ভিখারী বিদায় পাইবে,—এইরূপ কথা ঘরে, দ্বারে, পথে, ঘাটে, প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কৃষকেরা মল্লিকবাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় একবার দাঁড়াইয়া দুটা খোসগল্প শুনিয়া যাইত, রমণীগণ মিত্রবাড়ীর নিকট কলসী নামাইয়া একবার মেয়েকে দেখিয়া যাইত।

তারিণীবাবুর বৈঠকখানা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত লোকারণ্য; কত বন্ধু, কত পরামর্শদাতা, কত সমাজপতি ও দলপতি, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিত, তাহার ঠিক নাই। দিবারাত্রি সাধুবাদ ও স্তুতিবাদ ও নাজির মহাশয়ের বিজ্ঞতার প্রশংসা চলিত। দলপতি ও সমাজপতি বলিতেন,—এ ত তারিণীবাবুরই উপযুক্ত কাজ। এরূপ যোগ্য লোক কি আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়? লক্ষ্মী সরস্বতী দ্বারে বাঁধা। বিদ্যা-বুদ্ধি বলে সাহেব মহলে তারিণীবাবুর কত মান, কত রাজা রায়বাহাদুর হার মানিয়া যায়। আর বিষয়ের ত কথাই নাই, তালপুকুরের মধ্যে দীনদরিদ্র ইতরভদ্র, যে যখন বিপদে আপদে পড়ে, তারিণীবাবু ভিন্ন আর সহায় কে? তারিণীবাবু দীর্ঘজীবী হউন, আমাদের সমাজ বজায় রাখুন, আশু পুত্রমুখ দেখিয়া পরম সুখ ভোগ করুন, ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তারস্বরে কহিলেন,—তারিণীবাবুর সদাই ধর্ম্মে মতি, তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক, তাঁহার ত এ যোগ্য কাজই বটে। সৎকুল দেখিয়া, ভদ্রবংশ দেখিয়া সুলক্ষণা কন্যা স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্রসঙ্গত কাজ করিয়া হিন্দু আচার বজায় রাখিয়াছেন। আজকাল যেরূপ সময়, নাস্তিকগুলো কি করে, তাহার কি ঠিক আছে? কেহ বয়স্কা কন্যা খোঁজে, কেহ বিধবা বিয়ে করিতে চায়, কেহ বা আবার জাতি ছেড়ে অন্য জাতিতে বিয়ে করে। ছি! ছি! সমাজ, তারিণীবাবুকে দেখিয়া শিক্ষা লাভ কর! পুত্রসন্তান কামনায় সদ্বংশজা, সুলক্ষণা, নবমবর্ষীয়া বালিকা

গ্রহণ করিয়া তারিণীবাবু আজ স্বজাতির নাম উজ্জ্বল করিলেন, সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিলেন, ইত্যাদি।

তারিণীবাবুর বন্ধুগণ বলিলেন,—তা নবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিবেন না কেন? তারিণীবাবুর বয়সই বা কি? এখনও চল্লিশ পার হয় নাই, এই ত বিবাহের উপযুক্ত কাল। আহা, মুখখানি যেন কার্ত্তিকের মত, শরীরখানি যেন গণেশের মত, কত কাল তপস্যা করিয়া কন্যা এরূপ বর লাভ করে, ইত্যাদি।

এই সকল কথা শুনিয়া তারিণীবাবুর মুখে আর হাসি ধরিত না, লুকাইয়া দর্পণে ঘন ঘন আপনার মুখখানি দেখিতেন, চুলে ঘন ঘন কলপ দিতেন, কাহার সাধ্য একগাছি পাকা চুল বাহির করে? নাপিতের মাহিয়ানা দ্বিগুণ করিয়া প্রত্যহ ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন, দাড়ি গোঁপ এখনও উঠে নাই বলিলেও চলে!

স্বর্ণকার দিন দুই তিন বার করিয়া তারিণীবাবুর বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিতেছে, পুরাতন গহনা ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের গহনা করিবার ফরমায়েশ হইয়াছে, সেই নূতন গহনাতে প্রেমিক তারিণীবাবু নববধূর অঙ্গ ভূষিত করিয়া দিবেন! কথাটা এক একবার মনে হইতেছে, আর বৃদ্ধের বুকটা নাচিয়া উঠিতেছে। বালিকার সুন্দর ললাটে সিঁথি পরাইয়া দিবেন, ললিত-বাহু-লতা হাতে ধরিয়া আদর করিয়া তাবিজ, বাজু পরাইয়া দিবেন, কুসুমকলিবিনিন্দিত বক্ষের উপর সখের হার ঝুলাইয়া দিবেন, কটীতে রসের চন্দ্রহার দোলাইবেন! ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের শরীরটি রোমাঞ্চিত হইল, বুড়ো বুঝি পাগল হয়!

তারিণীবাবুর বাড়ী আজ লোকারণ্য এবং জ্ঞাতিকুটুম্বে পরিপূর্ণ। দাসদাসী গোলাপী কাপড় পরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। পুকুর হইতে বড় বড় মাছ, হাট হইতে চাঙ্গারি করিয়া শাক শবজি, বর্দ্ধমান হইতে খাজা, সীতাভোগ ও মিহিদানা, কলিকাতা হইতে রসগোল্লা সংগৃহীত হইয়া বাড়ী পূর্ণ হইয়াছে। বাড়ীতে যেন দিবারাত্রি যজ্ঞ হইতেছে, বাহিরে দিবারাত্রি বাদ্য ও লোকের কোলাহল, সমস্ত গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে!

দরিদ্র বিন্দু ও সুধা গলা ধরাধরি করিয়া কাঁদিল, একদিন সন্ধ্যার সময় লুকাইয়া জ্যেঠাইমার ঘরে গিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিল। কিন্তু আজ আনন্দের দিন,—দুঃখিনীদের কান্না কে শুনে, কে দেখে? সজোরে ঢাক বাজাও, রোশনচৌকির শব্দে গ্রাম কম্পিত কর, ভেরিরবে সমস্ত গ্রামে প্রচার কর,—আজ গ্রামের আনন্দের দিন, আজ মহামান্য নাজির মহাশয়ের শুভবিবাহ।

এদিকে কন্যার বাড়ীও আজ লোকারণ্য। মিত্রগণ এককালে গ্রামের বড়লোক ছিলেন, তালপুকুরে ও নিকটস্থ গ্রামসমূহে তাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্বের অভাব ছিল না, তবে সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন পক্ষিকুল নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়া থাকে, মিত্রদিগের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার সময় সেইরূপ জ্ঞাতিকুটুম্বগণ নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়াছিলেন, কেহ সাড়াশব্দ করেন নাই, একবার তত্ত্বতল্লাস করেন নাই। আবার সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ পক্ষিকুল মহা আনন্দে শব্দ করিয়া পুনরায় আকাশ আচ্ছন্ন করে, আজি মিত্রদিগের সৌভাগ্যরবির উদয়ে দশ গ্রাম হইতে জ্ঞাতিকুটুম্ব আসিয়া, গোপীর মার পুরাতন গৃহ আচ্ছন্ন করিল!

চারুর মা সম্পর্কে গোপবালার মাসী হয়। বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে, স্থূল শরীরখানি গহনা-ভরা, মুখে সদাই হাসি। এতদিন পরে বোন্‌ঝিকে মনে পড়িল, পাল্কী করিয়া মিত্রদের বাড়ী আসিলেন। হেসে হেসে গরবিণী বলিলেন,—তা বোন, আমার চারুও যে, গোপীও সে,—আহা! এতদিন বাছা গোপীকে দেখিতে পাই নাই, মনে করি আসি আসি, তা আমাদের যে সংসার, সহজে কি আসা হয়? তা, বাছা গোপী ভাল আছে? বেঁচে থাকুক, শ্বশুরবাড়ীর গৃহলক্ষ্মী হয়ে থাকুক, সোণার চাঁদের মত ছেলের মুখ দর্শন করুক। মল্লিকদের বাড়ী সর্ব্বদাই যাতায়াত আছে, বাছা গোপীকে সর্ব্বদাই দেখে যাব। আমরা আসিব না ত কে আসিবে? কথায় বলে,—মাও যে, মাসীও সে, মা মাসী বাছাকে দেখবে না ত দেখবে কে? ইত্যাদি।

হরির মা সম্পর্কে গোপীর পিসী হয়। সামান্য গৃহস্থঘরে বিবাহ হইয়াছে, শরীর শীর্ণ, স্বভাবটী একটু রুক্ষ। ভ্রাতার মরণের পর মিত্রবাড়ীতে পা দেন নাই, তবে গোপীর মা অন্নকষ্টে লালায়িত হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করায় একবার পাঁচ টাকা ধার দিয়াছিলেন, তাহাও ঘটী বাটী বিক্রয় করিয়া, সুদসুদ্ধ আদায় করিয়া লইয়াছেন। আজ পিসীমার শরীর স্নেহে গলিয়া পড়িতেছে, গোপীর চুল বেঁধে দিতেছেন, গহনা পরাইয়া দিতেছেন, কত সেবাশুশ্রূষা! বলিলেন,

—তা আমরা করব্‌ না ত কর্‌বে কে গা বোন? থাক্‌তেন আজ দাদা বেঁচে, আহা, এ আনন্দের দিন কতই আনন্দ করিতেন! আহা, দাদা যখন যে কাজটি করতেন আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ত করতেন না, আমাকে না ডাকাইয়া কি বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হবার যো ছিল? তা দাদা যেমন পুণ্যাত্মা ছিলেন, বাছা গোপীও সেই রকম গো, আহা মেয়ের মুখে কথাটি নেই। তা এমন মেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে না ত কার হবে? বেঁচে থাক্‌ বাছা, গা ভরে গহনা পরবি, পাল্কী চড়বি, বারাণসী সাড়ী পরে যগ্‌গিবাড়ী যাবি,—এর বাড়া কি সুখ আছে? বাছা তোদের মুখ দেখে মরতে পারিলেই বাঁচি, ইত্যাদি।

শ্যামের মা সম্পর্কে গোপীর খুড়ী হয়। তাঁহার স্বামীর সহিত গোপীর বাপ বিষয় লইয়া অনেক বিবাদ করিয়াছিলেন,—গোপীর বাপের মৃত্যুর পর, শ্যামের মা বিধবা জার উপরে সে কলহের বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। মকদ্দমা করিয়া দরিদ্র জার জমাজমী বিক্রয় করিয়া লইলেন, ডিক্রি করিয়া তাঁহার ঘটীবাটী বিক্রয় করিয়া লইলেন, সন্দেশ হাতে করিয়া ছেলেদের পাঠাইয়া দিতেন,—গোপীকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবি! গোপীর মা গরিব ও ভালমানুষ, সমস্ত সহ্য করিত ও কাঁদিত। টাকার কি মধুময়ী ক্ষমতা! গোপীর মার সৌভাগ্য উদয়ে শ্যামের মা সমস্ত বৈরিভাব ভুলিলেন, প্রিয় জার প্রতি তাহার কত মায়া, কত মমতা, কত যত্ন! বলিলেন,—আহা বোন! পুরাতন কথা কি ভুলা যায়? সেই তোমার আমার একই বৎসর বিয়ে হয়, আহা, আমরা যেন বোনের মত ছিলাম গো, একমন, একপ্রাণ, কেবল শরীর ভিন্ন বৈ ত নয়? তোমার যখন গোকুল পেটে, তখন বাছা শ্যামলাল হয়, তা আমার শ্যামলালও যে, গোকুলও সেই। তা গোকুল বেঁচে থাকুক, গুণবান বুদ্ধিমান ছেলে হয়েছে, দু'পয়সা রোজকার করিতেছে, মিত্রকুলের নাম রাখিবে। আর বাছা গোপীর বড় ঘরে বিয়ে হইতেছে, বড়মানুষের বৌ হবে, গা ভরে গহনা পরবে, সুখে থাকবে! আহা ওদের সুখ দেখলে আমাদের চক্ষু জুড়ায়, ইত্যাদি।

এইরূপ আত্মীয়দিগের যত্ন শুশ্রূষা, আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলকামনায় গোপীর মা বড়ই আপ্যায়িত হইলেন। তাহাদের বাড়ী হইতে বড় বড় তত্ত্ব আসিয়া মিত্রবাড়ী ভরিয়া গেল, এ কয়েক বৎসর ইহার চতুর্থাংশ অনুগ্রহ পাইলে গোপীর মা অন্নবস্ত্রের জন্য বিন্দু ও সুধার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইত না! গোপবালা মার চেয়ে সেয়ানা মেয়ে, বাপের বুদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধাদিগের কাছে মেয়ের মুখে কথাটি নাই, তাহাদের মমতা ও স্নেহবাক্যে মেয়ের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। চক্ষু মুছিয়া পুকুরধারে সমবয়স্যাদিগের কাছে আসিয়া একবার প্রাণ খুলিয়া হাসিল।

সমবয়স্যারা বলিল,—কিলো, বড় ঘরে বিয়ে হবে বলে বড় আহ্লাদ যে,—মুখে হাসি ধরে না যে।

গোপী। না লো, তার জন্য হাসি নয়।

বয়স্যাগণ। তবে কি জন্য? মনের কথাটা খুলেই বল না।

গোপী। এই আমার মাসীমা, পিসীমা, খুড়ীমা'দের যত্ন দেখে হাস্‌ছিলাম।

বয়স্যাগণ। ইস! হেসে যে গড়িয়ে গেলি, মেয়ের রকম দেখ না। তা মাসীমা পিসীমা বিয়ের সময় আসিয়াছেন, তোদের ভালবাসে বলে যত্ন কচ্ছেন, তাতে আবার হাসি কিসের লা?

গোপী বলিল,—না, না, তা নয়, তবে মাসীমা পিসীমার যত্ন দেখিয়া একটা রূপকথা মনে পড়িল তাই হাসিতেছিলাম। রূপকথাটি বলি শুন।—

দুটী ভাই ছিল, বড় ভাইটী বড়লোক, আর ছোট ভাইটী গরিব। তা বড় ভায়ের স্ত্রীর বড়মানুষী চাল, সে গরিব ছোট জাটীকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করে না, দেখা হইলে কথাও কয় না। গরিবরা দুঃখে থাকে, কাঁদাকাটি করে, কিছুদিন পরে সে গ্রাম থেকে উঠিয়া গেল।

বিদেশে চাকরীবাকরী করিয়া গরিবদের শেষে অনেক টাকা হইল। তখন তাহারা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পাকাবাড়ী করিল, নূতন পুকুর কাটাইল, জমীদারী কিনিল, আর অনেক চাকরবাকর রাখিয়া, বড়মানুষী চালে চলিতে লাগিল।

বড় জা তখন ছোট জাকে অনেক আদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাল্কী পাঠাইল। ছোট জা খাইতে আসিয়া দেখে,—রূপার থালে ভাত বাড়া, রূপার বাটীতে ব্যঞ্জন সাজান, রূপার রেকাবিতে সন্দেশ মণ্ডা! ছোট জা আসনে বসিল। ভাতগুলি চারি ভাগ করিল, ব্যঞ্জনগুলি চারিভাগ করিল, সন্দেশ মণ্ডা চারি ভাগ করিল। এই রকমে ভাগ করিয়া আসন থেকে উঠিয়া হাত ধুইল।

বড় জা বলিল,—একি বোন, খেলে কৈ? ছোট জা বলিল, যাদের জন্য খাবার করেছ দিদি, তাদের জন্য ভাগ করে দিলাম। এ ত আমার জন্য খাবার করনি দিদি।

বড় জা বলিল,—তোমার জন্য নয় ত কার জন্য বোন? ছোট জা বলিল,—এই এক ভাগ আমাদের পাকা বাড়ীর জন্য, এই এক ভাগ আমাদের পুকুরের জন্য, এই এক ভাগ আমাদের জমীদারীর জন্য, আর এই এক ভাগ আমাদের লোকজনের জন্য। এই সব দেখে রান্নাবান্না করিয়াছ দিদি, খাওয়াদাওয়া এদেরই সমর্পণ কর। আমাকে যদি খাওয়াইতে ইচ্ছা থাকিত, তাহলে যখন গরিব অবস্থায় অন্নের জন্য লালায়িত ছিলাম, তখন একদিন ডেকে খাওয়াইতে!

সন্ধ্যার সময় শাঁক বেজে উঠিল। ঘরে দ্বারে প্রদীপ বাতি জ্বলিল, বাহির দরজায় বাদ্য আরম্ভ হইল, বৃদ্ধাগণের ডাকাডাকি, তরুণীদিগের খোসগল্প ও হাস্যধ্বনি, দাসীদিগের ছুটাছুটিতে বাড়ী পুরিয়া গেল। বাহির বাড়ীতে কন্যাকর্ত্তা গোকুলবাবু কোমরে চাদর বাঁধিয়া ডাবা হুঁকা হাতে লইয়া, সভা প্রস্তুত করিতেছেন, বাতি জ্বালাইতেছেন, হাঁক ডাক করিতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন। ভিতর বাড়ীতে সমস্ত প্রস্তুত, কন্যাকে সাজাইবার জন্য ডাক হইল। মেয়ে সাজিতে বসিল, মুখখানি নম্র ও শান্ত, হৃদয়খানি আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শুভবিবাহ

তুষারমণ্ডিত বিশাল হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় টোপরমণ্ডিত তারিণীবাবুর বিশাল শরীর সভাস্থল জমকাইয়া রহিয়াছে! পাথুরে-কালো স্থূল শরীরের উপর রক্তবর্ণ চেলির কাপড় শোভা পাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের গোঁপ-কামান বরের মাথায় বিরাট টোপর শোভা পাইতেছে। কোথায় গেলেন কবি কালিদাস, তিনি সে মনোহর রূপ বর্ণনা করুন,—আমরা অক্ষম।

বাড়ী লোকারণ্য, চারিদিকের গ্রামসমূহে কায়স্থকুলের কেহ নিমন্ত্রণে বাদ পড়ে নাই। বাড়ীর ভিতর একেবারে মেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কল্ কল্ শব্দ, তাহাদের হাস্যধ্বনি, ও তাহাদের কথারহস্যে বাড়ী আনন্দপূর্ণ। কোন নবীনা উঁকিঝুঁকি মারিয়া সখীকে ডাকিতেছে. “ওলো দেখিবি আয়লো, দেখিবি আয়। ওমা, একি বিয়ের বর, না একটা মুশকো মিন্‌ষে লো?”

দ্বিতীয়া। দূর পোড়াকপালী, বিয়ের রাত্রি বরকে অমন কথা বলে! কেন লো, বরের রূপ মন্দই বা কি? রংটা একটু কাল বই ত নয়, না মুখের ছিরি আছে।

প্রথমা। হাঁ, ছিরি আছে বৈ কি,—কেবল গাল দুটি যেন পাকা বেগুন ঝুলে রয়েছে!

দ্বিতীয়া। দূর পোড়ামুখী! শুখনো চড়ান গাল বুঝি ভাল?

প্রথমা। আর ঠোঁট দুটী যেন বোলতায় কামড়ে দিয়েছে!

দ্বিতীয়া। দেখিস্, দেখিস, ঐ ঠোঁট পেয়ে গোপী বত্তে যাবে। শ্বশুরবাড়ী একবার গেলে হয়, এমন গোলগাল স্বামী পেয়ে আর এ-মুখো হবে না।

প্রথমা। আর বুকে কি চুল দিদি, ঠিক যেন আমাদের বাড়ীর আঁস্তাকুড়ের জঙ্গল।

দ্বিতীয়া। দূর হতভাগী! অমন কথা বল্‌তে নেই।

প্রথমা। ও বাবা! পেট্‌টা কি ফুলো গা? মিন্‌ষের পেট ফুলেছে নাকি?

দ্বিতীয়া। যা যা, তোর আর বরের নিন্দে কর্‌তে হবে না। গোপী শুন্‌লে রাগ কর্‌বে। দেখিস্, ঐ নাদোস নোদোস শরীর পেয়ে আমাদের গোপীর মন ভুলে যাবে।

প্রথমা। না, সত্যি দিদি, বরের পা দুখানা দেখ। ওমা পায়ে গোদ হয়েছে না কি? গোদা পা নিয়ে কোন্ লজ্জায় মিন্‌ষে বিয়ে করতে এল? কোন্ এক জোড়া মোজা পরে ঢেকে এল দিদি?

দ্বিতীয়া। দেখিস্ দেখিস্, ঐ পা গোপী কত যত্নে পূজা কর্‌বে।

প্রথমা। ইস! তা আর হতে হয় না। গোপী আপনার খুদে খুদে আল্‌তামাখা পা দুখানি যদি মিন্‌ষের টোপরের উপর না রাখে, তবে আমি আর কি বলেছি। আমি গোপীকে জানি, সে চাপা মেয়ে, মুখে ভাল মানুষ, মনখানি ক্ষুরের মত ধারাল।

বর গাত্রোত্থান করিলেন,—যেন হিমালয় পর্ব্বত শিকড় ছিঁড়িয়া উঠিলেন! বাড়ীর ভিতরে স্ত্রী-আচার, রসিকাগণ সে আচার বর্ণনা করুন, আমরা তাহার কি জানি? বাড়ীর উঠানে একেবারে মেয়ে পিল্‌পিল্ করিতেছে, তারিণীবাবুর বিশাল শরীরের চারিদিকে ঘুরিতেছে,

ফিরিতেছে, নির্লজ্জ হইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে,—যেন একটী বিশাল তমালবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ময়না পাখিগুলি উড়িতেছে! কোনও মেয়েটী ডিঙ্গি মারিয়া তারিণীবাবুর থল্‌থলে কাণটী একবার মলিয়া দিল। কেহ বা সেই প্রকাণ্ড উদরের উপর দৈয়ের হাতের ছাপ লাগাইয়া গেল! এবং কোন রসিকা সেই বিশাল পৃষ্ঠদেশে আলপনার দাগ দিয়া যেন দূরবিলম্বী মেঘরাশির উপর বিদ্যুতের শোভা করিয়া দিল।

ক্ষুদ্র গোপীকে পিঁড়ায় বসাইয়া বরের চারিদিকে সাত বার পাক দেওয়া হইল, তারিণীবাবুর মনটি নৃত্য করিতেছে, নজরটি সেই পিঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে! যখন “বর বড় না কনে বড়” প্রশ্ন হইল, তখন গোপীর পরম বন্ধুগণও স্বীকার করিল, বর বড় বটে। যখন বরণডালা লইয়া পতিপুত্রবতী কোনও গৃহিণী নাজির মহাশয়কে “ভ্যা” করিবার অনুরোধ করিলেন, তখন রসিকাগণ কাণাকাণি করিতে লাগিল,—“ভ্যা” করিবেন দিন কতক পর,—গোপী তেমন মেয়ে নয়!

তাহার পর বরকন্যা একত্র বসিলেন, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইলেন। তারিণীবাবু স্বেদপূর্ণ স্থূলহস্তে কন্যার সেই সুচিক্কণ সুন্দর পুষ্পাবিনিন্দিত হস্তগ্রহণ করিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন,—অবগুণ্ঠনশূন্য বধূর মুখ, মুক্তাবিভূষিত ললাট, এবং অলক্তকরঞ্জিত ওষ্ঠ দেখিয়া,—বুড়ো বুঝি বিবাহ-সভায় মূর্চ্ছা যায়!

তাহার পর বাসরঘর! বাসরঘরে আজ বড় তামাসা,—তারিণীবাবুর মত নাদোস নোদোস, গোলগাল, বয়স্ক, রসিক বর তালপুকুরের সুন্দরীগণ সর্ব্বদা পান না, আজ বুঝি বরকে আস্তই খেয়ে ফেলেন! বর ঘরে আসিবামাত্র এক জন শ্যামা, স্থূলাঙ্গিনী, মধ্যবয়স্কা রসিকা তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন, “এস এস গোপীবল্লভ এস, তোমার বিরহে গোপবালা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।” রসিক তারিণীবাবু ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন নয়, যেন ষোল শত গোপিনী সেই নিকুঞ্জে বসিয়াছেন!

বাসরঘরের রং তামাসা আমরা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? বাসরঘরের কথা আমরা কি জানি? কোথা গেলে রসিকা সুন্দরীগণ,—তোমরা সে গূঢ় আচার জান, তোমরা সে রসের কথা জান,—তোমরা যাহা করিবার কর। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের তারিণীবাবুর কোলে ময়না পাখিটীর ন্যায় কন্যাটিকে বসাও, আমরা বিদায় হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : দম্পতি-প্রণয়

সুখের স্বপ্নের মত তারিণীবাবুর ছুটি ফুরাইল, তিনি পুনরায় বর্দ্ধমানে কার্য্যে যোগ দিলেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া নববধূটিকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেন, আবার অনিচ্ছুক বলদের মত ফিরিয়া বর্দ্ধমানে যাইয়া আপিসের ঘানিগাছে বাঁধা হইয়া ঘুরিতেন।

তিন চারি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তারিণীবাবুর কায করা আর পোষায় না। বয়সে শরীর দুর্ব্বল হয়, মন নিস্তেজ হয়। কাযে সর্ব্বদাই ভুল হইত। সাহেবেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিতেন, নাজিরবাবুর পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইয়াছে, পেনশন লউক। অন্যান্য আমলাগণ কাণাকাণি করিত, নাজির মহাশয়ের মন নূতন বৌয়ের দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কাজ করিবেন কিরূপে?

চাকরীর মায়া শীঘ্র ছাড়া যায় না,—অনেক গঞ্জনা সহ্য করিয়াও আরও এক বৎসর কায করিলেন, শেষে অগত্যা পেনশন লইয়া গ্রামে আসিয়া বসিলেন। তখন গোপবালার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স, যৌবনের কান্তিতে শরীর ফেটে পড়িতেছে, রূপে ঘর আলো করিয়াছে, গা ভরিয়া গহনা পরিয়া রূপাভিমানী গৃহিণী গৃহ জমকাইয়া বসিয়াছে! বার্দ্ধক্যে রূপ-তৃষ্ণার্ত্ত তারিণীবাবু মনে করিলেন, “চাকুরীর মুখে আগুন, এবার নববধূকে লইয়া জীবন সার্থক করিব।” নববধূ মনে করিলেন, “এবার বুড়ো মিন্‌ষেকে ঘরে পাইলাম, নাকে দড়ী দিয়া ঘুরাইব, কর্ত্তাটী আর যাবেন কোথা?”

উমার মা রোগক্লিষ্টা, সংসার দেখিতে পারেন না, দুবেলা দুপেট খান, আর প্রায়ই আপনার ঘরে শুইয়া থাকেন। বিন্দু সর্ব্বদাই জোঠাইমাকে দেখিতে যাইত, কিন্তু নববধূ তাহাতে মুখ ভার করিলেন। লোকের কাছে বলিতেন, “ওদের জাত গিয়াছে, ওদের আচার ব্যবহার ভাল নয়,

উহারা ঘন ঘন আসা যাওয়া করিলে আমাদের নিন্দা হয়।" যে নম্রমুখী দরিদ্র বালিকা নগ্নাবস্থায় উঠানে সেদিন খেলা করিতে আসিত, আর একটী সন্দেশের জন্য লালায়িত হইত, সে এখন বড় ঘরের গৃহিণী, সম্পর্কে গুরু! তাহার এই কথা শুনিয়া বিন্দু গোপনে হাসিলেন, জ্যেঠাইমার বাড়ী যাওয়া-আসা কতকটা বন্ধ করিলেন।

উমার মার একটী পুরাতন দাসী ছিল, সে শুশ্রূষা করিত। বড় সতীনের প্রতি দাসীর এত মায়া দেখিয়া নববধূ সে দাসীর প্রতি বিরক্ত হইলেন, অভিমানে সুন্দর চক্ষে জল আনিয়া লাল ঠোঁট ফুলাইয়া কর্ত্তার কাছে লাগাইলেন,—"আমার ঘর-সংসারের কায চলে না, আমি খাটিয়া খাটিয়া হাড় কালি করিতেছি, আর দিদি গিন্দে ঠেসান দিয়া শুইয়া থাকেন, তাঁহার দাসী না হইলে চলে না। তা দিদিকে নিয়েই থাক, দিদি সংসার চালান, আমি বাপের বাড়ী চলিলাম।" বলা বাহুল্য, পুরাতন দাসী সেই দিনই বিদায় হইল। উমার মার মুখে জল দেয় এমন একজন লোক রহিল না।

পড়শীর লোক সর্ব্বদাই উমার মার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসিত, ছোটমার মেজাজ ও ভাবগতিক দেখিয়া তাহারাও আসা প্রায় বন্ধ করিল। উমার মার কাপড়চোপড় ও পূজা-আচ্চার খরচের জন্য তারিণীবাবু আলাদা কিছু টাকা মাসে মাসে দিতেন, নববধূর চক্ষে জল দেখিয়া তাহাও বন্ধ করিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও তারিণীবাবু নববধূর মন পাইলেন না। সুন্দরী গোপবালা স্বামীর নিকট সর্ব্বদাই বিমর্ষ, সর্ব্বদাই অভিমানিনী। যুবতী নারীর অভিমান-অস্ত্রের প্রভাব গোপবালা জানিতেন, বুদ্ধিমতী সুযোগ পাইয়া এখন ধনুকে সেই অস্ত্র জুড়িলেন!

বৃদ্ধ দেখিলেন,—বর্দ্ধমানে সাহেবদের চাকুরী করা অপেক্ষা তরুণী ভার্য্যার পরিচর্য্যা বিষম কায! সে কার্য্যে বৃদ্ধ হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, তবু ত তরুণীর মন উঠে না, মান ভাঙ্গে না! নূতন বস্ত্র নূতন অলঙ্কার, নানা প্রকার উপাদেয় বস্তু দিয়া সে রাঙ্গা চরণের সেবা করিতেন, তবু ত সে রাঙ্গা চরণের প্রসাদ পান না। তালুক থেকে তোড়া তোড়া টাকা এনে দেন, তরুণী টাকাগুলি বাক্‌সে বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসেন! জিজ্ঞাসা করিলে তরুণী কথা কহেন না, অথবা ঘোর অভিমানে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, "তবু যে জিগ্‌গেস কর্‌লে এই আমার ভাগ্য! আমার প্রতি ত তোমার মায়া নেই,—মায়া দিদির প্রতি! আমি গরিবের মেয়ে, আমাকে তাচ্ছিল্য কর্‌বে না ত কি?" (ক্রন্দন)

বুড়ো চক্ষের জল মুছাইয়া বলিতেন,—সে কি, সে কি, তোমাকে মাথায় করে রাখিব,—তুমি কি আমার অযত্নের ধন? কি করিলে তুষ্ট হইবে বল, আমি এখনই করিতেছি।

বিনাইয়া বিনাইয়া নবীনা বলিতেন,—তা আমি মেয়েমানুষ, কি করিলে ভাল হয়, আমি কি রকমে জানিব? ঐ চাটুয্যেদের বাড়ীর কর্ত্তাটী বুড়ো বয়সে আবার একটা বিয়ে করিয়াই কিছুদিন পর তাঁহার কাল হইল, ছোট মেয়েটাকে সতীনের হাতে ফেলে গেলেন। বড় সতীন তাকে উঠ্‌তে বস্‌তে গাল দেয়, দিবারাত্রি মজুরের মত খাটায়, দুবেলা খেতে দেয় না। ছোট বৌটী যেন মড়ার মত হয়ে গিয়েছে,—পথের কাঙ্গালীর মত কেঁদে কেঁদে বেড়াইতেছে। তা আমারও সেই দশা হবে। কেনই বা হবে না? কাঙ্গালীর ঘরে জন্ম, আমি পথে ভিক্ষা করিব না ত কে করিবে? (ক্রন্দন)

তারিণীবাবু। সে কি? উমার মার সাধ্য কি তোমাকে কিছু বলে?

গৃহিণী। হাঁ, উমার মার ত আমার প্রতি বড় মায়া! এখনই দুচক্ষে দেখতে পারে না,—এর পরে আমাকে কি আর আস্ত রাখ্‌বে? (ক্রন্দন)

এইরূপ প্রায় মধ্যে মধ্যে কাঁদাকাটি হইত, দিবারাত্রি অভিমান হইত, তারিণীবাবু আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। গৃহিণীর কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন যে গৃহিণী ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংস্থান করিতে চাহে। এতটুকু মেয়ের পেটে এ বুদ্ধি কেমন করিয়া হইল বুঝিতে পারিলেন না। তারিণীবাবু জানিতেন না যে গৃহিণীর পরামর্শদাতা পরম বুদ্ধিমান গোকুলচন্দ্র ঘন ঘন বর্দ্ধমান হইতে আসা যাওয়া করিত, এবং গোপনে ভগিনীর সহিত পরামর্শ করিত।

তরুণী ভার্য্যার তীব্র অভিমান ও অশ্রুজল দেখিয়া হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরিতে পারে এরূপ বীর পুরুষ সংসারে অল্প। তারিণীবাবুর মন ক্রমে টলিতে লাগিল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—আমার ভালমন্দ হইলে কিছু বিষয় ছোট গৃহিণীর হাতে থাকে এরূপ একটা

বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া ভাল। উহাকে বিষয় দিব না ত কাহাকে দিব? সেই মাতাল জামাইটা শেষকালে সমস্ত বিষয়টা কাড়িয়া লইবে? না না, সে কথা নহে, আমার প্রাণের গোপবালাকে কিছু দিয়া যাইব। আর যদি ছোট গৃহিণী দ্বারা আমার পুত্রসন্তান হয়, তাহা হইলে সেই পাইবে, মাকে দেওয়াও যা, ছেলেকে দেওয়াও তাই।

অনেক বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধ বর্দ্ধমানে গেলেন। তথায় উকীল মোক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া, রেজিষ্টারি আপিসে হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষে একখানি দলীল লইয়া বাড়ী আসিলেন, এবং বাড়ীতে পঁহুছিয়াই নববধূর রাঙ্গা চরণে পূজা দিতে আসিলেন! হাস্যগদ্‌গদ স্বরে তরুণী ভার্য্যাকে সম্ভাষণ করিয়া দলীলখানা তাঁহার হস্তে দিলেন, মনে করিলেন,—এবার উড়াপাখি পিঞ্জরে পুরিলাম,—এ কুহক মন্ত্র এড়াইবার নহে, দেখিব মন গলে কি না গলে।

অভিমানিনী বধূ স্বামীর দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলও না!

তারিণীবাবু। বলি চুপ করে রৈলে যে?

বধূ। তবে কি করিব?

তারিণীবাবু। দলীলখানা কি জান?

বধূ। কেমন করে জানিব?

তারিণীবাবু। এখানা উইল।

বধূ। শুনিলাম।

তারিণীবাবু। বড় মূল্যবান দলীল।

বধূ। তোমার বাক্‌সে রাখিয়া দাও।

তারিণীবাবু। আমার ভালমন্দ হইলে আমার বিজয়পুর তালুকখানি তোমারই হইবে।

বধূ। আমার চাই না।

তারিণীবাবু। সে কি? সে কি? এত অভিমান কিসের?

বধূ। অভিমান আবার কি? যে মানে রেখেছ, ঢের হয়েছে।

তারিণীবাবু অবাক হইয়া রহিলেন! বধূ চক্ষু মুছিতে লাগিলেন!

তারিণীবাবু দলীলখানি জোর করিয়া বধূহস্তে দিলেন। বধূ দলীলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ক্রোধে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন!

রাত্রি হইয়াছে। ছোট গৃহিণী খান নাই, দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছেন। তারিণীবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল! বৃদ্ধ দ্বারদেশে কালীঘাটের কাঙ্গালীর মত বসিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন।

এক ঘণ্টা মিনতির পর দরজা খুলিল।

বধূ বলিলেন,—আবার হাড় জ্বালাইতে আসিয়াছ কেন?

তারিণীবাবু সেই রাঙ্গা চরণ দুইটী আপনার কলপ দেওয়া চুলের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন,—কি অপরাধ করিয়াছি বল?

বধূ। অপরাধ আবার কি?

তারিণীবাবু। দলীলখানা ছিঁড়িলে কেন?

বধূ। কি দলীল?

তারিণীবাবু। আমার প্রধান তালুকখানি তোমাকে উইল করিয়া দিয়াছিলাম।

বধূ। আর সম্প্রতি যে জমীদারী কিনিয়াছ, সেটী বুঝি দিদিকে গোপনে দেওয়া হইবে? তা দিদি তোমার নয়নের তারা, দিদি তোমার মাথার মণি,—দিদিকে সর্ব্বস্ব দিয়ে যাও! আমি গরিবের মেয়ে, আমি তোমার চক্ষুর শূল হইয়াছি, আমাকে ভিখারীর মত তাড়াইয়া দাও, আমি গরিব মার কাছে চলিয়া যাই। লোকের বাড়ী ধান ভানিয়া খাইব, তবু তোমার অন্ন খাইব না,—এ অপমান, এ লাঞ্ছনা, এ যাতনা আর সহ্য হয় না! (ক্রন্দন)

তারিণীবাবু বিস্মিত হইলেন! তিনি সম্প্রতি একটী জমীদারীর অংশ নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা গৃহিণীদের বলেন নাই। সে কথা গোপবালাকে কে বলিল? নববধূ সেটীও চাহেন নাকি? সর্ব্বস্ব নববধূকে উইল করিয়া যাইলে উমার মার দশা কি হইবে? এইরূপ নানা চিন্তা তারিণীবাবুর হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল।

সেয়ানা মেয়ে গোপবালা স্বামীর মনের সন্দেহ বুঝিতে পারিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন

করিয়া বলিল, “আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পথের কাঙ্গালী হইব, পথে ভিক্ষা করিয়া খাইব। আমাতে তোমার যখন বিশ্বাস নাই, তখন আমি এ বাড়ীতে থাকিব না, গাছতলায় শুইয়া থাকিব। যাহার উপর বিশ্বাস আছে, সেই দিদির কাছে যাও,—আমাকে ছেড়ে দাও, আর দগ্ধ করিয়া মারিও না।” রমণী আছাড় খাইয়া পড়িল,—বুঝি বা হিষ্টিরিয়া হয়,—বড়মানুষী ব্যারামটীও দরকারের সময় গোপবালার আসিত।

সে রাত্রির কথা অধিক বর্ণনায় আমরা অক্ষম। একদিকে তারিণীবাবুর ভীষণ বিষয়-কামনা, অন্যদিকে তরুণী ভার্য্যার ভয়ঙ্কর উপদ্রব,—আজি পথের ভিখারীও তারিণীবাবুর অবস্থা দেখিলে দুঃখিত হইত। তীক্ষ্ম বুদ্ধিমতী ঘন ঘন অশ্রুবাণ, অভিমান-বাণ, ক্রন্দন-বাণ, হিষ্টিরিয়া-বাণ, আবার মিনতি-বাণ, ভালবাসার বাণ দ্বারা বৃদ্ধের শরীর জর্জ্জরিত করিলেন। কখন তর্জ্জন গর্জ্জন, কখন সাধ্য সাধনা, কখন বা মিনতি, কখন কত গল্প বলেন। কলিকাতার কত বড়মানুষ সমস্ত বিষয় স্ত্রীকে দিয়া গিয়াছেন, স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রী সুন্দররূপে সংসার চালাইতেছেন। নারী কি বিশ্বাসঘাতিনী? নারী কি স্বামীর সংসার স্বামীর ঘর কখন অবহেলা করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে? স্বামীর ঘর ভিন্ন নারীর কি অন্য ঘর এ জগতে আছে?

সমস্ত রাত্রি এইরূপ যুদ্ধ চলিল, প্রাতঃকালের প্রথম আলোকচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিল, তখন বিষয়ী তারিণীবাবু পরাস্ত হইলেন। বলিলেন, “হৃদয়ের ধন! তোমাকে দিব না ত কাহাকে দিব,—আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে লিখিয়া দিব, তুমি বড়, না আমার জমীদারী বড়?”

সমর-বিজয়িনী গোপবালা তখন নয়নের অশ্রু মুছিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া মাটী হইতে উঠাইয়া আপন পার্শ্বে স্থান দিলেন, এবং স্নেহগদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, “তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তুমিই আমার জীবন। বিষয় কি তুচ্ছ,—তোমার স্নেহ পাইলে সবই পাইলাম।” তরুণীর চক্ষে জল, মনে মনে হাসি,—তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, “মিত্রের ঘরের মেয়ে কেমন এতক্ষণে বুঝিলে? সে কি বুড়ো মিন্‌ষের রূপ দেখে বিয়ে করেছিল? যার জন্য বিয়ে করেছিল, সে কাজ আজ উদ্ধার হইল।”

এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত কাজ সমাধা হইয়া গেল। তারিণীবাবু আজীবন চাকরী করিয়া ন্যায় ও অন্যায় মতে যে বিষয় করিয়াছিলেন,—পৈতৃক সম্পত্তিও নিজে যাহা করিয়াছিলেন,—বিন্দু ও সুধার বাপের কাছে যাহা ঠকাইয়া লইয়াছিলেন,—গ্রামের লোকের সঙ্গে মকদ্দমা-মামলা করিয়া যাহা জিতিয়া লইয়াছিলেন, বর্দ্ধমানে সময়ে সময়ে সরকারি নিলামে যাহা সস্তা পাইয়া কিনিয়াছিলেন,—সে সমস্ত অদ্য তরুণী ভার্য্যাকে উইলপত্র দ্বারা লিখিয়া দিলেন। বৃদ্ধা, শোকগ্রস্তা, চিরপতিব্রতা উমার মাকে উদ্ধতা যুবতী সতীনের দয়ার উপর ভাসাইলেন,—ঘরের সন্তানের ন্যায় বিন্দুকে চিরদারিদ্র্যে ভাসাইলেন।

উমার মা এ সংবাদ শুনিলেন, বুঝিলেন, তিনি সপত্নীর ঘরে আশ্রিতা হইবেন, সপত্নীর অন্নে পালিতা থাকিবেন, সপত্নীর দাসী হইয়া পরিচর্য্যা করিবেন। মুমূর্ষু রোগীর এ মর্ম্মব্যথা অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না,—কয়েক দিনের মধ্যে রোগক্লিষ্টা, শোক-বিদগ্ধা নারী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বিন্দু ও সুধা জ্যেঠাইমার শেষ অবস্থায় অনেক সেবা করিলেন, জ্যেঠাইমার গলা ধরিয়া উমাতারাকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলেন।

তখন নববধূ মল্লিক বাড়ীতে জমকাইয়া বসিলেন। ক্রমে উইল-লিখিত সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর জীবিতাবস্থাতেই দখল করিতে লাগিলেন। তারিণীবাবুও তাহাতে আপত্তি করিলেন না, নববধূর কোনও কার্য্যে প্রতিরোধ করিতে তাঁহার সাহস হইয়া উঠিত না।

তারিণীবাবু পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন, লোকের সঙ্গে বিবাদ ঝগড়া করেন, গৃহস্থদের গালি দেন, পড়শীদের শাসন করেন,—আর বাড়ীতে আসিয়া ভিজে বেড়ালের মত আস্তে আস্তে লুকাইয়া থাকেন। সমস্ত বিষয় দিয়াও তরুণীর মন পাইলেন না, তরুণীর অভিমান ও দর্প ভাঙ্গিতে পারিলেন না।

বিষয়কার্য্য এখন গোপবালাই দেখেন,—তাঁহার মন্ত্রী গোকুলচন্দ্র। তারিণীবাবু দুই বেলা দুই পেট খাইতে পান, বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া থাকেন, অথবা উমার মা যে ঘরে মরিয়াছে, সেই ঘরে এক একবার যাইয়া ভাবেন। কেহ কেহ বলিত, উমার মার জন্য এত দিন পর শোক হইয়াছে। কেহ বলিত, দুঃখিনী বিন্দুকে কিছু না দিয়া সমস্ত বিষয় গৃহিণীকে উইল করিয়া দিয়া বৃদ্ধের মনস্তাপ হইয়াছে। কেহ বলিত, তা নয়, তা নয়, বুড়োর ভীমরতি ধরিয়াছে।

তারিণীবাবুর ভীমরতি ধরে নাই,—তিনি এখন সর্ব্বদাই পুরাতন কথা চিন্তা করিতেন,—এবং সেই চিন্তা করিতে করিতে মনে একটা মতলব স্থির করিতেছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ তালপুকুরের ইতিহাস

আমরা এতক্ষণ তারিণীবাবুর ইতিহাস লিখিতেছিলাম, কেননা তারিণীবাবু তালপুকুরের মধ্যে বড়লোক, বড়লোকের কথা কি শীঘ্র শেষ হয়? তথাপি তালপুকুরে সামান্য অবস্থার লোকও বাস করিত, তাহাদের সম্বন্ধেও দুই-একটী কথা লেখা আবশ্যক।

বিন্দু চিরকালই দরিদ্র, কিন্তু এই দরিদ্র অবস্থাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা করিত ও ছেলে দুটীকে মানুষ করিত। মেয়ে সুশীলার বয়স এখন দ্বাদশ বৎসর হয়েছে, দেখিতে একটু কাহিল ও শ্যামবর্ণ, কিন্তু মেয়েটী সুশ্রী ও শান্ত, এবং মার মত চক্ষু দুটী কাল, প্রশান্ত ও বড় সুন্দর। ছেলে সুবোধটীর বয়স নয় বৎসর হইয়াছে, নিকটস্থ সনাতনবাটী গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে যায়, এবং পিতার ন্যায় শান্ত। বিন্দুর আর সন্তান হয় নাই।

হেমচন্দ্র প্রায় গ্রামেই বাস করেন, জমীর চাষবাস দেখেন, আর বাড়ী বসিয়া দুই একখানা বই পড়েন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বধর্ম্মে আস্থা ছিল, কিন্তু আমরা বিদ্যালয়ে যে লেখাপড়া শিখি তাহাতে আমাদের নিজের শাস্ত্রে কিছু শিক্ষা পাই না। হেমচন্দ্রের সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পড়িতে বড়ই ইচ্ছা হইল।

এ বয়সে তিনি টোলে গিয়া শিক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যক্রমে শাস্ত্রশিক্ষার একটী সুযোগ ঘটিল। সনাতনবাটীতে সম্প্রতি রমাপ্রসাদ সরস্বতী নামে একজন বহু শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত আসিয়া বাস করিতেছেন, অনেক শিক্ষার্থী তাঁহার কাছে শাস্ত্র পাঠ করিতে যাইত, হেমচন্দ্রও পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে তাঁহার নিকট কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন, এবং সর্ব্বদা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন।

ক্রমে হেমচন্দ্রের সহিত রমাপ্রসাদের বড়ই সৌহৃদ্য জন্মিল। রমাপ্রসাদের বয়স ৪৫ বৎসর পার হইয়াছে, কিন্তু তিনি বহু বৎসরাবধি কাশীধামে বাস করিয়া অধ্যয়নাদি করিয়াছেন, এবং পশ্চিমদেশের অনেক তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার শরীর এখনও তেজঃপূর্ণ ও বলিষ্ঠ। তিনি মস্তকে জটা ধারণ করিতেন, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়াছিলেন, হরিদ্রাবসন পরিধান করিতেন, এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে শিক্ষা দান করিয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহার দেবীপ্রসাদ নামে পঞ্চদশ বৎসরের একটী সন্তান ছিল, সে পিতার সহিত পশ্চিমে অনেক ভ্রমণ করিয়াছে, পিতার ন্যায় তেজঃপূর্ণ ও উদারচেতা। সে এখন সনাতনবাটীর বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করে, এবং পিতার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। দেবীপ্রসাদ বালক সুবোধকে বড় ভালবাসিত, সর্ব্বদা আপন গৃহে লইয়া যাইত এবং তালপুকুরেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া সুবোধ ও সুশীলার সহিত খেলা করিত।

সুধা বিবাহের পর কয়েক বৎসর শরতের সঙ্গে কলিকাতায়ই বাস করিতেন, কখন কখন গ্রামে আসিতেন। শরচ্চন্দ্র একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেন, পরে একটী উপযুক্ত চাকরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। একবার ইচ্ছা হইল, বিলাতে যাইয়া বড় পরীক্ষা দিয়া ভাল চাকরী লইয়া আইসেন, কিন্তু শরতের সেরূপ আয় নাই যে বিলাতে যাইয়া কয়েক বৎসর থাকেন। শুনিলেন, দেশেও ভাল পরীক্ষা দিতে পারিলে "ষ্ট্যাটুটরি সিভিল সার্ভিস"-এ প্রবেশ করিয়া উচ্চকর্ম্ম পাওয়া যায়, সুতরাং সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান, উৎসাহী কৃতবিদ্য লোক পরীক্ষায় ব্যর্থপ্রযত্ন হইলেন না। যে বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, সেই বৎসরই তালপুকুর গ্রামে সুধার একটী পুত্রসন্তান হইল। সুধা এটী সুলক্ষণ মনে করিয়া বড় স্নেহে পুত্রের মুখ চুম্বন করিলেন। খোকার মাসী বড় যত্নে খোকার শুশ্রূষা করিতেন, এবং খোকার বাপ সহর্ষে পুত্রমুখ দেখিয়া চাকরীস্থান পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া গেলেন।

সেই অবধি দুই বৎসর শরচ্চন্দ্র বিদেশে বিদেশেই রহিলেন, দুই বৎসরের মধ্যে বাড়ী আসিতে পারেন নাই। স্বামীকে এত দিন ছাড়িয়া থাকা সুধার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল, গোপনে গোপনে চিঠি দিতেন, দিদির কাছে গিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেন, আবার পুত্রটীকে চুম্বন

করিয়া অশ্রু মুছিতেন। এবার শরৎবাবু কার্য্যস্থানে সুধাকে লইয়া যাইবেন; এক্ষণে দুই মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিতেছেন, আজ তাঁহার তালপুকুরে আসিবার কথা,—সেইজন্য সুধা এত প্রফুল্লহৃদয়া হইয়াছেন,—সেইজন্য স্বামিসোহাগিনী সযত্নে বেশভূষা করিতেছেন।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ ঠাকুরমার পরামর্শ

বিন্দু। বলি অ সুধা, সুধা, তোর কি আজ খোঁপা বাঁধা হবে না বোন? সন্ধ্যা হয়ে গেল এখনও কি তোর চুলবাঁধা শেষ হল না? এমন চুলবাঁধা ত বাপের জন্মেও দেখিনি!

সুধা। দেখ না দিদি, এই ঠাকুরঝিকে বললেম একরকম করে চুল বেঁধে দিতে, অ ঠাকুরঝি যে কি করছেন তার ঠিক নেই।

কালীতারা। হ্যাঁ লো হ্যাঁ, ঠাকুরঝিরই বড় সাধ, তোর মনে কিছু সাধ নেই, কেমন? লোকের ভাল করলে মন্দ হয়, না? তা এই নে বোন, এই খোঁপা বাঁধা শেষ হল, এখন রূপার ফুল দুটী দে দেখি, বসিয়ে দি।

সুধা। না ঠাকুরঝি, রূপার ফুলে কাজ নাই, ছেড়ে দাও, তোমার দুটী পায়ে ধরি।

কালী। আর নেকামিতে কাজ কি লো? এই নে ফুল দিয়ে দিয়েছি, এখন একবার তোয়ালেখানা দাও তো বিন্দুদিদি, সুধার মুখখানা ভাল করে মুছিয়ে দি!

কালীতারা ছাড়বার মেয়ে নয়। মুখখানি বেশ করে মুছাইয়া দিয়া, গলায় হার পরাইয়া দিয়া, হাতে দুখানি গয়না পরাইয়া দিয়া, একখানা কালাপেড়ে কাপড় পরাইয়া পরে আরশীখানি সুধার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,—এখন শরৎ বাড়ীতে এসে বলুক, মনের মত বৌ হয়েছে কি না?

লজ্জায় সুধা আরক্তমুখী হইয়া ছুটিয়া পলাইলেন, বিন্দু ও কালীতারা হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু সুধার আয়োজন এখনও শেষ হয় নাই। শুইবার ঘরে গিয়া একটি প্রদীপ জ্বালিলেন, হাসি-হাসি-মুখে বিছানা করিলেন, বিছানার ভিতর দুই একটী ফুলের মালা লুকাইয়া রাখিলেন, ডিবে ভরিয়া পান সাজিয়া রাখিলেন। কালীতারা ঘরে থাকতে রন্ধনকার্য্য আর কাহাকেও দেখিতে হইত না, তবে সুধা মিছরিপানা, ফল-মূল, মুগের ডাল ভিজান, প্রভৃতি যে সকল উপায়ে প্রথমে শরৎবাবুকে বশ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত আয়োজন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না।

রেকাবি করিয়া সমস্ত সাজাইতেছেন, এমন সময় সেই ঘরে ঠাকুরমাকে লইয়া বিন্দুদিদি প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরমা সুধাকে দেখিয়া বলিলেন, "বলি আজ বড় আয়োজন যে লো!" সুধা লজ্জায় হেঁটমুখী হইলেন।

ঠাকুরমার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিন্দু ও সুধার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না, গ্রামের কোন্ ঘরের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক তাহাও জানি না, তবে বৃদ্ধ বিধবাকে গ্রামের বৃদ্ধগণ আদর করিয়া মা বলিয়া ডাকিত, সুতরাং তিনি গ্রামের মধ্যবয়স্ক ও যুবক-যুবতীদিগের "ঠাকুরমা" হইতেন। বাল্যকাল হইতেই বিধবা, সুতরাং স্বামিঘর কখনও করেন নাই। মনটী সাদা, হৃদয় মমতাপূর্ণ, আর ছেলে দেখিলেই ঠাকুরমা কোলে লইতেন। সকল বাড়ীতেই তাঁহার যাতায়াত ছিল, সকল ঘরের ছেলেরা তাঁহাকে ভালবাসিত, সকল গৃহের গৃহিণীরা ঠাকুরমাকে বসাইয়া দুইটী গল্প করিতেন। তবে ঠাকুরমা একটু রসিকা ছিলেন, এবং কথাগুলি একটু অম্লমধু, নিতান্ত মিছরিমাখান নয়!

আজ অনেক দিন পর শরৎবাবু বাড়ী আসিবেন, শরৎবাবুকে ঠাকুরমা ছেলেবেলা বড় ভালবাসিতেন, তাই আজ একবার দেখিতে আসিয়াছেন। শরৎবাবুকে গ্রামের লোক একঘরে করেছে, কিন্তু ঠাকুরমা মায়া ও মমতা কাটাতে পারেন নাই।

হাসিতে হাসিতে ঠাকুরমা বলিলেন,—বলি আজ বড় আয়োজন যে লো! বিদেশে কি আর কারও স্বামী চাকরী করে না, না বিদেশ থেকে কেউ ফিরে আসে না! এত আয়োজন কিসের লো? বুড়ী ঠাকুরমা এসেছে তা কি একবার চেয়ে দেখ্‌তে নেই?

সুধা। না ঠাকুরমা, তুমি এসেছ জানতাম না। আয়োজন আর কি ঠাকুরমা, একটু জলখাবার তৈয়ার করে রাখছি। তা ঠাকুরমা, তুমি রেকাবিখানা সাজিয়ে দাও না।

ঠাকুরমা। দেখি দেখি, কি রেখেছিস। ইস্, এ যে পানফল, আক, মুগের ডাল, আর এ পাথরের গেলাসে বুঝি মিছরিপানা?

বিন্দু। হ্যাঁ গো ঠাকুরমা, শরৎবাবু মিছরিপানা বড় ভালবাসেন।

ঠাকুরমা। আর এ বাটীতে কি? ও মা, এ যে চিনির রসে রসবড়া রে! এ বুঝি তুই আপনার হাতে করেছিস? এ যে ভারি যত্ন লো। দেখিস বাছা, এত যত্নটত্ন করে যেন শরতের মাথাটি খাসনি।

বিন্দু। কেন ঠাকুরমা, শরতের মাথা খেতে যাবে কেন? অনেক দিন পর শরৎ বাড়ী আস্‌ছে, তা সুধা একটু যত্ন করবে না ত কে করবে?

ঠাকুরমা। তা করবে বৈ কি বাছা! সুধা ভাল মেয়ে, শরতের যত্নটত্ন করবে বৈ কি। তবে কি জানিস্‌, আজকাল যে রকম সময় পড়েছে, জেয়াদা যত্নটত্ন করলেই পুরুষমানুষ আবার মাথায় চড়ে। তা বুঝি জানিস্‌নি?

বিন্দু। না ঠাকুরমা, সে আবার কেমন, বল না ঠাকুরমা।

ঠাকুরমা। ওলো দেখবি, যখন আমার মত বয়স হবে দেখে শিখবি। আমি বাড়ী বাড়ী যাই, ঢের দেখিছি লো, তাই শিখিছি।

বিন্দু। তা আমাদের শিখাও না ঠাকুরমা, আমরা শুনি।

ঠাকুরমা। ওলো শুনবি ত শোন। ঐ যে তোরা বিয়ে বিয়ে পাগল হইস, ছেলের বিয়ে দাও, মেয়ের বিয়ে দাও বলে পাগল হইস্‌, আমি ত বলি ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় না ত, ছেলেমেয়ের নড়াই নাগে। এই যেমন রাজায় রাজায় নড়াই হয় না? সেই রকম নড়াই নাগে। নে, তোরা যে হেসে গড়িয়ে গেলি। বুড়ীর কথা শুনে যদি অমন করে হাসিস ত আমি এই চল্লাম।

বিন্দু। না ঠাকুরমা, আর হাস্‌ব না, বল, বল, বল, তোমার পায়ে ধরি।

ঠাকুরমা। বলছিলাম কি, বিয়ে নয় ত, ছেলেমেয়ের নড়াই নেগে যায়। যে যত আদায় করতে পারে, বুঝলি কি না, মেরে ধরে, বকে ঝকে, যে যত আদায় করতে পারে। ঐ আমাদের পাড়ার ঐ ঘোষালের পো আছে না? তার দুইটা ছেলে হয়েছে তা জানিস বাছা। তা ঘোষালদের বৌটী রোগা শরীর নিয়ে দুই ছেলে কাঁকে করে সমস্ত দিন খাটছে গো, সমস্ত দিন খাটছে, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, রাঁধা বাড়া, সমস্ত সংসারের কাজ করছে, তার উপর দুবেলা গাল খেতে খেতে প্রাণটা যায়। বাবুর যদি গরম দুধটুকু পেতে একটু দেরী হইল তা অমনি গালাগালি, সে ত এমন গালাগালি নয়, আমাদের কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। বৌটী নিতান্ত ভাল মানুষ, মুখে রক্ত উঠিয়ে বাবুর যত্ন করে, তবু ত উঠতে নাবতে গাল খায়। তাই বলি, অধিক ভাল মানুষ হওয়া কিছু নয়, একটু আদায় করতে শেখ।

বিন্দু। তা সব পুরুষ কি ঐ রকম ঠাকুরমা?

ঠাকুরমা। না, তা বলছিনি, তা বলছিনি, আবার সেও তেমনি আছে। ঐ যে বড়ালদের বৌটী কেমন পাকা মেয়ে। স্বামীকে ঠিক যেন ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। কর্ত্তাটী বৌয়ের কথায় উঠে, বৌয়ের কথায় বসে, মুখে কথাটী কহিবার যো নেই! তবু ত বড়ালের বৌয়ের বকুনি থামে না, সকাল থেকে পিট্‌ পিট্‌ করে বক্‌ছে, আর রাত দুই প্রহরের সময় সে বকুনি শেষ হয়! বাবুটী কলুর বলদের মত চোখ কাণ ঢাকিয়া মুখ বুজিয়া বৌয়ের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সারাদিন ঘুরছেন! সাবাস মেয়ে যা হউক! কেমন স্বামীকে বশ করেছে! কেমন কাজ আদায় করে নিচ্ছে! গহনা বল, কাপড় বল, টাকা বল, মানটুকু বল, কেমন আদায় করে নিচ্ছে! কোন কথায় কর্ত্তাটীর কি না বলিবার যো আছে?

বিন্দু। তা ওরকম কি আদায় করা ভাল? উহাতে কি সংসারে সুখ হয়। এই দেখ না জ্যেঠামহাশয়ের সংসার কি হইয়া গেল?

ঠাকুরমা। ঠিক বলেছিস বাছা, আহা ঠিক ধরেছিস! তারিণীবাবুর সোণার সংসার ছিল, উমার মাকে কখন একটা রেগে কথা কহিতে শুনিনি গো। তা তাকে ভাল মানুষ পেয়ে তোর জ্যেঠামশাই তাকে পায়ে ঠেল্‌লেন, দেখলি ত! আহা তাকে দগ্ধে মারলেন। এ নড়াই লো নড়াই—যে ভাল মানুষ তারই মরণ, যে শক্ত তারই জিত! আবার এখন কেমন নড়াই বেধেছে! সেই ত তারিণীবাবু,—পাড়ায় পাড়ায় ষাঁড়ের মত ফেরেন,—সকলকে শাসন করেন,—বাড়ীতে প্রভুত্ব করুন দেখি! কৈ এবারও ত ছেলে হইল না, আর একটী বৌ করুন দেখি! তার যো নেই, ছোট গৃহিণী তারে বাড়া শক্ত, নড়াইয়ে তারিণীবাবুকে হারাইয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া

লইয়াছে। বেশ করেছে! খুব করেছে! মেয়ের মত মেয়ে বটে! বেশ করেছে, আরও করবে। এ রকম মেয়ে না হইলে কি পুরুষ জব্দ হয়?

বিন্দু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তা গোপী জ্যেঠাই যা করলে, সে কি ভাল কাজ ঠাকুরমা? ও রকম কাজে কি সংসারে সুখ হয়?

ঠাকুরমা। ভাল আর কি? এই সংসারে রীতি, চিরকাল এই হয়ে আসছে! সুখ আবার কি? নড়াইতে সুখ হয়, না বিয়েতে সুখ হয়? যে যত কেড়ে নিতে পারে, মেরে ধরে বকে ঝকে যে যত আদায় করতে পারে। আমি ত সংসারে এই দেখি, তোরা বাছা লেখাপড়া শিখছিস, কি ভাবিস জানি না।

সুধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আচ্ছা ঠাকুরমা, দিদি ত হেমবাবুকে সেবাটেবা করে, আর হেমবাবুও দিদির যত্ন করে। কৈ দিদি ত আদায় করতে শেখে নাই।

ঠাকুরমা। ওলো, ওদের কথা বলিস কেন? হেমবাবুটী ত সন্ন্যাসী! আর বিন্দু চিরকালই একটু বোকাসোকা মেয়ে, ওদের কথা ছেড়ে দে। তা ওরকম বোকাসোকা ভাল মানুষ সংসারে কটা আছে? আমি ত দেখি সংসারে প্রায়ই নড়াই, যে ভাল মানুষ হয় তারই সর্ব্বনাশ। তা পুরুষের কি বল? তারা রোজকার করে, তাদের বিষয়সম্পত্তি আছে, তাদের আয় আছে, তারা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে, আর বৌগুলাকে দাসীর মত খাটাতে চায়। তা বৌগুলা যদি একটু ধারাল না হয়, একটু ঝাঁঝাল না হয়, তোর জ্যেঠাইয়ের মত শক্ত না হয়, তা হইলে কেবল খেটে খেটে তাদের প্রাণটা যাক? পুরুষের নাথি ঝেঁটা খেয়ে থাকুক? কেমন? তাই বলি বাছা, একটু ধারাল হবি, একটু ঝাঁঝাল হবি, একটু শক্ত হবি। তাহলে মানে মানে থাকবি, আদায় করতে শিখবি, কাপড়খানা, গহনাখানা, টাকা ও প্রভুত্বটা আদায় করবি। পুরুষকে ভয়ে ভয়ে রাখবি, পুরুষের গতর খাটিয়ে আদায় করে নিবি, তবে ত বলি মেয়ের মত মেয়ে। আদায় করতে শিখবিনি ত মেয়ে জন্ম নিয়ে এসেছিলি কেন?

বিন্দু। ঠাকুরমা, আদায় করতে গিয়ে যদি সব নোক্‌সান হয়?

ঠাকুরমা। যে রাঁধতে জানে তার হাতে কি বেন্নন খারাপ হয়?

বিন্দু। ঠাকুরমা, এই বয়সেই আমি কত নোক্‌সান দেখলাম! কত পরিবার ঝগড়াঝাঁটি করিয়া শ্মশানের মত হয়ে গিয়েছে। স্বামী কিংবা স্ত্রী একটু সহ্য করিলে সোণার সংসার থাকিত, কিন্তু সেইটুকু সহ্য না করিতে সংসার-সুখ গোল্লায় গিয়াছে। অধিক আদায় করিতে গিয়া সব নোক্‌সান হইয়াছে, ঠাকুরমা, শেষে যে আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিল সেই মাথায় হাত চাপড়াইয়াছে।

ঠাকুরমা। ও লো, সে রাঁদুনীর দোষ। বলি, ঐ যে এক একটা রাঁদুনী বেন্ননে জেয়াদা নুন দিয়ে ফেলে,—তাই বলে কি নুন না দিলে রান্না হয়? তুই ত একজন ভাল রাঁদুনী, কৈ নুন না দিয়ে কেবল মিছরি দিয়ে সব বেন্ননগুলো রাঁধ দেখি?

দশম পরিচ্ছেদ : প্রিয় সমাগম

রাত্রি প্রায় আটটার সময় শরচ্চন্দ্র বাটী আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহাকে দুই বৎসর পর দেখিবার জন্য আজ বাড়ী লোকে পূর্ণ। হেমচন্দ্র এতদিন পর ভ্রাতৃসম শরৎকে আলিঙ্গন করিয়া যথার্থই আনন্দ লাভ করিলেন। অন্যান্য বয়স্য বন্ধুগণও শরৎকে সানন্দে অভিবাদন করিলেন। গ্রামের বৃদ্ধগণ (যাঁহারা শরচ্চন্দ্রকে একঘরে করিতে অগ্রগামী ছিলেন), তাঁহারা উচ্চপদাভিষিক্ত বহুক্ষমতাশালী যুবককে "বাবাজি" "বাবাজি" বলিয়া বড়ই প্রীতি, স্নেহ ও যত্ন দেখাইলেন। শরৎ সকলকে সম্মানিত করিয়া মার ঘরে গেলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া স্নেহময়ী মাতাকে প্রণাম করিলেন। শুক্লকেশী শুভ্রবসনা বৃদ্ধা সজল নয়নে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনেকক্ষণ মাতার কাছে বসিয়া মাতার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরতের মাতা সংসার হইতে প্রায় অবসর লইয়াছেন, সংসারের কাজকর্ম্ম কিছু দেখেন না। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পূজা-আহ্নিক করেন, তৎপর কিছু জলগ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যার সময় আবার আহ্নিক করিয়া নিরামিষ ভোজনান্তর শয়নগৃহে প্রবেশ করেন।

শরৎকে সকলে যখন একঘরে করে, তখন শরতের মাতা হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব বলিলেন, “মা, কিছু ভাবিও না, ব্রাহ্মণ পূজারী তোমার বাড়ীতে আসে না আসে তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুমি যে নিয়মে পূজা-আহ্নিক কর, সেই নিয়মেই করিতে থাক, পূজারী ব্রাহ্মণের সাহায্য অনাবশ্যক। মনের সহিত ভগবানকে ডাকিলেই ভগবানের আরাধনা হয়, ভগবানের আরাধনায় মোক্তারনামা আবশ্যক হয় না।”

শরতের মাতা সেই পরামর্শই গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুণ্যবলে শরৎ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপযুক্ত কার্য্য পাইয়াছেন, আজ বিদেশ হইতে আসিয়া ভক্তিভাবে মাতার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন।

বিন্দু ও কালীতারা শরতের কাছে বসিয়া কত যত্ন করিলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্ভাষণ করিলেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মান অবগুণ্ঠনবতী সুধার ক্রোড় হইতে প্রিয় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিলেন,—আনন্দে সুধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাজপুরুষদিগের আহ্বানার্থ নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে বড় ধুম হয়। পুণ্যচরিত্র পুণ্যহৃদয় শরচ্চন্দ্রকে আহ্বান করিবার জন্য আজ সেই ক্ষুদ্র কুটীর যেরূপ স্নেহের লহরীতে ভাসিল, তদপেক্ষা প্রকৃত স্নেহ, প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত ভালবাসা এ জগতে দৃষ্ট হয় না।

শরৎ অনেকক্ষণ পর মুখ প্রক্ষালন করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী সুধা সযত্নে জলখাবার আনিয়া দিলেন। জল খাইয়া পুনরায় হেমচন্দ্রের সহিত বাহিরের ঘরে যাইয়া সমবেত বন্ধুদিগের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। গ্রামের সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তদিগকে আশু সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন, সাধারণের ব্যবহার্য্য পুষ্করিণী ও পথঘাট সংস্কারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন, পীড়িতদিগের ঔষধাদি দানের ব্যবস্থা করিলেন, দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যালয়ের মাহিয়ানা দিতে স্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধাদিগের কাহারও ছেলেদের পড়িবার পুস্তক চাই, কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধে কিছু সাহায্য চাই, কাহারও ঘরটী ছাইবার জন্য কিছু খড় চাই। শরৎ দুই বৎসর পর দেশে আসিয়াছেন, কাহাকেও বঞ্চিত করিলেন না, সকলকেই সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় আহার প্রস্তুত হইয়াছে। হেম ও শরৎ আহারে বসিলেন। বিন্দু তাঁহাদের কাছে বসিলেন, কালীতারা রন্ধনে অতুল্যা, তিনি ভাইকে মনের মত খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন।

পরে মেয়েদের খাওয়াদাওয়া হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হেম ও বিন্দু বিদায় হইলেন। বিন্দু বিদায় হইবার পূর্ব্বে শরতের হাত ধরিয়া তাঁহার শয়নঘর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া বলিলেন, “এখন তোমার ধন তুমি বুঝিয়া লও, আমরা চলিলাম!” ঘরে প্রবেশ করিয়া শরৎ দেখিলেন, শয্যায় শিশু নিদ্রিত রহিয়াছে, পার্শ্বে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, এবং শিশুর নিকটে পূর্ণযৌবনা, পতিপ্রাণা, লজ্জাবনতা সুধা রঞ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন!

এক মুহূর্ত্ত কাল সেই পুণ্য ছবিটী দেখিলেন,—প্রদীপের স্তিমিত আলোকে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব রত্নকে নিরীক্ষণ করিলেন,—ধীরে ধীরে সুধার পার্শ্বে আসিয়া সেই কোমল প্রেমবিহ্বল দেহলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই কম্পিত ওষ্ঠদ্বয়ে গাঢ় চুম্বন করিলেন।

সুধা চক্ষু মুদিত করিলেন, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কোমল বাহুলতা দ্বারা পতির গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন,—বহুদিনের হৃদয়ের ব্যথা ভুলিলেন। পতিপ্রাণা সুধার পূর্ণ হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল, নয়ন দুটী আনন্দবারিতে আপ্লুত হইল।

সাদরে সে জল মুছাইয়া দিয়া সে সুন্দর নয়নদ্বয়ে বারবার চুম্বন করিয়া শরচ্চন্দ্র বলিলেন, “সুধা,—আমি জগতের মধ্যে ভাগ্যবান যে তোমার মত রমণীরত্ন আমার হৃদয়াকাশে শোভা পাইতেছে, আমার জীবনাকাশে চিরকাল দীপ্ত রহিয়াছে। স্বদেশে, বিদেশে, সুখে, শোকে, সন্তাপে, তুমিই আমার নয়নমণি, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী।”

সুধা কিছু উত্তর দিতে পারিল না,—স্বামীর স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে আবার সজল নয়নে চাহিল, আবার স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া নয়নজল ত্যাগ করিল।

পতিপ্রাণা সুধার মনের কথা যদি বাক্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে সে বলিত, “পথের কাঙ্গালিনীকে কুড়াইয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছ,—দুঃখিনীর জন্য কত নিন্দা ও কষ্ট সহ্য

করিয়াছ,—হৃদয়েশ্বর! আমি কি তোমার রত্ন হইলাম? চিরজীবন তোমার দাসী হইয়া থাকিব, জন্মে জন্মে ঐ পুণ্যপদ সেবা করিব।"

একাদশ পরিচ্ছেদ : দাদামহাশয়ের পরামর্শ

ঠাকুরমা। কৈ লা সুধা, উঠেছিস্?

সুধা। উঠেছি ঠাকুরমা, এত সকালে যে?

ঠাকুরমা। এই সকালে একবার এলাম গো, শরৎকে দেখিতে। আর এই নে, কাল রাত্রিতে একখানা দৈ পেতেছিলাম, শরতের জন্য নিয়ে এলাম।

সুধা। একি ঠাকুরমা? এত যত্নটত্ন করলে পুরুষ মানুষ মাথায় চড়বে যে!

কালীতারা। ঠাকুরমার ঐ রকম ধারা। অন্য লোককে বলেন, আদায় করে নে, আদায় করে নে, আর আপনি পরের জন্য করে করে গতরখানি মাটি করিলেন। তাহা ঘোষালদের জন্য ঠাকুরমা যদি না করিত, ত সে বৌ কি বাঁচত, সংসারের অর্দ্ধেক কাজ ঠাকুরমা গিয়ে করে দিয়া আসে। ঐ বড়ালদের বাড়ীর কর্ত্তাটীর যখন ব্যারাম হইল, ঠাকুরমা ত পাঁচ সাত দিন ঘরে আসে নি, রোগীর কাছে বসেই ছিল। আহা উমার মার শেষ দশায় ঠাকুরমা না থাকলে কে করত, দিন নেই, রাত নেই, রোগীর যত্ন করিত। আর পাড়ার যত ছেলে ত ঠাকুরমাকে পেয়ে বসেছে, পাটালিগুড় আর দৈ কারও ঘরে কিনিতে হয় না।

ঠাকুরমা। না লো না,—তবে লোকের ব্যারামস্যারাম হলে করতে হয়। বলি সুধা, অ সুধা, কাল রাত্রিতে একটু মানটান করেছিলি লা? দুই একটা ঝাল ঝাল কথা শুনিয়ে দিয়েছিলি? এতদিন পর বিদেশ থেকে এল, একবার অভিমান করে বেঁকে বসেছিলি ত? পায়েটায়ে ধরাইয়াছিলি?

সুধা। না ঠাকুরমা, ভুলে গিয়েছিলাম।

ঠাকুরমা। ওমা! কোথাকার হাবা মেয়ে গা? বলি একটু মুখভারি করে দুই একখানা গহনা আদায় করলি নি? তোর জন্য দুই একখানা গহনা এনেছে?

সুধা। জানিনি ঠাকুরমা, জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম!

ঠাকুরমা। ও হরি! বলি তুই কি একেবারে কচি খুকি লো? এই রকম করে সংসার কর্‌বি? বলি এতদিন যে বিদেশে চাকরি কর্‌লে, টাকাগুলো কি কর্‌লে তার খোঁজ খবরও নিলিনি? তুই এমন ফুটফুটে বৌ, তোর নামে কোম্পানির কাগজ দুই একখানা করে দিক্ না? তা বলেছিলি?

সুধা হাসিতে হাসিতে পুনরায় বলিলেন,—বল্‌তে ভুলে গিয়াছিলাম ঠাকুরমা।

ঠাকুরমা। হয়েছে! নে বাছা, তোরা মিছরি দিয়ে বেন্নন রাঁধগে,—আমি তোর নূতন জ্যেঠাইমার বাড়ী একবার যাই। সে বাড়ীর বেন্ননে বেশ একটু নুন লঙ্কা পড়ে।

এইরূপ কথা হইতেছিল, এমন সময় শরৎবাবু সেই ঘরে আসিয়া পড়িলেন।
দেখিয়া একটী গড় করিয়া বলিলেন,—ঠাকুরমা, এত সকালেই এসেছ, আমি মনে
একবার তোমার বাড়ী আজই যাব।

ঠাকুরমা। না বাছা, তোরা যাবি কেন, আমিই এসে এসে দেখ্‌ব। কাল সন্ধ্যার সময়ই আমি এসেছিলাম, তোর আসতে রাত হইল দেখে চলে গেলাম। আহা বেঁচে থাক, আমার মাথার চুলের মত তোর বয়স হউক, ভগবান তোর মঙ্গল করুন। আহা তোর শাশুড়ী যদি আজ বেঁচে থাক্‌ত, সোণার চাঁদের মত দুটী জামাই দেখে তার চক্ষু জুড়াত।

ঠাকুরমা কাপড়ের খোঁট দিয়া চক্ষু মুছিলেন। ক্ষণেক পর একটু হাসিয়া বলিলেন,—তা বাছা, এতদিন পর এলি, কৈ বৌয়ের গহনা? ভালমানুষ বৌ বলে ফাঁকি দিলে ত হবে না, আমি এই বৌয়ের জন্য কোমর বেঁধে ঝগড়া কর্‌তে এসেছি।

শরৎ হাসিয়া বলিলেন,—বৌ আগে, না ঠাকুরমা আগে? এই বলিয়া ঠাকুরমার জন্য যে তসরের সাটী আনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন।

ঠাকুরমার চক্ষে আবার জল আসিল। বলিলেন,—এ সব কেন বাছা, আমাদের জন্য এ সব কেন? আমি বুড়োসুড়ো হয়েছি, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, আমার তসর গরদের কি

কাজ বল দেখি? তা ঠাকুরমাকে মনে করে এনেছিস্, বেঁচে থাক্ বাছা, বেঁচে থাক্। কিন্তু দেখ্ শরৎ, আর আমার জন্য এমন করে খরচপত্র করিস্‌নি।

শরৎ ঘরে আসতে সুধা ঘোমটা দিয়া কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন,—কাণে কাণে কালীতারাকে কি বলিলেন। কালীতারা হাসিয়া ঠাকুরমাকে বলিলেন,—বৌ বল্‌ছে ঠাকুরমা, তসরের কাপড়খানা নাও, আরও খুব আদায় করে নাও, না হলে পুরুষ মানুষ মাথায় চড়বে যে।

শরৎ হাসিয়া বলিলেন,—ঠাকুরমা বুঝি আদায় করিবার মন্ত্র শিখাইতেছিলেন! ঠাকুরমার মত সকলে যদি জগতের স্নেহ, ভালবাসা, মমতা, আদায় করিতে পারিত, তাহা হইলে জগৎ স্বর্গ হইত।

ঠাকুরমার পর গ্রামের দিদিমা শরৎকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন, তাহার পর জ্যেঠাইমা, খুড়ীমা, পিশীমা, মাসীমা, যত বৃদ্ধাগণ সকলে শরতের মুখচন্দ্র দেখিতে আসিলেন। সমাজের নিয়ম অনুসারে তাঁহারা শরৎ ও সুধাকে একঘরে করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের দেবতুল্য অনিন্দনীয় চরিত্র, তাহাদের অসীম পরোপকারিতা, তাহাদের দয়া, মায়া ও সৎকার্য্য কাহারও অবিদিত ছিল না। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাদের সাধুবাদ করিত, আবালবৃদ্ধবনিতা আজ তালপুকুর গ্রামের গৌরবস্বরূপ শরচ্চন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতে আসিল। শরৎও সকলকে প্রিয় সম্ভাষণে তুষ্ট করিলেন, বৃদ্ধদিগকে প্রণাম করিয়া বস্ত্রাদি দিলেন, বন্ধুদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষকদিগের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাতে এক একটী টাকা দিলেন। কৃষকপত্নীগণ সজল নয়নে ছেলে কোলে লইয়া বাবুকে সাধুবাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আহারাদির পর সমস্ত দিন শরচ্চন্দ্র গ্রাম পর্য্যটন করিয়া সকলের বাড়ী গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন, শত্রু মিত্র বিচার করিলেন না। অবশেষে বৈকালবেলা তারিণীবাবুর বাড়ীও গেলেন। তারিণীবাবু শরৎকে সমাদর করিলেন,—শরৎবাবু প্রস্থান করিলে তারিণীবাবুর গর্ব্বিণী গৃহিণী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিলেন,—তা চাকরি হয়েছে, যাক চাকরি করুক গিয়া। আমাদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া কেন? যার জাত নেই, কুল নেই, তার সঙ্গে মিশিলে আমাদের পুণ্যের সংসারে কলঙ্ক পড়বে যে!

সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে কিছু জলযোগ করিয়া শরচ্চন্দ্র "দাদামহাশয়ের" বাড়ীতে গেলেন। দাদামহাশয় গ্রামের মধ্যে বুড়ো, কিন্তু এখনও খুব শক্ত,—লাঠি ধরিয়া পাড়ায় পাড়ায় ফিরেন, সকল বাড়ীর খবর রাখেন, গ্রামের বয়স্কা গৃহিণীদিগকে কখন "মা" বলিয়া সম্বোধন করেন, কখন "বেটী" বলিয়া গালি দেন, এবং গ্রামের যুবতীদিগকে নাতিনী বলিয়া উপহাস করেন। যুবতীগণ ঘাট হইতে কলস লইয়া আসিবার সময় বুড়োকে দূর থেকে দেখিতে পাইলে ভয়ে পলায়,—"দাদামহাশয়ের" জ্বালায় গ্রাম অস্থির!

শরৎকে ছেলেবেলা হইতে দাদামহাশয় বড় ভালবাসিতেন। শরৎও দাদামহাশয়কে বড় সম্মান করিতেন, এবং গ্রামে আসিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যার সময় বাড়ীর বাহিরের রকের উপরে দাদামহাশয় একাকী বসিয়া আছেন, পূর্ব্বকালের কথা স্মরণ করিতেছেন, পূর্ব্বস্মৃতি রোমন্থন করিতেছেন। দাদামহাশয়ের মুখখানি রসিকের মুখ, নয়নের কণায় উপহাসের ভাব লুক্কাইত রহিয়াছে! দাদামহাশয়ের মনটী ভাল, কিন্তু মুখে কিছু আটকায় না!

শরৎকে দেখিয়া দাদামহাশয় প্রকৃত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—এস ভায়া এস,—অনেক দিন পর তোমাকে দেখিলাম! বলি ভাল আছ ত?

শরৎ। আপনার প্রসাদে ভালই আছি।

দাদা। তোমার মা ভাল আছেন? কালীতারা ভাল আছে? আর আমার সেই ফুটফুটে নাতবৌটী ভাল আছে? খোকা ভাল আছে?

শরৎ। আপনার আশীর্ব্বাদে সকলেই ভাল আছে।

দাদা। তা এতদিন পশ্চিম অঞ্চলে কেমন ছিলে? সে দেশের জলহাওয়া কেমন?

শরৎ। ভালই ছিলাম।। বিহারের জলহাওয়া ভাল। তবে এখন এই বর্দ্ধমানের মত মেলেরিয়া জ্বর সেখানেও হইতেছে। মেলেরিয়াতে দেশটা উচ্ছন্ন হইল।

দাদা। বল কি? আমরা ত চিরকালই জানি পশ্চিম প্রদেশ বড়ই ভাল, কাশী প্রয়াগ যেমন পুণ্যস্থান, সেইরূপ শরীরের পক্ষেও উত্তম স্থান।

শরৎ। শুনিয়াছি কাশী প্রয়াগ এবং দিল্লী আগ্রা পর্য্যন্ত মেলেরিয়া জ্বর বিস্তারিত হইয়াছে, পাঞ্জাব প্রদেশেও নাকি মেলেরিয়া হয়। আমি এই দুই বৎসর বিহারে ছিলাম, সেখানে ত অতিশয় মেলেরিয়া হয়। তবে ভাগ্যক্রমে আমার এ পর্য্যন্ত জ্বর হয় নাই।

এইরূপে দাদামহাশয়ের সহিত অনেকক্ষণ পশ্চিমদেশের কথা, চাকরির কথা, তালপুকুরের কথা ইত্যাদি নানা কথা হইতে লাগিল। দাদামহাশয় পূর্ব্বকালের চাকরির রহস্য-গল্প বলিলেন, পূর্ব্বকালের গৃহসংসারের রহস্য-গল্প বলিলেন; কেমন করিয়া সাহেবদের বশে রাখিতে হয় তাহা বলিলেন, কেমন করিয়া বৌকে বশে রাখিতে হয় তাহাও বলিলেন! সেই সমস্ত কথা কহিতে কহিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বলি এখন ছুটী লইয়া আসা হইয়াছে কি মনে করিয়া? নাতবৌকে নিয়ে যেতে চাও বুঝি? তা হবে না ভায়া, নাতবৌকে শীঘ্র ছাড়ব না!

শরৎ। তা আপনারা অনুমতি না দিলে কি প্রকারে পরিবার লইয়া যাই।

দাদা। তা অনুমতি দি কেমন করে? তোমরা সব কালেজের ছেলে, বৌকে মাথায় করে রাখবে, আপনারও চাকরিটী ঘুচাবে, বৌয়েরও মাথাটী খাবে!

শরৎ। সে কি দাদামহাশয়? বৌয়ের মাথা খাব কেন?

দাদা। তা নয় ত কি? তোমাদের বৌঠাকরুণরা নাকি কলুর মত ঘানিগাছের উপর বসিয়া থাকেন, আর তোমাদের চখে ঠুলি দিয়া ঘোরান! ভায়া! সেকালে ত এমন রীতিটী ছিল না, সেকালে অন্য রীতি ছিল।

শরৎ। কি রীতি দাদামহাশয়? বল না দুই একটা পুরাতন কথা শুনি, দুই একটা পুরাতন রীতি শিখিয়া লই!

দাদা। বলি সেকালে কি বৌদের পায়ের উপর পা দিয়া বসিবার উপায় ছিল? ঐ সকাল থেকে উঠে বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কুটনা কোটা, বাটনা বাটা, রাঁধা, বাড়া, পুরুষদের খাওয়ান, ছেলেদের খাওয়ান,—এসব কাজ হলে তবে বৌয়েরা মুখে জল দিতে পারিত! কাজ না কর্‌লে কি বৌ তৈয়ের হয়? সেকালের শাশুড়ীরা বৌ তৈয়ের কর্‌তে জানত। তোমরা ভায়া কালেজের ছেলে, তোমরা তার কি জান্‌বে বল?

শরৎ। শুনেছি নাকি সেকালে শাশুড়ীরা কখন কখন হাতা পুড়িয়ে ছেঁকা দিয়া বৌ তৈয়ের কর্‌ত!

দাদা। ওহে ভায়া, চাই, চাই, একটু শাসন চাই! তোমরা সব বগী গাড়ী হাঁকাও না? বলি গাড়ী হাঁকাইবার সময় ঘোড়ার রাস একটু টেনে রাখলে ঘোড়া যায় ভাল, কেমন? আর তা না হলে ঘোড়া মুখ থুবড়ে পড়ে যায়! দেখ ভায়া, তোমার যেমন রাস আলগা,—যেন নাতবৌটী শেষে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় না!

শরৎ। দাদামহাশয়! মেয়েমানুষ কি ঘোড়া? তারা কি আপনাদের কর্ত্তব্য জানে না? তাদের কি ঘোড়ার মত মুখে রাস দিয়া ফেরাইতে হয়?

দাদা। হাঁ হে ভায়া, কর্ত্তব্য সকলেই জানে, তবু মুখে রাসটা থাকলে কর্ত্তব্যটা হয় ভাল। এই তোমরা যে সরকারি চাকরি কর,—কেমন কড়া নিয়ম? কোম্পানি কই একটু আলগা দিক দেখি? সব বিশৃঙ্খলা হইয়া যাবে।

শরৎ। দাদামহাশয়, গভর্ণমেণ্ট আমাদের মাহিনা দিয়া চাকর রাখিয়াছে, চাকরের মত খাটাইয়া লয়। মেয়েমানুষে কি আমাদের মাহিনা-করা দাসী? কাজ ত সকলেরই করা উচিত, আমরা বাহিরের কাজ করি, তাহারা সংসারের কাজ করিবে। কিন্তু তাদের প্রতি দাসীর মত ব্যবহার করা উচিত?

দাদা। ঐ! কালেজের ছেলেদের বুলি ঐ! বলি ঘাড়ে জোয়াল দিলে যেমন কাজটী হয়, অমনি কি তেমন হয়? সংসারের রীতি এই,—ঘাড়ে জোয়াল দিবে, খুব শাসন করবে, তবে ষোল আনা কাজ আদায় হইবে।

শরৎ। আর যদি ঘাড়ে জোয়াল না দিয়া বার আনা কাজ পাওয়া যায়, আর তার সঙ্গে যদি একটু ভালবাসা পাওয়া যায়,—সেটা ভাল নয়?

দাদা। ঐ! কালেজের ছেলেদের বুলি ঐ! ওহে বাপু, জোয়াল না দিলে কাজও পাবে না, ভালবাসাও পাবে না! তা বুঝি জান না? বলি মেয়েমানুষদের ময়না পাখীর মত সোণার

দাঁড়ে বসাইয়া রাখিলে কি তাদের যত্ন পাওয়া যায়, না ভালবাসা পাওয়া যায়? তা নয়, তা নয়! চারি দিকে চেয়ে দেখ ভায়া,—যে বাড়ীর গৃহিণী পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকেন, তার কাজও কম, যত্নও কম, ভালবাসাও কম। আর যে বাড়ীর কর্ত্তা খুব শক্ত, খুব কড়া, খুব স্বার্থপর, কাজে একটু ত্রুটি হইলে শাসন করে, বৌকে খুব খাটিয়ে খাটিয়ে আপনার ষোল আনা বাবুগিরি বজায় রাখে,—দেখবে ভায়া, সেই বাড়ীর বৌয়েরই অধিক যত্ন, অধিক মায়া, সেই বাড়ীর কাজও ভাল হয়, সেই বাড়ীর রান্নাটাও ভাল হয়! পাকা আমের মত মেয়েমানুষের ভালবাসা গাছে ফলে না,—যে একটু শাসন করতে পারে, একটু কড়া হয়, একটু স্বার্থপর হয়, মেয়েমানুষের কেমন তার দিকেই জেয়াদা টান হয়,—মেয়েমানুষের মনের রীতি এই!

শরৎ হাসিতে হাসিতে বলিল,—দাদামহাশয়, এক দেশে এক রাজা ছিল, সে বলিত, মাংস যত পিষিবে, কট্‌লেট্‌ তত নরম হইবে,—মেয়েমানুষকে যত প্রহার করিবে, তার মনটী তত নরম হইবে! দাদামহাশয়েরও সেই মত নাকি?

দাদা। ওহে ভায়া, কট্‌লেট্‌ ত কখনও খাই নাই, কেমন করিয়া বলিব? তোমরা কালেজের ছেলে, তোমরাই বলিতে পার! তবে ময়দাটা পিষিলে লুচীটী বেশ নরম হয় না? গরম গরম আলুর দমের সঙ্গে মুখে দিলেই গলিয়া যায়! বলি নাতবৌয়ের রান্নার বড় হাতযশ আছে না?

শরৎ। কিছু কিছু রাঁধিতে জানে বৈ কি?—তাহার দিদির কাছে শিখিয়াছে।

দাদা। আহা, বেশ বেশ! আরও শিখাইবে, বেশ করে দুবেলা কাজ করাইবে, তবে ত বৌ তৈয়ের হইবে। বেশ একটু মিঠে কড়া মেজাজ রাখিলে বৌ ভয়ে থাকিবে, বেশ হুকুমহাকাম চালাইলে বৌ যত্ন করিতে শিখিবে। দেখিতে পাও না? যে বাড়ীর কর্ত্তার রাত্রিতে ঘুম হয় না, সে বাড়ীর বৌ পা টিপিতে শিখে! আর যে বাড়ীর কর্ত্তা পেটরোগা, সে বাড়ীর বৌ ভাল রান্না শিখে!

শরৎ। তা এ ত বড় মুস্কিল দাদামহাশয়! বৌকে পা টিপিতে শিখাইবার জন্য ঘুম বন্ধ করিব? না বৌকে রান্না শিখাইবার জন্য পেটরোগা হইতে হইবে?

দাদা। না কথায় কথায় বল্‌ছি,—পেটরোগা যে হইতে হইবে তা নয়, তবে একটু পিট্‌পিটে, একটু খিট্‌খিটে, একটু গরম মেজাজ হইলে বৌ থাকে ভাল, নৈলে মাথায় চড়িয়া বসে! দেখিতে পাও না? আমরা যে কুকুর বেড়াল পুষি, তাদের কেবল দুধ ভাত খাওয়াইয়া বিছানায় শুয়াইয়া রাখিলে কামড়াইতে আইসে। আর মধ্যে মধ্যে লাথি ঝেঁটা মারিলে কেমন পোষ মানে।

শরৎ। দাদামহাশয়, মেয়েমানুষকে যাহারা কুকুর বেড়ালের মত দেখে, তাহারা সেইরূপে পোষ মানায়। আর যাহারা মেয়েমানুষকে সম্মানের যোগ্য বলিয়া মনে করে, তাহারা অন্য অন্য রূপে পোষ মানায়।

দাদা। ঐ! কালেজের ছেলেদের বুলিই ঐ! ওরে সম্মান কিরে? সম্মানে কি কাজ পাওয়া যায়, না সম্মানে পেট ভরে? কাজ আদায় করা চাই, তবে ত সংসার চলে! বলি, ঐ ঘোষালের পো, যে ও পাড়ায় থাকে, তাহাকে তুমি জান?

শরৎ। জানি।

দাদা। ঘোষালের পো কেমন পাকা ছেলে! কেমন বৌকে তৈয়ের করিয়াছে! ঠিক যেন ময়না পাখী পড়িয়েছে, ঘোষালের পো যা হুকুম দিবে, বৌমা টুঁ শব্দ না করেই তাই কর্‌বে! বৌকে ত এমন তৈয়ের করেনি! মাঘ মাসের শীতে দেখিছি কাঁপতে কাঁপতে ৪টা রাত্রির সময় ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতেছে, আর চৈত্র মাসের ঠিক দুই প্রহরের রোদে দেখিয়াছি এক কোলে ছেলে, এক কোলে কলসী করিয়া পুকুরঘাটে দশ বার উঠানামা করিতেছে! স্বামীর নাওয়া-খাওয়া হইলে, ছেলেরা দুই প্রহরের বেলা ঘুমাইলে, তবে বৌমা স্নান করিতে পায়, মুখে একটু জল দিতে পায়! একে বলে হিন্দু বাড়ীর বৌ। ঘোষালের পো কেমন বৌ তৈয়ের করেছে? মুখ ফুটে বৌমা একটী কথা কহিতে পারে?

শরৎ। দাদামহাশয়, বৌকে ঐ প্রকারে তৈয়ার করা কি ভাল? তাহাতে কি স্ত্রী সুখে থাকে, না স্বামী সুখে থাকে?

দাদা। মেয়েমানুষের আবার সুখ কি? পুরুষের লাথি ঝেঁটা খেলেই তার সুখ। আর এমন করে বৌটীকে তৈয়ার করিলে পুরুষের কেমন সুখটুকু হয় বল দেখি ভায়া? ঘোষালের

পো ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে গরম দুধটুকু প্রস্তুত,—বেড়াইয়া না আসিতে আসিতে বৌমা পা ধুইবার জল লইয়া হাজির, স্নান না হইতে হইতে গরম ভাত প্রস্তুত! একটু এদিক ওদিক হউক দেখি, একটা ব্যঞ্জন খারাপ হউক দেখি, আঁচাইবার পর পান আনিতে একটু দেরি হউক দেখি, আহারের পর বিছানা প্রস্তুত হইতে একটু বিলম্ব হউক দেখি,—বৌমা সেদিন সমস্ত দিন চৌদ্দপুরুষের প্রশংসা শুনিবেন, তাঁহার সেদিন ভাত খাইতে হইবে না! সেদিন বৌমার নাকি শরীরটা খারাপ ছিল, রাঁধিতে একটু দেরি হয়েছিল,—ঘোষালের পো গলা সাড়া দিয়া বলিলেন,—বৌয়ের যদি বাড়ীর কাজ একলা করিতে এতই কষ্ট হয়, তা হইলে আর একটী বৌ আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে! কথাটা শুনে বৌমা নাকি আছাড় খেয়ে কেঁদেছিল, তার পরদিন ৪টা রাত্রির সময় রান্না চড়িয়ে দিয়েছিল! জান্‌লে ভায়া, এই রকম করিয়া বৌ তৈয়ার করে। আমাদের হিন্দু ঘরের রীতি এই,—তোমরা কালেজের ছেলে,—এ সব রীতি কি জানিবে।

শরৎ। তা দাদামহাশয়, ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রী দুই ছেলেকে লইয়া এরূপ স্বামীর কাজ করিয়া উঠিতে পারেন?

দাদা। পারাপারি আবার কি? কাজ করিতেই হবে। শুনেছি নাকি বৌমা ইদানীং বড় কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। পুকুর থেকে জল তুলিতে সেদিন আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল, সিঁড়ি উঠিতে হাঁপায়, একদিন নাকি রাঁধিতে রাঁধিতে মূর্চ্ছা গিয়াছিল। তবু ত কাজ বন্ধ হইবার যো নাই,—ঘোষালের পো নাকি বলেছে, এক বৌ মরিলে আর এক বৌ হবে,—কিন্তু ঠিক সময়ে গরম দুধটুকু বন্ধ হবে না। শুনেছি নাকি এ বৌটা বড় অধিক দিন টিকিবে না, ঘোষালের পো গোপনে নাকি এদিক ওদিক ঘটকী পাঠাইতেছে! ঘোষালের পো পাকা ছেলে, যদি এ বৌটী মরে, ছয় মাসের মধ্যে আবার নূতন বৌটী তৈয়ারী করিয়া লইবে।

শরৎ দাদামহাশয়ের সঙ্গে একটু মিষ্টালাপ করিতে আসিয়াছিলেন,—শোক করিতে আইসেন নাই। কিন্তু ঘোষালপত্নীর কথা শুনিয়া গোপনে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুজল মোচন করিলেন। সে মেয়েটীকে বাল্যকাল হইতে জানিতেন, ছেলেবেলা একত্র খেলা করিয়াছেন, তাহার বিবাহ হওয়া দেখিয়াছেন, ক্রমে তাহার দুইটী সন্তান হওয়ার কথা শুনিয়াছেন। তাহার পর শরৎ বিদেশে ছিলেন, অন্য কথা বিশেষ শুনিতে পান নাই। দুই বৎসর পর গ্রামে আসিয়া এ সমস্ত কথা শুনিয়া শরতের মনে অতিশয় ব্যথা লাগিল, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—দাদামহাশয়, নারীর অসম্মান করা ও নারীকে যাতনা দেওয়া হিন্দু-ধর্ম্মও নহে, হিন্দু-আচারও নহে। আজকালকার স্বার্থপর লোকে স্বার্থপরতা অবলম্বন করিতে চাহিলে হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দেয়,—প্রবঞ্চকেরা প্রবঞ্চনা করিতে চাহিলে দেশীয় আচারের দোহাই দেয়,—হৃদয়শূন্য লোকে স্ত্রী-পরিবারের প্রতি নৃশংস আচরণ করিয়া আর্য্য-রীতির দোহাই দেয়! দাদামহাশয়, যাহারা স্বার্থসাধনের জন্য দেশীয় আচারের দোহাই দেয়, বিলাসপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দেয়, এবং আত্ম-সুখের জন্য ক্ষীণ, দুর্ব্বল, বহুশ্রমক্লিষ্টা বহুদুঃখভাগিনী নারীর প্রতি নির্দ্দয় হয়,—তাহারা আর্য্যও নহে, হিন্দুও নহে, তাহাদের স্পর্শ করিলে ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুদিগের জাত যায়। স্বার্থপরতা, প্রবঞ্চনা ও নির্দ্দয়তা হিন্দু-আচার নহে,—প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম উদার, ও মহৎ ও নিঃস্বার্থ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : সনাতনবাটীর জমিদার-বংশ

তালপুকুরের অনতিদূরে সনাতনবাটী নামে একটী বড় গ্রাম ছিল। তথায় এককালে সহস্র ঘর লোকের বাস ছিল, কিন্তু বর্দ্ধমানের মেলেরিয়া জ্বরে গ্রাম উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। এখনও তথায় পাঁচ-ছয়শত লোকের বাস আছে, তাহার মধ্যে প্রায় একশত ঘর ভদ্রলোক, কয়েক ঘর কলু, ময়রা, কামার, কুমার, তাঁতি প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক, আর অবশিষ্ট চাষী প্রজা। প্রত্যহ প্রাতঃকালে গ্রামে বাজার বসিত, এবং চারিদিক হইতে মাছ, তরিতরকারি বিক্রয় হইতে আসিত। তদ্ভিন্ন কয়েকখানি স্থায়ী দোকান ছিল। একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০।৮০ জন ছেলে পড়িত, তাহা ভিন্ন বড় পাঠশালায় ব্যবসায়ী ও ইতর লোকদিগের প্রায় একশত ছেলে পড়িত।

সনাতনবাটীর জমিদার মুখোপাধ্যায়-বংশ পুরাতন ঘর, পাঁচ-ছয় পুরুষ হইতে তাঁহাদের জমিদারী, এবং বংশটীও বিপুল হইয়াছে। প্রাচীন জমিদার-বংশে যেমন হইয়া থাকে, সরিকে

সরিকে অনেক মামলা-মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও চলিতেছে। কোন কোন অংশীদিগের মধ্যে কেহ কেহ একেবারে নিঃস্বত্ব হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া বর্দ্ধমান বা কলিকাতায় চাকরি লইয়াছেন। কোন কোন সরিক দরিদ্র হইয়াও কোনপ্রকারে সাবেক ভদ্রাসনে এখনও জমিদার নামটা বজায় রাখিয়াছেন। আবার কোন কোন তরফ এখনও বেশ সঙ্গতিপন্ন আছেন, আয় যথেষ্ট আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মামলা-মকদ্দমাও চলিতেছে।

বংশের যেরূপ অবস্থা, পুরাতন বাড়ীরও সেইরূপ অবস্থা। প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে অতি প্রাচীন ইমারত, কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কোথাও নূতন মেরামত করা হইয়াছে। প্রাচীন সিংহদ্বার এখন সিংহশূন্য, প্রাচীন উদ্যান এখন জঙ্গল, প্রাচীন খিড়কির পুষ্করিণী সরিকী, অতএব পানায় পরিপূর্ণ।

এজমালির বাড়ীতে কেহ বড় টাকা খরচ করিয়া সংস্কার করে না, কিন্তু সঙ্গতিপন্ন অংশিগণ স্থানে স্থানে নূতন দালান তুলিয়াছেন, যাহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ গৃহসংস্কার বা নূতন প্রস্তুত করিয়াছেন। কোন গৃহ অতি সামান্য, আবার সঙ্গতিপন্ন কোন অংশীর নব্য গৃহ প্রাসাদতুল্য শোভা পাইতেছে।

এইরূপে সনাতনবাটীর জমিদার-আবাস অনেক পুরুষের সৃষ্ট, অনেক ধাঁচায় নির্ম্মিত, অনেক অবস্থায় পরিণত। কিন্তু তথাপি সেই বিস্তীর্ণ আবাসস্থান, সনাতনবাটীর জমিদার-ঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ; এবং সেই বিস্তীর্ণ আবাসের বাসিগণ, কি ধনী, কি দরিদ্র, সনাতনবাটীর জমিদার-বংশীয় বলিয়া মর্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। ছেলেপুলে লইয়া প্রায় শতাধিক লোক সেই বিস্তীর্ণ জমিদার-বাড়ীতে বাস করিতেন, কেহ বা পুরাতন এজমালী বাড়ীর ভগ্ন ঘরে, কেহ নূতন-নির্ম্মিত প্রাসাদে। কেহ বা রাজার তুল্য আয় ভোগ করিতেন, কেহ বা প্রজার উপর উৎপাত করিয়া চালের কুমড়োটী কাড়িয়া আনিলে তবে গৃহিণী ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন। কোন গৃহিণী নিজ হাতে খিড়কির পানা পুষ্করিণীতে বাসন মাজিতেন, আর কেহ সুন্দর বাহুলতায় হীরকখচিত বলয় ও কঙ্কণ ধারণ করিয়া কর্ত্তার মন আকর্ষণ করিতেন। সকলেরই দেশে-বিদেশে সনাতনবাটীর জমিদার-বংশীয় বলিয়া মানসম্ভ্রম আছে।

এই বহুজ্ঞাতিপূর্ণ বাড়ীর মধ্যে কামিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ই আজ প্রধান বলিতে হইবে। তাঁহার পিতা বড় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, ছলে, বলে বা কৌশলে, ভয় দেখাইয়া, ঠকাইয়া, বা অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া, অনেক ক্ষুদ্র অংশ নিজ হস্তগত করিলেন, ও অবশেষে সমস্ত জমিদারির চারি আনা অংশের মালিক হইলেন। কামিনীকান্তবাবু নিজ বুদ্ধি ও প্রভাব বলে আর তিন আনা বাড়াইলেন, সুতরাং তাঁহাকে সাত আনির জমিদার বলিত। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন,—লেখাপড়া ধনাঢ্য জমিদারদের যেরূপ হয় সেইরূপই হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাবুগিরি শিখিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কামিনীকান্তবাবু নিজের অংশের অট্টালিকা ভাল করিয়া সাজাইলেন, ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, পাখা, মর্ম্মরপ্রস্তরের টেবিল, সোফা, চৌকি, কার্পেট প্রভৃতি নানা উপকরণদ্রব্য নব্য জমিদারের ঘর আলো করিল। সম্মুখে একটী বাগান করিলেন, মধ্যে পুষ্করিণী, চারিদিকে মর্ম্মরপ্রস্তরের মূর্ত্তি। বাগানে একটী নাচঘর নির্ম্মাণ করিলেন, তাহাতে কখন কখন সাহেবদের খানা দিতেন, কখন বা কলিকাতা হইতে বাই আনিয়া বাই-নাচ দিতেন। কলিকাতায় তাঁহার সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল, এবং কলিকাতার সুসভ্য বন্ধুগণও কখন কখন তাঁহার ইন্দ্রপুরীতে আসিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেন।

কামিনীকান্তবাবুর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। প্রজাগণ তাঁহার নাম শুনিলে কাঁপে, ক্ষুদ্র অংশিগণ তাঁহার অত্যাচার বহন করেন, দরিদ্রা অংশিনীগণ তাঁহার দ্বারা অবমানিতা হইলে ঘরে গিয়া কাঁদেন, জমিদার-বাড়ীর ছেলেপুলেরা তাঁহাকে দেখিলে পলায়। সাহেবসুবাদের নিকট তাঁহার যথেষ্ট নাম, পুলিশ তাঁহাকে ভয় করে, তাঁহার বাড়ীতে একটা ঘটনা হইলে শীঘ্র ঘেঁসে না। গ্রামের বুড়ো লোকে বলিত, অনেক বৎসর পূর্ব্বে একটা হাঙ্গামা হইয়া জমিদারের বংশেরই একটা ছেলে খুন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু লাশও পাওয়া গেল না, পুলিশ কোন কিনারাও করিতে পারিল না। আখ্যায়িকা বিবৃত-সময়ে কামিনীকান্তবাবুর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স, কিন্তু এখনও যৌবনের তেজ ও প্রতাপ কমে নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : জটাধারী

একদিন সন্ধ্যার সময় কামিনীকান্তবাবু একাকী উদ্যানে পাইচালি করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা একজন দীর্ঘকায় জটাধারী সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জটাধারী কামিনীবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, পরে জমিদারের প্রাসাদ, উদ্যান, নাচঘর প্রভৃতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কামিনীবাবু। আপনি কে?

রমাপ্রসাদ। আমি বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ। কাশীধামে ও অন্যান্য স্থানে বহু বৎসরাবধি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছি, অধুনা এই পুত্রটীকে লইয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইয়াছি। নাম—রমাপ্রসাদ সরস্বতী।

কামিনীবাবু। এ গ্রামে কবে আসা হইল? এখানে কি উদ্দেশ্য?

রমাপ্রসাদ। এ গ্রামে অদ্যই আসিয়াছি, সনাতনবাটীতে কিছুদিন থাকিয়া শিষ্যদিগকে শাস্ত্রাদি পাঠ করাইব, আপাততঃ এই উদ্দেশ্য। শুনিলাম এই বিস্তীর্ণ জমিদার-গৃহে অনেক অতিথি আশ্রয় লাভ করে, অতএব আপনার যদি অনুমতি হয়, আমিও একটা ভগ্ন ঘরে আশ্রয় লইয়া কিছুদিন বিশ্রাম করি।

কামিনীবাবু। আপনার এ প্রস্তাবে আমি সম্মানিত হইলাম। শাস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে আশ্রয়দান করা ও সমাদর করা আমাদের বংশের রীতি।

রমাপ্রসাদ। আপনার স্বর্গীয় পিতা শাস্ত্রজ্ঞদিগের বিশেষ সমাদর করিতেন।

কামিনীবাবু। আপনি আমার স্বর্গীয় পিতাকে জানিতেন?

রমাপ্রসাদ। তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া সদাব্রত করিতেন, কাশীধামেও সে ক্রিয়াবান জমিদারের নাম অনবগত ছিল না।

কামিনীবাবু। আপনার কথায় বড় আনন্দ লাভ করিলাম। আপনি যখন এ গ্রামে আসিয়াছেন, ভরসা করি কিছুদিন অবস্থান করিয়া এ গৃহ পবিত্র করিবেন।

রমাপ্রসাদ। অবস্থান করিবার মানসেই আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ।

কামিনীবাবু। ইচ্ছামত ঘর বাছিয়া লউন, সপুত্র অবস্থান করুন, তাহাতে আমি অনুগৃহীত হইব। আমার একজন ভৃত্য আপনার আবশ্যকীয় যোগাইবে।

রমাপ্রসাদ ও তাঁহার পুত্র দেবীপ্রসাদ সেই বিস্তীর্ণ অট্টালিকার নীচের একটী ভগ্ন ঘরে আশ্রয় লইলেন। সন্ধ্যার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ভূমিতে কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতে জমিদার-বাড়ীর সকলে শুনিল, পশ্চিমদেশ হইতে একজন বড় সাধু আসিয়াছে। বাবুগণ একে একে আসিয়া সাধুর সহিত দু'-চারটী কথা কহিলেন, মেয়েরা খিড়কীর পুকুর থেকে আসিবার সময় কলস কাঁকে করিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া জটাধারীকে দেখিয়া গেল, ছেলেগুলা উঁকিঝুঁকি মারিয়া পলাইয়া গেল। দুই একদিন পর আর কেহ বড় দেখিতে আসিত না, মেয়েরা বলাবলি করিত,—"ও সাধুও নয়, সন্ন্যাসীও নয় লো, ও হাত দেখিতে জানে না। কেবল পশ্চিমে একটা পণ্ডিত, একটা টোল খুলবে বুঝি, তাই এসেছে। দিন-রাতই পুঁথি পড়ে, আর ছেলেটাকে পুঁথি পড়ায়। আহা, ছেলেটী যেন সোণার চাঁদ।"

জমিদার-বংশের মধ্যে যোগমায়া নামে একজন বয়স্কা বিধবা ছিলেন, তিনি পণ্ডিত ঠাকুরকে জলটল আনিয়া দিতেন, একটু সেবাশুশ্রূষাও করিতেন। যোগমায়ার ছেলেবেলায় বড় ঘটায় এই জমিদার-ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, কেননা তাঁহার শ্বশুর এই জমিদারির একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন। কিন্তু শুনা যায়, তাঁহার বিবাহের পরই শ্বশুরের মৃত্যু হয়, হতভাগিনীর স্বামীও অচিরে মারা যায়,—অনাথা বিধবার যথাসর্ব্বস্ব অন্য অংশীদারগণ দখল করিয়া লইলেন! সেই অবধি বিধবা বিস্তীর্ণ শ্বশুরকুলে অন্যতমা দাসীর ন্যায় শোকে-দুঃখে বাস করিতেন। দুবেলা দুপেট খাইতে পাইতেন, চুপ করিয়া পরের গঞ্জনা শুনিতেন, যে যখন বলিত, তখনই তাহার জল আনিয়া, বাসন মাজিয়া, ঘর ঝাঁট দিয়া দিতেন। বৈধব্য দশায় ত্রিংশৎ বৎসর এইরূপে কাটাইয়াছেন,—শরীরখানি শীর্ণ, কিন্তু সুন্দর মুখশ্রী এখনও অপনীত হয় নাই, চক্ষু দুটী কোমল ও শান্ত, বাহুলতা ক্ষীণ হইলেও এখনও লাবণ্যশূন্য নহে, সমস্ত

অবয়বে এখনও ভদ্রবংশোচিত মাধুর্য্য বিরাজ করিতেছে। ত্রিংশৎ বৎসর কষ্টে কাটাইয়াছেন, আর কয়েক বৎসর এইরূপে কাটাইয়া সংসারদুঃখ হইতে মুক্তি পাইবেন, মনে মনে এই আশা করিতেন, এবং ভগবানের নাম লইতেন।

যেদিন সন্ধ্যার সময় সরস্বতী ঠাকুর সেই জমিদার-গৃহে আশ্রয় লইলেন, সেই দিনই যোগমায়া ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের সদয়, শান্ত, উন্নত মূর্ত্তি দেখিয়া,—বালক দেবীপ্রসাদের উজ্জ্বল, প্রশান্ত, তেজঃপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া,—বিধবার হৃদয়ে মায়ার উদয় হইল। যোগমায়া ঠাকুরের ঘরটী ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন, জল আনিয়া দিলেন, আবশ্যকীয় সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই ক্ষীণকায়া দুঃখিনীর দিকে দেখিলেন, চক্ষুর একবিন্দু জল মুছিলেন, শেষে বলিলেন, "ভদ্রে! তোমার মনটী দরিদ্রের প্রতি সদয়, তুমি আমার অনেক সেবা করিলে, ভগবান তোমার উপকার করিবেন। জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছ, কিন্তু তোমার কষ্ট অবসান হইয়া আসিয়াছে, শীঘ্র দুঃখ-নিশি প্রভাত হইবে।"

সেই অবধি যোগমায়াই সরস্বতী ঠাকুরের শুশ্রূষা করিতেন, সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন। ঠাকুর নিজেই পাক করিতেন,—রাত্রিতে পিতাপুত্র কম্বল পাতিয়া শুইতেন, অন্য বিছানা ব্যবহার করিতেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : শাস্ত্রপ্রচার

অল্পদিনের মধ্যে সনাতনবাটী ও চতুর্দ্দিকস্থ অনেক গ্রামে রমাপ্রসাদ সরস্বতীর নাম প্রকাশ হইল। তিনি যোগী সন্ন্যাসী নহেন, হাত দেখেন না, যাদু করেন না, কিন্তু তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা, শাস্ত্রপ্রচারে আনন্দনীয় উৎসাহ, শাস্ত্রব্যাখ্যায় অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা গ্রামে গ্রামে প্রকাশ পাইল। প্রাতঃকালে স্নান করিবার সময় উন্নতস্বরে তিনি যখন বেদগান গাইতেন, নারীগণ কলস নামাইয়া তাঁহাকে কোন দেবের অবতার বলিয়া প্রণাম করিয়া যাইত। মধ্যাহ্নে বৃক্ষতলে শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া যখন উপনিষদের অনন্ত চিন্তা ও অনন্ত ভাবের ব্যাখ্যা করিতেন, বিদ্যালয়ের বালকগণ নিজ নিজ পাঠ ছাড়িয়া তাঁহার কথা শুনিতে আসিত। আর সন্ধ্যার সময় নিজ ভগ্ন আবাসে যখন মহাভারতের বা রামায়ণের বা পুরাণের শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যানগুলি বলিতেন, গ্রামের বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত ও মুমূর্ষুগণও সেই অমৃতধারা পান করিয়া জীবনের পাপস্খালন করিত, জীবনের সায়ংকাল পবিত্র করিত!

চারিদিকের গ্রামের লোকে যেদিন অবসর পাইত, ঠাকুরের অমৃতকথা শুনিতে আসিত। হেমচন্দ্র প্রায়ই সন্ধ্যার সময় তালপুকুর হইতে আসিতেন, অবশেষে শরৎ বাটী আসিলে তাঁহাকেও একদিন সন্ধ্যার সময় সনাতনবাটীতে লইয়া আসিলেন।

সরস্বতী ঠাকুর নিজ আবাসের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে কম্বল বিছাইয়া বসিয়াছেন,—তাঁহার চারিদিকে তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ও বন্ধুগণ বসিয়া শাস্ত্রকথা শুনিতেছেন। প্রথমে দুই একটী বেদগান গাইলেন, শিষ্যগণ যাহারা যাহারা গাইতে জানিত, গুরুর সহিত তারস্বরে সেই অনন্তগীত গাইয়া নৈশ আকাশ সঙ্গীতে পূর্ণ করিল। গ্রামের গৃহে গৃহে সে শব্দ প্রবেশ করিল, মাতার ক্রোড়ে সুপ্ত বালক সে সঙ্গীত শুনিয়া নিদ্রাবেশে হাসিল।

তাহার পর উপনিষদ ব্যাখ্যা। উপনিষদের গভীর অর্থ কাশীধামে যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন, উপনিষদের উপাস্য পরব্রহ্মের স্বরূপ ও তত্ত্ব যেরূপ জানিয়াছিলেন, উপনিষদের সারগর্ভ আখ্যানগুলির সরল অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সত্যকাম উপাখ্যানের অর্থ, নচিকেতা উপাখ্যানের অর্থ, মৈত্রেয়ী উপাখ্যানের অর্থ,—ইত্যাদি নানারূপ উপাখ্যান-কথায় প্রায় এক প্রহরকাল অতীবাহিত হইল। শ্রোতৃবর্গ নিস্তব্ধ হইয়া সে অমৃতকথা শুনিতে লাগিল, সে অমৃতকথা সকলের হৃদয় ধর্ম্মজ্ঞান ও পবিত্রভাবে প্লাবিত করিল।

তাহার পর সকলে একত্রিত হইয়া বেদের বিশ্বকর্ম্মা, উপনিষদের পরব্রহ্মকে স্তুতিবাদ করিলেন। স্তুতিবাদ সাঙ্গ হইল, বন্ধু বন্ধুকে, গুরু শিষ্যকে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শরচ্চন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্যশূন্য হইয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে উঠিয়া রমাপ্রসাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—গুরুদেব! আপনি আজ আমাকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহা পিতৃগৃহে শিখি নাই, বিদ্যালয়ে শিখি নাই, কার্য্য-ক্ষেত্রে শিখি নাই! আমাদের এরূপ শাস্ত্র-কথা, নীতি-কথা থাকিতে আমরা বিদেশীয়দিগের নিকট শাস্ত্রের কাঙ্গালী হই! গুরুদেব! সাহসে দণ্ডায়মান হউন, উৎসাহে অগ্রসর হউন, কুরীতি ও অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত করিয়া আমাদের সনাতন ধর্ম্ম প্রকাশ করুন, সনাতন শাস্ত্র প্রকাশ করুন, সনাতন নীতি শিক্ষাদান করুন! পুরুষসিংহ! আপনার এ উদ্যম সার্থক হইবে, মুমূর্ষু কুপ্রথা-পীড়িত জাতি আপনার সঞ্জীবনী কথায় জীবন পাইয়া পুনরুত্থান করিবে।

যুবকের উৎসাহ দেখিয়া সরস্বতী ঠাকুরের চক্ষুতে জল আসিল। তিনি শরৎকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—শরৎ! তুমি আমাকে চেন না,—আমি তোমাকে চিনি। তোমার কার্য্যকলাপ আমি জানি, তোমার উৎসাহ ও উদ্যম আমি জানি! তোমাদের ন্যায় লোক থাকিলে আমাদের স্বদেশের মঙ্গল। তৎপর সরস্বতী ঠাকুর হেম ও শরৎকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন।

ঠাকুরের ভগ্ন ঘরটী যোগমায়া পরিষ্কার করিতেছিলেন,—বাহিরের দুইজন লোক দেখিয়া যোগমায়া সরিয়া গেলেন। সরস্বতী ঠাকুর বলিলেন,—ভদ্রে যোগমায়া, সরিয়া যাইবার আবশ্যক নাই। হেমবাবু ও শরৎবাবু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাস্বরূপ,—অল্পদিন মধ্যে তুমিও ইঁহাদিগকে চিনিবে। আজ উঁহারা আমার এইখানেই কিঞ্চিৎ আহার করিবেন, তিনটী পাত পাড়। যোগমায়া সেইরূপই করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : শাস্ত্রশিক্ষা

শরৎ। আজ আপনার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া আমার হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল। এই নূতন শিক্ষা কবে এদেশে প্রচলিত হইবে?

সরস্বতী। শরচ্চন্দ্র! এ শিক্ষা নূতন নহে, আমাদের শাস্ত্র যত দিনকার, বেদ যত দিনকার, এ শিক্ষা তত দিনের। তবে আধুনিক কালে জনসাধারণের অজ্ঞানতাবশতঃ তাহারা এ পবিত্র প্রথা হারাইয়াছে, ভ্রান্ত হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তুমি যদি বারাণসী নগরে কখনও যাও, বিশ্বেশ্বর মন্দিরে যাইও, দেখিবে তথায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এখনও বেদপাঠ করেন, সে পবিত্র গীত শুনিলে পাপমোচন হয়, সুকৃতি লাভ হয়।

শরৎ। আমি কাশীতে কখনও যাই নাই, কিন্তু শুনিয়াছি তথায় এখনও বেদ-বেদাঙ্গের চর্চ্চা আছে। কিন্তু সে কয়জনের মধ্যে? প্রকৃত শাস্ত্রকথা আমাদের দেশে কয়জন জানে?

সরস্বতী। অতি অল্পই বটে। এবং সেই জন্যই আমাদের প্রাচীন আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও নীতি, সকলই বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে! শরৎ, তুমি ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস অবগত আছ, তুমি কি জান না যে জনসাধারণ অজ্ঞান ও মূর্খ হইয়া থাকিলে, দেশাচার বিকৃত হইয়া যায়? তুমি কি জান না যে জ্ঞানের আলোক বিকাশ পাইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে রীতি ও দেশাচারের পুনঃসংস্কার হয়?

শরৎ। সরস্বতী ঠাকুর! তাহা আমি জানি, জগতে এরূপ অনেকবার ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে কি সেটি ঘটিবে? আমাদের দেশে কে প্রকৃত শাস্ত্রপ্রচার করিবে? যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, যাঁহারা শিখাইলে শিখাইতে পারেন, তাঁহারাই স্বার্থের জন্য সেগুলি সঙ্গোপন করেন। হতভাগ্য দেশে কি পুনরায় শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশের উপায় আছে?

সরস্বতী। শরৎ! যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারা স্বার্থপর নহেন, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান গোপন করেন না! শাস্ত্রজ্ঞ রাজা রামমোহন রায় প্রথমে উপনিষদগুলি অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীদিগের হস্তে অর্পণ করেন। শাস্ত্রজ্ঞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমুদ্রতুল্য শাস্ত্রমন্থন করিয়া সমাজ-সংস্কারে পবিত্র জীবন অতিবাহিত করেন। শুনিয়াছি এখনও কলিকাতায় শাস্ত্রজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের পুণ্যকথায় স্বদেশীয়দিগকে উদার শিক্ষা দিতেছেন। শরচ্চন্দ্র! ইঁহাদের উপদেশ, ইঁহাদের কার্য্য, ইঁহাদের চেষ্টা ফলপ্রসবিনী হইবে, বঙ্গসমাজ ইঁহাদের আহৃত রত্নের উত্তরাধিকারী! কিন্তু এরূপ অসাধারণ পণ্ডিতদের কথা ছাড়িয়া দাও, শাস্ত্র প্রকাশ করা

শিক্ষিত লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য, যে যতটুকু পারে, তাহার সেইটুকু করা কর্ত্তব্য। কে শাস্ত্র প্রকাশ করিবে জিজ্ঞাসা করিতেছ? শরৎ! তুমি প্রকাশ করিবে, আমি প্রকাশ করিব, হেমবাবু প্রকাশ করিবেন, যে দেশানুরাগী, সে যতটুকু পারে প্রকাশ করিবে! এইরূপে দেশে দেশে প্রকৃত শাস্ত্রশিক্ষা প্রচার হইবে, অজ্ঞান তিরোহিত হইবে, কুরীতি ও কুপ্রথা উঠিয়া যাইবে। উৎসাহী উদ্যমশীল যুবক! তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এ কার্য্য কাহার দ্বারা সম্পাদিত হইবে? সৈন্যদলের সৈনিকপুরুষ যুদ্ধ-সময়ে জিজ্ঞাসা করে, কে বিজয়লাভ করিবে?—অগ্রসর হও, আমরাই জয়লাভ করিব! এ কার্য্যে রাজার মুখ চাহিয়া থাকিব না, রাজপুরুষদিগের ইহাতে অধিকার নাই, ক্ষমতাও নাই,—হিন্দুদিগের মধ্যে শাস্ত্রপ্রচার হিন্দুদিগেরই কার্য্য!

শরৎ। আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথা সফল হউক! কিন্তু এ যুদ্ধে আপনার মত কয়জন যোগদান করিবেন? তিনজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রশিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, হিন্দু-জাতির ঐক্য সাধনে, উন্নতি সাধনে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু কত সহস্র সহস্র শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্বার্থসাধনার্থ শাস্ত্রজ্ঞান একচেটিয়া করিয়া রাখেন, নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য হিন্দু-জাতিকে অবনত ও বিভিন্ন ও দুর্ব্বল রাখিবার প্রয়াস পান?

সরস্বতী। শরৎ, তুমি শিক্ষিত, তুমি ইতিহাসজ্ঞ, তুমি কি জান না যে স্বার্থপরদিগের প্রয়াস তাহাদিগের জীবনের সহিত লীন হয়, নিঃস্বার্থ মনুষ্যের চেষ্টা ফলপ্রসবিনী হয়? নিঃস্বার্থ বুদ্ধদেবের উদ্যমফল অদ্যাবধি জগৎসংসারে দেদীপ্যমান, যে স্বার্থপর লোকে তাঁহার প্রতিরোধ করিয়াছিল, তহারা কোথায়, তাহাদিগের কর্ম্মফল কোথায়? ইউরোপে নিঃস্বার্থ লুথরের চেষ্টা ফলপ্রসবিনী হইয়াছে, যে সহস্র সহস্র পুরোহিত তাঁহার প্রতিরোধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে কে জানে? ক্ষুদ্র জঘন্য পতঙ্গরাশির ন্যায় ক্ষুদ্র স্বার্থপর লোকের চেষ্টা কালের করাল হৃদয়ে বিলীন হইয়া যাইবে,—রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা ফলপ্রসবিনী হইবে! তাঁহাদের চেষ্টায় অবনত হিন্দু-জাতি উন্নত হইবে, জাতি-নির্ব্বিশেষে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবে!

শরৎ। হিন্দুগণ জাতি-নির্ব্বিশেষে এই শাস্ত্রশিক্ষা লাভ করে, এইরূপ আপনার উদ্দেশ্য?

সরস্বতী। হাঁ শরৎ, সকল হিন্দুরই শাস্ত্রশিক্ষায় অধিকার আছে, সকল হিন্দুই এ মহৎ শিক্ষা লাভ করুক, জনসাধারণের শিক্ষা ভিন্ন উন্নতির উপায়ান্তর নাই। পুরাকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেরই শাস্ত্রশিক্ষায় অধিকার ছিল, এখন সেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভাঙ্গিয়া তোমরা শত শত ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছ,—তোমাদের পৈতৃক অধিকার কে কাড়িয়া লয়? প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে শূদ্র অর্থে অনার্য্য, যদি তোমরা অনার্য্য হও, তাহা হইলে আমরা কি আর্য্য? আর তোমরা যদি আর্য্য হও, তোমরা যদি দ্বিজ-সন্তান হও, তাহা হইলে আর্য্যশাস্ত্ররূপ পৈতৃক ধন কে তোমাদের নিকট কাড়িয়া লইতে পারে?

শরৎ। তবে এতদিন শাস্ত্রজ্ঞান কেবল ব্রাহ্মণগণ একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন কেন?

সরস্বতী। তোমরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য সন্তান হইয়া নিজ পৈতৃক ধন ভুলিয়াছিলে, এইজন্য ব্রাহ্মণেরা তোমাদের সে গচ্ছিত ধন রক্ষা করিয়াছেন। তোমরা যখন সুপ্ত ছিলে, ব্রাহ্মণেরা জাগরিত থাকিয়া সে শাস্ত্রধন রক্ষা করিয়াছেন, তোমরা যখন বেদ-বেদাঙ্গ ভুলিলে, ব্রাহ্মণেরা সহস্র বৎসরের পর সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সেই বেদ-বেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন! স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়, শোকে, সন্তাপে, ব্রাহ্মণেরা সে অমূল্য ধন রক্ষা করিয়াছেন! জ্ঞান-প্রদীপ যখন ভারতবর্ষে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে সে প্রদীপ স্নিগ্ধ অবিনশ্বর তেজে জ্বলিতেছিল, আর্য্যক্রিয়া, আর্য্যরীতি যখন আর্য্যপ্রদেশে বিলুপ্ত, ব্রাহ্মণদিগের আচরণ ও অনুষ্ঠানে সেই রীতি ও ক্রিয়াকলাপ জীবিত ছিল! এখন তোমরা পুনরায় নিদ্রা হইতে উত্থান করিয়াছ, পৈতৃক ধন চিনিয়াছ, আনন্দে অগ্রসর হইয়া সে ধন অধিকার কর! এবং যে অনার্য্য ইতর জাতিসমূহ হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগেরও ঐ শাস্ত্রধন দান করিয়া উন্নত কর!

শরৎ। আপনার মহৎ কথা শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল, উৎসাহে পূর্ণ হইল। আপনার বাসনা পূর্ণ হউক। সকল প্রদেশে সকল জাতীয় হিন্দু যখন একত্র হইয়া একই আচার্য্য পুরোহিতের শিক্ষায় এক ঈশ্বরকে পূজাদান করিবে, তখন আমরা ঐক্য পাইব, বল পাইব, সাহস পাইব! ভগবন্! এ অপূর্ব্ব মন্ত্র আপনি কোথা শিখিলেন, কে আপনাকে

শিখাইল, জানিতে বড় ইচ্ছা করে। কয়েক মাস হইতে আপনার যশ চারিদিকে শ্রুত হইতেছে, আমি অদ্য আপনার পবিত্র কার্য্যের যাহা পরিচয় পাইলাম, তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। সেই জন্য ইচ্ছা করে আপনার পবিত্র জীবনের ইতিহাস কিছু জানি।

সরস্বতী। শরৎ, আমার জীবনের ইতিহাস যৎসামান্য। যদি রুচি হয়, আহারান্তে শ্রবণ করিও।

যোগমায়া তিনজনকার আহারের জন্য পাত পাতিয়া দিলেন, জল আনিয়া দিলেন, এবং সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। বালক দেবীপ্রসাদ সামান্য আহার প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা আনিয়া দিল, তিনজন আহারাদি সমাপন করিলেন। বালকও পিতার পাতের অবশিষ্ট কিছু আহার করিয়া পার্শ্বের ঘরে পুস্তকপাঠে রত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : রমাপ্রসাদের ইতিহাস

"আমি ধনাঢ্যের সন্তান ছিলাম, কিন্তু অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় একটী বিষম সংকটে পড়িয়া সমস্ত হারাইয়া তীর্থপর্য্যটন করিতে যাই। অনেক স্থান দর্শন করিয়া শেষে কাশীধামে বেদ শিক্ষার জন্য অনেক বৎসরাবধি অবস্থান করি।

"কাশীধামে অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, আমার গুরুদেব তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেন। বেদপাঠ ও বেদশিক্ষাদান ভিন্ন তাঁহার অন্য কাজ ছিল না, দেশবিদেশ হইতে, দ্রাবীড়, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও কাশ্মীর হইতে, শিষ্যগণ তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে আসিত। তিনি আমাকেও শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নিজের অনুগ্রহে, আমার গুণে নহে।

"নয় বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করি। এই কালের মধ্যে কাশীর অনেক ধনাঢ্য বণিক ও মহাজন, আমি দরিদ্র, অনাথ বিদ্যার্থী বলিয়া আমাকে দয়া করিতেন। আমি অনেকের বাটী যাতায়াত করিতাম, অনেকের নিকট পরিচিত হইলাম, অনেকের অনুগ্রহভাজন হইলাম।

"পঞ্জাব-দেশীয় কৃপাল সিংহ নামে একজন ক্ষত্রিয় কাশীতে সপরিবারে বাস করিতেন, এবং আমাকে নিজের সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন। বিদ্যার্থীর প্রয়োজন অতি অল্প, আমার প্রয়োজনবশতঃ নহে, তাঁহার দয়াবশতঃই, তিনি আমাকে অনুগ্রহ করিতেন। ব্রহ্মচারী বেশে যখন তাঁহার আলয়ে যাইতাম, তাঁহার গৃহিণী আমাকে পুত্রবৎ যত্ন করিতেন, আমিও তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতাম। তাঁহার ছোট মেয়েটীও আমাকে বড় যত্ন করিত।

"কালক্রমে কৃপাল সিংহ সেই একমাত্র কন্যাসন্তান রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন আমার পাঠ শেষ হইয়াছে, আমি নিজে একটী মঠ খুলিয়া কয়েকজন শিষ্য গ্রহণ করিলাম। কৃপাল সিংহের কাশীতে আত্মীয় কেহ ছিল না, তাঁহার বিধবা আমারই মঠে বাস করিতেন, তাঁহার অল্প যাহা সম্পত্তি ছিল, তাহা আমারই হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে আর এক বৎসর অতিবাহিত হইল।

"কৃপাল সিংহের একমাত্র বালিকা আমাকে অতিশয় স্নেহ করিত, তাহার নিরাশ্রয় অবস্থা, শান্তমূর্ত্তি, এবং অনির্ব্বচনীয় স্নেহ দেখিয়া আমারও তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিল। বালিকা যৌবন-লক্ষণ প্রাপ্ত হইল,—আমি মনের ভাব আর সঙ্গোপন করিতে না পারিয়া সেই লাবণ্যময়ী সুলক্ষণা বালিকাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলাম। আমার বয়ঃক্রম তখন অষ্টাবিংশ বৎসর, বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।"

সরস্বতী ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। শরচ্চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, ক্ষত্রিয়-বালিকাকে কিরূপে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন?

সরস্বতী। শরৎ, এরূপ ক্রিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, নীতিবিরুদ্ধও নহে। এটি কি নীতি-বহির্গত কাজ বলিয়া তোমার মনে হয়?

শরৎ। ভগবন্! আমি এ কার্য্য নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি না। আমি নিজে বিধবা বিবাহ করিয়াছি, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন না।

সরস্বতী। শরৎ, সে কথা আমার অজ্ঞাত নহে। তোমার মাতা ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা

করিও,—রমাপ্রসাদ সরস্বতীই সে বিবাহে ব্যবস্থা দান করিয়াছিল! আমি কাশীধাম হইতে মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে আসিতাম,—তোমাদের ইতিহাস কিছু কিছু অবগত আছি।

শরৎ বিস্মিত হইয়া রহিলেন,—এ রমাপ্রসাদ সরস্বতী কে? সরস্বতী পুনরায় আপনার ইতিহাস বলিতে লাগিলেন।

"কৃপাল সিংহের বিধবা আমাকে ধর্ম্মপরায়ণ ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেন, আমি যখন এ বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া তাঁহার নিকট বার বার উপরোধ করিলাম, তখন তিনি অবশেষে সম্মত হইলেন। তাঁহার জ্ঞাতিকুটুম্ব কাশীতে এরূপ কেহ ছিল না যে এ কার্য্যে আপত্তি করে। আমার বন্ধুবান্ধব আমাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, আমার মঠ ভাঙ্গিয়া গেল, শেষে আমি নববধূ ও তাহার মাতাকে লইয়া কাশী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু কার্য্য অন্যায় বা শাস্ত্রবহির্গত বলিয়া আমার বোধ হয় না, হেমবাবুর এ বিষয়ে কি মত, তাহা জানিতে আমি বাসনা করি।"

হেমচন্দ্র। আপনি নিরাশ্রয় ক্ষত্রিয় বালিকাকে বিবাহ করিয়া আপনার দয়া, আপনার সাহস, আপনার ধর্ম্মপ্রিয়তা দেখাইয়াছেন।

সরস্বতী। হেমবাবু, তোমার ন্যায় আদর্শচরিত্র লোকের এইরূপ মত হওয়াই সম্ভব। ভগিনী বিন্দুবাসিনী যখন অনাথা দরিদ্রা বালিকা ছিলেন, তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নিজের দয়া, সাহস ও ধর্ম্মপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলে! ভগিনী বিন্দুবাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিও,—তাঁহার বাল্যাবস্থায় রমাপ্রসাদ সরস্বতী তাঁহার হাত দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলিয়াছিল।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া রহিলেন। রমাপ্রসাদ সরস্বতী কে?

ক্ষণেক পর সরস্বতী আবার বলিলেন,—হেমচন্দ্র! তুমিও অনাথা বালিকা বিবাহ করিয়াছিলে, কিন্তু তিনি স্বজাতীয়া। আমার ন্যায় অন্যজাতীয়া বালিকা বিবাহ করিলে কিছুমাত্র আত্মগ্লানি বোধ করিতে না?

হেম। কিছুমাত্র না।

সরস্বতী। আত্মীয় কি পরিবারের মধ্যে যদি কেহ ভিন্ন জাতির সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহাকে কিছুমাত্র নিন্দা করিবে না?

হেম। কিছুমাত্র না।

সরস্বতী। তোমার নিজের এরূপ অবস্থা হইলে এরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইবে? লক্ষ্মীসমা শান্তহৃদয়া তোমার দ্বাদশবর্ষীয়া সুশীলা নাম্নী যে কন্যা আছে, তাহার সহিত অন্য জাতীয় উপযুক্ত পাত্রের সহিত শুভবিবাহে তোমার কোনরূপ আপত্তি হইবে না?

হেমচন্দ্র এ প্রশ্নে বিস্মিত হইলেন! উত্তর করিলেন,—গুরুদেব! পাত্র যদি উপযুক্ত হয়েন, এ কার্য্যে আমি কিছুমাত্র আপত্তি করিব না।

সরস্বতী তখন হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চিন্ত হও। আমি আপাততঃ সুশীলা মাতার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করিতেছি না, তোমার মনটী জানিবার জন্য একথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

সকলে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে হেমচন্দ্র বলিলেন,—গুরুদেব, আপনার ইতিহাসের শেষাংশ জানিতে বড় ঔৎসুক্য হইতেছে, আপনার বধূ ও বধূমাতা এক্ষণে কোথায়?

সরস্বতী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার ইতিহাস সাঙ্গ প্রায়, আমার জীবনের আশা-ভরসাও সাঙ্গ হইয়াছে। বিবাহের দুই বৎসর পরই দৌহিত্র মুখ দেখিয়া আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাহার পর আমি পুত্র-কলত্র লইয়া মথুরায় ১৫ বৎসর যাবৎ আবাস করিতেছিলাম। সেখানে প্রত্যহ প্রাতে যমুনাতীরে অনন্ত মহিমাপূর্ণ গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া পরমাত্মার বিকাশাংশ সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিতাম, সায়ংকালে যমুনাঘাটে বসিয়া শিষ্যদিগকে উপনিষদগুলির অচিন্তনীয় অর্থ শিখাইতাম। প্রিয় পুত্রকে নিজেই সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদান করিতাম এবং তথাকার বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখাইতাম, এবং স্নেহময়ী ভার্য্যার যত্নে আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে স্বর্গসুখ ভোগ করিতাম। সে স্নেহময়ী অন্তর্হিতা হইলেন, আমার মন বিচলিত হইল, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছি।"

সরস্বতী নিস্তব্ধে চক্ষু হইতে দুই একটী অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিলেন। হেম ও শরৎ অচিরে বিদায় গ্রহণ করিয়া তালপুকুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : গ্রামে মহৎ আন্দোলন

রমাপ্রসাদের নূতন প্রথায় শাস্ত্রপ্রচার লইয়া গ্রামে অনেক আন্দোলন হইতে লাগিল। নানারূপ লোকে নানারূপ কথা কহিতে লাগিল। যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহারা রমাপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, যাঁহারা পাণ্ডিত্যের ভাণ করেন, তাঁহারা রমাপ্রসাদকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া দুটা গালি দিলেন! পরের একটু উপকার করিলে যাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ হয়, তাঁহারা রমাপ্রসাদের সাহায্য করিলেন, পরের নিন্দা রটাইয়া বেড়াইয়া যাঁহারা দুপয়সা আয় করেন, সে ক্ষুদ্রভাগ্যগণ রমাপ্রসাদের নিন্দা রটাইয়া দুপয়সা আয় করিলেন! শাস্ত্রশিক্ষা দিয়া দেশের লোকের হৃদয় উন্নত করা, চরিত্র গঠিত করা, যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা রমাপ্রসাদের সহিত সহানুভূতি করিতে লাগিলেন, এবং শাস্ত্রপ্রচার হইলে যাঁহাদের ব্যবসা উঠিয়া যায়, অন্ন উঠিয়া যায়, তাঁহারা রমাপ্রসাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন! গ্রামের উন্নতি, দেশের উন্নতি হইলে যাঁহারা তুষ্ট হয়েন, তাঁহারা রমাপ্রসাদের শিক্ষাদানে আনন্দিত হইলেন, এবং দেশের সামাজিক বা ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি হইলে যাঁহাদের একচেটিয়া উঠিয়া যায়, তাঁহারা রমাপ্রসাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতিচেষ্টা দেখিয়া,—বেহদ্দ গালি দিলেন!

এইরূপে পাড়ায় পাড়ায় সরস্বতী ঠাকুরের কথা লইয়া আন্দোলন বাড়িতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী নিন্দার কথা রটিল। হেমচন্দ্র ও শরতের সহিত সরস্বতী ঠাকুরের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, জমিদার-বাড়ীর কেহ কেহ আড়ালে থাকিয়া তাহা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা এখন অনুগ্রহ করিয়া রটাইলেন যে সরস্বতী ঠাকুর অন্যজাতীয়া নারী বিবাহ করিয়া জাতি হারাইয়াছেন, সনাতনবাটীর লোকের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছেন, তালপুকুরের হেমবাবুর কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিতে বসিয়াছেন। সহসা রাত্রিযোগে গ্রামে অগ্নি লাগিলে নৈশ আকাশ যেরূপ রক্ত আলোকে পূর্ণ হয়, তালপুকুর ও সনাতনবাটী গ্রাম এই নিন্দাকথায় পূর্ণ হইল!

সনাতনবাটীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই অধর্ম্মাচারী ভণ্ড জটাধারীকে লক্ষ্য করিয়া যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিলেন। প্রাচীন সম্প্রদায়, প্রাচীন হিন্দু-আচার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিলেন। নব্য সম্প্রদায়, আর্য্য-রীতির ব্যতিক্রম হইতেছে বলিয়া ইংরাজী ভাষায় অনেক তর্কবিতর্ক করিলেন। জমিদার-বাড়ীর মেয়েমহলে ক্ষত্রিয়া-প্রণয়-বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া অনেক ব্যঙ্গ করা হইল। তালপুকুরের দাদামহাশয় সন্ধ্যার সময় ডাবা হুঁকা টানিতে টানিতে বলিলেন,—"এ আর কিছুই নয়,—মেয়েগুলা বড় স্বাধীন হইতেছে, তাই যত বিশৃঙ্খলা।" গরবিণী গোপবালা গরবের খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন,—"কি হয়েছে, কি হয়েছে? সুশীলার মা বামুনের ছেলের সঙ্গে সুশীলার বিয়ে দিবে? বামুন না চণ্ডাল? তা হবে না কেন? 'ওদের ত আর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, তা না হইলে বিধবার বিয়ে দেয়?" বুদ্ধিমান ঘোষালের পো ঘটকীর সঙ্গে কি কথা কহিতেছিলেন, এবং নূতন বৌ বাড়ীতে আনিবেন মনে করিয়া মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতেছিলেন,—এমন সময় রমাপ্রসাদের কথা শুনিয়া একেবারে দেশ-হিতৈষিতায় অবশ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ হুঁকা হস্তে লইয়া সমাজ-সংরক্ষণার্থ দলবল জুটাইতে বাহির হইলেন। এদিকে রুক্ষবন্দনা রুক্ষচিন্তা বড়ালের বৌ ছাতে বসিয়া পায়ে আলতা পরিতেছেন, তিনিও নাপ্তিনীর নিকট এই কলঙ্ককথা শুনিয়া একেবারে সাপিনীর ন্যায় ফোঁস করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আর কিছু নয়, এখনকার মিন্‌ষেগুলা একেবারে গোল্লায় গিয়াছে! আসুক না আজ, একবার বেশ শিক্ষা দিব এখন।" সেদিন রাত্রিতে বড়াল-মহাশয় যে অমৃতবচন শুনিলেন তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম।

ক্রমে এ কথা জমিদার কামিনীকান্তবাবুর কাণে উঠিল। হিন্দুধর্ম্ম-সংরক্ষণের জন্য তিনি বিশেষ শিরোবেদনা ভোগ করিতেন না, কিন্তু তথাপি তিনি দেশের জমিদার, তিনি হিন্দু-আচার বজায় না রাখিলে কে রাখে? অতএব তিনি আদেশ দিলেন,—সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জানাইবে, তিনি থাকাতে জমিদার-গৃহে বড় গোলযোগ হইতেছে, এবং দেশাচাররত স্বধর্ম্ম-পরায়ণ বংশেও কিছু কলঙ্ক পড়িতেছে। ঠাকুর অন্য স্থানে বাসা ঠিক করুন।

বৈশ্বানরতুল্য তেজঃপূর্ণ রমাপ্রসাদকে সহসা একথা কেহ বলিতে সাহস করিল না। জমিদার-

গৃহে লোকে বকাবকি করে, কানাঘুসো করে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলে না। অবশেষে বাড়ীর একজন বৃদ্ধ ভৃত্য একদিন অনেক কষ্টে, অনেক কথার পর, কোনও প্রকারে প্রভুর আজ্ঞা ব্যক্ত করিল। রমাপ্রসাদ শুনিয়া হাসিলেন,—আবাসস্থান ত্যাগ করিলেন না।

জমিদারমহাশয় নিজ আজ্ঞা লঙ্ঘিত হইয়াছে শুনিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দুর্জ্জয় সিং, রামখালাওন সিং, অর্জ্জুন দোবে, বলবন্ত চোবে প্রভৃতি বৃহৎ লাঠিধারী দ্বারবানগণ আসিয়া রমাপ্রসাদের ঘরের সম্মুখে আস্ফালন করিল, তাঁহার কম্বল টানিয়া ফেলিয়া দিল, তাঁহার হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিল। দ্বারবানগণ এতটা বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিশ্রাম করিতে গেল,—রমাপ্রসাদ পুনরায় কম্বল বিছাইয়া পুঁথি পাঠ করিতে বসিলেন, দেবীপ্রসাদ নূতন হাঁড়ী কিনিয়া আনিল।

যোগমায়া সন্ধ্যার সময় পাত পাড়িয়া দিবার সময় অশ্রুজল মোচন করিলেন। অসার দুঃখপূর্ণ জীবনে তিনি এই সন্ন্যাসী ভিন্ন কাহারও নিকট মিষ্ট কথা শুনেন নাই, সন্ন্যাসীর বালক ভিন্ন আর কাহারও নিকট অপত্যসম স্নেহ পান নাই। ইঁহারা শীঘ্র চলিয়া যাইবেন শুনিয়া যোগমায়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

রমাপ্রসাদ মনের ভাব বুঝিলেন, কহিলেন,—যোগমায়া, তুমি অতি দুঃখিনী, তোমাকে এ দুঃখে ফেলিয়া আমি চলিয়া যাইব না, নিশ্চিন্ত হও!

যোগমায়া। জমিদার-গৃহিণী আদেশ দিয়াছেন, ভৃত্যগণ প্রভুকে কাল গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিবে।

রমাপ্রসাদ। যোগমায়া, আমি তোমাকেই জমিদার-গৃহিণী বলিয়া জানি।

যোগমায়া। ভগবন্! আমি এককালে জমিদার-গৃহিণী ছিলাম, এখন অনাথিনী। আমার ক্ষমতা কোথায়? সম্পত্তি কোথায়?

রমাপ্রসাদ। এই গৃহ তোমার শ্বশুরের সম্পত্তি, তোমার স্বামীর সম্পত্তি।

যোগমায়া উত্তর দিলেন না, বলয়শূন্য সূক্ষ্ম হস্তদ্বয়দ্বারা মুখ আবরণ করিয়া অনেকক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, হৃদয়ে কি একটী ভাব উদয় হইতেছিল, মুখে কি একটী কথা আসিতেছিল, কিন্তু তাহা বাক্যতে প্রকাশ পাইল না। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—আমি স্ত্রীলোক, সম্পত্তির কি জানি।

রমাপ্রসাদ। আমি তোমার সম্পত্তি জানি। আমি সে সম্পত্তি রক্ষা করিব।

যোগমায়া। জমিদারের প্রভূত ক্ষমতা, আপনি আমার সম্পত্তি রক্ষা করিবেন কিরূপে, আমাকেই বা রক্ষা করিবেন কিরূপে?

রমাপ্রসাদ। দুর্ব্বলকে রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচরণে ঈশ্বর বলদান করিবেন।

যোগমায়া। তবে আপনি যাহা বুঝেন করুন, আমি অবলা, আমি,—আমি,—আমি আপনার আশ্রিতা, আপনি আমার দেবতা।

রমাপ্রসাদ। নিশ্চিন্ত হও। কামিনীকান্তবাবুর গৃহিণীকে একবার বল, সন্ন্যাসী ঠাকুর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করে,—কামিনীকান্তবাবুর মঙ্গল অমঙ্গল তাঁহার উপর নির্ভর করে।

যোগমায়া এই কথা গৃহিণীকে জানাইলেন। গৃহিণীর মনে একটু ভয় হইল। তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

রমাপ্রসাদ। একজন দরিদ্র শাস্ত্র-ব্যবসায়ী আপনাদের বিস্তীর্ণ জমিদার-গৃহে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া কি আপনার মত হইয়াছে?

গৃহিণী। বাবু এইরূপ মত করিয়াছেন।

রমাপ্রসাদ। এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে এ দরিদ্র থাকিবার জন্য কি একটী ঘর পায় না?

গৃহিণী। ঘরের অভাব নাই।

রমাপ্রসাদ। দুবেলা দরিদ্রকে খাওয়াইবার অন্নের অকুলান?

গৃহিণী। অন্নের অভাব নাই!

রমাপ্রসাদ। তবে দরিদ্রকে তাড়ান কেন?

গৃহিণী। অনেক গোলযোগ হইতেছে, আমাদের বড় নিন্দা হইতেছে, আমাদের দেশাচার দেখিয়া চলিতে হয়, সেইজন্য বোধ হয় বাবু এরূপ আদেশ দিয়াছেন।

রমাপ্রসাদ। দেশাচার কি আমি অন্যথা করিলাম, না খোজেস্তা বিবি?

গৃহিণী উত্তর করিলেন না,—তিনি খোজেস্তা নাম্নী একজন মুসলমান নর্ত্তকীর কথা শুনিয়াছিলেন,—নীরবে চক্ষুর জল মুছিলেন।

রমাপ্রসাদ। তবে এ উপদ্রব কেন?

গৃহিণী। বাবুর আদেশ।

রমাপ্রসাদ। দরিদ্রের উপর উপদ্রব করিলে কি বাবুর মঙ্গল হইবে?

গৃহিণী সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন,—আমিও বাবুকে তাই বলিয়াছিলাম, বাবু শুনিলেন না।

রমাপ্রসাদ। বাবুকে আর একটু বুঝাইয়া বলিবেন যে দরিদ্রের উপর অত্যাচারে বড়লোকের অমঙ্গল হয়।

গৃহিণী। বলিয়াছিলাম। বাবু শুনিলেন না।

রমাপ্রসাদ। তবে বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবেন, রমণীকান্ত নামে এক জমিদার-পুত্র এই জমিদার গৃহে বাস করিতেন, বাবু তাঁহাকে জানিতেন কি?

গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

রমাপ্রসাদ। তাঁহাকে আপনি দেখিয়াছিলেন কি?

গৃহিণী। দেখিয়াছিলাম। তখন আমার নূতন বিবাহ হইয়াছে।

রমাপ্রসাদ। তিনি কোথায় গেলেন জানেন কি?

গৃহিণী। তাঁহার অনেক দিন হইল কাল হইয়াছে।

রমাপ্রসাদ। কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হয়?

গৃহিণী আবার শিহরিয়া উঠিলেন।

রমাপ্রসাদ। তাঁহার কিসে মৃত্যু হয় শুনিয়াছেন কি?

গৃহিণী। মরা মানুষের কথায় প্রয়োজন কি?

রমাপ্রসাদ। তবে বাবুকে বলিবেন, দরিদ্রের উপর উৎপীড়নে প্রয়োজন কি? পাপের পরিমাণ অধিক হইলেই প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়।

গৃহিণীর সহিত রমাপ্রসাদের যাহা যাহা কথা হইয়াছিল, যোগমায়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিয়াছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় যোগমায়া রমাপ্রসাদের আহারের সময় আসিলেন না। নিশীথে রমাপ্রসাদ যদি উঠিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে সেই শীর্ণকায়া হতভাগিনী তাঁহার মাথার নিকট বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

প্রাতঃকালে যোগমায়া যখন জলটল লইয়া আসিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন,—এ জমিদার-গৃহের লোকজন সব ভাল লোক ত? রাত্রিতে আসিয়া সন্ন্যাসীর ঝুলিটী, গরিবের বাক্সটী, নাড়াচাড়া করে কে?

যোগমায়া হেঁটমুখী হইয়া রহিলেন, ক্ষণেক পর বলিলেন,—কৈ, এ বাড়ীর লোকজনের কোনও বদনাম শুনি নাই; আপনার কোন দাসী আপনার দ্রব্য নাড়িয়াচাড়িয়া থাকিবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : খিড়কীর পুকুরের খোসগল্প

পরদিন প্রাতে সন্ন্যাসী ঠাকুর চলিয়া যাইবেন সকলে প্রত্যাশা করিয়াছিল, দেখিল তাহার বিপরীত। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সেবার জন্য বড়কর্ত্তার খাস ভৃত্য প্রাতঃকাল হইতে ছুটাছুটি করিতেছে! সন্ন্যাসী ঠাকুরের খাইবার জন্য গয়লা দুধ মাখন আনিয়া দিল, ময়রা মিষ্টান্ন আনিয়া দিল! সন্ন্যাসী ঠাকুরের হুকুম পালনজন্য একজন দ্বারবান সর্ব্বদা দ্বারে দণ্ডায়মান! বড় গৃহিণীর খাস দাসী সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঘর ঝাঁট দিতেছে, বড় গৃহিণীর খাস রাঁধুনী রন্ধনের আয়োজন করিতেছে!

জমিদার-বাটীর খিড়কী পুকুরের ঘাটে আজ বড় হুলস্থুল। মেয়েমহলে খোসগল্পের শেষ নাই! দুঃখের বিষয় কোন সংবাদপত্রের সংবাদদাতা খিড়কী পুকুরঘাটে দণ্ডায়মান ছিলেন না, এবং কোন নব্য লেখকও সেই ঘাটের কথাবার্ত্তার "শর্টহেণ্ড রিপোর্ট" লয়েন নাই। যদি লইতেন, তাহা হইলে "মেয়েমহলে চরিত্র সমালোচনা" নামক অপূর্ব্ব উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দকে তৃপ্ত করিতে পারিতেন।

প্রথমে, মল পায়ে, গহনা গায়ে, হাসি মুখে, নবীনাদিগের দল সেই ঘাটে ঝম্ ঝম্ করিয়া

আসিলেন। রসিকা ফুলকুমারী তাঁহাদের নেত্রী, কলসটী নামাইয়া যাত্রার একটী ছড়া কাটিলেন,—

"ওলো, এত দিনের পর সন্ন্যাসীর কপাল ফিরেছে।
কর্ত্তাটী কর্ত্তাটী বলে বড় গিন্নী ডেকেছে।"

বসন্তকুমারী। দূর পোড়ারমুখী, বড়গিন্নীর উপর ঠাট্টা! শুনতে পেলে মাথা মুড়িয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেবে!

ফুলকুমারী। ঠাট্টা আবার কি? বড়গিন্নীর দাসী এখানে কাজ কর্‌ছে, রাঁধুনী রান্নার আয়োজন কর্‌ছে, তা বড়গিন্নী সন্ন্যাসীর উপর সদয় হয়েছেন নয় ত কি?

কুসুমকুমারী। না লো না, তা নয়। বড়গিন্নীর একটা বড় ফাঁড়া ছিল, সন্ন্যাসী স্বস্ত্যয়ন করে তাই কাটিয়ে দিয়েছে, তাই সন্ন্যাসীর এত আদর।

হেমকুমারী। তা নয় লো, তা নয়, তোরা জানিস্‌নি শুনিস্‌নি, কথা ক'স্‌ কেন? কর্ত্তার একটা বড় ফাঁড়া ছিল, তাই বড়গিন্নী সন্ন্যাসীকে কাল সন্ধ্যার সময় ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী। ও লো, আমি বলি শোন। সন্ন্যাসীকে ঔষধ কর্‌তে ডেকেছিল।

ফুলকুমারী। কিসের ঔষধ লো? বড়গিন্নীর এ বয়সে আবার ছেলে হবার সাধ আছে না কি?

স্বর্ণকুমারী। দূর পোড়াকপালী! তা নয় লো তা নয়, এ অন্য ঔষধ।

সকলে। কি? কি? কি ঔষধ?

স্বর্ণকুমারী। বড়গিন্নীর একটা শত্রু আছে, তাকে বাণ মারবার ঔষধ। এখন শুন্‌লি?

সকলে। কে? কে? কে? শত্রু কে?

স্বর্ণকুমারী। ওলো, বলি শোন্‌। ঐ যে একটা মুছুনমানী কল্‌কেতায় আছে না? তার নাম খোজেস্তা, তাকেই বাণ মারবে। আমাদের খোকার ঝি লুকিয়ে লুকিয়ে শুনে এসেছে। সন্ন্যাসী নাকি বল্‌ছে সেই মুছুনমানীকে শীঘ্র ধ্বংস করিবে।

নবীনাদিগের দল চলিয়া না যাইতে যাইতে মধ্যবয়স্কা একদল আসিয়া সেই ঘাটে কলস নামাইলেন।

মাতঙ্গিনী। ও লো, আজ যে বড় ঘটা দেখ্‌ছি! কি, হয়েছে কি?

তরঙ্গিণী। ও লো, তা জানিস্‌নি,—আমাদের যোগমায়ার যে কপাল ফিরেছে?

মাতঙ্গিনী। সে কি? সে কি? কি হয়েছে?

তরঙ্গিণী। হবে আবার কি? কাল যোগমায়া নাকি বড়গিন্নীর কাছে সন্ন্যাসীকে নিয়ে গিয়ে ঢের কাঁদাকাটি করেছে। বলেছে, সন্ন্যাসীকে বাড়ী থেকে বার করে দিলে আমি ঝুলী নিয়ে তার সঙ্গে বৈষ্ণবী হয়ে বেরিয়ে যাব!

মাতঙ্গিনী। অবাক কল্লে মা! কোথা যাব মা! ওমা চল্লিশ বছরের বুড়ি বৈষ্ণবী হবে! কলিতে কতই নাকি হবে!

রাধারঙ্গিনী। ও লো, তা নয়, তোরা আসল কথা শুনিস্‌নি।

সকলে। কি? কি? কি? আসল কথাটী কি?

রাধারঙ্গিনী। বলি ঐ যে তালপুকুর থেকে দুটা বাবু আসে না,—হেমবাবু আর শরৎবাবু? তাদের মধ্যে শরৎবাবুটী একটী বিধবা বিয়ে করেছে, সে নাকি হেমবাবুর শ্যালী হয়। তা তারাই নাকি সন্ন্যাসীকে ভজিয়েছে যে বিধবারও বিয়ে হয়। এই আর আমাদের যোগমায়া কোথায় যায়? একেবারে নেচে উঠেছে। এই জন্য সন্ন্যাসীর এত শুশ্রূষা করে, সন্ন্যাসীর পাত পেতে দেয়, জল এনে দেয়, কত সেবা করে।

কৃষ্ণসঙ্গিনী। ও লো, তা নয় লো, তা নয়, তোরা আসল কথা শুনিস্‌নি।

সকলে। কি? কি? কি? কি হয়েছে?

কৃষ্ণসঙ্গিনী। হবে আর কি? ঐ সন্ন্যাসীর ছেলেটীর সঙ্গে হেমবাবুর মেয়েটীর বিয়ে হবে, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

সকলে। বলিস্‌ কি লো? সত্য নাকি? অবাক কল্লে মা! কোথায় যাব মা!

রামরঙ্গিনী। তাও কি হয় লো, সন্ন্যাসী হইল বামুন, হেমবাবু হইল কায়েত, এদের কি বিয়ে হয়?

কৃষ্ণসঙ্গিনী। কিসের বামুন? বামুনের মুখে আগুন।

সকলে। অবাক কল্লে মা! কোথায় যাব মা! ইত্যাদি।

মধ্যবয়স্কার দল বিদায় না হইতে হইতে বৃদ্ধার দল কলস নামাইয়া সেই ঘাটে সত্যের আবিষ্কার করিতে বসিলেন।

শ্যামাসুন্দরী। আজি যে সন্ন্যাসী ঠাকুরের বড় সম্মান!

বামাসুন্দরী। এখন হয়েছে কি? আরও সম্মান হবে।

শ্যামাসুন্দরী। কেন লো? কি হয়েছে?

বামাসুন্দরী। ও লো, তা বুঝি জানিস্ না? তবে শোন্, চুপি চুপি শোন্। কর্ত্তা-গিন্নী শুনলে আমাদের ঝেঁটা মেরে বের করে দেবে।

শ্যামাসুন্দরী। কি? কি? কি? কি হয়েছে?

বামাসুন্দরী। বলি এই জমিদার-বাড়ীর একটা ছেলে খুন হয়ে গিয়েছিল তা কি শুনিস্ নি?

ত্রিপুরাসুন্দরী। হাঁ, হাঁ, হাঁ! ওমা সে যে আজ তিরিশ বছর হতে গেল গা। আমার বিলাসকামিনীর সেই মাসে বিয়ে হয়, ওমা সে কথা কি আমরা ভুলতে পারি! ওমা কি ভয় পেয়েছিনু গো! বিয়ের সম্বন্ধ বুঝি ভেঙ্গে যায়! তা বিয়ের ঘটা সব বন্ধ হয়ে গেল, বাজনা বন্ধ হয়ে গেল, নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে গেল,—চুপি চুপি বামুন ডাকিয়ে আমার মেয়ের বিয়ে হয়। হা আমার পোড়াকপাল রে!

হরসুন্দরী। ওমা সে কথা আর মনে নেই?—সে যে বৈশাখ মাসে। আমার নাড়ুগোপালের সেই মাসে ভাত, সে কথা কি আমি ভুলিতে পারি। বাছা নাড়ুগোপালের ভাতের সব আয়োজন বন্ধ হয়ে গেল, নোকজনকে ভাল করে খাওয়াতেও পারিলাম না। হা আমার ভাঙ্গাকপাল রে!

কৃষ্ণসুন্দরী। ওমা সে কথা জানি বৈ কি? ঐ যে ঠিক সেই মাসে আমার বড়বৌয়ের সাধ, সাধের কত আয়োজন, কত যগ্‌গি, কত নোকজন জড় হয়েছে—রাজ্যের মেয়ে আমার বড়বৌয়ের সাধে এসেছে। ওমা এমন সময় বীরগ্রাম থেকে খবর আসিল যে বড় হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে, রমণীবাবু খুন হইয়াছে! ওমা কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আমার বড়বৌ ত শুনে প্রায় মূর্চ্ছা যায়,—আমি ত অবাক,—বাড়ীসুদ্ধ মেয়ে ভয়ে আড়ষ্ট! কেবা যগ্‌গিতে খায়, কেবা খাওয়ায়?

বামাসুন্দরী। ঠিক বলেছ দিদি! ছেলেটীর নাম রমণীবাবুই বটে। আহা যেন সোণার চাঁদটী ছিল।

ত্রিপুরাসুন্দরী। আহা! এমন ছেলেও মারা যায় গা? কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আহা রমণীবাবু আমাকে কত সম্মান কর্‌ত, আমার বিলাসকামিনীকে ঠিক বোনের মত ভালবাসিত।

হরসুন্দরী। আহা! তার কথা মনে হলে এখনও চোখে জল আসে। রমণীবাবু আমার নাড়ুগোপালকে কত কোলে কর্‌ত, নাড়ু হাতে দিত, কত আদর কর্‌ত! আহা বাছারে, এমন সোণার চাঁদ ছেলেও মারা যায়!

কৃষ্ণসুন্দরী। আহা, মরে যাই! সে কথা তুলো না গো, সে কথা তুলো না। বাছা রমণী আমার ছেলের মত ছিল গো,—আমার বড়বৌ তাকে দেবর বলিয়া কতই ঠাট্টা করিত! আর সে ত এমন দেবর ছিল না,—কাপড়খানি, গহনাখানি, বর্দ্ধমান থেকে কত খাজা, মেঠাই সর্ব্বদাই আমার বড়বৌয়ের জন্য পাঠাইয়া দিত! আমার বড়বৌয়ের খোকা হবে খোকা হবে বলে কতই আহ্লাদ কর্‌ত! তা বাছা খোকাকেও দেখিয়া গেল না!

বামাসুন্দরী। তা সে খুন ত পুলিশে কিছু কিনারা কর্‌তে পার্‌লে না, লাশ রাতারাতি জ্বালিয়ে ফেলেছিল। এতদিন ত কেউ ধর্‌তে পারেনি, এখন নাকি সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়ে তাই বার করেছে! কর্ত্তাবাবু নাকি বড় ভয় পেয়েছেন, তাই সন্ন্যাসীর এত খোসামোদ!

এইরূপে সমস্ত দিন ধরিয়া জমিদার-বাটীতে বড়গিন্নীর চরিত্র, যোগমায়ার চরিত্র, কর্ত্তা-মহাশয়ের চরিত্র এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরের চরিত্র লইয়া অনেক সমালোচনা হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় দেবীপ্রসাদ পিতাকে বলিল,—বোধ হয় জমিদারমহাশয় আমাদের উপর আজি সদয় হইয়াছেন, আপনার প্রতি সুহৃদতুল্য ব্যবহার করিতেছেন।

রমাপ্রসাদ। দেবী, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। আজি জমিদারমহাশয় আমাদের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,—সতর্কে থাকিও।

দেবীপ্রসাদ। সে কি? তিনি আমাদের আহারের জন্য দ্রব্যাদি পাঠাইতেছেন,—আমাদের সেবার জন্য দাস-দাসী রাখিয়াছেন।

রমাপ্রসাদ। তাঁহার দত্ত আহার স্পর্শ করিও না,—তাঁহার দাস-দাসী,—আমাদিগকে পাহারা দিবার জন্য!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : কলিকাতা যাত্রা

যেদিন রমাপ্রসাদ গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে কামিনীকান্ত জমিদারমহাশয়ের কেহ বড় দর্শন পাইত না। তিনি সর্ব্বদাই ঘরের ভিতর থাকিতেন, গোপনে কি পরামর্শ করিতেন, বর্দ্ধমান ও কলিকাতায় লোক পাঠাইতেন, সর্ব্বদা নানা দিক হইতে পত্র পাইতেন, নানা স্থানে পত্র পাইতেন। ভৃত্যগণ বলিত,—জমিদারমহাশয় রুক্ষস্বভাব হইয়া গিয়াছেন, দাসীগণ বলিত,—কর্ত্তাবাবুর শরীর আধখানি হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে দুই তিন মাস অতিবাহিত হইলে পর তালপুকুর হইতে সংবাদ আসিল, বৃদ্ধ তারিণীবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। আরও সংবাদ আসিল যে মৃত্যুর পূর্ব্বে তারিণীবাবু রমাপ্রসাদ সরস্বতী ঠাকুরকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, সরস্বতী ঠাকুর মুমূর্ষুর ঘরে সমস্ত রাত্রি ছিলেন; সুধা এবার শরতের সহিত পূর্ব্বদেশে গিয়াছেন, শরৎ সেই দেশে বদলি হইয়াছেন, সুতরাং বিন্দু একাকী জ্যেঠামহাশয়ের অনেক সেবাশুশ্রূষা করিয়াছেন। গোপী-জ্যেঠাই বিন্দুর আসা-যাওয়া ইচ্ছা করিতেন না, কিন্তু বাবুর কঠিন পীড়ায় মুখ ফুটিয়া কোনও আপত্তি করেন নাই। আরও সংবাদ আসিল যে মৃত্যুর সময়ে তারিণীবাবুর নিকট রমাপ্রসাদ ছিলেন,—সম্ভবতঃ স্ত্রীকে উইল দ্বারা যে সম্পত্তি দান করিয়াছেন, সে উইল অন্যথা করিয়া সম্পত্তি বিন্দুবাসিনীকে ও সুধাকে উইল করিয়া দিয়াছেন!

এই সমস্ত কথা শুনিয়া কামিনীকান্তবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন! সেদিন খাওয়া, ঘুম ত্যাগ করিলেন, সমস্ত দিন বসিয়া অতি গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তারিণীবাবুর সম্পত্তিটুকু হেম ও শরৎকে না দিয়া আপাততঃ গোপবালার হস্তে রাখেন এবং ক্রমশঃ নিজে আত্মসাৎ করেন; অধর্ম্মাচারী রমাপ্রসাদের উপরে কোনও প্রকারে বৈরনির্য্যাতন করেন; উদ্ধত হেমকে একটু শিক্ষা দান করেন; ভাবী মকদ্দমায় একটা হুলস্থূল করিয়া আপন ক্ষমতা প্রচার করেন; সুশীলা ও দেবীপ্রসাদের বিবাহ বন্ধ করিয়া আপন ধর্ম্মপ্রিয়তা ও দেশাচারপ্রিয়তা প্রকটিত করেন;—এইরূপ নানা চিন্তা ও প্রলোভনে বিষয়ী কামিনীকান্তের মন একেবারে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইল! দুই প্রহর, আড়াই প্রহর, তিন প্রহর হইয়া গেল,—স্নান নাই, আহার নাই,—কেবল ভৃত্যগণ ঘন ঘন তামাকু আনিয়া দিতেছে, এবং জিলিপির পাকের মত কামিনীকান্ত ও বন্ধুবর্গের মন্ত্রণার পাক চলিতেছে!

সন্ধ্যার সময় উল্লাসপূর্ণ মুখে কামিনীকান্তবাবু বারান্ডায় দাঁড়াইয়াছেন, দূর হইতে দেখিলেন, তালপুকুর হইতে রমাপ্রসাদ ফিরিয়া আসিয়াছেন। একটু হাসিয়া মনে মনে বলিলেন,—সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমি ভারি খেলোয়াড়! খুব এক চাল চালিয়া কিস্তি দিয়াছ! আমিও খেলার কিছু জানি,—আমিও এবার এক চাল চালিব,—সাবধান!

পরদিন প্রাতে সনাতনবাটীর জমিদার-গৃহ হইতে পাল্কী ও ঝি তালপুকুরে উপস্থিত হইল। জমিদার-গৃহিণী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তারিণীবাবুর স্ত্রী পতিশোকে বড় কাতর হইয়াছেন, তালপুকুরে তাঁহাকে দেখিবার শুনিবার কেহ নাই, বিষয়রক্ষার পরামর্শ দিবারও কেহ নাই, সুতরাং গৃহিণীর ইচ্ছা যে গোপবালা কয়েকদিন সনাতনবাটী গিয়া থাকেন। শোক একটু হ্রাস হইলে, বিষয় শত্রুদিগের হস্ত হইতে নিরাপদ হইলে, গোপবালা পুনরায় নিজ গ্রামে আসিবেন। আর যদি যথার্থই তারিণীবাবু উইল করিয়া বিষয় ভাইঝিদের দিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত সে বিষয় লইয়া একটা মকদ্দমা হইবেই। সনাতনবাটীর জমিদারমহাশয় সে মকদ্দমায় নিরাশ্রয় বিধবার পক্ষ হইয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতে সম্মত আছেন।

এরূপ দয়ার্দ্র জমিদারের নিমন্ত্রণে নিতান্ত সম্মানিত হইয়া গোপবালা সনাতনবাটী যাইলেন, তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দশ পনর দিন ধরিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল, বর্দ্ধমান হইতে গোকুলচন্দ্র আসিল, কামিনী-

বাবুর অন্যান্য পরামর্শদাতা আসিল. অনেক পরামর্শ করিয়া কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল। বর্দ্ধমানে ঘন ঘন দরখাস্ত পড়িল, পুলিশের থানায় ঘন ঘন লোক যাইতে লাগিল। সমস্ত ঠিক হইল, গোপবালা তালপুকুরে ফিরিয়া গেলেন, এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় কামিনীকান্তবাবু মহাসমারোহে শিবিকায় আরোহণ করিয়া সনাতনবাটী ত্যাগ করিলেন।

রমাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। দেবীপ্রসাদ বলিল,—ঐ জমিদারমহাশয় যাইতেছেন। কয়েকমাস হইতে তাঁহার শরীর নিতান্ত অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়াছে। শুনিয়াছি, বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিম যাইতেছেন।

রমাপ্রসাদ। দেবী, তুমি ভুল শুনিয়াছ। আমাদিগকে একটী ঘোর সঙ্কটে ফেলিবার জন্য বুদ্ধিমান জমিদার কলিকাতা যাইতেছেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : সুমতিবাবুর বৈঠকখানা

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী সুমতিবাবুর বৈঠকখানাটী বড় ফিটফাট। অধিক ঝাড়-লণ্ঠনের আড়ম্বর নাই, কেবল ঘরের মধ্যে তিন ডালওয়ালা শেণ্ডেলীয়রে গ্যাস জ্বলিতেছে, আর লিখিবার টেবিলের উপর আস্‌লরের বাড়ীর একটী পরিষ্কার রিডিং ল্যাম্প। দেওয়ালে বিবস্ত্রা অপ্সরাদিগের ছবির ধুমধাম নাই, খানচারেক সুন্দর দৃশ্যের ছবিমাত্র,—পর্ব্বত, সমুদ্র, হ্রদ ও পল্লীগ্রামের ছবি। মর্ম্মর-প্রস্তরের উপকরণাদির অধিক ছড়াছড়ি নাই, কেবল একটী পরিষ্কার লিখিবার টেবিল, কয়েকখানি চৌকি, দুইটী সোফা ও একখানি ইজি চেয়ার। কার্পেট, গালিচার আড়ম্বর নাই, ঘরের মেজে নূতন মাদুর দিয়া ঢাকা। নানাপ্রকার মুসাহেব ও গীতবাদ্যকুশল লোকদ্বারা সে ঘর পূর্ণ নহে, সুমতিবাবুর ঘরে অল্প কয়েকজন বাছা বাছা বন্ধু মাত্র। ধনী বলিয়া সুমতিবাবু পরিচয় দেন না, দেখিলে শুনিলে তাঁহাকে বুদ্ধিজীবী চতুর লোক বলিয়াই বোধ হয়।

সন্ধ্যা হইয়াছে, বাতি জ্বলিতেছে, বন্ধুগণ কথাবার্ত্তা ও মিষ্টালাপ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন বন্ধু আমাদের পরিচিত।

ধনপুরের ধনঞ্জয়বাবুর আর পূর্ব্বের ন্যায় ধন নাই। বিষয় অনেক হাতছাড়া হইয়াছে, অবশিষ্ট বিষয় ঋণের জন্য আবদ্ধ হইয়াছে, লোকে কাণাকাণি করে, ধনঞ্জয়বাবুর অধিকাংশ ধনই সূক্ষ্মবুদ্ধি সুমতিবাবুরই হস্তগত হইয়াছে! ধনঞ্জয়বাবু এই দ্বিতীয় গৃহিণীতে সুখী হয়েন নাই, উপ-গৃহিণীগণ গৃধ্রপালের ন্যায় মাংসশূন্য শব ত্যাগ করিয়া অন্য শব অন্বেষণে উড়িয়া গিয়াছে, সখের বাগান বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ধনঞ্জয়বাবু এই সুমতিবাবুর বৈঠকখানাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুমতিবাবু অভদ্র লোক নহেন, যাঁহার সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়াছেন তাঁহাকে একেবারে তাচ্ছিল্য করেন না। বৈঠকখানার পার্শ্বে ধনঞ্জয়বাবু বসিয়া থাকেন, সুমতিবাবুর অনুগ্রহে একটু একটু হুইস্কী পান করেন, সুমতিবাবুর মিষ্ট কথায় আপনাকে সমাদৃত বোধ করেন। ধনঞ্জয়বাবুর পূর্ব্ববৎ রূপ নাই, যৌবন-লক্ষণ নাই, অকালেই চক্ষুর জ্যোতিঃ কমিয়া গিয়াছে, মাথার চুল কিছু কিছু শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, হাতে হুইস্কীর গ্লাস একটু একটু কাঁপিতেছে। ধনঞ্জয়বাবুর পূর্ব্বের কাল জুড়ী ও সাদা জুড়ীর পরিবর্ত্তে একটী অনাহারী ঘোড়ায় গাড়ী টানে, সইস কোচমানগণও প্রায় অনাহারী হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং বেশ ছিন্ন, তকমা মলিন। সম্প্রতি তারিণীবাবুর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া ধনঞ্জয়বাবুর নূতন বিষয়লাভের একটু আশা হইয়াছে। সুমতিবাবুর নিকট পরামর্শ লয়েন, সুমতিবাবুর ন্যায় পরামর্শদাতা কলিকাতায় কয়জন আছে?

কয়েকজন নব্য জমিদারও আজ সুমতিবাবুর নিকট আসিয়াছেন। কেহ এখনও নাবালক, শীঘ্রই বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন, ইতিমধ্যে টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, সে প্রয়োজনসাধনে সুমতিবাবুর ন্যায় আর কে পণ্ডিত আছে? কেহ মৃত জ্ঞাতির বিষয়টুকু লইবার জন্য লোলুপ হইয়াছেন, নানারূপ মকদ্দমার আয়োজন করিতেছেন, একখানি উইল (কিরূপে সৃষ্ট তাহা আমরা জানি না) সুমতিবাবুকে দেখাইতে আসিয়াছেন। কেহ বিলাস-সাগরে নবীন শরীর ভাসাইয়া দিয়াছেন. নাট্যশালার কোন নূতন বিলাসিনীর হাস্যে মুগ্ধ হইয়া সেই বিষয়ে চতুর-চূড়ামণি সুমতিবাবুর সহিত মিষ্টালাপ করিতে আসিয়াছেন। কেহ আগামী শনিবারে বাগানে

পার্টি দিবেন, সুমতিবাবুকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। কেহ এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, কেবল সুমতিবাবুকে দেখিবার জন্য (ও এক গ্লাস হুইস্কী পানার্থে) একবার গাড়ী থেকে নামিয়াছেন।

এইরূপ নানা পুষ্প-বিভূষিত সুমতিবাবুর বৈঠকখানায় পারিজাত পুষ্পের ন্যায় কামিনীকান্তবাবু শোভা পাইতেছেন। কিন্তু এ হাস্যপূর্ণ ঘরে তাঁহার মুখখানি আজ গম্ভীর, নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে কামিনীবাবু আজ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুমতিবাবু বুঝিলেন, বিষয়টা কিছু গুরুতর।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা ও গল্প রহস্য হইতে লাগিল, রাত্রি প্রায় দশটার সময় সকলে গাত্রোত্থান করিয়া বিদায় লইলেন। কেবল ধনঞ্জয়বাবু ঘরের এক পার্শ্বে হুইস্কীর গ্লাস লইয়া একটু তন্দ্রা ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া কামিনীকান্ত আপনার কথা সংক্ষেপে বলিলেন। গ্রামে এক ঘোর অধর্ম্মাচারী জটাধারী আসিয়াছে, সে ব্রাহ্মণপুত্রের সহিত কায়স্থ-কন্যার বিবাহ দিতে চায়, তারিণীবাবুর বিধবাকে স্বামীর বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে চায়। তারিণীবাবুর পীড়ার সময় সেই ঔষধ খাওয়াইয়াছিল, তারিণীবাবুর মৃত্যুর পর সেই জাল উইল প্রস্তুত করিয়াছে! হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-আচার রক্ষা করা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য, এবং নিরাশ্রয় বিধবা জমিদারকে সাহায্য করা জমিদারমাত্রেরই কর্ত্তব্য। অতএব জটাধারীকে ফৌজদারী মকদ্দমায় ফেলার যে আয়োজন হইয়াছে, সে সমস্ত কথা সংক্ষেপে কামিনীবাবু বিবরণ করিলেন।

বিবরণ করিতে করিতে রাত্রি এগারটা বাজিল, পরামর্শের সময় নাই, সুতরাং আর একদিন একথা হইবে বলিয়া কামিনীবাবু বিদায় লইলেন।

বিদায় লইবার সময় বলিলেন,—আপনার সহিত আবার কবে দেখা হইবে? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ আবশ্যক, সেই জন্যই আসিয়াছি।

সুমতি। যবে আপনি আজ্ঞা করেন।

কামিনীকান্ত। কল্য সন্ধ্যার সময় অবকাশ হইবে? আমার বাগানবাটীতে যদি আসেন তাহা হইলে কিছু গীতবাদ্যও হইবে, কথাবার্ত্তাও হইবে।

সুমতি। অবশ্য আসিব। আপনার সেই কোকিলমিষ্টভাষিণী যবন সুন্দরীটী আছে ত? তাহার "তাজা ব তাজা" গানটী আর একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে। গায় যেন তানসেন, নাচে যেন পরীটী!

কামিনীকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—আপনার আদেশে সে সম্মানিত হইবে! সন্ধ্যার সময় আসিবেন, গানটানও হইবে, আমাদের বিষয়ের কথাও হইবে।

এই বলিয়া কামিনীবাবু প্রস্থান করিলেন,—চাহিয়া দেখিলেন, ধনঞ্জয়বাবু তখন নিদ্রিত!

কামিনীবাবু একটী ভুল করিয়াছেন,—ধনঞ্জয়বাবু শ্বশুরের উইলের কথা শুনিয়া কাণ খাড়া করিয়া, চক্ষু বুজিয়া, সমস্ত কথা শুনিয়াছেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : কামিনীবাবুর বাগানবাড়ী

আজ কামিনীবাবুর বাগানে বাই-নাচ! কোকিল-বিনিন্দিত স্বরে খোজেস্তা বিবি "তাজা ব তাজা" গাইল, অপ্সরা-বিনিন্দিত তালে নৃত্য করিল, মৃগনয়ন-বিনিন্দিত কটাক্ষে তীক্ষ্ণ শর-বর্ষণ করিল! সুমতিবাবু অনিমেষ নয়নে, স্মিতফুল্ল বদনে, সে নর্ত্তকীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কামিনীকান্তবাবুর ললাট হইতে চিন্তারেখা আজ অপনীত হইল না।

নৃত্যান্তে খাওয়া-দাওয়া হইল। বলা বাহুল্য, খানা ইংরাজি ধরণে। মুসলমান খানসামা নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য মেজের উপর আনিয়া দিল, খোজেস্তা বিবি খানসামার হাত হইতে শেম্পেন বোতল লইয়া স্বহস্তে বাবুদের পাত্র ভরিয়া সুধা ঢালিল, এবং হাফেজ কবির "সাকী ময় বাকী" নামক অপূর্ব্ব সঙ্গীত গাইল! গীত সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তা বিবি বিদায় লইল, কিন্তু কামিনীকান্তবাবুর অনাস্বাদিত সুরা সম্মুখেই রহিল, তাঁহার ললাট হইতে চিন্তারেখা অপনীত হইল না।

তখন দুইজনে নিকটে বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন।

সুমতি। এখন আপনার কথাটী পুনরায় বলুন দেখি। কল্য সমস্ত বলা হয় নাই।

কামিনী। সমস্ত কথাই প্রায় কল্য বলিয়াছি। আমাদের গ্রামে কয়েক মাস হইতে যে একজন জটাধারী ব্রাহ্মণ আসিয়া হুলস্থুল বাধাইয়াছে, তাহার কথা কল্যই বলিয়াছি। সে উপনিষদ পড়ে, সে বেদ-গান গায়, সে জনসাধারণকে ডাকিয়া শাস্ত্রশিক্ষা দেয়, জাতিভ্রষ্ট হেম ও শরতের সহিত আহারাদি করে, শুনিয়াছি সে কায়স্থ-কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতেও চেষ্টা করিতেছে! উঃ, কি অধর্ম্মাচরণ! সনাতনবাটী গ্রামে বুঝি হিন্দুয়ানি ও দেশাচার আর থাকে না!

সুমতি। আপনি হিন্দুয়ানির স্তম্ভস্বরূপ, আপনি থাকিতে জটাধারী বেটার এত বিক্রম? আপনি কেন একটী সদুপায় অবলম্বন করুন না?

কামিনী। আদেশ করুন।

সুমতি। আপনি আজ যে বাই-নাচ দিলেন, আপনার গ্রামে সেই বাই-নাচ দিন! যবন সুন্দরীর প্রতাপে জটাধারী বেটা বাপ বাপ করিয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইবে!

কামিনী। না হে, সে কাজের কথা নয়। আমাদের গ্রামের লোকেদের এখনও কুসংস্কার আছে, তেমন উন্নতি হয় নাই। মুসলমানীকে গ্রামে লইয়া গেলে নিন্দা হইবার সম্ভব।

সুমতি। তবে দ্বিতীয় উপায়টী অবলম্বন করুন।

কামিনী। সে কি উপায়, বলুন?

সুমতি। আপনার বলবন্ত নামে যে লাঠিধারী দ্বারবান আছে, তাহাকে বলুন, জটাধারী বেটার জটা ধরিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দেয়। এই সামান্য বিষয় লইয়া আপনি এরূপ চিন্তিত হইয়াছেন?

কামিনী। সে উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু সে উপায়ও ব্যর্থ হইয়াছে। কল্যই বলিয়াছি, সে জটাধারী বোধ হয় আমাদের গ্রামের পূর্ব্বের ঘটনার কথা কিছু জানে! তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে সে পূর্ব্বের কথা তুলিয়া আমাদিগের সকলকে বিপদে ফেলিবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস!

সুমতি। আপনার গ্রামের পূর্ব্ব-ইতিহাসটী যদি ভাঙ্গিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত বুঝিতে পারি।

কামিনী। তবে পুরাতন কথা শ্রবণ করুন। আমার পিতা অতি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, আমাদিগের বিপুল জমিদারীর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ক্রয় করিয়া চারি-আনির মালিক হইয়া পরলোক গমন করেন, তাহা আপনি জানেন। আমি সেই চারি আনা দখল করিলাম, এবং রমণীকান্ত নামে আমার জ্ঞাতিভাই ছিল,—সে তখন নাবালক,—তাহার তিন আনা অংশও আমাদের হাতে ছিল।

সুমতি! আপনি বুদ্ধিমান, সুতরাং সে নাবালকের তিন আনা অনায়াসেই আপনার হাতেই রহিয়া গিয়াছে!

কামিনী। বড় অনায়াসে নহে। সে নাবালক রমণীকান্ত ভয়ানক গোঁয়ার ছেলে ছিল, তাহার অংশ আমার হাতছাড়া করিতে চায়। হাঁটিয়া বর্দ্ধমানে গিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে যে তাহার অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে যায়। কিন্তু কালেক্টর সাহেব আমার হাত-ধরা—দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল, নাবালকের সম্পত্তির ভার আমারই হস্তে রহিল।

গোঁয়ার রমণীকান্ত তাহার পর বীরগ্রামে গিয়া প্রজাদিগকে খাজনা দিতে রহিত করিল। নিজে লাঠি লইয়া আমার নগদীগণকে বীরগ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিল। প্রায় একশত প্রজার হস্তে লাঠি দিয়া সেই গ্রামের রাজা হইয়া বসিল!

এখনকার কালে সেরূপ হইলে পুলিশে খবর দিতে হয়,—সে কালে আমরা নিজের হাতেই অনেক কাজ করিতাম। আমিও সে বয়সে একটু নির্ব্বোধ ও গোঁয়ার ছিলাম, পাঁচ শত লাঠিয়াল লইয়া সেই গ্রাম আক্রমণ করিলাম! তাহার পর কি হইয়াছে আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন।

সুমতি। শুনিয়াছি সেই হাঙ্গামায় রমণীকান্ত খুন হইয়াছিল। তাহা লইয়া পুলিশ আপনাদিগকে অনেকদিন অবধি দিক করিয়াছিল।

কামিনী। পুলিশকে গরিবেরা ভয় করে, ধনীলোকে ভয় করে না। তবে কাহাকেও চালান না দিলে দারগাবাবুর চাকরি থাকে না, তাই পাঁচ সাতজন আমাদের মাহিনা-করা লাঠিয়াল

ধরিয়া দিলাম, তাহাদের শাস্তি হইয়া গেল, তজ্জন্য তাহাদের স্ত্রী-পুত্রকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলাম। যাহারা প্রকৃত আসামী তাহাদের সরাইয়া দিলাম, এবং হীরাসিং, লালসিং আর জওহরসিং, ইহারা রাত্রির মধ্যে রমণীকান্তের লাশ দাহ করিয়া ফেলিল, এবং দেশান্তর হইল।

সুমতি। সুন্দর বন্দোবস্ত! ইহার পর আপনার ভাবনার কারণ কি আছে? হাঙ্গামায় আপনি ছিলেন না প্রমাণ করিয়াছেন, যাহাদের থাকা প্রমাণ করিলেন, তাহারা জেলে গেল, আর চিন্তা কিসের? জটাধারী কি ত্রিংশৎ বৎসর পর আপনার বিরুদ্ধে সেই মকদ্দমা আবার উঠাইতে চাহে?

কামিনী। জটাধারী যে সেই হাঙ্গামার কথা জানে, তাহা আমার স্থির বিশ্বাস, সে সমস্ত শুনিয়াছে, সমস্ত জানে! কিন্তু সেজন্য আমি ভয় করি না। ত্রিংশৎ বৎসর পর পুরাতন মকদ্দমা উত্থাপন করিতে পারিবে, সে ভয় আমি করি না।

সুমতি। তবে কিসের ভয়?

কামিনী। রমণীকান্ত আমার সহিত বিরোধ আরম্ভ করিয়া অবধি তাহার স্ত্রীকে পোষ্যপুত্র লইবার অনুজ্ঞা-পত্র দেয়। গোঁয়ার ছেলে বোধ হয় বুঝিয়াছিল যে কোন দিন লাঠালাঠিতে তাহার প্রাণ যাইবে।

সুমতি। আপনি বুদ্ধিমান জমিদার হইয়া একটা বিধবা মেয়েমানুষকে ভয় করেন? আপনি সনাতনবাটীতে থাকিতে রমণীকান্তের বিধবা পোষ্য গ্রহণ করিবে?

কামিনী। সে পথ আমি বন্ধ করিয়াছি। রমণীকান্তের মৃত্যুর পর তাহার বিধবা যোগমায়ার নিকট সে অনুজ্ঞা-পত্র কাড়িয়া লইয়াছি, এবং তাহার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি তাহার নিকট লিখাইয়া লইয়াছি! কিন্তু আমি গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিয়াছি, এই জটাধারী সেই অনুজ্ঞা-পত্রের কথা জানে, এখন সেই কথা আদালতে প্রমাণ করাইবে, এবং আপন ছেলেটীকে পোষ্য স্বরূপ যোগমায়াকে দিবে। তাহার পর পুত্রের স্বত্বে তিন আনা জমিদারির মালিক হইয়া বসিবে! যেরূপ যোগমায়ার আচার-ব্যবহার দেখিতেছি, বোধ হয় সেই নির্লজ্জ বিধবাও বুঝি জটাধারীর গৃহলক্ষ্মী হইয়া বসিবে! যেরূপ জটাধারীর আচার-ব্যবহার দেখিতেছি, তাহার ধর্ম্মপ্রচার ষোল আনা ভণ্ডামি, উদ্দেশ্য জমিদার হইয়া বসিবে! থাক্‌তো সাবেক কাল, এমন বিধর্ম্মী দেশাচারভ্রষ্ট স্ত্রী-পুরুষকে আস্তো মাটীতে পুঁতে ফেলিতাম! কিন্তু এখন কি আমাদের ক্ষমতা আছে, না হিন্দুয়ানি আছে?

অনেকক্ষণ কথা কহিয়া কামিনীবাবুর গলা শুকাইয়া আসিয়াছে, এবং হিন্দুয়ানির দুর্দ্দশার জন্য হৃদয়ও ব্যথিত হইয়াছে, সুতরাং এক গ্লাস সুরা পান করিয়া গলাটা সিক্ত করিলেন, এবং হিন্দুয়ানি বজায় রাখিলেন। পরে ধীরে ধীরে আবার বলিতে লাগিলেন।—

এই আমাদের বিপদ, এখন যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহা সমস্ত কল্য বলি নাই, শ্রবণ করুন।

তালপুকুরের তারিণী মল্লিকের সম্প্রতি কাল হইয়াছে। তাহার সম্পত্তি সে পূর্ব্বেই স্ত্রীকে উইল করিয়া দিয়াছিল। শুনিলাম নাকি মরিবার সময় আর একটা উইল করিয়াছে, তদ্দ্বারা আপনার সমস্ত সম্পত্তি হেম ও শরৎকে দিয়া গিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ! অনাথা বিধবাকে কি কেহ এরূপ করিয়া ভাসাইয়া যায়?

সুমতি। ভাসিয়া আসিয়া নাকি সে বিধবা সনাতনবাটীতে কূলকিনারা পাইয়াছে?

কামিনী। গোপবালা নিরাশ্রয় হইয়া পরামর্শ লইতে আসিয়াছিল, আমিও সুপরামর্শ দিয়াছি।

সুমতি। এ অবস্থায় পরামর্শ ত সহজ। উইল রদ করিয়া নিরাশ্রয় বিধবার সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করুন, এবং সেই যৌবনক্লিষ্টা বিধবাটীকেও আপনি স্নেহদানপূর্ব্বক সান্ত্বনা করুন!

কামিনী। না হে, এ ঠাট্টার কথা নহে, এর ভিতর গুরুতর কথা আছে। সেই জটাধারী তারিণীর মৃত্যুর সময়ে ছিল,—বুড়ো উইল করিয়াই যে হঠাৎ মরিল, তাহাতে সন্দেহের কারণ আছে! জটাধারী বড় সহজ লোক নয়।

সুমতি। এ দেখ্‌ছি আপনাদের পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধি! কলিকাতা আপনাদের কাছে হার মানিয়াছে! তা জটাধারীর উপর খুনের দাবী চাপাইয়াছেন নাকি? সাবাস পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধি!

বীরগ্রামের হাঙ্গামা লইয়া সে আপনার উপর খুনের দাবী আনিবে,—না আপনি আগে থাকিতে তাহার নামে খুনের দাবী আনিয়াছেন! সাবাস!

কামিনী। আমি দাবী আনিব কেন? সে যে বড় কাঁচা কাজ হয়! গোপবালা জেলায় দরখাস্ত পাঠাইয়াছে যে তাহার স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুতে সন্দেহের কারণ আছে, সুতরাং সে বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। সুতরাং পুলিশ তদন্ত করিবে,—এবং পুলিশ আমাদের হাতে! জটাধারী যদি খুনের দাবীতে চালান না হয়, তবে আমি বৃথা এতদিন বিষয়কর্ম্ম করিলাম!

সুমতি। কামিনীবাবু, আপনি আমার নিকট বন্ধুস্বরূপ পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন, আমি বন্ধু হইয়া মিথ্যা পরামর্শ দিব না,—আপনি এ কার্য্যে একটু ভুল করিয়াছেন। এখনকার কালে এরূপ মিথ্যা খুনের দাবী টিকিবে না, শেষে আপনি বিপদে পড়িতে পারেন।

কামিনী। এটী আপনার ভুল। কলিকাতায় কি হয় জানি না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে যে কথা জানে, বিচারাসন পর্য্যন্ত সে কথা পঁহুছে না,—এই আমাদের আধুনিক বিচারের নিয়ম! কার ধান কে কেটে নিল গ্রামসুদ্ধ সকলে জানে, বিচারক মাথা চুলকাইয়া বুঝিতে পারিলেন না, বিপরীত বিচার করিলেন। জটাধারী নির্দ্দোষী বলিয়া দেশবিদেশে পরিচিত হউক না কেন, বিচারপতি তাহা জানিবেন না,—শিক্ষিত সাক্ষী যেমন বলিবে, অর্থলুব্ধ পুলিশ যেমন রিপোর্ট দিবে, তাহার বাহিরে বিচারকের যাইবার উপায় নাই, এই আধুনিক বিচারের নিয়ম। সাহেবেরা বিচারদেবীকে একটী ঠুলি পরাইয়া তাহার মূর্ত্তি করেন না? আমাদের বিচারপতিরাও চক্ষুতে ঠুলি পরিয়া এবং কাণে তুলা দিয়া আসন গ্রহণ করেন।

সুমতি। এ কথা সত্য, কিন্তু তথাপি, কামিনীবাবু সাবধান। ধর্ম্মপ্রচারককে খুনী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন না।

কামিনী। যদি নাই পারি! তথাপি ত কয়েক মাস জটাধারী মহাশয়কে হাবুডুবু খাওয়াইব, একটু বিলক্ষণ শিক্ষাদান করিব।

সুমতি। এও আপনাদের পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধি। মকদ্দমায় শেষে কিছু হইবে না,—কেবল হায়রাণ করিবার জন্য মকদ্দমা করা,—এ আপনাদের পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধি!

কামিনী। আর আপনারা কলিকাতার লোক বড় হায়রাণ করেন না,—এককোপে কাটেন। কেমন?

সুমতি। তা আমরা হিন্দুর ছেলে হয়ে আর কি করি? এককোপেই কাটিতে হয়। তা এখন সমস্ত অবস্থা বুঝিলাম, এখন কি করিতে হইবে বলুন?

কামিনী। বাল্যকাল হইতে আপনি আমার সুহৃদ, আমার পরামর্শদাতা, বিপদ আপদে আমার বন্ধু, এই মকদ্দমায় আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। আপনাকে বর্দ্ধমান যাইতে হইবে, আমার উকীলদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, এই বিষম মকদ্দমাটী আপনাকে স্বহস্তে চালাইতে হইবে। আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আপনার অসাধারণ উদ্ভাবন-ক্ষমতা, আপনার অসংখ্য বন্ধু ও আলাপী লোক,—এ সমস্ত আমার অপরিচিত নহে। আপনি কলিকাতার মধ্যে অদ্বিতীয় ধীসম্পন্ন এটর্নী, এবং আমার পরম সুহৃদ, এইজন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।

অনেকক্ষণ ধরিয়া মকদ্দমার কথা হইতে লাগিল, অনেক আলোচনার পর সমস্ত কার্য্যপ্রণালী ঠিক হইল। রাত্রি দুই প্রহরের পর সুমতিবাবু বিদায় লইলেন, যাইবার সময় কামিনীবাবুকে বলিলেন,—আপনি বর্দ্ধমানে যান, আমি হাতের কাজ সমাপন করিয়াই আসিতেছি, তাহাতে আর চিন্তা কি? বুদ্ধিমান সুমতিবাবু মনে মনে ভাবিলেন,—কামিনীবাবুর এ কাজটীতে সহসা হাত দেওয়া হইবে না। নির্দ্দোষী লোকের উপর খুনী মকদ্দমা চাপান,—কাজটা কিছু পাড়াগেঁয়ে রকম হইয়াছে। প্রথমে জজসাহেবের নিকট উইলখানা জাল প্রমাণ করিলেই হইত। তাহার পর জজসাহেবের অনুমতি লইয়া জটাধারী বেটাকে জালের মকদ্দমায় ফেলিলেই হইত। তা নয় গোঁয়ারের মত একেবারে খুনের মকদ্দমা চাপাইয়াছেন। কামিনীবাবুর শরীরখানিও যেমন স্থূল, বুদ্ধিখানিও সেইরূপ স্থূল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : খিড়কীর পুকুরে খোসগল্প

কলিকাতায় যখন এই সমস্ত আয়োজন হইতেছিল, সে সময়ে সনাতনবাটীতে অনেক ঘটনা হইয়া গিয়াছিল। কাহার নিকট সে সমস্ত ঘটনার সংবাদ পাইব, কে আমাদের সে সমস্ত কথা জানাইবে? দুঃখের বিষয় সনাতনবাটীতে সংবাদপত্রও নাই, সংবাদদাতাও নাই। অগত্যা আমরা আর একবার জমিদার-বাড়ীর খিড়কীর পুকুরে যাই,—তথায় প্রত্যহই গ্রামের সংবাদের রটনা হয়, এবং গ্রামস্থ লোকদিগের চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়!

প্রাতঃকালে সূর্য্য না উঠিতে উঠিতেই আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা নবীনার দল মধুর ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দে ঘাট প্রতিধ্বনিত করিলেন, রূপে ঘাট আলো করিলেন! সুন্দরী, রসিকা, ফুলকুমারী কাঁকাল হইতে কলস নামাইয়া একটু মুচ্‌কে হাসিয়া যাত্রার ছড়া কাটিতে আরম্ভ করিলেন,—

"ও লো, রাজবাড়ীতে কেমন কেমন কথা শুন্‌তে পাই,
ভস্মমাখা জটাধারী,—নাকি হবে নাতজামাই!"

বসন্তকুমারী। কে লো, কে জামাই হবে? তোর যে আজ বড় রঙ্গ দেখ্‌ছি! বলে,—

"মালিনী তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়!"

ফুলকুমারী। আমার আবার রঙ্গ কি? যার রঙ্গ করবার সময় হয়েছে, সে রঙ্গ করবে।

কুসুমকুমারী। সে কে লো? ভেঙ্গেই বল না, অত ঠেকার কিসের?

ফুলকুমারী। আমার আবার ঠেকার কিসের লা? যার ঠেকার হবার, তার ঠেকার দেখ্‌গে যা।

হেমকুমারী। বুঝেছি, বুঝেছি! তাই বুঝি বিদ্যাসুন্দরের ছড়া কাটছিলি? তা কথাটা কি সত্য নাকি? আমাদের বিদ্যাঠাকরুণ সত্য বৈষ্ণবী হয়ে বেরিয়ে যাবে না কি? বলে,—

"পান চির্‌তে জান না ধনি! শিখ্‌তে হবে সিদ্ধি ঘোঁটা!"

স্বর্ণকুমারী। আর "বিদ্যা" "বিদ্যা" করে ঢাকলে কি হবে? আগুন কি আর ছাই দিয়ে ঢাকা যায়? না আমাদের যোগমায়ার আচরণের কথা মুখে কাপড় দিয়া বন্ধ রাখা যায়?

হেমকুমারী। ও লো, নামটাম করিসনি লো,—শুনতে পেলে এখনই মহা কুরুক্ষেত্র লাগিয়ে দেবে।

স্বর্ণকুমারী। কিসের কুরুক্ষেত্র? আর সেদিন সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইলেন, আর যোগমায়াদিদি ঘোমটা দিয়ে পাশে দাঁড়াইয়া পাখা করিতে লাগিলেন,—তা কি কেউ দেখে নাই? আমরা কি চোখে ঠুলি বেঁধে ছিলাম?

বসন্তকুমারী। সত্য নাকি লো? সত্য?

ফুলকুমারী। সত্য নয় ত কি? আর যোগমায়াদিদি সন্ন্যাসী ঠাকুরের জন্য বাতাসা ভিজিয়ে রাখেন, পানফল ছাড়িয়ে রাখেন,—তুই দেখ্‌ছিস্‌ কি? সন্ন্যাসীর ঘরের লক্ষ্মী হয়েছেন,—কবে মালা বদল করিয়া গেরুয়া-বসন পরিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া বাহির হয় দেখ!

হেমকুমারী। না লো না, যোগমায়াদিদি আবার গেরুয়া-বসন পরবে! তোরা তবে সব দেখিস্‌নি বুঝি?

সকলে। কি? কি? কি?

হেমকুমারী। সব চোখ বুজিয়ে থাক্‌বি ত দেখ্‌বি কি? আমি সেদিন সন্ধ্যার সময় যোগমায়াদিদির ঘরে উঁকি মেরে দেখি, ওমা! দেখি না, দড়ীতে একখানি নূতন কালাপেড়ে সাড়ী ঝুল্‌ছে! ওমা, আমি ত দেখে অবাক! আজ তিরিশ বছর বিধবা হয়েছে, থানকাপড় পরেছে, এখন কিনা পাড়ওলা কাপড় পরিবার সাধ হইয়াছে? ওমা, কোথা যাব মা! যোগমায়াদিদির মনে এত ছিল?

স্বর্ণকুমারী। আরও কত দেখ্‌বি লো, আরও কত শুন্‌বি! তোরা কাণে তুলা দিয়া থাকিস তা সব কথা শুন্‌বি কোথা থেকে? সব কথা ত শুনিস্‌ নি।

সকলে। কি, কি, বল না স্বর্ণদিদি?

স্বর্ণকুমারী। বলি ঐ যে বেণেবৌ আমাদের বাড়ীতে আসে না? তাকে জিজ্ঞাসা করিস্‌।

যোগমায়াদিদি নাকি বেণের দোকান থেকে মাথাঘসা আনিয়াছে, মেতি আনিয়াছে, আরও কত কি কিনেছে! আহা বেশ! বেশ! বেশ! ও লো, বুড়ো হলে কি মনের সাধটুকু মেটে, তা মেটে না! যোগমায়াদিদির সাধটুকু আবার গজিয়ে উঠ্‌ছে!

ফুলকুমারী। ও লো, সুধু মাথাঘসা নয় লো, আরো কত কি দেখ্‌বি।

সকলে। আর কি গা দিদি?

ফুলকুমারী। ও লো, ঐ নাপতের বৌ আমাদের বাড়ী আসে না? তাকে জিজ্ঞাসা করিস্‌, কত শুনবি এখন! কোন দিন বা যোগমায়াদিদি পায়ে আলতা দিয়ে, দাঁতে মিশি দিয়ে দর্শন দিবেন! দিদির কাঁচা বয়স ফিরে আস্‌ছে লো! কথায় বলে,—

“জীবন যৌবন গেলে কি ফেরে?”

তা যোগমায়াদিদির ফিরেছে! যোগমায়াদিদির বড় কপালের জোর লো, বড় কপালের জোর!

স্বর্ণকুমারী। সত্য লো, সে কথা সত্য। যোগমায়াদিদির চুলে এখন একটু বেশ তেল পড়ে, আবার শুনছি নানারূপ বেশভূষার আয়োজন হইতেছে! ঐ তাঁতিবৌ আমাদের বাড়ী আসে না? তাকে জিজ্ঞাসা করিস। ওমা! যোগমায়াদিদি নাতি তাঁতিবৌকে রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী সব আনতে বলেছে। অবাক করলে মা! কোথা যাব মা? ইত্যাদি।

নবীনার দল কলস লইয়া চলিয়া না যাইতে যাইতেই একদল মধ্যবয়স্কা নারী উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদেরও আজ ঢের কথা,—সনাতনবাটীতে আজকাল নানা বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে।

মাতঙ্গিনী। ও লো, আজ যে বড় তোদের হাসিখুসি দেখ্‌ছি। কি, কথাটা কি?

তরঙ্গিণী। ও লো, তা জানিসনি? এই যে বিয়েতে আমরা জল সইতে যাব।

মাতঙ্গিনী। কার বিয়ে লো, কার বিয়ে?

রাধারঙ্গিণী। ওমা, তা জানিসনি? তুই কি এই বয়সে চখের মাথা খেয়েছিস নাকি? বলি কিছু ঠাওর করতে পারিসনি?

মাতঙ্গিনী। কৈ, আমি ত বাড়ীর কারও বিয়ের কথা শুনি নাই।

কৃষ্ণসঙ্গিনী। ও লো, এসব বিয়ের কি কথা হয়,—এসব বিয়ে আগে হয়, তারপর কথা উঠে! ঐ যে তালপুকুরে মল্লিকদের বাড়ী একটা মেয়ে বিধবা হয়ে আবার বিয়ে করেছিল না? এবার আবার আমাদের জমিদার-বাড়ীতেই তাই বুঝি হয়!

মাতঙ্গিনী। সে কি? বিধবা হলে কি আবার বিয়ে হয়? তালপুকুরের তারা নাকি একঘরে হয়ে আছে?

তরঙ্গিণী। তা হলেই বা একঘরে। অমন রূপবান সন্ন্যাসীকে নিয়ে সে ত বেরিয়ে যাবে,—তারপর গাঁয়ের লোক একঘরে করলেই বা!

মাতঙ্গিনী। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কার বিয়ে হবে লো?

রাধারঙ্গিণী। বলি তুই কি কচি খুকি লা? আমাদের যোগমায়ার রকমসকম দেখিসনি? ছি! ছি! অমন মেয়েরও মুখে আগুন! সন্ন্যাসীরও মুখে আগুন!

কৃষ্ণসঙ্গিনী। কচি খুকি না কচি খুকি! বলি ঐ সেকরাদের ছেলেটা কাল আমাদের বাড়ী এসেছিল, তা তুই কি দেখিসনি?

মাতঙ্গিনী। হাঁ হাঁ, তা দেখেছি। সে ছোঁড়াটা এসেছিল কেন?

কৃষ্ণসঙ্গিনী। ওমা, তা জানিসনি? সেকরাদের ছেলেটা এসে ফিস ফিস করে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের যোগমায়ার সঙ্গে কথা কহিতেছিল। আমি অমনি থোকার ঝিকে পাঠিয়ে দিলাম, বলি যা ত, কি বলছে শোন ত। খোকার ঝি কলাগাছের আড়ালে থেকে সব শুনেছে!

মাতঙ্গিনী। কি বলছিল দিদি, যোগমায়া কি গয়না করতে দিয়েছে?

কৃষ্ণসুন্দরী। ও লো, গয়নার বাড়া! সেকরাকে একগাছা হাতের নো তৈয়ার করতে বলেছে! বিধবা হয়ে আবার বিয়ে করবে, আবার ঘোমটা দিয়ে বৌ হবে, আবার হাতে নো পরবে, গায়ে গয়না পরবে, এ বয়সে আবার ছেলের মা হবে! মুখে আগুন! মুখে আগুন! যম কি এমন বিধবাদের ভুলে থাকে? পোড়ারমুখী চল্লিশ পেরিয়ে আবার নাকে নথ পরবে, পায়ে মল পরবে, কালাপেড়ে সাড়ী পরে সন্ন্যাসীর ঘর করবে! মুখে আগুন! মুখে আগুন!

রামরঙ্গিণী। ও লো, মল পরাবে লো, মল পরাবে! কাল সন্ধ্যার সময় লোহার মল নিয়ে সব এসেছে, মল পরবার আশা মেটাবে।

সকলে। কে এসেছে দিদি? কে এসেছে?

রামরঙ্গিণী। তা বুঝি জানিসনি? ঐ যে পুলিশের দারোগা এসেছে; লালপাগড়ী বেঁধে সব পাহারাওয়ালা এসেছে!

সকলে। কি সর্ব্বনাশ! ওমা কি হবে গা? দারোগা কেন এসেছে দিদি?

রামরঙ্গিণী। শুনেছি নাকি কর্ত্তাবাবু দারোগা মশাইকে ডাকাইয়াছেন, ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বেঁধে বর্দ্ধমানে নিয়ে যাবে। যোগমায়ার রকমসকম দেখে কর্ত্তাবাবু নাকি বড়ই রেগেছেন, বোধ হয় বর্দ্ধমানে সাহেবদের কাছে বলেছেন, সাহেবেরা হুকুম দিয়েছে—সন্ন্যাসীকে আর যোগমায়াকে বেঁধে বর্দ্ধমানে নিয়ে আয়!

সকলে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ছি! ছি! জমিদারের বাড়ীর বৌ হয়ে যোগমায়া এমন ঢলানটা ঢলালে। শেষে পুলিশে পর্য্যন্ত এ কলঙ্ক রাষ্ট্র হল! ছি! ছি! ছি!

মধ্যবয়স্কাদিগের দল কলস লইয়া চলিয়া গেলেন,—তাহার পর প্রাচীনাদিগের দল আসিলেন। তাঁহাদেরও ঐ কথাবার্ত্তা, সনাতনবাটীতে পুলিশ আসিয়াছে, সুতরাং ঐ বিষয় ভিন্ন গ্রামে আজ অন্য কথা নাই।

শ্যামাসুন্দরী। ও লো, আর শুনেছিস? ঐ তালপুকুরে পুলিশের দারোগাবাবু এসেছিল, সে নাকি কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের গ্রামে আসিয়াছে?

বামাসুন্দরী। কেন লো? পুলিশ আবার কেন? ওমা, শুনলে যে গা কাঁপে।

শ্যামাসুন্দরী। তা আসবে না তো কি? গ্রামের যেমন রীতিপদ্ধতি হয়েছে, পুলিশ না এসে আর কি করে। ঐ সে বছর নাকি তালপুকুরের হেমবাবুর ঘর থেকে একটা বিধবা মেয়েকে বার করে শরৎবাবু বিয়ে করেছে। আবার এই জমিদার-বাড়ীতে শুনছি ঐ পোড়ামুখো সন্ন্যাসীটা নাকি সেই তল্লাসে ঘুরছে। কর্ত্তাবাবু গ্রাম থেকে গিয়ে অবধি সন্ন্যাসীটার স্পর্দ্ধা বেড়েছে, এখন নাকি বলেছে, আমাদের যোগমায়ার গলায় মালা দিয়ে তাকে বের করে নিয়ে যাবে! ওমা, ছি! ছি! ছি! তা কর্ত্তামশাই নাকি বর্দ্ধমানে সাহেবদের তাই বলে দিয়েছেন!

বামাসুন্দরী। ওমা, কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্নার কথা!

শ্যামাসুন্দরী। তাতে আবার লজ্জা কি লো? কলির যে রীতিই তাই!

হরসুন্দরী। ও লো, তা নয় লো তা নয়। সেজন্য পুলিশ আসেনি লো, সে জন্য নয়!

সকলে। তবে কিসের জন্য দিদি?

হরসুন্দরী। কর্ত্তাবাবু আমার নাড়ুগোপালকে একদিন বলেছিলেন, সন্ন্যাসীটা নাকি দাঙ্গা করে, খুন করে, লোককে ঔষধ খাওয়ায়, সব করিতে পারে। তাই পুলিশ এসেছে লো!

কৃষ্ণসুন্দরী। না লো তা ত নয়, তা নয়! ঐ যে তালপুকুর থেকে মল্লিকদের বৌ আমাদের বাড়ী এসেছিল না?—আহা বাছার কপাল ভেঙ্গে গেছে, এ বয়সে বিধবা হয়েছে!—তার সঙ্গে বড়গিন্নী একদিন কথাবার্ত্তা করছিলেন, তখন আমার বড়বৌ সেইখানে ছিল। তা মল্লিকদের বৌ বলছিল যে ঐ ওদের গ্রামে যে হেমবাবু আছে, সে নাকি মল্লিকদের সব বিষয় ঠকিয়ে নিয়েছে! তাই পুলিশ এসেছে গো, তাই পুলিশ এসেছে।

ত্রিপুরাসুন্দরী। ও গো, না গো, তা নয়। আমাদের বিলাসকামিনী এর ভিতরের কথা সব জানে। আমার বিলাসকামিনীর যে বছর বিয়ে হয়, সেই বছর আমাদের বাড়ীর রমণীবাবু খুন হয় না?

হরসুন্দরী। হাঁ হাঁ। আর বাছা নাড়ুগোপালের সেই মাসে ভাত হয় গো, সেই মাসে তার ভাত হয়। তা ভাতের সব আয়োজন,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৃষ্ণসুন্দরী। ঠিক বলেছ দিদি, ঠিক বলেছ, সেই মাসে আমার বড়বৌয়ের সাধ হয়। আহা রমণীবাবু আমার বৌকে কত সামগ্রী দিত,—তা সে খোকার মুখ দেখেও যেতে পারলে না গো,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ত্রিপুরাসুন্দরী। তা সেই খুনী মকদ্দমা পুলিশ নাকি এতদিনে সন্ধ্যান পেয়েছে, তাই এসেছে। আহা এমন ছেলেও খুন হয়, সে আমার বিলাসকামিনীকে কত ভালবাসত, বাছা বিয়েটাও দেখে যেতে পেলো না গো,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : পুলিশ-তদন্ত

খিড়কীর পুকুরের খোসগল্প হইতে আমরা জানিয়াছি যে প্রথমে তালপুকুরে, তৎপরে সনাতনবাটীতে পুলিশের আগমন হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পুলিশ-তদন্ত সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

বর্দ্ধমানে ভূতপূর্ব্ব নাজির তারিণী মল্লিকের সহসা মৃত্যু হইয়াছে, গ্রামের লোকে সন্দেহ করে, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সন্দেহ করে যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক,—শিক্ষিত, উন্নত-চরিত্র রমাপ্রসাদ সরস্বতী দোষী কি নির্দ্দোষী,—এ গুরু বিষয় তদন্ত করিতে অসীম ক্ষমতাশালী জমাদার মহাশয় গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

জমাদার পশ্চিমের লোক, ভাল বাঙ্গালাও জানেন না, ভাল হিন্দিও জানেন না,—তাঁহার বৃহৎ শরীর ও বৃহৎ গোঁপ দেখিয়া বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জমাদার করিয়াছেন! তাঁহার বেতন ১৫ টাকা, ১৫ টাকার উপযুক্ত তদন্ত হইল। অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, সরস্বতী ঠাকুরকে দুই চারিটা তিরস্কার করা হইল, সন্ধ্যার সময় জমাদার মহাশয় থানায় ফিরিয়া গেলেন।

দারোগা। কি হইল?

জমাদার। মৃত্যুতে বহুত সন্দেহ আছে।

দারোগা। কিরূপ সন্দেহ?

জমাদার। বোধ হয় দাওয়াই দেকে খুন কিয়া হোগা।

দারোগা। কে খুন করিয়াছে?

জমাদার। বোধ করি রমাপ্রসাদ নামে একঠো সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীঠো বহুত বদমাস আছে। সাহেবকো পাস আপনি রিপোট লিখুন কি বদমাস রেজিষ্টারিমে উন্‌কো নাম লিখা যায়।

দারোগা। কি বদমাইসী করিয়াছে?

জমাদার। সে পুলিশ ডরায় না। হামাকে দেখ্‌কে সবকোই ডরায়, সে কিছু ডরায় না। জমাদারের সওয়ালে সে হাসে, এয়সা বদমাস!

দারোগা। তা তদন্তে স্থির হইল কি? খুন সত্য না মিথ্যা?

জমাদার। ঠিক কেমন করে হইবে? ভদ্রলোক আসামী হইলে কি খুন আসকারা হোয়? গরিবলোক হোয় তো ডরসে জল্‌দি কবুল করান যায়,—বস্‌ কবুল জবাব লিখ্‌কে খুনি-মকদ্দমা চালান দে।

দারোগা। দূর্ মেড়ুয়াবাদী! এখন কেবল কবুলে কি খুনি-মকদ্দমা প্রমাণ হয়?

জমাদার। হয় না ত কি? খুনি-মকদ্দমায় কবুলি আসামী লোক কো ডিপুটী বাবু ছোড় দেনে সক্‌তা?

দারোগা। আরে ডিপুটী বাবু যেন দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। দায়রায় কি হয়? জজ সাহেব যখন ছাড়িয়া দেবেন তখন কি হবে?

জমাদার। আরে আসামী দায়রা সুপর্দ্দ হইলে তো হামলোক কো কাম তামাম হইল। জুরি লোক যব আসামী খালাস দেয়, তব হামলোকক্কা সাহার গবর্ণমেণ্টমে রিপোট করেগা কি জুরি লোক গাধা আছে!

দারোগা মহাশয় দেখিলেন, জমাদার মেড়ুয়াবাদী হইলেও বুদ্ধিমান বটে! যাহা হউক, এ মকদ্দমায় বিশেষ সন্দেহের কারণ থাকায় দারোগা মহাশয় নিজেই তদন্তে বাহির হইলেন।

জমাদার যেরূপ দেখিতে পালওয়ান, দারোগা মহাশয় সেইরূপ ক্ষুদ্র, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, কিন্তু বুদ্ধিটুকু বড়ই তীক্ষ্ণ। দারোগা বাবু বাখরগঞ্জের লোক, বাখরগঞ্জের কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর ভৃত্য থাকিয়া পুলিশকার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাহার পর কিছুদিন কুলীর রিক্রুটর হইয়াছিলেন, শেষে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে পুলিশে চাকরি পাইলেন। কয়েক বৎসর জমাদারী করিয়া দারোগাগিরি কার্য্য পাইলেন, এবং কার্য্যদক্ষতায় কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতেন। নিজ গ্রামে পাকা ইমারত প্রস্তুত হইতেছে, পুষ্করিণী, বাগান প্রস্তুত হইতেছে। বাড়ীতে যথেষ্ট টাকা পাঠান, গৃহিণীর সোণার গহনার অভাব নাই, ছেলেপুলেদের

কাপড়চোপড় অতি উৎকৃষ্ট। তদ্ভিন্ন থানার নিকট একটী সদ্গোপ বিধবা বাস করিত, তাহার জন্য ১২ ভরির সোণার চন্দ্রহার সেকরা তৈয়ারি করিতেছে। দারোগা মহাশয়ের একটী ঘোড়া আছে, এবং বামুন, চাকর ও সইস থানায় বাস করে। দারোগা মহাশয়ের বেতন মাসে ৩০ টাকা।

দারোগা মহাশয় বিশেষ তদন্ত করিতে লাগিলেন। ঘনঘন ডাইয়ারি পাঠাইতে লাগিলেন, ডাইয়ারির লেখা অতি সুন্দর, অতি পরিষ্কার, এবং অনিন্দনীয়। তদন্তে স্থির হইল যে রমাপ্রসাদ তারিণীবাবুকে ঔষধির পরিবর্ত্তে বিষ খাওয়াইয়াছেন, তাহাতেই তারিণীবাবুর সহসা মৃত্যু হইয়াছে! প্রমাণ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমে সন্ন্যাসীটাকে হাতে হাতকড়ি দিয়া বর্দ্ধমানে চালান দিতেছেন, এমন সময় ইন্সপেক্টর বাবু গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

ইন্সপেক্টর বাবু শিক্ষিত যুবা, কলেজে পড়িয়াছেন, ভদ্রঘরে জন্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে। বর্দ্ধমানে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত, তাঁহার দ্বারা মকদ্দমা তদন্ত হয় বলিয়া পক্ষেরা সর্ব্বদা আদালতে আবেদন করিত। তিনি তালপুকুরে মল্লিকদের বাড়ী আসিয়া দেখিলেন দারোগা বাবু বসিয়া ধূম পান করিতেছেন,—সম্মুখে রমাপ্রসাদ দণ্ডায়মান,—হাতে হাতকড়ি।

দেখিয়াই তাঁহার আপাদমস্তক শরীর জ্বলিয়া গেল, কর্দ্দমসুদ্ধ জুতার আস্বাদন দারোগা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ দান করিতে তাঁহার বড়ই প্রবৃত্তি হইল,—কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা সম্বরণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কি?

দারোগা তখন মাথা চুলকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—খুনি-মকদ্দমায় আসামী চালান দিতেছিলাম,—তা আপনি আসিয়াছেন,—যাহা আজ্ঞা হয় করিব।

ইন্সপেক্টর বজ্রনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রমাপ্রসাদ সরস্বতী খুনের অপরাধী! এই তুমি তদন্তে জানিয়াছ!

দারোগা বড় কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না।

ইন্সপেক্টর স্বয়ং আসামীর হাতকড়ি খুলিয়া দিয়া বলিলেন,—ক্ষমা করুন, আপনার উপর যে অভদ্রাচরণ করা হইয়াছে, তাহার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

রমাপ্রসাদ। ক্ষমাপ্রার্থনার কিছুই নাই। দারোগা মহাশয় বোধ হয় নিজের কর্ত্তব্যসাধন করিতেছিলেন মাত্র।

ইন্সপেক্টর। ঐ কথাটী উচ্চারণ করিবেন না। দেশের যত বদ্‌জাত প্রতারক লোকে আজকাল "কর্ত্তব্যসাধন" করিবার ভাণ করিয়া দেশ প্রতারণায় উচ্ছন্ন করিল! যাহা হউক, আপনি আজ জামিন দিয়া গৃহে যান, আমি মকদ্দমার কাগজপত্র দেখি, আপনাকে আবশ্যক হইলে পুনরায় তলব করিব।

ইন্সপেক্টর বাবু দারোগাকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন, আপনি সমস্ত প্রমাণের কাগজ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেন। সেই প্রমাণের কথা রিপোর্ট করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আপন মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন যে বিষপ্রয়োগ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ সমস্ত মিথ্যা এবং গ্রামের জমিদারদ্বারা সৃষ্ট; তারিণীবাবুর রোগে মৃত্যু হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ আদেশ পাঠাইলেন,—বিষপ্রয়োগদ্বারা হত্যা মকদ্দমার যখন প্রমাণ রহিয়াছে, ইন্সপেক্টর অবিলম্বে বিচারার্থ মকদ্দমা চালান দিবেন। প্রমাণ সত্য কি মিথ্যা আদালতে প্রকাশ পাইবে।

রোষে ও দুঃখে অশ্রুজল মোচন করিয়া ইন্সপেক্টর বাবু মকদ্দমা চালান দিলেন, নিজের ব্যয়ে গরুর গাড়ী করিয়া আসামীকে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দিলেন।

বিপদে আপদে রমাপ্রসাদের মুখ এক মুহূর্ত্তের জন্য কেহ ম্লান দেখে নাই, ভয়ে সে গম্ভীর প্রসন্নমুখ একদিনের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হয় নাই। বর্দ্ধমানে গমনকালে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বৎস, বড় সমারোহে বর্দ্ধমানে বেড়াইতে যাইতেছি, চিন্তিত হইও না, কুশলে ফিরিয়া আসিব! সজল নয়নে দেবীপ্রসাদ পিতার চরণ ধরিয়া বিদায় লইল।

পরে রমাপ্রসাদ হেমচন্দ্রের চক্ষুতে জল দেখিয়া বলিলেন,—হেমচন্দ্র, অশ্রুজল মোচন কর, শত্রুরা যেন মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের কাতরতা-চিহ্ন না দেখিতে পায়,—পাপ ভিন্ন ভয়ের অন্য কারণ নাই! পরে হেমচন্দ্রকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া এই মকদ্দমা সম্বন্ধে যাহা যাহা করিতে হইবে, স্থির অবিচলিত চিত্তে তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

হেম বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া সেই রাত্রিতেই বর্দ্ধমানে আসিলেন, এবং পরদিন প্রাতের গাড়ীতে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ : বিচার-গৃহ

বর্দ্ধমানের বিচার-গৃহ আজি বড় শোভাময়। তারিণীবাবুর মৃত্যুর মকদ্দমার আজি বিচার হইবে! জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তারিণীবাবুকে জানিতেন, বড় অনুগ্রহ করিতেন, পেন্সন লইতে তারিণীবাবু বর্দ্ধমানে আসিলে তাঁহাকে আপনার খাস কামরায় ডাকিয়া বসাইতেন, তাঁহাকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট করিবেন এরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারিণীবাবুর মৃত্যুর সংবাদে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তারিণীবাবুর বিধবার দরখাস্ত পাইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সম্ভ্রান্ত তালুকদার ও জমিদারকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে? এক অজ্ঞাত পশ্চিমে সন্ন্যাসী এই নৃশংস কার্য্য করিয়াছে? নিরাশ্রয়া বিধবাকে অকূলসাগরে ভাসাইয়া মুমূর্ষুর নিকট উইল দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি অন্যের নামে লিখাইয়া লইয়াছে? তারিণীবাবুর মৃত্যু না হইতে হইতেই সে বিধবাকে গ্রাম হইতে সনাতনবাটীতে তাড়াইয়া দিয়াছে? এরূপ নৃশংস হৃদয়শূন্য মানবাকৃতিধারী হিংস্রক পশু কি জগতে থাকিতে পারে? রোষে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল, তিনি ভাল করিয়া পুলিশ-তদন্তের আদেশ দিলেন।

দারোগা বাবু যে ডাইয়ারি পাঠাইলেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সমস্ত আদ্যোপান্ত পড়িলেন,—পড়িয়া তুষ্ট হইলেন। ইন্সপেক্টর বাবু যে রিপোর্ট পাঠাইলেন, তাহা তিনি ক্রোধে ফেলিয়া দিলেন,—বলিলেন, এ মকদ্দমার বিচার হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, এখনই চালান দাও। সন্ধ্যার সময় খেলিবার স্থানে পুলিশ সাহেবের সহিত তাস খেলিতে খেলিতে বলিলেন,—তোমার ঐ দারোগাটী আমার জেলার মধ্যে কার্য্যদক্ষ, তোমার ইন্সপেক্টরটী বড় গাধা।

গুড ফ্রাইডের ছুটীতে মকদ্দমা আসিয়া পঁহুছিল। দারোগা মহাশয় সাক্ষী লইয়া নিজেই হাজির, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গিয়া আবেদন করিলেন,—অদ্যই প্রমাণ লেখা হউক, নচেৎ সাক্ষী খারাপ হইয়া যাইতে পারে, আসামী বড় ফেরেববাজ ও কুলোক, সাক্ষী হাত করিতে পারে! পুলিশের মকদ্দমা পোলাওয়ের মত তপ্তই ভাল, ঠাণ্ডা হইলে খারাপ হইয়া যায়! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরও ইচ্ছা তখনই বিচার আরম্ভ হয়,—কিন্তু তিনি ন্যায় অন্যায় জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ছিলেন না। ছুটীতে উকিল-মোক্তার বাড়ী গিয়াছে, এই ছুটীর সময় মকদ্দমার বিচার করিলে আসামীর প্রতি নিতান্ত অন্যায় হইবে জানিয়া বিচার তিন দিনের জন্য মুলতুবি রাখিলেন।

আসামীকে জামিনে ছাড়িয়া দিবার জন্য একজন ক্ষুদ্রকায় ক্ষীণজীবী মোক্তার দরখাস্ত করিলেন,—তর্ক করিলেন যে প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আসামীকে হাজতে দেওয়া আইন ও হাইকোর্টের মতের বিরুদ্ধ। সাহেব তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি? খুনি-মকদ্দমার আসামীর জামিন প্রার্থনা? তোমার স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোককে হত্যা করা হইয়াছে, সেই মকদ্দমায় আসামীকে উচিত দণ্ডবিধানের জন্য মকদ্দমা হইতেছে, আর তুমি তারিণীবাবুর বন্ধু,—তুমি তারিণীবাবুর স্বদেশীয় লোক,—তুমি সেই তারিণীবাবুর হত্যা-মকদ্দমার আসামীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছ? তাহার জামিন প্রার্থনা করিতেছ? আমি বিস্মিত হইলাম! সাহেবের ভাবগতিক দেখিয়া ক্ষুদ্রকায় মোক্তার মহাশয় চারিদিকে সরষে ফুল দেখিলেন,—আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, বাম হস্তে শামলা ধরিয়া সেলাম ঠুকিয়া চম্পট দিলেন।

ছুটীর কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। দারোগা মহাশয় বড়ই চিন্তায় সে কয়দিন কাটাইলেন, পাছে সাক্ষীদিগকে কেহ হাত করে, পাছে তালপুকুর হইতে কোনও লোক সাক্ষীদের সহিত দেখা করে, পাছে রমাপ্রসাদের দেবতুল্য চরিত্র ও নির্দ্দোষতা আলোচনা করিয়া সাক্ষীদিগের মন আপনা হইতে ফিরিয়া যায়! ছোট ডিঙ্গিতে চড়িয়া জাল ফেলিয়া জেলেভায়া যখন বড় বড় কাতলা মাছ ধরেন,—কাতলা মাছ যখন ধড়ফড় করিতে থাকে, জালই ছেঁড়ে কি ডিঙ্গিই ডোবে,—তখন জেলেভায়া যেরূপ উৎসুক হয়েন, দারোগা মহাশয় আজ সেইরূপ উদ্বিগ্ন! যে কাতলা মাছ তাঁহার জালে পড়িয়াছে, ইহা নিরাপদে ডিঙ্গিতে তুলিতে পারিলে তাঁহার লাভের শেষ নাই, বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যে পদ ও বেতন বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু এ বিষম কাতলা! জটাধারীকে কেহ চেনে না, উহাকে সন্দিগ্ধ লোক বলিয়া প্রমাণ করা বড় কঠিন নহে, দারোগা মহাশয় এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু মকদ্দমা হইয়া অবধি সরস্বতী ঠাকুরের যশ আরও চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। দারোগা বাবুর ডিঙ্গি বুঝি ডোবে!

ছুটীর কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। সাহেব-মহলে সে কয়েকদিন ঐ মকদ্দমার অনেক কথা হইত। তারিণীবাবুকে সাহেবেরা চিনিতেন, তারিণীবাবুর হত্যায় সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, আপনাদিগের শাসনকার্য্যের গ্লানি বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। তীব্রস্বরে পুলিশ সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—সেই হত্যাকারী সন্ন্যাসী যদি এ মকদ্দমায় খালাস পায়, তাহা হইলে বঙ্গদেশে মনুষ্যের জীবন ও সম্পত্তি আর নিরাপদে থাকিবে না।

ছুটীর কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। সে কয়েকদিন বর্দ্ধমানের দোকানে, বাজারে, ভদ্রলোকের গৃহে গৃহে, এই কথা লইয়া বিশেষ আন্দোলন। তারিণীবাবুর খুনের কথা শুনিয়া প্রথমে সকলেই বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, ক্রমে আসল কথা প্রকাশ পাইতে লাগিল, লোকে কামিনীকান্তবাবুর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল, দারোগা বাবুর চালাকির উল্লেখ করিতে লাগিল! বাজারে দারোগা বাবুর মুখ দেখান ভার হইল,—তিনি সাহেব-মহলেই প্রায় মুখ দেখাইতেন।

ছুটীর কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। আজি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারাসনে বসিয়াছেন, তিনি স্বয়ং এই মকদ্দমা বিচার করিবেন! ইতর ভদ্র অনেক লোকে আজ বিচারগৃহ পূর্ণ, বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব নাজিরের মৃত্যুর মকদ্দমা সকলেই দেখিতে আসিয়াছে, বাজারের লোক বারাণ্ডায় ও চারিদিকের মাঠে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! মাজিষ্ট্রেট সাহেব গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে পুলিশ সাহেব বসিয়াছেন, তিনি মকদ্দমা চালাইতে আসিয়াছেন। কোর্ট বাবু কনষ্টবল সহ বর্ত্তমান, আমলা কেরাণী আজ কাজকর্ম্ম ফেলিয়া এই বৃহৎ মকদ্দমা দেখিতে আসিয়াছে! উকিল মহাশয়দের মধ্যে কেহ বাকী নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ অনুসারে উকিল সরকারমহাশয় এই মকদ্দমা চালাইবার জন্য উপস্থিত। তাঁহার বিজ্ঞ আকৃতি ও বিজ্ঞ প্রকৃতি বর্দ্ধমানে কে না জানে, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি বর্দ্ধমানে কাহার অপরিচিত?

তাঁহার নিকট গম্ভীরাকৃতি উমাপ্রসন্নবাবু আসীন রহিয়াছেন,—বর্দ্ধমান জেলায় উমাপ্রসন্নবাবুর ন্যায় কাহার যশ, কাহার নাম, কাহার অভিজ্ঞতা? লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সদয়, সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠে বাস করেন, মান-মর্য্যাদা, বিদ্যা, ধন, গৌরব, সকল বিষয়েই উমাপ্রসন্নবাবু ভাগ্যবান। উমাপ্রসন্নবাবুর সমকক্ষ হওয়া উকিলদিগের উচ্চাভিলাষ, উমাপ্রসন্নবাবুকে নিযুক্ত করা ধনী জমিদারদিগের আকাঙ্ক্ষা, উমাপ্রসন্নবাবুর ন্যায় বড়লোক হওয়া বর্দ্ধমানের বিদ্যালয়ের বালকদিগের বাল্যস্বপ্ন!

তাঁহার পার্শ্বে ক্ষীণশরীর সূক্ষ্মবুদ্ধি চতুর পদ্মলোচনবাবু বসিয়াছেন,—কার্য্যদক্ষতায় বল, ক্ষমতায় বল, সাহেবদিগের নিকট মান-মর্য্যাদায় বল, গবর্ণমেণ্টের নিকট সুনামে বল,—পদ্মলোচনবাবুর ন্যায় বর্দ্ধমানে কে আছে? বর্দ্ধমান সহরের লোক তাঁহার আদেশ শিরোভূষণ করিয়া মানে, পল্লীগ্রামের লোকে তাঁহার অনুগ্রহ অপেক্ষা করে!

তাঁহার নিকট প্রবীণ, বুদ্ধিমান, অমায়িক, মিষ্টভাষী শ্যামলালবাবু; শ্যামলালবাবু সকলের প্রিয়, যে তাঁহাকে জানে সে তাঁহাকে আদর করে, তাঁহাকে ভালবাসে, তাঁহার প্রিয় কথায় তুষ্ট হয়, তাঁহার সৎপরামর্শে উপকৃত হয়। তাঁহার পার্শ্বে,—আর কত নাম করিব? পদ্মসরোবরের ন্যায় আজ বিচারগৃহ শোভা পাইতেছে,—শামলা-পরিধায়ী উকিল মহাশয়গণ যেন পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছেন।

রমাপ্রসাদের দীর্ঘ-জটাচ্ছাদিত তীব্র নয়ন দেখিয়া লোকে আরও বিস্মিত হইল। যাঁহার শাস্ত্র-শিক্ষা অসাধারণ, বেদ-বেদান্ত যাঁহার কণ্ঠস্থ, সরস্বতী যাঁহার ওষ্ঠে বাস করেন, যিনি কাশী বৃন্দাবন পর্য্যটন করিয়াছেন, যিনি প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রমেও দৈববল ধারণ করেন, যিনি জীবনের শেষাবস্থা ধর্ম্মশিক্ষা দানে অতিবাহিত করিতেছেন, সেই প্রাচীন ঋষিতুল্য মনুষ্য কি তারিণীবাবুর হত্যাকারী? এই প্রশান্ত দেবতুল্য ললাটে কি হত্যাকারী শব্দ অঙ্কিত আছে?

বড় বড় উকিল সমস্ত বাদীর পক্ষে,—আসামীর পক্ষে সেই ক্ষুদ্রকায় ক্ষীণজীবী মোক্তার। তিনি মাজিষ্ট্রেটের ভাবগতিক দেখিয়া, অনেক কষ্টে একখানি দরখাস্ত দাখিল করিলেন।

দরখাস্ত এই যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং তারিণীবাবুকে জানিতেন, সনাতনবাটীর জমিদার কামিনীকান্তবাবুকেও জানেন। তারিণীবাবুর বিধবা ও কামিনীকান্তবাবু এই মকদ্দমায় প্রকৃত বাদী। অতএব মকদ্দমাটী মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে বিচার না করিয়া অন্য বিচারকের হস্তে দিলে

ভাল হয়। যদি মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহা না করেন, তবে আসামীকে অবকাশ দিন,—আসামী এ বিষয়ে হাইকোর্টে আবেদন করিতে চাহে।

দরখাস্ত শুনিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেব গরম হইলেন, পুলিশ সাহেব হাসিয়া উঠিলেন, তদন্তকারী দারোগা কাঁদিতে লাগিল,—মকদ্দমা মুলতুবি হইলে বা হস্তান্তর হইলে দারোগা মহাশয়ের ডিঙ্গি বুঝি ডোবে! অথচ ক্ষুদ্রকায় মোক্তার নাছোড়বন্দ, আইনের পুস্তক খুলিয়া বসিয়াছে!

ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাজিস্ট্রেট সাহেব আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ মকদ্দমা অতিশয় গুরুতর বলিয়া আমি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছি। আমি বিচার করি ইহাতে তোমার কোনও ,আপত্তি আছে?

প্রশান্তহৃদয় রমাপ্রসাদ উত্তর করিলেন,—আপনি বিচারপতি, সুবিচার আপনার অভ্যস্ত কার্য্য। সুবিচারে আমার ভয় নাই,—আপনিই বিচার করুন।

ক্ষুদ্রকায় মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বসিলেন, মাজিস্ট্রেট সাহেবের তিরস্কারে ভীত হইলেন, বাদীর সাক্ষীদিগকে জেরা করিতেও সাহস পাইলেন না। কেবল কোন্ সাক্ষী কি বলিতেছে, এক পার্শ্বে বসিয়া লিখিয়া লইলেন।

বিচার আরম্ভ হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : বিষকচুর মকদ্দমা

প্রথম সাক্ষী,—সনাতনবাটীর একজন ডাক্তারবাবু। তিনি বলিলেন,—তারিণীবাবুর পীড়ার সময় মধ্যে মধ্যে আমি আসিয়া দেখিতাম, এবং ঔষধির ব্যবস্থা করিতাম। তারিণীবাবুর কোনও সাংঘাতিক পীড়া হয় নাই, কেবল বাত এবং জ্বর। তাঁহার বয়স অনুমান ৫৫ বৎসর হইয়াছিল, এ বয়সে ঐরূপ সামান্য পীড়ায় মৃত্যু হওয়া অসম্ভব। মৃত্যুর পূর্ব্বের দিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে আসিয়াছিলাম, জ্বর বিশেষ বাড়ে নাই, মৃত্যুর কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তাহার পরদিন মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, লাশ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম, রমাপ্রসাদ রাতারাতিই লাশ দাহ করিয়াছেন।

তারিণীবাবুর সামান্য পীড়া ও সহসা মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার বাড়ীর দুই তিনজন লোক প্রমাণ দিল।

তাহার পর সনাতনবাটীর বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তিনি বলিলেন,—মৃত্যুর পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় তারিণীবাবু পূর্ব্বের উইল রদ করিয়া নূতন একখানি উইল করেন। সে উইলখানি দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি আপন ভ্রাতৃকন্যা বিন্দুবাসিনীকে ও সুধাহাসিনীকে দান করিয়া যান। উইলখানি করিবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে সরস্বতী ঠাকুর ঐরূপ উইল করিবার জন্য দিবারাত্র বিরক্ত করিতেন, এবং দুই এক জন লোকের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন যে বৃদ্ধ অধিকদিন বাঁচিবেন না। যে সময়ে নূতন উইল হইল, সে সময়ে রমাপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি উইলের একজন সাক্ষী। তাহার পর রমাপ্রসাদ সেই ঘরে রহিলেন, সে রাত্রি ঘরে আর কেহ ছিল না। সেই রাত্রিতেই তারিণীবাবুর সহসা কাল হয়।

তারিণীবাবুর ভৃত্যেরা প্রমাণ দিল, যে রাত্রিতে তারিণীবাবু নিদ্রা যাইতেছিলেন, সে ঘরে রমাপ্রসাদ ছিলেন। হঠাৎ দুই প্রহর রাত্রির সময় মৃত্যুর গোল উঠিল, ভৃত্যেরা যাইয়া দেখিল, বাবু হাত পা খেঁচিতেছেন, মুখে ফেনা উঠিতেছে, ঠিক বিষ খাইয়া মরিলে যেরূপ মৃত্যু হয়, সেইরূপ আকার হইয়াছে। ভৃত্যেরা মাঠাকুরাণীকে এ কথা বলিয়াছিল, অন্য লোককে ঐরূপ জানাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রমাপ্রসাদ তাহাদের নিষেধ করিয়া সেই রাত্রিতে লাশ জ্বালাইয়া দিলেন।

গোপবালার বাপের বাড়ীর প্রিয় পরিচারিকা আসিয়া প্রমাণ দিল যে রমাপ্রসাদ তারিণীবাবুকে ঔষধি খাওয়াইতেন। ঘটনার রাত্রিতে রমাপ্রসাদ ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া কতকগুলো শিকড় বাটিতে বলিলেন, আমি সেই শিকড়গুলা বাটিয়া দিলাম, তাহাতে প্রায় দুই ছটাক রস বাহির হইয়াছিল। শিকড়গুলা দেখিতে একপ্রকার বিষকচুর শিকড়। সে রস পাত্রে করিয়া রমাপ্রসাদ ঠাকুরের নিকট রাখিয়া আমি চলিয়া যাই, রস খাওয়ান দেখি নাই। মৃত্যুর পর

আমার মনে সন্দেহ হয়, সুতরাং সেই পাত্রটী ও শিকড় যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা দারোগা মহাশয়কে দিয়াছি। রমাপ্রসাদ অনেক রকম ঔষধ জানে, রোগীকে ভাল করিতে পারে, জীবন্ত মানুষকে মারিতেও জানে! উহার নিকট ঔষধের জন্য অনেক লোক আইসে!

সেই ঔষধপাত্র ও শিকড় পাওয়া ও ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠান সম্বন্ধে দারোগা বাবু স্বয়ং ও দুই একজন কনেষ্টবল জবানবন্দী দিল। তাহার পর ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন যে তিনি ঐ পাত্রস্থ রস ও শিকড় পরীক্ষা করিয়াছেন, উহা শরীরের অতিশয় অপকারজনক। ঐ রস অধিক পরিমাণে খাইলে মনুষ্যের মৃত্যু হইতেও পারে।

শেষ সাক্ষী সনাতনবাটীর একজন ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন,—তারিণীবাবুর লাশ দাহের সময় আমি ছিলাম। রমাপ্রসাদ ও হেমবাবু আস্তে আস্তে কথোপকথন করিতেছিলেন। হেমবাবু বলিতেছিলেন,—আজ কণ্টকোদ্ধার হইল, বিন্দুর ও সুধার পিতৃকুলের সম্পত্তি বিন্দু ও সুধা ফিরিয়া পাইল। রমাপ্রসাদ উত্তর করিলেন,—বিষকচু চমৎকার ঔষধ,—উহার প্রয়োগে অনেক সুফল ফলে।

বাদীর পক্ষের প্রমাণ সাঙ্গ হইল। বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরদিন চার্জ্জ করিয়া আসামীর জবাব গ্রহণ করিবেন, অদ্য মকন্দমা মুলতুবি রাখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আসামী পুনরায় হাজতে গেলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ : মকন্দমা বিচারাধীন

পরদিন ১১টার সময় পুনরায় বিচারঘর লোকারণ্য, পুনরায় উকিলগণ উপস্থিত হইয়াছেন, আসামী রমাপ্রসাদ আসামীদিগের স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার-আসনে বসিয়াছেন।

পেশকার একখানা চার্জ্জসিট প্রদান করিল,—সাহেব দণ্ডবিধি আইন খুলিয়া দেখিতেছেন, কলম লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন;—

এমন সময় কাছারির বাহিরে একটা গোল হইল, একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, গাড়ী হইতে দুইজন লোক নামিয়া অতি বেগে বিচারঘরে প্রবেশ করিলেন।

একজনকে বর্দ্ধমানের উকিলগণ জানিতেন,—তিনি হাইকোর্টের যশস্বী উকিল চন্দ্রনাথ! মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলম রাখিয়া একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, এ আবার কোথা হইতে বিপদ আসিল! উকিলের সঙ্গে হেমচন্দ্র;—রমাপ্রসাদ তাঁহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

চন্দ্রনাথ সাহেবকে জানাইলেন,—আমি আসামীর পক্ষে উপস্থিত হইতেছি, বাদীর সাক্ষীদিগকে কূটপ্রশ্ন করা হয় নাই, আদালত যদি অনুমতি করেন ত সে সাক্ষীদের ডাকিয়া একবার জেরা করিতে ইচ্ছা করি।

মাজিষ্ট্রেট। সাক্ষীরা কল্য প্রমাণ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের পুনরায় তলব করিয়া মকন্দমা-কার্য্য বিলম্ব করিবার আবশ্যকতা নাই। মকন্দমা দায়রায় বিচার হইবে, তুমি ইচ্ছা করিলে দায়রার বিচারের সময় জেরা করিতে পার।

চন্দ্রনাথ। সাক্ষীরা চলিয়া যায় নাই, এই আদালতের নিকটেই বর্ত্তমান আছে। যদি অনুমতি করেন, আমি এখনই দেখাইয়া দিতেছি। জেরা করিতে আমার এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে না, অতি গুরু অপরাধে দায়রায় প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে আসামী এই সামান্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে! জেরার পর যদি মকন্দমা দায়রায় পাঠান আবশ্যক বিবেচনা করেন, সে বিষয়ে আদালতের সম্পূর্ণ অধিকার।

মাজিষ্ট্রেট অগত্যা অনুমতি দান করিলেন। সনাতনবাটীর সাক্ষিগণ চলিয়া যায় নাই, কাছারির বাহিরে সনাতনবাটীর সদর নায়েব মহাশয়ের সহিত মিষ্টালাপ করিতেছিল, এবং ধূমপান করিতেছিল। তাহাদের পুনরায় আনা হইল।

প্রথম সাক্ষী ডাক্তারবাবু। কূটপ্রশ্নে প্রকাশ হইল, তিনি ডাক্তারবাবু নহেন। কোনও কালে ডাক্তারী পড়েন নাই, কোনও পরীক্ষা দেন নাই, এক ডাক্তারখানায় কয়েক মাস কম্পাউন্ডার ছিলেন, শেষে মাতলামী দোষে সে কর্ম্মটী হারান। এখন সনাতনবাটীতে থাকেন, লোকের

জ্বরটর হইলে কুইনাইন বাজারের দরের দেড়া দরে বিক্রয় করেন; এবং কামিনীকান্তবাবুর মুসাহেবি করেন, কলিকাতা হইতে বাই-নাচ আনিতে হইলে তিনিই কলিকাতায় গিয়া আয়োজন করেন। ডাক্তারবাবু আরও স্বীকার করিলেন যে তারিণীবাবুর মৃত্যু বড় সহসা হয় নাই, সন্দেহের বিশেষ কারণ ছিল না, বিশেষ কারণ থাকিলে আমি থানায় সংবাদ অবশ্য দিতাম!

তাহার পর উইলের সাক্ষী কূটপ্রশ্নে প্রকাশ করিলেন,—আমি সনাতনবাটীতে থাকি, কামিনীকান্তবাবুর আশ্রিত লোক। তালপুকুরে বড় যাই না, কেবল উইল করিবার দিন গিয়াছিলাম মাত্র। রমাপ্রসাদ তারিণীবাবুকে উইল করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহা নিজের কর্ণে শুনি নাই, সনাতনবাটীতে এইরূপ লোকের মুখে শুনিয়াছি মাত্র!

যে পরিচারিকাসুন্দরী বিষকচু বাটার প্রমাণ দিয়াছিলেন, তিনি কূটপ্রশ্নে প্রকাশ করিলেন, —আমি কস্মিন্‌কালেও তারিণীবাবুর বাটীতে দাসী ছিলাম না, গোপবালার বাপের বাড়ীর দাসী। তারিণীবাবুর মৃত্যুর দিন সে বাড়ীতে গিয়াছিলাম, এবং সেই মল্লিকদের বাটীতে শয়ন করিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে বিষকচু বাটিবার আবশ্যক হওয়ায় বাড়ীর দাসীদের না বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকেই ডাকিয়া বিষকচু বাটিতে বলিয়াছিলেন! কেননা আমি বড় বিশ্বাসী পুরাতন ঝি! তাহার পর পাত্র কোথায় ছিল জানি না, বিষকচুর শিকড় কোথায় ছিল জানি না, দারোগা মহাশয় বাটি ও শিকড় খুঁজিয়া বাহির করাতে আমি তাহা সনাক্ত করিয়াছি মাত্র! কাছারীতে যে পাত্র আছে, সে সেই পাত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, ঠিক বলিতে পারি না।

তাহার পর দারোগা মহাশয়ের জবানবন্দী,—বর্দ্ধমানের সমস্ত লোক সে জবানবন্দী শুনিতে কাছারী ঘরে ঝেঁকে আসিল। দারোগা মহাশয় কূটপ্রশ্নে প্রকাশ করিলেন,—আমার বাড়ী বাখরগঞ্জ জেলায়, আগে বাখরগঞ্জের কোন দারোগার ভাণ্ডারী অর্থাৎ ভৃত্য ছিলাম। সেই দারোগা বাঁকুড়া জেলায় বদলী হইলে তাহার সহিত আইসি, এবং তথায় ভাণ্ডারী কাজ ছাড়িয়া দিয়া কুলীর কণ্ট্রাক্টর হই। তাহাতে বিস্তর লাভ হয়, কিন্তু একটী বিবাহিতা স্ত্রীকে বাহির করিয়া কুলী করিয়া চালান দেওয়ায় ধরা পড়ি, ও সে বিষয়ে মকদ্দমা হয়। মকদ্দমায় অব্যাহতি পাই, কিন্তু কুলীর কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া পুলিশে কনেষ্টবল হইলাম। এই মকদ্দমার তদন্ত সনাতনবাটীতে বসিয়াই হইয়াছে, তথাকার সদর নায়েব মহাশয় সমস্ত সাক্ষী জোগাড় করিয়া দিয়াছেন, এবং তদন্তে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বিষকচুর শিকড় তারিণীবাবুর বাড়ীতেই পাওয়া যায়, পাত্রও তথায় পাওয়া যায়। দাসী দিয়াছিল কি, কি প্রকারে পাওয়া যায়, তাহা ঠিক স্মরণ নাই! বাখরগঞ্জের দারোগার নিকট দশ বৎসর ভাণ্ডারী কার্য্য করিয়াছি, সে অবকাশে তথাকার পুলিশের কার্য্য অনেক দেখিয়াছি।

শেষ সাক্ষী যিনি লাশ জ্বালাইবার সময় রমাপ্রসাদ ও হেমের কথোপকথন শুনিয়াছিলেন, তিনি তালপুকুর গ্রাম কিরূপ, শ্মশানভূমি কোথায়, কিছুই বলিতে পারিলেন না! আরও কূটপ্রশ্নে প্রকাশ পাইল, তিনি কলিকাতায় কামিনীকান্ত মহাশয়ের বাগানবাড়ীর একজন ভৃত্য!

এইরূপ সমস্ত কথা প্রকাশ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলম রাখিয়া দীর্ঘ শ্মশ্রু কণ্ডূয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন! তিনি স্বভাবতঃ কিছু উগ্র, কিছু ক্ষিপ্র, কিছু ব্যস্তচিত্ত, কিন্তু তিনি বুদ্ধিশূন্যও নহেন, হৃদয়শূন্যও নহেন,—মকদ্দমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন, আসামীর প্রশান্তমূর্ত্তির দিকে বার বার চাহিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভাবগতিক দেখিয়া দারোগা বাবুর মুখ শুকাইল, বারাণ্ডায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন, দীননাথ কনেষ্টবলকে পুকুর থেকে এক ঘটী জল আনিতে বলিলেন!

চন্দ্রনাথ তখন আদালতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আসামী নিরপরাধী, নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ লোক, অতিশয় কুলোকের মিথ্যা চক্রান্তে পড়িয়া এই কষ্টভার, এই কলঙ্কভার বহন করিতেছে। আদালত অনুমতি দিন, কয়েকজন সাফাই সাক্ষী দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনও শ্মশ্রু-কণ্ডূয়ন ও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন,—সাক্ষিগণ সকলেই কামিনীকান্তের অনুগত লোক, কামিনীকান্তের উত্তেজনায় এ মকদ্দমার সৃষ্টি, কামিনীকান্তের উত্তেজনায় সকল সাক্ষী আগাগোড়া মিথ্যা বলিয়া গিয়াছে! বিষকচুর গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা, বাখরগঞ্জবাসী এই দারোগা সে গল্পটী

সৃষ্টি করিয়াছে! সে বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, অনুমতি দিন, আমি কয়েকজন সাফাই সাক্ষী ডাকি।

ম্যাজিস্ট্রেট তখন উত্তর করিলেন,—বাদীর প্রমাণ যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তাহা হইলে আসামীর সাক্ষী ডাকিবার কিছু আবশ্যক আছে কি?

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—সচরাচর মকদ্দমায় আবশ্যক নাই বটে, কিন্তু এ মকদ্দমায় আছে। এ মকদ্দমায় একজন ধর্ম্মপরায়ণ উন্নতচরিত্র ভদ্রলোকের নামে একটী সম্পূর্ণ মিথ্যা অপরাধ আরোপিত হইয়াছে! বার্দ্ধক্যে, রোগে যে লোকের মৃত্যু হইল, তাহাকে বিষ খাওয়ানর একটী অদ্ভুত গল্প সৃষ্ট হইয়াছে! বিষকচু বলিয়া কি পদার্থ আছে তাহা সচরাচর লোকে জানে না, পুলিশ সেই বিষকচুর শিকড় পাঠাইয়াছেন, পাত্রটী পর্য্যন্ত ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন! যদি এ ভয়ঙ্কর অপরাধ সত্য হয়, তাহা হইলে আসামীর প্রাণদণ্ড বিধেয়! যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে যে নৃশংস মিথ্যাব্যবসায়ী এরূপ মকদ্দমা সৃষ্টি করিতে পারে তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান আপনার কর্ত্তব্য! আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি এরূপ নৃশংস, মিথ্যাব্যবসায়ী পুলিশকর্ম্মচারী বঙ্গদেশে আজকাল অধিক নাই,—যদি এরূপ থাকে,—যদি তাহাদিগের শঠতা ও নৃশংসতা প্রমাণ হয়,—তাহা হইলে সেই পুলিশকুলাঙ্গারদিগকে তিরোহিত করিয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করা রাজার সমুচিত কার্য্য। আপনি কেবল বিচারপতি নহেন, এ জেলার শাসনকর্ত্তা, সুশাসনের ভার আপনার হস্তে। বিচারের সহায়তার জন্য, সুশাসনের সহায়তার জন্য, আমার স্বদেশবাসীদিগের মঙ্গলের জন্য, আমি অনুরোধ করিতেছি, আমাকে দুই ঘণ্টা মাত্র সময় দিন। আদালতের সময় মূল্যবান, কিন্তু দুই ঘণ্টা মাত্র পরিশ্রম করিলে আপনার মনের সম্পূর্ণ সন্দেহ দূর হইবে, আপনি জানিতে পারিবেন, এ মকদ্দমা সম্পূর্ণ সত্য কি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ কথা আপনার হৃদয়ঙ্গম হইলে আপনিও কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়া সন্তোষলাভ করিবেন,—আসামীও প্রমাণ দিয়া সন্তোষ লাভ করিবে। তাহার পর আপনি যাহা আদেশ দিবেন, আসামী শিরোধার্য্য করিয়া মানিবে। আমার সাক্ষী আমি স্বয়ং আনিয়াছি, বাহিরে উপস্থিত আছে, আদেশ করুন, তাহাদের ডাকি।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সাফাই সাক্ষীদের ডাকিতে আদেশ দিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : মকদ্দমা সমাপ্ত

কামিনীকান্তের ন্যায় জমিদার, কাছারীতে মকদ্দমা দেখিতে আইসেন না। কিন্তু অদ্য চার্জ্জ হইয়া দুষ্ট জটাধারী দায়রায় প্রেরিত হইবে, ভণ্ড প্রচারক জমিদারের ক্ষমতা বুঝিতে পারিবে, এই উল্লাসে কামিনীকান্তবাবু নিজে উকিলদিগের সহিত বসিয়াছিলেন! যখন চন্দ্রনাথবাবু হেমচন্দ্রকে লইয়া বিচারঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন কামিনীবাবুর হৃদকম্প হইল, চন্দ্রনাথবাবুর কূটপ্রশ্নে মকদ্দমার আসল অবস্থা প্রকাশ হইতে লাগিল, তখন কামিনীবাবু মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইলেন। তিনি বার বার বাহিরে চাহিতে লাগিলেন, সুমতিবাবুর বর্দ্ধমানে আসিবার কথা ছিল, এ বিপত্তির সময় সুমতিবাবু কোথায়? সুমতিবাবু কলিকাতার বুদ্ধিমান এটর্নী, পাড়াগেঁয়ে মোটা বুদ্ধিতে যেরূপ মকদ্দমা স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাতে বড় হাত দেন নাই, পরে হাইকোর্টের চন্দ্রনাথবাবু এ মকদ্দমায় আছেন শুনিয়া মকদ্দমায় কি হইবে তখনই বুঝিয়াছিলেন! ডুবন্ত ডিঙ্গিকে পদাঘাত করিয়া ডুবাইয়া দেওয়া সুমতিবাবুর রীতি ছিল, তিনি হেমচন্দ্র ও যশস্বী চন্দ্রনাথবাবুর পরম বন্ধু হইয়া সরস্বতী ঠাকুরের সাফাইয়ের অনেক আয়োজন করিয়া দিলেন, এদিকে কামিনীকান্তবাবুকে সংবাদ পাঠাইলেন,—বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে আমি বর্দ্ধমান আসিতে অশক্ত; ভরসা করি, আপনার কার্য্য সিদ্ধ হইবে!

সাফাই সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে লাগিল।

আসামীর প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইলেন, তিনি তারিণীবাবুর গুরুদেব, সনাতনবাটীর একজন ভদ্র শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। টোলে শিষ্যদিগকে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করান, জমিদার-গৃহে ক্রিয়া-কর্ম্ম সম্পাদনার্থ যান, সমস্ত গ্রামে আদৃত ও সম্ভ্রান্ত। ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, কখনও আদালতে পদক্ষেপ করেন নাই, আজি বিন্দুবাসিনী ও যোগমায়ার ক্রন্দন এড়াইতে না পারিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তিনি প্রকাশ করিলেন,—রমাপ্রসাদ কয়েক মাস অবধি সনাতনবাটীতে বাস করিতেছেন, জমিদারমহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর রমাপ্রসাদ জমিদারকে ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাতে কামিনীবাবু কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে ডাকিয়া শপথ করিয়া বলেন,—যদি রমাপ্রসাদকে উৎসন্ন না করি, তাহা হইলে আমি নিজে দেশত্যাগ করিব। তারিণীবাবু মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে হইতে তাঁহার নূতন গৃহিণীর সহিত বড় কথা কহিতেন না, কেবল তাঁহার মৃত পত্নীর কথা ভাবিতেন, বিন্দু ও সুধার কথা ভাবিতেন, এবং চক্ষুর জল ফেলিতেন। তারিণীবাবু আমাকে ডাকাইয়া অনেকবার বলেন,—বিষয় আমার ভ্রাতৃকন্যাদেরই দিব, গৃহিণীকে দিব না। হেমচন্দ্র এ কথা শুনিয়া তারিণীবাবুকে স্পষ্টই বলিতেন,—আপনার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে এ বিষয় আমরা লইব না। শরৎ মৈমনসিংহ যাইবার আগে তারিণীবাবুকে বলিয়া গেলেন,—আপনার বিষয় জ্যেঠাইমাকেই দিন, আমরা লইতে স্বীকৃত হইব না। তথাপি বৃদ্ধের মন ফিরিল না, মৃত্যুর পূর্ব্বসন্ধ্যায় উইল করিয়া বিন্দু ও সুধাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছেন, রমাপ্রসাদ ঠাকুর এবং আমি সে উইলের সাক্ষী। তারিণীবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা সনাতনবাটীতে আসিয়া অবস্থান করেন। যখন গোপবালা স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে দরখাস্ত করিলেন, তখন তিনি কামিনীকান্তবাবুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন

সনাতনবাটীর পুরাতন একজন দাসী (সে যোগমায়াকে বাল্যকাল হইতে যত্ন করিত) আসিয়া প্রকাশ করিল,—আমি ৪০ বৎসর ঐ বাটীতে আছি, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রমণীকান্ত নামে নাবালক জমিদার বাস করিতেন, কামিনীকান্তের সহিত হাঙ্গামায় তাঁহার কাল হয়। সে কথা সকলে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই কথার উল্লেখ করিয়া কামিনীকান্তের গৃহিণীকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমি আপন কর্ণে শুনিয়াছি। সেই অবধি জমিদারবাবু সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বড় যত্ন করিতেন, অচিরে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

ধনপুরের ধনঞ্জয়বাবু তাঁহার পর উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া কামিনীকান্তবাবু চমকিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—তারিণীবাবু আমার শ্বশুর হইতেন, মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে আমি একবার তারিণীবাবুকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। তারিণীবাবুর সাধ্বী পতিপ্রাণা প্রথম স্ত্রী শোকে ও রোগে প্রাণত্যাগ করেন, তারিণীবাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী অতিশয় প্রখরা ও উদ্ধতস্বভাবা, তারিণীবাবুকে জ্বালাতন করিয়া সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া লইয়াছিলেন। তারিণীবাবুর মৃত্যুর পর কামিনীকান্তবাবু কলিকাতায় সুমতিবাবুর নিকট গিয়াছিলেন, সেদিন সে সময়ে আমিও সুমতিবাবুর বাটীতে ছিলাম। কামিনীবাবু বলিলেন যে রমাপ্রসাদ সরস্বতী একটী হাঙ্গামার মকদ্দমার কথা উত্থাপন করিয়া কামিনীবাবুকে শাসন করিয়াছেন, এবং তারিণীবাবুর নিকট নূতন উইল করিয়া লইয়া বিষয় তাঁহার ভ্রাতৃকন্যাদিগকে দেওয়াইয়াছেন। এই সকল কারণে কামিনীবাবু তারিণীবাবুর বিধবাকে দিয়া রমাপ্রসাদের নামে একটী খুনের মকদ্দমা স্থাপন করিয়াছেন, প্রকাশ করিলেন! ধনঞ্জয়বাবু আরও বলিলেন, আমি শ্বশুরের বিষয় পাইতে এক সময় লুব্ধ ছিলাম, এখন আর নাই। আমি নিজের দোষে বিপুল সম্পত্তি হারাইয়াছি, পতিব্রতা, সাধ্বী, স্নেহময়ী স্ত্রী (তিনি হেমবাবুর ভগিনী হইতেন), তাঁহাকেও হারাইয়াছি। সে সময়ে হেমবাবু আমাকে অনেক সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন, হেমবাবুর স্ত্রী আমাদের বাড়ী আসিয়া অনেক উপকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের দোষে আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করি নাই। হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র তারিণীবাবুর বিষয় পাইয়াছেন শুনিয়া তুষ্ট হইয়াছি,—আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই, আর একটী সম্পত্তি লাভ করিয়া অপব্যয় করিবার ইচ্ছাও নাই। বাল্যকাল হইতে সুরাপান শিখিয়াছি,—তাহাতেই শীঘ্র আমার মৃত্যু হইবে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

ধনঞ্জয়বাবুর এইরূপ আত্মগ্লানি ও আত্মদোষ স্বীকার শুনিয়া সকলের চক্ষুতে জল আসিল, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল।

তাহার পর খোজেস্তা বিবি নর্ত্তকী! তাহাকে দেখিবামাত্র কামিনীবাবুর প্রাণ উড়িয়া গেল, কাছারীর লোক একেবারে ঝাঁকিয়া আসিল! সে প্রকাশ করিল যে আমি কলিকাতার একজন নর্ত্তকী। কামিনীবাবু বাই-নাচপ্রিয়, বাই-নাচ দেখিবার জন্য আমাকে সর্ব্বদা ডাকিয়া পাঠান। সম্প্রতি কামিনীবাবুর বাগানে একদিন ডাকাইয়াছিলেন, তথায় সুমতিবাবু ছিলেন। তাহার

পর সুমতিবাবুর নিকট কামিনীবাবু যে কথা বলিয়াছিলেন, খোজেস্তা সমস্ত প্রকাশ করিল। সমস্ত আদালত নিস্তব্ধ অবাক ও হতজ্ঞান।

কামিনীবাবুর উকিল প্রশ্ন করিলেন,—তুমি মুসলমানী, কামিনীবাবু তোমার হস্ত হইতে সুধা পান করিয়াছিলেন, এইরূপ বলিয়াছ।

খোজেস্তা। বলিয়াছি।

উকিল। কামিনীবাবু সনাতনবাটীর জাতি-রক্ষা-সভার অধ্যক্ষ, তাহা তুমি জান?

খোজেস্তা। শুনিয়াছি।

উকিল। কামিনীবাবু তালপুকুরের শরৎ ও হেমকে একঘরে করিয়াছেন—তাহা তুমি জান?

খোজেস্তা। শুনিয়াছি।

উকিল। কামিনীবাবু জাতি-রক্ষা সম্বন্ধে এতদূর উৎসাহী হইয়া তোমার স্পৃষ্ট সুরা পান করেন কিরূপে?

খোজেস্তা। তাহা আমিও বাবুজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

উকিল। বাবুজী কি বলিলেন?

খোজেস্তা। বলিলেন, গোপনে কিছু করিলে তাহাতে জাত যায় না। বাবুমশাই, আপনি কি তাহা জানেন না?

উকিল মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। শেষ সাক্ষী মৈমনসিংহের জয়েণ্ট মাজিস্ট্রেট শরচ্চন্দ্র ঘোষ! তাঁহাকে দেখিয়া চন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন,—শরৎকে কে ডাকাইল? কবে মৈমনসিংহ হইতে আসিলেন।

হেমচন্দ্র বিষয়লুব্ধ লোক, তিনিই সরস্বতী ঠাকুরদ্বারা নূতন উইল লিখাইয়া লইয়াছেন,—এ সকল কথা অপ্রমাণ করিবার জন্য শরচ্চন্দ্র সাক্ষীর স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। চন্দ্রনাথবাবু কোন প্রশ্ন করিলেন না, শরৎবাবু আপনিই যাহা জানেন বলিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের মহত্ত্ব, হেমচন্দ্রের নির্ভীকতা, হেমচন্দ্রের দয়া, হেমচন্দ্রের অবিচলিত ন্যায়পরায়ণতা সজল নয়নে বর্ণনা করিলেন। তারিণীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর জন্য বিন্দুর যত্ন, শ্রদ্ধা ও মায়া বর্ণনা করিলেন, রোগে, শোকে, পরিতাপে শতবার বিন্দুবাসিনী তারিণীবাবুর বাটী গিয়া দাসীর ন্যায় সেবা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিলেন। তারিণীবাবু যখন প্রকাশ্যে হেম ও বিন্দুকে জাতিচ্যুত করিলেন, তখনও বিন্দু গোপনে যাইয়া জ্যেঠামহাশয়ের সেবা করিতেন, জ্যেঠাইমার শুশ্রূষা করিতেন। তারিণীবাবুর নববধূ যখন বিন্দুর সে বাটী যাওয়া বন্ধ করিলেন, তখনও বিন্দু সে কথা না মানিয়া পীড়ার সময় মল্লিক-বাড়ী যাইতেন। ঐ নববধূ সেদিন দরিদ্র বালিকা ছিল,—দিবাগতে চারিটী ভাত খাইতে দেয় এরূপ লোক গ্রামে ছিল না,—বিন্দু তাহাদের চাল ডাল দিয়া আসিতেন, বিন্দু তাহাদের কাপড় কিনিয়া দিতেন, বিন্দু আপনার মেয়েকে ফেলিয়া মাতার মত গোপবালাকে কোলে লইয়া দুধ খাওয়াইতেন। সেই গোপবালা যখন তারিণীবাবুর গৃহিণী হইলেন, তখন অহঙ্কারে বিন্দুকে ভর্ৎসনা করিয়া পাঠাইতেন, বিন্দুবাসিনী একদিনের জন্য রুষ্ট কথা কহেন নাই, অভিমান করেন নাই, দাসীর মত জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ী গিয়া শুশ্রূষা করিয়া আসিয়াছেন। বিষয় পাইবার জন্য হেমচন্দ্র দ্বিতীয় উইল করিয়া লয়েন নাই, তাঁহার অমতে তারিণীবাবু গোপবালার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ঐ উইল করিয়াছেন। হেমবাবু তারিণীবাবুর বিষয় গ্রহণ করিবেন না বলিয়া বার বার শরৎকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। শরৎ সে চিঠি মৈমনসিংহে পাইয়াছেন,—সমস্ত আদালতে দাখিল করিলেন।

তাহার পর শরচ্চন্দ্র রমাপ্রসাদ সরস্বতীর কথা বলিতে লাগিলেন। রমাপ্রসাদের দেবতুল্য চরিত্র, অসাধারণ ধর্ম্মশিক্ষা, অনিন্দনীয় উৎসাহ, অবিচলিত দেশহিতৈষিতা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। জাতি-নির্ব্বিশেষে, স্বধর্ম্মে অবস্থা-নির্ব্বিশেষে, সকল হিন্দুকে ডাকিয়া শিক্ষা দিতেছেন, দ্বেষ, হিংসা ও অনৈক্য প্রপীড়িত সমাজে ঐক্যসাধনে যত্ন করিতেছেন, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সঞ্জীবনী কথাদ্বারা আধুনিক হিন্দু-সমাজে জীবনদান করিতেছেন। এই চেষ্টায় রমাপ্রসাদ কলঙ্কভার আনন্দে বহন করিয়াছেন, নিন্দুকদিগের নিন্দা-কথা শুনিয়া হাস্য করিয়াছেন, দ্বেষীদিগের অপকার-চেষ্টার কথা শুনিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সৎপরামর্শ দিয়াছেন। দ্বেষী ও অভিমানীদিগের ভর্ৎসনায় মুহূর্ত্তের জন্যও রমাপ্রসাদের হৃদয় বিচলিত হয় নাই, সনাতনবাটীর জমিদারমহাশয়ের ভয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও রমাপ্রসাদের উদ্দেশ্য লঙ্ঘিত

হয় নাই! স্বদেশ-বৎসল রমাপ্রসাদ একাগ্রচিত্তে, অবিচলিত হৃদয়ে, স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতেছেন, স্বধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন, অনৈক্য-বিধ্বস্ত স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে ঐক্যসাধন করিবার যত্ন করিতেছেন! তাঁহার পবিত্র জীবনের সেই পবিত্র উদ্দেশ্যসাধন করিবার চেষ্টায় অদ্য তিনি বিপদ, ক্লেশ ও মিথ্যা কলঙ্কে পতিত হইয়াছেন! আমি রমাপ্রসাদকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাস্বরূপ সম্মান করি,—তাঁহার উন্নত চরিত্রে দোষ, কলঙ্ক ও অপরাধ স্থান পায় না!

এই পর্য্যন্ত প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেব কলম ফেলিয়া দিলেন,—তিনি ব্যগ্রস্বভাব, কিন্তু হৃদয়শূন্য নহেন। মুষ্টিদ্বারা সজোরে টেবিলে আঘাত করিয়া রোষে গর্জ্জিয়া বলিলেন,—এই দেবতুল্য মনুষ্যকে পিশাচ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কামিনীবাবু ষড়যন্ত্র করিয়াছেন? এই উন্নতহৃদয় দেশহিতৈষীকে ধ্বংস করিবার মানসে গোপবালা দরখাস্ত করিয়াছেন? আমাদের সৃষ্ট আদালত কি মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনার রঙ্গভূমি হইয়াছে? আমাদের গঠিত পুলিশ কি জমিদারদিগের অত্যাচারের উপায়স্বরূপ হইয়াছে? রমাপ্রসাদ! কল্য আমি তোমাকে মহা অপরাধে অপরাধী মনে করিয়াছিলাম, অদ্য আমি আমার ভ্রম বুঝিলাম। তুমি নির্দ্দোষী, উন্নতচরিত্র, পরোপকারী ও ধর্ম্মপরায়ণ! তোমার ন্যায় অধিক লোক থাকিলে তোমাদের দেশ এত হতভাগ্য হইত না! তোমাকে খালাস দিলাম, এবং তোমার নামে যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি নালিশ করিতে পার।

সমস্ত বিচারগৃহ নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক! সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে রমাপ্রসাদ তীব্রস্বরে কহিলেন,—বিচারপতি! আপনার সুবিচারজন্য ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন,—কিন্তু আমার আর একটী বক্তব্য আছে।

মাজিস্ট্রেট। কি?

রমাপ্রসাদ। সাক্ষীরা বলিয়া গিয়াছে, ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে ঐ কামিনীকান্ত একটী হাঙ্গামা করিয়া তাঁহার ভ্রাতা রমণীকান্তকে খুন করিয়াছে। তাহার বিচার এখনও হয় নাই!

মাজিস্ট্রেট। ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাও অদ্য বিচার হইতে পারে। কিন্তু তাহার প্রমাণ এখন কি আছে? তাহার সাক্ষী এখন কয়জন আছে?

রমাপ্রসাদ। হাঙ্গামার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু ভ্রাতৃবধ-স্বরূপ ভয়ঙ্কর পাতক হইতে স্বয়ং জগদীশ্বরই কামিনীবাবুকে অব্যাহতি দিয়াছেন! রমণীকান্ত সে হাঙ্গামায় আহত হয়, কিন্তু প্রাণে মরে নাই! তিনজন দ্বারবান রমণীকান্তের মৃতবৎ দেহ সরাইয়া ফেলে, পরে রমণীকান্ত চৈতন্য পাইলে তাহাকে লইয়া পশ্চিমদেশে পলাইয়া যায়। সে তিনজন দ্বারবান পশ্চিম হইতে আসিয়াছে,—হীরা সিং, লাল সিং ও জওহর সিং, ঐ দাঁড়াইয়া আছে—কামিনীবাবু বোধ হয় তাহাদের চিনিতে পারিবেন। আর (কামিনীবাবুর দিকে তীব্রদৃষ্টি করিয়া মস্তকের জটা সরাইয়া, সন্ন্যাসী সিংহনাদে বলিলেন), সে রমণীকান্ত এখনও জীবিত আছে, কামিনীবাবু ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় তাঁহার ভ্রাতাকেও চিনিতে পারিবেন!

কামিনীবাবু সেই জটাধারীর জটামুক্ত ললাট দেখিলেন, তাঁহার অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত নয়ন দেখিলেন, তাহার প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিলেন,—সেই ক্রুদ্ধস্বভাব বালক আজি মহাবলে বলিষ্ঠ বীরপুরুষ হইয়া বৈরনির্য্যাতন করিতে আসিয়াছেন! কামিনীবাবু নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া গেলেন,—লোকে ধরাধরি করিয়া জমিদারবাবুকে বাহিরে লইয়া গেল।

কাছারীতে একটা মহা গণ্ডগোল হইয়া উঠিল! সে গোল থামাইয়া মাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—রমাপ্রসাদ! তুমিই রমণীকান্ত? কামিনীবাবু তোমাকেই বাল্যকালে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন? সে বিষয়ে অভিযোগ কর, প্রমাণ লইয়া আইস,—ইংরাজ শাসনাধীনে তুমি সুবিচার পাইবে,—আমি নিজে তোমার অভিযোগ তদন্ত করিব।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : কচি আঁবের অম্ল ও চিনিপাতা দধি

বিচারগৃহের বাহিরে সেদিন কিরূপ গোলমাল, কিরূপ আন্দোলন, কিরূপ "মহারাণীর জয়", "বড়লাট এলগিন সাহেবের জয়" প্রভৃতি শব্দ হইতে লাগিল তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। জটাধারীবেশে রমণীকান্ত জমিদারকে দেখিবার জন্য লোক ভাঙ্গিয়া আসিল, হাইকোর্টের উকিল চন্দ্রনাথবাবুকে দেখিবার জন্য মহা ভিড় হইল, মৈমনসিংহের জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট শরৎকে

দেখিবার জন্য অনেকে ছুটিয়া আসিল। সে গোলমালের মধ্যে কথাবার্ত্তা হওয়া অসম্ভব,—কেবল চন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া রমাপ্রসাদ আপনার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

ঠিক হইল, সকলে মোক্তারের বাসায় যাইবেন, তথায় সন্ধ্যার সময় সকল বিষয়ে আলাপ হইবে। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথবাবু, শরৎবাবু ও রমণীকান্তবাবুকে ধরাধরি করিয়া বর্দ্ধমানের উকিলগণ একজন প্রধান উকিলের বাড়ী লইয়া গেলেন, তথায় কিছু জলযোগ না করিলে তাঁহারা কিছুতেই ছাড়িবেন না। সুতরাং হেমচন্দ্র একলাই মোক্তার মহাশয়ের বাসা জিজ্ঞাসা করিয়া তথায় উঠিলেন।

হেমচন্দ্র মোক্তার মহাশয়ের বাটী দেখিলেন, কাছারী হইতে তখনও কেহ আইসেন নাই। সুতরাং তিনি বাহিরের একটী ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর পার্শ্বের একটী ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরের কপাটটী খুলিল, সেই ঘর দিয়া বাহিরবাটী হইতে ভিতরবাটী যাওয়া যায়। সেই অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে একটী সুগোল দমদম ও তাবিজ-পরান বাহু দেখা গেল। মেয়েমানুষটি যুবতী ও ঘোমটা-দেওয়া,—হেমচন্দ্র অন্যদিকে চাহিলেন।

দমদম ও তাবিজের শব্দ হইল! হেমচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, সেই মেয়েমানুষটী অঙ্গুলীদ্বারা হেমবাবুকে সেই ঘরে আসিতে ইসারা করিতেছে!

হেমবাবু নিতান্ত ভদ্রলোক, একটু ইতস্ততঃ করিলেন, ভাবিলেন বর্দ্ধমানের মেয়েদের এইরূপ আচার-ব্যবহার নাকি? তথাপি মেয়েটী কি জন্য ডাকিতেছে জানা উচিত, সুতরাং সেই ঘরে গেলেন। যুবতী কপাট বন্ধ করিল, খিল দিল!

হেমবাবু পাড়াগেঁয়ে ভালমানুষ—বর্দ্ধমানের মেয়ের হাতে পড়িয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। অন্ধকার ঘরে অপরিচিত যুবতীর সহিত এক মুহূর্ত্তও থাকা ভদ্রলোকের উচিত কার্য্য নহে, মোক্তার মহাশয় হেমচন্দ্রের এ ব্যবহার জানিতে পারিলে কি বলিবেন?

বাড়ীর ভিতরদিকের একটা দ্বার খুলিয়া যুবতী সেইদিকে পলাইয়া গেল। আবার সেই বাড়ীর ভিতর হইতে হেমবাবুকে ইসারা করিয়া ডাকিতে লাগিল! বর্দ্ধমানের মেয়েদের রীতি সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে হেমবাবু অগত্যা বাড়ীর ভিতর গেলেন।

যুবতী আসন পাতিয়া দিল, এবং একজন পাচিকা হেমবাবুকে কয়েকখানা ফুল্‌কো লুচি ও আলুর দম আনিয়া দিল। হেমবাবু হাত ধুইয়া আহারে বসিলেন। দেখিলেন, বর্দ্ধমানের মেয়েদের ব্যবহার যেমনই হউক না,—তাহাদের রন্ধনটা বড়ই উৎকৃষ্ট!

কিন্তু পাচিকাও বেহদ্দ বেহায়া। লুচি দিতেছে আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতেছে,—হেমবাবু পাড়াগেঁয়ে লোক, তাঁহার খাইবার রকমসকম দেখিয়া মেয়ে দুইটী হাসিতেছে!

আহার প্রায় শেষ হইল, পাচিকা অম্ল আনিয়া দিল। হেমবাবু কাঁচ আঁবের অম্ল একটু চাকিয়া দেখিলেন,—আবার চাকিয়া দেখিলেন,—অবগুণ্ঠনবতী পাচিকার মুখের দিকে চাহিলেন,—সহসা বামহস্ত দিয়া পাচিকার হাত ধরিলেন!

এ কি! হেমবাবু নিতান্ত ভদ্রলোক,—পরের বাড়ীর রাঁধুনীর হাত ধরা কি রকম? পাচিকা "ছি" "ছি" বলিয়া হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, হেম হাসিয়া বলিলেন,—আর লুকাইলে হইবে না, এই কাঁচ আঁবের অম্ল খেয়ে চিনিয়াছি, এ তালপুকুরের রান্না! বিন্দু! তুমি কবে আসিলে, কি প্রকারে বর্দ্ধমানে আসিলে?

বিন্দু তখন ঘোমটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীর পার্শ্বে বসিলেন। বলিলেন,—যোগমায়া সনাতনবাটীর প্রাচীন দাসীকে লইয়া বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছি।

হেম। যোগমায়া এই বাটীতে আছেন? দাসী এ বাটীতে আছে?

বিন্দু। তাহারা দুইজনই এখানে আছে। মোক্তার মহাশয়ের গৃহিণী আমাদের অনেক যত্ন করিয়া এখানে রাখিয়াছেন। তাঁহারা লোক বড় ভাল।

হেম। লোক ভাল হইতে পারেন, কিন্তু বাড়ীর মেয়েদের আচার-ব্যবহার একটু বেহায়া! যে মেয়েটী আমাকে বাহির হইতে ডেকে আনিল, তাহার রকম যেন কেমন কেমন!

বিন্দু। না গো না, সে মেয়েটীর স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল; তবে ছেলেবেলা থেকে একটু ধামাল! ঐ যে সে আবার আসিতেছে!

পূর্ব্বোক্ত যুবতী একটী সাদা পাথরবাটী করিয়া চিনিপাতা দই আনিয়া দিল, এবং হেমচন্দ্রের পাতে দুইটা সন্দেশ দিল।

চিনিপাতা দই দেখিয়াই হেমবাবুর মনে সন্দেহ হইল, আস্বাদন করিয়া যুবতীকে হাসিয়া বলিলেন,—বুঝেছি! আর ঘোমটায় কাজ কি? ঘোমটাটী খোল। এই চিনিপাতা দই দিয়েই ধরা পড়িয়াছ।

হাস্যমুখী সুধা তখন অভিমানের ভাণ করিয়া বলিলেন,—না গো না, ঘোমটা খুলিতে ভয় করে। ঘোমটা দিয়েই "বেহায়া" হইলাম, না জানি ঘোমটা খুলিলে কি হইবে?

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইলেন, অনেক মিনতিদ্বারা সুধাহাসিনীর মান ভাঙ্গিলেন!

শরৎ ও সুধার কথা জিজ্ঞাসা করাতে বিন্দু তখন বলিলেন,—আমি বর্দ্ধমানে আসিয়া শুনিলাম যে মকদ্দমা হইতে দুই তিন দিন দেরী আছে। আরও শুনিলাম যে মৈমনসিংহ হইতে এখানে দুই দিনে আসা যায়! সরস্বতী ঠাকুরের এ বিপত্তির সময় শরৎবাবু আসিলে সাহেবদের বলিয়া কহিয়া হয় ত কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন, এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া আমি শরৎকে টেলিগ্রাম পাঠাইলাম। শরৎ টেলিগ্রাম পাইয়া অনেক জেদ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট দশ দিন মাত্রের ছুটী লইয়া সুধার সহিত বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন।

এই সমস্ত শুনিয়া হেমচন্দ্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—এমন বুদ্ধিমতী উকিল তালপুকুরে আছে জানিলে সরস্বতী ঠাকুর আমাকে বোধ হয় কলিকাতায় উকিল আনিতে পাঠাইতেন না। সরস্বতী ঠাকুর কে তাহা জান?

বিন্দু বলিলেন,—অনেক দিন জানি!

হেমবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি? তোমাকে কে বলিল? ত্রিংশৎ বৎসর পর রমণীবাবুকে গ্রামের কে চিনিল?

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন,—পুরুষমানুষে কেহ চিনে নাই, পুরুষমানুষে আপনার লোককে ভুলে,—মেয়েমানুষে তাহা ভুলে না। এই যে আমি ঘোমটা দিয়াছিলাম, আর তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না! পুরুষের খাবার দিকেই মন, আমাকে ভুলিয়া আঁবের অম্লটা চিনিলে! মেয়েমানুষ ত তেমন নয়, ত্রিংশৎ বৎসর পরও যোগমায়াদিদি রমণীবাবুকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন। নারী কি স্বামীকে কখনও ভুলিতে পারে?

সুধাহাসিনী খোকাকে কোলে করিয়া হেমবাবুর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তিনিও যো পাইয়া আবার একটু খোঁটা দিয়া বলিলেন,—দিদি! যোগমায়াদিদি রমণীবাবুকে চিনিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেন, তাঁহার খাবার প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাহাতে রমণীবাবু যোগমায়াদিদিকে "বেহায়া" মনে করেননি ত?

হেমবাবু আজ দুই ভগিনীর কাছে পরাস্ত হইলেন, দুই বোন একত্র হইলে তাঁহাদের সহিত কথায় পারিয়া উঠা ভার! কথার কোন উত্তর না দিয়া বুদ্ধিমানের মত কাঁচ আঁবের অম্লটুকু আর চিনিপাতা দইটুকু সমস্ত শেষ করিলেন!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : যোগমায়ার দড়ীহার

যোগমায়ার দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সনাতনবাটীর জমিদার-গৃহে রমণীবাবুর সহিত বড় ধূমধামের সহিত বিবাহ হয়। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় হতভাগিনী স্বামীকে হারায়! চতুর্দ্দশ বৎসরের বধূ স্বামীকে চিনিয়াছিল, স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, স্বামীর দেবতুল্য মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিতে শিখিয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে যোগমায়া পতিকে হারাইলেন,—তাহার পর সপ্তবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবলমাত্র পতির সেই দেবতুল্য মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া শোকে, কষ্টে, পরের অত্যাচার ও অবমাননা সহ্য করিয়া, পতিপ্রাণা নারী প্রাণ ধারণ করিয়া ছিলেন। যে বৎসরে তালপুকুরে বিন্দুর জন্ম হয়, সেই বৎসরই সনাতনবাটী হইতে রমণীবাবু দেশত্যাগী হয়েন, সুতরাং বিন্দু অপেক্ষা যোগমায়া চতুর্দ্দশ বৎসরের বড়।

যেদিন সন্ধ্যার সময় রমণীকান্ত জটাধারী বেশে পুনরায় জমিদার-গৃহে আশ্রয় লইলেন, শান্তহৃদয়া দুঃখিনী যোগমায়া সন্ন্যাসীর ঘরে একটু জল ছিটাইয়া ঝাঁট দিয়া গেলেন। রাত্রিতে যখন সন্ন্যাসী দীপ জ্বালিয়া একাকী বসিয়া উন্নতস্বরে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে বসিলেন,

দুঃখিনী সে ধর্ম্মগীতে আকৃষ্ট হইয়া পার্শ্বের ঘরে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন, এবং এক একবার সেই পুণ্য দেবতুল্য মূর্ত্তির দিকে দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর গম্ভীরস্বরে শাস্ত্রপাঠ শুনিয়া, সন্ন্যাসীর প্রশান্ত উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া, যোগমায়ার ছেলেবেলাকার কথা এক একবার মনে পড়িতে লাগিল,—কেন তাহা যোগমায়া জানেন না। রাত্রি দুই প্রহর হইল, সন্ন্যাসী দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলেন, যোগমায়া পূর্ব্বস্মৃতিদ্বারা ব্যাকুল ও ব্যথিত হইয়া বিধবার নিরানন্দ শয্যায় শয়ন করিলেন। নিদ্রা হইল না! বার বার বাল্যকালের কথা মনে আসিতে লাগিল, বার বার যৌবনের হৃদয়েশ্বরকে মনে পড়িতে লাগিল, বার বার সেই নব বৈধব্যের অসহ্য বেদনা সপ্তবিংশ বৎসর পর বিধবার হৃদয় আবার মন্থন করিতে লাগিল। বালিশে মুখ ঢাকিয়া নীরবে কাঁদিয়া অভাগিনী নিদ্রা যাইল। নিদ্রা স্বপ্নপূর্ণ—বোধ হইল যেন, ছাদের উপর হইতে তাঁহার যৌবনের স্বামী সেই তেজঃপূর্ণ রমণীকান্ত উন্নতস্বরে গীত গাইতেছেন। চমকিত হইয়া হতভাগিনী উঠিল,—প্রাতঃকাল হইয়াছে, সূর্য্যকিরণে বৃক্ষ, তড়াগ ও শস্যক্ষেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, আর সেই সূর্য্যালোকে দণ্ডায়মান হইয়া উন্নতস্বরে সরস্বতী ঠাকুর বেদগান করিতেছেন।

তাহার পর?—তাহার পর দিন দিন যখন সন্ন্যাসীর ঘর ঝাঁট দিতে আসিতেন, প্রাতঃকালে বা অপরাহ্নে ফলমূলাদি লইয়া আসিতেন, সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালিয়া আনিতেন,—যোগমায়ার শান্তহৃদয় উদ্বিগ্ন হইত, যোগমায়ার শান্তচিত্ত অশেষ চিন্তাতরঙ্গে আপ্লুত হইত! আর যখন সরস্বতী ঠাকুর প্রাতঃকালে উন্নতস্বরে শিষ্যদিগের নিকট উপনিষদ পাঠ করিতেন, অথবা দ্বিপ্রহর নিশি পর্য্যন্ত একাকী দীপালোকে বসিয়া সঙ্গীতপূর্ণস্বরে মহাভারত ও পুরাণ পাঠ করিতেন,—যোগমায়া নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই পাঠকের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, চৈতন্যশূন্য হইয়া সেই অমৃতবচন শ্রবণ করিতেন! তাঁহার জীবন আনন্দপূর্ণ হইত, হৃদয় শান্তিপূর্ণ হইত! পাঠ শেষ হইলে অভাগিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই যোগিবরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, শূন্যহৃদয়ে নিজ আবাসে ফিরিয়া যাইতেন! এ কি যৌবনের উদ্বেগ? যোগমায়ার যৌবন ত অনেক দিন পার হইয়া গিয়াছে। এ কি নূতন প্রণয়ের উদ্রেক? যোগমায়ার হৃদয় ত প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন ভুলিয়াছে। তথাপি সন্ন্যাসীর সেই প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে দেখিলেই যোগমায়ার যেন পূর্ব্বস্মৃতি উদয় হইত, হৃদয় বিলোড়িত হইত, মন নানারূপ চিন্তা বা কল্পনা বা স্বপ্নে ভাসিয়া যাইত!

যেদিন সরস্বতী ঠাকুর আপন জীবন-ইতিহাস হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রকে বলেন, সেদিন যোগমায়ার হৃদয় নানা চিন্তায় একেবারে ব্যাকুল ও বিপর্য্যস্ত হইল। সরস্বতী ঠাকুর ধনীর সন্তান ছিলেন? সরস্বতী ঠাকুর অষ্টাদশ বৎসর বয়সে একটী সঙ্কটে পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন? সরস্বতী ঠাকুর পশ্চিম হইতে পুনরায় সনাতনবাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন? সরস্বতী ঠাকুর কি—? বিধাতা, রক্ষা করুন! আমি যেন বৃথা লোভে লুব্ধ না হই, আমি যেন পাপ-মোহে মুগ্ধ না হই, আমি যেন পাগলিনী না হই!

কয়েকদিন ধরিয়া যোগমায়া ব্যাকুলচিত্তা হইয়া রহিলেন, পূর্ব্বস্মৃতি ও নব অপরিস্ফুট আশাতে সে শুষ্ক হৃদয় উথলিতে লাগিল। পরে যেদিন সরস্বতী ঠাকুর যোগমায়ার নিকট যোগমায়ার স্বামীর কথা ও সম্পত্তির কথা উত্থাপন করেন, ও কামিনীকান্তের গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রমণীকান্তের কথা উত্থাপন করেন,—তখন যোগমায়ার মনে আর সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ স্বামীর চরণে আছাড় খাইয়া পড়িয়া তখনই সে প্রিয় চরণ দুইটী জড়াইয়া ধরে! কিন্তু স্বামী কি তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন? স্বামী কি তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন? স্বামী ত এতদিন অবধি তাঁহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না, সে বিষয়ে পরিচয়ও দিলেন না,—স্ত্রীর কি সে পরিচয় প্রথমে দেওয়া ভাল? নানা চিন্তায় অভিভূত হইয়া যোগমায়া সেদিন রাত্রিতে জল গ্রহণ না করিয়া শুইলেন।

রাত্রিতে ঘুম হইল না। নানা কথা মনে উদয় হইতে লাগিল, সন্ন্যাসীর অবয়ব, সন্ন্যাসীর বেদপাঠ, সন্ন্যাসীর ঝুলিটী মনে পড়িতে লাগিল, সন্ন্যাসীর ঝুলির ভিতর একটী ছোট বাক্স আছে তাহা মনে পড়িতে লাগিল। বাক্সের চাবিটী বালিসের নীচে রাখিয়া সন্ন্যাসী নিদ্রা যান তাহা যোগমায়া দেখিয়াছেন। মনে হইল,—বাক্সে কি আছে? বাক্সটী একবার খুলিয়া দেখিব? তাঁহার বাক্স আমি খুলিব, ইহাতে কি দোষ আছে?

দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় দীপ হস্তে করিয়া যোগমায়া সন্ন্যাসীর ঘরে যাইলেন, বালিসের নীচে হইতে আস্তে আস্তে চাবিটী বাহির করিলেন, বাক্সটী খুলিলেন,—যাহা দেখিলেন, যোগমায়ার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল! রমণীকান্ত বিবাহের পর মাতার একগাছি দড়ীহার বধূকে দিয়াছিলেন, যোগমায়া স্বামীর প্রথম উপহারটী হৃদয়ে করিয়া লইয়াছিলেন! কাহারও কাছে রাখিতে বিশ্বাস হয় না বলিয়া স্বামীর কাছেই সে ধন গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন,—আজ সপ্তবিংশ বৎসর পর সেই গচ্ছিত ধনটী স্বামীর বাক্সে দেখিলেন। ইতিমধ্যে রমণীবাবু আহত হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন, দেশে-বিদেশে ভিক্ষা করিয়া খাইয়াছেন, অন্য দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু যোগমায়ার হারটী হস্তান্তর করেন নাই, যোগমায়ার গচ্ছিত ধন লোকসান করেন নাই। "প্রভু! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, তাই অভাগিনীর গচ্ছিত ধনটী যত্ন করিয়া রাখিয়াছ! আর একটী ধনও তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম,—সেটী আমাদের প্রথম ভালবাসা! যেদিন সময় পাইব, যেদিন তুমি অনুমতি দিবে, সেদিন সে ধনটীও দাবি করিব।" সমস্ত রাত্রি সেই হারটী বুকে করিয়া যোগমায়া সেই ঘরে বসিয়া কাঁদিলেন, পরে হার পুনরায় বাক্সে রাখিয়া চাবি বালিসের নীচে রাখিয়া, আপন কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন।

রমাপ্রসাদ বা রমণীকান্ত ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার পতিপরায়ণা হতভাগিনী স্ত্রী হৃদয়েশ্বরকে ভুলে নাই—সন্ন্যাসীর বেশে বা জটাভারে পতিব্রতা রমণীর চক্ষু প্রতারিত হয় না,—যোগমায়ার নিকট আর গোপন থাকিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং একদিন সন্ধ্যার সময় যোগমায়াকে গোপনে সমস্ত কথা বলিলেন, সপ্তবিংশ বৎসর পর যৌবনের প্রণয়িনীকে হৃদয়ে ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন, সযত্নে যোগমায়ার অশ্রুমোচন করিয়া সেই শুষ্ক ওষ্ঠে চুম্বন করিলেন। পরে অতিশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—যোগমায়া! ভগবানের প্রসাদে আমরা আর একদিন পরস্পরের মনের কথা খুলিয়া বলিব, বহুবৎসর পর যৌবনের প্রণয়ের কথা স্মরণ করিব,—এখন এই পর্য্যন্ত। যতদিন আমি নিজ নামে প্রকাশ না হই, ততদিন, আমি সন্ন্যাসী মাত্র, তুমি জমিদার-গৃহের বিধবা। ইতিমধ্যে লোকে আমাদের জানিতে পারিলে আমাদের প্রাণের সংশয় আছে,—কামিনীকান্তবাবুকে আমি জানি! সাবধান!

যোগমায়া আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন, কিন্তু সে চন্দ্র আবার মেঘাবৃত হইল! মকদ্দমার তদন্ত ও বিচারের কয়েকদিন যোগমায়া জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন, শেষে যাতনা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তালপুকুরে আসিয়া বিন্দুবাসিনীর কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া বর্দ্ধমানে আসিলেন।

বিচার হইয়া গিয়াছে, হৃদয়েশ্বর নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, রমণীকান্তের নাম দিগ্বিদিক উচ্চারিত হইতেছে, পথে, ঘাটে জয়ধ্বনি পড়িতেছে! যোগমায়ার নারীহৃদয় বুঝি আনন্দের উদ্বেগে ফাটিয়া যায়, যোগমায়া অস্থির হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। যখন রমণীকান্ত কাছারী হইতে মোক্তারের বাড়ীতে আসিলেন, যখন বাড়ীর ভিতরের উঠানে পদক্ষেপ করিলেন,—যোগমায়া আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া স্বামীর প্রিয় চরণ দুইটী জড়াইয়া ধরিলেন! একবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ ভরিয়া রোদন করিয়া হৃদয়ের বেগ প্রকাশ করিলেন, সপ্তবিংশ বৎসরের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিলেন।

চারিদিকে লোকে সেই দম্পতিকে ছাড়িয়া সরিয়া গেল, সে আনন্দের ক্রন্দন শুনিয়া সকলের হৃদয় আলোড়িত হইল, সকলের চক্ষুতে জল আসিল। সুধা ঘরের ভিতর গিয়া খোকাকে চুম্বন করিয়া কাঁদিলেন, বিন্দু স্বামীর হাত ধরিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন, বাহিরে চন্দ্রনাথ-বাবুও হস্তে ললাট স্থাপন করিলেন, চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বহিয়া পড়িল। মোক্তার মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী প্রাচীন কালের লোক,—তাঁহারা দুই বাহু তুলিয়া ভগবানকে ডাকিয়া রমণীকান্ত ও যোগমায়াকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনেক চেষ্টার পর রমণীকান্ত যোগমায়ার হাত ধরিয়া উঠাইলেন, চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন, আপনার চক্ষুর জল মুছিলেন। কথা কহিতে পারিলেন না,—নীরবে যোগমায়ার পুরাতন দড়ীহারটী যোগমায়ার গলায় পরাইয়া দিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : শুভবিবাহ

আমাদের ইতিহাস শেষ হইল। আমরা তালপুকুর গ্রামের সপ্তবিংশ বৎসরের ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম।

দরিদ্রের কন্যা, দরিদ্রের গৃহিণী, শান্তহৃদয়া বিন্দুবাসিনী আমাদের নায়িকা। বিন্দুকে আমরা হইতে দেখিয়াছি,—বিন্দুর নবম বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতার সহিত একদিন সন্ধ্যাবেলা তালপুকুরের ঘাটে সে কন্যাটীকে দেখিয়াছিলাম;—বিন্দুর অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় তাহার বিধবা ভগিনীর বিবাহের নিমন্ত্রণে আমরা গিয়াছিলাম;—এখন বিন্দুর সপ্তবিংশ বৎসর বয়স, তাহার কন্যা সুশীলার বিবাহে আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে!

সুধাহাসিনীও দরিদ্র-কন্যা, অকালে বিধবা! আধুনিক শিক্ষাকে আমরা নিন্দা করি, কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবলেই সুধা চির হতভাগিনীর অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইয়া উন্নতচেতা হৃদয়েশ্বর লাভ করিয়াছে। সুধা চিরকালই প্রফুল্লচিত্তা, প্রফুল্লনয়না ও একটু রসিকা, কিন্তু তালপুকুর গ্রামে তাহার অপেক্ষা প্রকৃত সদ্‌গুণবতী, দয়ার্দ্রহৃদয়া, পরোপকারিণী কেহ ছিল না,—জগৎ-সংসারে তাহার অপেক্ষা পতিপ্রাণা, পতিপরায়ণা কেহ নাই।

ধনপুরের ধনবতী বধূ উমাতারার অকাল মৃত্যুতে আমরা অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছি, অভাগিনী কালীতারার অকাল বৈধব্যে আমরা আক্ষেপ করিয়াছি।

হেমচন্দ্র ও শরতের সহিত কলিকাতায় যাইয়া আমরা অনেক বড়লোকের পরিচয় পাইয়াছি, উঁকিঝুঁকি মারিয়া বড়মানুষদের বৈঠকখানা এক আধবার দেখিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি। দেবীপ্রসন্নবাবুর বিপুল সংসারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গরবিণী গৃহিণীর সহিত সভয়ে দুই চারিটা কথা কহিয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। ধনঞ্জয়বাবুর মর্ম্মরপ্রাসাদ এবং সাদা জুড়ি ও কালো জুড়ি দেখিয়াছি, তাঁহার হৃদয়ের মিত্র ও মিত্রাণীদিগকে দেখিয়াছি, তাঁহার উন্নতি ও তাঁহার অকালে অবনতিও দেখিলাম। সুচতুর বুদ্ধিমান সুমতিবাবুর ক্রমশঃ উন্নতি দেখিয়াছি, তিনি কবে "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইবেন, পথ চাহিয়া রহিয়াছি। কলিকাতার বড়বাজার দেখিয়াছি, তথায় যশ, মান ও পাণ্ডিত্য বিক্রয় হয়, এবং সুধার বিবাহের সময় কলিকাতার অনেক আর্য্যসন্তান ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদের পরিচয় পাইয়া জীবন পবিত্র করিয়াছি!

সনাতনবাটীতে অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর শাস্ত্রকথা শুনিতে গিয়া প্রসিদ্ধ জমিদার-বংশের কিছু পরিচয় পাইলাম, এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার কামিনীকান্তবাবুর দর্শন লাভ করিলাম। সেই বিপুল বংশের নবীনা ও প্রাচীনাদিগের সহিত কখন কখন পুকুরঘাটে দেখা হইয়াছে, ভয়ে ভয়ে এই ইতিহাসে তাঁহাদের দুই একটী কথা লিখিয়াছি, যদি অপরাধ হইয়া থাকে, নবীনা ও প্রাচীনাগণ ক্ষমা করিবেন।

তালপুকুরের "ঠাকুরমা" ও "দাদামহাশয়ের" নিকট অনেক গভীর পরামর্শ পাইয়া আমাদের সমাজের বুদ্ধিমতী ও বুদ্ধিমানগণ উপকৃত হইয়াছেন, এবং সংসারে যথেষ্ট "আদায়" করিতে শিখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তালপুকুরের তারিণীবাবুর বিবাহে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়া কলিকাতা ও বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত হাঁটাহাঁটি করিয়াছি। বর্দ্ধমানে যাইয়া পদ্মসরোবরের ন্যায় তথাকার উকিলমণ্ডলীর দর্শন পাইয়াছি, এবং উঁকিঝুঁকি মারিয়া হাকিমদিগের এজলাস ও খাসকামরা দেখিয়া আসিয়াছি।

সংসার ও সমাজ দোষ ও গুণে গঠিত,—যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। সমাজে দোষ অনেক আছে, কিন্তু আমি দোষ অপেক্ষা সদ্‌গুণই অধিক দেখি, সুতরাং আমাদের ভবিষ্যতের উন্নতির আশা রাখি। যে সমাজে রমণীকান্তের ন্যায় জমিদার আছেন, চন্দ্রনাথের ন্যায় উকিল আছেন, হেমচন্দ্রের ন্যায় পল্লীগ্রামনিবাসী আছেন, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় রাজকর্ম্মচারী আছেন, সে সমাজের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইবে না।

যোগমায়া, বিন্দুবাসিনী ও সুধাহাসিনীর ন্যায় পতিপ্রাণা নারী আমাদের বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে বাস করেন,—বঙ্গসংসার আজিও বঙ্গনারীদিগের পুণ্যবলে উজ্জ্বল। এবং হেমচন্দ্র একদিন আহার সমাপন করিয়া আমাদের কাণে কাণে বলিলেন,—বঙ্গদেশের রন্ধনশালাও অদ্য পর্য্যন্ত বঙ্গনারীদিগের রন্ধননৈপুণ্যবলে উজ্জ্বল!

রমণীকান্ত বর্দ্ধমানে কয়েক দিন থাকিয়া তথাকার সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত আলাপ করিলেন, এবং কয়েকটী গুরুকার্য্য সম্পাদন করিলেন। কামিনীবাবুর সহিত বিষয়-বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। কামিনীবাবুর উকিলগণই বিষকচুর মকদ্দমা সম্বন্ধে কামিনীবাবুকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—আপনি যদি এক্ষণে রমণীবাবুর সমস্ত জমিদারীর অংশ নির্ব্বিরোধে না ছাড়িয়া দেন, এবং রমণীবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ না করেন, তবে আমাদের সহিত আপনার সম্বন্ধ এইখানে শেষ হইল। আপনার মকদ্দমা স্পর্শ করিয়া বর্দ্ধমানের উকিলগণ যেরূপ কলঙ্কিত হইয়াছে, এরূপ কলঙ্কের ভার আমাদের পূর্ব্বে কখনও বহন করিতে হয় নাই। কামিনীবাবু মহাবিক্রমশালী জমিদার, কিন্তু অদ্য মহাবিপদে পড়িয়াছেন। সুচতুর সুমতিবাবু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, বর্দ্ধমানের উকিলগণ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, রমণীবাবু ইচ্ছা করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে পুরাতন হাঙ্গামার মকদ্দমা স্থাপন করিতে পারেন! রোষে গর্জ্জন করিয়া কামিনীবাবু অগত্যা ভ্রাতার সমস্ত অংশ ছাড়িয়া দিলেন, জিঘাংসাপূর্ণ হৃদয়ে কলিকাতায় গিয়া একটী বৃহৎ "জাতি-সংরক্ষণ-সমাজ" স্থাপন করিলেন, এবং হৃদয়ের শান্তি লাভের জন্য আবার বাই-নাচ দিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং খোজেস্তা সুন্দরীকে পুনরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন!

রমণীকান্তের দ্বিতীয় কার্য্য,—তারিণীবাবুর বিষয় সম্বন্ধে মীমাংসা করা। তারিণীবাবু শেষের উইল দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি বিন্দু ও সুধাকে দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তারিণীবাবুর বিধবাকে বঞ্চিত করিয়া সে বিষয় গ্রহণ করিতে হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র অস্বীকার করিলেন। হেমচন্দ্র বলিলেন,—বিষয় সমস্তই শাশুড়ী ঠাকুরাণী গ্রহণ করুন, ও আমরা স্পর্শ করিব না। রমণীকান্ত উত্তর করিলেন,—গোপবালা প্রথম যৌবনে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার শুনিবার কোনও লোক নাই; অনেকগুলি টাকা হাতে দিয়া তাঁহাকে শীঘ্র পাপের পথে প্রেরণ করাই কি তোমাদের ইচ্ছা? অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে হেম ও শরৎ সে বিষয় দখল করিবেন, এবং বিষয়ের লাভ কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত গণিয়া কিস্তি কিস্তি গোপবালার নিকট প্রেরণ করিবেন। ঘোর অভিমানিনী গোপবালা রোষে গর্জ্জন করিলেন, আবার বিন্দু ও সুধার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইল, এই অভিমানে ক্রন্দন করিলেন! তিনি বিন্দু ও সুধার সহিত দেখা করিলেন না, তালপুকুর গ্রামে মুখ দেখাইলেন না, গোকুলচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বিষয়-উদ্ধারের পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। কয়েকদিন পর গোকুলচন্দ্র ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিল, গোপবালার আর কোন খবর পাওয়া গেল না। বিন্দুকে লোকে বলিত, গোপবালা পরামর্শ গ্রহণজন্য সুমতিবাবুর বাটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন।

রমণীকান্তের তৃতীয় কার্য্য,—পুত্রের বিবাহ স্থির করা। অনেকদিন পূর্ব্বে রমণীবাবু হেমচন্দ্রের নিকট আপন জীবন-ইতিহাস ব্যাখ্যা করিবার সময় ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ বিধেয় কিনা, সে বিষয়ে হেমবাবুর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হেমবাবু এখন সে প্রশ্নের অর্থ বুঝিলেন। তিনি সানন্দে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে যুবা দেবীপ্রসাদের সহিত সুশীলা মাতার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। সুশীলার মাসী সুশীলাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—দেখিস বাছা, বড়ঘরের বৌ হইলে যেন আমাদের ভুলে যাসনি!

ব্রাহ্মণপুত্রের সহিত কায়স্থকন্যার বিবাহ হইবে শুনিয়া বর্দ্ধমানে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু হেমচন্দ্র ও রমণীকান্ত কার্য্যে ব্রতী হইলে লোকনিন্দা বা লোকভয়ে হটিবার লোক নহেন। বিবাহের দিন স্থির হইল, বর্দ্ধমানেই বিবাহের পত্র হইয়া গেল, তালপুকুর গ্রামে মহাসমারোহে বিবাহ হইবে স্থির হইল।

শরচ্চন্দ্র মৈমনসিংহে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু সুধা বিবাহ না দেখিয়া যাইবেন না বলিয়া খোকাকে লইয়া হেম ও বিন্দুর সহিত তালপুকুরে আসিলেন। এদিকে রমণীকান্ত ও যোগমায়া মহাসমারোহে সনাতনবাটীতে আসিয়া আপনাদিগের জমিদারী দখল করিয়া বসিলেন। সনাতন-বাটীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, হাটে-বাজারে আজ নূতন জমিদারের কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই, পুকুরঘাটে মেয়েমহলে আজ যোগমায়ার কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই! ফুলকুমারী কলসী কাঁকে করিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—ও লো, মিন্‌ষে যোগীও নয়, সন্ন্যাসীও নয়, আমাদের তিন-আনি জমিদার লো! মাথার জটা ফেলে দিয়ে ঠিক যেন কার্ত্তিক ঠাকুরের মত রূপ হয়েছে। যোগমায়াদিদির খুব কপালজোর!

কুসুমকুমারী দাঁতে মিশি দিতে দিতে বলিলেন,—ও লো, কপালজোর মিনষের! যোগমায়া-দিদির কালোপেড়ে কাপড় পরে গায়ে গয়না দিয়ে কেমন রূপ বেরিয়েছে দেখিছিস? ঠিক যেন রাঙ্গা বৌটী বর্দ্ধমান থেকে ঘরে আসিল!

বসন্তকুমারী আলতা-মাখা রাঙ্গা চরণ ধুইতে ধুইতে বলিলেন,—ও লো, যোগমায়াদিদি রাঙ্গা বৌ হবে কেন? রাঙ্গা বৌ যে ঘরে আসছে।

হেমকুমারী কলসী নামাইয়া কাকপক্ষ-বিনিন্দিত নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশির বিউনি খুলিতে খুলিতে বলিলেন,—হাঁ, হাঁ, শুনিলাম যে রমণীবাবুর ছেলের সঙ্গে তালপুকুরের হেমবাবুর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে!

গরবিণী স্বর্ণকুমারী স্পর্দ্ধায় তাবিজ-বাঁধা হাত নাড়িয়া বলিলেন,—দূর্ পোড়াকপালী! তাও কি হয় লো? আমরা যে বামুণ লো, আমরা যে দেবী লো! আমাদের সঙ্গে কি কায়েতের বিয়ে কখন হয়?

রমণীকান্ত গ্রামে আসিয়া গ্রামের ইতর ভদ্র সকলকে বস্ত্র, মিষ্টান্ন ও নানারূপ উপহার বিতরণ করিলেন; যোগমায়া জমিদার-গৃহের বৌ, ঝি, প্রাচীনা, নবীনা, সকলকে সমান সম্মান করিয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার বিতরণ করিলেন! গ্রামে নূতন জমিদারের জয়-জয়কার হইতে লাগিল, জমিদার-গৃহে ও পুকুরঘাটেও যোগমায়ার চরিত্র সমালোচনা কিছুদিন স্থগিত রহিল! প্রাচীনাগণ নূতন তসর ও গরদের কাপড় পড়িয়া অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন,—না, বাছা যোগমায়ার মায়াদয়া আছে, আমাদের জন্য একটু ভক্তি আছে, তা ত চিরকালই বলেছি। তবে কপাল মন্দ, তাই একটা ইতর জাতির সতিন হয়েছিল, তারই ছেলেটাকে কায়েতের ঘরে বিয়ে দিতেছে; নিতান্ত ভাঙ্গা কপাল, নৈলে কি বামুণের ঘরের বৌ হইয়া কায়েতের সঙ্গে সম্বন্ধ করে?

গ্রামের পণ্ডিতাভিমানী শাস্ত্রজ্ঞগণ দলবদ্ধ হইয়া একদিন রমণীবাবুর নিকট গিয়া এরূপ গর্হিত সম্বন্ধ করিতে নিষেধ করিলেন, সমাজের আদেশ লইয়া শাস্ত্রসম্মত কাজ করা ভাল, এইরূপ নানা তর্ক করিলেন। রমণীবাবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাহার আদেশ লইব? দেশের রাজা ভিন্নধর্ম্মী, তাঁহারা শাস্ত্রকথা জানেন না। আপনারা শাস্ত্রকথা জানেন, কিন্তু নিজের প্রভুত্বটী বজায় রাখিবার জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা দান করেন। সেই জন্যই লোকে সে ব্যবস্থা তুচ্ছ করিয়া নিজের ধর্ম্মজ্ঞান অনুসারে সমাজের উন্নতিসাধন করিতেছে। লোকে এক্ষণে জাহাজে করিয়া শ্রীক্ষেত্র, চট্টগ্রাম, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যাইতেছে, সে বিষয়ে আপনারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি? লোকে এক্ষণে নানাজাতি একত্র হইয়া বিদ্যালয়ে একত্র পাঠ করিতেছে, সংসারে একত্র ব্যবসা করিতেছে, অনেক স্থলে একত্র আহারাদি করিতেছে, সে বিষয়ে আপনারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি? লোকে এক্ষণে বহুবিবাহ ত্যাগ করিতেছে, বাল্যবিবাহ ত্যাগ করিতেছে, স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দিতেছে, বালবিধবাদিগের বিবাহ দিতেছে, সে বিষয়ে আপনারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি? লোকে এক্ষণে নানাজাতি একত্র হইয়া রাজনৈতিক উন্নতিসাধন করিতেছে, জাতীয় ঐক্যসাধন করিতেছে, সে বিষয়ে আপনারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি? লোকে এক্ষণে জগৎ পরিক্রমণ করিয়া বিদ্যালাভ করিতেছে, বহুদর্শিতা লাভ করিতেছে, সে বিষয়ে আপনারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি? প্রিয় বন্ধুগণ! ধর্ম্মই মনুষ্যের প্রকৃত বন্ধু, ধর্ম্মই উন্নতির প্রধান উপায়। আপনারা যদি ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা দিতেন, তাহা হইলে সমাজের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন। আর যদি কেবল নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে সে ব্যবস্থা তুচ্ছ করিয়া হিন্দুসমাজ আপনার উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবে! পণ্ডিতমহাশয়গণ! প্রকৃত ধর্ম্ম একটু আলোচনা করিবেন, প্রাচীন শাস্ত্র একটু দেখিবেন, বেদাদি একটু পাঠ করিবেন, শাস্ত্রে বলে, বেদাদি পাঠ না করিয়া ব্যবস্থা দান করিলে তাহাতে পাপ হয়,—দেশের সর্ব্বনাশ হয়।*

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিদায় হইলে কলিকাতা হইতে কামিনীকান্তবাবুর প্রেরিত কয়েকজন মহাসম্ভ্রান্ত পরামর্শদাতা আসিয়া কামিনীকান্তবাবুর নামে এ বিবাহ নিষেধ করিতে বসিলেন। কামিনীবাবু বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—আমাদের মধ্যে যাহা হইয়াছে, এখন আর বিবাদ-বিসম্বাদ নাই, এক্ষণে রমণীবাবু যেন এরূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়া বংশে কলঙ্ক না আনেন। রমণীকান্ত

---

* বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ৩।৬, ১২।

হাসিয়া বলিলেন,—আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, আমি ধর্ম্ম অনুসারেই কার্য্য করিতেছি। জ্যেষ্ঠমহাশয়কে জানাইবেন, তিনিও ধর্ম্ম অনুসারে আচরণ করিলে এ প্রাচীন বংশ সম্মানিত হইবে, নর্ত্তকী-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিলে পতিব্রতা গৃহিণী সম্মানিত হইবেন। শাস্ত্রে বলে, পতিব্রতা পরিত্যাগ করিলে গর্দ্দভচর্ম্ম পরিধান করিয়া ছয় মাস প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।*

কামিনীকান্তের বন্ধুগণ প্রস্থান করিলে পর তালপুকুর ও সনাতনবাটীর দলপতিগণ সমবেত হইয়া এ কার্য্য নিষেধ করিবার জন্য রমণীকান্তবাবুর নিকট আসিলেন, তালপুকুরের ঘোষালের পো তাঁহাদের বক্তা। ঘোষালমহাশয়ের সুন্দর বক্তৃতা অনেকক্ষণ শুনিয়া রমণীকান্তবাবু সহাস্যবদনে উত্তর দিলেন,—পণ্ডিতপ্রবর! ভিন্ন-জাতির মধ্যে বিবাহ-কার্য্য অধর্ম্ম বলিয়া আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় না—বিবাহিতা নারীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করাই অধর্ম্ম বলিয়া আমার বোধ হয়। তোমার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে শিশু অবস্থায় আমি ক্রোড়ে করিয়া খেলা দিয়াছি, আজি তোমার নৃশংস আচরণে সে অকালে মৃত্যুশয্যায় প্রায় শায়িত, তাই এ কথা বলিতেছি, ক্ষমা করিও। নারীকে ক্লেশ দিলে বংশ নির্ব্বংশ হয়, এই শাস্ত্রের বচন।† শাস্ত্রের আদেশ পরকে শুনাইবার যেরূপ অভ্যাস আছে, নিজের জীবনে পালন করা বোধ হয় তোমার ততদূর অভ্যাস নাই। সেইজন্য অন্য একটী আদেশ দিতেছি,—তোমার গৃহিণী আমার কন্যাস্বরূপ, এবং তুমি আমার জমিদারীর মধ্যে বাস কর। সাবধান!

ঘোষালের পো মুখটী চূণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। শুনিয়াছি সেই দিন হইতে সহধর্ম্মিণীর জন্য একজন পরিচারিকা রাখিলেন, এবং নিজেও একটু যত্ন করিতে লাগিলেন। দুঃখিনী ঘোষালপত্নী প্রাণে বাঁচিল।

সকল বন্ধু ও পরামর্শদাতৃগণ চলিয়া গেলে পর সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র রমণীবাবুর নিকট আসিয়া বলিলেন,—জগৎসুদ্ধ লোক এ বিবাহকার্য্যে আপত্তি করিতেছে, আপনি যদি এখন নিরস্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাই করুন। আমার জন্য কেন জগতের নিকট অবমানিত হইবেন?

রমণী। হেমচন্দ্র! এ কার্য্যে তোমার মনে কোন সন্দেহ হইতেছে? তোমার হৃদয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে?

হেম। কিছুমাত্র নহে। আমাকে লোকে অনেকদিন একঘরে করিয়াছে। আপনি আমার সহিত এ সম্বন্ধে স্বীকৃত হইয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার কন্যাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমি কেবল আপনার জন্য বলিতেছিলাম।

রমণী। তবে নিশ্চিন্ত হও। তোমার ন্যায় কুটুম্ব পাইয়া আমিও সম্মানিত হইয়াছি. সুশীলা মাতার ন্যায় শান্ত, সরলা, সর্ব্বগুণসম্পন্না সহধর্ম্মিণী পাইয়া দেবীপ্রসাদও সম্মানিত হইবে। আমি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র যতদূর বুঝি, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য যতদূর বুঝি—এ কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধও নহে এবং কর্ত্তব্যবিরুদ্ধও নহে। আমার হৃদয় যখন সৎকার্য্য করিতে আমাকে আদেশ দেয়, লোকনিন্দা-ভয়ে সে কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকা আমার অভ্যাস নাই।

সনাতনবাটীর জমিদার রমণীকান্তের একমাত্র পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে মহাসমারোহ হইল। রমণীকান্ত নিজে মহাসমারোহ ভালবাসেন না—গত সপ্তবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ভূমিতে কম্বল বিছাইয়া শয়ন এবং অতি সামান্য খাদ্য ভক্ষণ তাঁহার অভ্যাস। কিন্তু অদ্য সমারোহ না করিলে নয়। অদ্য দেশে দেশে সংবাদ প্রচার হইয়াছে যে মহাবলপরাক্রান্ত জমিদার রমণীকান্ত সনাতনবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া নিজ সম্পত্তি অধিকার করিয়াছেন। অদ্য গ্রামে গ্রামে সংবাদ প্রচার হইয়াছে যে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ জমিদার প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে আপন সন্তানকে কায়স্থ-কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন। অদ্য ঘরে ঘরে প্রচার হইয়াছে যে দেবতুল্য দেবীপ্রসাদের সহিত লক্ষ্মী-সদৃশা সুলক্ষণা সুশীলার বিবাহকার্য্য সম্পাদন হইবে। চারিদিকের গ্রাম হইতে সহস্র সহস্র ইতর ভদ্র লোক সনাতনবাটীতে নবজমিদারের পুত্রবিবাহ দেখিতে আসিয়াছে; প্রাচীন

আপস্তম্ব ১।১০।২৮।১৯।

† মনুসংহিতা ৩।৫৭।

জমিদার-গৃহ আজি নূতন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া, নিশান ও পতাকায় আচ্ছাদিত হইয়াছে; গ্রামে, বাজারে, হাটে, দোকানে লোকে আজি সেই বিবাহের কথা কহিতেছে; মেয়েমহলে আজি বড় রঙ্গের কথা গড়াইতেছে! বিবাহের দিন প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য উদয় হইল, তখন সনাতনবাটী লোকে লোকারণ্য, তোরণ ও পতাকায় উজ্জ্বল, বিবাহের বাদ্যরবে ও মনুষ্য-কোলাহলে পরিপূর্ণ এবং নবজাত সূর্য্যালোক এবং হৃদয়ের আনন্দালোকে স্নাত!

সন্ধ্যার সময় বর বাহির হইল। সনাতনবাটী হইতে তালপুকুর পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, সে পথ আজি দীপালোকে সমুজ্জ্বল। সহস্র মশালধারী সেই পথে দিবালোক বর্ষণ করিতেছে, দশসহস্র পল্লীগ্রামনিবাসী সেই পথে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের নবজমিদার ও জমিদারপুত্রকে দেখিতে আসিয়াছে। সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া বাদ্যকরেরা রণবাদ্য বাজাইয়া অগ্রসর হইল; মশালধারিগণ সারি সারি মশালের আলোক বর্ষণ করিতে লাগিল; এবং তাহার মধ্যে কখন কখন গন্ধকের আলোক, বা রক্ত বা পীত বা হরিদ্বর্ণ আলোক নয়ন ঝলসিত করিল। বহু বন্ধু বেষ্টিত হইয়া দীর্ঘকায় তেজঃপূর্ণ রমণীকান্ত পদব্রজে চলিতেছেন, এবং তাঁহার পশ্চাতে রৌপ্য-বিমণ্ডিত শিবিকায় কার্ত্তিকেয়তুল্য সৌন্দর্য্য ও বীর্য্যসম্পন্ন দেবীপ্রসাদ দর্শন দিলেন! সহস্র সহস্র পল্লীগ্রামনিবাসিগণ যখন নবজমিদারের দর্শন পাইল, যখন বিবাহবেশে নবীন জমিদারপুত্রকে দেখিতে পাইল, তখন তাহারা হৃদয়ের উল্লাসে জয় জয় নাদ উচ্চারণ করিয়া মেদিনী ও নৈশ আকাশ কম্পিত করিল!

এদিকে দরিদ্র বিন্দুবাসিনীর ক্ষুদ্র কুটীরও লোকে আজি পরিপূর্ণ। বিন্দুবাসিনী দরিদ্র, বিন্দুবাসিনীকে লোকে একঘরে করিয়াছে, সুতরাং সচরাচর তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে অধিক লোকের সমাগম ছিল না। কিন্তু আজি দেশের জমিদারের একমাত্র পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইবে, বিন্দুবাসিনী জমিদারের কুটুম্বিনী হইবেন, সুশীলা জমিদার-গৃহের গৃহিণী হইবেন, সুতরাং দেশের মেয়ে আজ বিন্দুর বাড়ী ছাইয়া ফেলিয়াছে। বহু পুরাতন বন্ধুগণ এতদিন পর তাঁহাদের স্মরণ করিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্বগণ এতদিন পর সুশীলার তত্ত্বতল্লাস করিলেন, এই আয়ুর্ব্বর্দ্ধনকামনায় বস্ত্র ও মিষ্টান্ন পাঠাইলেন। প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মিতে যেমন নানা বৃক্ষ হইতে শত শত পক্ষী আসিয়া গগন ছাইয়া ফেলে,—বিন্দুবাসিনীর সৌভাগ্যদিনের উদয়ে জ্ঞাতি কুটুম্বগণ সেইরূপ চারিদিক হইতে আসিয়া দরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটীর ছাইয়া ফেলিলেন।

সে মেয়েমহলের মধ্যে আজি সুধাহাসিনীর ন্যায় কে প্রফুল্লা, কে রসিকা, কে সানন্দহৃদয়া? সুধার বিবাহের সময়ে অনেকে যাহার-পর-নাই নিন্দা করিয়াছিলেন, অপবাদ দিয়াছিলেন, সুধাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, আজি সুধা বড়লোকের গৃহিণী হইয়াছেন, বড়লোকের কুটুম্বিনী হইতে চলিলেন, সুতরাং সেই সমস্ত লোকেই অদ্য সুধাকে কত মিষ্ট কথা কহিতেছেন, সুধাকে তুষ্ট করিতে কত যত্ন করিতেছেন! সুধার সরল ও পূর্ণ-হৃদয়ে রোষের লেশ মাত্র নাই—যাঁহারা তাঁহাকে এককালে নিন্দা করিয়াছিলেন, সুধ তাঁহাদিগকে ভগিনীর ন্যায় সম্ভাষণ করিতেছেন, যাঁহারা তাঁহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, সুধা আজি তাঁহাদিগের হাত ধরিয়া সমাদর করিতেছেন, গলা ধরিয়া মিষ্টালাপ ও হাস্য করিতেছেন! ক্ষমা সমাজের বন্ধনী, ক্ষমা মনুষ্যের হৃদয়ের তোষিণী। রোষ, ঈর্ষ্যা, অভিমান ও গর্ব্ব আমাদের সকলেরই আছে, এবং ইহার পরবশ হইয়া আমরা প্রত্যহ আমাদের ক্ষুদ্র সমাজে অনৈক্যসাধন করিতেছি। যাঁহারা এই সকল রিপু দমন করিয়া ক্ষমা-পরবশ হইয়া শত্রু-মিত্রকে আলিঙ্গন করেন, সমাজে ঐক্য স্থাপন করেন, হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী, তাঁহাদিগকে দেব বলিয়া আমি প্রণাম করি।

বড় আহ্লাদের সহিত সুধা আজি সুশীলাকে সাজাইতে বসিয়াছেন,—সে শাস্ত্রে সুধার ন্যায় কোন্ নবীনা পারদর্শিনী? আট বৎসর পূর্ব্বে সে বিধবা বালিকা দিদির ঘরে রন্ধন-কার্য্য করিত, বাসন মাজিত, ঘর ঝাঁট দিত, আর বিড়ালছানা লইয়া খেলা করিত, সংসার কাহাকে বলে জানিত না, প্রণয় কাহাকে বলে বুঝিত না; আট বৎসরের মধ্যে সুধা প্রণয় বুঝিয়াছে, বিবাহের অর্থ বুঝিয়াছে, সংসার জানিয়াছে, নবজাত পুষ্পের ন্যায় তাহার হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি একে একে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই মনোবৃত্তিগুলির সহিত যেন তাহার দেহলতা নব সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইয়াছে! লাবণ্যময়ী যুবতী আজি স্বামীর প্রেমধনে ধনবতী, স্বামীর সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী, পুত্রের স্নেহে স্নেহময়ী। সমাজ যে কোরকটী অকালে পদে দলিত করিবে

ইচ্ছা করিয়াছিল, নবশিক্ষার স্নিগ্ধ কিরণে সে কোরকটী পুষ্পিত হইয়াছে, জগৎসংসারে কি সুগন্ধ, কি আমোদ বিতরণ করিতেছে। কোন্ দরিদ্রা সুধার নিকট আসিয়া বঞ্চিত হইয়া যায়, কোন্ হতভাগিনী সুধার মায়া, সুধার স্নেহ, সুধার সহানুভূতি পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী না মনে করে? সুশীলাকে মনের মতন করিয়া সাজাইতে সাজাইতে সুধার আপন জীবনের কথা ক এক একবার মনে উদয় হইল? আপনি যে প্রণয়ধন, যে স্বামীর ভালবাসা পাইয়াছেন, সুশীলা মাতা সেই ধনে চির ভাগ্যবতী হয়, বার বার এই নীরব আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সুধার হৃদয় ভালবাসায় প্লাবিত হইল। মনের মতন করিয়া বালিকার সুন্দর কেশপাশের উপর সিঁথি পরাইয়া দিলেন, সুললিত বাহু ও হস্তে তাবিজ ও বাজু, দমদম ও বলয় পরাইয়া দিলেন। লাবণ্যময় কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে সখের সপ্তনর ঝুলাইয়া দিলেন। হাসিতে হাসিতে বড় নৈপুণ্যের সহিত বালিকার চুল বাঁধিয়া দিলেন, বড় স্নেহের সহিত কপালে চন্দনের টিপ পরাইয়া দিলেন! বৈকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সজ্জাকার্য্য চলিতে লাগিল, কন্যাকে সাজান আর শেষ হয় না! স্নেহময়ী মাতা বিন্দুবাসিনী এক একবার ঘরে আসিয়া তাড়া দিতেছেন, কিন্তু রসিকা সুধাহাসিনী আজ ছাড়িবার লোক নহেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দিদি, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন তুমি গিয়া দেখ,—কন্যা সাজান আজ আমার কাজ!

হাসিতে হাসিতে বিন্দুবাসিনী খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন দেখিতে গেলেন। নূতন রন্ধনশালা প্রস্তুত হইয়াছে, সনাতনবাটী হইতে ভাল ভাল পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়া বড় সমারোহে রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ঘর ও প্রাঙ্গণ নানারূপ মিষ্টান্নে ভরিয়া গিয়াছে, বর্দ্ধমান হইতে ভাল ভাল খাজা, সীতাভোগ ও মিহিদানা আসিয়াছে, সে খাজাগুলি এক একখানি থালার ন্যায় বৃহৎ, সে মিহিদানার দানাগুলি এক একটী সরিষার ন্যায় সূক্ষ্ম! সমস্ত বাটী মেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে, সকলে কন্যার মাতাকে সম্ভাষণ করিতেছে, সমাদর করিতেছে, তোষামোদ করিতেছে,—আজি বিন্দুবাসিনীর ন্যায় কে ভাগ্যবতী?

এইরূপ আনন্দের দিনে, উৎসবের দিনে, বিন্দুবাসিনীর এক একবার পুরাতন কথা মনে পড়িতে লাগিল; আলোকপূর্ণ দিনে এক একটী ক্ষুদ্র মেঘের ন্যায় সুখের দিনে এক একবার দুঃখের কথা হৃদয়-আকাশ দিয়া চলিয়া যায়। অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে বিন্দুবাসিনীর দুঃখিনী মাতা দুই বালিকাকে লইয়া এই গ্রামে বাস করিতেন, পুকুর হইতে জল আনিতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, রাঁধাবাড়া করিতেন, মেয়ে দুটীকে দুঃখে মানুষ করিতেন।

আজি যদি সেই স্নেহময়ী মাতা ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, আজি যদি হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রের ন্যায় জামাতা দুইটীকে দেখিতে পাইতেন, আজি যদি বিন্দু ও সুধাকে একবার আয় মা, কোলে আয়" বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিতেন, আজি যদি লক্ষ্মীস্বরূপা দৌহিত্রী সুশীলাকে বুকে লইয়া একবার সাশ্রুজলে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেন, আজি যদি মাতার পুণ্যবলে কন্যাদিগের সৌভাগ্যের উদয় দেখিতে পাইতেন, আজি যদি বিন্দুর সংসারে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিন্দুর ঘর কি আনন্দপূর্ণ হইত, বিন্দুর সংসার কি জ্যোতিঃপূর্ণ হইত! লোকপূর্ণ প্রাঙ্গণ হইতে সরিয়া গিয়া নীরবে বিন্দুবাসিনী একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন, নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া স্বর্গীয়া মাতার জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ অনুভব করিয়া একটী প্রণাম করিলেন; এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

বিবাহের দিন শোকের দিন নহে, বাদ্যকরগণ সজোরে বাদ্য করিয়া উঠিল, বাহিরবাটী হইতে কন্যাযাত্রীদিগের ঘন ঘন সানন্দ হাস্যরব শব্দিত হইতে লাগিল। সেই কন্যাযাত্রীদিগের মধ্যে হেমচন্দ্র আজি শান্তহৃদয়, প্রফুল্লমনা, সহাস্যবদন! লোকে তাঁহাকে অনেক নিন্দা করিয়াছে, বিধবা শ্যালীর বিবাহ দেওয়ায় একঘরে করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেবতুল্য চরিত্র দেখিয়া সকলেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মান্য করে। সচরাচর যে গুণগুলিদ্বারা লোকে “বড়লোক” হয়, হেমচন্দ্রের তাহার একটীও নাই। হেমচন্দ্রের ধন নাই, জমিদারী নাই, বিশেষ বিদ্যা নাই, জগৎসংসারে নাম নাই, রাজদত্ত উপাধি নাই, কোনও বিষয়ে অধিক গৌরব নাই। তথাপি সেই সামান্য দরিদ্র পল্লীবাসীর হৃদয়ের সাহস, নির্ভীকতা ও পবিত্রতা দেখিয়া শরচ্চন্দ্র ও রমণীকান্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনে অবিচলিত উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পল্লীগ্রামবাসী ও নগরবাসিগণ চমৎকৃত হইয়াছেন! দারিদ্র্যে, শোকে, রোগে মহামনা হেমচন্দ্রের মন একদিনও টলে নাই; নিন্দা, ভর্ৎসনা ও অপবাদে, একদিনের জন্য কর্ত্তব্যসাধনের পথ হইতে তাঁহার

I